“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

ভারতী

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(১৩২৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০]   ভারতী কার্য্যালয়,   [বার্ষিক মূল্য ৩।৵০

১৩২৫ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

চিত্র সূচী

অন্ধ·ণিমা

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

৪২শ বর্ষ]　　　　বৈশাখ, ১৩২৫　　　　[১ম সংখ্যা

জয়ধ্বনি

রক্তের আল্‌পনা,—　　　মৃত্যুর জল্পনা,—
　তার মাঝখান্‌টিতে জাগ্‌ছে ও কে!
নির্ম্মল্‌ মুখখানি,　　　উৎপল্‌ দুই পাণি,
　শান্তির কান্তিটি ভায় দু' চোখে!

নক্ষত্রের বীথী　　　কার প্রাণ্‌ময় গীতি
　তন্ময় শুন্‌ছে গো স্বপ্নসুখে!
ডঙ্কার ডিণ্ডিম,—　　　ঘোর হুঙ্কার ভীম,—
　উৎপাত নিঃসাড় কার সমুখে?

কার ইঙ্গিত্‌-বলে　　　সিন্ধুর ঢেউ চলে
　বজ্রের বেগ বাঁধা কার নিয়মে?
খুন্‌-লুণ্ঠন্‌-রত　　　ক্রুর-নিষ্ঠুর যত
　কার দুই পায় নত হয় চরমে?

কার কাল্‌-বৈশাখী　　　ঘোম্‌টায় থোয় ঢাকি
　চন্দন্‌-ধৌত সে স্নিগ্ধ চাঁদে?
দিন মাস বৎসর　　　কার পন্থার পর
　হয় আর পায়, হায়, লয় অগাধে?

শেষ ফল কার হাতে?　　　সংশয়ময় রাতে—
　উজ্জ্বল ভায় সদা কার বা জ্যোতি?
কণ্টক কণ্টকে　　　উদ্ধার কর্‌ছ কে?
　যুগ-যুগ ওই পদে মোর প্রণতি।

দুষ্টের দুষ্কৃতি　　　কৌটিল্যের নীতি
　চক্রের ঘূর্ণনে ওই কে গুঁড়ায়!
ঝঞ্ঝার তাণ্ডব—　　　কার শঙ্খের রব?—
　দস্যুর বৈভব পাড়্‌তে ধূলায়!

নিদ্রায় জাগ্‌ছে যে,—তিন লোক রাখ্‌ছে যে,—
　নক্‌সায় দাগ্‌ছে যে দূর ভাবী কাল,—
উৎসব যার হাসি—　　　সব সংশয়-নাশী,—
　হার কঙ্কাল-রাশি—সর্প ভয়াল।—

পদ্মের সদ্মে যে,—　　　বজ্রীর ছদ্মো'যে,—
　সত্ত্বের মধ্যে যে—মৌন মহান,—
তার্‌ রূপ স্বাধ্‌ দীন!　　　রুদ্রের দক্ষিণ
　মূর্ত্তির কর্‌ আজ কর জয়-গান।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ছন্দ-সরস্বতী

—প্রথম প্রকাশ—

[আত্মাশ্রী-মূর্ত্তি—মকরাঙ্গী ডিঙ্গা বাহন—গঙ্গিনীতরণ পদ্ধতি]

বারো উৎরে তেরোয় পা দেওয়ার মাস-খানেকের মধ্যেই ছন্দ-সরস্বতী স্কন্ধে এসে ভর কর্‌লেন। তার ফলে, বিকেলে, ইস্কুল থেকে এসেই, পিতামহের পরিত্যক্ত, অনেকদিনের পুরোনো, নীলরঙের একখানা বাতিল্ ব্যাঙ্ক-বই আমার নিজস্ব ডেস্ক থেকে বার ক'রে, তার রুল্-টানা পাতায় সযত্নে লিখলুম—

"কি দিয়া পূজিব মাগো, কি আছে আমার।
জ্ঞানহীন আমি দীন সন্তান তোমার॥"

এম্‌নিধারা গোটা-আষ্টেক-দশ লাইন লিখ্‌তেই সন্ধ্যা হ'য়ে গেল।

লেখ্‌বার এবং লেখা লাইনগুলো ফিরে-ফিরে পড়্‌বার ঝোঁকে এম্‌নি মশ্‌গুল ছিলুম, যে, পিছনে যে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তা' টেরই পাই-নি। হঠাৎ—"বাঃ! বেশ হয়েছে।"—শুনে, চম্‌কে ফিরে দেখি মাষ্টারমশাই।

তিনি বল্লেন—"তুমি তো বেশ পদ্য লিখ্‌তে পারো, কোথাও ছন্দ-পতন হয় নি দেখ্‌ছি।"

আমি বল্লুম—"হয়-নি না কি? ছন্দ-পতন কাকে বলে? ছন্দের নিয়মই বা কি? আমায় শিখিয়ে দেবেন?"

মাষ্টারমশাই বল্লেন—"ছন্দের নিয়ম জান্‌তে চাও? তা' আমি তো ভালো জানিনে; তবে, মোটামুটি দু'চারটে যা' জানা আছে তা' বলছি। প্রথম কথা—ছন্দ নানারকম, এই ধর, যেমন পয়ার, ত্রিপদী, মালঝাঁপ।"

জিজ্ঞাসা করলুম—"পয়ার কি?"

তিনি বল্লেন—"পয়ার জান না? তুমি যে-ছন্দে লিখেছ, একেই বলে পয়ার। এর প্রতিলাইনে চোদ্দটি অক্ষর থাকে, জোড়া-জোড়া লাইনে মিল। প্রতি পংক্তির অক্ষরগুলো সাজাবার আবার একটু কায়দা আছে। পরে পরে এম্‌নি সব কথা বসাতে হয় যাতে আট অক্ষর আর চোদ্দ অক্ষরের পর একটু দম নেওয়া যায়। সাধারণত বিজোড়-হরফ-ওয়ালা শব্দের পর বিজোড়-হরফ্-ওয়ালা শব্দই বসাতে হয়, —জোড়ের পর জোড়; তা'তে রচনা শ্রুতি-মধুর হয়।"

আমি বল্লুম—"তা হলে তো আমার ভুল হয়েছে; এই দেখুন, "কি দিয়া পূজিব" 'কি' হ'ল বিজোড়, ওর পর বিজোড় বসানো উচিত, কিন্তু তা' না বসিয়ে, জোড় বসানো হয়েছে,—'দিয়া' দু'অক্ষরের শব্দ।"

মাষ্টারমশাই একটু মাথা চুলকে বল্লেন—"এখানে 'কি দিয়া' একসঙ্গে তিন অক্ষর ধরতে হবে, তার পর 'পূজিব' তিন অক্ষর; তা হ'লে বিজোড়ের পর বিজোড়ই হ'ল। এক-অক্ষরের শব্দ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পরেকার শব্দের সঙ্গে

ওকে যোগ ক'রে নিয়ে, জোড় কি বিজোড় ঠিক করতে হয়; তার পর—

"বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।
আটে ছয়ে হাঁফ্ ছেড়ে ঘুরে যাও মোড়॥
যুক্তাক্ষর চড়া পেলে হসন্তের লগি—
মারো ঝট্, ডিঙ্গা ভেসে যাবে ডগমগি॥
ঠাঁই বুঝে গুন টানো, ঠাঁই বুঝে দাঁড়।
যুক্তাযুক্ত হসন্তের পয়ার তাগাড়॥"

এই গেল পয়ারের নিয়ম। ছন্দকার বলেন—

"আট-ছয় আট-ছয়, পয়ারের ছাঁদ কয়,
ছয়-ছয়-আট ত্রিপদীর।
লঘু ছন্দ এনে বসে, দীর্ঘ আট-আট-দশে,
রচনা করিবে তুমি ধীর॥"

ছন্দের কথা এইখানে শেষ করে, অঙ্ক-ভূগোল-ব্যাকরণের নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতি আমাকে দিয়ে পালন করিয়ে মাষ্টারমশাই যথাসময়ে বিদায় হ'লেন, কিন্তু ছন্দ-সরস্বতী ঘাড় থেকে নাব্‌তে চাহিলেন না। যতক্ষণ জেগে রইলুম ছন্দের কথাই মাথার ভিতর ঘুরতে লাগল; ঘুমিয়েও নিস্তার নেই; স্বপ্ন দেখলুম, যেন, কাগজের নৌকো তৈরী ক'রে, ভাসাব ব'লে চৌবাচ্চার দিকে গিয়েছি, গিয়ে দেখি চৌবাচ্চা শুকনো খট্‌খটে! নিরাশ হ'য়ে জলের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে, হঠাৎ দেখি সামনে একটি ছোট্ট নদী ঝিরঝির ক'রে ব'য়ে চলেছে, নদীর—

"পাড়ময় ঝোপঝাড় জঙ্গল জঞ্জাল।
জলময় শৈবাল,—পান্নার টাঁকশাল॥"

জলে নাব্‌বো বলে ঘাট খুঁজলুম, পেলুম না; শেষে পায়ের দাগ খুঁজছি এমন সময় কে বলে উঠলো—

"কাঅ নাবড়ি খাটি মন কেড়ুআল।
সদ্‌গুরু বঅনে ধর পতবাল॥"

মাথা তুলে এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না। তার পর নদীর দিকে চোখ পড়তে, দেখলুম, যার আওয়াজ পাওয়া গেছে সেই লোকটি নিজের কায়াকে নৌকো ক'রে নদী পার হয়ে চলেছে,—তার নৌকো কাঠেরও নয়, কাগজেরও নয়। ফের যেই নাব্‌তে সুরু করেছি অমনি কে বলে উঠল—

"কে সিরজিল গঙ্গা, কে সিরজিল পঙ্ক।
তাহে উপজিল দ্বাদশ আঙ্গুল শঙ্খ॥"

উদ্‌গ্রীব হয়ে সামনেকার বন-ধুতরোর ডালপালা সরিয়ে দেখি কে একজন হাঁটুজলে হেঁটে চলেছে। লোকটির একহাতে একটি শ্বেতপদ্মের কুঁড়ির মতন শাঁখ, আর-এক হাতে নৌকোর রশি; গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে দেখি একখানা নৌকো তার পিছনে; লোকটা তারি গুন টেনে চলেছে, আর মাঝে মাঝে হাতের শাঁখটার উপর চোখ রেখে থমকে থমকে দাঁড়াচ্ছে।

গাঙের ধার-দিয়ে ধার-দিয়ে নৌকো-খানা ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। নৌকোর চেহারা অনেকটা মকরের মতন; মকরের পুচ্ছে চাঁদমালা, শুঁড়ে সোনার সিঁথী-মোর। মাঝিরা দাঁড় বন্ধ রেখে গান ধরেছে—

"দহে পৈসু বড়ারি, তিরীর জীবন।
বৈরী হঅাঁ লাগিলি এ রূপ জৌবন॥"

নৌকো আরো এগিয়ে এলে দেখলুম, মাঝি অনেক, কিন্তু আরোহী একজন মাত্র মেয়ে; তার গলায় কুঁদফুলের মালা, হাতে শ্বেতপদ্ম, কানে বকফুলের কর্ণিকা।

দেখেই কেমন মনে হ'ল, ইনিই গঙ্গা-দেবী। যেমন মনে হওয়া অমনি, পাঠ-শালের পোড়োদের মতন সুর ক'রে জোর গলায় বল্‌তে সুরু করলুম—

"বন্দে মাতা সুরধুনী,
পুরাণে মহিমা শুনি,
পতিতপাবনী পুরাতনী!"

আমি গঙ্গাবন্দনার দ্বিতীয় পদটায় না পৌঁছতেই নৌকো আমার সাম্‌নে এসে পড়ল। দেখ্‌লুম দেবী হাস্‌তে হাস্‌তে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছেন। তাঁর ডাকা সত্ত্বেও আমি জলে নাব্‌তে ইতস্তত করছি, দেখে, একজন মাঝি আরেক-জনকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে—"ওহে মুরারি ওঝার নাতি, ছেলেটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসনা ভাই! ও বোধ হয় জল দেখে ডরাচ্ছে।"

বল্‌বামাত্র মুরারি ওঝার নাতি এসে আমার হাত ধরে বল্লেন—"চলে এস, ভয় কি? হাঁটু-জল।"

"নৌকোয় পা দিতেই দেবী বল্লেন,—"তুমি আমার মকরাঙ্গী ডিঙ্গা দেখে, বোধ হয়, আমায় মকরবাহিনী গঙ্গা ঠাউরেছ। আমি গঙ্গা নই, আমি ছন্দ-সরস্বতী। আজ প্রায় হাজার বছর ধ'রে এম্‌নি ক'রে এই ডিঙ্গায় চড়ে গৌড়-বাংলার নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেন জানো? মরালের সন্ধানে। অনেক দিন মানস-সরোবরে যাওয়া হয় নি, তাই, এদের বল্লুম আমার বাহন খুঁজে দিতে, তা এরা আমায় এই মন্থরগতি মকরাঙ্গী ডিঙ্গা এনে দিলে।—

'ভালো আর নাহি লাগে সদা সর্ব্বক্ষণ।
মকরাঙ্গী ডিঙ্গা চড়ি গাঙ্গিনীতরণ॥'"

অন্যমনস্কভাবে পায়ে ক'রে একরাশ টগর আর শ্বেত-শিউলী জলে ফেলে দিয়ে দেবী বল্‌লেন—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

আমি বল্লুম—"যাব।"

কি আশ্চর্য্য! বলবা মাত্র দেখি নৌকো চলতে আরম্ভ ক'রেছে! দুইধারে সপ্তপর্ণী আর পঞ্চমুখী জবার জঙ্গল নিরিবিলি সাত-পাতা আর পাঁচ-পাপ্‌ড়ির পয়ার-পাঁচালি রচনায় ব্যস্ত। গাঙের জলে রাশ রাশ বিল্বপত্র ত্রিপদীর অর্ঘ্য বহন ক'রে চলেছে। মেয়েরা গা ধুয়ে কলসীতে জল ভর্‌তে ভর্‌তে গুন্‌-গুনিয়ে গাইছে—

"বাঁশী বাজাইল যবে কাহ্নে,
কোকিল কৈল পালি গানে;
আগুনি জ্বালিল, দেহে তখন, দক্ষিণ পবনে।"

তারা সব—

"উপর কর্ণে চাকি পরে নাম্বা কর্ণে ঢেঁড়ি।
তাহার মধ্যে শোভা করে হীরা মঙ্গল কড়ি॥"

তাদের—

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনী বহিয়া যায়।"

এম্‌নি কত স্নানের ঘাট কত আঘাটা পিছনে ফেলে নৌকো চলেছে, একদিকে—

"মুকুলিল আম্র-সাহারে।
মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জরে॥"

অন্যদিকে—

"মাদলের বাজনে রাউত নাচ্যা যায়।
কাহন কুঞ্জরে সাজে রাজরূপ রায়॥"

একদিকে ধনী বেনেদের মস্ত মস্ত বাড়ী, তার—

"পাষাণ দেয়াল ঘরের, লোহার কবাট।
হীরার বাঁধুনি, নাই পীপিড়ার বাট॥"

অন্যদিকে বিজন বন, সেখানে—

"খোঁড়া বাঘ বলে উঠি বাউলের প্রায় ছুটি
তবু মোর তিন খানি পা।
গণ্ডার লুকায় কোলে ক্রোধের সময় ফুলে
পর্ব্বত সমান হয় গা ॥"

একদিকে মূর্চ্ছাবন্দী গড়, তার—
"বাহির মহলে বসেছে বীর
ধরণী উপরে ধনুক তীর।"

অন্যদিকে, লতা-বিতানে ঘেরা স্বপ্নপুরীর পইঠায়—
"সুকোমল চরণ কমল দু'টি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি আঁচল ধরায় পড়ে লুটি।"

একদিকে স্তবের গুঞ্জন,—
"নমস্তে সর্ব্বানী ঈশানী ইন্দ্রানী
ঈশ্বরী ঈশ্বর-জায়া!"

অন্যদিকে সুরের ক্রন্দন—
"কেন এত ফুল তুলিলি স্বজনী, ভরিয়া ডালা।"

একদিকে পল্টন চলেছে—
"কত, নিশান ফরফর্ নিনাদ ধরধর্
কামান গরগর্ গাজে।"

অন্যদিকে—
"কপোত দুটি ডাকে, বসি শাখে মধুরে,
দিবস চ'লে যায় গলে যায় গগনে;
কোকিল কুহু তানে ডেকে আনে বধুরে,
নিবিড় শীতলতা তরু-লতা গহনে॥"

ছবির পর ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছি, হঠাৎ, আপ্‌নার মনে ছন্দময়ী বলে উঠ্‌লেন—
"বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক-রেখা॥"

আমি জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে মুখের পানে চাইতেই বল্লেন—"পেয়েছি, আমার মরালের সন্ধান পেয়েছি। সে যুক্ত-ডানা মুক্ত ক'রে আমার দিকে উড়ে আসছে।" হঠাৎ আমার হাতের দিকে নজর যেতেই বল্লেন,—"তোমার হাতে ও কি? কাগজের নৌকো? ভাসিয়ে দাও, ভাসিয়ে দাও, এতক্ষণ ভাসাও-নি কেন? .. আচ্ছা তুমি কাগজের হাঁস তৈরী করতে জান?...জাননা?...বাড়ী থেকে কাগজ নিয়ে এস, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।"

কাগজের জন্যে বাড়ী ফেরাটা কিন্তু মোটেই মনঃপূত হ'ল না। প্রথমে পকেটটা হাৎড়ে দেখ্‌লুম, তার পর, কি ভেবে জানিনা—বোধ হয় কাগজের বদলে তাল-পাত চলে, এই কথাটা মনে পড়ে গিয়ে থাক্‌বে—যেমন একটা হেলে-পড়া তালগাছের পাতা ছিঁড়ে নেবার জন্যে টান দেব অম্‌নি নৌকোখানা স'রে গেল, আমি শূন্যে ঝুলতে লাগলুম। তারপর সমস্ত কেমন গুলিয়ে গেল। খালি মনে পড়ে নৌকোখানা অদৃশ্য হওয়া মাত্র, তার গুন-টানা দড়িগুলো অজগরের মতন হ'য়ে আমার পায়ে যেন জড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল। আমি প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম, এবং সেই চীৎকারের চেষ্টাতেই ঘুমটাও ভেঙে গেল। চোখ্ মেলে দেখি বন্ধ জান্‌লার ছিদ্র দিয়ে তবকু-মোড়া মোটা মোটা গুন-টানা দড়ির মতন সূর্য্যের কিরণ বিছানায় এসে পড়েছে।

দ্বিতীয় প্রকাশ—

[হৃদ্যাশ্রী-মূর্ত্তি,—মঞ্জুমরাল বাহন—
গঙ্গা-যমুনা পদ্ধতি।]

তিন্‌টে বছর অক্ষর গুণে কেটে গেল। এই সময়ে একদিন ইস্কুলের পথে, আমাদের

পাড়ার এক ভদ্রলোকের হাতে একখানি লাল মলাটের বই দেখ্‌লুম। জিজ্ঞেস ক'রে জান্‌লুম সেটি কবিতার বই। লাভ সাম্‌নে ইস্কুলেই যাওয়া গেল, কিন্তু মনটা পড়ে রইল সেই বইটার উপর। পণ্ডিতের ঘণ্টায় ছেলেরা যখন হট্টগোল জুড়ে দিয়েছিল আমি তখন টেবিলে মাথা দিয়ে সেই বইটার কথাই ভাব্‌ছিলুম। হঠাৎ দেখি ছন্দময়ী আমার সাম্‌নে উপস্থিত! এবার নতুন মূর্ত্তিতে,—মরাল বাহনে, বীণা-পুস্তকরঞ্জিত-হস্তে। ভোরের আলোয় শুকতারার মতন তাঁর চোখদুটি, আধ্-ফোটা বেলফুলের কুঁড়ির মতন তাঁর মুখখানি,—প্রসন্ন প্রফুল্ল অথচ প্রশান্ত। তাঁর হাতের পুস্তকটিকে প্রথমে টালি বলে' ভুল ক'রেছিলুম, কিন্তু ক্রমশ জান্‌লুম, সে টালিও নয়, পাটালিও নয়, সেটি হচ্ছে, আমার ইস্কুলের পথের মারীমৃগ—সেই লাল মলাটের কাব্যগ্রন্থাবলী।

ছন্দময়ী বল্লেন—"দেখ, দেখ,—

'বঙ্গ-হৃদয় উন্মীলি যেন
রক্ত কমল ফুটে!
নিমেষে নিমেষে আলোকরশ্মি
অধিক জাগিয়া উঠে!'"

ছন্দময়ী যখন আবৃত্তি করছিলেন, আমি তখন বইটার পাতা ওল্‌টাচ্ছিলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল—

"একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু বলিবারে চাই
বলিতে দিতেছ কই?"

আমার অক্ষর-গোণা বিদ্যার এই নতুন ছন্দের কোনো হদিস্ না পেয়ে দেবীকে বল্লুম—"এ কি রকম পদ্য? এ যে পড়াই যায় না, অক্ষর সব কম-বেশী।"

ছন্দময়ী হেসে বল্লেন—"এই আমার মঞ্জু মরাল, এর কণ্ঠে কলধ্বনি, চরণে নৃত্য, গতিতে বৈচিত্র্য অথচ সুষমা। এতদিন বাঙালী ছন্দবিদ্যার প্রায় উড়ে আর আসামীর সামিল ছিল, এই বারে বিশিষ্টতা অর্জ্জন ক'রেছে।"

আমি বল্লুম—"আমি কিন্তু এর বিশেষত্ব ধর্‌তে পার্‌লুম না।"

ছন্দময়ী বল্লেন—"পংক্তির বা শব্দের গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়গায় যুক্ত অক্ষর, প্রকৃত পক্ষে যে এক-জোড়া অক্ষর, এই কথাটা স্মরণ রাখলে, এই নতুন ছন্দের বিশেষত্ব বুঝ্‌তে কষ্ট হবে না। হ্যাঁ, আর এটাও স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে ঐকার আর ঔকার হচ্ছে স্বর-সঙ্কর অর্থাৎ এক-জোড়া ভিন্ন জাতের স্বরবর্ণে তৈরী —ইংরিজিতে যাকে বলে dipthong; এই দুটো কথা মনে রেখে, এই নতুন ছন্দ পড়তে, কি লিখ্‌তে চেষ্টা করলে সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে। এখন আর বাংলা ভাষা ব্রহ্মার কমণ্ডলুর ভিতর, যুক্ত-অক্ষরের হর্ত্তুকি-বয়ড়া, আর হসন্তের জুঁইফুল পচিয়ে মহা-সুগন্ধি ত্রিফলার জল তৈরী করছে না; এখন এ 'বহতা পানী নির্ম্মলা'...আমার গাঙ্গিনী-তরণের মকরাঙ্গী ডিঙ্গা সোনার তরীতে পরিণত হয়েছে। যা এতদিন সিংহল-যাত্রায় বেরিয়ে ক্রমাগত খালের জালেই ঘুরে মরছিল, তা এবার গঙ্গা-যমুনা পদ্ধতিতে পাড়ি দিয়ে সাগর-সঙ্গম ছাড়িয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় অগ্রসর। সাগরের

তরঙ্গ-ভঙ্গে এখন এর উল্লাস। যুক্তাক্ষরের চড়ায় ঘেঁষ্‌ড়াতে ঘেঁষ্‌ড়াতে, হসন্ত-তকারের কল্‌মীদাম দাঁড়ের আগায় ছেঁচ্‌তে ছেঁচ্‌তে, অন্যান্য হসন্ত-অক্ষরের শুশুক-পৃষ্ঠে লগি লাগাবার দুশ্চেষ্টা করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছিল। বাংলা কথার উড়ে উচ্চারণ আর সহ্য হয় না। বাঙালী কবির—

'স্ত্রীর নাহি অন্য গতি সৃজিল বিধাতা।
স্নেহে অধিক নাহি স্বামীর ব্যগ্রতা॥'

আর উড়ে কবির—

'নির্ম্মল দ্রুষ্টিরে নাথ' মোতে ন চাঁহুছ।
বেনিভুজে আলিঙ্গন' কিম্পা ন করুছ॥'

ছন্দ উভয়েরই সমান; তফাৎ এই যে, উড়ে পয়ারটির 'নির্ম্মল' 'নাথ' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণে অকারান্ত; অপর পক্ষে বাংলা পয়ারটির 'অধিক' 'স্বামীর' প্রভৃতি শব্দের শেষ অক্ষর হসন্ত, অথচ শুধু ছন্দের খাতিরে অকারান্ত ক'রে পড়্‌তে হয় অর্থাৎ উড়ে-পন্থী হ'তে হয়। মাত্রা-বিচার-শূন্য অক্ষর-গোনা-ছন্দ, এখন উড়ে কবিরা সযত্নে রক্ষা করুন, বাঙালী কবির দ্বারা আর ও কাজ চল্‌বেনা। কারণ উচ্চারণের ধারা তফাৎ হ'য়ে গেছে। উচ্চারণের নিরিখ ক্রমাগতই বল্‌ছে যে পুরোনো ছন্দ পুরোনো কাপড়ের মতন ভগ্ন হয়েছে; ওতে আর লজ্জা নিবারণ হবে না, এখন—

'হরী নু কং রথ ইন্দ্রস্য যোজমায়ৈ
সূক্তেন বচসা নবেন।'

এখন দেবতার রথে নূতন ছন্দের তরুণ অশ্ব-যোজনা করতে হবে।

'স প্রত্নবন্‌ নব্যসে বিশ্ববার
সূক্তায় পথঃ কৃণুহি প্রাচঃ॥'

"তা হ'লে দেবতাও সেই পূজা গ্রহণ ক'রে, ভাবের ভুবনে তোমাদের নূতন নূতন পথ খুলে দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

পয়ার ত্রিপদীর কাজ ফুরিয়েছে। ছন্দ-বিদ্যায় বাঙালী আর পাঁঠশালের পোড়ো নয়, উঁচু ক্লাসে প্রোমোশন হয়েছে। সে আর আসামী কবির—

"দুধ পিউ দুধ পিউ বোলেরে যশোবা।
দুধ না খাঞা গোপাল কান্দে ওবাঁ ওবাঁ॥'

ছন্দে ভুল্‌ছে না; কারণ তার ছন্দ-বুদ্ধি এখন বোধিসত্ত্ব, সে আর স্তনন্ধয় শিশু নয়। মঞ্জু-মরালের পায়ে সোনার মঞ্জীর বেজে উঠেছে। এ আর গাঙ্গিনী-তরণ পদ্ধতির মকরাঙ্গী ডিঙ্গা নয়; এতে 'ঙ্গ'-এর দু'-রকম বাটখারায় ওজন চল্‌বে না। ছন্দ-ব্যবসায়ীরা এখন থেকে আর হসন্তের ষাট তোলা, স্বরান্তের আশী এবং সংযুক্তাক্ষরের একশো তোলা—দুজেশ্বরীর টাটে ব'সে—তিনরকম বাটখারায় মিশিয়ে, ইচ্ছামত ওজন দিয়ে—চুক্তি-ভুক্তন্‌ করতে পারবেন না। ঐ দেখ শান্ত জলেও আজ ঢেউ উঠেছে—

'কলস ঘায়ে উর্ম্মি টুটে,
রশ্মি-রাশি চূর্ণি উঠে,
শান্ত বায়ু প্রান্ত নীর চুম্বি যায় কভু।'"

আমি এইবার জিজ্ঞাসা করলুম—"ছন্দ পাটির অনুসারে এই পদটি কি পাটিয়ে দেখ্‌তে পারি?"

দেবী হেসে বল্লেন—"দ্যাখো।"

পাটিয়ে এই রকম দাঁড়াল:—

কলস ঘায়ে। উর্‌মি টুটে।
রশ্‌মি রাশি। চুর্‌ণি উঠে।
শান্‌ত বায়ু। প্রান্‌ত নীর। চুম্‌বি যায়।

ছন্দময়ী দেখে বল্লেন—"ঠিক হয়েছে, প্রতি পংক্তি-পর্ব্বে পাঁচ। এ আমার পাঁচ্‌কড়াই পাইজোর।"

এই ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে, আবার আপনার মনে গুন্‌গুন্ ক'রে বল্‌তে লাগলেন—

"গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম-জলে
মেলিয়া যুক্ত ডানা,
মঞ্জুমরালি বিহর হরষে
সঙ্গীত গাও নানা।
ওগো বিচিত্র! বঙ্গবাণীর
নবীন বাহন তুমি,
মধুস্বরের কলগুঞ্জনে
মোহিত বঙ্গভূমি।"

ছন্দময়ী নীরব হ'লে আমি বল্লুম—"এই নতুন ছন্দে লিখ্‌তে চেষ্টা করব কি?"

দেবী বল্লেন—"এখন না।"

জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন?"

তিনি বল্‌লেন—"খবর্দ্দার! ভয়ানক মার খাবে।"

ছন্দ-সরস্বতীর এই আকস্মিক রূঢ়তায় বিস্মিত হ'য়ে, তাঁর মুখের দিকে চাইতে গিয়ে চোখ-দুটো একটু বেশীমাত্রায় বিস্ফারিত হ'য়ে গেল এবং দেখলুম—সে মুখ ছন্দ-সরস্বতীর নয়—আমাদের ক্লাসের পণ্ডিত-মশাইয়ের। আমাকে তাঁর ঘণ্টায় ঘুমুতে দেখে তর্জ্জনী তুলে প্রচণ্ড রকম তর্জ্জন সুরু ক'রেছেন।

—তৃতীয় প্রকাশ—

[চিত্রশ্রী-মূর্ত্তি—মত্তময়ূর বাহন—
ঝর্ণা-ঝামর-পদ্ধতি।]

মঞ্জু-মরালের নৃত্যের তালে কান তৈরী হওয়ার বছর পাঁচেক পরে আবার এক দিন সন্ধ্যার ঝোঁকে খেয়ালী মেয়ে ছন্দময়ী এসে হাজির। বাইরে তখন ঝর্ণার মতন ঝঙ্কার সুরে বৃষ্টি ঝরছে, বাদ্‌লা হাওয়ায় জুঁইফুলের গন্ধ, জান্‌লা দিয়ে এসে, আস্তে আস্তে চোখের উপর ঘুমের চামর ঢোলাচ্ছে। চোখ একেবারে ঝাম্‌রে আস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই জুঁইফুলের ঘুম্-ঘুম্-গন্ধ থিতিয়ে গিয়ে জুঁইফুলের মতন হাল্‌কা এবং জুঁইফুলেরই মতন ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ের চেহারা আমার চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি জড়ানো আওয়াজে বল্লুম—"কেগা?"

মেয়েটি বল্লে—

"'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান,
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল তিন কন্যে দান।'

"আজ এই তিন কন্যের তৃতীয় কন্যাটির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব ব'লে, এলুম।"

আমি সসম্ভ্রমে উঠে বসে বল্লুম—"দেবী, আজ তোমার এ আবার কি মূর্ত্তি?—

"ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ-শুভ্র-নীল-পদ্ম-বিভূষণা!
হংসারূঢ়া! ময়ূর-আসনা!'

আজ্‌কে মেঘাড়ম্বর দেখে মত্ত ময়ূরকে ধ'রে বুঝি বাহন ক'রেছ? হাতে নীল-পদ্মের কুঁড়ির মতন ওটি কি?"

ছন্দময়ী বেশ একটি কি নাম বল্‌লেন; নামটি সংস্কৃত-গোছের, তার মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ। তাড়াতাড়ি সেই অপূর্ব্ব-নাম-বিশিষ্ট নীল পদ্মটিকে হাতে নিতে গিয়ে দেখলুম, সেটি পদ্ম নয়, হাতের পোঁছার মতন ছোট্টো একটুখানি মেঘের টুক্‌রো, তাতে বিদ্যুৎ ঝলক দিচ্ছে! আমি স্পর্শ করবার

আগেই সে হাত-ফস্‌কে অন্ধকার ঘরের কোণে কোণে, বিদ্যুৎ-হাসি হাস্‌তে লাগ্‌ল।

ছন্দময়ী বল্‌লেন—"ওকে অত সহজে আয়ত্ত করতে পার্‌বে না। ও হ'ল বাংলাভাষার প্রাণপাখী। ওকে যে বশ করতে পারবে বঙ্গবাণীর স্বরূপ-মূর্ত্তি সে প্রত্যক্ষ করবে, বাংলা সঙ্গীতের মর্ম্মের কথা তার কাছে রূপ ধ'রে ফুটে উঠ্‌বে। দেখ্‌তে ছোট বটে, কিন্তু, সহজে তুমি ওকে হাত-করতে পারবে না। আচ্ছা, রোসো.. আমিই ওকে ধরে দিচ্ছি।"

এই-ব'লে ছন্দময়ী বীণার তারে আঙুল সঞ্চালন করতে লাগলেন বীণা ব'লে উঠল—

"তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।"

ছন্দটি নতুন অথচ চির-পরিচিত মনে হ'ল,—বাড়ীর মেয়েকে পূজো-বাড়ীতে দেখার মতন। তাড়াতাড়ি খড়ি পেতে ছন্দলিপি নিতে গেলুম, কিন্তু, একি!

তোমার আমার। মাঝখানেতে।
একটি বহে। নদী।
দুই তটেরে। একই গান সে।
শোনায় নির-। বধি।

—যুক্তাক্ষরের বালাই নেই, অথচ—ছয়, পাঁচ, পাঁচ, দুই; পাঁচ, ছয়, পাঁচ, দুই;—পংক্তিপর্ব্বের কোনোটায় ছ' অক্ষর কোনটায় পাঁচ, এ কি-রকম?

ছন্দময়ী ঈষৎ হেসে, আমার ছন্দলিপির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লেন—"এ ছন্দে হসন্ত বা ভাংটা অক্ষর ছাঁটাই ক'রে, খালি স্বরান্ত বা গোটা অক্ষর গুণতে হয়। শব্দের যে-যে-অক্ষর উচ্চারণে হসন্ত, সেইগুলিতে হসন্তের চিহ্ন দিয়ে ছাখ, বুঝতে পারবে।"

আমি আবার ছন্দপাটি ধরলুম—

তোমার্‌ আমার্‌। মাঝ্‌খানেতে।
একটি বহে। নদী।
দুই তটেরে। একই গান্‌ সে।
শোনায়্‌ নির-। বধি॥

পংক্তিপর্ব্বগুলো পরীক্ষা ক'রে বল্লুম—"সকল পর্ব্বেই চার পাচ্ছি; ~~শুধু দ্বিতীয়~~ পংক্তির প্রথম পর্ব্বে পাচ্ছি পাঁচ। দু-ই-ত-টে-রে, তবেই পাঁচ হ'ল। এইখানে ছন্দ পতন হ'য়েছে।"

দেবী বল্লেন—"দাঁড়াও, অত শীগ্‌গির ছন্দ পতন হ'য়েছে ব'ল' না। দুই-শব্দের ইকার পুরো উচ্চারণ হচ্ছে না, কাজেই ওটা হসন্তের সামিল; যদি স্বরবর্ণ ব'লে ওকে হসন্ত বলতে ইচ্ছা না হয়, ওকে আধলা বা ভাঙটা বলতে পার, পুরো বা গোটা বল্‌তে পার না। বাংলায় হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ বা হ্রস্ব-উ দীর্ঘ-ঊ নেই; আছে গোটা ই, ভাংটা ই্‌; গোটা উ, ভাংটা উ্‌;—এমন কি গোটা ও, ভাংটা ও্‌; গোটা এ, ভাংটা এ্‌ পর্য্যন্ত আছে। 'বাইশ' আর 'বাইজী' শব্দ 'বাউল' আর 'আউলে' শব্দ 'বাঁওড়' আর 'হুকওড়া' শব্দ, মনসামঙ্গলের 'গাএন' আর 'প্যাএরা' শব্দ পরস্পর তুলনা ক'রে দেখলেই আমার বক্তব্য বুঝতে পারবে। এই সমস্ত জোড়া জোড়া উদাহরণের গোড়ার গুলিতে গোটা এবং শেষের গুলিতে ভাংটা স্বর

রয়েছে। বাংলায় সমস্ত স্বরই এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্যঞ্জন ত স্বভাবতই আধ্‌লা, স্বরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে তবেই পুরো হয়। কাজেই কি স্বর, কি ব্যঞ্জন সমস্ত বর্ণেরই এই দুই মূর্ত্তি,—গোটা আর ভাংটা, পুরো আর আধ্‌লা।

আগেকার কবিরাও নিজেদের রচনায় বাংলার এই বিশেষত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন, ওই শোনো মুরারি ওঝার নাতি কি বল্‌ছেন—

'বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥'

"তোমাদের ভাগবতকার কি বল্‌ছেন শোনো—

'হাসিয়া নড়িলা কৃষ্ণ শিশুর্‌ কথা শুনি।
তাল্‌ খাইবারে শিশুর্‌ সঙ্গে চলে চক্রপাণি॥'

"রামায়ণে আর ভাগবতে ভাংটা স্বরের নমুনা দেখ্‌লে? এখন মহাভারতকার কাশীদাস কি বলেন শোনো—

'নির্দ্দারিদ্র্য হইল ক্ষিতি পাইয়া মহাদান।'

"সেকালের উচ্চারণে হসন্ত বা ভাংটা স্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই ছিল; নইলে ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যে যাঁরা রাজপূজা পেয়ে এসেছেন, তাঁরা পদে পদে এ সমস্ত ব্যাভার ক'রে স্বেচ্ছায় নিজের রচনাকে বিড়ম্বিত করতেন না।"

আমি বল্লুম—"তা যেন হ'ল—স্বরের পুরো ও ঝুরো মূর্ত্তি যেন স্বীকার করা গেল—কিন্তু ঐ ছন্দে লিখে আর বাহাদুরী কি? এতো আমাদের পুরোনো তেরকেলে ছড়ার ছন্দ—নিরক্ষর চাষার ছন্দ, সাপের মন্তরের ছন্দ।

ছন্দময়ী বল্‌লেন—"হ্যাঁ, এ নিরক্ষরের ছন্দ; সংস্কৃতের উঞ্ছিতে এর চেহারা বদলে যায় নি; সেইজন্যে ভাষার নিজস্ব রূপটি এতে বজায় আছে। তাই বাইরে থেকেই বোঝা যায়, এর বুকের ভিতর—

'কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি
কত স্রোতের টান,
পূর্ণিমাতে সাগর হ'তে
কত পাগল বান।'

"এর অর্দ্ধোচ্চারিত বর্ণ-বিন্যাসে যেন রঙিন ছবির ছায়া-সুষমা; এর চোখের পাতায়, ঠোঁটের কোণে, এর ভাঁজে-ভাঁজে, পরতে পরতে—

'কত আভাস আসা-যাওয়ার
ঝর্‌ঝরাণি হঠাৎ হাওয়ার!'

"ওজন-বজায় রাখার চেয়ে সংখ্যা ভর্ত্তি করবার দিকে যাঁদের বেশী ঝোঁক তাঁরাই একদিন একে পয়ারের কাঠগড়ায় পুরে এর চেহারা বিগ্‌ড়ে দিতে গিয়েছিলেন। মধ্য-যুগের ফার্সীনবিশ লিখিয়েরা ফার্সীর দেখা-দেখি বাংলার 'যাইবে' 'পাইবে' প্রভৃতি শব্দের অনির্দ্দিষ্ট বা ভাংটা ই-কারগুলিকে গোটা বা পুরো ক'রে বাংলা ছন্দের পায়ে অক্ষরবৃত্তের তুড়ুং ঠুকে দিয়েছিলেন। চীনে সুন্দরীদের পায়ের মতন কেতাবী ভাষার ছন্দের গতি, পয়ারের লোহার জুতোর মধ্যে অল্প বয়সে বাঁধা পড়ে, একেবারে বেঁকেচুরে আড়ষ্ট হ'য়ে এসেছিল। বাংলা ছন্দের এই আড়ষ্ট গতিকে কেউ কেউ শালীনতার বা আভিজাত্যের লক্ষণ বল্‌তেও কুণ্ঠিত হন নি, কিন্তু এ যে অস্বাভাবিক তা অস্বীকার করতে পারেন না। এ সমস্তই বাইরে থেকে কারী-

অলঙ্কারের একটা অবান্তর সূত্রের অনুসরণ করার ফল। 'জরূরৎ-ই-শা'য়র্' বা ছন্দের খাতিরে বয়েতের ভিতর প্রচুর পরিমাণে ই-কারের আমদানী করা ইরানী কবিদের একটা মহৎ ব্যায়রাম; যেমন—

"নিশস্ত্(ই) সর্-। বর্(ই) আহ্ল্(ই)।
করম্ ব মজ্-। লিস্(ই) খাস্।
দো খাঁ' সে খাঁ'। দো সে খাঁ' খাস্ত্।
(ই) খাঁ' চে খাঁ। কে ন' খাস্ত্।

ফার্সীর নজীরে এম্নি ক'রে মধ্যযুগের ছন্দকারেরা হসন্ত-শব্দকে খেয়াল-মাফিক স্বরান্ত বা হসন্ত করেছেন। কালিদাসের প্রাকৃতে—

'কিং বি হিঅএ করিঅ মস্তেধ'

ইত্যাদি পদের 'করিঅ' (কৃত্বা) শব্দের ই-কার যখন ঢুলে ঢুলে ক্রমশ ঘুমিয়ে নেতিয়ে পড়্ল, তখনো কেতাবী ভাষায় কাতুকুতু দিয়ে তাকে জাগিয়ে রাখ্বার চেষ্টা চলেছে, কিন্তু এত করা সত্ত্বে ভাষার স্বরূপ চাপা পড়েনি।"

ছন্দময়ী নীরব হ'লে আমি বল্লুম—"তা পড়েনি। এখন বেশ বুঝ্তে পারছি পুরোনো কবিদের ভিতর চৌদ্দর নিয়ম এত শিথিল কেন। আগে ভাব্তুম এঁরা বুঝি মিশরী কবিদের মতন ছন্দসৌকুমার্য্য রক্ষার চেয়ে বক্তব্য বিষয়টা স্পষ্ট কর্বার দিকেই বেশী ঝোঁক দিতেন—তা' অক্ষর যতই বেড়ে যাক্‌না কেন। যেমন—

ধেয়ানত হাড়ি গুরু ধেয়ান্ করি চায়্।
ধেয়ানর মাবতু ষোল কাওন্ কড়ি ঝোলায় লাগাল্ গায়।

"সেকালে গুন্তির হিসেব চলন থাক্লে শেষের পংক্তিতে আটের ফারাক দাঁড়ায়; শব্দ-পাপড়ি বা syllableএর হিসেবে তিনের ফারাক হয়। কাজেই, শেষের নিয়মই প্রাচীন কালে বলবান ছিল, বলা সঙ্গত। নইলে বল্তে হয় বাঙালীরা ছন্দবিদ্যায় মিশরীদের নিকট জ্ঞাতি বা ভক্ত শিষ্য। কৃত্তিবাসও লিখেছেন—

তারা মোকে নিবেধিল ত্রিবিধ বিধানে।
তোমা হেন ধার্ম্মিক্ চণ্ডালে প্রতীত্ গৈলাঙ্ কেনে॥

তার পর শূন্য-পুরাণের—

কুথা হইতে আইলেক্ কুর্ম্ম কুথা তোহ্মার ঘর।

কিম্বা মাণিকচন্দ্রের গানের—

যখন্ আ্সিবে যম্ভাড়ুয়া দেখে ~~[illegible]~~
তৈল পাঠের খাড়া দিঞা ফেলাম্ কাটিঞা॥

অথবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের—

তোমা সভা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ্ ছাড়া যায় তোমা সভা ছাড়িতে না পারি॥

প্রভৃতি শত শত পদ, যা' আমাদের পণ্ডিতমশাইরা এতদিন প্রাচীন কবিদের ছন্দ-মূর্খতার উদাহরণ ব'লে ঘোষণা ক'রে এসেছেন, তা', এই ছড়ার ছন্দের বা ঝর্ণা-ঝমরপদ্ধতির নিয়মে, syllable বা শব্দ-পাপ্ড়ির সংখ্যার হিসাবে প্রায় নিখুঁৎ। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে, ভাষার যা' ধাতুগত,—যা ছেলে-ভোলানো গানে, মেয়েলি ছড়ায়, ব্রতকথায়; যা' সাপের ওঝা, ভূতের ওঝা, ডাইনের ওঝার বোলচালে; যা বাড়ীবন্ধ, শরীরবন্ধ, জলপড়া, তেলপড়া, সর্ষেপড়ার মন্ত্রে; এক কথায় বাংলার অথর্ব্ববেদে যা' আত্মপ্রকাশ করেছে; অন্যদিকে যা' পাঁচালি-তর্জ্জায়, ঝুমুরে-কবিতে, যা' ভেল্টলের সুরে, বাউলের গানে, বৈরাগী-ফকিরের সাধন-সঙ্গীতে, যা' রামপ্রসাদের

রচনায়, এক-কথায় বঙ্গের গীতিসাহিত্যে যা বাঙালীর সামবেদে, নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছে, তা' একদিন বাংলার সত্যিকার ঋগ্বেদে অর্থাৎ কাব্যসাহিত্যেও সুব্যক্ত ছিল। সাক্ষী প্রাচীন কৃত্তিবাস ("বটতলার নয়), সাক্ষী গোবিন্দচন্দ্রের গান, সাক্ষী শূন্যপুরাণ। মক্তবের মুন্সীদের দুর্মুশ-দলনে বা টোলের পণ্ডিতদের গোময়-লেপনে তা যে একেবারে লুপ্ত হয়নি তার প্রমাণ আজ পাওয়া গেল। আশ্চর্য্য এই, যে, এদিকে এতদিন কারো নজর পড়েনি!"

~~ছন্দসরস্বতী~~ বল্লেন—"লম্বকর্ণদের ছন্দের কান নেই, তারা ছন্দের ভিতরকার সুর ধরবে কি ক'রে? বহুদিন পরে বাংলায় একজন সত্যিকার কবিকে দেখ্‌তে পেয়েছি যে জগতের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারে—

'বেদানাম্ মাতরম্ পশ্য

মৎস্থাম্ দেবীম্ সরস্বতীম্।'

তাকে পেয়ে আমার অনেক ক্ষোভ মিটেছে, অনেকদিনের অনেক আরম্ভ সম্পূর্ণতা লাভ ক'রেছে। বাংলায় ছন্দ-বৈচিত্র্য সাধনের জন্যে এ পর্য্যন্ত অনেকে অনেক রকম চেষ্টা করেছেন,—মিথিলার অনুকরণে, টেণ্টন্, সরহ, কাহ্নুপাদ, নসীর মামুদ, রায় বসন্ত, গোবিন্দদাস বাংলার ছন্দে হ্রস্বদীর্ঘের কৌলীন্য প্রবর্ত্তনের চেষ্টা পেয়েছেন। ভারতচন্দ্র ভুজঙ্গপ্রয়াতের ভঙ্গীর হুবহু নকল ক'রেছেন কিন্তু খাঁটি বাংলা শব্দ সাম্‌নে পড়্‌লেই, ভঙ্গ না দিন, পাশ কাটিয়েছেন। গুপ্তকবি 'আয় রোদ্দুর হেনে' বা 'ধিন্‌তা-ধিনা' প্রভৃতি ছন্দে খাঁটি বাংলার ধাতটি প্রায় ধ'রে ফেলেছেন, বলা যেতে পারে; কিন্তু বেশী দূর এগোননি। এঁর 'স্বেচ্ছা ছন্দ' এখনকার 'মুক্তবন্ধ' বা Vers Libre এরই অগ্রদূত। তারপর মধুসূদনের ব্রাত্যশ্রী-সম্পন্ন অমিত্রাক্ষর, তাতে গ্রীকছন্দের Rhythm বা ছন্দস্পন্দ ধরা না পড়্‌লেও, বাংলার পক্ষে বেশ একটু নতুন জিনিস। রমাই পণ্ডিতের—

'জমরাজা পড়িল ফাঁপরে

আসিয়া জমের মা জমকে দিল গালি

পুত্র আজ করিলি রে সর্ব্বনাস।'

প্রভৃতি হিব্রু-বৃত্তগন্ধী রচনাকে যদি অমিত্রাক্ষরই ধরা যায়, তা হ'লেও মেঘনাদের ছন্দ-বিশিষ্টতা কমে না। তারপর যিনি যাই করেছেন, তাতে আমাকে ক্রমাগতই বল্‌তে হয়েছে—

'তোমরা কেউ পারবে না গো

পারবেনা ফুল ফোটাতে।'

"এইযুগে আমি যখনই বীণার জন্যে হাত বাড়িয়েছি তখন হয় পেয়েছি শিঙে নয় পেয়েছি রামশিঙে। মনের কষ্টে দিন কেটেছে। আমার দুঃখে বোধ হয় বিধাতার টনক নড়েছে, তাই পেয়েছি এই সুরবাহার। ইরানীরা বলে এক বুল্‌বুলে বসন্ত-সম্ভব হয় না, কিন্তু বাংলার শুভাদৃষ্টক্রমে এক বুল্‌বুলেই এখানে ঋতুরাজ মূর্ত্তিমান হ'য়ে উঠেছেন। বাংলাদেশের মুক্তবেণীর গঙ্গা-তীরে, একজন মাত্র কবির প্রতিভাবলে, আজ ছন্দের তিন ধারা বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে যুক্তবেণীর সৃষ্টি ক'রেছে। আজ—

'আকাশ জুড়ে চল নেমেছে, সূয্যি ঢেকেছে,

চাঁচর চুলে জলের গুঁড়ি,—মুক্তো ফলেছে।

চাউনিতে কার আওয়াজ দিয়ে বিজুলি চম্‌কায়,

হাওয়ায় উড়ে কদম ফুলের কেশর লাগে গায়।

আলুগোছে যা' গায় লাগে তা' গুণ্‌ছে বল কে?
নৃত্য করে মত্ত ময়ূর বিদ্যুতালোকে।
সুপ্ত বীজের গোপন কথা অঙ্কুরে আজ ছায়,
ঝর্ণা-ঝামর-পদ্ধতিতে ময়ূর নেচে যায়॥"'

ছন্দময়ীর ছন্দ-গুঞ্জন শেষ হ'লে আমি বল্লুম—"আচ্ছা, এই অক্ষর-গোণা ছন্দ এবং syllable বা শব্দ-পাপ্‌ড়ি-গোণা ছন্দ, মূলে কি একই জিনিস নয়?"

ছন্দময়ী হেসে বল্লেন—"আমার নবীন বাহন মত্ত ময়ূর আমাকে যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত করছে, কাজেই, আমি নিজে কিছু বল্‌তে পারব না। তামিল-আলঙ্কারিক অমৃত-সাগরন্‌কে স্মরণ করছি, সেই এসে যা' হয় বল্‌বে।"

এই ব'লে ছন্দময়ী অন্তর্হিত হ'লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নবজলধরকান্তি একজন পুরুষ ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে আমায় মধুর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি জান্‌তে চাও?"

আমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলুম।

তিনি বিজ্ঞভাবে ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন—"অলবড়ি!...অলবড়ি কাকে বলে জানো? যে-সমস্ত পদ্য-পংক্তিতে চারটি ক'রে পংক্তি-পর্ব্ব থাকে, তাকে বলে অলবড়ি। তোমাদের পয়ারেও তাই, লাচাড়িতেও তাই; ছড়ার ছন্দেও তাই, পুঁথির ছন্দেও তাই; কাজেই মূলে দুইই এক। অলবড়ি শব্দের অপ-ভ্রংশ হ'চ্ছে লাচাড়ি।"

হঠাৎ অমৃত-সাগরনের কথায় বাধা দিয়ে কে-একজন বলে উঠলেন—"কিহে? ভুল শেখাচ্চ কেন?"

অমৃত-সাগরন্‌ বল্লেন—"কে হে! সৈফী মিঞা যে! তুমি এসে জুটেছ? তুমি কি বল্‌তে চাও?"

কপালে রেশমী রুমাল বুলিয়ে মুসলমান ভদ্রলোকটি বল্‌লেন—"বল্‌তে চাই যে লাচাড়ী শব্দ ফার্সী লাচার-শব্দ থেকে এসেছে। লাচারেরা যে ছন্দে গান গেয়ে বা ছড়া ব'লে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়, সেই হচ্ছে লাচারী ছন্দ। যেমন লাচারী তোড়ি মানে লাচার বা ভিখিরীদের মুখে মুখে তোড়ি রাগিণীর যে নতুন চেহারা দাঁড়িয়েছে, সেইটি। আর পয়ার হ'ল আরবী বয়েৎ শব্দের অপভ্রংশ।"

অমৃত-সাগরন্‌ অদ্ভুতভাবে ঘাড় নাড়লেন। সৈফী মিঞা বিরক্তির স্বরে বল্‌লেন—"কি? 'হাঁ' বল্‌ছ, না 'না' বলছ? তোমার ও মাদ্রাজী ঘাড়-নাড়ার কোনো হদিস্‌ পাইনে, ব্রাদার্‌।"

"না বল্‌ছি,—নিশ্চয়ই 'না'। বয়েৎ থেকে পয়ার! তুমি হাসালে দেখছি। পয়ার হয়েছে তামিল ছন্দ 'পারণী' থেকে।"

"হুঁঃ! তাহলে আসামীরাও বল্‌তে পারে যে ল্যাচারি হয়েছে তাদের লেচার শব্দ থেকে—যার মানে—চলার ঝোঁকে হাতের ঝাঁকি।"

"কি রকম?"

"রকম আবার কি?"

বাংলায় তামিল আগে? না তুর্কী আগে?"

"বাংলায় ফার্সী কথা বেশী? না দ্রবিড় কথা বেশী?"

"দ্রবিড়!"

"কি রকম?'

"যেমন বহুবচনের 'গুলো'-শব্দ; আমাদের 'মরম্-গল' বাংলায় হয়েচে 'গাছগুলো'।"

"বেশ; কিন্তু অপর দিকটাও দেখছ না কেন? বাংলায় ক্রিয়ার ভিতরেও যে মুসলমানী ঢুকেছে,—আমাদের 'কম্' থেকে যে কমানো হ'য়েছে তা' জানো? তোমাদের বেশী প্রভাব, না আমাদের?"

"আমাদের!"

"আমাদের!"

"নিশ্চয়ই না!"

"নিশ্চয়।"

তুমুল তর্কে তন্দ্রা ভেঙে গেল। তখনও গোলমাল চল্‌ছে; তর্কটা এখন কিন্তু ঘরের বাইরে। তাড়াতাড়ি উঠে জান্‌লার ধারে গিয়ে দেখি, রাস্তায় একজন কেয়াফুল-ওয়ালা কুল্‌ফি বরফ খেয়ে পয়সার বদলে বরফ-ওয়ালাকে ফুল নিতে বলেছে, তারই গোলমাল।

—চতুর্থ প্রকাশ—

[দৃপ্তশ্রী-মূর্ত্তি — গগন-গরুড় বাহন—
বিমান-বিহার-পদ্ধতি।]

কলেজের পড়ায় ইস্তফা দিয়ে এবং বাংলা-ছন্দের ত্রয়ী মোটামুটি আয়ত্ত ক'রে একদিন কবিগুরুর মন্দিরে উপস্থিত হলুম। এবং প্রণাম ক'রে আমার যৎসামান্য ছন্দের অর্ঘ্য তাঁর পায়ের কাছে রেখে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলুম।

কিছুদিন যাতায়াতের পর একদিন কথায় কথায় কবিগুরু বল্‌লেন—

"বাংলায় ছন্দবন্ধের অভাব নেই, কিন্তু ছন্দস্পন্দ (rhythm) জিনিসটা তেমন ফুটতে পেলে না।"

আমি বল্লুম—"কেন আপনার—

'পৌষ প্রখর শীতে জর্জ্জর
ঝিল্লি-মুখর রাতি।'

প্রভৃতি কবিতা তো ছন্দস্পন্দের চমৎকার উদাহরণ।"

কবি বল্লেন—"কিন্তু, আনাড়ির হাতে ঐ ছন্দই এমন ছন্ন-ছাড়া মূর্ত্তিতে দ্যাখা দেয় যে ওকে আর চেন্‌বার জো থাকে না। বাংলায় হ্রস্ব-দীর্ঘের তেমন স্পষ্ট প্রভেদ না থাকায়, সংস্কৃতের মতন বিচিত্র ধ্বনির পর্য্যায়-বিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত হ'তে পারছে না। কেবল—'বিজোড়ে বিজোড় গেঁথে, জোড়ে গেঁথে জোড়'—হরফের পর হরফ সাজিয়ে কম্পোজিটারের নকল করলে ঠিক চলবে না। বাংলা উচ্চারণের বিশেষত্ব বজায় রেখে সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ বাংলায় আন্‌তে হবে। হরফের মাথায় খুসি-মতন ঘন ঘন কষি টেনে কাজ সারলে চলবে না। তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না। আমার বিশ্বাস তুমি ঠিক পারবে।"

কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্লুম—"ছন্দে নূতনত্ব বিধানের চেষ্টা আপনি ছাড়া আর-সকলের পক্ষেই অনধিকার-চর্চ্চা।"

কবি বল্লেন—"ওই দ্যাখ, তোমাদের এক কথা। আমি কি চিরকালই এই করব? খালি আমাকেই খাটাবে?, তোমরা একটু খাটবে না? সে হ'চ্চেনা। তোমাকেই এ করতে হবে। মন্দাক্রান্তা নিয়ে সুরু কর।... কবে দেখতে পাব, বল। কুড়েমি করলে

চল্‌বে না,...পরশু পারবে?... হ'য়ে উঠবে না?... ...আচ্ছা এক হপ্তা সময় রইল।"

আমি প্রণাম ক'রে বিদায় নিলুম।

বাড়ী এসে রাত্রে ছন্দময়ীর শরণাপন্ন হওয়া গেল।

ছন্দময়ী প্রসন্নমুখে বল্লেন—"তার আর কি? বাংলায় দীর্ঘস্বর নাই বা থাক্‌ল? যুক্তাক্ষর তো আছে।—

'সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গ-সংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু, পাদান্তস্থ বিকল্পেন চ॥'

—যুক্তাক্ষরের পর্য্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনি-বৈচিত্র্যের গতি-ক্রম প্রবর্ত্তিত কর।"

আমি বল্লুম—"তাহ'লে ক্রমাগত সংস্কৃত অভিধান থেকে দুর্ব্বোধ দুরুচ্চার্য্য শব্দের আমদানী করতে হবে; নইলে, বাংলায় সংযুক্তবহুল শব্দ তো আর বেশী নেই, কি ক'রে কাজ চল্‌বে?"

ছন্দময়ী বল্লেন—"পার্শী, আরবী, গ্রীক, রোমকে যুক্তাক্ষর নেই, অথচ তাতে কি ক'রে ছন্দস্পন্দের প্রতিষ্ঠা হ'ল?...হ'ল মোটামুটি দু'রকমে:—দীর্ঘ স্বরের সাহায্যে, আর অক্ষর-সংঘাতের বিন্যাসে। অর্দ্ধোচ্চারিত বা আল্‌গোছ অক্ষরের পর, পূর্ণোচ্চারিত বা গোছালো অক্ষর বস্‌লেই অক্ষর-সংঘাত হয়; সেই অক্ষর-সংঘাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে অক্ষর, তাকে পার্শী, আরবী, গ্রীক, রোমক ছন্দশাস্ত্রে দীর্ঘ বলেই ধরা হয়, কেননা, গায়ে গা জুড়ে না দিলেও, বস্তুত ও যুক্তাক্ষরেরই সামিল। কাজেই,

'দীর্ঘো সংযুক্ত-পরো।'

-এই নিয়ম এখানেও অবাধে খাটে। বাংলায় কি স্বর, কি ব্যঞ্জন, স্থল-বিশেষে দুইই আল্‌গোছ বা গোছালো,—ভাংটা বা গোটা,—ঝুরো বা পুরো হ'য়ে থাকে। কাজেই অক্ষর-সংঘাতের পর্য্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে—শুধু সংস্কৃত কেন?—সংস্কৃত, তামিল, পার্শী, আরবী, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় মধুর-গম্ভীর ভাষার ছন্দস্পন্দ আহরণ ক'রে বাংলা কবিতাকে অলঙ্কৃত করা যেতে পারে। বাংলায় স্বভাব-গুরু নাই থাক্‌ল? অবস্থানের গুণে গুরু ঢের মিল্‌বে। হিন্দীর—

'রাজত রাজ-সমাজ-ম
কোসল-রাজ-কিসোর।
সুন্দর সামল গোর তনু,
বিশ্ব-বিলোচন-চোর॥'

কিম্বা, মারাঠির—

ঝালা যথামতি কবিচা জামাতা,
উঁচ সৎকথা পরিসা।'
যা চরিতামৃত পানেঁ, যা লোকীঁ সর্ব্ব,
রসিক হো হরিসা॥'

অথবা গুজরাটির—

'রুথমনী তে কহে ছে তাতনে
শিশুপাল বর হুঁ নহি বরুঁ
জাদব-বংশী ছে কৃষ্ণজী,
তেও বাঁহে হুঁ ধরুঁ॥'

প্রভৃতি পদে, দীর্ঘস্বরের দরাজ আওয়াজ বায়ুমণ্ডলে জোয়ার ভাঁটার যে কুহক সৃষ্টি করে, তা হয় তো বাংলায় সম্ভব হবে না। না হোক, যতটা হয় তাই বা ছাড়বে কেন? তুমি কাজ আরম্ভ ক'রে দাও,—মেঘের সঙ্ঘাতে যে গর্জ্জন, যে বিদ্যুৎ, অক্ষর-সঙ্ঘাতের সাহায্যে তারি সৃষ্টি কর।"

আমি ছন্দময়ীর ইঙ্গিতে যন্ত্র-চালিতের মতন লিখলুম—

"ভরপুর্ অশ্রুর। বেদনা-ভারাতুর।
মৌন কোন্ সুর। বাজায় মন।
বক্ষের্ পঞ্জর। কাঁপিছে কলেবর্।
চক্ষে দুঃখের্। নীলাঞ্জন॥"

দেবী চোখ বুলিয়ে, বল্লেন—"এই তো! ঠিক হয়েছে, মন্দাক্রান্তা।—

'কশ্চিৎ কান্তা। বিরহগুরুণা।
স্বাধিকার-। প্রমত্তঃ।'

ভরপুর্ অশ্রুর। বেদনা-ভারাতুর।
মৌন কোন্ সুর। বাজায় মন।'

ঠিক হ'য়েছে। বাংলার ধাত বজায় আছে, অথচ মন্দাক্রান্তা হয়েছে। আচ্ছা আরেকটা চেষ্টা কর, মালিনী—এই তার ছাঁদ:—

অসিত-গিরি-সমংস্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে।
সুর-তরুবর-শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।"

আমি লিখলুম—

"উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল, শূন্যময় স্বর্ণ পিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।
রাগিণী সে আজি মন্থর, উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন,
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর, মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ।'

দেবী বল্লেন—"আচ্ছা এইবার সাতাশের ঘরানা চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত। ছাঁদ এই:—

'ইহ হি। ভবতি। দণ্ডকা-। রণ্যদে-।
শে স্থিতিঃ।
পুণ্যভা-। জাং মুনী-। নাং মনো-। হারিণি।'

আমি লিখলুম—

"গগনে গগনে। নীল্ নিবিড়।
ভিড় মেঘের। ভিড় গো ভিড়।
শোন্ তাদের। শব্দ ভীম।
ডম্বরুর। দুন্দুভির॥"

দেবী বল্লেন—"'পঞ্চচামর'—শিবতাণ্ডব স্তোত্রের ছন্দ।—

'গতিক্রমপ্রবর্ত্তিত প্রচণ্ড তাণ্ডবঃ শিবঃ।'"

আমি বল্লুম—

"মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর
বরণ তোমার তমঃ শ্যামল।
মহেশ্বরের প্রলয় পিণাক
শোনাও আমার শোনাও কেবল॥"

দেবী বল্লেন—"এইবার বৈদিক ছন্দ গায়ত্রী।
—'তৎস-। বিতুর্-। বরেণ-। ইঅম্।'"

আমি বল্লুম—

"সূর্য্য মহান্ তাহার অধিক
সত্য মহান্, মহান্ বিবেক।
অদিম্ এ সাম্ প্রধান এ ঋক!

মৃত্যু মহান্ তাহার অধিক
মুখ্য মহান্ প্রাণের নিষেক,
অভয় এ সাম্, অশোক এ ঋক।"

ছন্দময়ী বল্লেন—"বাল্মিকীর অনুষ্টুপ,—

'মা নিষাদ। প্রতিষ্ঠাংত্ব-।
মগমঃ শা-। শ্বতী সমা।'"

আমি বল্লুম—

"আর্ত্ত সংসার ব্যথায় কাঁদ্‌ছে,
ওরে শোন্ তুই যে ন'স্ বধির;
ধৃষ্ট ধায় ধূমকেতুর দম্ভে,
বাড়ে কল্লোল রুধির নদীর!
নিব্‌ছে উৎসব মানুষ ডুব্‌ছে,
প্রাণে সংশয় দু'পায় শিকল,
অগ্নি-খড়্গের পিশাচ-হাস্যে
সারা সৃষ্টির মরম বিকল।
অন্ধ স্বার্থের রথের চক্রে
ওঠে ঘর্ঘর নিনাদ নিদান,

যুদ্ধ দুনিয়ার চরম যুক্তি !
কাটে সাত চোর বিধির বিধান।
উগ্র আত্মম্ভরীর ডঙ্কা
বাজে ওই শোন্ কপাল-মালায় !
চক্ষে গহ্বর বিকট মৃত্যু
সেজে পল্টন আগুন জ্বালায় !
নষ্ট ঘর পর সুহৃৎ শত্রু
ভেঙে যায় সব লুটায় ধূলায়,
কষ্ট বিশ্বের গভীর মর্ম্মে
কাঁদে ক্রৌঞ্চীর হিয়ার কুলায়।
বিঁধল বাণ কার সাথীর বক্ষ
ধোঁয়া-শেষ নীড় মশাল শিখায় !
রিক্ত রাজ্যের মালিক মস্ত
কিবা সুখ তোর রাজার টীকায় ?
শুষ্ক অন্তর হৃদয় শূন্য
কি বাজাও বুক অহং-মায়ায় ?
ভস্ম-নেত্রের নিজের দৃষ্টি,
জেন, দগ্ধায় নিজের কায়ায় ॥"

দেবী বল্লেন—"তোটক !—ছাঁদ জানো তো ?—
'রণনির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরম্
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।'"

আমি বল্লুম—
"ওকি, ফুটল গো ফুট্‌ল দিগন্ত ভরি !
কারা, জাগ্‌ল ধূসর ধূলি শয্যাপরি ?
একি ভাণ্ডারে লুট ক'রে ধন লোটানো !
একি, চাষ দিয়ে রাশ ক'রে ফুল ফোটানো !"

দেবী বলে উঠলেন—"এই তো ! এই তো !—
'এ যে, চঞ্চলতার ডানা বৃন্তে বাঁধা,
এ যে, মূর্চ্ছনা-ময় গীতি মৌনে সাধা।'
ঠিক হয়েছে, আমি এই ছন্দকে আমার বাহন করে নেব। এ আমার গুরু-লঘু-সমাজে অসঙ্কোচ বিচরণে—কুণ্ঠাহীন বিমান-বিহারে—সহায় হবে, এর নাম রইল 'গগন-গরুড়'।"

আমি বল্লুম—"না, দেবী, তার চেয়ে নাম রাখুন—পুতুল-নাচের জটাইপক্ষী।"

ছন্দময়ী বল্লেন—"কেন ?"

আমি বল্লুম—"এখনো যথেষ্ট জড়তা রয়েছে।"

দেবী বল্লেন—"ও কিছু নয়, ও ঠিক হয়ে যাবে। আর ওকে কি জড়তা বলে ?
'অট্টালক পরম রম্য শৃঙ্গাটক বিবদ হর্ম্ম্য
দেব-দ্রুম দিব্য-কুসুম দেউল ফুলবাটি।'
কিম্বা—
'তৃষার্ত্ত সম্প্রাপ্ত সুধাব্ধি যত্নে
সমীক্ষি' সম্পূজ্য পদাব্জ রত্নে।
সুতৃপ্ত মচ্চিত্ত সুশান্ত অন্ত
সুধন্য সম্যক্ চতুরান্ত সন্ত ॥'
প্রভৃতি পদ যখন সর্ব্বাঙ্গে ভূর্জ্জপত্রের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গুটিগুটি বাংলার সদর রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, তখন তোমার আবার ভাবনা ? তুমি মিছে ভয় কোরো না, এ পুতুল-নাচের জটাইপক্ষী মোটেই নয়। এ গগন-গরুড়। এতকাল বিমান-বিহারের প্রয়োজন হ'লেই আমাকে মিথিলা থেকে পক্ষীরাজ ঘোড়া ভাড়া করে আনতে হ'ত ; নয়ত কৌশাম্বী রাজের চিড়িয়াখানা থেকে তাঁর হস্তীবিষ পাখীটি ধার ক'রে আনতুম্। তাতেও লঘু-গুরুর গোল ঠিক মিটত না, প্রমাণ—
'নানা তরুবর মৌলিল রে
গঅনত লাগেলী ডালি।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই
কর্ণ-কুণ্ডল বজ্রধারী ॥'

ক্রিয়া—

"চলইতে শঙ্কিত পঙ্কিল বাট।
মন্দির বাহির কঠিন কপাট॥'

"এই দুই পদের 'লাগেলী'র 'গে' এবং 'চলইতে'র 'তে' গুরু হ'লেও লঘুই পড়তে হয়েছে। বিমান-বিহার কুণ্ঠাবিহীন বৈকুণ্ঠের নাগাল পায়নি। ভারতচন্দ্র এ পদ্ধতিতে অনেকটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, অবশ্য খাঁটি বাংলা শব্দ একরকম বর্জ্জন করেই। যেমন—

'জয়, বিষাক্ত-কণ্ঠক কৃতান্ত-বৃঞ্চক
ত্রিশূল-ধারক হতাধ্বর
জয়, পিণাক-পণ্ডিত পিশাচ-মণ্ডিত
বিভূতি-ভূষিত কলেবর।'

এ শ্লোকে ক্রিয়া বা সর্ব্বনাম একটিও নেই, অর্থাৎ যেখানে বাংলার বাংলাত্ব তার চিহ্ন মাত্রও রাখা হয়-নি। বুঝেছ?...এখন, তর্ক থাক। চল গগন-গরুড়ে আরোহণ করে ভুবন-পর্য্যটন করে আসা যাক।"

এই বলে সস্নেহে আমার হাত ধরে ছন্দময়ী অন্তরীক্ষে উঠলেন। আমি সানন্দে বলে উঠলুম—"চমৎকার! চমৎকার!"

ছন্দময়ী তখন আপনার মনে বলছেন—

"উধাও! উধাও! গগন-গরুড়!
বিমান-বিহার তারায় তারায়,
সেতার, কানুন্, সারং, লায়র্
বীণার আওয়াজ হাওয়ায় হারায়।
আকাশ-নদীর লহর লীলায়
যে সুর সে আজ বীণায় আমার,
আমার বীণায় মেঘের গমক
অলখ চমক পুলক-হাওয়ার।
দ্বাদশ রাশির দ্বারের ধূলায়
রবির শশীর যে সুর হারা,—
আচোট আলোর কিশোর যে সুর
আমার যে আজ সবাই তারা।"

ছন্দময়ী গান থামিয়ে বল্লেন—"ভাখ, ভাখ, পায়ের নীচে তালীবন ছন্দে শাখা-বিস্তার করেছে; নীড়ে সুপ্ত পাখীর, দোলায় ঘুমন্ত শিশুর নিশ্বাসের ছন্দে বুক উঠচে পড়চে। ছন্দে সাগর দুলচে, ছন্দে পল্টন চলচে, ক্লান্ত কুলি ছন্দের ভরনায় বুক দিয়ে পরিশ্রমের কষ্ট ভুলছে। বিশ্ব-জগৎ ছন্দে ওতঃপ্রোত। ও শুধু সৌখীনের বীণার তারেই নেই, বিশ্ববীণার সকল তন্ত্রীতেই ছন্দের স্পন্দন।"

হঠাৎ এই সময়ে গগন-গরুড় ডানা স্থির করে রইল, অন্তরীক্ষে ছন্দময়ীকে দেখে কারা মধুর স্বরে গেয়ে উঠল—

"বিদিতা দেবী বিদিতা হো
অবিরল কেস সোহন্তী।
একানেক সহসকো ধারিণী
অরিরঙ্গা পুরনন্তী॥
কজ্জল রূপ তুঅ কালী কহিঅও
উজ্জল রূপ তুঅ বাণী।
রবি-মণ্ডল-পরচণ্ডা কহিএ
গঙ্গা কহিএ পানী॥
ব্রহ্মা ঘর-ব্রহ্মাণী কহিএ
হর ঘর কহিএ গৌরী।
নারায়ণ ঘর কমলা কহিএ
কে জান উতপতি তোরী॥"

গরুড় আবার উড়ে চল্ল। এইবার পাহাড়ী মেয়েদের গান শোনা যাচ্ছে—

"হিমালে মাথি লাসা র গাঁও
লামা ত টাসি ছ।"

টাসি লামার নাম শুনে কি জিজ্ঞাসা

করতে যাচ্ছি এমন সময় দেবী বল্লেন—"ওই ত্থাখ চীনের আলগা পাপ্‌ড়ি (monosyllable) শব্দের অপূর্ব্ব ছন্দ, মান্দারিন্ হংস হ'য়ে, এই দিকে পাখা মেলে আসছে, তারা বল্‌ছে—

'শিস্ কে ত্থায় গো আজ ?
তার কি ভিন্ গাঁ ঘর ?
দুখ সে তার কি পর ?
চাঁদ সে তার কি তাজ ?
কে ওই গায় রে গান !
যা ভাই তার নে খোঁজ !
কি গান গায় সে রোজ,
কি সাধ ছায় সে প্রাণ !
খোঁজ নে, যায় যে দিন,
ছাই যে ছায় রে দিক,
নীড় সে দূর হা ধিক !
দিন যে যায় রে দীন !
যে দিন যায় সে যায়,
যে ভুখ রয় সে রয়,
যে ভুল হয় সে হয়
দু চোখ জল যে ছায়।
হায় রে নেই ক' সুখ;
চাঁদ সে তার কি তাজ,
বল্ গো, ফুল কি সাজ,
ফাঁক রে ফাঁক এ বুক।'"

গাইতে গাইতে "কফুল্ অঙ্গ্ সফেদ রঙ্গ" হংসমালা আলোয় মিলিয়ে গেল। হঠাৎ নীল আকাশের কোণ থেকে তিনটে নীলকণ্ঠ পাখী বলে উঠল—

"নয় রে ভিন্
জড় ও জীব,
জড় যে এক,—
দেখ রে দেখ,—
শিব সে শিব
স্বর্-ভু-লীন।"

ক্রমে এদের আওয়াজও কমে গেল। এইবার পশ্চিম দিক থেকে এক ঝাঁক বুল্‌বুল্-বোস্তাঁ কাকলি করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে এল।

ছন্দময়ী বল্লেন—"ওরা সব ইরান-আরবের ছন্দ-পাখী; ওই যে ছন্দ-'মদীদ' বল্‌ছে—

'শিউলি কোটবার এইতো কাল,
ক্ষান্ত-বর্ষণ এই সকাল।'

"ত'বীল গাইছে—

'কাজল চোখ! যাহোক তুই লোক!
না-হক্ চাস্, ভুলাস্ দুখ শোক!'

"আমির প্রিয় ছন্দ হজজ্ কূজন ক'রে বলছে—

'হাজির ফাল্গুন, ভ্রমর গুন্‌গুন্
নূপুর রুণরুণ, গোলাপ নিম্‌খুন!'

"রজজ্ বলছে—

'কিশমিশ-ডালিম-পেস্তার মুলুক,
বুলবুল! কোয়েল! সঙ্গীত চলুক।'

"রমল্ গমক দিয়ে বলছে—

'ডাক্‌তে মন চায়, কিন্তু লজ্জায়
হয় না হায় হায়, এম্‌নি দিন যায়;
ওই হরিণ চোখ, চাউনি-টুক্ তোর
রইল সঞ্চয় ঝাঁজরা পাঁজরায়।'

"খফীফ্ মিহিসুরে বলছে—

'নেই সে ফাল্গুন বুল্‌বুল্ বিলাপ
করছে বিস্তর,
কুঞ্জে নেই ফুল, নিশ্চুপ সেতার,
গ্রীষ্ম দুস্তর।'

"মতদারিক গাইছে—

'দুঃখ দূর! দুঃখ দূর
হস্তে মোর স্বর্গপুর!'"

এমনিধারা ইরানী-আরবী ছন্দ-বিহঙ্গদের সঙ্গীত ফুরোতে না ফুরোতে দেবী বলে উঠলেন—"ওই ত্তাখ গ্রীসের মহাকবি হোমরের প্রধান ছন্দ ষট্-পর্ব্বিকা (Hexameter) স্বর্ণ-চঞ্চু ঈগল পাখীর মতন শূন্যে ডানা বিস্তার ক'রে সূর্য্যের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কি বলছে, শোনো শোনো—

'হিংসা কি সংসারে চারকালই থাকবে রে
থাকবে কি সংগ্রাম!
অন্তরে হীন তবে জ্ঞান কর কোন্ দোষে
দাও তারে দুর্নাম?
শৃঙ্গীরে দন্তীরে নাশ ক'রে দূর ক'রে
বশ ক'রে চেষ্টায়,
অন্তরে ভূত প্রেতই পুষবে কি, ফুঁসবে কি
রক্তেরি তৃষ্ণায়?
হায় মানবত্ব কি মিথ্যা সে একবারে?
সত্য যা স্বার্থ?
প্রেম স্নেহ ভক্তি কি নইলেও চলবে রে?
হায় রে লোভার্ত্ত!
রেড়-কড়া ধন নিয়ে আধ-কাঠা ঠাঁই নিয়ে
চল্‌বে কি দ্বন্দ্ব?
ভুলবি কি সত্যেরে? সুন্দরে মঙ্গলে
দলবি কি অন্ধ!'"

ক্রমে ষট্‌পর্ব্বিকা আকাশে মিলিয়ে গেল। নীরবে ছন্দময়ী আমায় সঙ্গে ক'রে আরো ঊর্দ্ধে উঠতে লাগলেন। খানিক পরে আমায় সম্বোধন করে বললেন—

"ত্তাখো, ত্তাখো, হাজার হাজার গ্রহ নক্ষত্র, শূন্যমার্গে বিচিত্র ছন্দ রচনা করে চলেছে, ওদের—

'না হয় ভূষণের ধ্বনি, নাহি নড়ে চীর।
দ্রুতগতি চরণে না বাজে মঞ্জীর॥'

কোথাও একটু তালভঙ্গ হচ্ছে না; যদি হ'ত তবে অতলে তলিয়ে যেত। সূর্য্য চলেছেন সাত ঘোড়ার রথ হাঁকিয়ে, তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার বিরাট ছন্দ রচনা করতে করতে। ছন্দশাস্ত্রের শতাবধি মাত্রার উৎকৃতি, অভিকৃতি, সঙ্কৃতি প্রভৃতি ছন্দ, এঁর এই বিরাটরূপা সরস্বতীর কাছে চুটকি অঙ্গের ছন্দ মাত্র। চন্দ্র চলেছেন তারার ফুলে সাতাশ-মাত্রার দিব্য-স্রগ্ধরা রচনা করতে করতে, ওঁর মাতানো ছন্দে সপ্তসিন্ধু মাতাল হয়ে উঠল। সিন্ধুর এই চঞ্চলতার ভিতরেও একটি ছন্দ জন্মগ্রহণ করেছে তার নাম জোয়ার ভাঁটা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছন্দে বাঁধা। যাঁরা এই ছন্দের স্পন্দন নিখিলের অণু-পরমাণুতে পর্য্যস্ত প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরাই বিশ্বস্রষ্টাকে নাম দিয়েছেন—'কবির্মনীষী' উদয়াস্তে ছন্দ, আলোয়-অন্ধকারে ছন্দ, জীবনে-মৃত্যুতে ছন্দের স্পন্দন।"—বলতে বলতে ছন্দময়ীর মূর্ত্তি বিদ্যুৎ-শিখার মতন হয়ে উঠল।

গগন-গরুড় তাঁর সারথ্যে আরো ঊর্দ্ধে উঠছিল কিন্তু লঘু বাতাসে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে দেখে দেবী গতি ফেরালেন।

নেবে আসবার সময় বেগাতিশয্যে আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হচ্ছিল, তাই, জোর করে নিজেকে চাঙ্গা রাখবার চেষ্টায় চট্ করে চটকা ভেঙে গেল, এবং চেয়ে দেখলুম নিজের ঘরে নিজের শয্যাতেই পড়ে আছি।

—পঞ্চম প্রকাশ—

[মঞ্জুশ্রী-মূর্ত্তি—বিদ্যুৎতাঞ্জাম বাহন—
বুল্‌বুল্-গুল্‌জার পদ্ধতি।]

শীতকালের হতশ্রী বাদ্‌লায় সমস্তটা দিন ঘরে বসে-বসে বিরক্ত বোধ হ'চ্ছে, অথচ বের'বার জো নেই। লিখ্‌তে পড়্‌তেও মন বস্‌ছে না, গল্পগুজবের সঙ্গীও কেউ জোটেনি, কাজেই গলির দিকের জান্‌লার কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে গলির ওপারে অপোগণ্ড ঋষিদের প্রাকৃত বেদগান শুন্‌তে লাগ্‌লুম—

"আয় রোদ্দুর হেনে
ছাগল দেব মেনে।"

কিন্তু ছাগলের লোভেও যখন রোদ্দুর তাদের কথায় কর্ণপাত করলে না এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল তখন তারা একটুও না দ'মে বেশ সপ্রতিভ ভাবে সুর ধরলে—

"ধিন্‌তা ধিনা, পাকা নোনা
ডাল ভাতে ভাত চড়িয়ে দেনা।"

আমি বালাপোষটা পায়ের উপর বেশ ক'রে ঢাকা দিয়ে চোখ বুজ্‌লুম। মাথার ভিতর তখন ঘুরছে ঐ "ধিন্‌তা ধিনা পাকা নোনা।" হঠাৎ আপন মনে বলে উঠ্‌লুম—"বাঃ এ যে চারের ঘরানা ছন্দ, কিন্তু চারে থই পাচ্ছেনা। পাকা নোনা হাল্কা হ'য়ে পড়ছে ব'লে ছেলেগুলো আপ্‌না হতেই 'পাকা-া নোনা' ক'রে খুব খানিকটা ঝোঁক দিয়ে টেনে উচ্চারণ করছে।"

আমারি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঠিক এই সময়ে কে বলে উঠল—

"জৈম ন সহই কণঅ-তুলা
তিল-তুলিঅঁ অদ্ধ-অদ্ধেন।
তেম ন সহই সবন-তুলা
অবছন্দ ছন্দ-ভঙ্গেন॥"

আমি বল্লুম "অর্থাৎ?" আগন্তুক বল্লে—

"'সয়না সোনার নিক্তি যেমন
ওজন-ফারাক্ আধ্-রতির,
তেম্‌নি সূক্ষ্ম কানের নিরিখ
একটু খুঁতেই হয় অথির।'

"তুমি যাকে চারের ঘরানা—চারালী বা লাচারী—বল্‌ছ, তাকে পাঁচের ঘরানা বা পাঁচালীও বল্‌তে পার।"

জিজ্ঞাসা কল্লুম—"সে কি রকম?"

আগন্তুক বল্লেন—

"'লঘুর্ভবেদ্ একমাত্রো...ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্' —কাজেই 'ডাল্ ভাতে ভাত' পাঁচ দাঁড়াচ্ছে; 'ধিন্‌তা ধিনা' সাড়ে চার; 'পাকা নোনা' চার, তাকে ঝোঁক দিয়ে পাঁচের কাছাকাছি টেনে আন্‌তে হ'চ্ছে। কাজেই পাঁচের ঘরানা বা পাঁচালিও বল্‌তে পার।"

আমি বল্লুম—"এ নিয়ম খাটালে 'আয় রোদ্দুর হেনে'র কি দশা হবে?"

আগন্তুক বল্লেন—"কেন? 'আয় রোদ্দুর' সাড়ে-চার মাত্রা, কারণ ওতে রয়েছে পুরো তিন আর খুরো তিন। পাঁচালি ছন্দে প্রতি পংক্তি-পর্ব্বে ন্যূন পক্ষে সাড়ে-চার মাত্রা রাখা দরকার, তার কম হ'লেই টেনে বুন্‌তে হয়। অথচ পাঁচটা গোটা অক্ষর দিয়ে পর্ব্ব গড়্‌লে শ্রুতিকটু হবে। কাজেই চারটে গোটা, এবং একটা কি দুটো আধলা দিয়ে গড়াই যুক্তিসঙ্গত।"

আমি বল্লুম—"তার মানে, আপনি

বল্‌তে চান, যে, এর প্রতি-পংক্তিপর্ব্বটিই পক্ষীরাজ, তার চারটে পা আর দুটো ডানা।”

আগন্তুক বল্লেন,—“উপমাটা বেশী দূর চালালে কিন্তু চল্‌বে না, কারণ—

'আয় রৌদ্দুর হেনে'

কিম্বা 'আয় আয় সই জল্ আনিগে
জল আনিগে চল্।'

অথবা 'এক পয়সায় কিনেছে সে
তাল পাতার এক বাঁশী।'

এদের প্রত্যেকটির প্রথম পংক্তি-পর্ব্বে তিন ঠ্যাং এবং তিন ডানা। এদের বেলায় কি বলবে? তা ছাড়া অনেক সূক্ষ্ম হিসেব এর ভিতর রয়েছে, যেমন—নাওয়া, খাওয়া, চাওয়া, পাওয়া প্রভৃতির 'ওয়া' দুই না ধরে এক ধরতে হয়, কারণ, ওটা অন্ত্যস্থ 'ব'য়ের সামিল; তারপর বাজিয়ে সাজিয়ে প্রভৃতির 'ইয়ে' পংক্তি-পর্ব্বের পূর্ব্বার্দ্ধে থাকলে এক এবং শেষার্দ্ধে থাকলে দুই হবে, যেমন—'বাজিয়ে যাব মল।' কিন্তু ঐটে উল্টে 'যাব বাজিয়ে মল' লিখলে ছন্দ হ'বে না। কারণ 'ইয়ে' এখানে দুমাত্রা। শুধু তাই নয়, পংক্তি-পর্ব্বের কোনো জায়গাতেই একটা পূরোর ব্যবধানে দুটো খুরো ব্যবহার করতে পারনা, করলেই শ্রুতিকটু হ'বে। 'নূপুর বাজে সোনার পায়ে' বা 'বাজল নূপুর সোনার পায়ে' দুইই শ্রুতিমধুর; কিন্তু 'মঞ্জীর বাজে সোনার পায়ে' বা 'বাজল মঞ্জীর সোনার পায়ে' শ্রুতিকটু। তোমার পক্ষীরাজের ডানা-দুটো সাম্‌নের দুপায়ে জুড়লেও চলবেনা, পিছনের দুপায়ে জুড়লেও মুস্কিল। অনেক ভজকট। তার চেয়ে এক কাজ কর:—এমন ছন্দ তৈরি কর যার প্রত্যেক হসন্ত এবং স্বরান্ত-অক্ষর হিসাবে পাওয়া যায়। সংস্কৃতে যেমন হ্রস্ব-দীর্ঘের পর্য্যায়-বিন্যাসে নতুন নতুন ছন্দ তৈরী হয়েছে, বাংলায় তেম্‌নি স্বরান্ত এবং হসন্ত, পা এবং পাখনার পর্য্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে নতুন ছন্দপদ্ধতির প্রবর্ত্তন কর। এতে ক'রে আদ্যা-পদ্ধতির বৈমাত্র-বিড়ম্বনা ঘুচবে, হৃদ্যা-পদ্ধতির যুক্ত-পূর্ব্ব হসন্ত-হরফের স্বরলোলুপতার অবসান হবে। চিত্রা-পদ্ধতির পা ও পাখনার গোল মিট্‌বে; দৃপ্তা-পদ্ধতির হল-স্বরের —দামাল-আলা-ভোলার—হঠাৎ-সমাগমে, সংঘাতের স্থলে সাযুজ্য-বিভ্রাটের অন্ত হ'বে। আমি স্বয়ং পিঙ্গল নাগ তোমাকে মঞ্জু-পদ্ধতির মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি, কাজ আরম্ভ কর, বিলম্ব কোরো না।”

হঠাৎ বিদ্যুৎ-শিখার মতন ছন্দকারের ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে আবির্ভূত হ'য়ে ছন্দময়ী বলে উঠলেন—

“ঠিক বলেছে পিঙ্গল, তুমি আমার বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম তৈরী ক'রে দাও; স্থির বিদ্যুতের মণিপট্টে চপলা-বিলাস গেঁথে গেঁথে আমার ফুল্‌দার চৌদোল্ নির্ম্মাণ কর।”

আমি বল্লুম—“ক্ষমা করুন।”

ছন্দময়ী বল্লেন—“কেন?”

আমি বল্লুম—“প্রমিথ্যাম্যুপহাস্যতাম্।”

দেবী বল্লেন—“আমার হুকুম, কোনো ভয় নেই।”

আমি বল্লুম—“যুক্তাক্ষর আর ঐকার ঔকার প্রভৃতির কি ওজন ধরা যাবে? দুই ধরব কি?”

দেবী বল্লেন—“না, দেড় ধর; যুক্তাক্ষরের

প্রথমাংশ আধ, শেষাংশ এক, দুয়ে মিলিয়ে দেড়। ঐকার ঔকারের প্রথমার্দ্ধ এক, শেষার্দ্ধ আধ, দুয়ে জড়িয়ে ঐ দেড়ই দাঁড়াবে। কাজেই পুঁজি দাঁড়াচ্ছে পুরো আর আধলা, গোটা আর ভাংটা। এই দুয়ের পর্য্যায়-বিন্যাসের সাহায্যে নতুন ছন্দস্পন্দের বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম নির্ম্মাণ কর; কলম ধর।"

আমি স্বপ্নাবিষ্টের মতন কলম হাতে নিলুম; কলম চলতে লাগল—

"তুল্ তুল্ টুক্ টুক্।
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্!
কোন্ ফুল্ তার্ তুল্
তার তুল কোন ফুল?
টুক্ টুক্ রঙ্গন
কিংশুক ফুল্ল
নয় তার দুই পা'র
আল্‌তার মূল্য।"

দেবী বল্লেন—"হিন্দুস্থানী আলঙ্কারিকেরা একে কি বলবেন জান? শূদ্রজাতি ছন্দ। কারণ এ ব্যঞ্জনবহুল; স্বরবহুল ছন্দ তাঁদের মতে ব্রাহ্মণজাতি। এঁরা ছন্দেরও জাতিভেদ কল্পনা করেছেন। এইবার ব্রাহ্মণ-জাতি ছন্দ রচনা কর দেখি—আগাগোড়া স্বরান্ত।"

কলম আবার চল্‌তে সুরু হ'ল—

"ঘুমেরি মহলে বেশরে মোতিটি
নিশ্বাসে নড়ে!
প্রেমী জেগে আছে মুখে চেয়ে, চোখে
পাতা না পড়ে!
মেঘে-গড়া ঘসা কাঁচেরি কানুসে
চাঁদেরি আলো;
তাতে কাঁচা সোনা মু'খানি নয়নে
লাগে যে ভালো।
মেঘে মেঘে ঢাকা আকাশেতে রাকা
চাঁদেরি বিভা,
মাঠো মাঠো আলো চুএে চুএে মাঠে
পড়ে বুঝি বা!
আলোতে কালোতে মলয়জে যেন
মিলেছে চুয়া,
পহেলি ফাগুনে কে ধরেছে মরি
শাঙনী ধুঁয়া।
জোছনা আঁধারে মুখোমুখি করে
রয়েছে বসে,
ধারা সে ঝরেনা, আলো ফুটিবারে
নারে সাহসে।
হাওয়া থেমে আছে, থেমে আছে যেন
তটিনীটিও,
অচেনা কি পাখী জেগে উঠে বলে
"কি ও! ও কি ও!"
বেণুবনে ঝোপে ঝাপে যত ঝিঁঝি
ডাকে ঝিমিয়ে,
জোনকীরা একে একে নিবে গেল
টিম্‌টিমিয়ে।
বেপথু হৃদয়ে ঘুমোনো অধরে
চুমুটি নিতে,—
অচেনা পাখীটা ডেকে ওঠে "কিও!
ওকি ও!" গীতে
ঘুমেরি নিছুনি নিতে দেরে পাখী,
উঠনা ডেকে,
স্বপনে সোহাগে মিশে যেতে দেরে
স্মৃতি না রেখে"।

ছন্দময়ী বল্লেন—"তোমার ব্রাহ্মণজাতি ছন্দ একেবারে সারস্বত ব্রাহ্মণ দেখছি।"

আমি বল্লুম—"উঁহু, ভঙ্গ-কুলীন। এক-বার একজায়গায় হসন্ত ব্যাভার হয়েছে।"

দেবীর সহাস্ত ইঙ্গিতে আবার কলম চল্ল—

"তাজা তাজা আজি ফুল ফোটায়
এই আলোয় এই হাওয়ায়,
কচি কিশলয়ে কুঞ্জ ছায়
সব তরুণ আজ ধরায়!
তরুণী আশারে সঙ্গী কর
আজ আবার মনরে মন,
চির-নূতনেরি যেই নির্ঝর
ব্যক্ত আজ সেই গোপন।"

দেবী বল্লেন—"একে ব্রহ্মমূর্দ্ধা ছন্দ ~~বলতে পারি।~~ কারণ এর প্রতি চরণের প্রথমাংশ স্বরবহুল। আচ্ছা অন্য ছন্দের প্রবর্তন কর।"

কলম চল্ল—

"পান বিনা ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা
রূপশালি ধান ভানা
রূপ দেখ তোমরা।"

ছন্দময়ী বল্লেন—"এটির নাম রইল 'পিউকাঁহা' ছন্দ। তারপর?"

কলম চল্ল—

"হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে,
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল?
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল! রাত্রি এল!"

দেবী বল্লেন—"পংক্তি-পর্ব্বের মাঝখানে অক্ষরের ওলটপালট দেখছি। এ মধ্যচপলা 'মিশ্র-পর্ব্বিকা।' আচ্ছা, এইবার একটি অন্তচপলা 'মিশ্র-পর্ব্বিকা' রচনা কর।"

কলম চল্ল:—

"জাগ্‌ছে আলো জাগ্‌ছে হৃদয়,
জাগ্‌ছে ভাষা জাগ্‌ছে আশা,
বন্ধ ঘরের ঘুল্‌ঘুলিতে
বুল্‌বুলি সব বাঁধছে বাসা।"

দেবী বল্লেন—"তারপর?"

কলম চল্ল—

"দুঃগ্রহ কুদৃষ্টি হানে—
দুঃখ দেহে, দুঃখ মনে,
তাই বলে কি হস্ত জুড়ে
বসবে গ্রহ-স্বস্ত্যয়নে।"

দেবী বল্লেন—"এটির নাম রইল 'পাগলা ভোলা' ছন্দ। তারপর?"

কলম একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে আবার চল্‌তে সুরু করলে—

"নিশাসে কি সৌরভ
কালো চুলে মেঘ সব
পশ্‌লায় পশ্‌লায় রূপ ধর গো!
কালো চোখে বিদ্যুৎ
কোনোখানে নেই খুঁৎ
অদ্ভুত! অদ্ভুত! তুই স্বর্গ!"

ছন্দময়ী বল্লেন—"আরও চলুক।"

কলম ভঙ্গীভরে চল্‌ল—

—"অ! বটে এই বুঝি! দেখলুম দেখলুম।"
—"ছি! ওকি রাগ করে' তুই ভাই যাচ্চিস্?"
—"তা তুমি বলবে না, থাকবার দরকার?"
—"হুঁ; বলি আয় কাছে 'ফুস্‌ফুস্ ফিস্‌ফিস্'!"
—"এ—কিএ? ছাই কথা, ফুস্‌ফুস্ ফিস্‌ফিস্!"

ধাঁ করে ভেংচিয়ে কম্‌লীর প্রস্থান।
হাঁ ক'রে রয় চেয়ে ফট্‌কের দুই চোখ,
গোঁ হয়ে ভাবছে কি?—গম্ভীর মুখখান!"

ছন্দময়ী ঈষৎ হেসে বল্লেন—

"বা কবি, বেশ তুমি, বাংলায় দীর্ঘের
তা' বুঝি বাংলাদে ছল পেয়ে আজ ফের!'
তারপর?—"

কলম আবার গোঁভরে দাগ পাড়তে লাগল—

"হর-মুকুট! হর-মুকুট!
ভূ-স্বরগের সুমেরু-কূট!
গগনে প্রায় ভিড়ায়ে কায়
করিতে চায় তারকা লুট!
বিজুলি থির হয়ে নিবিড়
রয়েছে কার বেড়িয়া শির,
হীরাফটিক উজলি দিক
ঘিরেছে কার জটারি নীড়।"

একটু ভুরু-কুঁচকে দেবী বললেন —"হুঁ; তারপর?"

আবার কলমটা মাথা গুঁজে কাগজ আঁচড়াতে সুরু করলে—

"রুনুরুনু বাজে কার বাজে মঞ্জীর
কাঁপে তার সেতারের স্নায়ু আর শির;
মৃদু গুঞ্জরে কুঞ্জে কে উন্মন,—
সাথী কার ব্যথা-ভার-ভরা যৌবন!
ফোটে ফুল বকুলের, অশোকের থোপ
হরিয়াল্ লালে লাল্ কাগুয়ার ছোপ!
মুখে মুখ সারীশুক লেহা বিস্তর,
মধু-বায় বুলে, হায়, দোলে পিঞ্জর।
সারঙের তারে রয় যত কম্পন
তারি ঝঙ্কারে, হায়, কাঁপে কায় মন;
বাঁশরীর অশরীর বাহুডোর, হায়,
এ হৃদয়-কমলের কমলায় চায়।
গুঞ্জে বঁদ হয়ে কুঁদ হল রঞ্জন,
রুনুরুনু বাজে কার করে কঙ্কন!
ফেলে' বাস ভরা শ্বাস চুয়াচন্দন,
কাঁহা পিউ কাঁহা পিউ ওঠে ক্রন্দন।"

দেবী প্রসন্ন মুখে বল্‌লেন—"এটির নাম রইল 'রুনুঝুনু' ছন্দ। ঠিক হয়েছে; আমার বিদ্যুৎ-তাঞ্জামের চাল, চাঁদোয়া, চুড়ো, ঝালর, পাটা, চৌপায়া সব তৈরী। এইবার এঁর একটা পা-দান তৈরী করে দাও।"

ক্লান্ত কলম আবার নক্সার কাজে প্রবৃত্ত হল—

"একটুকু উস্‌খুস্,
একটা কি ফিস্‌ফাস্
কার মৃদু নিশ্বাস
কার নিদ্ টুটল
ভেদ করে আবলুস্
ঘুটঘুটে রাত্রির
শান-দেওয়া সাত তীর
নিঃসাড় ছুটল!
হিম হাওয়া বিলকুল
ঢুলছিল নিউরে
উঠল সে শিউরে
ঝিউলীর স্পর্শে;
বোল বলে বুল্‌বুল্
আর পাখী তায় শিস্
চনমনে চৌদিশ
চঞ্চল হর্ষে।"

ছন্দময়ী সানন্দে বলে উঠ্‌লেন—"হয়েছে, হয়েছে, এইবার অক্ষর-সঙ্গীতের সূক্ষ্মতর শ্রুতিগুলি পর্য্যন্ত ধরা পড়েছে, ছন্দের সঙ্গীত মঞ্জুশ্রী লাভ করেছে। আমার মনের মতন এই বুলবুল্-গুলজার-পদ্ধতি,—মনের মতন এই পুষ্পক রথ।"

আমি সাশ্রুনয়নে বল্লুম—"দেবী, তোমার বিদ্যুৎ-তাঞ্জাম নির্ম্মাণ করতে, বিদ্যুদ্দামকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধতে আমার দুই চোখ ঝল্‌সে গেছে। আমি আর তোমায়

ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিনে।"—বলতে বলতে দুই চোখ আবার কুলে কুলে ভরে উঠল। বার বার করে চোখ মুছে যখন চোখ মেলতে সক্ষম হলুম, তখন বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত-লোচনা ছন্দ-দেবতাকে স্বচ্ছন্দে বহন করে বিদ্যুৎ-অগ্রাম আমার নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে; আর গৌড়-বাংলার ভবিষ্যৎ-কবি-পরম্পরা এক-ঝাঁক শুভ্র সুন্দর বলাকার মতন সেই তাগ্রাম ঘিরে আনন্দে কাকলি করতে করতে পাখার ভরে উড়ে চলেছে।

ফাল্গুন ১৩২৪] শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

মমতার ক্ষুধা

(গল্প)

দয়াল কুণ্ডুর আড়তের মুহুরী নবীন নন্দী যখন এক হপ্তার মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমস্ত পরিজনকে একে একে মুখ-অগ্নি করিয়া বিদায় দিয়া আসিয়া একলা 'ঝাড়া-হাত্‌পা হইয়া সংসারে দাঁড়াইল তখন তার অতিবড় শত্রুও তার দশা দেখিয়া আহা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তার যে কতবড় দুর্দ্দিন আর কতখানি দুঃখ তাহা এক ভগবান ছাড়া আর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল দয়াল কুণ্ডুর মা-বাপ-মরা বিধবা ভাইঝি লক্ষ্মী।

নবীন নন্দীর বয়স হইয়াছে বছর চল্লিশ বড় জোর; কিন্তু তার নাম নবীন হইলেও এই বয়সেই তার চেহারাটা বিষম প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিল,—তার মাথার সব চুলই প্রায় বার্দ্ধক্যের জয়ধ্বজা হইয়া উঠিয়াছে, তার পোড়া কপালে দারিদ্র্য আর শোক নিজেদের দখল সাব্যস্ত করিয়া কায়েমি বসবাসের জন্য ভদ্রাসনের ভিত কাটিতেছিল, তারই ছায়া তার চোখের কোলে পড়িয়া তার বয়সকে চেহারায় অনেক-খানি বেশী করিয়া তুলিয়াছিল। তবু লোকে তাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল "তোমার বয়েসই বা কি? শিগ্‌গির আবার একটি বিয়ে করে সংসারী হও।"

নবীন তার হিতাকাঙ্ক্ষীদের হিতোপদেশ শুনিয়া না হাঁ না হুঁ কিছুই উচ্চবাচ্য করিল না, সে দুই হাতের মধ্যে মাথা ধরিয়া ম্লান মুখে উবু হইয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল। লোকে বলিল "একসঙ্গে যমের এতগুলো কোপ খেয়ে লোকটা কেমন জবুথবু হয়ে গেছে।"

তার আপনার বলিবার মতন শেষ লোকটির চিতা নিবাইয়া নবীন যখন শূন্য-বাড়ীর দাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছে তখন আইবড় মেয়েদের বাপেরা আসিয়া খুব দরদ দেখাইয়া নজির দেখাইল—মল্লপালের এমনি সর্ব্বনাশের পর সে একটি ডাগর মেয়ে ঘরে আনিয়া তবে বাড়ীতে টিকিতে পারিয়াছিল, নইলে শূন্য বাড়ী খা-খা

করিয়া তাকে যেন গিলিতে চাহিত; হরিষ-সরকারের খুড়ো নৌকোডুবি হইয়া ধনজন সব খোয়াইয়া পাগল হইয়া যাইবার জো হইয়াছিল, শেষে বুক বাঁধিল আমাদের মথুর মজুমদারের সুন্দর ডাগর মেয়েটির মুখ চাহিয়া।—কিন্তু তার উত্তরে নবীন একটিও কথা কহিল না।

যে লোক স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বড় গলা করিয়া বলে না, যে, আমি আর এ-জীবনে কথনো বিয়ে করিতে পারিব না বা বিয়ের কথা শুনিলে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়, তার কাছে মেয়ের বাপেদের আশাভরসা বড় অল্প। তাই একে একে সকলে সরিয়া পড়িল। টাট্‌কা শোক, দুদিন সয়ে যাক, তখন দেখা যাবে—বলিয়া সকলে ভবিষ্যতের আশায় উৎসুক হইয়া রহিল।

দয়াল কুণ্ডু যখন দেখিল নবীন কোনো দিন বা একবেলা একমুঠো রাঁধে, কোনো দিন বা উপোষেই থাকে, আড়তে আসিয়া চুপচাপ বসিয়া আপনার কাজটুকু সারিয়া বাসায় চলিয়া যায় আর স্ত্রী-পুত্রের শ্মশান শূন্য-ঘরের দাওয়ায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া গুমিয়া গুমিয়া পুড়িতে থাকে, তখন দয়াল কুণ্ডু দয়া করিয়া বলিল—ছাখো নবীন, তুমি একলার জন্যে আর বাসা ভাড়া দিয়ে হাত পুড়িয়ে কেন কষ্ট করবে, আমার বাড়ীতে এসেই থাকো।

নবীন মাথা নত করিয়া আস্তে বলিল—যে আজ্ঞে।

এতদিন যে চোখের জল দারুণ দুঃখেও পড়িবার অবকাশ পায় নাই তাহা দয়াল কুণ্ডুর সদয় কথায় বাহির হইবার পথ পাইল। নবীন চোখ মুছিয়া আস্তে-আস্তে চলিয়া গেল।

স্ত্রী আর পুত্রকন্যাদের এমন তাড়াতাড়ি পর পর বিদায় দিতে হইয়াছিল, এক-জনকে বিদায় দিবার সময় বিদায়োন্মুখ অপরদের তাগাদা তখন মনটাকে এমন বিব্রত করিয়া রাখিয়াছিল, যে, নবীন কাঁদিবারই অবকাশ পায় নাই। একলা হাতে ওলাউঠার রোগীদের সেবা করিয়াছে, ঔষধ পথ্য দিয়াছে, ডাক্তারের দর্শনী দক্ষিণা গণিয়াছে, আবার যে বিদায় লইয়াছে তার মুখ-অগ্নিও করিয়া আসিতে হইয়াছে। বেচারা বড় আশা করিয়াছিল যে সেও ত উহাদের পিছেপিছেই যাত্রা করিবে, একটু-মাত্র পথের আগে-পিছে বই ত নয়, তার জন্য সে কাঁদিতে যাইবেই বা কেন? তাড়াতাড়ি যাইবার আগ্রহে সে আপনাকে বিধিমতে যমের ছোঁয়াচের মধ্যেই রাখিয়া দিয়াছিল, কিন্তু যম সব-কটিকে সরাইয়া তাকে ছাড়িয়া দিয়া গেল, কিছুতেই ছুঁইল না পর্য্যন্ত। যখন নিরাবিল বাড়ীতে কাঁদিবার প্রচুর অবসর মিলিল, তখনও নবীনের কান্না আসিল না—ধনে আর জনে এই কদিনে তাড়াতাড়ি তার এমন খরচ হইয়া গিয়াছে, যে, শূন্য তহবিল মিলাইয়া দেখিতে তার আর সাহস হইতেছিল না। আজ সেই সর্ব্বস্বের শ্মশান শূন্য বাসাখানি ছাড়িয়া যাইবার সময় নবীনের সমস্ত অস্তিত্ব যেন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—সবাই গেল, শুধু সে আছে! এ যে তার কাছে দুঃখের চেয়ে লজ্জার কথাই

বেশী বলিয়া মনে হইতেছিল। সে চোখের জলে দাওয়ার ধূলা ভিজাইয়া আপনার সংসার ভাঙিয়া চাটিবাটী তুলিয়া বাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেল।

নবীন নন্দীর যে আজ কী দুঃখ তাহা লক্ষ্মী নিজের মন দিয়া বুঝিতেছিল। তারও যখন বাপের বাড়ীতে বাপ মা আর শ্বশুর-বাড়ীতে স্বামী মারা গেল, তখন তারও এমনি নিরাশ্রয় অবস্থা, তখন তারও কাছে সংসার এমনি ভীষণ শূন্য লাগিয়াছিল, মনে হইয়াছিল কোথাও বুঝি কিছু অবলম্বনের বা নির্ভরের বস্তু নাই—এ সংসার যেন অতল অথই অন্ধকার গহ্বর, তার মধ্যে সে যুগযুগান্তর ধরিয়া শুধু পড়িতেই থাকিবে, কোথাও থামিবে না। তার শ্বশুর শাশুড়ী ছিল না; দেওর আর ভাসুররা আর তার জায়েরা তার স্বামী থাকিতেই তার সঙ্গে যে-রকম সদয় ব্যবহার করিত তাতে বিধবা হইয়া তার এই দুর্ভাগ্যটাই বড় বলিয়া মনে হইল যে এখন ওদের দয়ার উপরে মাত্র তার নির্ভর; সে নির্ভর যে কূপের মুখে মাকড়সার জালের মতন পল্কা তা ত তার জানিতে বাকী ছিল না। বিধবা হওয়ার দুদিন পরেই তার বড় ভাসুর বলিল—'বৌমা, তোমাকে ত এখন যাবজ্জীবন আমাদেরই ভরণপোষণ করতে হবে—শিবুর ভাগে পৈতৃক বিষয়ের যে হিস্সা পড়ে তাতে তোমার এখন জীবন-উপস্বত্ব। কিন্তু তাতে ত আর তোমার খাওয়াপরার খরচ কুলোবে না—তাই বলছি কি, সেটা এখন বিক্রী করে কিছু থোক টাকা হাতে পেলে আমরা তোমার খরচ চালাতে পারি। নইলে দশজন ভদ্দর লোক ডেকে তোমার অংশ বুঝে পড়ে নিয়ে তুমি পৃথক হতে পারো।'

লক্ষ্মী একলা পৃথক হইবার ভয়েও চমকিয়া উঠিল, অথচ ভাসুরদের সংসারে থাকাটাও যে খুব প্রলোভনের তা মনে হইল না। তাই সে শুধু বলিল 'আমি কি জানি, যা ভালো হয় আপনাদেরই ত করতে হবে।'

এই উত্তর শোনার দুদিন পরেই লক্ষ্মীর অংশের বিষয় তার ভাসুর লেখাপড়া করিয়া কিনিয়া লইল আর সেই টাকা নিজের কাছেই আমানত রাখিল লক্ষ্মীর খোরপোষের জন্য খরচ হইবে। বড় ভাসুর টাকা রাখিল লক্ষ্মীর খরচের জন্য, কিন্তু তার জন্য বরাদ্দ হইল একবেলা আহার সকলের খাওয়া-দাওয়ার অবশিষ্ট যা যেদিন হাঁড়ির তলায় পড়িয়া থাকিত আর ভাসুরেরই ছাড়াছোড়া ছেঁড়াখোঁড়া এক-একখানা কাপড়। লক্ষ্মীর দস্তির মতন গতর বলিয়া জায়েদের কাছে লক্ষ্মীর সমাদরের অভাব ছিল না। যে জায়ের যখন ছেলে হয় তার আঁতুড়ের কর্ণা করিতে হয় লক্ষ্মীকে; কারো অসুখ হইলে লক্ষ্মীকেই ডাক পড়ে, আপনার জন আপনার জনের সময়ে অসময়ে না করিলে করিবে কে? রান্না করা সে ত ঘরের লক্ষ্মীরই কাজ। কোনো ছেলে কাঁদিলে লক্ষ্মীকেই সামলাইতে হয়, নয়ত তার আক্কেল দেখিয়া জায়েরা অবাক হইয়া ভয়ানক গরম হইয়া উঠে; ছেলেরা কোনো জিনিস অপচয় করিলে বা ভাঙিলে ছিঁড়িলে দোষ

পড়ে লক্ষ্মীরই উপর,- সে কি শুধু বসিয়া বসিয়া বাড়ীর অন্ন ধ্বংস করিবে, একটা কোনো কাজে লাগিবে না, ইহা ভাবিয়া তার জায়েরা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। জায়েদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু লক্ষ্মীকে সৎ উপদেশ দিবার বেলা তাদের একমত ও একজোট হওয়া একতার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া নীতিপুস্তকে স্থান পাইতে পারে। ভাসুর-দেওরেরা সংসারের কোনো কাজেই যাদের দশ হাত কাপড়ে কাছা নাই এমন একাট্য প্রমাণে সাব্যস্ত নির্বুদ্ধি জীবদের কোনো পরামর্শই গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্বন্ধে তাদের মতামত শুনিয়া কাজ করিতে এদের আপত্তি একবারও দেখা যাইত না। বিকালের জলখাবার পাইতে দেরী হইলে যখন "বাড়ীর ভিতরের ওঁরা" নামক অবাচ্য সম্পর্কের লোকেরা জানাইত যে লক্ষ্মীর বাবুয়ানি তার জন্য দায়ী, তখন পুরুষদের বিশেষ লক্ষণ রাগটা এমন প্রচণ্ড হইয়া উঠিত যে লক্ষ্মীর কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত লওয়া তারা আবশ্যক মনে করিত না, হাতা খুন্তি বেলন যাহা হাতের মাথায় পাইত তাই দিয়াই লক্ষ্মীর অঙ্গসেবা করিয়া নিজেদের ক্ষুধার জ্বালাটা লক্ষ্মীর উপর ঝাড়িয়া অনেকটা আরাম বোধ করিত। ভাসুর-দেওরদের এইরকম ন্যায্য আচরণে লক্ষ্মীর যদি চোখ দিয়া দু চার ফোঁটা জল পড়িত তা হইলে দোষ করিয়া আবার কান্না দেখিয়া বাড়ীর সকলেরই অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত আর এ বাড়ীতে না পোষায় নিজের রাস্তা দেখিবার জন্য লক্ষ্মীকে নোটিশ দেওয়া হইত। এমনি সুখে থাকিয়াও লক্ষ্মীর যখন স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, হস্তির মতন খাটিবার শক্তি আর রহিল না, তখন সেই গতরখাকীকে বসিয়া বসিয়া খাইতে দেখিয়া বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সকলেই একবাক্যে তাকে আপনার পথ দেখিতে বলিল—বসিয়া খাওয়াইতে পারে এমন সঙ্গতি তাদের নাই আর, তার উপর আবার রোগের কর্ণা করে কে, তাদের বলে নিজেদেরই কে দেখে তার ঠিক নাই তা আবার পরের সেবা।

লক্ষ্মী বলিল—'আমার ত আপনার বলতে তিন কুলে কেউ নেই, আমায় হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দাও।'

আমনি বড় জা ফোঁস করিয়া উঠিলেন—'আ মর মুখপুড়ী! আবার ঘুরিয়ে গাল দেওয়া! তিন কুলে কেউ নেই কি না? তোর ভাসুর দেওর সব নির্ব্বংশ হয়ে মোলে তুই বাঁচিস?'

লক্ষ্মীর ভাসুর-দেওরেরা শুনিয়া বলিল—'ঘরের বৌকে হাঁসপাতালে দিতে বুঝির মানে লোকের কাছে আমাদের অপদস্থ অপমানিত করা, দশের কাছে মুখ হেঁট করে দেবার মতলব!'

লক্ষ্মী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তবে আমি কোথায় যাবো?'

ভাসুরেরা বলিল—'কেন, জেঠার কাছে।'

লক্ষ্মীর জেঠা দয়ালকুণ্ডু তার বাপের জেঠতুতো ভাই। সে ব্যবসা ফাঁদিয়া দুপয়সা ঘরে আনিতে আরম্ভ করিলে লক্ষ্মীর জেঠিমা দেওরকে বসিয়া বসিয়া অন্ন ধ্বংস করিতে

দেখিয়া ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল; লক্ষ্মীর বাবা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে অকালে মারা গিয়াছে, তার মাও স্বামীর পিছে-পিছে গিয়াছে, তবু ত জেঠামশায় জেঠিমার নজর কোনো দিন তাদের উপর পড়ে নাই; তার পর তার এই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তারা ত শুনিয়াও একবার আহা বলিয়া একদিনও তার খোঁজ লয় নাই; এখন সে কিসের দাবীতে সেই জেঠামশায়-জেঠিমার কাছে যাইবে।

লক্ষ্মী বলিল—'যে জেঠা একদিনের তরে খোঁজ করে না তার কাছে কোন্ মুখে যাবো?'

জায়েরা বলিল—'যার ভাতের থিত নেই তার আবার অভিমান!'

ভাসুর বলিল—'ওর জবানী আমরা চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

লক্ষ্মীর জেঠামশায় লক্ষ্মীর চিঠি পাইল, সে কাঁদাকাটা করিয়া চিঠি লিখিয়াছে একবার জেঠামশায় যদি তাকে লইয়া যান ত দিনকতক সে জেঠিমার কোলে জুড়াইয়া আসে।

দয়াল কুণ্ডু গিন্নির মুখের দিকে চাহিল; গিন্নি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—'আনিয়ে নাও। একজন রাঁধুনি রাখবো ভাবছিলাম, তা পরকে কেন মাস মাস নগদ টাকা গুনি, আপনার জন ভাতকাপড় পেলেই বর্ত্তে যাবে।'

লক্ষ্মীর জেঠামশায় তাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া তার হাতে লক্ষ্মীকে চিঠি পাঠাইল—লক্ষ্মীর যে এমন সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তা তারা জানিত না, জানিলে কি.....ইত্যাদি।

লক্ষ্মী চোখের জলে ভাসুর আর জায়েদের পায়ের ধুলা ধুইয়া দিয়া বিদায় লইল।—স্বামী মারা যাওয়া অবধি এবাড়ীতে তার সুখ ছিল না, তবু এই সুখের শ্মশান ছাড়িয়া যাইতেও তার বুক ভাঙিয়া যাইতেছিল, আশৈশব সে ত এই বাড়ীকেই আপনার বাড়ী বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছিল।

জেঠামশায়ের বাড়ীতে গিয়া নামিতেই লক্ষ্মীর দশা দেখিয়া জেঠিমা আঁৎকাইয়া উঠিল—'আ মরণ! ঘাটের মড়া একেবারে! এ কি হাঁসপাতাল, না গঙ্গাতীর, যে এখানে মরতে এলি!' প্রথম পদার্পণেই অভ্যর্থনার নমুনা পাইয়া লক্ষ্মীর বুক কাঁপিয়া উঠিল, চোখের জল দিয়াও সে তার জেঠিমার ক্রোধের আগুন নিবাইতে পারিল না। কিন্তু ঠাঁইনাড়া হইয়া আর মনের জোরে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ভালো হইয়া উঠিল, সে বুঝিয়াছিল যে, যে-গরিব পরের আশ্রিত তার শরীর খারাপ হইলে চলিবে না, যতদিন সে খাটিতে পারিবে ততদিন তার আদর না জুটুক ত অনাদর জুটিবে না। লক্ষ্মী এখন তার জেঠামশায়ের সংসারের ভাঁড়ারী, রাঁধুনী, গৃহিণীর প্রধান পরিচারিকা। সে ভোরে উঠিয়া রাত দুপুর পর্য্যন্ত অক্লান্ত খাটে; ম্লান বিষণ্ণ মুখে তার একটি রা নাই। একটু ত্রুটি হইলেই তার জেঠিমা তাকে কোমল স্বরে অনুরোধ করে 'এসগে বাছা তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ী, আমার এখানে তোমার পোষাবে না।' সেই ভর্ৎসনায় লক্ষ্মীর চোখ-দুটি ছলছল করিয়া উঠিলেও, এতে তার বেশী কষ্ট হয় না,—সে শ্বশুরবাড়ীর চেয়ে এখানে

কত সুখে আছে, তার তুলনায় এ ত রাজার হাল। তার মিষ্ট স্বভাব, শান্ত প্রকৃতি আর ম্লান বিষণ্ণ নীরব মুখ দেখিয়া চাকরদাসী সবাই তাকে মনে মনে আহা করে, ভালোও বাসে। তাই সে জেঠিমার একএকটা মোলায়েম তিরস্কার মনে মাখে না। ছেলেবেলা থেকে দুঃখের আঘাত সহিয়া সহিয়া তার মনটি এমন কোমল করুণ রোদনোন্মুখ অথচ নিরভিমান হইয়া উঠিয়াছিল যে একটু আঘাত সেখানে বড় বেশী হইয়া বাজিলেও তাকে সে আমল দিত না। সেই কারণে পরের দুঃখও তার মনে বড় সহজেই আসিয়া লাগিত; কোনো দাসীচাকরকে তাদের মনিবেরা তিরস্কার করিলে লক্ষ্মীর চোখ ছলছল করে, তার জেঠামশায় কোনো চাকরকে মারিলে বা ছাড়াইয়া দিলে সেদিন আর লক্ষ্মীর মুখে জলটুকুও রোচে না। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া নবীন-নন্দী যেদিন দয়াল-কুণ্ডুর আশ্রয়ে আসিল, সেদিন লক্ষ্মী লুকাইয়া লুকাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, সেদিনটা ঠায় উপবাসেই তার কাটিল।

নবীন নন্দী অসহ্য শোকের ঘায়ে কেমন জবুথবু হইয়া গিয়াছিল। সে সমস্ত-দিন শুধু দয়ালবাবুর গোলার দপ্তরখানায় বসিয়া খেরুয়া-বাঁধা বড় বড় রোকড়ের খাতায় হিসাবই লিখিত, নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণার হিসাব বড় একটা রাখিত না। অবসর পাইলে পাছে নিজের জীবনের লাভক্ষতি খতাইয়া দেখিতে মন হয় এই ভয়ে যে বেচারা রাতদিন বাবুর লাভক্ষতির খতিয়ান করিতেই মোতায়েন থাকিত।

নবীন নন্দী দুপুর বেলা খেরুয়া-বাঁধা পাকা খতার উপর একমনে জাব্দা খাতা হইতে জমাখরচ নকল করিতেছিল। বাবুর বাড়ীর চাকর আসিয়া খবর দিল—নন্দীমশায়, ভাত দেওয়া হয়েছে।

নন্দীমশায় খাতা হইতে মুখ না তুলিয়া লেখার পরে সোজা সোজা মুখ-বাঁকা কষি টানিতে টানিতে বলিল—আমার খিদে নেই, আমি আজ আর খাবো না।

বেলা তিন প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে। চাকর আবার আসিয়া ডাকিল—নন্দীমশায়, খাবেন আসুন, আপনি না খেলে দিদিমণি খেতে পাচ্ছেন না।

নবীন কলমটা কানে গুঁজিয়া হাত নাড়িয়া বকিয়া উঠিল—এ ত ভারি জ্বালাতন! আমার খিদে না থাকলেও খেতে হবে! তোমাদের দিদিমণিকে খেতে বলগে। আমি না খেলে তাঁর খাওয়া হবে না, এর কি মানে আছে?

চাকর রাগ করিয়া ফিরিয়া গিয়া লক্ষ্মীকে জানাইল—ও বুড়ো পাকা হরতুকী খেয়েছে, দিদিমণি। সে আস্‌বে না, আপনি খান গিয়ে।

লক্ষ্মীর মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল—আ।! একটা প্রাণী বাড়ীতে অভুক্ত থাকিবে আর সে খাইয়া বসিয়া থাকিবে! তার পেটে ত এখনো এমন আগুন লাগে নাই। সে চাকরকে বলিল—"তুমি বুঝি ভালো করে নন্দীমশাইকে ডাকো নি, সাধু?"

সাধুচরণ ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—আবার কেমন করে ডাকৃতে হবে, পায়ে ধরে

সাধ্‌তে হবে নাকি? আপনি ওর ভাত ঢেকে ফেলে রেখে দিন, পেট জ্বললে আপ্‌নিই এসে খেতে বস্‌বে।

সাধুর কথাগুলি গিয়া লক্ষ্মীর মনে বিঁধিল। পরিঘরী আর পরভাতী লোকের এমনই হেনস্থা সহিয়া থাকিতে হয়। সেও ত নিজে পরঘরী আর পরভাতী, সে মর্ম্মে মর্ম্মে এই অনাদরের বেদনা অনুভব করিল। থাকিত যদি নবীন-নন্দীর স্ত্রী বা কন্যা, তারা কখনো এমন করিয়া তার ভাত ফেলিয়া রাখিয়া নিজেরা খাইতে বসিতে পারিত না। লক্ষ্মী আবার মিনতি করিয়া সাধুকে বলিল—"আর-একটিবার যাও সাধু।"

—না, দিদিমণি, আমি আর যেতে পার্‌বো না, এখনি বাবু ঘুম থেকে উঠ্‌বেন, তামাক দিতে হবে।—বলিয়া সাধু চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর যেখানে নবীনের ভাত ঢাকা ছিল সেখানে গিয়া মাটিতে হাতের ভর রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

যে ঘরে নবীন কাজ করিত সে ঘর-খানা বাবুর বাড়ীরই সামিল। বাড়ীর ভিতরদিক্‌কার একটা জানলার খড়্‌খড়ি-কপাটে ইস্ক্রুপ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া সেই ঘরখানাকে পৃথক্ করা হইয়াছিল, খড়্‌খড়ির পাখীগুলা পর্য্যন্ত ইস্ক্রুপ-আঁটা। সেই কপাটের নীচের দিক্‌কার দুইটা পাখী খসিয়া গিয়া সেখানটায় ফাঁক ছিল। লক্ষ্মী নবীন-নন্দীর ভাতের কাছে বসিয়া থাকিতে থাকিতে কি ভাবিয়া উঠিয়া গিয়া সেই দরজার কাছে দাঁড়াইল, চাবির-থোলো-বাঁধা আঁচলটা তুলিয়া কাঁধে ফেলিল। ঘরের ভিতরের অন্য গোমস্তারা ভাঙা খড়্‌খড়ির ফাঁক দিয়া লক্ষ্মীর পা দেখিতে পাইল, চাবির থোলোর ঝনাৎ শব্দ শুনিতে পাইল। কিন্তু নবীনের কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে খাতাই লিখিতেছে। সকলে লক্ষ্মীর আগমনে সসম্ভ্রমে ব্যস্ত হইয়া নবীনকে বলিল—নন্দীমশায়, দিদিমণি নিজে ডাক্‌তে এসেছেন, খেতে যান।

নবীন একবার সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল দুখানি কার পা তার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি "যাই যাই" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া লেখার উপর চোষ-কাগজ চাপিয়া উঠিয়া পড়িল।

তার পরদিনও দুপুর-বেলা সাধু আসিয়া ডাকিল—নন্দীমশায় খেতে আসুন।

"যাচ্ছি।"—বলিয়া নবীন একমনে খাতাই লিখিতে লাগিল, যে তারিখটার খরচের খতিয়ান সে করিতেছে তাহা মাঝখানে ছাড়িয়া গেলে ভুল হইয়া যাইতে পারে, ঐ তারিখটা শেষ করিয়া সে যাইবে।

কতক্ষণ সে বিলম্ব করিল তার ঠিক নাই, হঠাৎ চাবির থোলোর ঝনাৎ শব্দে চমকিয়া চাহিয়া সে ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল কালিকার মতন আজও কার দুখানি কোমল চরণতল দেখা যাইতেছে। নবীন অসমাপ্ত খতিয়ান ফেলিয়া ব্যস্ত হইয়া "যাই যাই" বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

পরদিন খাবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, একটা বাজে, তবু সাধু নবীনকে খাইতে ডাকিতে আসিল না। নবীন আম্‌দানীর খাতায় তিসি গম কলাই পাট জমা করিতেছে আর এক-একবার সাধুর প্রত্যাশায় দরজার দিকে, আর এক-একবার সেই দুখানি পায়ের প্রত্যাশায় ভাঙা খড়্‌খড়ির দিকে আড়ে আড়ে চাহিতেছে।

সাধু গিয়া লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিল—"নন্দীমশায়কে ডাক্‌তে যাবো দিদিমণি?"

লক্ষ্মী বলিল—"না, এখন থাক। হাতের কাজ ফেলে তিনি আস্‌তে পারেন না, সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাক, তখন ডাকলেই হবে।"

সকলকে খাইতে বসাইয়া লক্ষ্মী গিয়া সেই ভাঙা জান্‌লাটির কাছে দাঁড়াইল, আবার তার চাবি বাজিল। লক্ষ্মী বুঝিয়াছিল যে সে নিজে ডাকিতে গেলে নবীন আর বিলম্ব করিতে পারিবে না, লোক না পাঠাইয়া তার নিজে ডাকিতে যাওয়াই ভালো।

নবীন আজ প্রস্তুত হইয়াইছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল।

তারপর রোজই একটার ঘরের দিকে ঘড়ীর কাঁটাটা যত ঝোঁকে নবীনের মনটাও ততই চঞ্চল হইয়া সেই 'দুখানি' পায়ের আবির্ভাবকে আহ্বান করিতে থাকে; তার সমস্ত ইন্দ্রিয় চাবির সেই ঝম্‌ঝম্‌ শব্দটি ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। তখন তার মন মনকষা সুদকষার মধ্যে আর নিবিষ্ট হয় না, সে ঘনঘন ঘড়ীর দিকে আর ভাঙা খড়্‌খড়ির ফাঁকের দিকে চায়, আর ভাবে আজ বুঝি সে আর আসিল না। তারপর যেই সে আসে আর অমনি যেন নবীনের সর্ব্বাঙ্গ সাড়া দিয়া উঠে, সে তার উল্লাস আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। সেই সময়ে যদি কোনো দালাল কোনো মালের খবর জানাইতে আসে, নবীন অকারণে চটিয়া উঠিয়া বলে—'কি ভ্যানর ভ্যানর করো হে, দেখ্‌ছ আমি কাজ করছি। এখন ফুর্‌সৎ নেই। হয় একটু ঘুরে ঘণ্টা দুই পরে এসো, নয়ত কাল বারোটার আগে বা দুটোর পরে এসো, তখন তোমার কথা শুন্‌ব।' এক্‌টার কাছাকাছি সময়ে কোনো গোমস্তা তার কাছে কোনো কাজ লইয়া আসিলেও নবীন চটিয়া উঠে—'আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, কেবল কাজই করি, কি বলো?' সেই সময় যদি বাবু দপ্তরখানায় আসেন তবে নবীনের আর অস্বস্তির অন্ত থাকে না; সে উস্‌খুস্‌ করিতে থাকে, পাছে বাবু সেই দুর্লভ মুহূর্ত্তটিতে তাকে কিছু আদেশ করিতে আরম্ভ করিয়া আবদ্ধ করিয়া ফেলে এই ভয়ে সে ছট্‌ফট্‌ করিয়া একবার ঘরের বাহিরে যায়, একবার ঘরে আসে।

নবীনের মন সমস্ত স্নেহের আশ্রয়গুলিকে হঠাৎ একসঙ্গে হারাইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল; এই একটি কে অচেনা অদেখা মেয়ে এই সর্ব্বরিক্ত হতভাগা অচেনা পরের প্রতি মমতা দেখাইয়া নবীনের স্তম্ভিত মনকে চেতাইয়া তুলিল,—সে জগৎটাকে আবার সুন্দর দেখিতে লাগিল, জীবনটাতে সে আবার স্বাদ পাইল। নিঃস্ব

জনের কুড়াইয়া-পাওয়া সোনার কুচির মতন সে যে অকথিত স্নেহের এতটুকু পরিচয় প্রতিদিন পাইতেছিল, তাহা সে লোকের ভয়ে দেখাইতেও পারিত না পাছে লোকে তাকে চোর ভাবে, আবার মনের আঁচলে গেরো দিয়া রাখিয়াও ত তার ক্ষুধা মিটিত না—যে জিনিসটাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া ব্যবহারই না করিতে পারিলাম তার আবার মূল্য কি? মানুষ যা ভালোবাসে তার কথা যে বলিতে শুনিতে ভাবিতে সুখ। কিন্তু নিঃস্ব নবীনের জীবনে যদি লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটিল তবু তাহা লোককে জানাইতে সে পারিল না, পাছে লোকে জানিতে পারিলে তাকে এই অনধিকারের ঐশ্বর্য্য হারাইতে হয়। প্রথম-প্রথম লক্ষ্মীর পা-দুখানি দেখিতে পাইলেই নবীন 'যাচ্ছি' 'যাই' বলিয়া সাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইত; সে উঠিয়া দপ্তরখানার তক্তপোষ হইতে যতক্ষণ না নামিত ততক্ষণ লক্ষ্মী রুদ্ধ দরজার ওপারে দাঁড়াইয়া থাকিত। কিন্তু এখন লক্ষ্মীর আগমন দূর হইতেই নবীন টের পায়, এখন সে আর 'যাই' বলিয়া সাড়াও দ্যায় না, তাড়াতাড়িও করে না, গড়িমসি করিতে-করিতে আস্তে আস্তে চোরের মতন উঠিয়া চলিয়া যায়; লক্ষ্মীও আর এখন নবীনের সাড়া পাইবার আশায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে না, সে ভাঙা খড়খড়ির সামনে একটু দাঁড়াইয়া চাবির-থোলো-বাঁধা আঁচলটা পিঠে ফেলিয়া ফিরিয়া যায়,—সে জানিয়াছিল যে তার পোষমানা প্রাণীটি তার পিছনে পিছনে ঠিক আসিবে।

রোজই লক্ষ্মী নিজে নবীনকে ডাকিতে আসে, নবীনও তার আগমনের প্রতীক্ষায় একটা বাজিবার কাছাকাছি সময়ে বিশেষ-রকম উন্মনা ও ব্যগ্র হইয়া উঠে, অথচ লক্ষ্মী আসিলেই নবীন কেমন কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া গড়িমসি করিতে-করিতে উঠিয়া যায়;—ইহা সেই দপ্তরখানার লোকেদের দৃষ্টি এড়াইতেছিল না। তাদের মনের মধ্যে কৌতুক ও সন্দেহ নানারকম সম্ভব অসম্ভব আকারে তাদের পীড়ন করিতেছিল, কিন্তু বাবুর ভাইঝির সম্বন্ধে কোনো কথা কেউ মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিতেছিল না। প্রত্যেকে ভাবিতেছিল সে যা টের পাইয়াছে অপর সকলে তা টের পাইয়াছে কি না; সকলকে নিজের মনের সন্দেহ পরিবেষণ করিয়া দিবার আগ্রহ প্রত্যেকেরই হইতেছিল, কিন্তু কেউই সাহস করিতেছিল না। নবীন উঠিয়া গেলেই সকলে নিবিষ্টমনে খাতা লিখিতে লিখিতে আড়চোখে আড়চোখে একবার নবীনকে ও একবার সেই ঘরের অপর লোকদের মুখের দিকে চাহিয়া লইত; প্রত্যেকেরই জানিতে ইচ্ছা, যে-ব্যাপারটা আমি বুঝিতেছি তা অপরে বুঝিল কি না।

একদিন নবীন উঠিয়া যাইতেই একজন মুহুরী আড়চোখে চারিদিকে চাহিয়া খাতার উপর মাথা ঝুঁকাইয়া লিখিতে-লিখিতে বলিল—"এতক্ষণে নক্ষীমশায়ের একটা বাজ্‌ল।"

ঘর নিস্তব্ধ, সবাই একমনে খাতা লিখিতে ব্যস্ত, যেন কেহই মুহুরীর মন্তব্য

শুনে নাই বা বুঝে নাই। কেবল সেই মুহুরীর পাশের গোমস্তাটি তেমনিভাবে মাথা গুঁজিয়া আস্তে বলিল—"হুঁ!"

ঐ মুহুরীটি একবার যেই আগল ভাঙিয়া দিল, অমনি সাহস পাইয়া নবীননন্দীকে লইয়া আলোচনাটা মুহুরী-মহলে একটু-একটু করিয়া দিনকার-দিন বাড়িয়াই চলিতে লাগিল যেমন করিয়া জল পাইয়া বীজ হইতে অঙ্কুর অল্পে অল্পে গজাইয়া পাতা মেলিয়া গাছের আকার ধরিয়া উঠে। কোনোদিন লক্ষ্মী একটু আগে আসিলে কেউ বলিয়া উঠে—"নন্দীমশায়ের ঘড়ীতে আজ একটু সকাল-সকাল একটা বাজ্‌ল!" একটা বাজিয়া গেলেও লক্ষ্মী যদি না আসে তবে হয়ত কেহ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করে—"নন্দীমশায়, একটা কি আজ আর বাজ্‌বে না?"

নবীন সেইসব ছেলেছোক্‌রার ধৃষ্টতা দেখিয়া মনে মনে চটিলেও কখনো রাগ প্রকাশ করিত না, এবং তারা যে কি ইঙ্গিত করিতেছে তার দিক দিয়াও না গিয়া ঘড়ীর দিকে দেখিয়া সে সহজ স্বরেই বলিত—'কৈ, একটা ত এখনো বাজেনি!' অথবা 'না, একটা ত অনেকক্ষণ বেজে গেছে; প্রায় দুটো বাজে আর কি!'

একদিন প্রায় দুটো বাজে-বাজে, তখনো লক্ষ্মী নবীনকে নীরব আহ্বান করিতে আসিল না। নবীন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ঘনঘন ভাঙা খড়্‌খড়ির ফাঁকের দিকে আড়ে আড়ে তাকাইতেছে। এমন সময় সাধু খানসামা আসিয়া ডাকিল—"নন্দীমশায় খেতে আসুন।"

নবীন একবার চম্‌কিয়া উঠিয়া অবাক হইয়া সাধুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল—এ আজ আবার কি নূতন কাণ্ড। সাধুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ত বহুদিন হইল চুকিয়া গিয়াছিল। তার বিরস জীবনের এক মুহূর্ত্তের এতটুকু সুখ-কণিকাকে গ্রাস করিবার জন্ত এ কোন্ রাহুর আবার উদয় হইল? [illegible] নাম ত সাধু, কিন্তু এমন অসাধু আচরণ সে তার সঙ্গে করে কেন, ইহা যেন নবীন বুঝিতে পারিতেছিল না। নিত্য নিত্য লক্ষ্মীর ডাক পাইয়া পাইয়া নবীনের মনে তার উপর মমতার সঙ্গে একটা দাবীর ভাবও জড়াইয়া গিয়াছিল; আজ তার বদলে সাধু ডাকিতে আসাতে নবীনের মনে হইতেছিল যেন সাধু তাকে হক পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

নবীনের নড়িবার লক্ষণ না দেখিয়া আর কাছারীর সকল গোমস্তা-মুহুরীর টেপা হাসি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সাধু বলিয়া উঠিল—"হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন! খেতে চলুন।"

নবীন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খাতার উপর দৃষ্টি নামাইয়া বলিল—"চলো, যাচ্ছি।"

সাধু কড়া সুরে বলিল—"চলো যাচ্ছি নয়, এখনি চলুন। আজ কি আর দিদিমণি আছে যে আপনার ভাত কোলে করে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত উপোষ করে বসে থাক্‌বে।"

সাধুর কথা নবীনের বুকের মধ্যে ঝনাৎ করিয়া গিয়া আঘাত করিল। 'আজ কি আর দিদিমণি আছে!...' সে নাই? এই 'নাই' কথাটা এক নিমেষে নবীনের

সমস্ত জীবনটাতে আবার একটা ব্রহ্মাণ্ড-জোড়া প্রকাণ্ড শূন্য দাগিয়া দিল। নবীন একবার সেই ভাঙা খড়খড়ির ফাঁকের দিকে চাহিল, সে মনে করিতেছিল এতক্ষণে হয়ত সাধুর কথা মিথ্যা প্রমাণ করিয়া সেই ফাঁক ভরিয়া দুখানি চরণের আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু না, সেখানটা তার বুকের মধ্যেকার মতনই শূন্য! ও ত ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক নয়, ও যেন নবীনের ভাঙা বুকের পাঁজরা খসার শূন্যতা! নবীনের ভাব দেখিয়া ঘরের লোকেরা আর হাসি চাপিতে পারিতেছিল না; চেপা হাসি ঠোঁটের কল গড়াইয়া, চোখের কোণ দিয়া ঠিকরিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। তার সহকর্মীদের এই ক্রূর হাসি আর সাধুর রূঢ় দৃষ্টি দেখিয়া বিমূঢ়ের মতন হইয়া নবীন আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নবীন খাইতে বসিয়া যে-পরিমাণ ভাত থালের এধার ওধার করিয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, সে পরিমাণে গ্রাস মুখে উঠিতেছে না। সে যে-জায়গাটিতে খাইতে বসে তার সম্মুখে দরজার একখানি কপাট আজও অন্যদিনের মতন ভেজানো আছে, কিন্তু তার আড়ালে আজ সে কারো দাঁড়াইয়া-থাকা অনুভব করিতেছে না। নবীনের মন হাহাকার করিয়া কাঁদিতে চাহিতেছিল —কোথায় গেলে তুমি কোথায় গেলে! এই নিঃস্বকে রিক্ত করিয়া তুমি কোথায় গেলে!

হঠাৎ নবীনের কানে গেল প্যারী দাসী গিন্নিকে বলিতেছে—"মা, দিদিমণি কি খাবে? একটু সাবু-টাবু করে দেবো?"

কথাটা শুনিয়াই নবীনের বুকের মধ্যটা ধক্ করিয়া উঠিল। আহারে! অসুখ করিয়াছে! তাই সে উঠিয়া আসিতে পারে নাই। নবীনের ইচ্ছা করিতেছিল, সে যদি একবার তার কাছে গিয়া তাকে একবারটি দেখিয়া শুধাইয়া আসিতে পারিত, সে কেমন আছে? কিন্তু তার অধিকার কি? সে এ বাড়ীর কে?

প্যারী দাসীর প্রশ্নের জবাবে গিন্নি বলিয়া উঠিল—আর আদিখ্যেতা করে সাবু করে দিতে হবে না, শেষ-হাঁড়ির ভাতের টাট্কা ফেন একটু এনে দিগে যা, গরম-গরম নুন-নেবু দিয়ে খাবে। তিনদিন অন্তর যার অসুখ তার জন্যে অত সাবু-বার্লিক কোথায় পাবো?

গিন্নির কথাগুলি নবীনের মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। ভাতের ফেন খাদ্য আর পথ্য হিসাবে ফেল্না না হইলেও আমরা তা ফেলিয়া দি বলিয়া উহা তুচ্ছ বা অখাদ্য ভাবি; সেই ফেলিয়া দিবার জিনিস বরাদ্দ করাতে গিন্নির কথায় লক্ষ্মীর উপর যে নির্ম্মমতা আর তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাইল তার ব্যথা নবীনের মনে আসিয়া বাজিল। সে ত মাসে মাসে সাড়ে সতেরো টাকা মাইনে আর চার-টাকা ছ-আনা তহরির পাইতেছে, তার এক পয়সাও ত আর খরচ নাই—সেই সমস্ত টাকা যে সে লক্ষ্মীর পথ্যের জন্য খরচ করিতে পারে। কিন্তু সেই খরচ করিবার তার অধিকার কৈ?

নবীন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।—প্যারীকে ডাকিয়া চুপিচুপি তার সমস্ত পুঁজি উজাড় করিয়া দিলে হয় না? কিন্তু তাতে প্যারী কি ভাবিবে? সে লক্ষ্মীকে মমতা দেখাইবার কে?

গিন্নি চটা সুরে ডাকিল—প্যারী, কোথায় গেলি?

প্যারীর জবাব শোনা গেল—দিদিমণির মাথা কামড়াচ্ছে তাই একটু টিপে দিচ্ছি...

গিন্নি কটু সুরে বলিল—ওরে আমার নবাব-গিন্নি! তবু যদি রতন পাল ভাদ্দর-বৌকে ভাতকাপড় দিত! যার গতর না খাটালে অন্ন জোটে না, তার আবার অত নবাবী!...

প্যারী তাড়াতাড়ি গিন্নির কাছে আসিয়া বলিল—দিদিমণি বলেনি মা, আমিই নিজে-থেকে দিচ্ছিলাম।

—তোরাই ত ওর চাল বিগড়ে দিচ্ছিস। আমার পা দুটো একটু টিপে দিবি আয়।

নবীন খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

উপরের বারান্দা হইতে প্যারী ডাকিয়া বলিল—নন্দীমশায়, মা বল্‌ছেন তাঁর বাড়ীতে অমন ভাত অপ্‌চ কর্‌লে চল্‌বে না।

নবীনের দুচোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, সে মুখ না তুলিয়াই করুণ স্বরে বলিল—আমি খেলেও ত অপ্‌চ হত। আমি খেতাম, না হয় পাঁদাড়ের কুকুরগুলো খাবে।

গিন্নি প্যারীকে বলিল—মিন্সে যমের ঘা খেয়ে কেমন একতর হয়ে গেছে। কর্ত্তার যেমন আক্কেল যত সব ভদ্দরকুড়ের প্রধান করে তুলেছেন বাড়ীখানা—বাইরে নবীন নন্দী, ভেতরে লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ! যত খাবেন তত অপ্‌চ করবেন, কিন্তু কোনো কাজে লাগেন যদি একটু! ওদের আপনার আপনার পথ দেখতে বল্‌লেই হয়...

নবীন এঁটো হাতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলা শুনিয়া গেল। সে বুঝিয়া গেল, সে এ বাড়ীতে গলগ্রহ হইয়া আছে। কিন্তু সে ত এ বাড়ীতে যাচিয়া থাকিতে আসে নাই। দুবেলা সে এ বাড়ীর অন্ন ধ্বংস করিতেছে বটে, কিন্তু তা কত কটি? লক্ষ্মী নিজে ডাকিতে যায়; নইলে ত সে আধেক দিন একবেলা খাইয়া বা উপোস করিয়াই কাটাইয়া দিতে চায়। যে খাওয়াতে তাঁর রুচি নাই, সেই খাওয়ার উপরে আবার খোঁটা। কথাটা নবীনের মনে বড় অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। আর হইলই না হয় সে দুবেলা গিলিতেছে, কিন্তু দুবেলা দুটি খাইতে দিয়া মনিবের কি কিছু লাভ হয় নাই? আগে সাতটা থেকে এগারোটা আর তিনটে থেকে পাঁচটা ছ ঘণ্টা তাকে খাটিতে হইত, এখন সে যে ভোর থেকে দুপুর রাত পর্য্যন্ত খাটে—পোড়া মনকে বিশ্রাম দিবার কি তার জো আছে? তার ত একলার পেট, গঞ্জের গোলায় গোলায় কয়ালির কাজ করিলেও ত চলিয়া যায়—বাঁধা মাইনে তার না হয় নাই থাকিল। চাকরীর মায়া ছিল তখন যখন অনেকগুলি মুখ তার উপার্জ্জনের দিকে তাকাইয়া থাকিত। কিন্তু এখনই কি সে এ চাকরী ছাড়িয়া যাইতে পারে? হায় লক্ষ্মী! সেও যে তারই মতন এদের গলগ্রহ, নিগ্রহভাজন! একজন ত

এতদিন সে জানিত না। সে জানিল লক্ষ্মী বাবুর ভাইঝি। শুধু সে বিধবা বলিয়াই নবীনের মনে যে একটু খেদ আর বেদনা ছিল। আজ সেই বেদনা সেই খেদ যে তীব্র হইয়া উঠিল তাকে নিগৃহীত অনাদৃত জানিয়া। নবীন আঁচাইতেছিল আর তার দুই চোখ হইতে জলের ধারা বহিতেছিল। যদি সে লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা কহিত তাহা হইলে সে লক্ষ্মীকে সান্ত্বনা দিতে পারিত।

জেঠিমার কথা কটা লক্ষ্মীরও অশোনা রহিল না। সেও জ্বরের ঘোরে বিছানায় পড়িয়া ভাবিতেছিল—সে ত আপনি ইচ্ছা করিয়া বাচিয়া জেঠার গলগ্রহ হইতে আসে নাই। সে শ্বশুরবাড়ীর চেয়ে এখানে ঢের বেশী সুখে আছে বটে, কিন্তু এ সুখে তার কোনো দাবী নাই জানিয়াই ত সে কখনো চাহেও নাই। সে মেয়েমানুষ, নিরুপায়, তাকে এই স্নেহহীন আত্মীয়তার আশ্রয়েই আমরণ থাকিতে হইবে। কিন্তু নন্দীমশায় ত পুরুষমানুষ, তিনি কেন পরঘরী আর পর-ভাতী হইয়া এই লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করেন? যাই সে আছে তাই ত উহাকে ডাকিয়া-ডুকিয়া খাওয়ায়; সে থাকিতেই চাকর-দাসীরা ভাত ফেলিয়া রাখিতে চায়, না থাকিলে ত সেই মাছি-ভনভনানো ভাত তাকে খাইতে হয়। আহা! যে লোক স্ত্রীকন্যার যত্নের স্বাদ পাইয়া হারাইয়াছে, তাকে যে এতটুকু অযত্ন কতখানি ক্লেশ দিবে তা ত লক্ষ্মী নিজেকে দিয়া জানে। সে যদি নন্দীমশায়ের সঙ্গে কথা কহিত তাহা হইলে আজই তাঁকে এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বলিত।

সেইদিন হইতে নবীন লক্ষ্মীর সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হইয়া উঠিল। কেউ তাকে হয়ত তিরস্কার করিতেছে, তার হয়ত কিছু চাই কিন্তু সে পাইতেছে না, এই ভাবিয়া ভাবিয়া নবীন অনির্দ্দিষ্ট কল্পিত আশঙ্কায় নিরন্তর পীড়িত হইতে লাগিল। সে বাড়ীময় চকিত হইয়া কান পাতিয়া-পাতিয়া বেড়ায়, কিন্তু না পায় কোথাও লক্ষ্মীকে দেখিতে আর না পায় তার একটি কথাও শুনিতে। এত-দিন তারা এক বাড়ীতে আছে, কিন্তু নবীন সাদা থানের পাড়ের নীচে লক্ষ্মার দুখানি পা ছাড়া তার আর চাক্ষুষ পরিচয় কিছু পায় নাই, লক্ষ্মীর চাবির থোলোর শব্দ ছাড়া সে তার একটি কথাও শোনে নাই। লক্ষ্মী এমনি লক্ষ্মী যে সারাদিন মুখ বুজিয়া কাজ করে, হাজার তিরস্কারেও তার মুখে একটি কথা শোনা যায় না। কিন্তু লক্ষ্মীর কথা শুনিতে না পাইলেও নবীন যখন-তখন গিন্নির তর্জ্জন শুনিতে পাইতে লাগিল এবং বুঝিতে লাগিল যে এ বাড়ীতে লক্ষ্মী কেমন আদরে কেমন সুখে থাকে। অক্ষম বলিয়াই তার আকুলতা তাকে অধিক পীড়া দিতে লাগিল। এত তিরস্কার-গঞ্জনাতেও লক্ষ্মী যখন শয্যাগত, তখন না জানি তার কেমন কঠিন পীড়া হইয়াছে,—এই দুর্ভাবনাতেই নবীন চঞ্চল হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

নবীনের চঞ্চলতা দেখিয়া তার সহকর্ম্মীরা ভাবিতেছিল লক্ষ্মীকে দেখিতে না পাইয়া বুড়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে। এতে তারা অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিতেছিল। একএকটা দিন যাইতেছিল আর সেদিনও

লক্ষ্মীর শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবার কোনো চিহ্ন কোথাও না দেখিয়া নবীন বেশী করিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছিল। সে বাড়ীর-ভিতর খাইতে গিয়া, তার সহকর্ম্মী যারা বাবুর বাড়ীতে খাওয়া পাইত তাদের সকলের শেষে পাত ছাড়িয়া উঠিত আর সকলের পিছনে পড়িয়া হয় সাধু নয় প্যারী যাকে যেদিন কাছে পাইত তাকে ভয়ে-ভয়ে সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করিত—তোমাদের দিদি-মণি কেমন আছেন?

লক্ষ্মীর সম্বন্ধে নবীনের এই জিজ্ঞাসা আস্তে সন্তর্পণে হইলেও তার সহকর্ম্মীদের মধ্যে তুখোড় ফাজিল ছোক্‌রা গোপেশের অশ্রুত থাকিত না; নবীনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় দ্বিধা ইতস্ততঃ আর গোপনতার প্রয়াস গোপেশের মনে কৌতুককে কৌতূহলে আর সন্দেহকে ধারণায় পরিণত করিতেছিল।

প্যারী দাসীর মনের কোণেও একটু কৌতুক বা সন্দেহ জমিতেছিল; সে রোজ গিয়া লক্ষ্মীকে শোনাইত নন্দীমশায় তার কুশল জানিবার জন্য কি-রকম ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া থাকে। লক্ষ্মী শুনিয়া চুপ করিয়া ভাবিত—এই নির্বান্ধব স্নেহমমতাহীন পুরীতে ঐ বুড়াটিই তার ব্যথা বুঝিয়াছে, কারণ সে নিজেও ভুক্তভোগী কিনা।

একদিন গোপেশ খাইয়া কাছারী-ঘরে গিয়া বলিয়া বসিল—নন্দীমশায়, একটি ডাগর-ডোগর দেখে বিয়ে-থা করে সংসারী হয়ে বসুন; শেষকালে বুড়োবয়সে একটা কেলেঙ্কারী ধাষ্টমো করবেন।

নবীন অবাক হইয়া গোপেশের মুখের দিকে তাকাইয়া পরে বলিল—বুড়ো বয়সে বিয়ে করাটাও ত কম কেলেঙ্কারী ধাষ্টমো হবে না ভাই। এতটুকু দুধের মেয়ে বিধবা হলে তার বিয়ে দেবার জন্যে ত ভাবনা হয় না, যত কেলেঙ্কারী ধাষ্টমোর ভয় কি বুড়ো পুরুষের বেলা?

গোপেশ চকিতে ঘরের সকলের মুখের উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া মুচ্‌কি হাসি ঠোঁটের কোণে চাপিয়া বলিল—হুঁ! নন্দীমশায়ের আজকাল বিধবার ওপর বড় দরদ হয়েছে দেখ্‌ছি! বিধবার বিয়ে আপনিই চলন করে দিন না।

নবীন খতিয়ানের খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল—বউ-মরা লোকের যদি বিয়ে করতেই হয় তা হলে বিধবাকেই বিয়ে করা উচিত।

তারিণী হাসিয়া বলিল—তা হলে পাত্রী খুঁজ্‌ব নন্দীমশায়?

গোপেশ হাসি চাপিয়া তারিণীকে ধমক দিয়া বলিল—পাত্রী নন্দীমশায় নিজেই ঠিক না করে কি আর কথাটা পেড়েছেন।

সেইদিন হইতে সবাই বিধবা-বিবাহ লইয়া নবীনকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল; গোপেশ শুভকর্ম্মটা তাড়া-তাড়ি সারিবার জন্য তাগাদা দিতে লাগিল; তারিণী মিতবর হইবার জন্য উমেদারী জুড়িয়া দিল।

প্যারী দাসী খবর পাইয়া সাত-তাড়া-তাড়ি গিয়া লক্ষ্মীকে বলিল—আর শুনেছ দিদিমণি? নন্দীমশায় বিধবা-বিয়ে করবে বলে ক্ষেপেছে। নাকি কনেও ঠিক করে রেখেছে। এখন দুহাত এক হলেই হয়।...

লক্ষ্মী একবার প্যারীর মুখের দিকে

চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল—প্যারীর মুখের হাসি কটাক্ষ কৌতুকভাব লক্ষ্মীর ভালো লাগিল না। লক্ষ্মীকে নীরব থাকিতে দেখিয়া প্যারীর আনন্দ উল্লাসে পরিণত হইল, সে দম ভরিয়া হাসিবার জন্য সেখান হইতে ছুটিয়া উঠিয়া গেল।

বিধবার বিবাহের কথা কেন যে নবীনের মনে উঠিল তাহা ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

লক্ষ্মী চার-পাঁচদিন পরেই বিছানা ছাড়িয়া আবার আপনার কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। মধ্যে কদিন নবীনকে না ডাকিতে যাওয়াতে এখন আবার নূতন করিয়া তাকে ডাকিতে যাইতে লক্ষ্মীর সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। রোজ যেমন ডাকিয়া আনে আজও তেমনি সাধু গিয়া নবীনকে ডাকিয়া আনিল। কিন্তু খাইতে বসিয়া নবীন যখন দ্বারের অন্তরালে লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভব করিল, তখন অভিমানে তার আর খাওয়া হইল না। তার পর-দিন সাধুর ডাকে সে খাইতে যাইতে অস্বীকার করিল; আজ তার শরীরটা ভালো নাই, এবেলা সে খাইবে না। তখন আবার লক্ষ্মীকে তার নিত্যকার দৌত্যে নিযুক্ত হইতে হইল। আবার একটার সময় ভাঙা খড়্‌খড়ির ওপারে পায়ের উদয় হয়, চাবি বাজে, নবীনও বিনা ওজরে খাইতে উঠিয়া যায়।

সেদিন বৃহস্পতিবার; গোল্‌দারদের দপ্তরখানা বন্ধ। দয়াল কুণ্ডু স্ত্রীকে লইয়া বাঁড়েশ্বরতলায় পুত্র-প্রার্থনায় পূজা দিতে গিয়াছে; সাধু সঙ্গে গিয়াছে। গঞ্জের ঘাটে দু নৌকা পাট আসিয়াছে, তাহা তোলাইয়া মাপাইয়া গোলাজাত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নবীন গোপেশ আর তারিণী গঞ্জে গিয়াছে। কেহই সন্ধ্যার আগে ফিরিবে না। বাড়ীতে কেবল লক্ষ্মী আর প্যারী আছে। লক্ষ্মী প্যারীকে বলিল—শুধু তোমার একলার জন্যে আর কি রাঁধবো প্যারী-দিদি, তুমি এবেলা ফলার-টলার করে থাকো; ওবেলা সকলের জন্যে ত রাঁধ্‌তেই হবে।

প্যারী বলিল—আর তুমি?

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল—হ্যাঃ! শুধু আমার জন্যে আবার রাঁধ্‌তে গেলাম! আজ অবকাশ পেয়েছি, সমস্ত বাড়ীটা ঝেড়ে পুঁছে ফেলি।

লক্ষ্মী কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঝাঁটা ধরিয়া বাড়ী পরিষ্কারে লাগিয়া গেল। বাড়ীর ছাদের কার্ণিশ হইতে পায়খানা পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গা ঝাঁট দিয়া, ধুইয়া, ঝুল ঝাড়িয়া, জিনিসপত্র সাজাইয়া গুছাইয়া সে বাড়ীটাকে একেবারে বিয়ের কোনের মতন সুন্দর করিয়া তুলিতে লাগিল। নবীন থাকিত সদর-অন্দরের সন্ধিস্থলে একটা ঘরে। ঘরটায় ধূলা ঝুল আবর্জ্জনা জমিয়া আছে; এক পাশে কতকগুলো ময়লা বিছানা ওলটাল হইয়া পড়িয়া আছে, দড়ির আন্‌লায় কতক-গুলো ময়লা জামা কাপড় এলোমেলো ঝুলিতেছে। লক্ষ্মী সেই ঘরে পা দিয়াই বলিয়া উঠিল—আরে রাম! এ ঘরে কে থাকে?

প্যারী হাসিয়া বলিল—তোমার নন্দী-মশায়।

লক্ষ্মী ঘরটাকে ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিয়া বলিল—আহা! তোমরা একটু দেখ্‌তে পারো না প্যারী-দিদি?

প্যারী মুখ ঘুরাইয়া বলিল—আধবুড়ো মিন্সে নিজের ঘরটাকে নিজে পরিষ্কার কর্‌তে পারে না?

লক্ষ্মী বলিল—এসব কি পুরুষমানুষে পারে? তাতে আবার উনি বৌমরা বুড়ো মানুষ।

প্যারী বলিল—তোমার মতন আমাদের অত দরদের প্রাণ নয় দিদিমণি।

প্যারীর কথার ভঙ্গীতে একটা কেমন খোঁচা স্পষ্ট হইয়া উঠিল দেখিয়া লক্ষ্মী আর কোনো কথা না বলিয়া নবীনের বিছানা ঝাড়িয়া বিছাইয়া দিতে লাগিল।

এমন সময় গোপেশ আর তারিণী হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া-পড়িতেই লক্ষ্মী কোমরে-জড়ানো আঁচল লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। গোপেশ আর তারিণী থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্মীও তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সারিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে বাবু গিন্নি কর্ম্মচারী একে একে সকলেই বাড়ীতে ফিরিয়া বাড়ীর শ্রী দেখিয়া অবাক। বাড়ীর মেয়েকে উৎসবের বেশে দেখিলে যেমন লাগে, এই পুরানো বাড়ীখানাকে তেমনি কেমন নূতন লাগিতেছিল; সে তার ধূলো মাটি কালিঝুল ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়াছে, শৃঙ্খলায় পরিপাটি হইয়া সাজানো হইয়াছে। বাবু বৈঠকখানায়, গিন্নি শোবার ঘরে, কর্ম্মচারীরা দপ্তরখানায়, চাকরেরা রান্নাঘরে একজন কার নিপুণ হস্তের স্পর্শ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল। কিন্তু গোপেশ আর তারিণী যখন চুপিচুপি চোখ টিপিয়া সকল কর্ম্মচারীকে বলিল—'আর জানেন, নন্দার ওপর লক্ষ্মীর কৃপা কত! নিজের হাতে নন্দীর বিছানা পেতে দেওয়া হচ্ছিল! আমরা গিয়ে পড়্‌তেই একেবারে থতমত খেয়ে গেল!' তখন আর কারো মনে সেই ব্যাপারটাকে সমস্ত বাড়ী সাফের সাধারণ অঙ্গ বলিয়া ঠেকিল না; গোপেশদের দেখিয়া লক্ষ্মীর থতমত খাওয়াটা পুরুষের সামনে পড়ার সঙ্কোচ বলিয়াও কেহ বুঝিল না। লক্ষ্মী যে সমস্ত বাড়ীটা সাফ করিয়াছে, সে কথা সকলে ভুলিয়া গিয়া নন্দার বিছানা পাতিয়া দেওয়ার অসামান্য ব্যাপারটা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে না-হইতে একেবারে প্রমত্ত হইয়া উঠিল। ধরা পড়িয়া লক্ষ্মী যে থতমত খাইয়া গিয়াছিল তার সাক্ষী ত গোপেশ আর তারিণী। আর হয় না-হয় প্যারীকে ডাকিয়া ভজাইয়া দিতেও ত তারা প্রস্তুত!

অনেক রাতে নবীন বাড়ীতে ফিরিয়া নিজের ঘরে পা দিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তার সে লক্ষ্মীছাড়া ঘরে কে পদ্মহস্ত বুলাইয়া এমন লক্ষ্মীশ্রী দিয়া গেল! তার অতীত জীবনের চেষ্টা-করিয়া-ভুলিতে-চাওয়া কথা মনে পড়িয়া গেল; তার মেয়ে যখন শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিত তখন সে এমনি করিয়া তার এলোমেলো ঘরকন্নায় শৃঙ্খলা সৌষ্ঠব দান করিত; তার স্ত্রী মেয়ের কাছে বকুনি খাইয়া হাসিয়া বলিত—'আমরা সেকেলে মানুষ মা, আমরা কি

তোদের একেলে চালচলন জানি।! নবীন সেইখানে মেঝের উপর উবু হইয়া বসিয়া পড়িল, দুই হাত তার মাথায় আর দুই ধারা তার চোখে।

গোপেশ আর তারিণী নবীনের আসার প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল; হাসিতে-হাসিতে আসিয়া বলিল—নন্দীমশায়ের ঘরে আজ লক্ষ্মীর কৃপা হয়েছে দেখ্‌ছি!

নবীন অন্ধকারে চোখের জল লুকাইয়া বলিল—হাঁ্যা ভাই, লক্ষ্মীছাড়ার ঘরেও লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠেছে।

গোপেশ বলিল—এখন উঠুন, খেতে চলুন।

নবীন বলিল—না ভাই, তোমরা যাও আমি আজ আর খাবো না।

যাইতে যাইতে তারিণী হাসিয়া বলিল—দিবা-অভিসার চল্‌ছিল, এইবার নিশা-অভিসার সুরু হবে।

গোপেশ ধমক দিয়া বলিল—সুরু যে হয়নি তা তুই কেমন করে জান্‌লি?

তারিণী হাসিয়া বলিল—তাও ত বটে!

গোপেশ আর তারিণী যখন নবীনকে খাইতে ডাকিতে আসিয়াছিল তখন নবীন শুনিতেছিল উপরে প্যারী গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—মা, দিদিমণি রাত্তিরে কি খাবে? সমস্ত দিন কিছু খায়নি, রাত দশটা বেজে গেছে, আর ত ভাত খেতে নেই?

গিন্নি রাগিয়া উঠিয়া বলিল—আদিখ্যেতা করে আবার দিনের বেলা ভাত খাওয়া হয়নি কেন? একবেলা ভাতই দিতে পারি, রাত্তিরে বিধবার জলখাবার ক্ষীর সর ননী কোথায় পাবো? উনি আবার বামুনের বিধবার মতন ঢং করে রাত্তিরে আচমনী জিনিষ খান না! কি আর খাবেন তবে? উপোষ করে থাকুন।

এই কথা শোনার পর নবীনের খাইবার প্রবৃত্তি আর ছিল না। যে লোকটি সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া সমস্ত ঘরসংসারে অপূর্ব্ব শ্রী দান করিয়াছে, তাকে রাত্রেও অনাহারেই থাকিতে হইবে। আর সে দিনে রাতে খাইয়া চলিবে, ইহা নবীনের অত্যন্ত অন্যায় মনে হইল।

খানিকক্ষণ পরে প্যারী আসিয়া বলিল—নন্দীমশায় খেতে আসুন, দিদিমণি নিজে ডাকৃতে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

নবীন আজ লক্ষ্মীর আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল—শুন্‌লাম বিধবার সমস্ত দিন উপোষ করে থেকেও রাত্রে কিছু খেতে নেই। বিধবার নিয়ম আমিও আজ থেকে পালন করব প্যারী।

প্যারী বলিল—আপনি আগে বল্লেননি, চাল নেওয়া হয়েছে, ভাত ফেলা গেলে মা রাগ করবেন। আজ খাবেন চলুন, কাল থেকে যা হয় করবেন।

নবীন বলিল—আমি খেলেও ত চাল বাঁচত না। আমি খাবো না। তোমাদের দিদিমণিকে বোলো কাল থেকে আমাকে তাঁরই হাঁড়ির হবিষ্যি ছুটি করে দেবেন; যেদিন তাঁর উপোষ সেদিন আমারও উপোষ।

প্যারী মুচ্‌কি হাসিয়া চলিয়া গেল।

প্যারী ফিরিবার আগেই লক্ষ্মী চোখের জল গোপন করিতে সে তল্লাট ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। নবীন যে তার প্রতি মমতার বশেই এই ক্লেশ স্বীকার করিতেছে ইহা লক্ষ্মীর বুঝিতে বাকী ছিল না; মা বাপ আর স্বামীকে হারাইয়া অবধি লক্ষ্মী একদিনের তরে একজনের কাছে একটিও স্নেহের নিদর্শন পায় নাই; কোথাকার কে এই পরের কাছে এমন মমতার পরিচয় পাইয়া শান্ত লক্ষ্মীর চোখের জল দুরন্ত হইয়া ছুটিয়াছিল; কত দিনের কত কঠোর ব্যবহার সে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে এই অস্পষ্ট মমতার আভাসটুকুও সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

এতদিন লক্ষ্মী নিজের রান্নাটা ভাতে-ভাত করিয়াই সারিত; কিন্তু নবীন তার অংশীদার হওয়াতে তাকে রোজ ডাল আর নিদেন পক্ষে একটা তরকারীও রাঁধিতে আরম্ভ করিতে হইল। তাহা দেখিয়া গিন্নি রুষ্ট হইয়া বলিলেন—নবাবী যে ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল। নন্দী মিন্সে সংসারের স্লপ্‌টা রান্না খেয়ে থাকে ভালো, নয়ত আপনার পথ দেখুক। এক বাড়ীতে সাত হেঁসেল ত আমি চালাতে পার্‌ব না।

গোপেশ তারিণীকে চোখ মট্‌কাইয়া বলিল—ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা বাড়্‌ছে। একবাড়ী থেকে একহাঁড়িতে ঠাঁই হয়েছে; তার পর……

বাড়ীময় যে ঘোঁট জটলা-পাকাইয়া সারা বাড়ীর হাওয়াটাকে গুমোট করিয়া তুলিতেছিল তার ছোঁয়াচ অল্পে অল্পে কর্ত্তা-গিন্নির মনে গিয়াও লাগিতেছিল। কেহ সাহস করিয়া কর্ত্তাগিন্নির সাম্‌নে কুৎসা আলোচনা করিতে সাহস করিত না বটে, কিন্তু ফিস্‌ফাস কানাঘুষার আভাস একটু আধটু ছিট্‌কাইয়া তাঁদের কানেও লাগিতেছিল।

একদিন একটার সময় লক্ষ্মীর আগমনের প্রতীক্ষায় নবীন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; একবার লিখিতেছে, একবার কানে কলমটা গুঁজিয়া রাখিয়া চোষ-কাগজ দিয়া লেখার কাঁচা কালি ছাপিতেছে। একটু পরেই ভাঙা খড়্‌খড়ির ফাঁকে লক্ষ্মীর পা উঁকি মারিয়া চাবির শব্দে নবীনকে ডাকিল। নবীন উঠিয়া তক্তপোষ হইতে নামিয়া চটিজুতার মধ্যে পা দিতেছে, এমন সময় গোপেশ হাসিমুখে ঘরে আসিয়া বলিল—নন্দীমশায়, বাবু আপনাকে বৈঠক্‌খানায় ডাক্‌ছেন!

এমন শুভ মুহূর্ত্তে একি অঘটন! সে ক্ষুন্ন মনে চলিতে যাইবে এমন সময় শুনিতে পাইল সেই ভাঙা জান্‌লার ওপারে চটাস করিয়া একটা চড়ের শব্দ আর গিন্নির চড়া গলার গর্জ্জন—নচ্ছার মেয়েমানুষ, এখানে দাঁড়িয়ে তুই কি কর্‌ছিস। সাধে কি বুড়ো মিন্সে বিধবা-বিয়ে কর্‌বে বোলে ক্ষ্যাপে!……

গিন্নির সেই ভীষণ চড় নবীনের মনের মধ্যে পাঁচ আঙুলের দাগ বসাইয়া গেল। তার জন্তে লক্ষ্মীর এই লাঞ্ছনা আর অপমান! উহা নিবারণ করিতে সে যে প্রাণ দিতেও পারিত! এ বাড়ীতে থাকিয়া সে আর লক্ষ্মীর দুঃখ বাড়াইবে না। বাবুর কাছে বলিয়া সে আজই বিদায় লইবে।

লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া যাইতে তার কষ্ট হইবে খুবই; কিন্তু কথামালার টাক ও পরচুল গল্পটার কথা স্মরণ করিয়া নবীন মনকে সান্ত্বনা দিল, আপনার জনকেই সে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই তা পরকে ধরিয়া রাখিবে কেমন করিয়া? অনেক বিচ্ছেদের দুঃখ সে সহিয়াছে, এ দুঃখও তাকে সহিতে হইবে।

বাবুর বৈঠকখানায় গিয়া দাঁড়াইতেই দয়াল কুণ্ডু পরম শান্ত স্বরে বলিল—এই নাও তোমার এ মাসের মাইনে, আর নোটিশের দরুন একমাসের মাইনে আগায়। দরজায় গাড়ীতে তোমার জিনিসপত্তর তোলা হয়ে গেছে এতক্ষণ, তুমি এ গাঁ ছেড়ে এখনি চলে যাও।

নবীন বাবুকে নমস্কার করিয়া যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় গিয়া গোরুর গাড়ীতে চড়িল। কিন্তু কোথায় সে যাইবে? কোথায় তার কে আত্মীয়, কোথায় বা তার ঘরবাড়ী?

নবীনকে জানাইয়া তাকে অপমান করাতে লক্ষ্মীর মর্ম্মান্তিক বাজিয়াছিল। এ ত শুধু তাকে অপমান নয়, এ যে নবীনকেও। তার জন্য যে নবীন অপমানিত হইল, ইহাতে লক্ষ্মী নিজেকে অপরাধী বোধ করিতে লাগিল। তার পর যখন জানিল যে নবীনের চাকরী পর্য্যন্ত গেল, এই ঠিক দুপুর বেলা অভুক্ত বৃদ্ধকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইতেছে, তখন লক্ষ্মীর বুক ভাঙিয়া পড়িবার মতন হইল। সে লজ্জায় দুঃখে ক্ষোভে মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, লোকে আজ যে তার কান্না দেখিতেছে তাতে তার আর লজ্জা নাই।

বাবুর বৈঠকখানা হইতে নবীন বাহির হইয়া যাইতেই গিন্নি দয়ালকে গিয়া বলিল —একটা আপদকে ত দূর করলে; আর একটা?

দয়াল গম্ভীর হইয়া বলিল—ঐসঙ্গেই দূর করে দিতাম, কিন্তু লোকে যাকে আমার ভাইঝি বলে তাকে অমন করে তাড়ালে আমারই মুখ হেঁট হবে। নিজের কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

গিন্নি উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল— শ্বশুরবাড়ী থেকে তারা এইরকম রীত দেখেই দূর করে দিয়েছে!

লক্ষ্মী জেঠামশায় আর জেঠিমার কথা শুনিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। ওরা তাকে নবীনের মতনই তাড়াইয়া দিত যদি তাতে ওদের মুখ হেঁট না হইত। তাড়াইতেছে না তার প্রতি মমতা বা দয়া করিয়া নয়, নিজেদের নিন্দার ভয়ে। এখানে যতকাল থাকিতে হইবে এই কুৎসার কুণ্ঠা তাকে বহন করিতে হইবে! এই কথা ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মীর অমন যে শান্ত স্নিগ্ধ কোমল মুখ, তা কঠোর উগ্র হইয়া উঠিল।

নবীন নন্দী চলিয়া যাইতেছে দেখিবার জন্য দপ্তরখানার সব কর্ম্মচারী, বাড়ীর চাকর দাসী, গোলার দফাদার মজুর, পাড়াপ্রতিবেশী অনেক লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছে; বাড়ীর উপরের বারান্দা হইতে বাবু আর চিকের আড়াল হইতে

গিন্নিও দেখিতেছে। গাড়োয়ান গাড়ীতে গোরু জুতিয়া লাগামের দড়ি ধরিয়া টুট্ টুট্ করিয়া চালাইবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে উল্কার মতন ছুটিয়া একেবারে পথে বাহির হইয়া লক্ষ্মী নবীনকে ডাকিয়া বলিল জেঠামশায় একটু দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।

নবীন গাড়ীর ছইএর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিল একটি কোমল-স্নিগ্ধ-মূর্ত্তি তরুণী তাকে জেঠামশায় বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। সে ত কখনো লক্ষ্মীকে চোখে দেখে নাই, কখনো ত তার কথা শুনে নাই, কিন্তু সে অন্তরের অনুভবে জানিল এই লক্ষ্মী। সে গলা বাড়াইয়া ব্যাকুল ব্যগ্রতার সহিত বলিল—মা-লক্ষ্মী, তুমি এ লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে কোথায় যাবে মা?

লক্ষ্মী গাড়ীর কাছে গিয়া বলিল—আমি যাবো জেঠামশায়, আমি না থাক্‌লে আপনাকে দেখ্‌বে কে, আপনার কষ্ট হবে যে!

দয়াল কুণ্ডুর যেন মাথা কাটা গেল, সে তাড়াতাড়ি বারান্দা ছাড়িয়া ঘরে গিয়া লুকাইল।

তারিণী হাসিয়া গোপেশকে বলিল—আজ নন্দীমশায়ের বাড়ীতে বড় জোরে একটা বেজেছিল হে!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ম্ম

শক্তিমায়ের ভৃত্য মোরা নিত্য খাটি নিত্য খাই,
শক্ত বাহু শক্ত চরণ চিত্তে সাহস সর্ব্বদাই;
ক্ষুদ্র হউক তুচ্ছ হউক, সর্ব্বসরম-শঙ্কাহীন—
কর্ম্ম মোদের ধর্ম্ম বলি' কর্ম্ম করি রাত্রিদিন।

চোদ্দপুরুষ নিস্ব মোদের বিন্দু তাহে লজ্জা নাই,
কর্ম্ম মোদের রক্ষা করে অর্ঘ্য সঁপি কর্ম্মে তাই;
সাধ্য যেমন শক্তি যেমন তেম্‌নি অটল চেষ্টাতে
দুঃখে সুখে হাস্যমুখে কর্ম্ম করি নিষ্ঠাতে।

কর্ম্মে ক্ষুধায় অন্ন যোগায় কর্ম্মে দেহে স্বাস্থ্য পাই,
দুর্ভাবনায় শান্তি আনে নির্ভাবনায় নিদ্রা যাই;
তুচ্ছ পরচর্চ্চাগ্লানি মন্দ ভালো কোন্‌টা কে—
নিন্দা হ'তে মুক্তি দিয়ে হাল্কা রাখে মনটাকে।

পৃথ্বীমাতার পুত্র মোরা মৃত্তিকা তাঁর শয্যা তাই,
শষ্পেতৃণে বাসটি ছাওয়া দীপ্তি হাওয়া ভগ্নী ভাই;
তৃপ্ত তাঁরি শস্যেজলে ক্ষুৎপিপাসা দুঃসহ,
মুক্ত মাঠে যুক্ত করে বন্দি তাঁরেই প্রত্যহ।

* * * *

পক্ষীপ্রাণী নিত্য জানি, শ্রম বিনা কার খাদ্য হয়,
সুদ্ধ মানুষ ভিন্ন—সে কি বিশ্ববিধির বাধ্য নয়!
চেষ্টা ছাড়া অন্ন যে খায় অন্যে তারে বল্‌বে কি,
ভিক্ষুকেরও ঘৃণ্য তারে গণ্য করা চল্‌বে কি?

ক্ষুদ্র নহি তুচ্ছ নহি ব্যর্থ মোরা নই কভু—
অর্থ মোদের দাস্য করে অর্থ মোদের নয় প্রভু;
স্বর্ণ বল' রৌপ্য বল' বিত্তে করি জন্মদান,
চিত্ত তবু রিক্ত মোদের নিত্য রহে শক্তিমান।

কীর্ত্তি মোদের মৃত্তিকাতে প্রত্যহ রয় মুদ্রিত,
শূন্য-পরে নিত্য হের স্তোত্র মোদের উদ্‌গীত ;
সিন্ধুবারি পণ্য বহি' ধন্য করে তৃপ্তিতে,
বহ্নি মোদের রুদ্র প্রতাপ ব্যক্ত করে দীপ্তিতে।

ঠাট্টা করুক ব্যঙ্গ করুক লক্ষ্মীপেঁচার বাচ্ছারা—
পার্ব্বেনাক করতে মোদের কর্ম্মদেবীর কাছছাড়া
শান্তিভরা দৃষ্টি যে তাঁর জ্বলছে মোদের অন্তরে,
শঙ্কাসরম ডঙ্কা মেরে তুচ্ছ করি মন্তরে।

বিশ্ব যুড়ি' সৃষ্টি মোদের হস্ত মোদের বিশ্বময়,
কাণ্ড মোদের সর্ব্বঘটে কোন্‌খানে তা দৃশ্য নয়?
বিশ্বনাথের যজ্ঞশালে কর্ম্মযোগের অন্ত নাই,
কর্ম্ম,সে যে ধর্ম্ম মোদের—কর্ম্ম চাহি কর্ম্ম চাই।

মাতৃভূমি! পিতৃপুরুষ! কর্ম্মে যেন দীক্ষা হয়!
রুদ্ররবে গর্জ্জি' বল' ভিক্ষা নহে—ভিক্ষা নয়!
হস্ত যখন সঙ্গে আছে সঙ্গে আছেন শক্তিময়,
কর্ম্ম ছাড়া অন্য কাযে করব মোরা ভক্তিভয়?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

রূপ-রেখা

যেদিকে যেতে হবে, রেলের লাইন ঠিক সেই-মুখে না হয়ে, যদি উল্টো-মুখে পাতা হয়, তবে গন্তব্য স্থানটি রইলো একদিকে, আমরা রইলেম একদিকে। তেমনি সব জিনিষকে বোঝবার একটা একটা পথ; সেই পথ না ধরে, অন্য পথ ধরে যদি আমরা সেটাকে বুঝতে চলি, তবে কেবল পথ-চলাটা ছাড়া আর-কিছু আমাদের লাভ হয় না।

আর্টের জিনিষগুলোকে বুঝতে হলে, artistic training এবং artistic feeling —এই দুই সোজা লাইন ছাড়া আমাদের মনোরথ অনন্যগতি।

আর্ট যদি জ্যামিতির সমস্যা, ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা, কিম্বা দেহতত্ত্ব জীবতত্ত্ব প্রভৃতির মতন একটা-কিছু হতো, তবে আর্ট বুঝতে যেতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলমোহর-করা ছাড়-পত্রখানি, রেলওয়ে পাসের মতন, আর্টের প্লাটফর্ম্মটিকেও আমাদের পক্ষে সুগম করে দিতো। কিন্তু সেটি তো হবার যো নেই! বাণীর বীণাটিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে, বিশ্বের সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করতে গেলে দ্বারী আমাদের পথ আটকাবে! বিশ্বকর্ম্মার দিক থেকেও ঠিক ওই কথা;—শিল্পজ্ঞান এবং রসবোধ এ-দুটোর একটা তোমার থাকা চাই।

কলেজের বেঞ্চি এবং বাসার তক্তা-পোষ এ দুটোর মাঝে যে-জগৎটা রূপের ছন্দে বিচিত্র, সুরের আঘাতে মুখর, সেই-খানটিতে আমাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধির পথ খুলে রাখা চাই। আমাদের মধ্যেকার সহজ সৌন্দর্য্য-বোধ, সুর-বোধটি নিয়ে, সৌন্দর্য্যের নব-নব-ছবি, সুরের নতুন-নতুন লহরী, যেখানে নিরত আমাদের চোখে পড়ে, সেই স্কুল-ঘরের বাইরেটাতেই মাঝে মাঝে আমাদের দাঁড়াতে হবে। আমরা সবই করি, কেবল

সেইটিই করি না,—যেগুলোর দ্বারায় আমাদের শিল্পবোধটিতে শান্ পড়ে।

লেখাপড়ার কাজ, আমাদের বাল্যে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে একই জায়গায়—স্কুল মাষ্টারের চেয়ার, নয়তো অফিস চেয়ারেতেই —বসিয়ে রেখে দেয়। যদি ডিবেটিং ক্লাব, এবং রাজনৈতিক সভা প্রভৃতি গুলোই হয় মনের কথা বলবার এবং হাঁফ-ছাড়বার স্থান, তবে যেখানে দিন, রাত্রি এবং ষড়ঋতুর রসের ছন্দে ছাঁদ মিলিয়ে শিল্পী গড়ছে এবং লিখছে সেদিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব হবে?

রসবোধ করবার শক্তিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে। আঙুলের সামান্য স্পর্শে কেঁপে উঠে বাজবার শক্তি বীণার তারের মধ্যেই রয়েছে। একমাত্র শিথিলতাই হয় বাজার অন্তরায়। বিশ্বের যে বীণা-ঝঙ্কার আলো হয়ে দীপ্তি পাচ্ছে, ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, রং হয়ে ঋতু থেকে ঋতুতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, দিনরাত্রি কোথাও যার বিরাম নেই, তারি সঙ্গে নিজেই সুর হয়ে মেলবার ক্ষমতা ও চেষ্টা, বিধাতা শুধু আর্টিষ্টদেরই দিয়ে পাঠাননি। অণুপরমাণুর মধ্যে বাইরের থেকে তরঙ্গের অভিঘাত পেয়ে জেগে ওঠবার যে শক্তি, কানের এবং চোখের—শব্দের সঙ্গে, আলোর সঙ্গে, এক-সুরে মেলবার যে শক্তি, সেই শক্তি আর-একভাবে আমাদের সকলের মনকে সৃষ্টির সুরে সুর মেলাবার জন্যে রয়েছে। আর্টিষ্টের কাজের মধ্যে দিয়ে সেই শক্তির পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি মাত্র; এ ছাড়া আর্টিষ্ট আর সাধারণ-মানুষে তফাৎ কোন্খানে?

এটা আমরা দেখেছি—নিজের নিজের পরিবারে যে-বিষয়ে অধিক চর্চ্চা চলে, সেই-খানে দেখতে-দেখতে অনেকগুলি ছেলে সেই সেই বিষয়ে একটা স্বাভাবিক দক্ষতা পায়। অবশ্য যেখানে গানের চর্চ্চা, সেখানে সবাই কালোয়াৎ হয়ে ওঠে না, কিন্তু সুরবোধ, তাল-মান-জ্ঞান, এবং গানের ভালোমন্দ-বিচারের একটা সহজ-শক্তি তারা লাভ করেই। তবেই দেখা যাচ্ছে আমাদের সবার মধ্যে শিল্পবোধরূপ-শক্তি চর্চ্চার অভাবে অনেক সময়ে ফুটতে পায় না; সে-শক্তিটা যে আমাদের মধ্যে নেই, তা নয়।

আমাদের দেশে, ছাত্র-অবস্থা থেকে শিক্ষাটা যে-পথে চলে আসে, সেটা আমাদের শিল্পবুদ্ধি উদ্রেক করবার অনুকূল কিনা, সেটা তর্কের বিষয় হলেও, এখানে আমি সে প্রশ্ন করবো না। শিল্পীর কোন্ পথ, সেইটে নির্দ্দেশ করতে পারলেই, শিল্পকে বোঝাবার পথও আমরা পাবো।

যেমন আমাদের কাছে বহির্জ্জগৎ রয়েছে, তেমনি অন্তর্জগৎও রয়েছে। বহির্জগতের দেখা কেবলমাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের দেখা। সেখানে সাধারণ-মানুষও যা দেখছে, শিল্পীও তাই দেখছে;—কতকগুলো আকার, কতক-গুলো বর্ণ, কতকগুলো ভঙ্গী। আর অন্তর্জগৎ—সেখানে এক মানুষের দেখার সঙ্গে আর-এক মানুষের দেখার পার্থক্য রয়েছে; সেখানে শিল্পীর দেখার সঙ্গে সাধারণের দেখার মিল হচ্ছে না।

শিল্পী যেখানে দেখছেন মেঘাচ্ছন্ন সকালের

আকাশ,—যেন জলভারে অবনত চোখের পাতাটির মতো! সাধারণ দেখছে, সেখানে একটা বাদলার দিন—অফিস লেটের উপক্রম; কিম্বা কলেজের ছেলে দেখছে স্কুল বন্ধের সুযোগ!

এইখানে শিল্পীর কাজ বুঝতে হলে সাধারণ-ধারণাটি নিয়ে গেলে তো চলবেনা। বড় শিল্পী যে হয়, সে কাজের কৌশলে তোমার মনটিকে ঠিক সেইখানটিতে নিয়ে উপস্থিত করে, যেখানটিতে যাওয়া তোমার-আমার সাধ্য হয়নি;—যেন আর-একটা লোকে উপনীত হয়ে মন আমাদের দ্বিজত্ব লাভ করে। সাধারণ-ধারণাটুকু ছাড়া যার পক্ষে আর-কিছু সম্ভব নয় তার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্।

শিল্পী মনোরাজ্যের চাবি-কাঠিটি নিয়ে এসেছেন এটা মেনে, সেইদিক্ দিয়ে শিল্পকে যদি আমরা বুঝতে চলি, তবে মন-বস্তুটা ঝাপ্‌সা ঠেকলেও, শিল্পীর মানসমূর্ত্তিগুলো আমাদের কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসে।

শিল্পী যখন বস্তুটির সাধারণ-রূপটাই দিচ্ছেন, যেমন কোনো প্রাণীবিশেষের চেহারা কিম্বা স্থানবিশেষের দৃশ্য, তখন আমাদের সাধারণ-বুদ্ধি সহজেই তার দোষ-গুণ ধরতে অপারগ হয় না। কিন্তু যেখানে ভাব এসে শিল্পীর কাজে যোগ দিয়েছে, সেইখানে সাধারণভাবে তার বিচার অসম্ভব।

আমাদের দেশের,—বল্‌তে গেলে সমস্ত প্রাচ্য জগতের—শিল্প হচ্ছে ভাবাত্মক। ভাবের খাতিরে সেখানে স্বভাবের অভাব, বহুল পরিমাণে শিল্পীরা নিজেদের কাজের মধ্যে ঘটিয়েছেন এবং সেটুকু স্বীকার করে নিয়েই প্রাচ্য শিল্পকে দেখতে হবে।

ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ, সমভঙ্গ—এমনি সব যে ভঙ্গী—সাধারণ-মানুষ তেমন ভঙ্গীতে শরীরটাকে বাঁকাতে-চোরাতে গেলে হাড়-গোড়-ভাঙ্গা ছাড়া আর-কিছুই করতে পারবেন না। কিন্তু শিল্পীর হাতে এইসব ভঙ্গী নিয়ে তাঁর মানস-মূর্ত্তিগুলি সুন্দর হয়ে উঠেছে, এটা আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

মান্দ্রাজের নটরাজ মূর্ত্তি। এটার মধ্যে সাধারণ হাত-পায়ের গড়ন অনেকটা বজায় রাখা হয়েছে। এর কারণ এখানে শিল্পীকে ভাবের একটি মৃদু-ছন্দের অবতারণা করতে হয়েছে। ভাব-তরঙ্গকে এখানে সজোরে দেহকে উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ করতে দিলে, ভাবের ব্যাঘাত ছাড়া পরিস্ফুরণ হয় না। আমি যখন প্রথম এ মূর্ত্তিটি দেখি, তখন এটা আমাকে খুব আকর্ষণ করেনি, বরং এই মূর্ত্তির মধ্যে যে দেহগঠনসম্বন্ধে বাস্তবিকতা ও সাধারণ-পরিমাণ, সেটা দেখে এটার সম্বন্ধে খুব বড় ধারণা মোটেই হয়নি, কিন্তু আমি এটাকে বোঝবার চেষ্টাও পরিত্যাগ কল্লেম না। দিনের পর দিন,—শেষে একদিন এ মূর্ত্তিটির মধ্যে শিল্পীর যে অভিপ্রায়টি রয়েছে সেটা আমার কাছে ব্যক্ত হ'ল!

প্রথম, এ যে সামান্য নট নয়, কিন্তু নটরাজ—সেই কথা শিল্পী স্পষ্ট করে বলে দিলেন সহজ মানুষের চেয়ে দুখানি হাত বেশি দিয়েও বটে, নাচের ভঙ্গীটির একটি অপূর্ব্ব সুষমা, প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে
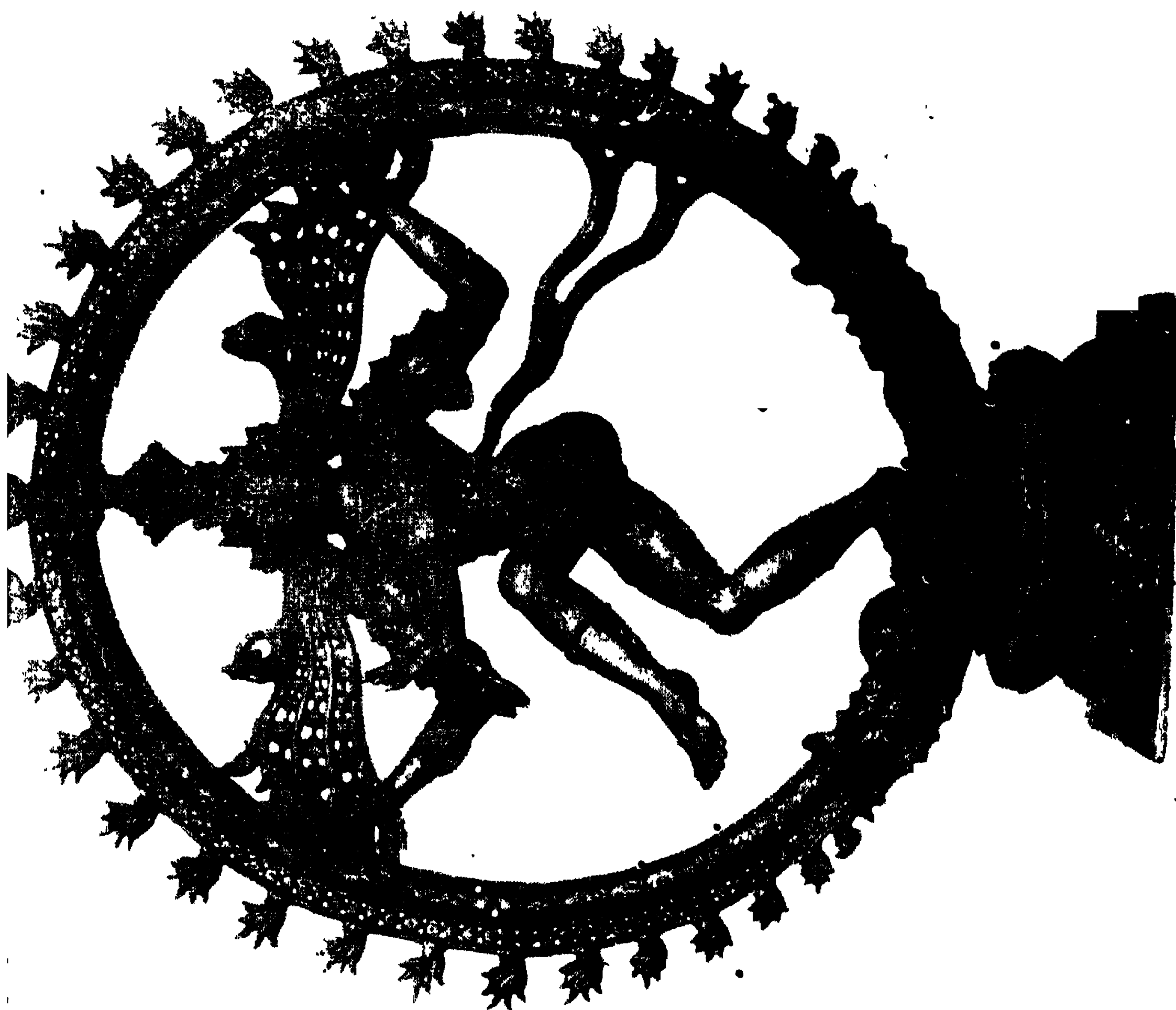
নটরাজ

ধর্মপাল

প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীর চমৎকার সামঞ্জস্য দিয়েও বটে। পুরাণের অন্ধকাসুর-বধের উপাখ্যানটি যে মূর্ত্তি বা কল্পনার গোড়া, সেটা বুঝতে তাণ্ডব-মূর্ত্তির পায়ের তলায় অসুর, এক-হাতের ডমরু, জটার চন্দ্রকলা, গলার সাপই যথেষ্ট ছিল। এ সত্ত্বেও শিল্পীর যা অভিপ্রায় —যেটার জন্যে এ মূর্ত্তিটা শিল্পজগতে এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি—সেটা আমার কাছে অনেক-দিন ধরা দেয়নি। সাধারণ-চোখে দেখলে, মূর্ত্তিটা শিবের তাণ্ডব-নৃত্য—এইটুকু মাত্র প্রকাশ পাবে। কিন্তু একটু মনঃসংযোগ করে দেখলে আমরা দেখবো যে, মূর্ত্তিটা একেবারেই নাচ্চেনা ;—গতির গতাগতি ওতে নেই বল্লেও চলে। যেন নাচের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে হঠাৎ এক-নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হয়েছে ; দুই-হাতের তাল পড়বার জন্য উদ্যত—পড়বে এমন আভাষটি মাত্র ; ডান-পাখানি পড়ে রয়েছে অসুরের উপরে সম্পূর্ণ লিপ্ত এবং স্থির ;—ধ্বংসের পর এক মুহূর্ত্তের জন্য সৃষ্টি-কার্য্য বন্ধ হয়েছে। হয় তো এখনি আরম্ভ হবে, কিম্বা হয় তো এই নটরাজের দক্ষিণহস্তের দ্বিতীয় তালটি পড়ার অপেক্ষায় যুগযুগান্তর কেটেও যেতে পারে!—শিল্পীর এই অভিপ্রায়টিই ঐ মূর্ত্তিতে ধরা রয়েছে। ভাব যেখানে স্তম্ভিত হয়েছে, সেখানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী ও মান-পরিমাণের আতিশয্য যে মোটেই শোভনীয় হতে পারেনা, এই মূর্ত্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন সেইটেই পরিষ্কার করে আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিল।

এরি পাশে আর এক সংহার-মূর্ত্তি।—এখানে শিল্পী মূর্ত্তিটিকে একটা অপ্রতিহত গতি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। ঝড়ের বেগে মূর্ত্তিটা—যেন ক্ষুব্ধ সমুদ্রে বিপুল তরঙ্গের মতো—একদিকে গড়িয়ে চলেছে! এখানে আর স্বাভাবিক দেহের গঠন-ভঙ্গী রাখা চলেনা। ভাব এ'কে টেনে নিয়ে চলেছে—যতটা পারে একদিকে। ঝোড়ো-বাতাস-ভরা পালকে যে ভঙ্গীটি দেয়, সজোরে-টানা ধনুক ঠিক যে বাঁকটি পায়—সেই বাঁকটি! সাধারণ-মানুষের দেহ কোনো দিন এমন বাঁকতে পারেনা। কিন্তু এটি বাদ দিলে তো চলে না ; শিল্পীর অভিপ্রায় যে অস্ফুট থাকে! আট-হাতের এবং দুই-প্রসারিত-পায়ের রেখাগুলি মিলে একটা গতিশীল উত্তাল তরঙ্গের সৃজন করেছে। এই তরঙ্গ বহন করে আন্‌ছে পাপীর জন্য অষ্টবজ্র! দেবতার ক্রোধ এম্‌নি করেই আসে,—সর্ব্বনাশের আঘাতে দিক্‌-বিদিক্‌ ধ্বসিয়ে দিয়ে। ঠিক এরি উপরে শাস্তার করুণা-দৃষ্টি শিল্পী আশ্চর্য্য কৌশলে, কতকগুলি মুখের ভঙ্গীতে, ফুটিয়ে তুলেছেন।

ধর্ম্মপালের এই মূর্ত্তির জন্য শিল্পীকে যে ফরমাস দিয়েছিল, তার মনে ছিল হয়তো ঠিক শাস্ত্র-মতো অষ্টভুজ ধর্ম্মপাল! শিল্পী ইচ্ছা করলে সেইটুকু মাত্র দিয়েই ক্রেতাকে বিদায় করতে পারতেন ; কিন্তু না, এখানে আশার অতিরিক্ত দান করে তবে শিল্পী ক্ষান্ত হলেন। এ দান কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে দেওয়া নয়, এটা জগৎকে দেওয়া ; এবং এরি জন্য বাস্তব জগতের সঠিক বর্ণনা না হলেও, এই সব ভাবাত্মক-শিল্পের মূল্য নেই বল্লেও চলে।

শিল্প যেখানে ভাবাত্মক নয় সেখানে

সে life-like ; তার প্রমাণ পাচ্ছি কোনার্ক-মন্দিরে শিল্পী যে রাজ-হস্তীটি রচনা করেছেন সেটি দেখে। সেখানে হস্তীটির বিপুল অবয়ব, তার চেয়ে সুবিপুল গাম্ভীর্য্যটি ; —শিল্পী যেন সজীব রাজ-হস্তীটি এনে সেখানে দাঁড় করিয়েছেন! এইখানে ভাবাত্মক-শিল্পের সঙ্গে, দেহের গঠন, মান-পরিমাণ নিয়ে, অনুকৃতি-শিল্পের মস্ত প্রভেদ।

এরি পাশে কোনার্ক-শিল্পের শ্রেষ্ঠরত্ন অরুণের অশ্বটি এনে দেখি। প্রথমেই চোখে পড়বে—ঘোড়ার দেহের অসাধারণ মান-পরিমাণ। এখানে ঘোড়ার অস্থিসংস্থান, মাংসপেশী প্রভৃতির দিকে শিল্পীর কোনো নজর নেই ;—কেবল এটা যে ঘোড়া, হাতি নয় এইটুকুমাত্র! অ্যানাটমি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এটাকে কাঠের ঘোড়া ছাড়া আর কিছুই মনে হবেনা। কিন্তু ভাবের দিক থেকে শিল্পীর অভিপ্রায়টিকে ধরবার চেষ্টা কল্লেই দেখবো যে, এ সেই-ঘোড়া, যে সূর্য্যের আলোক-রথকে বহন করে আনে। এর মধ্যে, অন্ধকারকে অতিক্রম করে আসবার যে তেজ এবং গতিবেগ, সেটি—ঘোড়ার পশ্চাতের পাচুখানি থেকে তার বাঁকা ঘাড় এবং সম্মুখের পাচুখানির তলা পর্য্যন্ত—রেখার একটিমাত্র তরঙ্গে শিল্পী দেখিয়ে দিয়েছেন। ঘোড়ার মধ্যে যে গতি, ঠিক সেই গতিই রয়েছে অরুণ সারথিটিতেও। তার এক পদক্ষেপ থেকে আর-এক পদক্ষেপের মধ্যে বিপুল ব্যবধান। দ্রুতগতিতে অন্ধকারকে অতিক্রম করে অরুণ, সূর্য্যের বিজয়-অশ্বটি বহন করে আনছে। অন্ধকারের উপরে আলোর জয়,—শিল্পীর এই অভিপ্রায়, আর-এক নটরাজের মতো মহান্ ভাবে, এই বাস্তবিক ঘোড়ার সঙ্গে অনেক তফাৎ, অরুণাশ্বটির মধ্যে দিয়ে, আমরা পাচ্ছি।

ইংরাজীতে দুটি কথা আছে—presentation আর representation। ভাবাত্মক-শিল্পের মধ্যে জিনিষটাকে শিল্পী present কচ্ছেন—ভাবকে মূর্ত্তি দিয়ে শিল্পী আমাদের জন্য উপস্থিত কচ্ছেন। আর শিল্প যেখানে represent করা মাত্র, সেখানে শিল্পী তাঁর নিজস্ব কিছু দিচ্ছেন-না ; যা দিচ্ছেন সেটা ইতিহাসের ঘটনামাত্র, কিম্বা এমন কিছু ঘটনা যা আমাদের

কোনার্কের অরুণাশ্ব

নিজের চোখের উপরেই রয়েছে দেখছি, তারি ছবিটি।

আদালতের মকদ্দমায়, ঘটনাগুলো যেমন ঘটেছে বোঝাবার বেলায় খুব বড় ব্যারিষ্টারের দরকার হয় না। কিন্তু কেস্‌টা কেমন করে present করা হবে যখন একথা ওঠে, তখন একজন এমন লোকের প্রয়োজন হয় যার ভাব্‌বার শক্তি, সাধারণ ঘটনাকে অতিক্রম করে একটা নতুন দিক দিয়ে কেস্‌টা দেখতে পারে।

এই যে ঘটনাকে অতিক্রম করে একটা নতুন বড় দিক দেখবার শক্তি, সেইটেই হল শিল্পীর। এছাড়া রূপের অনুরূপ করা, বর্ণের মতো ঠিক বর্ণটি লেখা, এমন কি ঘটনাটার ঠিক-ঠিক ছাপ তুলে নেওয়াকে কৌশল, কারিগরি, চাতুরী প্রভৃতি শব্দকল্পদ্রুমে শিল্পের যে অর্থ দেওয়া আছে তাছাড়া আর কিছু বলা চলেনা।

এখন প্রশ্ন—বাস্তব রূপ ও তার ঠিক-ঠাক্‌ মান-পরিমাণের ব্যতিক্রম না করে শিল্পীর মনোভাব চিত্র করা যায় কি না? আমার মনে হয় যায়না। কেন, তা বলি। বস্তুরূপটি হল স্থির-পদার্থ—স্থিতিশীল; আর ভাব তরল—গতিশীল। ভাবের বদল হচ্ছে, উচ্ছ্বাস রয়েছে—নিবৃত্তি রয়েছে। না-চলাকে না-ভেঙ্গে যেমন চলা ব্যক্ত করা অসম্ভব, তেমনি রূপকে না ভাংলে বা ভঙ্গী দিলে ভাবকে তার মধ্যে পোরা অসম্ভব। ভাবের গতি-অনুসারে কতটা ভাঙা, না-ভাঙা, সেটা শিল্পীর ইচ্ছার উপরে নির্ভর কচ্ছে। সেখানে তাকে এতটা ভাঙো, অতটা নয়, —এ উপদেশ দিতে যাওয়াই ভুল। নটরাজ-মূর্ত্তিতে দেহের সাধারণ-গড়ন শিল্পী কমই ভেঙেছেন, কিন্তু ধর্ম্মপাল-মূর্ত্তিতে দেহ-সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানকে ভেঙে তিনি চুরমার করেছেন। ভাব যে কি মূর্ত্তিতে দেখা দেবে শিল্পীর হাত থেকে, তারও ঠিকানা নেই;—সে মানুষ হয়েও দেখা দিতে পারে, ঘোড়া হয়েও আসতে তার বাধা নেই।

ভাবাত্মক-শিল্প—ভাবের গতি দেখানোই যার উদ্দেশ্য—তাতে শিল্পীকে রূপ-প্রকাশের জন্যে এমন-কিছু বেছে নিতে হয় যেটা গতি ও তরঙ্গ দুই ব্যক্ত করে।

পাহাড়ের নানা পাথর তার বস্তুরূপ। সব পাহাড়ই পাথরের স্তূপ, কিন্তু এক পাহাড়ের রূপের আসল বিভিন্নতাটি ধরা দেয়—পাহাড়ের শিখরে শিখরে যে নানাভাবের রেখাগুলি তরঙ্গিত রয়েছে তারি মধ্যে। এই রেখা-রূপ বা রূপ-রেখাগুলি গতিশীল। এরি সাহায্যে আমরা দেখি কোনো পাহাড় বেগে আকাশ ছাড়িয়ে উঠতে চাচ্ছে, কোনোটা গড়িয়ে পড়ছে, —এমনি নানা ভাব! বস্তুরূপ স্তূপাকার হয়ে পাহাড় হয়েছে সত্য; কিন্তু ঐ অচল তাদের নিজের-নিজের ভাব প্রকাশ করছে এই সচল রেখাগুলি আকাশ-পথে টেনে দিয়ে।

পাহাড়ের কাঠামোটা পিরামিড্‌; মানুষের কাঠামো তেমনি কঙ্কাল। কঙ্কালের রেখা ও রূপ দুইই স্থির; তার ভাবও স্থির। সচল মানুষের মধ্যে সে আপনার স্থির ছাঁদ তার চেয়েও স্থির অট্টহাস নিয়ে বিরাজ করছে। এরি উপরে বিধাতা কেবল

নাকের রেখাটির একটু, চোখের টানটির একটু, আঙুলের রেখার একটু কম-বেশ, —এমনি রেখাকে কোথাও একটু উঠিয়ে, কোথাও একটু গড়িয়ে, এখানে একটু টেনে, ওখানে একটু বাড়িয়ে, সেখানে একটু কমিয়ে রূপকে কি বিচিত্র-ভাবেই জগতে উপস্থিত করেছেন। রেখা। সচল সজীব রেখা ছাড়া, ভাবকে রূপ দেবার এমন জিনিষ শিল্পীর আর কোথা! রেখা চাই রূপকে বাঁধবার জন্য, রেখা

বুদ্ধমূর্ত্তি
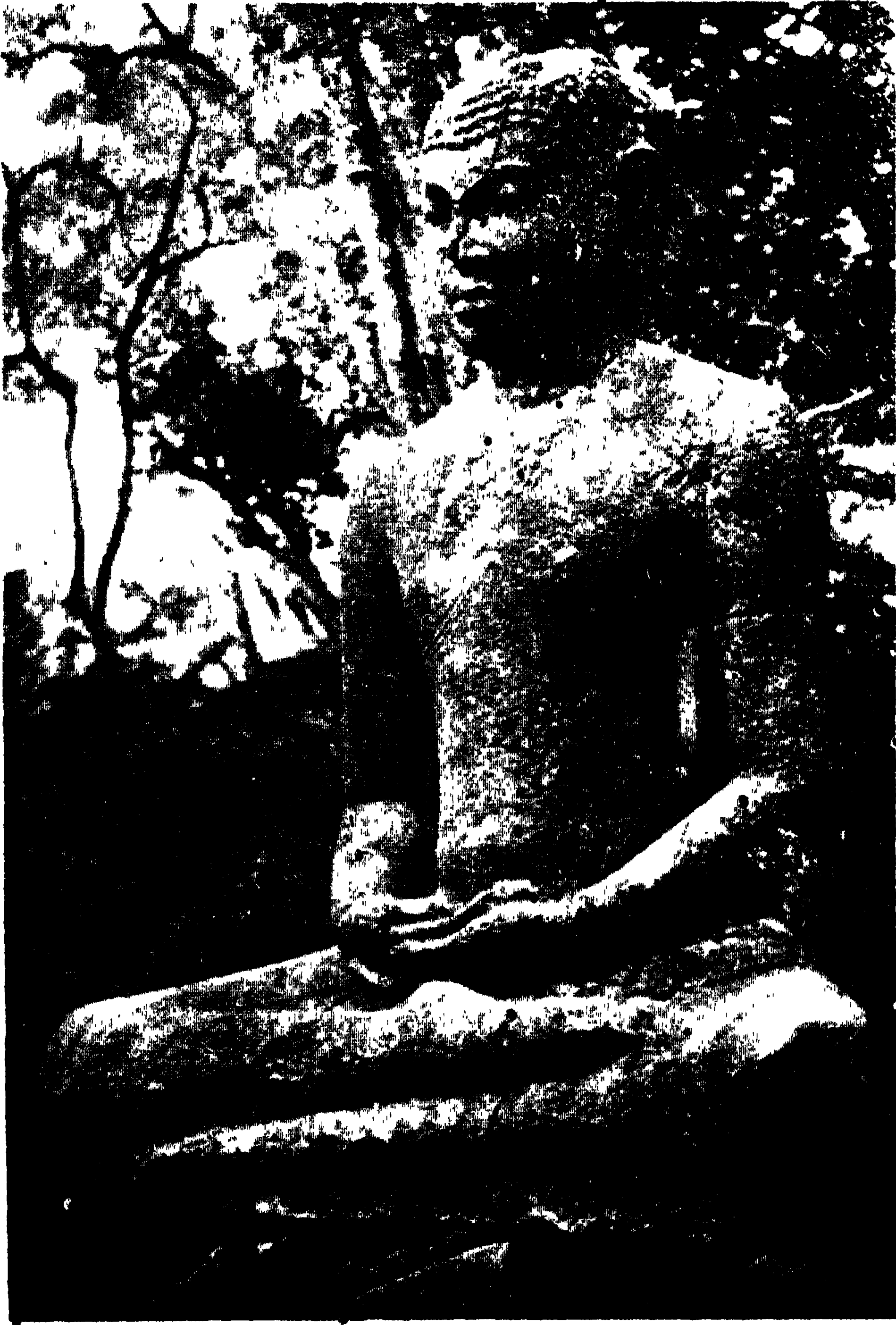
সতী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত

চাই ভাবকে গতি দেবার জন্য, রেখা চাই বর্ণের সঙ্গে রূপ, রূপের সঙ্গে ভাবকে জুড়ে দেবার জন্য।

রঙের ছন্দে ভাব দীপ্তি পায় মাত্র; কিন্তু রেখার ছন্দে সে রূপ পেয়ে—গতি পেয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। ভাবাত্মক-শিল্পমাত্রই রেখার শিল্প।

ইউরোপীয় শিল্প, বস্তুরূপ দিয়ে যীশুখৃষ্টের

মূর্ত্তি ফোটাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু পেরেছে কি? এ সম্বন্ধে একজন ইউরোপীয়ান্‌ই কি বলছেন—

"Think of the curious fact that, after more than eighteen centuries of Christianity, our art has not yet created a single adequate image of its founder; whilst the Buddhist world soon incarnated its ideal Gautam in a form which left us no room for change."

ভাব-রূপকে গোচর করবার শক্তি কেবল-বস্তুর মধ্যে নেই, কিন্তু কেবল-রেখাতে আছে। বুদ্ধের মূর্ত্তিতে বাস্তবিকতা নেই বল্লেও চলে। বুদ্ধের এটি প্রতিকৃতি নয়। বুদ্ধত্বের ভাব-রূপ—চোখ-দুটির নত-রেখায়,

কৈকেয়ী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু-অঙ্কিত

ঠোঁটদুটির আনন্দের একটু তরঙ্গিত টানে,—এখানে সজীব হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমাদের দেশের খুব-এখনকার এই 'সতী'র চিত্র। রেখাগুলি ভাবে সজীব হয়ে এখানে দেখা দিচ্ছে। এখানে রং দিচ্ছে কেবল আগুনের দীপ্তি ও জ্বালা; কিন্তু তারি মধ্যে ভাবযুক্ত-রেখা, করপুটে নির্ভয়ে গভীর আনন্দের সঙ্গে আপনাকে দান করতে উদ্যত রয়েছে দেখছি।

আবার এই শিল্পীর লেখা 'কৈকেয়ী'। পায়ের কাছে সাড়ির পাড় থেকে, বাঁকা ভুরু-দুখানি পর্য্যন্ত,—রেখা এখানে সাপিনীর মতো তর্জ্জন করে উঠেছে, কুটিল বক্রগতিতে রেখাগুলো যেন আপনাকে-আপনি ক্রমাগত দংশন করে চলেছে! কৈকেয়ীর চেহারাটা চিত্রকর দেননি;—কৈকেয়ীর কুটিলতাকেই এখানে রেখা দিয়ে শিল্পী রূপ দিয়েছেন।

ভাবাত্মক-চিত্রে রং বল, আকৃতিই বা বল, ভাবের তারা সাজ। শিল্পী ইচ্ছা করলে যে সাজ পরিয়ে হোক্, ভাবকে উপস্থিত করতে পারেন; কিন্তু রেখা, ভাবকে মূর্ত্তি দেয়, বহন করে;—তাকে সার্থক ক'রে তোলাতেই শিল্পীর ক্ষমতার পরিচয়।

অজন্তা-গুহার চিত্রাবলী। বুদ্ধের জীবনের ঘটনা এখানে দেখানো হয়েছে। শুধু representation-হিসেবে এই চিত্রগুলি থেকে, সে সময়ের আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি-সরঞ্জামগুলিই যে আমাদের চোখে পড়ে তা নয়, প্রত্যেক মানুষটি সেখানে ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অজন্তা-শিল্পীদের রঙের ভাণ্ডার খুব কম,—লাল, নীল, হলুদ, কালো, সাদা। খুব কম-দামের বিলিতি রঙের বাক্সয় যতগুলো রং থাকে, তার সিকিভাগও তাদের ছিল না। তাই নিয়েই তারা ভাবকে ফুটিয়েছে। গুহাগুলির এমন স্থান নেই যেখানে শিল্পীর ভাবনা, ফুলের মতো সৌন্দর্য্যে, সুষমায় ফুটে ওঠেনি। রেখা সেখানে অজন্তা-শিল্পীর একমাত্র নির্ভর হয়ে, কোথাও মৃণালদণ্ড, কোথাও শতদল পদ্ম, কোথাও কিন্নরী, কোথাও অপ্সরী, কোথাও দেবতার আশীর্ব্বাদ, কোথাও-বা মানুষের দুইহাতে প্রেম ভক্তি, চোখে লাস্য আলস্য,—এমনি বিচিত্র-ভাবে ক্রীড়া করছে।

অজন্তার গুটিকতক হাতের ছবি। মানুষের হাতের anatomical drawing এগুলো মোটেই নয়। শুধু রেখা—নানা ভাবে তরঙ্গিত রেখা; এতেই এগুলি সজীব হয়েছে দেখি।

তার পর, অজন্তার সেই কুমার সিদ্ধার্থের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। একটিমাত্র ত্রিভঙ্গ-রেখা। মূর্ত্তিটির পা থেকে কিরীট পর্য্যন্ত একটা বিষণ্ণতা যে ফুটে উঠেছে, তার মূলে রয়েছে ঐ রেখার ছন্দ।

অজন্তার রেখা-শিল্পের আর-একটি অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি—'মা ও মেয়ের' চিত্রখানি। যে শিল্পী ছবিখানি লিখেছেন তাঁর নাম নেই ছবিটিতে। শিল্পে নাম-প্রচার তখন আমাদের মতো এতটা অগ্রসর হয়নি। এই ছবিখানি দেখে মনে হয় না যে ছবি;—একটা যেন কথা, শিল্পীর প্রাণের মধ্যে থেকে এসে এই ছবিখানির রেখাগুলির তারে-তারে বেজে উঠেছে! মা

অজন্তার 'মা ও মেয়ে'

তার ছোট্ট মেয়েটির হাত দিয়ে বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিতে এসেছে—ঘটনাটি এই; কিন্তু শিল্পীর হাতের টান শুধু ঘটনা হয়ে এখানে দেখা দিলে না;—এর বিস্মিত দুই-চোখের টানে, এর সমস্ত দেহটির উন্মুখ-রেখায়—ব্যাকুলভাবে এগিয়ে যাবার ভঙ্গীতে—এর

হাত-দুখানির স্নেহকোমল রেখার মধ্যে দিয়ে সমস্ত ছবিটা যেন এই কথা হ'য়ে দেখা দিয়েছে—

"ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী!
আয়ো যদি চাও, মোরে কিছু দাও, ফিরে আমি দিব তাই।"

সাধারণত ছবিকে হয় বাস্তব ঘটনার, নয় তো শিল্পীর মানস-কল্পনার ছবি (ছাপ) বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু এ ছাড়াও দেখছি শিল্পের উচ্চতম দিক রয়েছে। সেখানে ছবি, সে ছবি নয়,—সে কবির কথা!

—এইখানে একটু গোল বাধবার সম্ভাবনা। ছবি যদি কথাই হল, তবে কথাটা স্পষ্ট ক'রে, বড়-বড় অক্ষরে, সাইন্‌বোর্ডে লিখে দিলেই তো চলতো! এত রেখার টানটোন্, রং এবং সময়ের অপব্যয় ক'রে একখানা ছবির অবতারণা করবার কি দরকার ছিল? কবির কাছ থেকে কথা তো পাচ্ছি, ছবিটা না হয় ছবি হোক্!

এটা আমরা কেমন করে বলি যে, ছবি যে লেখে, সে কেবল ছবি দেবারই চেষ্টা নিয়ে জগতে এসেছে;—কথা-বলবার জন্যে কিম্বা কথা-শোনাবার জন্যে কোনো চেষ্টাই তার থাকা সম্ভব নয়? কবিকে যেমন বলা যায় না—তুমি কেবল কথা দাও, কবিতায় ছবি দেওয়া তোমার কাজ নয়; তেমনি শিল্পীর উপরেও সে হুকুম চলে না। কবি ছন্দের মধ্যে কখনো কথাকে গাঁথেন, কখনো-বা ছবিকেও ফোটান। শিল্পীর দিক থেকেও সেই একই চেষ্টা,—কখনো কথা, কখনো ছবি, শুধু ছবি কখনই নয়—

"তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি!
কে বলে রয়েচ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?"

কবি কথা দিয়ে কথা বলেন; আমাদের সঙ্গে শিল্পী কথা বলেন ছবি দিয়ে। কবি কথাতে লেখেন ছবি, শিল্পী ছবি দিয়ে লেখেন কথা। কেবল উপায়ের প্রভেদ।

তাই বলে' যে-সব রূপ-রেখা শিল্পীর অন্তরের কথা ব্যক্ত করে, তাদের চীনে ভাষার মূর্ত্তিমন্ত অক্ষর, কিম্বা তান্ত্রিকদের মন্ত্রচিহ্নগোছের একটা-কিছু বলা চলেনা।

জোয়ারের জল সরে গেলে বালির উপরে জলের রেখাগুলির ছবি পড়ে যায়। কিন্তু তার মধ্যে জলের পদক্ষেপের ইতি-হাস ছাড়া, প্লাবনের রূপও নেই, জলের কথার কলধ্বনিও নেই! মানুষের পদ-ক্ষেপের ছাপ দেখলে, মানুষটি কিম্বা তার কথা যেমন শোনা হল না, শিল্প যেখানে symbol মাত্র, সেখানে সে অঙ্কশাস্ত্র, অঙ্কন-বিদ্যা নয়।

এই তর্কটার মীমাংসা আমাকে ছবি লিখে একবার করতে হয়েছে। "দেখিবারে আঁখী-পাখী ধায়।"—এই কথাটা শিল্পী যে-উপায়ে কথা বলে সেই-উপায়ে আমাকে বলতে হবে!

আঁখি-পাখীর সন্ধান করে বেড়ালেম; এজগতে তেমন পাখী মিল্লোনা। শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে চীনের অক্ষরের মতো খঞ্জন-নয়নটির দেখা পেলেম। যেমন দেখা অমনি তাকে ধরে' কাগজের দাঁড়ে বসানো! কিন্তু দেখলেম ওড়া তো দূরের কথা, সে নড়েও

আঁখি-পাখী

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

না। যেখানে খঞ্জন-চোখ, তার সাম্‌নে মেঠো রাস্তার মতো আঁকা-বাঁকা রাস্তা দেগে দিলেম, এবং যার আঁখি তার সাম্‌নের চুল, এবং নাসাটিকেও অনেকটা পাখীর ঠোঁটের আকার দিয়ে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু

পাখী উড়লোনা; এবং সে যে আঁখি-পাখী নয়,—মানুষ ও পাখীর আদিপুরুষের কেউ, এইটেই বার-বার প্রমাণ করতে লাগলো। হতাশ হয়ে কাগজ্ থেকে পাখীটাকে রবার ঘষে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায়,

চোখের তারা প্রায় মুছে গিয়ে, শিবনেত্রটি, আঁখি-পাখীকে মনের মধ্যেই যে ধরা সম্ভব সেটা, আমায় বলে দিলে। তখন আমি মনোজগৎ থেকে যে আঁখি-পাখী ধরে এনে বসালেম ছবিতে, সেইটেই যথার্থ কথা বলতে, উড়তে, চলতে, কিছুমাত্র বিলম্ব কল্লেনা। ছবিটা এই—

একটি মেয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে বাইরে উঁকি দিচ্ছে। উঁকি দিচ্ছে, শুধু এই এই কথাটি মাত্র বলতে হলে, জান্‌লার কাছে মুখটি নিয়ে গেলেই আমার ঝঞ্ঝট চুকতো; কিন্তু উঁকি-দেওয়া যে ঘটনাটি তার ছবিতো আমি চাইনি, আমি চেয়েছি "দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়"—এই কথাটি ছবিকে বলাতে। ছবির ধ্বনি নেই যে সেটা সে উচ্চারণ করবে; কিন্তু রেখাক্ষর বর্ণমালার তো তার অভাব নেই! সে রঙের ভাষায় রেখার ছন্দে কথাটি পরিষ্কার উচ্চারণ কল্লে। শুধু তাই নয়, কবির কথায় ছবিটি আমাদের মনে কতকটা অস্ফুট ছিল, ছবিতে, সুস্পষ্ট হল।

প্রথমেই দেয়াল উঠলো—খাঁচার ছোট দরজাটির মতো জালিবদ্ধ একটি ছোট জান্‌লা নিয়ে। এরি মধ্যে খাঁচার পাখীটির মতো, দুই পায়ে নূপুরের বেড়ি-পরা মেয়েটি। খাঁচার পাখী সারাদিন বসে যেমন তার পালকগুলি ধোয়-মোছে, এখানেও মেয়েটি ছোট ঘটে একটুখানি জল, একটি রঙিন কাপড় নিয়ে, সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছিল —আপনারি অঙ্গরাগে। উত্তমেই ছবির এতখানি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তার পরে বাইরের সুর আলো হয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে কি, মেয়েটির পা থেকে মাথা—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রেখা—সচকিত, সজীব, মুখর হয়ে, পাথর ভেঙে, জান্‌লার জাল ঠেলে, বেরিয়ে যাবার জন্য ঝটাপটি করছে; ঐ সুরে তার সমস্ত অঙ্গ, অলঙ্কারের সব বন্ধন কেঁপে-কেঁপে সোনার ডানা মেলে দিয়েছে —আলোয় ঝিক্‌মিক্। এই যে রেখা ও রঙের উচ্ছ্বাস-কম্পন, এরি মধ্যে দিয়ে ছবির কথা, কবির কথার মতো, আমাদের কাছে এসে উচ্চারিত হচ্ছে। কবির কথাটি আসছে তাঁর হাতের লেখার আকারে, কিম্বা কণ্ঠস্বরের মূর্ত্তিতে; আর শিল্পীর কাছ থেকে আসছে তাঁর কথা, তাঁরই হাতের লেখা ছবির আকারে, রঙের সুরে ও রেখার ছন্দে জীবন্ত হয়ে। এই মাত্র প্রভেদ—কবিতায় ও ছবিতে।

এই রূপরেখা, শিল্পীর হাতে, ভাবকে ধরার ফাঁদ। এই রেখার ছাঁদ, ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ছবি হয়ে দেখা দেয়,—কথা হয়েও উপস্থিত হয়। চোখে যেমন রূপ দেখা যায়, প্রাণেও তার কথার সুর তেমনি স্পষ্ট হয়েই বাজে। শুধু রেখা বলতে আমরা যা বুঝি এ তা নয়। শুধু যে লাইন, সে outline মাত্র; সে প্রাচীরের মতো সীমানা নির্দ্দেশ করে। চীনের দেয়ালের মতো, কিম্বা খাতার দুই ছত্রের মধ্যে দপ্তরীর টানা রুলটির মতো, সে সরু-মোটা সব-অবস্থাতেই কঠিন এবং জড়। কিন্তু রূপ-রেখা—সে পাকা ফলের গায়ে, ফোটা ফুলের পাপ্‌ড়িতে, নদীর তরঙ্গে, মেঘের কিনারায় লেগে থাকে। এই রূপ-রেখার সাধনাই হয়েছে প্রাচ্য শিল্পীদের সাধনা। রূপ-রেখার মধ্যে রূপও আছে, রংও আছে

ভাবও আছে,—এই কথাটা প্রাচ্যশিল্প, রেখায়-রেখায় জীবন্ত প্রতিমাগুলির মধ্যে দিয়ে, জগৎকে জানিয়েছেন।

এই রূপ-রেখা আমাদের কাছে যে কতটা তা সাধারণকে বোঝানো অসাধ্য। গাড়ির চাকার গায়ে যে সরু সুতোটা নানা রং দিয়ে টানা থাকে, তাতে লেখবার বাহাদুরী থাকা ছাড়া আর কি আছে? সেটা না-থাকলে হয় তো চাকাখানা দেখায় না ভালো, কিন্তু তার জন্যে চাকার চলার কোনো ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু চাকার চারিদিকের রেখা? কিম্বা চাকাকে ধরে রাখে যে দণ্ডটি? এই একটি গতিশীল, আর-একটি রুলের মত সরল,—এই দুই রেখা যদি যে শিল্পী নয় সে টানে তবে চাকার গোলাকার, এবং দণ্ডের লম্বটি দেখতে ঠিক থাকলেও গাড়ি হয় চলবেনা, নয় তো খুঁড়িয়ে চলবে। চাকার দু-চারখানা কাটি কমও দেওয়া যায়, বেশিও করা চলে—যেমন মূর্ত্তিতে দুখানা হাত বেশি-কমে কিছু আসে-যায় না। কিন্তু চাকার রেখাকে, এবং শিল্পের রূপ-রেখাকে প্রাধান্য দিতেই হবে—যদি শিল্পী কথা চালাতে চান।

এই যে "সুন্দর-মূর্ত্তি"; এতে রং নেই, সবই রূপরেখা। রূপরেখা—সে মূর্ত্তির ডান পাখানিতে শক্ত হয়ে, মাটিতে শিকড় গেড়েছে—গতির লেশমাত্র সেখানে নেই। বাঁ-পাখানি এগিয়েছে, রেখা সেখানে দুলেছে, একটু তরঙ্গ তুলেছে। তারপর ডান-হাত, সেখানে রেখায় পিছন থেকে টান পড়েছে; হাতে মুঠোর রেখাগুলি যেন শক্ত করে কিছু আঁকড়ে রয়েছে;—কেবল দুটি আঙুলের মাঝে একটু ফাঁক, রেখা সেখানে দৃঢ়তাকে শিথিল করেছে—দুই আঙুলের ডগার কোমলতায়। বাঁ-হাতের রেখা সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে—যেন কাকে স্পর্শ করবার জন্যে! সব-উপরে চোখের রেখা-দুটি! তারা নেই, কিন্তু তবু দেখছি চোখ দেখছে—নির্ণিমেষ হয়ে! "সুন্দর-মূর্ত্তি"র বাস্তব-দেহটা কেমন ছিল কেউ দেখেনি; এবং এটা তাও নয়, কেননা এই মূর্ত্তি অন্যরকমও দেখেছি। এটি হচ্ছে

সুন্দর মূর্ত্তি

একটি ভাবের রূপ। "সুন্দর-মূর্ত্তি"র সমস্ত জীবন-কাহিনীর সার মর্ম্ম এটি—

ধনকুবেরের একমাত্র সন্তান, সুন্দর-মূর্ত্তি, শাপভ্রষ্ট শিবানুচর, বিবাহের রাত্রে তরুণ বর! এইটুকু ঘটনা—মাথার চন্দ্রকলা, গলার রত্নমালা—এমনি গোটাকতক চিহ্ন (symbol) দিয়ে সহজে প্রকাশ হল। এর পর ভাবের খেলা। বিবাহের উৎসব-আনন্দের মধ্যে ভুলে রয়েছেন সুন্দর; হৃদয়ের স্বামীকে পূজার অঞ্জলি দেবার জন্যেই যে করপুট, সেই চলেছে সংসারের সুখ-সৌভাগ্য দুই হাতে গ্রহণ করতে—বহন করতে। ঠিক সেই সময় সুন্দরের দেবতা তাঁকে দেখা দিয়েছেন;—দেবতা তাঁর পলাতক দাসকে সংসারের মধ্যে থেকে ফিরে নিতে এসেছেন! এখানে আর সুন্দরমূর্ত্তিকে বাস্তবের মধ্যে কিম্বা symbolএর মধ্যে রাখা গেলনা। নানাদিক থেকে নানাভাবের রেখায় টান পড়লো। ডান-হাতের কাছে সংসারের প্রাণপণ টান; পায়ের রেখা চলেও-চলেনা; হাতেরও মুঠোর রেখাগুলি—সঙ্গী-সঙ্গিনীর হাত, সংসারের দখল—ছেড়েও-ছাড়তে চায়না। সামনে নতুন করে ফিরে-পাওয়া চিরদিনের তৃষাতুর দেহমন সসম্ভ্রমে এগিয়ে চলেছে; নির্নিমেষ দৃষ্টিটি দেবতার দিকে স্থির। রেখা রূপে-রূপে সুন্দরকে সৌন্দর্য্যে স্নান করিয়ে দিয়েছে! শিল্পীর ধ্বনি-হীন রেখার ভাষা এখানে বীণার সুরের চেয়ে কম ঝঙ্কার তুলছেনা; কিন্তু কোনোদিন কানে তা পৌঁছয় না, প্রাণেও তা বাজেনা,—প্রাণ এবং কান দুটোই শিল্পচর্চ্চা থেকে দূরে রাখলে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান

অশ্রুনদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।
নিজের হাতে নিজে বাঁধা,
ঘরে আধা বাইরে আধা
এবার ভাসাই সন্ধ্যা-হাওয়ায় আপনারে।

কাট্‌ল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে।
কথার সে ভার নামারে মন,
নীরব হয়ে শোন্ দেখি শোন্
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্ বীণার তারে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

II সা—া—ঋা। গজ্ঞা-গমা- পজ্ঞা। পা -া -া। -া -া পজ্ঞা II
অ ০ ০ শ্রু ০ ন দীর ০ ০ ০ ০ সু

পা -া -না। ধপা -া -জ্ঞা। গা -া -া। -া -া -া II জ্ঞগা -া -জ্ঞা।
দূ ০ র্ পা ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ ঘাট ০ ০

গজ্ঞা -পা পজ্ঞা। গা -া -ঋা। -সা -া সা II সা -ঋা -া। ঋা -া -া।
দে ০ খা যায় ০ ০ ০ ০ তো মার ০ ০ দ্বা ০ ০

সা -া -া। -া -া -া II
রে ০ ০ ০ ০ ০

I জ্ঞপা -া -া। জ্ঞপা -া গা। পা -া -া। -া -া -া I জ্ঞপা -া -া।
নি ০ ০ জের ০ হা তে ০ ০ ০ ০ ০ নি ০ ০

জ্ঞপা -জ্ঞা পা। ধা -া -া। -া -া -া I পধা -া -া। ধা -পা ধা।
জে ০ বাঁ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ঘ ০ ০ রে ০ আ

I না -া -া। -া -া -া I নর্সা -া র্গা। র্গর্রা -া না। র্সা -া -া।
ধা ০ ০ ০ ০ ০ বা ০ ই রে ০ আ ধা ০ ০

I -া -া -া I র্সা -া -র্গা। র্গর্রা -া না। র্রর্সা -া -া। -া -া -া I
০ ০ ০ এ ০ ০ বার ০ ভা সাই ০ ০ ০ ০ ০

I র্সনা -া -র্রা। র্রর্সা -া না। ধনা -া -ধা। -পা -া -া I
স ০ ০ ন্ধ্যা ০ হাও য়ায় ০ ০ ০ ০ ০

I জ্ঞপা -া -া। পা -জ্ঞা পা। পদা -া -া। -জ্ঞা -া -া II
আ ০ ০ প ০ না রৈ ০ ০ ০ ০ ০

II ঋগা -া -া। ঋগা -া রা। সা -া -া। -া -া -গা I ঋগা -া -া।
কাটু ০ ০ ল ০ বে লা ০ ০ ০ ০ ০ হা ০ ০

I ঋগা -া রা। সা -া -া। -া -া -া I গা -া -পা। পা -জ্ঞা পা।
টের ০ দি নে ০ ০ ০ ০ ০ লো ০ ০ কের ০ কু

ধপা -া -ক্ষা। -গা -া -া I গা -া -ক্ষা। গক্ষা -পা -ক্ষা। গা -া -া। -া -া -া I
পাব ০ ০ ০ ০ ০ রো ০ ঝা ০ কি নে ০ ০ ০ ০ ০

I গপা -া -া। ক্ষপা -া গা। পা -া -া। -া -া -া II ক্ষপা -া -া।
ক ০ ০ থার ০ সে ভার ০ ০ ০ ০ ০ না ০ ০

পা -ক্ষা পা। ধা -া -া। -া -া -া I পধা -া -া। ধা -পা ধা।
মা ০ রে মন ০ ০ ০ ০ ০ নী ০ ০ রব ০ হ

না -া -া। -া -া -া I নর্সা -া -র্গা। র্গর্রা -া -না। র্রর্সা -া -া। -া -া -া I
য়ে ০ ০ ০ ০ ০ শোন্ ০ ০ দে ০ খি শোন্ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -া -র্গা। র্গর্রা -া না। র্রর্সা -া -া। -া -া -া I সনা -া -র্রা।
পা ০ ০ রের ০ হাও যায় ০ ০ ০ ০ ০ গান ০ ০

র্রর্সা -না নধা। ধনা -া -ধা। -পা -া -া I ক্ষপা -া -া। পা -ক্ষা পা।
বা ০ জে কোন্ ০ ০ ০ ০ ০ বী ০ ০ ণার ০ তা

পদা -া -া। -া -া -ক্ষা II II
রে ০ ০ ০ ০ ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিলাসী *

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহার হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে-ছেলেদের সকালে আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়,—চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নীচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া ইস্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগ্য বালকদের মা সরস্বতী খুসি

* জনৈক পল্লীবালকের ডায়েরি হইতে নকল। তাঁর আসল নামটা কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই, নিষেধও আছে। ডাকনামটা না হয় ধরুন, ন্যাড়া।

হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন ভাবিয়া পান না।

তারপরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান,—তাঁদের চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্র লোকেই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দ্দশা হয়না!

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক্, কিন্তু ঐ চার-ক্রোশ-হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্র লোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু সহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক্ এ সকল বাজে কথা। ইস্কুলে যাই,—দু ক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত দু তিন খানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে সুরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁইচি ফল অপর্য্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছের কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া, কার মর্ত্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর পাড়ের খেজুর মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামস্কট্‌কার রাজধানীর নাম কি, এবং সাইবিরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে না সোনা মেলে—এ সকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসৎই মেলেনা।

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্‌লক খাঁ।—এবং, আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে—তার পরে প্রোমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মৎলব করি মাষ্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে যে সে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চির দিন দেখিয়া আসিয়াছি।—তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না; ছিল শুধু গ্রামের এক প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান আর তার মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ী;

আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার একটা কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এম্‌নি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্দ্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত; এবং ভাল করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে সেই দিনই দেখিয়াছি মৃত্যুঞ্জয় ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারো সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ কথাও কোন বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের সহিত দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল মাল-পাড়ার এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়ো বাড়ীতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তাপোষের উপর পরিষ্কার ধপ্‌ধপে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায় বাস্তবিকই যমরাজ চেষ্টার ক্রটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে—বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক্ খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া, ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানীতে জল দিয়া জিয়াইয়া-রাখা বাসি ফুলের মত! হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়া-চাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে!

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে ন্যাড়া?

বলিলাম—হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বোসো।

মেয়েটি ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায় যাহা কহিল তাহার মর্ম্ম এই যে প্রায় দেড় মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে। এবং যদিচ, এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলে মানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে, এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার! দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা কত শুশ্রূষা কত ধৈর্য্য কত রাত-জাগা! সে কত বড় সাহসের কাজ!

কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্য্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্য্যন্ত তোমাকে রেখে আস্‌ব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং, মনে যাই থাক্ প্রত্যুত্তরে শুধু একটা "না" বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল,—বন-জঙ্গলের পথ, একটু দেখে দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য, এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্য্যন্ত মন সরিল না।

২০।২৫ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়। এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময়ই পাইলাম না। কেবলই মনে হইতে লাগিল

একটা মৃত-কল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন! মৃত্যুঞ্জয় ত যে কোন মুহূর্ত্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত! কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত!

এই প্রসঙ্গে, অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি,—বাটীতে ছেলেপুলে চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য বিধবা স্ত্রী, আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে আর তিলার্দ্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? এমনি কত কি। কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলেনা! পাড়ায় খবর দেওয়া চাই,—অনেক জিনিস জোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই যা হবার সেতো হইয়াছে, আর বাহিরে গিয়া কি হইবে? রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক্ কাজ,—তুমি বোসো।

বলিলাম, বসিলে চলিবে না, একবার খবর দিতেই হইবে, বলিয়া পা বাড়াইবা মাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহে, তাঁর মৃত-দেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও স্ত্রীর সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানোও আমার উদ্দেশ্য নহে কিম্বা তাহা খাঁটি নয় এ কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিম্বা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে শুধু কর্ত্তব্য-জ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া এক সঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোন মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর-করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধানই পায়না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয়

যখন কোন নর-নারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক যদি হয় তো হোক্, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া কোন-মতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিম্বা ওই রেলগাড়ীর জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে অত-বড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস দুই আর তার খবরই নাই? তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে এ শুধু সম্ভব নয়, এই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানিনা তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কি না, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিনা। তবে, তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই তখন সে যে বাঁচিয়া আছে, এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে গেল-গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নাল্তের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না—অকাল-কুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক্, তাহার হাতে ভাত পর্য্যন্ত খাইতেছে! গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়! কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ এ কথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়া সকলের মুখেই ঐ এক কথা! অ্যাঁ—এ হইল কি? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাসা দেখিতেছিলেন, কোথা-কার জল কোথায় গিয়া মরে! নহিলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ী লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁর কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে!

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম তাহা মনে করিলে আমি আজিও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নাল্তের মিত্তির বংশের অভি-ভাবক হইয়া, আর আমরা দশবারো জন সঙ্গে চলিলাম, গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়ীতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দার একধারে

রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠি-সোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের 'মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট্ করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া, সেই ভয়ে-মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ সুরু করিলেন। বলা বাহুল্য জগতের কোন খুড়া কোনকালে বোধকরি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এম্নি, যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না; চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েচে জানো!

খুড়া বলিলেন তবেরে! ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীর দর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাতদুটা—এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্ত্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে স্ত্রীলোক দুর্ব্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না! আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা' সে নর-নারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তার পরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল, এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্দ্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

'চলিলাম' বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু, কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্ব্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে, এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভাল কাজ করিতেছি, সেও কিছুতে মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু, আমার কথা থাক্।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না।

বরঞ্চ, বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য্য প্রকাশ করি, যে, শুনিলে আপনারা অবাক্ হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া, অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিত, তা' হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না! আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা,—এতো একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া! হোক্ না সে আড়াই মাসের রুগী, হোক্না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়! ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ! সেতো আর সত্যসত্যই মাপ করা যায় না! তা' নইলে পল্লীগ্রামের লোক সঙ্কীর্ণ-চিত্ত নয়। চার-ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যা যে-সব ছেলের পেটে, তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়! দেবী বীণাপাণির বরে সঙ্কীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!

এই ত ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে অর্দ্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার, এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে! যাই হোক্, ছোটবাবু তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যে, গ্রামের বারওয়ারী পূজা-বাবত দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণদের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদ্ব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাশ দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি, পথে আসিতে আসিতে অনেকেই, দেশের এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত, কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক, তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে, মাসে মাসে এমন সব সদনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন!

কিন্তু যাক্। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া, গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্ম্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারে পূরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কসিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বৎসরখানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবে মাত্র সন্ন্যাসী-গিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ দুই দূরের মাল-পাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি একটা কুটীরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ী, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁথির মালা,—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়! কায়স্থের ছেলে একটা

বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরা-দস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ পুরুষের জাতটা বিসর্জ্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে, মেত্‌রাণী বিবাহ করিয়া মেতর হইয়া গেছে, এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণের ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি-কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভাল কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে,—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে,কোন কালে সে কসাই-ভিন্ন আর-কিছু ছিল! কিন্তু, সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাইত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এম্‌নিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না! যে পল্লীগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে! অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক্! ঝোঁকের মাথায় হয়ত বা অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুস্কিল হইয়াছে, এই যে, আমি কোনমতেই ভুলিতে পারিনা দেশের নব্বই জন নর-নারী ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ, এবং সেই জন্য কিছু একটা আমাদের করা চাইই। যাক্। বলিতেছিলাম যে দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুসি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, তুমি না আগ্‌লালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেল্‌ত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনিলাম পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশঃ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে এ কথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

যাই শুনিলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ ধরার বায়না আছে, এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলে-বেলা হইতেই দুটা জিনিষের উপর আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখ্‌রো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নাম-জাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক! আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ, এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়-বান্দা হইয়া উঠিলাম যে মাসখানেকের মধ্যে আমাকে সাগ্‌রেদ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল, এবং কব্জিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে,

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—
মনসা দেবী আমার মা—
ওলট পালট্ পাতাল-ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে
—দুধরাজ, মণিরাজ!
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে!

ইহার মানে যে কি তাহা আমি জানিনা। কারণ, যিনি এই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন—নিশ্চয়ই কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য-মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু, যতদিন না হইল, ততদিন, সাপ ধরার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হাঁ ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এতবড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু, যে সে ত ভাল-মন্দ কোন কথাই বলিত না। কিন্তু, বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এ সব ভয়ঙ্কর জানোয়ার একটু সাবধানে নাড়া-চাড়া কোরো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলা আমি এমনি অবহেলার সহিত করিতে সুরু করিয়াছিলাম যে সে-সব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে সাপ ধরাও কঠিন নয় এবং ধরা সাপ দুইচারিদিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভাণ করে, ভয় দেখায় কিন্তু কামড়ায় না। মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রী করা,—যা দেখাইবামাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বারকয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপরে তাহাকে শিকড়ই দেখানো হোক আর একটা কাঠিই দেখানো হোক সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখো, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত; সবাই করে—এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুকগে সবাই।

আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছিমিছি লোক ঠকাতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। সাপধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত। আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এম্‌নি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সাম্‌লাইতে পারিত না। আর আমার ত একরকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথাও ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়ী সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্ত্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে,—সে হেঁট হইয়া কয়েক টুক্‌রা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশিও থাকতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখ্‌চ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে?

বিলাসী কহিল, দুইই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই, আমি বল্‌চি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল, এবং মর্ম্মান্তিক ভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখ্‌রো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ—করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা সবাই যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ, সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত্ত হইতে একহাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া, আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল, এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরে আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার ঊর্দ্ধে আর উঠিবে না। এবং, আমার সেই, "বিষহরির আজ্ঞে" মন্ত্রটা সতেজে বারম্বার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে ভিড় জমিয়া গেল, এবং অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে

লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সম্বাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু, মিনিট্ পোনের-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া নাকে কথা কহিতে সুরু করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটীর উপরে একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম, আমার বিষ-হরির দোহাই বুঝি-বা আর খাটে না।

নিকটবর্ত্তী আরও দুই-চারি জন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন, এবং আমরা কখনো বা এক সঙ্গে, কখনো বা আলাদা তেত্রিশ কোটী দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল, ভাল কথায় হইবে না, তখন তিন চার জন রোজা মিলিয়া, বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে, সে, মৃত্যুঞ্জয় ত মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধ ঘণ্টা ধস্তা-ধস্তির পরে, রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক্, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব, যে, সে সাত দিনের বেশি আর বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রহিল, এ সব তুমি আর কখনো কোরোনা।

আমার মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা নয়, এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয় তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয়ই নরকে গিয়াছে। কিন্তু, যেখানেই যাক্, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন, ওইরূপ কোন একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়া মশাই ষোল আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত মৃত্যু হবে ত হবে কার? পুরুষ মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না তাতে ত তেমন আসে যায় না—না হয় একটু নিন্দাই হোতো। কিন্তু, হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মোলো, আমার পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু!

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্ন-পাপ! বাপ্ রে! এর কি আর প্রাশ্চিত্তি আছে!

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটাও

অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায়ই ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু, মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লী-গ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ। তবু এত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাঁহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নর-নারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চির দিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব্ব, পরাজয়ের ব্যথা, কোনটাই, জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাঁহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব্ব-প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ-ব্যাপারটা যাঁহাদের শুধু নিছক contract তা সে যতই কেননা বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী—অক্ষয় সতী-লোক তাঁরা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি, কিন্তু, সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত, শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইঁহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নয়।

এই বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও, মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাঁরা বলিবেন, এই হিন্দু সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলা বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিঁকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়; এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিঁকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব, যে বড় লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রি চোখে-চোখে এবং কোলে-কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু, একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু'এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চিরদিনের দাগা

ও-পার হতে এ-পার পানে খেয়া নৌকো বেয়ে
ভাগ্য নেয়ে
দলে দলে আন্‌চে ছেলে মেয়ে।
সবাই সমান তা'রা
এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপা-ফুলের পারা।
তাহার পরে অন্ধকারে
কোন্ ঘরে সে পৌঁছিয়ে দেয় কারে!
তখন তাদের আরম্ভ হয় নব নব কাহিনী-জাল বোনা—
দুঃখে সুখে দিন মুহূর্ত্ত গোনা!

একে একে তিনটি মেয়ের পরে
শৈল যখন জন্মাল তার বাপের ঘরে
জননী তার লজ্জা পেল; ভাব্‌ল কোথা থেকে
অবাঞ্ছিত কাঙালটারে আন্‌ল ঘরে ডেকে।
বৃষ্টিধারা চাইচে যখন্ চাষী
নাম্‌ল যেন শিলাবৃষ্টিরাশি।

বিনা-দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হ'ল সুরু,
পদে পদে অপরাধের বোঝা হ'ল গুরু
কারণ বিনা যে-অনাদর আপ্‌নি ওঠে জেগে
বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে।
মা তারে কয় "পোড়ার মুখী," শাসন করে বাপ,—
এ কোন্ অভিশাপ
হতভাগী আন্‌লি বয়ে—শুধু কেবল্ বেঁচে-থাকার পাপ

যতই তারা দিত ও'রে গালি
নির্ম্মলারে দেখ্‌ত মলিন্ মাখিয়ে তারে আপন কথার কালী।
নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়,
ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।

আমি বৃদ্ধ ছিনু ওদের প্রতিবেশী।
পাড়ায় কেবল আমার সঙ্গে দুষ্টু মেয়ের ছিল মেশামেশি।
"দাদা" বলে
গলা আমার জড়িয়ে ধরে বস্‌ত আমার কোলে।
নাম শুধালে শৈল আমায় বল্‌ত হাসি হাসি—
"আমার নাম যে দুষ্টু, সর্ব্বনাশী!"
যখন তারে শুধাতেম তার মুখটি তুলে ধরে
"আমি কে'তোর বল্ দেখি ভাই মোরে?"
বল্‌ত "দাদা, তুই যে আমার বর!"—
এম্‌নি করে হাসাহাসি হ'ত পরস্পর।

বিয়ের বয়স হল তবু কোনোমতে হয়না বিয়ে তার—
তাহে বাড়ায় অপরাধের ভার।
অবশেষে বর্ম্মা থেকে পাত্র গেল জুটি।
অল্পদিনের ছুটি;
শুভকর্ম্ম সেরে তাড়াতাড়ি
মেয়েটিরে সঙ্গে নিয়ে রেঙ্গুনে তার দিতে হবে পাড়ি।
শৈলকে যেই বল্‌তে গেলেম হেসে—
"বুড়ো বরকে হেলা করে নবীনকে ভাই, বরণ করলি শেষে?"
অম্‌নি যে তার দু'চোখ গেল ভেসে
ঝর্‌ঝরিয়ে চোখের জলে। আমি বলি, "ছি, ছি,
কেন, শৈল, কাঁদিস মিছিমিছি
করিস্ অমঙ্গল?"
বল্‌তে গিয়ে চক্ষে আমার রাখতে নারি জল।

বাজ্‌ল বিয়ের বাঁশি,
অনাদরের ঘর ছেড়ে হায় বিদায় হল তুষ্টু সর্ব্বনাশী।
যাবার বেলা বলে গেল, "দাদা, তোমার রইল নিমন্ত্রণ,
তিন-সত্যি —যেয়ো যেয়ো !" "যাব, যাব, যাব বৈ কি, বোন !"
আর কিছু না বলে'
আশীর্ব্বাদের মোতির মালা পরিয়ে দিলেম গলে।

চতুর্থ দিন প্রাতে
খবর এল, ইরাবতীর সাগর-মোহানাতে
ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাক্কা খেয়ে !
আবার ভাগ্য নেয়ে
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন্ পারে হায় গেল নৌকো বেয়ে ?
কেন এল কেনই গেল কেইবা তাহা জানে !
নিমন্ত্রণটি রেখে গেল শুধু আমার প্রাণে।
"যাব, যাব, যাব, দিদি, অধিক দেরি নাই,
তিন-সত্যি আছে তোমার, সে কথা কি ভুল্‌তে পারি ভাই ?"
আরো একটি চিহ্ন তাহার রেখে গেছে ঘরে
খবর পেলেম পরে।
গালিয়ে বুকের ব্যথা
লিখে রাখি এইখানে সেই কথা।

দিনের পরে দিন চলে যায়, ওদের বাড়ি যাইনে আমি আর।
নিয়ে আপন একলা প্রাণের ভার
আপন মনে
থাকি আপন কোণে।
হেন কালে একদা মোর ঘরে
সন্ধ্যাবেলায় বাপ এল তার কিসের তরে।
বল্লে, "খুড়ো, একটা কথা আছে,
বলি তোমার কাছে।

শৈল যখন ছোট ছিল, একদা মোর বাক্স খুলে দেখি
হিসাব-লেখা খাতার পরে এ কি
হিজিবিজি কালীর আঁচড় ! মাথায় যেন পড়ল ক্রোধের বাজ !
বোঝা গেল শৈলরি এই কাজ !
মারা ধরা গালি মন্দ কিছুতে তার হয় না কোনো ফল,—
হঠাৎ তখন মনে এল শাস্তির কৌশল।
মানা করে দিলেম তারে
তোমার বাড়ি যাওয়া একেবারে !
সবার চেয়ে কঠিন দণ্ড ! চুপ করে সে রইল বাক্যহীন
বিদ্রোহিনী বিষম ক্রোধে ! অবশেষে বারো দিনের দিন
গরবিণী গর্ব্ব ভেঙে বল্লে এসে, "আমি
আর কখনো করব না দুষ্টামি !"
আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই ক'খানা পাতা
আজ্‌কে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মত।
হিসাবের সেই অঙ্কগুলার সময় হল গত ;—
সে শাস্তি নেই, সে দুষ্টু নেই ;
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগা
শিশু-হাতের আঁচড় 'ক'টি আমার বুকে লাগা !"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক ক্রমবিকাশের তৃতীয় অবস্থা

(ফরাসী হইতে)

ইংলণ্ডে উদারনৈতিকদিগের মধ্যে, অধীন রাজ্যগুলি রক্ষার বিরুদ্ধে যে মনোভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল, এবং তৎপ্রযুক্ত ভারতে যে সকল আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, ইংলণ্ডের "সাম্রাজ্যবুদ্ধি" পরিপুষ্ট হইয়া সেই সকল আশাকে শূন্যে বিলীন করিয়া দিল। এখন আর কোন ভারতবাসী আশা করে না যে, ইংলণ্ড তাহার অধিকৃত প্রাচ্য দেশগুলিকে ছাড়িয়া দিবে। পক্ষান্তরে সার্ব্বজনিক কাজের অভ্যাস, হাকিমী কাজে ভারতবাসীদিগের পদোন্নতি, পার্লেমেণ্টে সদস্য হইবার চেষ্টাদি—এই সমস্ত হইতে, আন্দোলনকারীদিগের একটু বিজ্ঞতা জন্মিল।

অবশ্য, শেষের কংগ্রেস-সভাগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেসের সমস্ত সঙ্কল্প বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু উহাতে অর্থনৈতিক ও আয়ব্যয়-সংক্রান্ত প্রশ্নাদিই বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। ভাষার সংযম, গভর্ণমেণ্টের সহিত অধিক বনিবনাও করিয়া চলা—ইহার দ্বারাই জাতীয় কংগ্রেসের নবযুগের প্রারম্ভ পরিচিহ্নিত।

বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রবর্কার ১৯০০ অব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী, সুতরাং তাঁহাকে উভয়পক্ষের মন রাখিয়া মনোরঞ্জনী ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলেন :—

"ভারত-সরকারের কর্ণধাররূপে আমরা এমন একটি নীতিকুশল শাসনকর্ত্তা পাইয়াছি যাঁহার সম্বন্ধে ন্যায্যত বলা যাইতে পারে,—ভারতের রাজপ্রতিনিধির যাহা হওয়া উচিত, তিনি তাহাই হইবেন—এইরূপ তাঁহার কার্য্য দেখিয়া আশা হইতেছে। একথা বলা বাহুল্য, তিনি লোকের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, এবং লোকেরাও তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। ভারতের প্রদেশে প্রদেশে ভ্রমণের সময় তিনি যেরূপ আগ্রহপূর্ণ অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন, তাঁহাতেই বুঝা যায় তিনি ক্রমেই লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতেছেন। লর্ড কর্জ্জন আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন,—তাহার কারণ, তিনি যে অবধি এখানে আসিয়াছেন তিনি কেবল বস্তু-বিচ্ছিন্ন একটা সূক্ষ্মতত্ত্বের ন্যায় আমাদের মধ্যে নাই, পরন্তু রক্তমাংসবিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রসম্বন্ধে কোন সঙ্কল্পই প্রকাশ করুন কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্বন্ধে বক্তৃতাই করুন,—তিনি লোকদিগকে সাক্ষাৎভাবে সম্বোধন করেন, লোকদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তিনি তাঁহার অধিষ্ঠান, তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার উদ্যমশীলতা সমস্ত ভারতের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছেন" (India, 11 Jan 1901)।

যখন চন্দ্রবর্কার গবর্ণমেণ্টের দোষগুণ

বিচার করেন, তখন তিনি বিদ্রোহোদ্দীপক জন-নেতার ভাষা ব্যবহার করেন না; তাঁহার মতামত, তাঁহার বলিবার ধরণ সমস্তই প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিকের ন্যায়।

"যাহা ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির উপযুক্ত, যাহা মহারাণীর এই বৃহৎ ভারতসাম্রাজ্যের উপযুক্ত—এইরূপ প্রশস্ত উদারভাবে ও দক্ষতা সহকারে এখনো পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট এই সমস্যা-সমাধানে অগ্রসর হন নাই। যাহাকে লর্ড রোজবেরী বলেন 'জোড়া-তাড়ার' নীতি, এই সমস্যা-সমাধানকল্পে গভর্ণমেণ্ট সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার জন্য আমরা যতই দুঃখিত হইনা কেন—ইহাতে বিস্মিত হইবার বিষয় কিছুই নাই। বস্তুতঃ ব্রিটিশ চরিত্রে এমন অনেক জিনিস আছে যাহা প্রশংসনীয় ও যাহা আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করে। 'কেজো' ব্যবহারিক বুদ্ধিই এই চরিত্রের মূলভাব। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দুঃখকষ্টে সহানুভূতি, যে দয়া কাজে প্রকাশ পায়,—যাহার পরিচয় বিগত দুর্ভিক্ষের কার্য্যক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছে—এই সকল গুণ এই চরিত্রের স্থায়ী লক্ষণ। অবস্থার উপর প্রভুত্বও আর একটি লক্ষণ। ব্রিটিশচরিত্রের বলও ইহাই; কিন্তু অনেক সময় যাহা ঘটে—এই বলই কখন কখন দুর্ব্বলতায় পরিণত হয়। যে জাতির বুদ্ধি কেজো ধরণের, যাহারা কোন অসহ্য অহিতকর ব্যাপার চোখের সাম্নে দেখিলে তবেই উত্তেজিত হয় সেই জাতির লোক কোন দুঃখকষ্ট স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিলে, উপেক্ষার ভাবে যেমন চলিতেছে তেমনি চলিতে দেয়। হয়ত একটু দূরদৃষ্টি সহকারে একটু সুব্যবস্থা করিলে সেই সকল দুঃখ-কষ্ট নিবারিত হইতে পারে। ইংলণ্ড ও ভারতে অনেক সময় ইহাই ঘটিয়াছে। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে লর্ড রোজবেরী ইংলণ্ডের শাসনকার্য্যসম্বন্ধে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহা এখন ভারতের পক্ষেও খাটে। তিনি বলিয়াছিলেন :

"আমার মনে হয়, এদেশে—(অর্থাৎ ইংলণ্ডে) "আমরা দিন আনি, দিন খাই" —আমরা কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করি...আমরা বড় অপব্যয় করি। কেবল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করি না বলিয়াই এই অপব্যয় হয়।" (India, 11 Jan. 1901, P. 21)

এক্ষণে, ১৯০১ ও কংগ্রেসের সভাপতি কলিকাতার কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করেন তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিব।

মিঃ ডিন্‌শা এদল্‌জী বাচা কেবল অর্থনৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে যথাযথ তথ্যের প্রতি তেমন দৃষ্টি নাই। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ এই সকল প্রশ্ন তেমন বিজ্ঞতার সহিত আলোচনা করে না। এবং চন্দ্রবর্কারের বক্তৃতার বিপরীতে, বাচার বক্তৃতায় নিন্দাবাদের আধিক্য দেখা যায়।—

"ভারতে বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে—এই যে মত, 'এই মতটি কোন্ বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? যে দেশ ঋণ-গ্রস্ত ও বৈদেশিকের শাসনাধীন, যাহার ঋণ বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং যাহার রপ্তানীর পরিমাণ আমদানী অপেক্ষা

অধিক, সেই ভারতবর্ষ বাণিজ্যে কি কখন সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে? যে দেশে সঞ্চিত অর্থ নাই, সঞ্চয় নাই, ধনসম্পত্তি নাই, যে দেশের কোটি কোটি লোক সামান্য মজুরীতে অতিকষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে দেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে—ইহা দুঃসাহসের কথা। আমরা চাই, দরিদ্র লোকের অবস্থার ক্রমোন্নতি-সাধন—সমৃদ্ধি, জ্ঞানের বিকাশ এবং দাসত্ব মোচন। যতদিন "দূরাবস্থান"-প্রথা (absenteeism) প্রচলিত থাকিবে—যাহা ব্রিটিশ-শাসনের মুখ্য লক্ষণ—ততদিন কোন উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ৩০।৪০ কোটি টাকার দেশীয় দ্রব্যজাত দেশ হইতে অপসারিত হইতেছে—ইহা ফিরিয়া পাইবার কোন আশা নাই—ইহাই জাতীয় সমৃদ্ধির পথে একটা বৃহৎ অন্তরায়। এই বিষয়ে দেশীয় লোকের সম্মতি কখনই গৃহীত হয় নাই, এবং যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহাও অত্যন্ত বেশী। ভারতের পূর্ব্ব-শাসনকর্ত্তারা এই দেশেই বাস করিতেন এবং দেশের লোককে দিয়াই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৮৬০ হইতে ভারত হইতে চলিয়া যায় ৬২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা—ইহা বাদে বেসরকারী সওদাগরদিগের, ও বণিকদিগের লভ্যাংশের কত টাকা ইংলণ্ডে চালান হয়। ইহাই ভারতের দৈন্যদশার প্রকৃত কারণ।"

এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক,—ভারত ইংলণ্ডের নিকট যে টাকার জন্য ঋণী তাহার অধিকাংশই ধার-লওয়া টাকার সুদ। ইংলণ্ডের নিকট টাকা ধার করিয়া ভারতের বন্দর, রেলপথ, রাস্তা, খাল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি নির্ম্মিত হয় এবং বড় বড় দুর্ভিক্ষে সাহায্য করা হয়। যদি ভারতবাসীরা মূল ধনীদের "দূরাবস্থিতি"র জন্য (absenteeism) অভিযোগ করে, তাহা হইলে রুসেরাও ফরাসী মূলধনীদের "দূরাবস্থিতি"র জন্য অভিযোগ করিতে পারে। ভারত খুব কম সুদে টাকা ধার করিয়াছে; এবং ভারত ঐ টাকা খাটাইয়া সর্ব্বতোভাবে লাভবানও হইয়াছে। অবশ্য বিদেশীর নিকট প্রভূত অর্থ ঋণগ্রহণ করিলে দেশের অবস্থা একটু খারাপ হয়, এবং এই জন্যই জাপানীদের আয়ের টাকা জাপানীরা নিজের দেশের মধ্যেই চালাচালি করে। কিন্তু পক্ষান্তরে যে সকল ধার বাস্তবিকই প্রয়োজনীয়, তাহা কি বিদেশীর নিকট হইতে লওয়া হয় না? যেদেশ এতটা সমৃদ্ধ যে তাহার রাজকোষে প্রয়োজনীয় সমস্ত মূলধন সর্ব্বদাই সঞ্চিত থাকে সে দেশে, যে টাকা ধার করা হয় তাহার দ্বারা কেবল যুদ্ধের ও পূর্ত্তকর্ম্মের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় এবং আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবে যে টাকা ঘাটতি পড়ে তাহা পূরণ করা হইয়া থাকে। পূর্ত্তকর্ম্ম আবার অনেক সময় বেসরকারী ব্যক্তিগত উদ্যমের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। তাছাড়া ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি খারাপ হইয়া থাকে, তাহার জন্য বর্ণভেদ প্রথা, ভারতীয় বণিকদিগের কার্য্যপদ্ধতি, এবং ইংরাজী স্কুলে শিক্ষিত হিন্দুদের চারিত্র্যই দায়ী। ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত হিন্দুরা বাণিজ্য ব্যাপারে ও শিল্পকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না, তাহারা কেবল

বিদ্যাসাপেক্ষ (liberal) ব্যবসায়ের জন্য এবং গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর জন্যই চেষ্টা করে।

নিম্নলিখিত উদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝা যাইবে, খুব বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ভারতবাসীরাও অর্থনৈতিক প্রশ্নাদি সম্বন্ধে কতটা ভুল বুঝিয়া থাকে।

রৌপ্য টাকাই ভারতের প্রচলিত আদর্শ মুদ্রা। অতএব রূপার মূল্য হ্রাস হইলে, ভারতের আয়ব্যয়সংক্রান্ত আর্থিক অবস্থা খারাপ হইবারই কথা; কারণ, যে-ইংলণ্ড হইতে ভারত প্রভূত অর্থ ঋণ স্বরূপ লইয়া থাকে; সেই ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রাই প্রচলিত আদর্শ-মুদ্রা। অতএব ভারত-সরকার যদি রূপার মূল্য বাড়াইবার চেষ্টায় রৌপ্য মুদ্রার স্বাধীন মুদ্রণকার্য্য রহিত করিয়া থাকেন, টাকার মূল্য স্থিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন, স্বর্ণমুদ্রাকে আদর্শ মুদ্রা রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে এইসকল চেষ্টা তো প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে হয়।

এখন দেখ, M. Wacha এই চেষ্টা সম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করিয়াছেন :—

"মুদ্রার অপকর্ষ সাধন করায় এবং যে টাকার মূল্য পূর্ব্বে ছিল শুধু ১১ পেন্‌স্, তাহার ১৬ পেন্‌স মূল্য করিয়া দিয়া বাজারে চালাইতে থাকায় বেশ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে কিন্তু সাধু উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় নাই। টাকার কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধি ভারতীয় বাণিজ্যের পক্ষে সমূহ ক্ষতিজনক হইয়াছে। এবং গতবৎসরে এককোটি চল্লিস লক্ষ টাকা মুদ্রিত করা হইয়াছিল; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, ভূতপূর্ব্ব কোষ-সচিব যে বলিয়াছিলেন রূপার অতিপ্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে তাহা ভুল। ভারত-সরকারের অজ্ঞতা ও একগুঁয়েমীর দরুণ ভারতের প্রভূত অনিষ্ট হইয়াছে (১)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১) মুদ্রা-বিনিময়ের ঘাট্‌তিতে ঋণভার বর্দ্ধিত হইবার কথা; এই ঘাট্‌তির টাকা ভারতীয় করদাতারা পরিশোধ করিয়া থাকে; এই সংস্কার সাধনে তাহাদের লাভ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বিনিময়-হারের বৃদ্ধিতে কেবল রপ্তানিওয়ালাকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে; তাহারা টাকার মূল্যে জিনিস খরিদ করে এবং স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে তাহা বিক্রয় করে। কিন্তু স্বয়ং রপ্তানীওয়ালা বিনিময়ের ঘাট্‌তিতে বেশীদিন লাভ করিতে পারে না; বিনিময়ের চাঞ্চল্যে খরিদ্দারেরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। বিনিময়-হারের বৃদ্ধিতে প্রায়ই বাণিজ্যসঙ্কট উপস্থিত হয় (pour le Japan P 449), কিন্তু এই সংস্কারসাধনের দ্বারা পরিশেষে সকল পক্ষেরই লাভ হইয়া থাকে।

ন্যাশানাল কংগ্রেস সম্বন্ধে ইংরেজী সংবাদপত্রের মতামত—

Manchester Guardian (liberal, 28 Dec. 1901)।—এই সপ্তাহে ভারতের ন্যাশানাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। এই কংগ্রেস সম্বন্ধে, প্রায় অর্দ্ধেক ইংরেজী সংবাদপত্রে এত অনিষ্টজনক প্রবন্ধ বাহির হয় যে, এই সময়ে কংগ্রেস কি এবং কংগ্রেস কি কার্য্য করিয়াছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা মন্দ নয়। এই দুই প্রশ্নের যিনি উত্তর দিয়াছেন তিনি একজন আইনব্যবসায়ী, প্রিভিকৌন্সেলের সদস্য এবং বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি। সেই Sir Richard Garth এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন: "ভারত-সরকার ভারতের ন্যাশানাল কংগ্রেসের নিন্দাবাদ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, তাহার সহিত তৎকৃত অন্য অন্যায়ের তুলনা হয় না। ভারতসরকার-পক্ষীয় লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক এই বিষয়ে ইংরেজী সংবাদপত্রদিগের সম্মুখে যেরূপ অপ্রকৃত বা বিকৃত বর্ণনা করিয়াছেন এমন আর কোন বিষয়ে

উদ্বোধন

(কলেজ স্কোয়ারে)

যখন পাঞ্জাবে বসে কলেজে পড়তুম বাঙ্গালীর ডবল কোম্পানী গঠিত হচ্ছে, যখন মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুর্য্যের স্বাক্ষরিত টেলিগ্রাম আমার কাছে আস্‌ত—"আজ এতগুলি বাঙ্গালী ছেলে সৈন্য হয়ে চল্‌ল তাদের লাহোর ষ্টেশনে একটু আদর-অভ্যর্থনা করবেন"—আর যখন দশ পনের দিন বাদে বাদে ৩০টি, ৪০টি, ৫০টি বাঙ্গালী সৈন্য-বেশে ট্রেনে করে লাহোর ষ্টেসনে এসে নাম্‌ত, ষ্টেসনে ট্রেণ থাম্‌তে না থাম্‌তে জানালা থেকে আমাদের দেখ্‌তে পেয়ে তাদের "বন্দেমাতরং" গর্জ্জনে পাঞ্জাব-মেদিনী কম্পিত হয়ে উঠ্‌ত, তখন কি আনন্দে কি গর্ব্বে আমাদের গুটিকত প্রবাসী বঙ্গ নরনারী ও তাঁদের আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী পাঞ্জাবী মিত্রদের হৃদয় স্ফীত হয়ে উঠ্‌ত !

নহে।" কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদীরা বিনা প্রমাণে বলেন যে এই কংগ্রেস, ভারতের কোন জাতির, কোন শ্রেণীর বা কোন ধর্ম্মেরই মুখপাত্র নহে। Sir Richard Garth কষ্ট করিয়া এলাহাবাদ কংগ্রেসের প্রতিনিধি তালিকাটি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এবং এই বিশ্লেষণ হইতে তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন, এই প্রতিনিধিরা বাস্তবিকই লোকের মুখপাত্র "এবং এইসকল প্রতিনিধির বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে—এবং ইহারা অকপট দেশহিতৈষী"; তাহার পর তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, তবে এইসকল লোক এতটা আক্রমণ ও অবমাননার পাত্র কিসে হইল? তাহার উত্তরে তিনি বলেন:—"তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি। তাহারা আপনারা চিন্তা করিতে সাহসী হইয়াছে; আরও অধিক,—ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র ও নিরক্ষর প্রজাদের জন্যও চিন্তা করিতে সাহসী হইয়াছে। এই সকল হতভাগ্য লোকের সাহায্যার্থ তাহারা নিজের স্বার্থ বলিদান করিয়াছে এবং তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টকেও ভয় করে নাই। বহুবৎসরাবধি যে সকল অন্যায় অত্যাচারে আমাদের শাসনকার্য্য কলঙ্কিত এবং যাহা ভারত ও ইংলণ্ডের লোকমত দূষ্য বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে, কিন্তু যাহা ভারতসরকার দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে—উহারা সেই সকল অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে সাহসী হইয়াছে।" Standard (tory, 28 Dec. 1901)—গত বৃহস্পতিবারে কলিকাতায় ন্যাশানাল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিনিধিগণের বাক্‌সংযম দেখিয়া আমরা অতীব আনন্দিত হইয়াছি। যে সকল লোক নিজেরাই প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিল, যাহারা রীতিমত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহে তাহারাই, ভারতীয় লোকের নাম লইয়া, উগ্রভাবে বক্তৃতাদি করিয়াছিল, মুসলমানদিগের সুদৃঢ় প্রতিবাদের ফলে, উহাদের দুরাগ্রহ অনেকটা প্রশমিত হয়। যখন ভারত-সাম্রাজ্যের একটা বড় দল দৃঢ়তা সহকারে আন্দোলনকারীদের পক্ষ ত্যাগ করিল, এমন-কি খুব জোর করিয়া উহাদের মূলসূত্র সমূহের প্রতিবাদ করিতে লাগিল, তখন কংগ্রেসের অত্যুৎসাহী সভ্যেরাও বুঝিতে আরম্ভ করিল যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের দাবী করা নিতান্তই অসঙ্গত ... যদি কংগ্রেস এই প্রকার উদ্ধত বক্তৃতা পরিত্যাগ করে, এবং লর্ড কর্জ্জনকে সাহায্য করিয়াই সন্তুষ্ট হয় (কর্জনের সদভিপ্রায় সম্বন্ধে কংগ্রেস নিজেই স্বীকার করে) তাহা হইলে কংগ্রেস পূর্ব্বেকার নির্ব্বুদ্ধিতা ও ভুলভ্রান্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া দেশের প্রকৃত উপকার সাধন করিতে পারে।—১৯০২ অব্দের কংগ্রেস (আহমেদাবাদ) সভাপতি, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি।

প্রথম যেবার বাঙ্গালী সৈন্যের সাক্ষাৎ দর্শন করলুম, কালের ঘড়ি আমার মনে ১৫ বৎসর পিছিয়ে গেল। যেদিন দুর্গা পূজার মহাষ্টমীতে পিতৃগৃহে বীরাষ্টমী ব্রতের প্রথম অনুষ্ঠান করেছিলুম, বাঙ্গালী ছেলের হাতে ছড়ি ছাড়িয়ে লাঠি ধরিয়ে ছিলুম,—সমগ্র অবিশ্বাসী বাঙ্গলা দেশের প্রতিনিধিদের আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গনে আমন্ত্রণ করে বাঙ্গালীর হাতের ছোরা ও তলোয়ার খেলার নৈপুণ্য দেখিয়ে ছিলুম, শক্তিপূজক বাঙ্গালীকে শুধু ঘটে পটে নয়—অসিতে শক্তির আবাহন করতে লইয়ে ছিলুম—সেই-দিন মনে পড়ল। যে মহাশক্তির প্ররোচনায় আমি এই ব্রতে ব্রতী হয়ে ছিলুম তাঁরই কৃপায় সে ব্রত আজ উদ্‌যাপিত হল অনুভব করলুম। তাই আমার হৃদয় গেয়ে উঠ্‌ল

"দেখেছি সুন্দর শিখ
মরাঠা গোর্খা বীর,
এমন মোহন মূরতি যে নাই সে কোনটির।"

এই বাঙ্গালী সৈন্যেরা আমারই অন্তরের কল্পনা ও সাধনা যেন বাইরে মুর্ত্তিমান হয়ে লাহোরের প্লাটফর্ম্মে উপনীত হয়েছে। ট্রুপ ট্রেণে গাদা গাদা ইংরেজ সৈন্যও লাহোর ষ্টেসনে আনাগোনা করত। দলে দলে গোর্খা এসেও গাঁটরী ঠেসান দিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে বসে থাকত। কিন্তু পাঞ্জাবী শিখ সৈন্যদের—সৎশ্রী অকাল—এই গুঞ্জন ছাড়া আর কোন সম্প্রদায়ের কোন গুঞ্জন—"বন্দেমাতরং" এর মত লাহোর ষ্টেসনকে শব্দায়িত স্তম্ভিত ও আলোড়িত করে তোলেনি।

আমাদের লোকেরা চলৎ ট্রেণে লাফিয়ে উঠে সৈন্যদের কম্পার্টমেন্টে ঢুকে পড়তেন, তারপর ভিন্ন ভিন্ন কম্পার্টমেন্ট থেকে তাঁদের নামিয়ে সারবন্দী করে মালা পরান হত, পাঞ্জাবের শীতকালের প্রত্যুষের কন্‌কনে ঠাণ্ডায় তাঁদের চা পান করিয়ে গরম করে তোলা যেত এবং শেষে তাঁদেরই কম্পার্টমেন্টে আট দশটি গাইয়ে বাঙ্গালী ছেলে মেয়ে যুবকের দল বসিয়ে সঙ্গে-বয়ে-নিয়ে-যাওয়া হার্ম্মোনিয়ম বা বেহালার সঙ্গে তাঁদের বন্দনা-গীতি গেয়ে তাঁদের অন্তরাত্মাটিরও তৃপ্তি ও উৎসাহ সাধন করা যেত।

ডবল কোম্পানী খণ্ডে খণ্ডে নৌশেরায় গেল এবং নৌশেরা থেকে সম্পূর্ণ কম্পানী লাহোর হয়ে—লাহোরে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করে করাচী গেল। তারপরে শোনা গেল বাঙ্গালীর ব্যাটেলিয়ন তৈরি হচ্ছে—শুধু ২২৮ জন সৈন্যতেই শেষ নয়, এই ডবল কোম্পানীটি বঙ্গভূমির একটা hothouse প্রসূন নয়, বাঙ্গালীর জল-মাটিতে সৈন্য-প্রসবিনী স্বাভাবিক শক্তি আছে এবার তা প্রতিপন্ন হবে। শুধু ব্যাটেলিয়ন নয়, রেজিমেণ্ট তৈরি হচ্ছে—এবার বঙ্গজীবনে নতুন গণিত শিক্ষা হবে, কটা মানুষে একটা কম্পানি, কটা কম্পানিতে একটা ব্যাটেলিয়ন এবং কটা ব্যাটেলিয়নে একটা রেজিমেণ্ট হয় হাতে-কলমে সে নতুন নামতা অভ্যেস হবে।

এবার বড় আশা নিয়ে মাতৃভূমি বঙ্গভূমিতে এলাম। বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট দেখব। বাঙ্গালী সৈন্যের ধারাবাহিকতা চল্‌তে থাকবে, ফুলষ্টপ কোথাও পড়বে না। নিন্দুকদের মুখ বন্ধ হবে। যেমন কেরাণী-গিরি, যেমন স্কুল-মাষ্টারি, যেমন মুন্সেফী

যেমন ওকালতি, যেমন জজিয়তি, যেমন দালালি দোকানদারি, তেমনি এও একটা পেশা বাঙ্গালীর পক্ষে খুলে গেল। যেমন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, জমিদার সিভিলিয়ান, ব্যারিষ্টার ব্যাপারী সবই আছে—অথচ সৈন্যও আছে; ধড়খানা আছে, মাথাটা আছে, আবার সেই মাথাটা বাঁচাবার প্রয়োজনকল্পে নিজের হাতখানাও তৈরি আছে, পরের হাতের প্রত্যাশা রাখতে হয় না—তেমনি বিধির অনুগ্রহে বাঙ্গালীরও এতদিনে সেই শুভদিন আবার ফিরে এল।

কিন্তু এসে দেখি রেজিমেণ্টাল অঙ্কের কোটা এখনও অপূর্ণ। রেজিমেণ্ট পূরো করতে দুশো লোক এখনও চাই—আঠার-শ হয়েছে, শেষ দুশো ভরাতে নাকি প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হচ্ছে। কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং।

মনুষ্যত্ব জিনিষটি কি? বুদ্ধি বৃত্তির স্ফূরণ একটা মস্ত মনুষ্যত্ব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংরেজ-আমলের বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে ভারতবর্ষের অনেক জাতিকে পিছনে রেখেছেন বলে আমরা গর্ব্ব করি। কিন্তু বুদ্ধি-চর্চ্চা যদি শুধু পুঁথিগত হয়, বই পড়ায় ও বই লেখায় হয়, কার্য্যে ও সাধনায় না হয় তবে তাকে বামনে-বুদ্ধি, পণ্ডিতি-বুদ্ধি, বা পণ্ডিত-মূর্খতা বলা যায়। পণ্ডিত-মুর্খের নানারকম গল্প তোমরা শুনেছ কিন্তু আয়নায় মুখ মিলিয়ে দেখনি সে গল্পগুলি নিজেদের মুখেরই প্রতিবিম্ব কি না। বাঙ্গলা দেশকে ইংরেজ-যুগে পণ্ডিতমুর্খ করে রাখা হয়েছে। পরশুরাম ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করে ছিলেন—ব্রিটিশরাজ বঙ্গদেশকে নিঃক্ষত্রিয় করেছেন। বাঙ্গালীর প্রতি এই মহা অধর্ম্ম আচরণ হয়েছে। বাঙ্গালীকে এমন একটা পড়া গাঁজা ধরান হয়েছে যাতে করে সে বার্কি সব কর্ম্মিষ্ঠ উদ্যমী জাতকে 'ছাতু-খোর' 'মেড়ো' প্রতি খেতাব দিয়ে আত্ম-প্রসাদ লাভ করছে। পাঞ্জাবী, রাজপুত, মারাটী, নেপালী এরা সব হল sword hands of India—আর তোমরা বাঙ্গালীরা কি! না, পণ্ডিত, অর্থাৎ আত্মরক্ষায় একেবারে অসমর্থ। শুনি নাকি তোমাদের অক্ষমতা এতদূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে যে অন্ধকারে ঘরে চোর ঢুকেছে সন্দেহ হলে ভয়ে ভয়ে স্ত্রীকে টেনে বল "পিদিমটা জ্বালা।"

যদি তোমাদের মেয়ে-বৌকে রাস্তায় ঘাটে কেউ অপমান করে চুপ মেরে বসে বা লুকিয়ে অপমানটি হজম কর, বড় জোর দশ জনের পরামর্শে তার পরদিন কাছারীতে অপমানকারীর নামে মকদ্দমা কর। নিজের হাতে. নিজের স্ত্রী-কন্যার অপমানের শোধ নেবার পৌরুষ তোমাদের নেই—তাই বল, "পথে নারী বিবর্জিতা।" জীবনের রাজপথে বেরোবার পাথেয় যার নেই, যার অন্তরের গুপ্তির ভিতর আবশ্যকের সময় বের করার জন্যে তেজোরূপী অস্ত্র লুকান নেই, তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দোর বন্ধ করে অষ্টপ্রহর ঘরে বসে থাকাই শ্রেয়। মুক্ত বায়ু, উদার আকাশ, জীবন-মেলার শতধারে প্রবাহিত শতপথের আনন্দ—যাত্রীদের সঙ্গ তাদের জন্যে নয়। তারা ঘরের কোণে বসে বসে বই পড়ে পড়ে ডিস্‌পেপ্সিয়া, ডায়াবেটিস্ আর যক্ষা দিয়েই মানবলীলা সম্পন্ন করুক। জীবনের

যত কিছু রস তা ভারতের বাকী জাতিরা উপভোগ করুক—আর বাঙ্গালীরা শুধু দিস্তে দিস্তে কাগজ চিবিয়ে জিহ্বা লেলায়িত করুক, জীবনের সাধ কাগজে মেটাক।

'কিন্তু এখনও ত একেবারে রসাতলে যাওনি? এখনও ত কিছু মনুষ্যত্ব বাকী আছে। তোমাদের lucid momentsএ বুঝতে ত পার মনুষ্যত্ব জিনিষটা শুধু পড়ায় নয়, শুধু ভোগে নয়, শুধু সহজ-সাধ্যতায় নয়। এই যে তোমরা দলে দলে আজকাল দুদিন Convocationএ Cap ও gown পরে ডিগ্রি আর মেডেল নিয়ে এলে, এই ক হাজার ছেলের মধ্যে ক'শো ছেলেরও মনে military medal বা Victoria cross নেবার সখ চড়ে না'?

জ্ঞানবুদ্ধির চর্চা মুনি-ঋষিরাও করতেন। তাঁদের বুদ্ধিচর্চ্চার ফলেই আর্য্যসমাজে বর্ণাশ্রম বিভাগ হয়েছিল। কোনও মনুষ্য-সমাজে কেবলমাত্র এক বর্ণের স্থান নেই; তাতে সমাজ অচল হয়, পরস্পরের প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারজাতই চাই। আপনার আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে কে কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করবে স্থির করে নাও। অন্য-জাতের কি কথা, জাত-বামুনের ছেলেও একালে সবরকম অব্রাহ্মণ্য পেসায় নিযুক্ত হচ্ছ। তবে এই ত্রিশকোটি বাঙ্গালীর মধ্যে ক্ষাত্রস্বভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্রের ছেলেরা এই নিঃক্ষত্রিয় বঙ্গভূমিতে নতুন ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত কেন হবেনা? পরশুরাম ব্রাহ্মণশূন্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নূতন ব্রাহ্মণ জাতি সৃজন করেছিলেন বলে কিম্বদন্তী আছে। *তিলক গোখ্‌লে প্রভৃতি চিৎপাবন শ্রেণীস্থ* মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের কৃত ব্রাহ্মণ বলে শুনা যায়। আজ য়ুরোপীয় মহাসমরের যুগে ব্রিটিশ-রাজের অনুগ্রহে বাঙ্গলায় নূতন ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি কেন হবে না?

বাঙ্গালীর ধড়ে বীরত্ব নেই, বাঙ্গালীর শরীরে সাহস নেই, বাঙ্গালীর প্রাণে কষ্ট-সহিষ্ণুতা নেই, বাঙ্গালীর আত্মমর্য্যাদা নেই, আত্মসম্মান-বোধ নেই এ কলঙ্ক ক্ষালন কর। ত্রিশকোটির মধ্যে দুশো-আটাশ জনের সৈনিকবৃত্তিতে দেশের ক্ষাত্র তেজ পরিস্ফুট হয় না—দু হাজারেও হয় না। এই দু হাজারের ধারাবাহিকতায় হয়। লড়ায়ে যাচ্ছে আস্‌ছে, মর্‌ছে, ফির্‌ছে, আবার যাচ্ছে, আরও যাচ্ছে—এই রকমেতে হয়।

কে যাবে তোমরা? দু হাজার সংখ্যা এখনও পূরো হয়-নি—এখনও দুশো বাকী। কি লজ্জার কথা! এই তোমাদের বুদ্ধি-চর্চ্চার ফল? বুদ্ধি দিয়ে যেটা উচিত জান কাজে সেটা করে উঠতে পার না! এমন নিষ্কর্ম্মা সাধনাহীন বুদ্ধি? শুধু এগ্‌জামিন পাশ করা passive বুদ্ধি, নিজেকে মানুষ করার active বুদ্ধি নয়! আর এই বুদ্ধির গর্ব্বে বাকী বীর জাতিদের এক-একটা মানুষের মত মানুষকে ছাতুখোর বলে উড়িয়ে দাও? জেনো তারা তোমাদের চেয়ে ঢের বুদ্ধিমান। তারা ইংরেজ-সেনানী-ভুক্ত হয়ে জগতে ভারত-শক্তি উদ্দীপিত রেখে দিয়েছে। তোমরা বঙ্গের বঙ্গশক্তিকে খনিয়ে তোল,—ভারত-সৈন্যের পাশাপাশি বঙ্গসৈন্য হয়ে গিয়ে দাঁড়াও। দুর্ব্বল হাতে অস্ত্রধারণের বল ও কৌশল আয়ত্ত কর।

যে গুরুরা এতদিন তোমাদের য়ুনির্ভার্সিটির পাঠ্য, পরীক্ষা ও পাশের অগুরু-চন্দন-চুয়ায় ভুলিয়ে রেখেছিলেন তাঁরাই আজ মহা-শক্তির প্রেরণায় তোমাদের মানুষ হতে সাধাসাধি করছেন। তাঁদের উপর অভিমান করে নিজের ক্ষতি কোরোনা। এখনও সময় আছে, এখনও মানুষ হও।

শোনা যায় নাকি বাঙ্গালী বাপেরাই বাঙ্গালী ছেলেদের যুদ্ধে যাওয়ার অন্তরায়? তাই যে সব ছেলেরা যাচ্ছে তারা লুকিয়ে চুরিয়ে সেনাদলে ভর্ত্তি হচ্ছে, সভাস্থলে প্রকাশ্যে কেউ উঠে এসে নাম দাখিল কর্ত্তে পারে না!

শোন ভাই বাঙ্গালী পিতারা! গুরু গোবিন্দ সিং বলে একজন পাঞ্জাবী মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে লড়ছিলেন। তাঁর তিন তিন ছেলে তাঁর সঙ্গে ছিল। ১১ বৎসরের কনিষ্ঠ ছেলে যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ব্বে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে বল্লে—"পিতাজি, এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর, আমি একটু জল খেয়ে যাই, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে!"

গোবিন্দ সিং পুত্রের মুখ চুম্বন করে বল্লেন—"বৎস, পার্থিব জলের সময় নেই, সমর-প্রাঙ্গণে তোমার জন্যে দেবতারা অমৃতবারি নিয়ে অপেক্ষা করছেন—তাঁদের কাছে শীঘ্র যাও।"

যে রক্তমাংসের শরীরে গোবিন্দ সিং গঠিত ছিলেন, সেই রক্ত-মাংসের শরীরে বঙ্গপিতারা গঠিত। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের ভিতরে যে আত্মার শক্তি কার্য্য করছিল সে আত্মা বঙ্গপিতাদের দেহে কোথায় লুক্কায়িত? সে আত্মাকে জাগ্রত কর, আত্মশক্তির উদ্বোধন কর। আত্মানং বিদ্ধি।

৬ই মার্চ্চ ১৯১৮ শ্রীসরলা দেবী।

লুকোনো ছবি

সেই কিশোরীর হাসির আলো খুঁজছি কাঁচা বয়েস থেকে,
উর্ব্বশী বা তিলোত্তমা হিংসে গো যাঁর রূপটি দেখে—
ভালবাসার বুলবুলিটি দিয়ে গেল উড়ো চিঠি,
গো এক রঙীন্ ফাগুণ বিহান—হাস্‌ছ তুমি রঙ্গ দেখে?

মন যে আবার সবুজ হয়ে উঠ্‌ল গো তার খবর পেয়ে,
সরম-গুটির রেশ্‌মী শাড়ী মিশিয়ে আছে তার সে স্নেহে;
সূক্ষ্ম হিসাব করলে দেখি আস্‌ছ তুমি চালিয়ে মেকি—
শপথ ক'রেই বল্‌তে পারি সুন্দরী সে সবার চেয়ে।

আজও প্রিয়ে বুকের ভিতর রসের উজান বয় চলে,
তারই খোঁপার পাপ্ড়ি চাঁপার ঝর্‌ছে প্রাণের রঙ্‌মহলে,
কণ্ঠ তাহার কি যে মিঠে, ছিটার আনার-দানার ছিটে,
নট্‌কানো রঙ্‌ আঁচল ফুটে রূপ-দরিয়া পড়্‌ছে ঢলে।

নিন্দে কেবল কর্‌বে তুমি, বল্‌বে নিলাজ প্রগল্‌ভা সে,
হার মানে তার রূপের দেমাক্‌ সাঁচ্চা তোমার প্রেমের পাশে,
ও সব কথা নিক্তি ধরে' দেখতে কে যায় ওজন করে'
তুমি যে মোর ভরা ভাদর, ফাগুন মাসের দক্ষিণা সে।

ও কি সখি রাগ করিলে? কিন্তু সে মোর রাগ করে না,
সে যে আমার আঙুর মধু, অনুরাগের হাস্‌নুহেনা।
তোমার মত নয় সে মোটে, যাচ্চ তুমি বেজায় চটে',
বল্‌লাম আমি তার নিকটেই চুকিয়ে তোমার পাওনাদেনা।

"ঢঙ্‌ দেখে আর বাঁচিনে গো, সঙ্‌ সেজেছেন বুড়ো হয়ে,"
চোখ ঘুরায়ে কহেন প্রিয়া—"একেবারে গেছ ব'য়ে,
চল্লিশেতে চাল্‌শে ধরা, ঝাপ্‌সা চোখে চশ্‌মা পরা,
যৌবনেরই লক্ষণ এসব, পড়্‌তে পার প্রেমের মোহে।

বারেক শুধু দেখাও তোমার পোড়ার-মুখী কল্পনাকে,
বলিহারি পছন্দ তাঁর করতে পেয়ার চান তোমাকে?
মর্‌তে কি তার জায়গা নেই আর, প্রেম 'করা বা'র করব গো তার,
বুড়ো-খুকী দেয়ালা করেন, মন মজেছে গোঁফের পাকে।"

জবাব দিলাম-"ফটো যে তার রয়েছে মোর ডেক্‌সটিতেই,
সে যে তোমার সতীন প্রিয়ে, সে মুখ তোমার দেখ্‌তে তো নেই।"
যেম্‌নি ফটোর খবর পাওয়া, উল্কা সমান করেন ধাওয়া,
ডেক্‌স ফেরাজ ফেলেন খুলে—রিং-টি ছিল অঞ্চলেতেই।

তবু সহেনা, ছড়িয়ে ছিঁড়ে চিঠির তাড়া, কাগজ, ছবি
ঘরের মেঝেয় উলট-পালট, একসা করে' ফেলেন সবই।
আল্‌গা খোঁপা গেছে ক্ষেপে, মুক্তাদাঁতে অধর চেপে,
খোঁজেন ফটো—কইনু-ওগো—"সইতে নারি বেয়াদবি।"

"দিচ্ছি আর্শি বাহির করে' ওই জাপানী ব্রাস থেকে
মুণ্ডু ঘুরে যাবে এখন, তার সে চোখের ভঙ্গি দেখে,
ডালার তলেই আছে আঁটা, সেই তোমারি সতীন-কাঁটা,
মন যে আমার করলে দখল কনকচাঁপার রঙটি মেখে।"

দেখেন ডালার উল্টাপিঠে প্রেয়সী তাঁর নিজের মুখ,
উঠ্‌ল ফুটে আর্শীটিতে রূপের আলোর গুমরটুক্।
জল-জমা সেই চোখের পাতায় অভিমানের মুক্তালতায়
অপরূপ এক ধব্‌ল শোভা অশ্রুমাখা হাসির সুখ।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

মাসিকপত্রে কবিতা

বাংলা মাসিক পত্রগুলিতে যে সকল কবিতা বাহির হয়, তাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য থাকে না, কারণ বলিবার মত বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রায়ই যে সব কবিতার নমুনা পাই তাহাদিগকে কবিতা না বলিয়া কবিতার 'এক্‌সেসাইজ' বলিলেই ভাল হয়।

শুনিয়াছি জীবতত্ত্ববিদের পরীক্ষাগারে বহুকাল ধরিয়া জীবকোষ তৈরির চেষ্টা চলিতেছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা জীবকোষ যে যে উপাদানের দ্বারা গঠিত, তার যথাযথ পরিমাণ সমস্তই পাওয়া গেছে। সেই সেই পরিমাণ রক্ষা করিয়া উপাদান-গুলিকে ঘুঁটিয়া দেখা যায় যে এক রকমের কৃত্রিম জীবকোষ করা যায় বটে, কিন্তু তাতে প্রাণের স্পন্দনটা কোনমতেই জাগানো যায় না। তা যদি যাইত, তবে ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রাণ-তৈরির ফরমাস চলিত।

অ-কবির কবিতা এবং কবির কবিতার মধ্যে এই তফাৎ। অ-কবির কবিতাতে মাল-মসলা ঠিক আছে, কিন্তু প্রাণের সাড়া নাই। কবির কবিতাতে প্রাণ স্পন্দিত, বলিয়া মাল-মসলার খোঁজ নেওয়ার বড় একটা প্রয়োজন হয় না।

প্রাণ জিনিসটা ফরমাসের জিনিস নয়। প্রাণ হইতেই প্রাণের উদ্ভব। যে কবির মধ্যে প্রাণের আবেগ স্বত-উচ্ছ্বসিত, তাঁর রচনার মধ্যেই নব নব সঙ্গাতের বেগ স্বত-স্ফূর্ত। ঐ আবেগ জিনিসটাকে আমরা রস বলি—অথচ রস শুধু আবেগের মধ্যে নাই—আবেগ যখন ভাষায় ও ছন্দে সমূর্ত্ত ও সবেগ হইয়া দেখা দেয়, তখনই আমরা

রস অনুভব করি। কেননা 'রস মানে আস্বাদন। ভাব রূপ পরিগ্রহ না করিলে আস্বাদন জন্মিবে কি উপায়ে?

আমাদের শরীরের পক্ষে নাইট্রোজেনের দরকার। হাওয়ার মধ্যে নাইট্রোজেন যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু সে নাইট্রোজেন আমাদের রসনার গ্রাহ্য নয়। যে বস্তুর রস বা আস্বাদ আছে তাকেই রসনা গ্রহণ করে। রসগোল্লার মধ্যেও নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেটা রস রূপেই আছে। তার স্বাদ আছে।

কোন ভাব বা আইডিয়া কিম্বা কোন হৃদয়াবেগ বা ইমোসন্ ঐ আকাশের নাইট্রোজেনের মত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা রসমূর্ত্তি গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার স্বাদই নাই।

রসনার দ্বারা উপভোগ্য খাদ্যরসের সঙ্গে মনের দ্বারা উপভোগ্য কাব্যরসের তুলনা চলে। খাদ্যরসের মধ্যে যেমন শরীরের স্বধর্ম্ম থাকা চাই, কেননা খাদ্যকে শরীর হইতে হইবে—কাব্যরসের মধ্যে তেমনি মনের স্বধর্ম্ম থাকা চাই, কেননা কাব্যকে মননপূর্ণ অর্থাৎ জীবনপূর্ণ হইতে হইবে। এই মনন-ধর্ম্মটার অভাববশতই অনেক কাব্যই আমাদের ভোগে লাগে না। তারা ল্যাবরেটরিতে তৈরি জীবকোষের মত—তাদের মধ্যে আছে সবই, কেবল জীবনটুকুই নাই।

"বিজয়ী"

চৈত্রের "প্রবাসী"তে রবীন্দ্রনাথের "বিজয়ী" কবিতা বাহির হইয়াছে। এটি 'বিধুর' ছন্দে লেখা—ইংরাজীতে যাকে বলে free verse—সুতরাং অনভ্যস্ত পাঠকদের পক্ষে এ কবিতা ঠিকমত পড়া বিষম মুস্কিলেরই ব্যাপার।

জীবনের ছন্দটা সম-ছন্দ নয়, সেটা সম-অসম-ছন্দের দ্বন্দ্বে দোলানো বিষম-ছন্দই বটে। সঙ্গীতশাস্ত্রে শুধু সুরের খেলায় হয় 'মেলডি'; কিন্তু সুর-বেসুরের সঙ্গতিতে তৈরি হয় 'হার্ম্মণি'। সেই হার্ম্মণিই পূর্ণতর সঙ্গীত। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রই বলি আর কাব্যশাস্ত্রই বলি, জীবন-মহাশাস্ত্রেরই তারা ভাষ্য বইত নয়। সুতরাং জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্বের সুর যদি কাব্যে ফোটান দরকার হয়, তবে তাতো কোনমতেই একটানা সুর হইতেই পারে না—তার মধ্যেও কতক সুর কতক বেসুর দেখা দিবেই। সেই জন্য তার ছন্দটাও সম-ছন্দ না হইয়া ক্রমশঃ বিষম-ছন্দ হইবেই।

Blank verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই বিষম ছন্দেরই নমুনা। সেই জন্য বড় বড় এপিক-কাব্যে তার স্থান হইয়াছে। তার বিচিত্র দোল; তার বিরাম-যতির সংস্থানও বিচিত্র। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দটাকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলেই ইহা টের পাওয়া যাইবে।

ওয়াল্ট হুইটম্যান যখন বলিলেন যে, তিনি

"Life immense in passion,
pulse and power"এর গান

গাহিবেন, তখন তাঁকেও জীবনের ছন্দের সন্ধান করিতে গিয়া মিলকে বাদ দিয়া অমিলেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তিনি গদ্যে কাব্য লিখিলেন বটে কিন্তু সে গদ্য ছন্দোময় গদ্য (rhythmic prose)।

তাহা অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই আর এক সংস্করণ।

Tears ! | Tears ! | Tears ! |
In the night, | in solitude, | tears, |
On the white shore | dripping, |
dripping, | suck'd in | by the sand, |
ইত্যাদি।

এ এক রকম বৈদিক ছন্দের মত উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ছন্দের বিচিত্র উত্থান-পতন-মালায় গ্রথিত।

হুইটম্যানের ছন্দের কান খুব সূক্ষ্ম ছিল বলা যায় না; তাঁর রচনায় পৃথিবীর আদি-যুগের নানা যৌগিক ধাতুর স্তরের মত স্তর-ভেদ আছে—তাহা কোথাও কঠিন, কোথাও তরল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে যেমন পদ্যাংশকে গদ্যাংশ হইতে তফাৎ করা যায়, তেমনি হুইট্‌ম্যানের কাব্যেরও বিপুল গদ্যাংশকে স্বল্প পদ্যাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখানো সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি এই ছন্দোময় গদ্যের উৎকর্ষ দেখাইয়াছে। কিন্তু ইহাকে ছন্দোময় গদ্য আর বলা চলে না—ইহাও এক ধরণের পদ্যই বটে। কেন না রীতিমত গদ্যের মধ্যেও এক রকমের বড়-গোছের ছন্দ থাকে—সে ছন্দ পদ্যের ছন্দ নয়। অর্থাৎ তার পদক্ষেপ গণনা করা শক্ত। সেণ্টস্‌বারি গদ্যের সেই ছন্দের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

কিন্তু মিল রাখিয়া বিষম ছন্দে লেখার রীতি এই ধরণের গদ্য-পদ্য লেখার রীতি হইতে স্বতন্ত্র। আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে Browneএর কবিতায় এই সমিল বিষম ছন্দ দেখিয়াছি। বিস্তর কবি এই free verseএ রচনা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'তে এই ছন্দেরই উদ্ভাবন ঘটিয়াছে। এ ছন্দ পড়া শক্ত; এ ছন্দ লেখা আরও শক্ত। আনাড়ির হাতে এ বিষম ছন্দের এক্‌সেসাইজ্‌ বিষম দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতে পারে। কেননা এ ছন্দের নিয়ম কি তাহা না জানিলে এ ছন্দের ব্যবহার উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে। এ ছন্দের আপাত অনিয়মের মধ্যেও নিয়ম আছে।

"তখন তারা। দৃপ্তবেগের। বিজয়-রথে।
ছুটেছিল বীর। মত্ত অধীর, । রক্তধূলির।
পথ-বিপথে।
তখন তাদের। চতুর্দ্দিকেই। রাত্রি-বেলার।
প্রহর যত।
স্বপ্নে চলার। পথিক মত।
মন্দ-গমন। ছন্দে লুটায়। মন্থর কোন্।
ক্লান্ত বায়ে;।
বিহঙ্গ-গান। শান্ত তখন।
গহন রাতের। বসন ছায়ে।"

স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই ছন্দের পদক্ষেপ সমান নয়। এ পদক্ষেপ ভাবানুসারী। সমান ছন্দে ভাবের বিচিত্র উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দকে দোলায়িত করিবার সুযোগ নাই। সেখানে সমস্তেরই ওজন সমান করিয়া দিতে হয়।

এ ছন্দের মুস্কিল এই যে, চার অক্ষরের কথা ইহাতে ব্যবহার করা চলে না। অবশ্য যুক্ত অক্ষর রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বরাবরই দ্বিমাত্রিক বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। 'বিজয়ী' কবিতায় চার অক্ষরের শুধু একটি কথা—'মরীচিকা'—এক জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভাব্‌ল পথিক,। এই যে তাদের।
মশাল-শিখা।
নয়সে কেবল। দণ্ডপলের। মরী (ই) চিকা।

মরীচিকা কথাটিতে ঈর উচ্চারণ করিতে হইবে।

কিন্তু শুধু ছন্দের কথা বলিয়া কবিতাটিকে বিদায় দেওয়া যায় না।

কবিতাটির ভাব এই যে, যে সব বীর রাত্রিবেলা মশালের আলো জ্বালাইয়া ভাবিয়াছিল যে তাদের সেই মশালের শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে অমর হইয়া জ্বলিবে এবং অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া 'নিত্যকালের বিত্তরাশি' তাদের কবলিত করিবে—সেটা তাদের যে স্বপ্নাবেশ মাত্র তাহা তারা বুঝিল যখন প্রভাতের সূর্য্য প্রকাশ পাইল। ঐ মশালের আলোটা যে চিরন্তন নয়, ওটা যে একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র তাহা তখনই বোঝা গেল।

"Word over all, beautiful as the sky,
Beautiful that war and all its deeds of carnage must in time be utterly lost."

ইউরোপেও আজ 'রক্তধূলির পথবিপথে' যারা মশাল জ্বালাইয়া ছুটিয়াছে, নিত্যকালের আকাশকে আলোককে যারা ম্লান করিয়া দিল, একদিন যখন এ দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া যাইবে—তখন সেই আকাশ সেই আলোকেরই জয় হইবে। এবং তখন দেখিব যে,—

"মশালভস্ম লুপ্তি-ধূলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।"

শুধু এই যুদ্ধের কথাই বলি কেন, আমাদের হৃদয়রাগ (passion) যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন সেও নিত্যতাকে উপহসিত করিয়া কত দুঃস্বপ্ন-বিভীষিকারই সৃষ্টি করিয়া তোলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি তারই জয় হয়?

উপমা কালিদাসস্য—এই ত প্রসিদ্ধি। কিন্তু উপমা রবীন্দ্রনাথস্য বলিলে মহাকবির প্রতি কোন অমর্য্যাদা প্রকাশ পায় না। অন্ধকারের উর্দ্ধে মশালের আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন কবি তাহাকে উপমা দিতেছেন—

"বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল যেন দম্ভভরে"

এবং দূরের তারাগুলি তখন—

"দূর গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার পরে।"

চমৎকার উপমা!

সমস্ত কবিতাটিই যেন ছবি-পরম্পরা। ছবিগুলির গ্রন্থনে একটা অপূর্ব্ব কাহিনীর আভাষ দিতেছে। রাত্রির অন্ধকার—রথের ঘর্ঘর—পথের ধূলি রক্তময়—মশাল প্রদীপ্ত—দুর্গপ্রাচীর দগ্ধ—ঘণ্টার শব্দ—সূর্য্যোদয়—মশাল নির্ব্বাপিত। এম্নিতর ছবির পর ছবি। অথচ এ ছবিগুলি একটা বড় আইডিয়ার symbol মাত্র। সমস্ত কবিতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সেই আইডিয়ার প্রাণে স্পন্দমান। এইতো কবিতা।

বিদ্যাপতি

ফাল্গুনের "সবুজপত্রে" শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছেন।

তিনি প্রথমে লিখিয়াছেন যে অনেক সমালোচকের মতে বৈষ্ণব পদাবলী অশ্লীলতাপূর্ণ বলিয়া সে সব কবিতার কোন মূল্য নাই। এঁদের এই অভিযোগের

উত্তরে তিনি বলেন, "কবি কি লিখ্‌বেন তার উপরে সমাজপতি নীতিবিদের হাত ত নেইই খোদ কবিরও বড় বিশেষ নেই।... কবির যেখানে এই কবিতার জন্ম হচ্ছে সেখানটা কুনীতি, সুনীতি, শ্লীল অশ্লীল জুড়ে বসে নেই—সেখানটা জুড়ে ব'সে আছে সত্য ও আনন্দ।"

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "তাঁর পদাবলীতে আগাথেকে গোড়া পর্য্যন্ত হৃদয়ের কথার চাইতে হৃদয়জের ব্যথাই বেশী। আর হৃদয়জ জিনিষটা প্রেমলোকের গানের বিষয় নয়—সেটা হচ্ছে কামলোকের ধ্যানের বস্তু।"

সমাজনীতি বা গার্হস্থ্যনীতির তরফ হইতে সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলের বিচার চলেনা —সাহিত্যের বর্ণমালা-জ্ঞান যাঁর আছে একথা তাঁকে স্বীকার করিতেই হইবে। কেননা সমাজনীতিকে রেয়াৎ করিয়া বাঁধা-দস্তুরের পথে যদি সাহিত্যকে চলিতে হইত, তবে সে সাহিত্য রবিবাবুর 'ব্যাঙ্গকৌতুকে'র 'সারবান্ সাহিত্যের' বিচিত্র নমুনামাত্র হইত। তাহা তখন মনু-পরাশরের বিধান অনুসারে প্রেমের কবিতা লিখিত, উপন্যাসে নায়ক নায়িকার প্রেমের বর্ণনাও ঐ বিধান অনুসারেই করিত। কিন্তু সাহিত্য বা আর্ট—ধর্ম্ম হোক্, সমাজ হোক্, এমন কি সভ্যতা হোক্—কারো conventionকেই খাতির করিয়া চলেনা বলিয়াই তার নব নব উন্মেষ এমন আশ্চর্য্যরূপে এমন বিচিত্ররূপে লক্ষ্য করা যায়। সেই নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিই ত সাহিত্য-প্রতিভা।

সাহিত্যে তাই সমাজপতি বা পুরোহিত বা রাজার শাসন চলে না—কোন কালেই কি চলিয়াছে? কারণ, সাহিত্যে মানুষ যেমনটি ভাবে যেমনটি কল্পনা করে তেমনটিই প্রকাশ করে—সে প্রকাশের ফলাফল শুভ কি অশুভ তাহা তার চিন্তার বিষয় হয় না। প্রত্যেক সমাজেই ত ধর্ম্মনীতির কড়া শাসন বিদ্যমান, নইলে সমাজ চলে না। অথচ সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত 'অশ্লীল' সাহিত্যের ওজন বোধ করি শ্লীল সাহিত্যের চেয়ে ঢের বেশী। সংস্কৃত সাহিত্যে এমন কয়টা গ্রন্থ আছে (বৈরাগ্যশতক বা মোহ-মুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থ বাদে অবশ্য) যাহা খুব নরম নীতিবিদেরও হিসাবে শ্লীল? শকুন্তলা কি সমাজনীতিজ্ঞের হিসাবে চলে? মৃচ্ছকটিক? ইংরাজী সাহিত্যেও ঠিক তাই। শেক্‌স্‌পীয়র হইতে ব্রাউনিং পর্য্যন্ত প্রায় কোন কবিই নীতিবিদের পাস-মার্কা পান্‌না। ফরাসী সাহিত্যে রাবেলে, ইতালীয় সাহিত্যে বোক্কাক্সিয়ো, পেত্রার্কা প্রভৃতি, নীতি-বিদের কাছে, বিভীষিকার বস্তু। একালের সাহিত্যের ত কথাই নাই—ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গ ইব্‌সেন প্রভৃতি ত অচল।

তবে কি বলিতে হইবে যে, সাহিত্য নীতির কোন ধার ধারে না? যে-কোন দুর্নীতি সাহিত্যে প্রশ্রয় পাইবে? না। এমন আশঙ্কার কারণ নাই। কারণ সাহিত্য সমগ্র জীবনকে প্রকাশ করে—জীবনকে যে সাহিত্যস্রষ্টা যতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে ও দেখাইতে পারেন সাহিত্য-হিসাবে তাঁর আসন তত উঁচু। মানুষের জীবনে

কাম জিনিষটা কম প্রবল নয়, কামের প্রভাব প্রচণ্ড। সেই কামের লীলাকে যে কবি বা ঔপন্যাসিক উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া দেখান, তাঁর শক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে। অথচ সেই সঙ্গে বলিতেও হইবে যে, ইনি এর ঊর্দ্ধে এর বাহিরে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রেমের উচ্চ সপ্তকের সুর ইঁহাতে বাজিল না। বায়রণ বা বোকাক্‌সিয়ো, ভারতচন্দ্র বা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে এই কথাই বলা চলে। সুতরাং সাহিত্যের মূল্য যাচাই এই হিসাবেই চলে যে, কোন্ সাহিত্যের মধ্যে জীবনের কতখানি প্রসার ও গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা স্থির করিতে হইবে। এ standardছাড়া অন্য যে কোন standard দিয়াই সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে, উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার করা সম্ভব হইবে না।

অবশ্য এর চেয়েও বড় একটা ষ্টাণ্ডার্ড আছে। সে রসের ষ্টাণ্ডার্ড। সাহিত্যে প্রকাশ জিনিষটা সরস ও সজীব হইল কিনা, তাহা চিরকালের মানুষের আনন্দভোগে লাগিবে কিনা—সাহিত্যে এই বিচারটাই যথার্থ রসবিচার ও বড় বিচার। কবি ও অকবি এই বিচারের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু তারপরেও দেখা দরকার যে, জীবন জিনিষটা কোন্ কবি বা কোন্ সাহিত্যস্রষ্টার মধ্যে কতখানি প্রস্ফূর্ত্ত। কেননা তাহা না হইলে সকল কবির বা সকল স্রষ্টার আসনই সমান হইয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে সাহিত্যে জীবনের রস বিচিত্র—শুধু অলঙ্কার শাস্ত্রের নয় রস নয়। সেই বিচিত্র রস যাঁর লেখায় বিচিত্র ভাবেই ফোটে, তিনিই বড় স্রষ্টা। যাঁর লেখায় কম ফোটে, তাঁর স্থান নীচে।

বিদ্যাপতিকে যে সব সমালোচক অশ্লীল বলিয়া খাটো করিয়াছেন তাঁরা সম্ভবতঃ সমাজনীতির তরফ হইতে তাঁকে অশ্লীল বলেন নাই। তাঁদেরও বক্তব্য বোধ হয় এই যে, বিদ্যাপতির কবিতায় 'হৃদয়ের কথার চেয়ে হৃদয়জের ব্যথাই বেশী'। বিদ্যাপতি কামলোকের সোপান বাহিয়া উচ্চতর প্রেমলোকের নিত্য-সুন্দর ধামে পৌঁছিতে পারেন নাই। দুএকটা কবিতায় তার আভাস মাত্র দিয়াছেন। তাই আমরা বলিব যে, বিদ্যাপতি রসস্রষ্টা হিসাবে বড় বটেন, কেননা কামের রস তাঁর কাব্যে যথেষ্ট ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁর জীবনের প্রসার সংকীর্ণ বলিয়া কবি-হিসাবে তাঁর আসন শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিদের চেয়ে অনেক নীচে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪২শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫ [২য় সংখ্যা

সাহারা রাগ

গাইব আমি আমার সুরে
তোদের সুরটি নাইক জানা,
মরুদেশের সাহারা শোন্'
আমার রাগে নেই সাহানা !

অচল ঠাটের বাহিরে ধায়
তীব্র কড়ি কোমল নানা,
বাঁধা সুরের জ্ঞানে বাধে
শুনিস্‌নেরে, মানিস্‌ মানা !

ধূধূ বালুর মূর্চ্ছনা তায়
ঝঞ্ঝা উঠে মেলিয়ে ডানা,
কর্ম্মনাশা মীড়ে মীড়ে
মর্ম্মনাশা গমক হানা !
আমার গানটি নাই শুনিলি
সাহারা সে, নয় সাহানা।

মরীচিকার মিথ্যা ঝলক
ঝল্‌সে আঁখি কর্‌বে কানা,
ধূসর বরণ প্রাণের আমার
শুন্‌বি যদি আলাপখানা !
মরুদেশের সাহারা গাই
আমার রাগে নেই সাহানা !

শ্রীসরলা দেবী।

শিল্প ও শিল্পী

দুইদলে ঝগড়াটা চলেছে এইভাবে ঃ—

একদল শিল্পী মানস-রূপকেই প্রাধান্য দিয়ে বলছেন, মনোজগতে যে রূপটি সেইটিকেই প্রকট করে তোলো; চোখে যে-রূপ দেখি তার সঙ্গে মেলে তো ভালো, না মেলে তো ক্ষতি কি! মনের মধ্যে মনের মানুষ, হৃদ্‌পিঞ্জরে মন-পাখী, মানস-সরোবর প্রভৃতি সমস্তই রয়েছে—বিচিত্র রূপ, রং, ভাব-ভঙ্গী নিয়ে। চোখের দেখা রূপের সঙ্গে তারা কতক মেলে, অনেকটা মেলেও না। শিল্পীর কাজ সেই মনের ছবি দেওয়া।

অন্যদল বলছেন, তা কেন? যে-রূপ চোখে পড়ছে সেইটেই যতটা নির্ভুল করে দেখাতে পারো দেখাও। মনোবিজ্ঞানের কথা ছাড়। দৃষ্টিবিজ্ঞান, অস্থিসংস্থান এগুলোকে বাদ দেওয়া কিছুতেই চলবে না। যা খুসি তাই আঁকবার কিম্বা গড়বার স্বাধীনতা এঁরা মোটেই স্বীকার করেন না। ইউরোপ এই তর্কটা কিভাবে চালাচ্ছে সেটা আমাদের দেখবার বিষয় নয়; তারা স্বাধীন জাতি, আর্টিষ্ট-বিশেষের ইচ্ছা-অনুসারে গড়া না গড়ায় খুব একটা সঙ্কীর্ণ মত সেখানে কারুর না থাকাই সম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশ, যেখানে তর্ক ক্রমে মত এবং মত ক্রমে বেদবাক্য হয়ে উঠে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন-চেষ্টাকে সঙ্কীর্ণতার বেড়ি পরিয়ে দিতে অধিক বিলম্ব করেনা, সেখানে এই ঝগড়াটাকে বেশিদিন চলতে দিলে আমাদের ভালো হবেনা। যেমন খুসি ভগবান, জগতের রূপগুলিকে ভেঙে-চুরে, নিজের কল্পনাকে ব্যক্ত-করার আর্টিষ্টের স্বাধীনতা আছে কি, নেই—একমাত্র সেইটেই দেখছি ভাববার বিষয়। কবি—তিনি নিজের কল্পনার মধ্যে যে ছবিটি দেখেছেন সেটি ব্যক্ত করবার বেলায় প্রকৃত বস্তুগুলোর সম্বন্ধে বেশ একটু স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন দেখি। চোখ কখনো পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ায় না, উড়েও চলে না; সাধারণে এইতো চোখে দেখেছে! কিন্তু কবির মনোরাজ্যে চোখ, দুই পল্লবের বেড়িতে ঘেরা চোখ নয়, সে ঘুরে বেড়ায়, উড়ে চলে!—

"নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে।"

এটা খুবই একজন আধুনিক কবি বলেছেন। এটা সুরে ছন্দে জীবন্ত হয়ে যখন উপস্থিত হল তখন সাধারণের কান মনে প্রবেশের পথটি কোনো প্রশ্ন না করেই ছেড়ে দিলে। ধরে নেওয়া যাক্ এ পদটার মধ্যে অসামান্য কিছু নেই—যদিও এটা পদ! কিন্তু "দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়!" কিম্বা যেমন—

"শুধুই শ্যামল অঙ্গ পরিমল চন্দন চুয়াকো ভাতি
মোর নাশা জনু ভ্রমরী উমতি ততহিঁ পড়ল মাতি।"

এই 'জনু' বা 'যেন'র জন্যে কবি যে বাস্তব-জগতে একটা অভাবনীয় কাণ্ড করলেন তার উপর কেন বলা তো চলে না! তা যদি বলি তো কবিকে লিখতে হয় চোখটা একটুখানি নড়ছে, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চেয়ে রয়েছে। নাক বেচারা মাথা না নড়লে নড়তেই পারে না, উড়ে পড়া তো দূরের কথা! নাকের সম্বন্ধে কোন কথাই কবির বলা চলেনা।

বস্তুর মান সাধারণের কথায় বজায় রেখে চলা কবির পক্ষে সম্ভব কি না, কাব্য থেকে অসম্ভবকে বাদ দিতে গেলে কবিতা সম্ভব কিনা এটা আমার তর্ক নয়, কেননা আমি কবি নই। আমার ভাবনা শিল্পী আর শিল্প নিয়ে। শিল্পী কবিরই মতো মনোজগতের বাসিন্দা হলেও অত নির্ভয় নয়। কবির মতো ভাব-রূপটির খাতিরে বস্তুরূপকে নিয়ে যা-খুসি সে করতে পারে না। বস্তুর বাঁধন শিল্পীকে নিগড়ের মতো বেঁধেছে। এই বাঁধন কতটা শিথিল করতে পারে—এই ইচ্ছাটা বা এই চেষ্টাটা শিল্পীর দিক থেকে কিম্বা শিল্পের দিক থেকে মার্জ্জনীয় কিনা সেইটেই দেখি। মনোরাজ্যে যে অবাধ কল্পনার আসনখানিতে বসে পুষ্পক-রথ থেকে আরম্ভ করে পুষ্পবৃষ্টি পর্য্যন্ত কবি সৃষ্টি করেন, ঠিক সে আসনটি শিল্পীকে দেওয়া চলে না। কথা দিয়ে, না হয় রেখা দিয়ে,—যদিও কবিতায় আর ছবিতে এইমাত্র প্রভেদ, তবু কথায় এতটা ইঙ্গিৎ-আভাস দিয়ে ভাবকে বুঝিয়ে দেওয়া চলে যে রেখা কি রং দিয়ে সেটা অসম্ভব, যদিও রেখা ও রং দুয়েরই আভাসে জানাবার ক্ষমতাও কম নেই।

"দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়"—এই ভাবটা কবিতায় দু-চারটে বাছা-বাছা কথাকে ছুঁয়ে সহজে শ্রোতার মনে গিয়ে একটা রূপ নিচ্ছে, কিন্তু ছবিতে? ইউরোপ যেমন মানুষের পিঠে ডানা দিয়ে গড়েছে পরী, তেমনি চোখকে দুখানা ডানা দিয়ে 'আঁখি-পাখী' গড়া তো শিল্পীর দ্বারা হতে পারেনা! চোখ যেমন ঠিক তেমনিই আঁকতে হবে, অথচ এই ভাবটা পূর্ণরূপে দর্শকের মনে ফুটে উঠবে। এই অসাধ্য-সাধন শিল্পীকে করতে হয়। নিজের নিজের পেশাটার বড়াই সবাই করে থাকে, তাই সভার মধ্যিখানে আমাকেও বলতে হচ্ছে শিল্পীকে এইরকমের সব অসাধ্য-সাধন করতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ছবির যে 'ছ' পর্য্যন্ত এগিয়েছে এমন সব অসাধ্য-সাধনের অতি সহজ নানা উপায় সে আবিষ্কার করে নিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ভাবটিকে ছবিতে দিয়েছেন,—কোথাও চোখ দিয়ে, কোথাও চোখকে একেবারে বাদ দিয়ে, কোথাও বা চোখের সঙ্গে আর পাঁচটা সামগ্রী জুড়ে দিয়ে; কিন্তু পাখী দিয়ে, কি পাখীর একটি পালক দিয়েও নয়।

কবি এবং শিল্পীর মধ্যে ব্যক্তিগত শক্তির তারতম্য এবং ভাব ব্যক্ত করবার উপায়ের পার্থক্য থাকলেও, দুজনের মধ্যে আসলে মিল রয়েছে;—মানস-কল্পনাকে দুজনেই মূর্ত্তি দিচ্ছে,—যা দৃষ্টিতে পড়ছে এবং যা সৃষ্টির বাহিরেও রয়েছে দুই থেকেই উভয়ের মন রস সংগ্রহ করে চলেছে। কেবল মনের কল্পনাটা ব্যক্ত করবার উপকরণ ও উপায়ের প্রভেদ না হলে মনোজগতের দিকে কবির আর শিল্পীর সমান অধিকার দেখছি। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে সাধারণের বিচার কবিকে দিচ্ছে অভয়,—বস্তু অবস্তু দুইকে নিয়েই যথেচ্ছা সৃষ্টি করতে! বাস্তবকে যদি ভাংতে-চুরতে বাঁকাতে-চোরাতে হয় তাতেও কবি যেমন স্বাধীন, অবাস্তবের অবতারণা করতেও তিনি তেমনি নির্ভয়। কিন্তু শিল্পী ভাবের খাতিরে অবস্তু

যে মাপ অ্যানাটমি বিদ্যায় লিখ্ছে, কিম্বা সাধারণে চোখে সেটাকে যেমন দেখছে, সে সম্বন্ধে একটু স্বাধীনতা নিয়েছে কি আর রক্ষে নেই!

Anatomy ও perspective যে দুটো রয়েছে, সে দুটোকে অস্বীকার করা কিছুতেই চলেনা; কিন্তু শিল্পে তারা যে সর্ব্বেসর্ব্বা নয় এটা বলতে আমরা কেন ইতস্তত করবো? যেখানে আমরা চোখের দেখা বস্তুটি মাত্র চিত্র করছি সেখানে সাধারণ anatomy ও perspective ইত্যাদির মাপ-কাঠি দিয়ে সেটাকে যাচিয়ে নেওয়া চলে এবং সে সহজ কাজটা সাধারণ-দর্শকেও পারে, কিন্তু যেখানে শিল্পীর সম্পূর্ণ মানস-কল্পনাটি রয়েছে, কিম্বা যেখানে বিধাতার সৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি এসে মিলেছে, সে-স্থলে ও মানদণ্ডটি চালালে তো চলবে না! বহির্জগৎ রয়েছে এটা যেমন সত্য, আর্টিষ্ট মাত্রেরই, এমন কি সাধারণ মানুষ তাদেরও, একটি করে মনোজগৎ রয়েছে এটাও তেমনি সত্য।

ফটোগ্রাফের মন নেই, সুতরাং তাঁর মনোরাজ্যও নেই; তার আছে মাত্র এই জগৎ। এ জগতের বস্তুগুলোকে সে খুব ঠিক দেখে, আর খুব ঠিক করে তাদের ছাপ নেয়। কিন্তু কলের এই দেখার সঙ্গে আর্টিষ্টের দেখার তফাৎ রয়েছে যে! মনের মধ্যেও যে সে দেখতে পাচ্ছে। বাহিরের এই রূপ মনে গিয়ে কি বিচিত্রতাই না পাচ্ছে!

এই মনের দেখা আছে বলেই একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে ফটো-যন্ত্রের, এবং সাধারণের দেখার সঙ্গে কবি ও শিল্পীর দেখার তফাৎ রয়েছে। রকম রকম মন নিয়ে এক এক লোক এই জগৎকে দেখছে বলেই না জগৎ বিচিত্র ছবিতে, বিচিত্র কবিতায় ভরে উঠছে চিরকাল। শুনেছি পাছে আর-কেউ তাজ প্রস্তুত করে, সেই ভয়ে সাজাহান তাজের শিল্পীর প্রাণ হরণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আর্টিষ্টের মনের চোখ কড়া হুকুমে বন্ধ করে দেওয়া, প্রাণদণ্ডের চেয়েও এই ভয়ানক শাস্তি, কেন যে এ দেশের শিল্পীর উপরে প্রয়োগ করা হচ্চে—তার কারণ খুঁজে পাইনে। হুকুম তো হচ্ছে, কিন্তু হুকুম প্রতিপালন করে কে? যে ইউরোপীয় শিল্পের কাছ থেকে এই হুকুমটা আসছে বলে আমাদের বিশ্বাস, সেই ইউরোপই আপনাদের আর্টের মধ্যে কি কাণ্ড করছে দেখিনা।

ইউরোপীয়ান্ আর্ট পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যা ছিল এখন তা নেই। যে দেশের র‍্যাফেল সেই দেশেই এখন futuristদের প্রকাণ্ড দল। এর উপর cubist, pre-Raphaelite, realist, idealist; এমন কি বেশির ভাগ লোক এখন Classic ও Greek artকে পূজা দিতেও নারাজ। আর আমাদের দেশে, সেই পঞ্চাশ বৎসর আগেকার হুকুম—সে ঘুরতে ঘুরতে যতই পুরোণো হচ্ছে, ততই অভ্রান্ত বেদবাক্যে পরিণত হচ্ছে। ফটো-যন্ত্র আজকাল রূপের সঙ্গে রংও দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ইউরোপ কোনো দিন তাকে যে মনশ্চক্ষু দিয়ে এদেশে পাঠাতে পারবে এমন ভরসা আমরা করতে পারিনে, কাজেই এখনো অন্তত কতক পুরুষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষেও মনের দেখা শিল্পে প্রচলিত থাকবে।

সঙ্গীতের জায়গা গ্রামোফোন, চিত্রের জায়গা ফটো-যন্ত্র—এটা চলবে না এখানেও!

নেপোলিয়ানের একখানা সচিত্র জীবন-বৃত্তান্ত দেখছিলেম। বইখানাতে নেপোলিয়ান আর তাঁর যুদ্ধের ঘোড়ার কতকগুলি ফটো-গ্রাফ, এবং শিল্পীদের হাতের লেখা কতকগুলি চিত্র, পাশাপাশি-ভাবে সাজানো আছে। ফটোয় আসল ফরাসী বীর আর তাঁর ঘোড়া একেবারে সাধারণ জীব। চলিত কথায় যাকে বলা যায় পাঁচ-পাঁচি-গোছের! দেখে মনেই হয় না এদের দ্বারা কোনো লড়াই সম্ভব! অথচ ঐ দুটোই—মানুষটি ও জন্তুটার নির্ভুল বাস্তবিক রূপ! এরি পাশে শিল্পীর লেখা নেপোলিয়ানের মানস মূর্ত্তিগুলি,—কোথাও সে তুষারপর্ব্বত অতিক্রম করে চলেছে মহাকায় অশ্বারোহী পুরুষ, কোথাও সে রত্ন-মুকুট-মাথায় সিংহাসনে রাজ-রাজ্যেশ্বর! ফ্রান্সের দীনতম অধিবাসী মনে নেপোলিয়ানের যে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল, শিল্পীর দেখার মধ্যে সেই-গুলোই ধরা গেল, আর ক্যামেরা খুব নির্ভুল করে দেখলে অথচ সমস্ত ফ্রান্স এবং সমস্ত জগৎ যেটা দেখলে, সেইটেই দেখা তার পক্ষে সম্ভব হল না।

পুরীতে বিমলাদেবীর মন্দিরের উঠানে একটা পাথরের প্রকাণ্ড শার্দ্দূল বসানো আছে। এই শার্দ্দূল-মূর্ত্তিটি না বনের, না চিড়িয়াখানার সিংহের সঙ্গে মেলে। এই মূর্ত্তির রূপ-কল্পনার সঙ্গে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, সেটা থেকে আর্টের একটা দিকের কথা পাওয়া যায়। রাজার হুকুম হল—দেবীর মন্দিরের সামনে দেবীর বাহন শার্দ্দূলকে চাই। পুরীর মধ্যে সে নামজাদা আর্টিষ্ট, শ্বেত-পাথরে এক সিংহ গড়ে এনে হাজির। সিংহটি হল—ঠিক রাজার চিড়িয়াখানার সিংহ, একেবারে হাঁ করে, থাবা তুলে, ল্যাজ আপ্‌সে যেন গিলতে আসছে! সহরের লোক যখন সিংহের তারিফ করতে ব্যস্ত সেই সময় রাজা উপস্থিত। সিংহ দেখেই রাজা মহা খাপ্পা হয়ে শিল্পীকে বল্লেন, "একি! এ তো আমার সিংহ, এ তো আমি চাইনি। দেবীর শার্দ্দূল—সে কি ওই চিড়িয়াখানার সিংহ! যাও, এ সিংহ চলবে না, দোসরা গড়ে আন।"

দুই তিন চার, এমনি বারে বারে সিংহ আসে, প্রতিবার রাজা করেন না-পছন্দ। তখন শিল্পী পণ্ডিতের শরণাপন্ন হল—চাকরি বুঝি-বা যায়! পণ্ডিত শিল্পশাস্ত্র খুলে শার্দ্দূলের ধ্যানটি তাল-মান-সমেত তাল পাতায় আঁচড়ে দিলেন—বেরালের মতো চাকা মুখ, ভাঁটার মতো দুই চোখ, মুলোর মতো দাঁত, কুকুরের মতো জিহ্বা, ঘোড়ার মতো কেশর, সুন্দরী স্ত্রীর মতো কটি, গরুর মত ল্যাজ, বাঘের মতো থাবা। শাস্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে মূর্ত্তি এবার প্রস্তুত হল; পণ্ডিত সেটাকে ঠিক বলে সার্টিফিকেট দিয়ে, শিল্পীর নমস্কার ও দক্ষিণা নিয়ে বিদেয় হলেন। কিন্তু রাজা দেখলেন সেটা শার্দ্দূল তো হয়ই নি, উপরন্তু সেটা মুলোর ক্ষেত, বা কুকুর, কি ঘোড়া, কি স্ত্রী, কিম্বা বাঘিনী কোনো-কিছু-একটাও হয়ে ওঠেনি। পণ্ডিতের বৃত্তি এবং আর্টিষ্টের ভাতা বন্ধ হল।

হতমান শিল্পী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে দেখছে—দেয়ালের গায়ে পিটুলী-

আলপনার দাগা, ঘণ্টা-চামর-মুকুট-মণিহার দিয়ে সাজানো, এক শার্দ্দূলের চিত্র তার ছোট-মেয়েটা দেগে রেখেছে। বাপের প্রশ্নে মেয়ে বল্লে—নদীতে স্নানের সময়, জলের মধ্যে এই মূর্ত্তি ছায়ার মত সে দেখেছে, —বোধ করি দেবী আকাশ-পথে তখন মেঘের মধ্যে দিয়ে বিচরণ করছিলেন!

উড়িষ্যার মহাপাত্রটির উচিত ছিল চিড়িয়াখানা এবং পণ্ডিতের টোলে ছুটাছুটি না যাওয়া। শার্দ্দূল-মূর্ত্তিকে সেই ছোট মেয়েটির মতো নিজের মন থেকে সম্পূর্ণ টেনে বার করবার চেষ্টাই ছিল কথা। শাস্ত্রের বচনকে এবং চিড়িয়াখানার সিংহকে যথাযথ ধরতে যাওয়াই হয়েছিল শিল্পীর ভুল। যেখানে শিল্পী মন থেকে সৃষ্টি করার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ পাচ্ছে সেখানে সে যায় কেন সৃষ্ট বস্তুর নকল এবং শাস্ত্র ও শাস্ত্রীর হুকুমের দাস হতে?

পুরীর এই সিংহটির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী যাই থাকুক, সেটির গঠনের বাহাদুরী দেখলে পাকা কারিগরের হাত যে তাতে পড়েছিল তা বেশ বোধ হয়। শিশুর মধ্যে নির্ভয় কল্পনার যে স্বাধীনতা আছে, পাকা হাতের অভ্রান্ত টান টেনে এসে যখন তার সঙ্গে যোগ দেয় তখনি মনোমত মূর্ত্তিটি শিল্পীর কাছ থেকে আমরা লাভ করি।

এই মূর্ত্তির পাশে, জাপানের এক শিল্পীর লেখা একটি বাঘের চিত্র রেখে দেখলে আমরা দেখবো পুরীর শিল্পীর মতো জাপানী চিত্রকরও মন থেকে বাঘ কল্পনা করেছেন। খাঁচার বাঘের সঙ্গে এই বাঘটিকে মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় ঠিক বাঘের দেহখানি নকল করা হয় নি, কিন্তু বাঘের ভীষণতা সম্পূর্ণ ফুটে উঠেছে।

এখন কথা হচ্ছে—ছেলেদের 'কাপি বুক'এর যে বাঘ, সে বাঘের অবয়ব, ঠিকঠাক ভঙ্গী, সব বজায় রেখে আর্টের জিনিষ হয়ে ওঠে কি না—যদি তার মধ্যে বাঘের ভীষণতাটি না দেওয়া যায়। হয়ে উঠবে, নিশ্চয় হয়ে উঠবে, কিন্তু বস্তুর ছাঁদটি ঠিকঠাক মান-পরিমাণমতো বজায় রেখে, একচুল এদিক ওদিক না করে, আর্টিষ্ট তাঁর বাঘের চিত্রে সেই হিংস্রতা কুটিলতা ফুটিয়ে তুলতে কিছুতেই পারবেন না! এটা শুধু কথার কথা নয়।

বাস্তবিক বাঘটার বাহিরের চেহারার মধ্যে এমন-কিছু নেই যে সেটাকে দেখলেই ভয়ানক রসের উদ্রেক হবে। তা যদি থাকতো তবে ছেলেরা আলিপুরের দিকেই যেতে চাইতো না। ছোট ছেলে যে বাঘের চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত—বাঘের অবয়বটা তো তাকে ভয় দেখায় না! বাঘকে সে একটা বড় জাতের বেরালই মনে করে। একটা গল্প আছে—এক কাপ্তেন সাহেব একবার সুন্দরবনে জাহাজ লাগিয়েছিল; তখন খালাসীরা নতুন বিলাত থেকে এদেশে এসেছে; একটা বাঘকে তীরের উপরে বসে থাকতে দেখে খালাসীরা কাপ্তেনকে শুধোলে—ওটা কি? কি জানি কি মনে করে সাহেব বলে দিলেন—Indian Cat. খালাসীদের বেরাল পোষবার সখ হলো, জন পাঁচ-সাত মিলে অনেক ধস্তাধস্তি আঁচড়-কামড়ের পরে বাঘটাকে কাছি দিয়ে বেঁধে জাহাজে এনে উপস্থিত। সবাই মিলে

কাপ্তেনকে যখন সেই বেরালটি বকসিস্ দিতে যায়, তখন কাপ্তেন বল্লেন ওটা কি জানো,— Indian Tiger!

যতক্ষণ জানা যায়নি বাঘ বলে, ততক্ষণ বাঘের জাজ্বল্যমান রূপ তাদের কাছে কোনো ভীষণতা ব্যক্ত করেনি, বাঘ সে বড় জাতীয় বেরালের চেয়ে একতিলও বড় ছিলনা; কাপ্তেনের এককথায় সে আর বেরাল রইল না, সত্যি বাঘই দেখা দিলে!

শিল্পেও তেমনি। কাপ্তেনের ওই একটি কথার মতো ঠিক অবয়বটির একটুখানি টেপা-টোপা টানা-টোনা অদল-বদল না করলে, বহিরঙ্গীন রূপের পর্দ্দা সরিয়ে আভ্যন্তরীণ যেটা, সেটাকে প্রকাশ করা অসম্ভব। তবে কতটা অদল-বদল, কতটাই বা ভাঙাচোরা সইবে সেটা স্থির করবার ভার শিল্পী ছাড়া, সাধারণ কমিটির হাতে দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি আমরা; কিন্তু তাতে শিল্পী বেচারাকে নানা মুনির নানা মতের ফের থেকে আমরা কিছুতেই বাঁচাতে পারবো না। জন-সাধারণের দেখার সঙ্গে শিল্পীর দেখার যে পার্থক্য রয়েছে, সেটা স্বীকার করতেই হবে। বাহিরের রূপ পর্দ্দার মতো ভিতরের পদার্থটিকে প্রচ্ছন্ন রেখেছে, সেই পর্দ্দা সরিয়ে যাওয়া এবং সরিয়ে দেখানোই শিল্পীর কাজ।

মনোজগৎ এবং ভাবজগৎ ছেড়ে একবার চোখের-দেখা জগতে নামা যাক্। মানুষের অবয়বটা সৃষ্টি হয়েছে যে প্ল্যান-অনুসারে, বানরের অবয়বেও ঠিক সেই একই প্ল্যান। ঘোড়ারও কঙ্কালে মানুষের মতো ঠিক ততগুলো অস্থি ঠিক তেমনিভাবে সাজানো আছে। অথচ সেই একই প্ল্যানের মধ্যে বিচিত্র তিনটে সম্পূর্ণ আলাদা জীব দেখছি। এই যে মানুষে-মানুষে এবং মানুষের সঙ্গে ইতর জীবগুলির আকার-গত প্রভেদ, এটা সৃষ্টিকর্ত্তা ঘটান্ কোন্ উপায়ে? ওই কঙ্কালটা, যেটা মানুষে এবং অন্য জীবে প্রায় এক, সেইটেকে ঢেকে কোথাও লম্বা ছাঁদ কোথাও সুশ্রী কোথাও সোজা কোথাও বাঁকা দিয়ে নয় কি?

বিধাতা দেখছি বিচিত্রতার সৃষ্টি করছেন ছাঁদ দিয়ে,—ছাঁদকে খাড়া রাখছে কঙ্কালটা এইটুকু মাত্র। শিল্পীও বিচিত্র রূপ গড়ে তোলে ঠিক এই নিয়মে; কেবল সে কঙ্কালটা অতটা কৌশলে গড়েনা; খড়-জড়ানো কাঠামো, ব্রহ্মসূত্র কিম্বা জলের পাইপ—এমনি একটা মোটামুটি জিনিষের উপরে সে ছাঁদকে বসায়; তারপর নানা রেখা, নানা ভঙ্গী শিল্পী নিজের থেকেই দেয়। এই ছাঁদ শিল্পীর মনের ছাঁদই হোক, আর দেখা কোনো বস্তুর নকল করা ছাঁদই হোক, দেশ-ভেদে, শিল্পী-ভেদে সেটা রকম-রকম হবেই এবং হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কঙ্কাল বদলায় না; কিন্তু ছাঁদ বদলায়। ছাঁদ গতি দেয়, বিচিত্রতা দেয়, ছাঁদের একটু-আধটু এদিক-ওদিকে জিনিষটা পুতুলও হতে পারে, সজীবও হয়ে ওঠে; সুন্দরও হয়, কুৎসিতও হয়। আর্টিষ্টের পক্ষে কঙ্কালের অস্থি-সংস্থান তন্ন তন্ন করে জানার চেয়ে, ছাঁদের রহস্য-জ্ঞানই হচ্ছে আসল দরকার।

ভাবকে ধরার একটি ফাঁদ হচ্ছে ছাঁদ। ভাবকে ঠিক ধরতে যদি আঙুলকে লম্বা ছাঁদ, চোখকে আকর্ণ-বিশ্রান্ত ছাঁদ, কটিকে

যদি একেবারে অসম্ভব-রকম ক্ষীণ, এমন কি মানুষকে অসম্ভব-রকম অমানুষ ছাঁদ দিতে হয়, তবে তাও করতে হবে। সাধারণে কি বলবে, কিম্বা আমাদের শিল্প-জগতের বাস্তব-পন্থীরা সেটাকে দুষবেন, এ কথা ভেবে হাত-গুটিয়ে বসলে তো চলবে না! ছাঁদ বিষয়ে আর্টিষ্টের সম্পূর্ণ নির্ভয় হওয়া চাই। শুধু যে ভাবাত্মক শিল্পের বেলাতেই আর্টিষ্টের এই স্বাধীনতা তা নয়, যখন সে চোখে দেখে কারো প্রতিমূর্ত্তি গড়ে তখনও তাই।

মানুষ দণ্ডে দশবার দশ রকম মুখোস খুলছে, পরছে। বাইরে এল সে এক মুখোস, ঘরে সে আর-এক! যখন সে আফিসে কেরাণী তখন মুখোসটা দীন-হীন গোছের, আবার যখন সে ইস্কুলের মাষ্টার-মশায় তখন ভীষণ গম্ভীর, যখন সে সাধারণ সভায় আচার্য্য উপাচার্য্য কি বক্তা কি শ্রোতা তখন যে মুখোস, ফেরি জাহাজের আমাদের "শুশুক সভায়" যাবার বেলায় সে মুখোসটা সে সম্পূর্ণ বদলে আসে। এ ছাড়া Regimental uniform এর মতো মানুষের বংশগত, পিতৃপরম্পরাগত উদ্দির ধরণের মুখোস; আটপৌরে মুখোস, Title-holder এর মুখোস! politician, journalist, artist, poet, philosopher প্রভৃতির হাজার-একশো-একের চেয়েও বেশি মুখোস আমাদের আছে। আর্টিষ্টের স্বাধীনতা থাকা চাই এই হাজার হাজার মুখোসের মধ্যে যে-কোনো-একটা মুখোস আমায় পরাতে কিম্বা এ সমস্ত মুখোস টেনে ফেলে মুখোসের পর মুখোসের কোটোর মধ্যে যে আমার-আমিটি লুকিয়ে রেখেছি সেইটেকে টেনে বার করতে।

হয় তো এমন হল যে, নিজের কাছে এবং আমার বন্ধুবান্ধবের কাছে আমার একটি মুখোস প্রিয় এবং সুপরিচিত, কিন্তু আর্টিষ্ট মূর্ত্তি গড়বার সময় সে মুখোসটা না বেছে নিয়ে, আমার নিজেরই, অথচ সম্পূর্ণ অসাধারণ একটি মুখোস পরিয়ে আমায় ছেড়ে দিলে! তখনই আমরা আদালতে চল্লেম আর্টিষ্টের সঙ্গে মামলা করতে। তাতে এমন হতে পারে যে আর্টিষ্ট হারালে পারিশ্রমিক, আবার এমনো হতে পারে যে আমি হারালেম শিল্পীর হাতের একটি অপূর্ব্ব রচনা! নাটক-রচয়িতা কবির সমস্ত মৎলব ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি অভিনয়ের সময়, যারা নাটকের পাত্র ও পাত্রী সাজবে, তারা নিজের নিজের সাধারণ মুখোস পরেই মঞ্চে অবতীর্ণ হতে চায়। সেই সময়ে সাজ-ঘরে আর্টিষ্টের প্রয়োজন। সে কুরূপাকে সুরূপা কিম্বা এর বিপরীতটাও করবার জন্যে অভিনেতাগণের মামুলি চেহারাটার উপর স্বাধীনভাবে হাত চালালে কবির কাছেও বাহবা পায়, দর্শকের কাছেও সাধুবাদ পেয়ে থাকে। কবি মৎলব ঠিক করে দিয়ে বসে আছেন, শিল্পী সেই মৎলবকে রূপ দিচ্ছেন, জন-সাধারণ দর্শকের জায়গায় বসে গোলমাল না করে সমস্তটা উপভোগ করেছে।—এইটেই হওয়া দরকার। না হলে সাধারণের জায়গা থেকে সাজঘরে এমন সাজাও, তেমন মৎলব কর—এমনটি হলে, কিম্বা সাজঘরের মধ্যেও সেপাই বিদ্রোহ উপস্থিত করলে, আর্টিষ্ট ও কবি দুজনেই মুস্কিলে

পড়ে এবং অভিনয়টাও ভেঙে যায়। জগতের নাট্যশালায় কবি আর শিল্পী দুজনের একই কথা—

"কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি
ইসারা তৃণের অঙ্গুলি—
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে
পাখীর মুখে এই যে খবর পেনু।"

সাধারণের দৌড় কেবল পাতাকে পাতা তৃণকে তৃণ-জ্ঞান পর্য্যন্ত। বনের পাখী, মনের পাখী তাকে কোনো খবর—কারু খবর পৌঁছে দেয় না। সে তাস খেলে, টেনিস খেলে, খেলাঘরের খেলার সাথীকে নিয়ে খেলবার অবসর সে যেমন চায়না, তেমনি পায়না। অন্য দেশে শিল্পের কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, কোন্ ছবিটা ঠিক, কোন্ ছবিটা নয় তার বিচার করবার প্রণালীটা যাই হোক, ভারতবর্ষে সাধারণ-ধারণার ছোট বাটখারায় ওজন করে যে শিল্পীর বেলায় তুলাদান ব্রতটা সাঙ্গ করা হয়ে থাকে এটা সত্য।

আদালতে 'কমন্' জুরির বিচার চলে কিন্তু রত্ন-পরীক্ষার বেলায় আমাদের জহুরীর কাছে যেতে হয়; নয় তো নিজে জহুরী হয়ে ওঠা চাই।

ইউরোপে শিশুকাল থেকে আর্টের চর্চ্চা সাধারণ লোকে করছে আর আমরা—আগেকার আমরা নয় এখনকার আমরা—সব করছি কেবল ওইটে নয়। শিল্পের যথার্থ ভাও নির্দ্ধারণ করতে সেই জন্যে আমাদের গোলযোগ হচ্ছে। শিল্পীর দেখাকে আমাদের সাধারণ দেখা দিয়ে আমরা মিলিয়ে নিতে চলি, তাতে করে শিল্পটা হয়ে আসে খাটো আর আমাদের সাধারণ দেখাটাই হয়ে ওঠে বড়।

এটা আমার ঘটেছিল। ছেলেবেলায় বুড়ো দেওয়ানজীর মুখে আমাদের ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে সোনার ইট ছিল, শুনতেম। ছেলে বুদ্ধিটি নিয়ে আমার ইটের মাপটাই যে সোনার ইটের মাপ, এটা আমি ঠিক করে রেখেছিলেম। বড় হয়ে পর্য্যন্ত আমার সেই ধারণা! Bar-Gold Brick-Gold যখন শুনি, তখনি লোহার মোটা গরাদে এবং এগার ইঞ্চির তুল্য মূল্য দিয়ে সেটাকে দেখি। একদিন খানিক সোনার প্রয়োজন, সরকারকে সোনা আনতে বলায় সে বল্লে—সোনার টালি বাজারে সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। আমি টালিই আনতে হুকুম দিলেম। সমস্ত দিন আমার মাথায় টালি ঘুরতে লাগলো। কিন্তু সোনার টালিটা এল ঘরের ছাদের টালির চেয়ে অনেক ছোট, অনেক পাতলা! টালির ধারণা নিয়ে সোনার তক্তি দেখতে গেলে যে গোল, বাস্তব-জগতের বস্তুগুলো সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ-দৃষ্টি নিয়ে, শিল্পীর সৃষ্টির দিকে দেখলেও সেই গোলযোগের সম্ভাবনা নিশ্চয়। চাক্ষুষ বস্তু সম্বন্ধে তো এই। জিনিষটার ভাব বোঝাও শক্ত হয় যদি সেটায় চোখ বুলিয়ে যাই মাত্র। সকালে আমেরিকায় একটা তার পাঠালেম—

"Thirty one pictures, full number already sent, invoice goes next mail, make payments to me."

সন্ধ্যাবেলায় censor আফিস থেকে, আমার explanation তলব করে এক প্রকাণ্ড

গালা-মোহর করা চিঠি! তারপর কোথায় যে গোল ঠিক করতে না পেরে ব্যারিষ্টার সঙ্গে আমি একেবারে আফিসে হাজির—সন্দের গোরার সাজ-পরা বড়-সাহেবের কাছে! সেখানে শুনলেম আমার লেখায় punctuation নেই; এবং censor সমস্ত রাত ধরে তার কোনো অর্থ আবিষ্কার করতে পারেনি! এত বড় সাধারণ মানুষকে গভমেণ্ট আমাদের গোপনীয় চিঠি খুলে পড়বার ভার দিয়েছেন জেনে আমি অনেকটা আরাম পেলেম। লেখাটা punctuation দিয়ে পড়ে full number মানে যে total number এখানে বোঝাচ্ছে সেই বলে দিয়ে censorএর কাছ থেকেও ধন্যবাদ নিয়ে এসেছি।

শিল্পীর কাজের মধ্যে, তিনি রূপকে যে-রকমে punctuate করে ভাবটা বোঝাচ্ছেন, সেটা সাধারণ punctuation হলো তো সাধারণ সেটাকে আর censor কল্লে না; কিন্তু শিল্পী যখন নিজের punctuation দিচ্ছেন, তখন সাধারণ বুদ্ধির কাছে সেটা হেঁয়ালি, কাজেই সে যখন সত্য বলে তখন বলে, 'বুঝলেম না মশায়!' কিন্তু যখন সে বলে—'আরে ছ্যাঃ ছাই হয়েছে'—তখন নিজের দিক থেকে সত্যবাদী, 'কিন্তু আর্টের দিক থেকে সে যে একটা মিছে তর্কের বোঝা বয়ে চলেছে এইটেই প্রমাণ হয়।

শিল্প যখন সাধারণে দেখাবার জিনিষ তখন সাধারণকে তার মতামত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে বাধা দেওয়া চলে না; কিন্তু সাধারণ যে তাই বলে শিল্পীকে হুকুম করবে, নিজের standard of judgment শিল্পীরও standard of judgment হোক এ কথা বলবে, এটা কেমন করে হতে পারে?

আমরা যেমন দেখছি শিল্পী কি কবি জিনিষটাকে তেমন করে দেখবেন না। যে দর্জ্জি নয় তাকে কোট প্রস্তুত করতে দিলে সে তার অজ্ঞতার পরিমাণকেই সে কোটের মাপে খাটাবে, কিন্তু যে পাকা দর্জ্জি সে জানে এক মাপ সবার নয়, এমন কি তার নিজের মাপও অন্যের উপরে খাটানো চলে না;—যদিও সে একজন সুপুরুষ।

গ্রীক শিল্পের উন্নততর মাধুর্য্য ও ভাবের দিকটা ছেড়ে দিয়ে তার কারিগরির দিকটাই দেখি। গ্রীক শিল্প Phediasর আমলে দৈহিক গঠন সম্বন্ধে, সাধারণ মানুষের ছাঁদকে অনেকটা স্বীকার করেছে। যাঁরা শিল্পে বাস্তব-পন্থী এটা তাঁদের কাছে মস্ত একটা প্রমাণ। কিন্তু গ্রীক শিল্প মস্ত শিল্প; সেখানকার শিল্পীরাও সাধারণ মানুষ ছিল না; তারা জানতো মানুষটাকে যদি সব-দিক-দিয়ে মানুষ করে তোলা যায় তবে সেটা সাধারণ ছাড়া আর কিছু হবে না। তারা এই চোখ মুখ হাতকে এমন size দিয়ে গড়েছে যে সে sizeএর মানুষ গ্রীসের সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। গ্রীক শিল্পের life-sizeটি হচ্চে সব-দিক-দিয়ে সাধারণ মানুষের মাপের চেয়ে একতাল বড়। মানুষের চোখে সাধারণত মণি থাকে, গ্রীক মূর্ত্তিতে, অন্ততঃ ভালো ভালো মূর্ত্তিতে, তা নেই! size সম্বন্ধে আতিশয্য, এবং চোখের মণি প্রভৃতির সম্বন্ধে অসাধারণতা ও অবাস্তবতা-প্রয়োগের স্বাধীনতা, এমনি আরো কত কি, গ্রীক শিল্পকে

বাঁচিয়েছে—common-place হওয়া থেকে।

আমার মনে হয়, আমাদের কলেজ স্কোয়ারের মূর্ত্তিগুলোর size যদি বিরাট রকমের করে তোলা যায় তবে তাদের পুত্তলিকা ভাবটা নিশ্চয়ই চলে যায়। সব দেশের সব শিল্পী রূপ দিয়ে,—রূপের পরিমাণ, ভাবভঙ্গী, রং ঢং সব দিয়ে,—সাধারণ দৃষ্টি, সাধারণ জ্ঞানকে ছাড়িয়ে উঠছে। চোখের দেখার কারাগার থেকে মুক্তি দেবার না-দেবার কর্ত্তা সাধারণ মানুষটি নয়, কর্ত্তা হচ্ছেন আর্টিষ্ট ও কবি নিজেরাই। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম কেন হবে?—এখানে বলা চলে না। শিল্পীর করা, আর কবির বলা দুইই যখন শেষ হয়েছে, তখনি কেবল সাধারণ আসতে পারেন মতামত প্রকাশ করতে।

আমাদের শিল্প-শাস্ত্রের একটি অনুশাসন হচ্ছে "দেব-মূর্ত্তি গড়বে, মানব-মূর্ত্তি নয়।" এই শাস্ত্র-বাক্যটা দুই রকমে শিল্পীর উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। খুব সঙ্কীর্ণ অর্থটা বেড়ির মতো শিল্পীকে পরিয়ে বলা—কেবলি হরি হরি হর হর, কেবলি চতুর্ম্মুখ পঞ্চানন ষড়ানন গজানন! এ মানুষও নেই, এ পৃথিবীও না, আছে কেবল তেত্রিশ কোটি অদ্ভুত লোক! ইউরোপীয় পরিব্রাজকরা এই শাস্ত্র-বাক্যের সঙ্কীর্ণ অর্থটাই যেন আমাদের শিল্পের উপরে কাজ করেছে দেখে। এখানে মাটি খুঁড়লে দেবতা, জল সেঁচলে দেবতার মূর্ত্তি, মন্দিরগুলো—গোপুর থেকে দেউল—আগাগোড়া দেবতায় মোড়া। পর্য্যটকের এটা ভাবা আশ্চর্য্য নয় যে এদেশের শিল্পীর স্বাধীনতা মোটেই ছিল না, ব্রাহ্মণেরা এদের দিয়ে যা খুসি তাই গড়িয়েছে।

এ কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্য আ কিন্তু যখন একটু ভালো করে চারিদি দেখি, যখন অন্ধকারের মধ্যে এক-একটা একটা-একটা চিত্র, একটা-একটা জ্যোতি মতো চোখে পড়ে তখন মনে হয়—না যত ভাবা গিয়েছিল ততটা নয়! অনুশাসন solitary cellএর দেয়ালের মতো শিল্পী কয়েদ করেনি, ফাঁক ছিল। form সম্বন্ধে শিল্প শাস্ত্রে যে বাঁধাবাঁধি, feeling সম্বন্ধে সেটা একেবারেই নেই,—শিল্পীর ধ্যানের উপরে সেখানে সম্পূর্ণ নির্ভর! এতে হয়েছে, কেবল যারা কারিগর তারা academic শিল্পের মতো বড় একটা আশ্রয় পেয়ে mediocre হবার সুবিধে পায়নি, আর যারা উঁচু দরের শিল্পী ছিল, ভাবরাজ্যে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে। পূজার মূর্ত্তি গড়েও শিল্পীর তখন যথেষ্ট অবসর ছিল, এবং সেই অবসরে তারা ইচ্ছা-মতো গড়তো এবং লিখতো; অজন্তা চিত্রাবলী বুদ্ধের মূর্ত্তি—এইগুলো তার সাক্ষী।

শিল্পশাস্ত্রের মূর্ত্তি-লক্ষণে স্পষ্ট করে বলা রয়েছে:—'কেবল যে সকল মূর্ত্তি পূজার জন্য, তারি এই লক্ষণ। অন্য মূর্ত্তি শিল্পী যথেচ্ছা গড়তে পারেন।'

সময়ে সময়ে শাস্ত্রের বাঁধন যে কড়া হয়ে উঠেছে, এবং লোকে সেটাকে আমোল দিচ্ছেনা তারও প্রমাণ শিল্পশাস্ত্রে এবং আমাদের শিল্পের মধ্যেও পাচ্ছি।

প্রতিমা-লক্ষণ অধ্যায়ের শেষ ছত্রে শুক্রাচার্য্য বলছেন—

"এই যে, লক্ষণাক্রান্ত শিল্পের কথা বলা গেল, এটা হল 'পণ্ডিতানাম্ মতম্'। এছাড়া

প্রাণ যেটায় খুসি হচ্ছে সেইটেই শিল্প।
—'তত্র রম্যং যত্র লগ্নংহি যস্য হৃৎ।'"

কোণার্ক মন্দিরে যাচ্ছি। পাত্রি বন্ধু বল্লেন—যেওনা! শিল্প সেখানে কোথা? পাগলের খেয়াল দেখবে! এ সত্বেও ঝড় মাথায় করে কোণার্কে উপস্থিত। সমুদ্রের খোলা বাতাসের মধ্যে সেখানে শিল্পী ও তার শিল্প সম্পূর্ণ স্বাধীন; দেখলেম—

অরুণ-সারথি সূর্য্যের রথের ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে আসছেন! শাস্ত্রে সে মূর্ত্তির লক্ষণ নেই, আর্টিষ্ট সম্পূর্ণ নিজের মন থেকে গড়েছে-রূপের মধ্যে রূপের দেবতা! সকালের আলোর মতো সেই ঘোড়া অন্ধকারকে অতিক্রম করে আসছে। নতুন দিন সমুদ্রের পরিষ্কার বাতাসে উত্তরীয়টি উড়িয়ে দেখতে দেখতে এগিয়ে এল, এই ভাবটি মাত্র! ঘোড়া সেখানে শিল্পী গড়েছে সাধারণ ঘোড়ার মতনই নয়, সারথি সে যেন তেজের প্রতিমূর্ত্তি! এরি ঠিক সামনে শিল্পী গড়ে রেখেছে কালো-পাথরে একটি একেবারে হুবহু রাজহস্তী! সেখানে শিল্পী ঐরাবতের দিক দিয়েও যায়নি; হাতীর সহজ মূর্ত্তির মধ্যে যে বিপুলতা আর গাম্ভীর্য্য সেইটুকু ঠিক গড়েই সে ছেড়ে দিয়েছে।

শিল্পের দুটো দিকই শিল্পীর কাছে খুলে যায় যখনি সে শাস্ত্র এবং সাধারণ দুয়েরই উপরে একটি স্বাধীন আসনে অধিকার করবার সুবিধা পায়। মাষ্টারের শেখানোতে কিম্বা প্রভুর হুকুমেতে শিল্পও হয় না, শিল্পীও হয় না। শিল্পী এসেছে একটি হতভাগা স্কুল-পালানো ছেলের মতো একেবারে দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা নিয়ে। পূজারী তাকে ধরে বলছে—গড় দেবতা; মাষ্টার তাকে ধরে বলছে—পড় anatomy, শেখ perspective; প্রভু তাকে বলছে—লেখ আমার রূপ-বর্ণনা; আবার সভার মধ্যিখানে পাঁচজনে তাকে বলছে ব্যাখ্যা কর শিল্প-শাস্ত্র! শিল্পীর জীবনের ইতিহাস এই!—চারিদিকে জুলুম-জবরদস্তি, তারি ফাঁকে-ফাঁকে সে মনোরাজ্যের খেলা-ঘরে এক একবার সাথীর সঙ্গে খেলে নিচ্ছে—সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিছাড়া খেলা!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাদ্‌শাজাদী

কমলাফুলি ঘোমটা 'খুলি' এলিয়ে দিয়ে চুল,
একলা ঘরে বাদ্‌শাজাদী ছিঁড়তেছিল ফুল।
আচম্‌কা সে ফিরিয়ে গ্রীবা ঝর্কা পানে চায়,
সুরকি-রাঙা রাস্তা থেকে দেখ্‌ল যুবা তায়।
কি সুন্দরী সেই তরুণী ইরাণ নারী-ছবি!
অরুণ-রথে আবীর-খেলা কর্‌লে সুরু রবি।

"ভুলিয়েছে মন রঙীন্ স্বপন"—গাইল রূপোন্মাদ,
"কে পেতেছে সুর্ম্মা-পিছল চোখের চোরা ফাঁদ?
ভোরের রাঙা রঙের রসে ঠোঁট-দুখানি লাল,—
দুল্‌ছে আলোর ঝুম্‌কো-লতা, উড়্‌ছে অলক-জাল।
মেহ্‌দি-রাঙা পা দু'খানিও আধেক দেখা যায়,
লুকিয়ে আছে আঙুল কটি জরির পাদুকায়।

এস আমার ফুলের ঝাড়ে ফাল্গুনেরি রাণি,
রূপের নতুন নৌরোজাতে বাড়িয়ে দেবে পাণি।"
সে গান গিয়ে ঢেউ তুলিল বাদ্‌শাজাদীর বুকে,
রঙঢালা হাসির আলো ফুট্‌ল চোখে মুখে।
ভাব্‌লে বালা খেল্‌বে খেলা মনের ছিনি-মিনি,
ছড়ায় পথে গুল্‌পশরা বাদ্‌শাহ-নন্দিনী।
প্রাণের গোপন কার্ব্বা থেকে ঝরল সুবাস-ধার,
পিছন থেকে খেলার পরী চোখ টিপিল তার।
গাইল বালা,—"চায় কে মালা? স্পর্দ্ধা এত কার?"
থাম্‌ল বনে বনের পাখী গাইল না সে আর।

বছর পরে আবার দেখা, সে এক সন্ধ্যাবেলা,
রাবির জলে বাদ্‌শাজাদী করতেছিল খেলা।
নবীন এলা-বল্লী জিনি' নন্দিত-যৌবনা,
মন্মথ-মন-উন্মাদিনী, নেত্রে অনল-কণা।
আবার হোলো চোখোচোখী,—নিখুঁৎ পদ্মফুল
পাপ্‌ড়ি মেলে রাবির জলে সৌরভে আকুল।
সাক্ষী রহে আশ্‌মানেতে ইদের চাঁদের ফালি,
সন্ধ্যাতারার চোখের পাতে দেয় রূপালি ঢালি'।

মুগ্ধ যুবা দেখ্‌ছে তখন—দুল্‌ছে স্বপন-দোলা,
নাচ-মহলের কাচ-দরজা সাম্‌নে গো তার খোলা।
মেঝের পরে শাদা-কালো মারবেলেতে গাঁথা
অপরূপ এক পাশাখেলার 'ছক' রয়েছে পাতা।
বাদ্‌শা খেলেন রূপের পাশা, বেগম-গুটি চেলে',
চম্‌কে ওঠেন ঠুংরী ঠেকায় তালটি কেটে গেলে,
হুকুম ছিল উড়িয়ে ওড়ন্‌ চরণ ফেলে ফেলে,
মিলিয়ে গলা বেয়ালা-সুরে খেলবো যাবে ঢেলে।
নূপুর-ভরা নৃত্যলীলা, অপাঙ্গে ফুল-বাণ,
সুন্দরীরা 'আড়ি'র দানে মাৎ করে গো প্রাণ,
জোড়ায় জোড়ায় ঘাঘরা ঘোরায় পাঁচশো কিশোরীতে—
গিট্‌কিরীতে টিট্‌কারীসুর ছুট্‌ল বাঁশরীতে।
তর্‌ করেছে আগ্‌রা-পুরী রসের তরঙ্গী,
ফুর্ত্তি-জোয়ার উজিয়ে চলে হাজার ভ্রূভঙ্গী।
সুরতি-রসে ঘুর লেগেছে, পড়্‌ছে টলে' শির,
গল্‌ছে তরল গুল্‌-ফোয়ারা পাঁচশো রূপসীর।

ভাব্‌ছে ওকিল, সাজিয়ে আসর খেল্‌তে হবে পাশা,
বাদ্‌শাজাদী বস্‌বে পাশে, পুরবে নাকি আশা?
দুল্‌বে আলো বেল্‌ঝাড়েতে, গল্‌বে হাজার বাতি,
কাট্‌বে জীবন বিলাস-লীলায় রাত্তির পরে রাতি।

সে সব কথা বিঁধ্‌ল গিয়ে আরংজীবের কাণে,
উঠ্‌ল ফুলে' ললাট-শিরা দারুণ অপমানে,
শৌর্য্য-তেজে ভারত জুড়ে' পাঞ্জা আঁকা যাঁর,
লড়্‌কীয়ে তাঁর কর্‌বে দাবি স্পর্দ্ধা এত কার?
করবে 'সাদি', পরবে গলায় বাদ্‌শাজাদীর হার,
খাপ্পা হ'য়ে উঠ্‌ল খাপে তুর্কী তরবার।

"ধিক্ ধবল হক শবল" ছুট্‌ল বাঁদীর দল,
বাদ্‌শা চলেন দেখ্‌তে বেটী, দিল্লী টলমল্‌।
শ্বেত-পাথরে তৈরি মহল 'রাবি'র কিনারায়,
সোনায় মোড়া হাওদা তাঁহার লাহোর-পথে ধায়।

বাদ্‌শা সেথায় পৌঁছে গেলেন, ফটক-নহবতে
ফেনিয়ে ঝরে সুর-ঝরণা মুলতানেরি গতে।
ঈষৎ 'দূনে' শানাই শুনে' টল্‌ল 'রাবি'র জল,—
বাদ্‌শাজাদীর চোখ দুটি গো অশ্রুতে ছলছল্‌!

মোগল আদব কায়দা মাফিক্‌ কুর্নিশে কুর্নিশে
জেব্‌-উন্নিসা বাপ্‌কে তাহার এগিয়ে নিল এসে।
বাদ্‌শা পশেন শীস্‌মহলে, কুঞ্চিত তাঁর ভুরু,
বাঁদীর দলে চামর চুলায় হৃদয় দুরু দুরু।
পায় না সাহস জেব্‌উন্নিসা আস্‌তে বাপের কাছে,
মেজাজ শরীফ নেইক আজি, করেন গোসা পাছে।

আল্‌বোলাতে পুড়্‌ছে ছিলিম বাদ্‌শাহী কক্কেতে,
স্নিগ্ধ মধুর গন্ধ-ধূমে কক্ষ ওঠে মেতে।
তপ্ত তাওয়ায় তাম্রকূট হায় পুড়্‌ছে মনের দুখে,
বাদ্‌শা আজি সুখ-টানে চুম্‌ দেন না নলের মুখে।
সাম্‌নে জলের যন্ত্র খোলা, তুষার-গলা ধার
ঝর্‌ঝরিছে, ছাপিয়ে গেছে স্ফটিক জলাধার।
থর্‌রা ভাসে গন্ধ তেলে, একটি ফোঁটাও তার
কর্‌তে পরশ নেইক খেয়াল আজ্‌কে শাহান্‌শার।

চিত্ত তাঁরি জিজ্ঞাসারি চিহ্নেতে ভোরপুর,
রুদ্র তালে দীপক্-রাগে লুপ্ত কোমল সুর।

ডাক্‌ল চমক—দিচ্ছে আজান মসজিদ্-আঙিনায়,
বাদ্‌শা চলেন পড়্‌তে নেমাজ প্রকৃত বয়ে' যায়।
মজ্‌ল ওরে গজল-সুরে আরংজীবের দিল,
পড়্‌ল চোখে জোড়ের মুখে কোন্‌খানে গরমিল।
পাগ্‌ড়ীতে তাঁর মুক্তাহীরার জেল্লা হ'ল ছাই,—
সুখ কিছুতেই নাই রে ওরে সুখ কিছুতেই নাই।
পড়্‌ল এসে শুক্ল কেশে দিন-ফুরানোর আলো,
বাদ্‌শাগিরির দিক্‌দারি আর লাগ্‌ছে নারে ভালো।
ছিটিয়ে ফেলেন থুথুর মত রংমহলের সুখ,
থেঁদিয়ে দিলেন তয়ফাওলীর সরাব-রাঙা মুখ,
খেতাব-খাতির ভেল্কিখেলা, দুনিয়া ফক্কীকার—
পাগ্‌লা আলানস্কারেরি ধাক্কাতে চুরমার!—
সাঁচ্চা যখন মিল্‌বে তখন চল্‌বে কি আর মেকি?
দেশ-বিদেশের ধর্ম্মফলের রস-মধুটি একই।
নেমাজ শেষে বাদ্‌শা বসেন ফুলের গালিচায়,
বসিয়ে কাছে আর্দ্রস্বরে-কহেন দুহিতায়—
"জেব্‌উন্নিসা, আল্লা তোমায় করুন্ মেহেরবানি,
বাদ্‌শার উপর বাদ্‌শাহ সেই 'মৌলা' তোমার পাণি
যুক্ত করুন সেই হাতে, যার মুক্ত তরবার
কাফের-শোণিত সিক্ত মুলুক কর্‌বে অধিকার।"

বাঁদীর মুখে বাপের কথার জবাব দিল বালা,—
"চায় সে হতে স্বয়ংবরা; তারেই দেবে মালা
তস্‌বীরে যার মূর্ত্তি দেখে' ধর্‌বে নেশা চোখে;"—
মনটি যে তার টল্‌ছে তখন প্রেম-সিরাজির ঝোঁকে।

বাদ্‌শার হুকুম বাদ্‌শাজাদীর হয় নি মনোমত,
ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটায় কল্‌জে-ঢাকা ক্ষত,
দরদ-ব্যথায় জেব্‌-উন্নিসার টুটল চোখের নিদ্‌,
হার মানিলেন পিতাই শেষে, রইল মেয়ের জিদ্‌।
হাজার যুবা দূতের হাতে পাঠিয়ে দিল ছবি;
প্রেম-ডুরিতে বাঁধ্‌বে কারে এই তরুণী কবি।

দ্বিতীয় বার পছন্দ তার হোলো ওকিল খাঁয়,
কিন্তু মিলন? আশ্‌মানে ফুল ফুটবে যখন হায়!
সাধ্য গো কার এড়িয়ে যাবে অদৃশ্য সেই হাত?
ইঙ্গিতে যার নিব্‌ল বাতি, উৎসবেরি রাত
করলে আঁধার, বেল্‌সাজারের ভোজ না হ'তেই শেষ,
থাম্‌ল হঠাৎ ঝঙ্কৃত বীণ, সঙ্গীতেরি রেশ।
অঙ্গুলি তার রুদ্র লেখা লিখ্‌ল দেওয়াল-গায়,
পেন্সিলে নীল কৃষ্ণ ছটার উল্কা ছুটে যায়।
সে হাত এসে হইল বাদী বাদ্‌শাজাদীর সাথে,
রহস্যময় নিষেধ-বিধি লিখ্‌ল নতুন ছাঁদে।

বাদ্‌শা গিয়ে ওকিল খাঁরেই পত্র দিলেন লিখে—
"চাই সঁপিতে তোমার হাতে স্নেহের দুলালীকে।
দিল্-পছন্দ হইল গো তার তোমারি তস্‌বীর,
দিল্লী এস, রোজার শেষে দিন করেছি স্থির।"

ওকিল খাঁ এক বন্ধুকে তাঁর দেখান চিঠিখানি,—
(হায় তিনিও ধ্যান করেছেন বাঞ্ছিত সেই পাণি)
ঈর্ষা চেপে কহেন, "সখা, কর্‌ছি আমি মানা,
নয় সে উচিত তোমার আমার বাদ্‌শাজাদী আনা।
ঝাঁপ দিওনা আগুন খেলায় বল্‌ছি তোমায় সোজা,
এই লেফাফা ফন্দীভরা যায় না ভাল বোঝা;
দিল্লী যেতে সাধেন কেন বাদ্‌শা আরংজীব?
পাগ্‌লী মেয়ের খাম্‌খেয়ালি কর্‌লে কি উদ্‌গ্রীব?
বুঝ্‌তে নারি এই হেঁয়ালি মুণ্ড ঘুরে যায়,
ভাব্‌না আমার, একটা বিষম কাণ্ড ঘটে হায়,
শেষটা কি গো শিব্‌জী সম বন্দী রবে তাঁরি?
শোধ নেবেন এই অপমানের, কাজ কি এ ঝক্‌মারি?"
শঙ্কা ভয়ে শিউরে ওঠে ওকিল খাঁয়ের মন,
লুকিয়ে বুকে বুকের দাগা করেন পলায়ন।
যাবার বেলা জেব্‌উন্নিসার পত্র পাঠান হায়—
"ধর্‌ণা দিয়ে পড়্‌ব প্রিয়ে, পীরের সে দর্‌গায়।
চোখের জলে ঘুর্‌ছে, হের, দর্‌বেশেরি বেশ,—
এই মুসাফির প্রেমের ফকীর ছাড়্‌ল গো আজ দেশ,
লাগ্‌ত যে দেশ বেহেস্ত্‌ সমান তাকিয়ে তোমার পানে—
কি খুব্‌-সুরৎ তুহার মুখ্‌—হুরীরা হার মানে।

দিল্ মস্‌গুল্ কর্‌লে তোমার 'গুলেস্তাঁ'রি গুল,
উড়্‌ল বঁধু তোমার পেয়ার, দিওয়ানা বুল্‌বুল্।"

পত্র পড়ে' জেব্-উন্নিসা তুনিয়া দেখেন খালি.
জ্বল্‌ছে হরফ বুক-চেরা তার রক্ত-জমাট কালি।
নিত্যি নতুন টন্‌টনানি প্রাণ-বঁধুয়ার ধ্যানে,
বেদনা চেপে ওঠেন ক্ষেপে—লুটান রাজোদ্যানে।
খরগোশেরা পায় না সোহাগ, যায় না গো তার কাছে,
তেমন উতল রং ঢেলে আর ফুল ধরে না গাছে,
আল্‌বালে আর জল পিয়ে না ময়না টিয়ে সারী,
ডুক্‌রে ওঠে শুক্ রাতে কাঁদন শুনে তারি।

ফল্‌ল না রে রাঙা স্বপন ভাগ্যে ওকিল খাঁর!
কমনে যাবেন ইরাণ মরুর মরীচিকার পার?
উট চলে ওই ঘণ্টা বাজে, আব্‌ছা কাঁপে দূরে,
মাথার 'পরে দীপ্ত তারা, এক্‌লা যুবা ঘুরে।
দুই-কুঁজওলা উট চড়ে' যায় হাব্‌সী যুবতীরা,
কাঁচল 'পরে নূর-দরিয়ার ঝক্‌মকিছে হীরা।
তৃপ্তি হাসে রূপ ধরে ওই মায়াপুরীর পথে,
চুষ্‌ছে সুধা মরুর শিশু মার পয়োধর হ'তে।
চার্‌দিকে প্রেম—ফকীর ওকিল পায় না নাগাল শুধু!
পথ-হারা তার দিল্-সাহারায় জ্বল্‌ছে আগুন ধূধূ।
তৃষ্ণা-মেটার ঝর্ণাটি তার দিল্লীতে ঝর্‌ঝর,
আস্‌ছে খবর বিনা তারেই, যন্ত্র থাকে ধর্।
পড়্‌ল মনে 'রাবি'র জলে ভাসিয়ে আদুল গা,
ইদের সাঁঝে বাদ্‌শাজাদী ছুঁড়্‌তেছিল পা;
বিদায় বেলা দুষ্ট রাবি চুমার ঢেউএ ভরে'
ছাড়্‌ল বালার আপেল-গালের রংটি ফিকে করে'।
দিল্লী ফিরে চল্‌ল ওকিল্ চোখের দেখার লাগি'—
আজ যে তারে ডাক দিয়েছে হিয়ার দরদ্‌ভাগী।

ফাল্গুনেরি ফুল-দানীতে রং জমেছে দলে,
মিলন দোঁহে পারুল-বাগে জলপায়েরি তলে।
চাঁদনী রাতে হাতে হাতে পরশ-রসে ভোর,
লুকিয়ে মনের কোণে কোণে খেল্‌ছে মনোচোর।

রূপ সে খেলায় 'কাণামাছি', প্রেম হোলো রে 'বুড়ি',
প্রাণ-বঁধুয়া পর্শি তারে বসল রে বুক জুড়ি'।
চুম্‌কুড়ি দেয় ফুল-কুঁড়িরা, মান্‌বে কে আজ মানা?
নিঙ্‌ড়ে দে তোর আনার-মধু, যা খুসি তাই গা' না।

পিক পাপিয়া দিক্ ছাপিয়া দেয় রে উলুধ্বনি,
ভর্ পেয়ালা রূপসী সাকী দুলিয়ে বেণীর ফণী।
বৌ কথা কও সাম্‌নে এসে কর্‌ছে পরিহাস—
"হায় তরুণি, এই বেলা তোর মিটিয়ে নে রে আশ।
যার লাগি তোর বাদ্‌শা পিতা 'হুলিয়া' দিয়েছে,
দুলিয়ে দে হার কণ্ঠে লো তার সেই আজ এয়েছে।"

আচম্বিতে ফুল-বীথিতে সারং বেসুর বলে,
আরংজীবের কালো ছায়া কাঁপ্‌ল বেদীর তলে।
তর্ সহেনা লুকায় কোথা? আজ্‌কে ধরা প'লে
বাদ্‌শার হুকুম কর্‌বে তামিল ডালকুত্তার দলে।
কয় সে বঁধুর কাণে কাণে—"সময় যে আর নাই,
লুকিয়ে থাক, বাদ্‌শা আসেন—পায়ের আওয়াজ পাই।
লুকিয়ে থাক ডেক্‌চিতে ওই, রোয়ো নীরব হয়ে'—
মান রেখো গো বাদ্‌শাজাদীর, যায় গো সময় বয়ে'।
হয় তো মোদের শেষ চুমু এই, মিট্‌লনা রে তৃষা,"
ফিরিয়ে নিল ব্যগ্র অধর ত্রস্ত জেব্‌উন্নিসা।"

"কি আছে ওই ডেক্‌চি মাঝে?"—আরংজীবের স্বর
বজ্রভরা মন্দ্র মেঘে কাঁপ্‌ছে থরথর।
কইল বালা—"আছে ঢালা টাট্‌কা গোলাপ-জল।"
শির-দাঁড়া তার গুঁড়িয়ে গেল, ফাট্‌ল পাঁজরতল।
বাদ্‌শা কহে—"চুইয়ে নেব, আতর হবে বেশ।"
বহ্নিতাপে ফুটল বারি বাদ্‌শাহী আদেশ।

সেই আগুনেই ঝল্‌সে গেছে ফুল্ল পারুল-বাগ,
মর্ম্মরেরি শুভ্র পরীর দগ্ধ বুকের দাগ
দীর্ণ করে ফুঁপিয়ে ওঠে গুমরে-কাঁদন কার!
অশ্রু ঢেলে কর্‌লে লোনা রাবির বারিধার।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

অগ্নিপরীক্ষা

এমন পরীক্ষায় কোন জাতি কখন পড়েনি। একেবারেই অগ্নি-পরীক্ষা! দুশো বৎসর ধরে যাদের পৌরুষকে জাগিয়ে না রেখে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, কোনোরকম সাহসিক কাজেই যাদের ব্রতী করা হয় নি, সৈনিক-বৃত্তির দ্বার যাদের জন্যে পুরুষানুক্রমে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে, আজ তাদের হঠাৎ বলা হচ্ছে—একদম জার্মানের আগুনের সম্মুখে আগুয়ান হও! সীতার সতীত্ব যেমন অগ্নি-পরীক্ষায় সাব্যস্ত হয়েছিল, বঙ্গীয় পুরুষের পৌরুষও তেমনি আজ অগ্নি-পরীক্ষায় যাচিয়ে নেওয়া যাবে। কাশীপুরের রেক্রুটিং মিটিংয়ে কমিশনর বাহাদুর র‍্যাঙ্কিন সাহেব প্রকারান্তরে সেই কথা বল্লেন, কলেজ স্কোয়ারের মিটিংয়ে বঙ্গীয় লাটের সদস্য কামিংসাহেব ভাষান্তরে সেই কথাই বল্লেন, বেঙ্গল রেজিমেণ্ট কমিটির রেক্রুটিং অফিসার কর্নেল বুড়িয়ার সাহেব প্রতি মিটিংয়ে বাঙ্গালীদের সেই কথাই শুনিয়ে এলেন, এবং খাস দরবারে বাঙ্গালী শ্রোতার প্রতি স্বয়ং লাটসাহেবের সেই একই উক্তি অমর ক'রে বাঙ্গলা রেজিমেণ্ট কমিটির মোহর-ওয়ালা কাগজে ছাপিয়ে রাখা হয়েছে। যে কোন বাঙ্গালীর রেজিমেণ্ট কমিটির সঙ্গে পত্রব্যবহারের সৌভাগ্যলাভ হবে তাকেই প্রথমে লাটসাহেবের উক্ত উক্তির সম্মুখীন হতে হবে:—

"I would tell the men of Bengal that the Government has granted them their hearts' desire, they have been given the privilege of fighting under the banner of their king and I would say to them then that you do not fail."

লাটসাহেব বলছেন fail হয়োনা বাঙ্গালী পুরুষেরা! য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষা আর এ পরীক্ষায় অনেক তফাৎ! দেখনা কেন য়ুনিভার্সিটিতে বি-এ ফেল্, এফ-এ ফেল, এণ্ট্রেন্স ফেল হয়েও বিয়ের বাজারে আর চাকরীর বাজারে বিকিয়ে যাচ্ছ—কিন্তু এ অগ্নিপরীক্ষায় যদি ফেল হও ত জগৎহাটে মানের বাজারে এক কাণা কড়িও তোমাদের মূল্য হবে না।

লাটসাহেব বলছেন—"I would tell the men of Bengal that the Government has granted them their hearts' desire."

বাঙ্গালীর কোন্ প্রাণের অভিলাষটি গবর্ণমেণ্ট পূরণ করেছেন? একেবারে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার অভিলাষ? এ অভিলাষও ত সাধারণ নয়! এমন আত্ম প্রত্যয়, এমন আভিজাত্য-জ্ঞান আর কোন্ জাত দেখিয়েছে? সোনার বাঙ্গলার মানুষও যে সোনার তা তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, নয়ত অগ্নিপরীক্ষায় আর কার কামনা বা সাহস হতে পারে? মেকলে থেকে আরম্ভ করে সব ইংরেজই বাঙ্গালীকে বুলি পড়িয়ে আসছেন—"বাঙ্গালী

ঝুটো, বাঙ্গালী নগণ্য, বাঙ্গালী মূল্যহীন"—এত বছরের বুলি পড়েও বাঙ্গালী বল্লে—"না, বাঙ্গালী সাচ্চা, বাঙ্গালী সোনা, আগুনে পুড়িয়ে দেখ"। চট্টগ্রামের বাঙ্গালী, তোমাদের মধ্যে সেই কথা বলবে কে, কে আগুনে পুড়তে সাহস করবে?

একবার ভূতপূর্ব্ব বড়লাটসাহেবের পত্নী লেডি হার্ডিংয়ের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে কথোপকথন হয়েছিল। তার পূর্ব্ব-ইতিহাস একটুখানি জানানর দরকার।

দিল্লী দরবারের পূর্ব্বে ভারত-সম্রাটের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে ভারবর্ষীয়দের কি বিশেষ দান দেওয়া হবে এই বিষয়ে যখন নানারকম আলোচনা চলছিল তখন "Coronation Boon to the Bengalis" এই শীর্ষে একটি ইংরেজী প্রবন্ধে আমি আমার মতে কি দান দেওয়া উচিত তা ব্যক্ত করি। তখনকার দিনে আমার প্রস্তাবিত দানের কল্পনাটুকুও এত দুঃসাহসিক বোধ হয়েছিল যে যে বাঙ্গালী টাইপিষ্টের দ্বারা আমি প্রবন্ধটি টাইপ করাই সে টাইপিষ্ট ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিল পাছে এমন পরম দুঃসাহসিক প্রস্তাব টাইপের সংযোগে প্রচারের দোষে সে ধরা পড়ে। একজন বঙ্গবন্ধু ইংরেজ সম্পাদককে আমি সে প্রবন্ধ পাঠিয়ে তাঁর কাগজে তার অনুভূতি বিষয়ের আলোচনা করতে অনুরোধ করি। তিনি লিখে পাঠালেন—"এখনও এ প্রস্তাবের সময় আসেনি। গবর্ণমেণ্ট এ প্রস্তাবকে অসমসাহসিক মনে করবেন,—প্রায় বোমার গোলা ফেলার মত,—এবং আজকাল কোন সম্বাদপত্রই এ প্রস্তাবকে পত্রে স্থান দিতে সাহস করবেনা।"

সে প্রবন্ধের কতকগুলি ছিন্নপত্র আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে পড়ে আছে। তার ভিতরকার প্রস্তাবটি কি ছিল শুনবে?—যা ছয় বৎসর পূর্ব্বে একটি ভারত-সুহৃদ্ ইংরেজ সম্পাদকের মনেও বিভীষিকা উৎপাদন করেছিল? সে আর কিছু নয়, শুধু এই যে—বাঙ্গালীদের সৈন্য কর।

সে প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম:—

"In the days of old when Gods and men were not such utter strangers to each other as they are in these degenerate days, and boons followed austerities invariably, Druva chose the sovereignty of a new world to be called after his name and repented ever afterwards for losing the chance of asking for something greater. Nachiketa was wiser and would have nothing short of the knowledge of things eternal by possessing which he knew he would possess all things on earth. The God of Death tried hard to dissuade him, tempted him with everything that a mortal's heart could desire, but he would not be waived from his purpose and got at last what he stood fast for.

What should we Bengalis ask for on the happy occasion of the Emperor's coronation? Now that the news is going round that His Gracious Majesty King George V of England and Emperor of India would

beseat himself on his hereditary throne in India and dispense boons with his two hands like the beloved kings of yore and would verily prove himself a representative of God on earth with the lustre of Indra, the strength of Vayu and the riches of Kuvera—what should we Bengalis ask for?

Sore as the Bengalis are on the question of the Partition of Bengal, we must hesitate nevertheless when the choice of a boon is offered to fix upon the reconsideration of the Partition as *the* boon to be desired at this particular moment. For the Partition is a temporary political blunder which shall be redressed as a matter of course, it being a question of time only. For it is a blunder which injures the rulers just as much as the ruled. We should rather seize the present opportunity to gain something greater,—i. e, that which has been withheld from us as a race ever since the British people took over the reins of our government. The restriction that denies the Bengali youth fullest opportunity for rendering loyal service, their ineligibility to be admitted in the army is the one act of iniquity and injustice under the British rule that cries for removal; and I believe when legitimate routes of bravery and heroism are opened up to them, the dark subterranean passages of political dacoities would be deserted for ever by the youth of Bengal. Give them equal opportunities of military service with other races of India, foster their manhood and self-esteem on the right lines, open up the doors of willing service to their king and I dare assert the Bengali youth would not be a source of anxiety to Government but a tower of strength. Would you allow your enemies to enlist them and yourself fail to recognise their merits?

Stung to the quick, hurt to the deepest depths by the cowardly taunts of barrack-room poets like Rudyard Kipling and the campaigns of falsehood of other writers and for ever denied the chance of belying those calumnies in the open battlefield, some of the Bhadralok Bengalis have been driven to moral suicide in the way of dacoities. Yet are these dacoities not indications of the stifled yearning for the mere physical conditions for the noblest of human achievements, the performance of heroic deeds?

The master-mind of a true statesman would see to the truth of my words in a flash of inspiration and my voice will not be the voice of one in the wilderness but that of a prophetess!"

দিল্লীর দরবার হয়ে গেল। যা দান বর্ষণ করবার তা করে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গেলেন। যে গোপন কথাটি আমার প্রাণের ভিতর ছিল তা রয়েই গেল, ব্যক্ত হবার সুযোগ পেলেনা। কিছুদিন পরে হঠাৎ একবার সাংঘাতিক রকম পীড়িত হয়ে পড়লুম। তখন এই পরিতাপ মনে জাগতে লাগল যে আমার কর্ত্তব্য সমাধা হল না, বাঙ্গালীকে অস্ত্র খেলিয়েছিলুম, কিন্তু তাদের অস্ত্র ধরাতে পারলুম না, বাঙ্গালীকে সৈন্যরূপে দেখার প্রথম ইঁটখানিও গাঁথতে পারলুম না। এবার সুস্থ হতে না হতে সিমলা পাহাড়ে ভাইস্‌রিনের মারফৎ ভাইসরয় সাহেবকে আমার অভীষ্ট-প্রস্তাব ও উল্লিখিত যুক্তিগুলি জ্ঞাপন করার সুযোগ গ্রহণ করলুম। আমার কথাগুলির উত্তরে সহৃদয়া লেডি হার্ডিং একটি কথা যা বল্লেন তা আমার এখনও মনে পড়ে। যখন আমি বল্লুম—"প্রকাশ্য আলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতা দেখাবার সুযোগ এদের রুদ্ধ বলেই, এদের উদ্দাম পৌরুষ ডাকাতির পথে আত্মপ্রকাশ করছে। ভেবে দেখুন আপনাদের দেশে কত শত-সহস্র যুবক আপনা আপনি সৈনিকবৃত্তি পছন্দ করে নেয়। আমাদের দেশেরও কোটি কোটি যুবকের মধ্যে ক্ষাত্র স্বভাবের যুবক শতসহস্র কি নেই? তাদের স্বভাবানুকূল বৃত্তি অবলম্বনের পথ যদি চিররুদ্ধ থাকে তারা বিপথগামী হতে পারে না কি?"

লেডি হার্ডিং বল্লেন—"সৈন্যদলভুক্ত হলেই কি সব শান্ত হবে? সৈন্য হলেই যে active serviceএ যাবে তার ত কোন কথা নেই? তুমি বাঙ্গালী যুবকদের সৈন্য হওয়া চাও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি যুদ্ধপর্ব্বের আয়োজন চাই, তা না হলে ত তোমার হিসেবে তোমার দেশের ভদ্রলোক ছেলেদের সৈন্য হওয়ার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হবে না। আমাদের দেশের যে-সব ছেলেরা সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করে তারা সকলেই active serviceএ থাকেনা, তাই বলে শান্তির সময় ত ডাকাতি করে না।"

এর উত্তরে আমি বল্লুম—"ব্যারাকের ড্রিল কস্‌রৎ প্রভৃতিতে শান্তির দিনে ইংরেজ যুবকের উদ্দামতা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে, আমাদের ছেলেদের সে পথও রুদ্ধ, শারীরিক ব্যায়ামের ক্লাব মাত্রই আজ সিডিষণের আখড়া বলে গণ্য।"

কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে স্পষ্ট করে মনের অভিলাষটা ব্যক্ত করা সেদিনের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার ছিল—মূষিক জাতির বেড়ালের গলায় ঘণ্টা পরানর মত। যে কথাটা সেদিনকার ইংরেজ সম্পাদকের মতে কাগজে আন্দোলনের সময় আসেনি, সে কথাটা সেই ঢাকঢাক গুড়গুড়ের দিনে মুখফুটে বলার সুযোগ মাত্রে আমি ধন্য বোধ করলুম। আমার একজনের বলায় সদ্য সদ্য ফল হয় নি,—তার অনেক পরে অনেকের বলায় হয়েছে। তাই বড়লাট বলছেন—"I would tell the men of Bengal that the Government has granted them their hearts' desire."

কিন্তু আজ লেডি হার্ডিংয়ের সেই একটি কথা আমার কাণে বাজছে—"বাঙ্গালী যুবকদের সৈন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি

যুদ্ধপর্ব্বের আয়োজন চাই * * তা নইলে তাদের সৈন্য হওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।"

প্রাতঃস্মরণীয়া লেডি হার্ডিং সেদিন যে কথাটা পরিহাস করে বলেছিলেন আজ কালচক্রে মহাকালের ইচ্ছায় সত্যসত্যই তা ঘটেছে। যুদ্ধপর্ব্ব সমাগমের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীকে সৈন্য হতে সম্মতি দেওয়া হয়েছে, তার পূর্ব্বে নয়। মুষ্টিমেয় দস্যুমার্গাবলম্বী ছেলেদের কথা ছেড়ে দিলে বাকী সমগ্র জাতির পক্ষে এ বড় কঠিন পরীক্ষার দিন। কসরৎ করতে ভালবাসা, ঘরে বসে সকালে বিকেলে কুস্তির আখড়ায় গিয়ে মাটি মেখে আসা, প্যারালালবার, ডাম্বল ও নানারকম জিমন্যাষ্টিকের দ্বারা শরীরের স্ফূর্ত্তিসাধন করা, এমন কি তলোয়ার ও ছোরা খেলায় খেলা হিসেবে নৈপুণ্য আয়ত্ত করা এক জিনিষ, আর প্রকৃত পক্ষে তলোয়ার হাতে নিয়ে সমরক্ষেত্রে মারতে বা মরতে বেরিয়ে পড়া আর এক জিনিষ। আর এ যুদ্ধে তলোয়ারও চলে না, শুধুই অগ্নিবর্ষণে ঝাঁপ দেওয়া। এক্ষেত্রে যোদ্ধা হওয়ার জন্যে শারীরিক বলের তত প্রয়োজন নেই—আছে প্রয়োজন মনের বলের। এখানে মনের পিছনে শরীর ছোটে, শরীরের সঙ্গে মন এগোয় না। এখানে পালোয়ান চাইনে, সাহসী চাই।

সাহস জিনিষটা যে পরিমাণে শারীরিক বল ও অস্ত্রকুশলতাসাপেক্ষ ততটুকু ব্যায়ামপটু ও কষ্টসহিষ্ণু শরীর চাই এবং ততটুকু অস্ত্রদক্ষতা চাই। তাই এই যুদ্ধের জন্যে একটা পল্টনকে তৈরি করতে বেশী দেরী লাগেনা, প্রায় তিনমাসের শিক্ষায় ও অভ্যাসে তারা যুদ্ধক্ষম হয়ে ওঠে। এবারকার জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ প্রচার করছে বাহুবলের চেয়ে মনোবলই আসল বল। সেই মনোবল চট্টগ্রামের যুবকেরা কতদূর দেখিয়েছে এবং আরও কতদূর দেখাবে? এই সেই দেশ যেখান থেকে বঙ্গীয় নাবিকেরা অতুল সাহসে সমুদ্রপথে নৌকা-বাহন করত, নৌযুদ্ধে পর্টুগীজদের সম্মুখীন হত। মৃত্যুভয় তোমাদের কোনদিন ছিল না, আজও তোমাদের গরীবদের মধ্যে নেই। কেননা চট্টগ্রামের লস্করেই য়ুরোপের যুদ্ধজাহাজবর্গও আজ গতিশীল। তোমরা তবে যুদ্ধানলে ঝাঁপ দিতে পিছপাও কেন হবে?

শুনতে পাই পূর্ব্ববঙ্গে ইণ্টার্ণমেণ্ট বাহুল্যে একটা রব উঠেছে—"মরতে ভয় পাই না, লড়তে ভয় পাই না, কিন্তু মরব কার জন্যে, লড়ব কার জন্যে? যে গবর্ণমেণ্ট ইণ্টার্ণমেণ্ট-রূপী দানবকে আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে তার জন্যে কেন প্রাণ দেব?"

ভাই, প্রাণ দেওয়া কোন গভর্ণমেণ্টের জন্যে নয়, প্রাণ পণ করা আত্মাভিমানের জন্যে। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে অভিমান করে আত্মাভিমানে কুঠারাঘাত করো না। যারা ঘরে রইল তারা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বুঝাপাড়া করবে, ইণ্টারমেণ্ট দৈত্যকে দেশ-ছাড়া করবে। যাদের বাইরে ডাক পড়েছে তারা বেরিয়ে এস—ঐ যেখানে রণরঙ্গিণী আমাদের ডাকছেন, এতদিন পরে বাঙালী সন্তানের উপর প্রসন্ন হয়েছেন—সেইখানে তাঁর পাশে গিয়ে উন্মত্ত উল্লাসে জাতীয় সম্মান রক্ষা ও বৃদ্ধি কর। কে আছে বীর চট্টগ্রামের সন্তান, নির্ভীক ও স্বাধীন নাবিকদের উত্তর পুরুষ, যার ধমনীতে এমন

সুযোগে আজ আহ্লাদ নেচে উঠছে না! তোমরা হিন্দু, মুসলমান, মগ, ফিরিঙ্গি যাই হও, যুদ্ধ-সমুদ্রে প্রাণ-নৌকা একবার বাহন করে এস, এপার ওপার পাড়ি দিয়ে দেখ, কেমন তালে তালে নৃত্য করতে করতে ঢেউয়ে ঢেউয়ে উঠে পড়ে জীবনের উপকূলে আবার এসে লাগবে! সমুদ্রে সবাই ডোবেনা, যুদ্ধে সবাই মরেনা। রাশি রাশি নৌকা পাল তুলে চলেছে—পাঞ্জাবী, মারাঠী, গোর্খা, রাজপুৎ, ইংরেজ, ফরাসী, জাপানী, মার্কিন! বাঙ্গালী, তুমিও নোঙর খুলে বেরিয়ে পড়, পালে হাওয়া লাগাও, উৎসাহে ফুলে ওঠ, সাহসে বাধা কাটিয়ে চল। কে যাবে চট্টগ্রামবাসী এই মহাযাত্রায় যাত্রী হয়ে?

২৩শে মার্চ শ্রীসরলা দেবী।
১৯১৮

সৌজাত্যবিদ্যা সম্বন্ধে দুই-একটী কথা

(২)

আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে বলিয়াছি, (১) পিতামাতার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, এবং উভয় পক্ষের উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষদেরও দৈহিক ও মানসিক রোগহীনতা প্রভৃতিই সুসন্তান উৎপাদন বিষয়ে প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। জীবতত্ত্ব ও বংশানুক্রমের আবিষ্কৃত সত্যগুলিই এ-সকল স্থলে সৌজাত্য বিদ্যা সমাজক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে চায়। জীব-তত্ত্বের আরও অনেক সত্য সৌজাত্যবিদ্যার লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিব।

অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় যৌন-নির্ব্বাচন বা বিবাহ-ব্যাপারেও—সুপ্রসিদ্ধ "Golden mean" বা "মধ্যপন্থা"ই বোধ হয় শ্রেয়স্কর। যে দুই জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত প্রার্থক্য অত্যন্ত বেশী তাহাদের যৌন-সম্মিলন শুভকর নহে।—আবার অন্যপক্ষে যাহাদের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত বেশী তাহাদের যৌন-সম্মিলনও মঙ্গলকর নহে। বর্ত্তমান যুগের জীবতত্ত্বের প্রধান আচার্য্য ডারুইন স্বয়ং এইরূপ কথা বলিয়াছেন (২)।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জাতির মধ্যে নরনারীর সম্মিলন যে ভাল নহে তাহা বোধ হয়—সহজ-সংস্কারবশতঃ—পৃথিবীর প্রাচীন জাতিরাও বুঝিতে পারিত। সেইজন্য দেখা যায় যে প্রাচীন জাতিরা পরস্পরের মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রায়ই নারাজ হইত। প্রাচীন গ্রীক, রোমক, হিব্রু প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই অল্পবিস্তর এই ভাব ছিল। পরে অবশ্য যুদ্ধে বন্দিনী

(১) সৌজাত্যবিদ্যা—ভারতী, চৈত্র, ১৩২৪

(২) Darwin—The Origin of species.

অন্য জাতির স্ত্রীগ্রহণের প্রথার মধ্য দিয়া অনেক জাতি-সংমিশ্রণ হইয়াছিল, কিন্তু কোনকালেই পরজাতির স্ত্রীগ্রহণের প্রতি মনের বিরূপ ভাবটা যায় নাই।

প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে এই ভাবটা অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেইজন্য আর্য্য-অনার্য্যদের মধ্যে বহুকাল যুদ্ধের পর একটা মিটমাট হইয়া গেলেও—বিবাহের আদান-প্রদান হইতে বহু যুগ কাটিয়া গিয়াছিল। যদিও পরবর্ত্তী কালে আর্য্য-অনার্য্য-শোণিতের সংমিশ্রণ হইয়াছিল—কিন্তু ব্যাপারটা চির-কালই আর্য্যসমাজে নিন্দনীয় ছিল। আর এখন পর্য্যন্ত যে সেই সহজ বিদ্বেষের ভাবটা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় নাই, তাহার প্রমাণ, দেশশুদ্ধ সকল জাতির আদমসুমারীর খাতায় আর্য্যনাম লিখিবার বিপুল আগ্রহ। যদিও অনেক বর্ণের মধ্যে সূক্ষ্ম রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াও 'আর্য্য-রক্তের' আভাস পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ,—তবুও সকলেই আমরা বুড়া মনুপরাশরের দোহাই দিয়া নিজ নিজ বংশের সীমা-রেখাটাকে সরস্বতী নদীর তীর পর্য্যন্ত টানিয়া লইতে ব্যস্ত।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির * নরনারীর যৌনমিলন যে কোন জাতির পক্ষেই শুভকর নহে—তাহার প্রমাণ মানব-ইতিহাসে যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমেরিকা, আফ্রিকা ও ও পলিনেশিয়ার অনেক আদিম জাতি যে অধিক-উন্নত ও অধিক-সভ্য ইউরোপীয় জাতির সহিত সংমিশ্রণে একেবারে লোপ পাইয়াছে—তাহাও সকলের জানা কথা। ডারুইন এরূপ কয়েকটী জাতিধ্বংসের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন (৩)। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে আদিমজাতির স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয়দের সমাগমে প্রায়ই বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইত। আর স্ত্রীগণের এই উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস বা লোপ জাতি-ধ্বংসের পূর্ব্বলক্ষণরূপে সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে। দুইটী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে—দুর্ব্বল জাতির জীবনপ্রবাহের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হওয়াতে তাহাদের মধ্যে নানারূপ রোগ ও দুর্ব্বলতাও দেখা দিয়াছে। এইরূপ মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কর-জাতি প্রায়ই দেহ-মনে অনুন্নত হইয়া পড়ে। প্রমাণ খুঁজিতে বেশীদূর যাইতে হইবে না। ভারতবর্ষেই সেইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে, এবং আমেরিকা ও আফ্রিকাতে দৃষ্টিপাত করিলেও বুঝা যাইবে।

আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত এই সত্যটী উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বলেন জীবতত্ত্ব-হিসাবে এই কথার কোন মূল্য নাই। কিন্তু এরূপ একটা চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মত প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। বরং আধুনিক যুগের একজন প্রধান পণ্ডিত এ-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জাপানের প্রধান মন্ত্রী এইরূপ জাতিসংমিশ্রণ বিষয়ে (জাপানীদের সহিত ইউরোপীয়দের) হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) মত চাহিয়া পাঠান। তদুত্তরে স্পেন্সার যে পত্র লিখেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

* এই প্রবন্ধে "জাতি"—'Race' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছি—'caste' নহে। 'caste=উপজাতি

(৩) Darwin—The Descent of man

"The physiological basis of this experience appears to be that any one variety of creatures in course of many generations acquires a certain constitutional adaptation to its particular form of life and every other variety similarly acquires its own special adaptation. The consequence of that if you mix the constitution of two widely divergent varieties which have severally become adapted to widely divergent modes of life, you get a constitution—which is adapted to the mode of life of niether, a constitution which will not work properly because it is not fitted for any set of conditions whatever."

অর্থাৎ দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির জাতির প্রকৃতি ও গঠন প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। তাহাদের মিশ্রণে উৎপন্ন যে সন্তান, সে কোন জাতির প্রকৃতি ও গঠনই ভাল করিয়া লাভ করিতে পারে না—সুতরাং জীবনযুদ্ধে মিশ্র জীবটীর কার্য্যকারিতা-হীন হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক জাতিরই একটা স্বাতন্ত্র্য একটা দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে তাহার সেই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যও রক্ষা করা দরকার। সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির সহিত যৌন-সম্মিলনে এই জাতীয় প্রকৃতি বা স্বাতন্ত্র্য-নাশের সম্পূর্ণ আশঙ্কা। সুতরাং যে জাতি আপনার অস্তিত্ব ও বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে চায় তাহাকে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হইবে। বিশ্ব-মানব বা মহামানবের মিলন মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ঘটিবে একথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু যৌন-সম্মিলন বা জাতিমিশ্রণের দিক দিয়া সেটা মঙ্গলকর কিনা এ বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। যাঁহারা ইউরোপীয় ও ভারতবাসীর মধ্যে বিবাহ-সংঘটনকে স্বর্গের পাকাসিঁড়ি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবেন, "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং।"

এই জাতি-সংমিশ্রণের ব্যাপারে ভারত-বাসীরা এখনও যে খুব সাবধান তাহাতে সন্দেহ নাই। বরং ব্যাপারটা আর এক বিপরীত দিকে গিয়া আমাদের অনিষ্ট ঘটাইতেছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ অনিষ্টকর। কিন্তু একই জাতির বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যৌন-সম্মিলন জীবতত্ত্ব-হিসাবে খুবই কল্যাণকর (৪)। ইহাতে নূতন রক্ত-সংমিশ্রণে উৎকৃষ্ট সন্তানের জন্ম হয়, জাতির উৎকর্ষ সাধিত হয়, জাতির মধ্যে নবতেজের সঞ্চার হয়। একই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বহুকাল ধরিয়া যৌন-সম্মিলন ঘটিলে, জাতি নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে, বুদ্ধিমান ও সুস্থ-সবল লোকের জন্ম দুর্লভ হইয়া উঠে। হিন্দুসমাজে এই সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী এতদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, তাহা সম্পূর্ণ ভয়াবহ। সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে বাঙ্গালী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভেদের গণ্ডী ত আছেই। এক এক প্রদেশে আবার ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি শত শত উপজাতি (Caste) আছে। এক এক উপজাতির

(৪) Darwin—The origin of species. বর্ণ = variety.

মধ্যে আবার শত শত বিভাগ। এক এক বিভাগের আবার শত শত শাখা, এক এক শাখার আবার শত শত উপশাখা। এই-রূপভাবে সীমা টানিতে টানিতে ব্যাপারটা যে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। অনেকস্থলে এই সকল কৃত্রিম গণ্ডী-বন্ধনের ফলে বিবাহক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে বিবাহই হয় না। কুলীনদের মধ্যে শত শত অনূঢ়ার অস্তিত্ব এখনও বিরল নহে। আধুনিক কালের কন্যাদায়ের সমস্যা, যে, অনেকটা ইহারই ফল নহে, তাহাও বলা যায় না। বরঞ্চ অর্থনীতি-শাস্ত্রের 'Law of demand on supply'-এর সূত্র প্রয়োগ করিলে, ইহাই প্রতীয়মান হয়। হিন্দুর শাস্ত্রবিরুদ্ধ যে সগোত্র ও সপিণ্ড-মিলন—তাহার সীমানা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা কোন কোন স্থলে দেখা যাইতেছে। এই-সব সঙ্কীর্ণ উপজাতি, শাখা, উপশাখা প্রভৃতির মিলনে যে নিবীর্য্য সন্তানের জন্ম হইতেছে, জাতি অনুন্নত হইয়া পড়িতেছে এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কেহ কেহ আবার আধুনিক 'বংশানুক্রম তত্ত্বে'র দোহাই দিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত "কৌলীন্য"-প্রথার সমর্থনের চেষ্টা করিতেছেন। ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ হাস্যকর তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহাদের আধুনিক 'বংশানুক্রম-তত্ত্বে'র কিছুমাত্র 'ষত্ব-ণত্ব' জ্ঞান আছে তাঁহারা কখনই এরূপ বলিবেন না। বংশানুক্রম-তত্ত্ব জীবতত্ত্বের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু-সমাজে প্রচলিত আধুনিক 'কৌলীন্য', কৃত্রিম প্রথা ও আভিজাত্য-গর্ব্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকস্থলে এই-গুলির মূল আকার ধনগর্ব্ব বা কাঞ্চন-কৌলীন্য। বংশানুক্রম বৈজ্ঞানিক সত্য-হিসাবে নর-নারীর শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের সন্ধান করিয়া থাকে, এবং "কৌলীন্য" আভিজাত্যের মিথ্যাগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া কেবল কতকগুলি গতানুগতিক প্রথা মানিয়া চলিতে প্রাণপণ করে। বংশানুক্রম ও 'সৌজাত্যবিদ্যা'র উদ্দেশ্য জাতির উৎকর্ষ-বিধান, 'কৌলীন্যে'র উদ্দেশ্য স্বার্থের পরি-পুষ্টি। প্রথম যখন কৌলীন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তখন 'নবধা কুললক্ষণং'এর হিসাব হইয়া-ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু এখন ত সে হিসাবের কল্পনাও কাহারও মনে আসে না। 'কাঞ্চন-কৌলীন্য' ও 'বনিয়াদির' খেয়ালেই সব কাজ চলিয়া থাকে। নর-নারী ও তাহাদের বংশের দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষ, অনুরূপ যোগ্যতা, উৎকৃষ্ট সন্তানের উদ্ভব, জাতির কল্যাণ, এ-সব কৌলীন্য-বাদীরা স্বপ্নেও ভাবে না। কোন্ কোন্ পর্য্যায়ের গরমিল হইলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হইবে—আর কোন্ পর্য্যায়ের হিসাব ঘটক-মহাশয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেই ভবিষ্যতে 'নন্দনকাননের মৌরশীপাট্টা' লওয়া যাইবে, তাহা সেখানকার আলোচনার বিষয়।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

প্রাচীন উপদেশমত এই নিয়মগুলি বিবাহব্যাপারে মানিয়া চলিলেও সৌজাত্য-বিদ্যার উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যাঁহারা সময়ে-অসময়ে সকল ব্যাপারেই 'আর্য্যামি'র বড়াই করেন, তাঁহারা

'কৌলীন্যে'র এই প্রাচীন নিয়ম মানিয়া চলেন কি? আমরাও হিন্দু-সমাজ ও সভ্যতার গৌরব করিয়া থাকি। কিন্তু যত পাকা ইমারতই হোক্ না কেন—কালবশে তাহার যে জীর্ণসংস্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়ে—নদীপ্রবাহের ন্যায় জাতির জীবন-প্রবাহও যে নূতন নূতন ঘাত-প্রতিঘাতে বহিয়া আপনাকে শক্তিশালী করিয়া নেয়, এই সনাতন সত্য অস্বীকার কবিবার মত দুঃসাহস আমাদের নাই।

আমরা আজ বিশ্বমানবের মিলন ঘটাইতে ব্যস্ত। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের জাতিরই বিভিন্নবর্ণের মধ্যে রক্তসংমিশ্রণের চেষ্টা করিলে বোধহয় ভাল হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিরাট হিন্দু-জাতির মধ্যে স্থানগত কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিলেও তাহাদের মধ্যে এক নিবিড় জাতীয় ঐক্যের বন্ধন সুস্পষ্ট। এই বিভিন্ন প্রাদেশিক হিন্দু-সমাজের মধ্যে যোগ্য নর-নারীর বিবাহ-বন্ধন ঘটিলে জাতির মধ্যে নবরক্ত সংমিশ্রণের ফলে যে নূতন তেজ ও বীর্য্যের উদ্ভব হইবে, জাতীয় উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই। যাঁহারা 'মহাভারতে'র কল্পনা করিতেছেন, তাঁহাদের এটা প্রণিধান করিবার বিষয়। আবার, এক এক প্রাদেশিক হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে রক্ত-সংমিশ্রণ আরও প্রয়োজনীয়। সহস্র সহস্র শাখা-উপশাখায়-বিভক্ত হিন্দু-সমাজের কৃত্রিম গণ্ডী ভাঙ্গিয়া নব নব রক্ত-সংমিশ্রণের ব্যবস্থা হোক্। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলাইয়া আমাদের নবযুগের সমাজের ভিত্তি গঠিত হোক্। ইহা অশাস্ত্রীয়ও নহে। প্রাচীন সমাজপতি ও শাস্ত্রকারেরা দূরদৃষ্টির বলে ইহার পথ-নির্দ্দেশও করিয়া গিয়াছেন। শুধু আমরাই সকল ধর্ম্ম ও সত্যের উপরে দেশাচারকে স্থান দিয়া, তাহারই নাগপাশে বদ্ধ হইয়া আজ হাঁকপাঁক্ করিয়া মরিতেছি। যে জাতি উঠিতে চায় তাহাকে এই নাগপাশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। যে সত্য দিবালোকের মত মুক্ত ও স্বচ্ছ, তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া জাতীয় উৎকর্ষ ও সামাজিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। "সৌজাত্যবিদ্যা" এই শিক্ষা দেয়; সুতরাং "সৌজাত্যবিদ্যা" আধুনিক যুগে আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

"বর্ব্বর" শব্দের পুরাতত্ত্বের প্রমাণ

"বর্ব্বর" শব্দটীর প্রয়োগ-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, কৌতুকাবহ ঐতিহাসিক সত্যেরই সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

বর্ব্বর শব্দটী যে সংস্কৃত ভাষারই শব্দ, শব্দশাস্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত সুপ্রচলিত বাক্য হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বামিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।"

এখানে "বর্ব্বর" যে ভাষাজ্ঞানে অজ্ঞ

ব্যক্তিরই বোধক তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে।

'বর্ব্বর' শব্দের অপর একটী প্রয়োগ অপর একটী 'সুপ্রচলিত' বাক্যে পাওয়া যায়, যথা—"ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ॥" অর্থাৎ 'বর্ব্বরেরা গত না হইলে কোন বিষয় দেখিতে পায় না।' ইহার তাৎপর্য্য এই যে বর্ব্বর-দিগের দূরদর্শন নাই। এস্থলে 'বর্ব্বর' মূর্খ অর্থেরই বোধক হইতেছে।

সংস্কৃত অপর একটী বাক্যেও 'বর্ব্বর' শব্দের একটী বিশেষ অর্থের আভাস রহিয়াছে, যথা—

"যেনতেন প্রকারেণ বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ঃ।"

এস্থলে 'বর্ব্বর' নির্ব্বোধ, বোকা লোককেই বুঝাইতেছে।

এই নির্ব্বোধ ভাব হইতেই বর্ব্বর শব্দের সহিত একটী অমার্জ্জিত অশিক্ষিত ভাব সংযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষার "বর্ব্বরোচিত" শব্দে এই অমার্জ্জিত বা অসভ্যতার ভাবটী স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত।

'বর্ব্বর' শব্দের মধ্যে এইরূপে ভাষাজ্ঞান ও সভ্যতার একটী নিকৃষ্ট আদর্শের আভাসই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

আর্য্যগণ আপনাদের উৎকৃষ্ট ভাষা, জ্ঞান ও সভ্যতার আদর্শ লইয়া যখন ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রতিবেশী ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা শুনিয়া তাঁহারা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ইহার অস্পষ্ট উচ্চারণের অনুকরণে ইহাকে 'বর্ব্বর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই 'বর্ব্বর' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের ভাষায় কেহ কথা বলিলেও, যদি তাহা আমরা স্পষ্টরূপে শুনিতে না পাই তবে "সে বর্‌বর্‌ করিয়া কি বলিতেছে?" এই-রূপ আমরা এখনও বলিয়া থাকি। "তাহার মুখে কি বল্‌বল্‌ করিতেছে?" ইহাও আমরা উক্তরূপ অর্থেই প্রয়োগ করিয়া থাকি। বলাবাহুল্য এই 'বল্‌বল্‌' প্রাগুক্ত 'বর্‌বর্‌' শব্দেরই অপভ্রংশ।

আর্য্যগণ বৈদিককালে অন্যপক্ষকে "কৃষ্ণবর্ণ" বা "অনাসিক" বলিয়া বিশেষিত করিতেন। বর্ণ ও আকৃতির বিশেষত্বের পর ভাষার বিশেষত্ব 'বর্ব্বর' শব্দদ্বারা প্রকাশিত হইত। 'বর্ব্বর' প্রথমে ভাষার বাচক হইয়া পরে জাতি ও দেশের বাচক হইয়াছে। পুরাণে 'বর্ব্বর' জনপদের স্থান-নির্দ্দেশ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"কম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরা হর্ষবর্দ্ধনাঃ।"

বিশ্বকোষধৃত মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ৫৭।৩৮

'দরদ' যে বর্ত্তমান দার্দ্দিস্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। কম্বোজ ও দার্দ্দিস্থান ভারতের উত্তরবর্ত্তী দেশ। ইহাদের সহিত একত্র উল্লিখিত হওয়ায় 'বর্ব্বর'ও ইহাদের সন্নিকট-বর্ত্তী স্থান বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের অনুসন্ধানও পুরাণের নির্দ্দেশকেই সমর্থন করে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্বের নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছেঃ—

"পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ সিন্ধুনদের মধ্যমোহনার সমীপবর্ত্তী স্থানকে * * * * প্রাচীন বর্ব্বর জনপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥"

'বর্ব্বর' নামক জনপদে 'বর্ব্বর' সংজ্ঞক অসাধুভাষার প্রচলন সম্বন্ধেও হিন্দুদিগের

গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন :—

"হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বর্ব্বর জনপদে একটী স্বতন্ত্র অপভ্রংশ ভাষাও প্রচলিত ছিল, যথা—
"বর্ব্বরাবন্ত্যা পাঞ্চালাঃ টাক্ক মালব কৈকয়াঃ॥"
(প্রাকৃতচন্দ্রিকা)।

ভাষার প্রমাণও যে পুরাণোক্ত সংস্থানেরই সমর্থক তাহাই এস্থলে অনুমিত হয়।

ভারতীয় আর্য্যগণই প্রথমতঃ আপনাদের অসভ্য, অনুন্নত, অশিক্ষিত প্রতিবেশীদিগের প্রতি "বর্ব্বর" এই শব্দ প্রয়োগ করেন। কালে এই "বর্ব্বর" শব্দটীই অসভ্য, অমার্জ্জিত ভাবের সাধারণ পরিভাষারূপে পরিণত হয়। এই পরিভাষারূপে 'বর্ব্বর' শব্দ কেবল ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাকে নাই —অপর দেশীয় সভ্যজাতিও তাঁহাদিগের অসভ্য প্রতিবেশীদিগের প্রতি হেয়তা জ্ঞাপনার্থ এই বর্ব্বর শব্দটীকেই বিশেষরূপে মনোনীত করেন। সর্ব্বপ্রথম গ্রীকগণই এই শব্দটী তাঁহাদের ভাষায় গ্রহণ করেন। গ্রীকদিগের নিকট হইতে রোমকেরা ইহা প্রাপ্ত হন। রোমকদিগের নিকট হইতে সম্ভবতঃ আরবীয়েরা ইহা আত্মসাৎ করিয়াছেন।

গ্রীকেরা বর্ব্বর শব্দটী যে ভারতবর্ষ হইতেই তাঁহাদের ভাষার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন তাহার ভাষাগত অতি আশ্চর্য্য নিদর্শনই বর্ত্তমান রহিয়াছে। 'বর্ব্বর'-বাচক 'barbarian' শব্দটীর মূল, ইংরেজী অভিধানে এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—

[L, barbarus, Gr. barbaros, bar, bar, an imitation of unintelligible sounds applied by the Greeks (and afterwards the Romans) to those speaking a different tongue from themselves.] Chambers's Etymological Dictionary.]

'বর্‌বর্‌' হইতে 'বর্ব্বর' অনুকার-শব্দ-রূপে উৎপন্ন বলিয়া আমরা পূর্ব্বে যে প্রদর্শন করিয়াছি—এস্থলে তাহার অনুরূপ অনুমানই আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

পাশ্চাত্য ভাষায় 'barbarian' শব্দ আমাদের বর্ব্বর শব্দেরই ন্যায় যেমন অসভ্যতা ও অমার্জ্জিত ভাবের সূচক—তেমনই ভিন্ন-জাতীয়তারও সূচক। পাশ্চাত্যভাষার 'Barbarian' শব্দ অপভাষার জ্ঞাপক এবং barbarity শব্দ অসভ্যতা ও অকমনীয়তার জ্ঞাপক। এইরূপে 'বর্ব্বর' শব্দ রূপতঃ ও অর্থতঃ উভয়তঃই যে পাশ্চাত্যভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে তাহারই প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি।

বর্ব্বর শব্দদ্বারা শেষে আরবীয়েরা আফ্রিকার 'বার্ব্বরি' দেশের নামকরণ করিয়াছে।

ভারতীয় আর্য্যগণ আপনাদিগের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যরক্ষার্থ অসভ্যদিগের জন্য যে 'বর্ব্বর' রূপ পরিভাষার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, অপর প্রাচীন সভ্যজাতিও অবিকল সেই পরিভাষাই আপনাদের জন্য গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সভ্যতার অধিক মৌলিকত্ব ও উৎকর্ষেরই সাক্ষ্যদান করিতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মায়ের সম্মান

অপূর্ব্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা সাতটা গাড়ি,
ছিল কুকুর; ছিল বেড়াল; নানান্ রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ' সাত জোড়া;
দেউড়ি-ভরা দোবে চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস্, বেহারা, চাপ্‌রাসী।
—আর ছিল এক মাসি।

স্বামীটি তার সংসারে বৈরাগী,
কেউ জানে না গেছেন কোথায় মোক্ষ পাবার লাগি'
স্ত্রীর হাতে তার ফেলে'
বালক দুটি ছেলে।
অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
তাই সে হেথায় আছে
ধনী বোনের দ্বারে।
একটিমাত্র চেষ্টা যে তার কি করে' আপ্‌নারে
মুছ্‌বে একেবারে।
পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে'
কেউবা বলে' ওঠে, "আপদ জুটল কোথা থেকে"
আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম,
সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম।

কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাৎ ছোট্ট ছেলে;
তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে
বিধাতা যে প্রকাণ্ড এই ধরা;
অঙ্গে তাদের দুরন্ত প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা।

শিশু-চিত্ত-উৎসধারা বন্ধ করে' দিতে
বিষম ব্যথা বাজে মায়ের চিতে।
কাতর চোখে করুণ সুরে মা বলে, "চুপ্, চুপ্—
একটু যদি চঞ্চলতা দেখায় কোনোরূপ।
ক্ষুধা পেলে কান্না তাদের অসভ্যতা,
তাদের মুখে মানায়নাকো চেঁচিয়ে কথা ;
খুসি হলে রাখ্‌বে চাপি'
কোনোমতেই কর্‌বেনাকো লাফালাফি।
অপূর্ব্ব আর পূর্ণ ছিল এদের এক-বয়সী ;
তাদের সঙ্গে খেল্‌তে গেলে এরা হ'ত পদে পদেই দোষী।
তারা এদের মারত ধড়াধ্বড়,
এরা যদি উল্টে দিত চড়,
থাকৃত নাকো গণ্ডগোলের সীমা,—
উভয় পক্ষেরি মা
কানাই বলাই দোঁহার পরে পড়ত ঝড়ের মত,—
বিষম কাণ্ড হত
ডাইনে বাঁয়ে দু'ধার থেকে মারের পরে মেরে।
বিনা দোষে শাস্তি দিয়ে কোলের বাছাদেরে
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মাসি
থাকৃত উপবাসী,—
চোখের জলে বক্ষ যেত ভাসি।
অবশেষে দু'টি ছেলে মেনে নিল নিজেদের এই দশা।
তখন তাদের চলা-ফেরা ওঠা-বসা
স্তব্ধ হল, শান্ত হল, হায়
পাখীহারা পক্ষিনীড়ের প্রায়।
এ সংসারে বেঁচে থাকার দাবি
ঝাঁটায় ঝাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাবি' ;
ঘুচে গেল ন্যায় বিচারের আশা,
রুদ্ধ হল নালিশ করার ভাষা।

সকল দুঃখ দুটি ভাইয়ে করল পরিপাক
নিঃশব্দ নির্ব্বাক।
চক্ষে আঁধার দেখ্‌ত ক্ষুধার ঝোঁকে—
পাছে খাবার না থাকে, আর পাছে মায়ের চোখে
জল দেখা দেয় তাই
বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাক্‌ত, বল্‌ত "ক্ষুধা নাই।"
অসুখ কর্‌লে দিত চাপা; দেব্‌তা মানুষ কারে
একটুমাত্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে।
প্রথম যখন ইস্কুলেতে প্রাইজ্‌ পেল এরা
ক্লাসে সবার সেরা,
অপূর্ব্ব আর পূর্ণ এল শূন্য হাতে বাড়ি।
প্রমাদ গণি', দীর্ঘনিশাস ছাড়ি'
মা ডেকে কয় কানাই বলাইয়েরে,—
"ওরে বাছা, ওদের হাতেই দেরে
তোদের প্রাইজ্‌ দুটি।'
তার পরে যা ছুটি'
খেলা করতে চৌধুরীদের ঘরে।
সন্ধ্যা হলে পরে
আসিস্‌ ফিরে, প্রাইজ্‌ পেলি কেউ যেন না শোনে।"
এই বলে মা নিয়ে ঘরের কোণে
দুটি আসন পেতে
আপন হাতের খইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে।

এমনি করে অপমানের তলে
দুঃখদহন বহন করে' দুটি ভাইয়ে মানুষ হয়ে চলে।
এই জীবনের ভার
যত হাল্কা হতে পারে করলে এরা চূড়ান্ত তাহার।
সবার চেয়ে ব্যথা এদের মায়ের অসম্মান,—
আগুন তারি শিখার সমান
জ্বলচে এদের প্রাণ-প্রদীপের মুখে।

সেই আলোটি দোঁহায় দুঃখে সুখে
যাচ্চে নিয়ে একটি লক্ষ্য পানে—
জননীরে করবে জয়ী সকল মনে প্রাণে।

কানাই বলাই
কালেজেতে পড়চে দুটি ভাই
এমন সময় গোপনে এক রাতে
অপূর্ব্ব তার মায়ের বাক্স ভাঙ্‌ল আপন হাতে,
করল চুরি পান্নামোতির হার,—
থিয়েটারের সখ চেপেচে তার।
পুলিস-ডাকাডাকি নিয়ে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে;
যখন ধরা পড়ে পড়ে.
অপূর্ব্ব সেই মোতির মালাটিরে
ধীরে ধীরে
কানাই দাদার শোবার ঘরে বালিস দিয়ে ঢেকে
লুকিয়ে দিল রেখে।
যখন বাহির হল শেষে
সবাই বল্লে এসে—
"তাই না শাস্ত্রে করে মানা
দুধে কলায় পুষতে সাপের ছানা!
ছেলে মানুষ, দোষ কি ওদের, মা আছে এর তলে।
ভালো করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে।"
কানাই বলাই জ্বলে ওঠে প্রলয়বহ্নি প্রায়
খুনোখুনি করতে ছুটে যায়।
মা বল্লেন, "আছেন ভগবান,
নির্দোষীদের অপমানে তাঁরি অপমান।"
দুই ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাসি;
রইল চেয়ে দোবে চোবে, রইল চেয়ে সকল চাকর দাসী,
ঘোড়ার সহিস, বেহারা চাপ্‌রাসি।

অপমানের তীব্র আলোক জ্বেলে
মাঁকে নিয়ে দুটি ছেলে
পার হল ঘোর দুঃখদশা চলে চলে কঠিন কাঁটার পথে।
কানাই বলাই মস্ত উকিল বড় আদালতে।
মনের মত বউ এসেচে, একটি দুটি আস্‌চে নাৎনি নাতি,—
জুট্‌ল মেলা সুখের দিনের সাথী।
মা বল্লেন, "মিট্‌বে এবার চিরদিনের আশ,—
মরার আগে করব কাশীবাস।"
অবশেষে একদা আশ্বিনে
পূজোর ছুটির দিনে
মনের মত বাড়ি দেখে
দুই ভাইয়েতে মাকে নিয়ে তীর্থে এল রেখে।

বছরখানেক না পেরতেই শ্রাবণমাসের শেষে
হঠাৎ কখন্‌ মা ফির্‌লেন দেশে।
বাড়িসুদ্ধ অবাক্‌ সবাই,—মা বল্লেন, "তোরা আমার ছেলে
তোদের এমন বুদ্ধি হল', অপূর্ব্বকে পূরতে দিবি জেলে?"
কানাই বল্লে, "তোমার ছেলে বলেই
তোমার অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জ্বলেই।
মিথ্যে চুরির দাগা দিয়ে সবার চোখের পরে
আমার মাকে ঘরের বাহির করে
সেই কথাটা এ জীবনে ভুলি যদি তবে
মহাপাতক হবে।"
মা বল্লেন, "ভুলবি কেন? মনে যদি থাকে তাহার তাপ
তাহলে কি তেমন ভীষণ অপমানের চাপ
চাপানো যায় আর কাহারো পরে
বাইরে কিম্বা ঘরে?
মনে কি নেই সেদিন যখন দেউড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এলেম তোদের দুটি সঙ্গে নিয়ে

তখন আমার মনে হল আমি যদি স্বপ্নমাত্র হই
জেগে দেখি আমি যদি কোথাও কিছুই নই
তাহলে হয় ভালো !
মনে হল শত্রু আমার আকাশভরা আলো,
দেবতা আমার শত্রু, আমার শত্রু বসুন্ধরা
মাটির ডালি আমার অসীম লজ্জা দিয়ে ভরা।
তাইত বলি বিশ্বজোড়া সে লাঞ্ছনা
তেমন করে পায়না যেন কোনো জনা
বিধির কাছে এই করি প্রার্থনা।"

ব্যাপারটা কি ঘটে ছিল অল্পলোকেই জানে,
বলে রাখি সে কথা এইখানে।

বারো বছর পরে
অপূর্ব্ব রায় দেখা দিল কানাইদাদার ঘরে।
একে একে তিন্‌টে থিয়েটার
ভাঙাগড়া শেষ করে' সে হল ক্যাশিয়ার
সদাগরের আপিসেতে। সেখানে আজ শেষে
ত'বিল-ভাঙার জাল হিসাবের দায়ে ঠেকেচে সে।
হাতে বেড়ি পড়ল বুঝি; তাই সে এল ছুটে
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে।
কানাই বল্লে, "মনে কি নেই?" অপূর্ব্ব কয় নতমুখে
"অনেকদিন সে গেছে চুকে বুকে।"
"চুকে গেছে?" কানাই উঠ্‌ল বিষম রাগে জ্বলে',
"এতদিনের পরে যেন আশা হচ্চে চুকে যাবে বলে'।"
নীচের তলায় বলাই আপিস করে—
অপূর্ব্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢুক্‌ল তারি ঘরে।
বল্লে, "আমায় রক্ষা কর!"
বলাই কেঁপে উঠ্‌ল থরথর।

অধিক কথা কয়না সে যে ; ঘণ্টা নেড়ে ডাক্‌ল দরোয়ানে।
অপূর্ব্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে মানে।

অপূর্ব্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী যে
এদের ঘরে নিজে
আস্‌তে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।
অনেক রকম করে ইতস্তত
পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী।
পূর্ণ বল্লে, "রক্ষা কর মাসি!"

...র পরে কাশী থেকে মা আস্‌লেন ফিরে।
কানাই তাঁরে বল্লে ধীরে ধীরে—
"জান ত, মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধার্য্য,
এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্য্য।
বিধি তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে,
উচিত নয় মা সেটা কারো পক্ষে।"
কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে
অপ্রসন্ন মুখে।
...ল্লে, "হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে
দেখব তখন বিবেচনা করে।"
মা বল্লেন, "তোরা বলিস্ কি এ!
একটা দুঃখ দূর করতে গিয়ে
আরেক দুঃখে বিদ্ধ করবি মর্ম্ম!
এই কি তোদের ধর্ম্ম!"
এত বলি' বাহির হয়ে চল্লেন তাড়াতাড়ি ;
তারা বলে, "যাচ্চ কোথায় ?" মা বল্লেন, "অপূর্ব্বদের বাড়ি।
দুঃখে তাদের বক্ষ আমার ফাটে,
রইব আমি তাদের ঘরে যতদিন না বিপদ তাদের কাটে!"
"রোস, রোস, থাম, থাম, করচ এ কি!
আচ্ছা, ভেবে দেখি!

তোমার ইচ্ছা যবে
আচ্ছা না হয় যা বল্‌চ তাই হবে।"
আর কি থামেন তিনি!
গেলেন একাকিনী
অপূর্ব্বদের ঘরে তাদের মাসি।
ছিলনা আর দোবে চোবে, ছিলনা চাপ্‌রাসি।
প্রণাম করল লুটিয়ে পায়ে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"ন্যাসানাল কংগ্রেসে"র কাজ

(ফরাসী হইতে)

এক্ষণে ন্যাসান্যাল কংগ্রেসের কার্য্য সম্বন্ধে আমরা বিচার নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করিব।

তাহারা যে একই দেশের লোক—এই ধারণাটি ন্যাসান্যাল কংগ্রেসই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীদিগের মনে জাগাইয়া তুলিয়াছে। অবশ্য, ভারত কিংবা কংগ্রেস সম্বন্ধে নিরক্ষর কৃষকদিগের কোনও ঔৎসুক্যই নাই; কিন্তু যে-কেহ সংবাদপত্রাদি পাঠ করে সেই আজকাল জানে, সমস্ত ভারতবাসীর একটি মাতৃদেশ আছে; আচার ব্যবহার ও ভাষার বহুল পার্থক্যসত্ত্বেও, ভারতের সমস্ত জাতিরই সমান স্বার্থ।

তবে-কিনা, ইংরেজরাই এই ভারতীয় মাতৃভূমিকে গড়িয়া তুলিয়াছে; নৈতিক শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য ভারত ইংরেজের নিকটেই ঋণী। ইংরেজী ভাষাই ভারতের সাধারণ ভাষা; মারাঠী, বাঙ্গালী, শিখ, তামিল, হিন্দুস্থানী—যাহারা কংগ্রেস-সভায় সম্মিলিত হয়—তাহারা ইংরেজী ছাড়া আর কোন ভাষায় পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে না; এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য উহারা দাবী করে সেগুলি ইংরেজী প্রতিষ্ঠান। ন্যাসান্যাল কংগ্রেসেই আমরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাই, ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক অভিব্যক্তি মাতৃদেশত্ববোধে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তা ছাড়া আরও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, ভারত কতটা ইংরেজ ভাবাপন্ন হইয়াছে, এবং ইহাও বুঝিতে পারি, পরিশেষে ভারত-ইংরেজী সভ্যতা কিরূপ আকার ধারণ করিবে। তাছাড়া, জাপানীদের ন্যায় ভারতবাসীদিগের উপর কেন এই-রূপ দোষারোপ করা হয় যে তাহারা বিদেশীর অনুকরণের জন্য, স্বকীয় জাতীয় ঐতিহ্য সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে? যদি জাপানীদের ও ভারতবাসীদের প্রতিনিধিমূলক কোন

প্রতিষ্ঠান না থাকিত, ইংরেজরা যাহাকে "Self government" (স্বায়ত্তশাসন) বলে, *সে সম্বন্ধে যদি তাহাদের কোন* ধারণাই না থাকিত, তাহা হইলে, য়ুরোপীয়দিগের পার্লেমেণ্টীয় পদ্ধতি গ্রহণ করিবার কথা তাহাদের আদৌ মনেই হইত না। কিন্তু জাপানীদিগের, গোত্র-পঞ্চায়ৎ ছিল, রাজবৃন্দের সভা, আমীরওমরাওদিগের সভা, মধ্যবিত্ত লোকের সভা, কৃষকদিগের সভা ছিল; সেই জন্যই রাষ্ট্রীয় মহাসভা ও মন্ত্রিপরিষৎস্থাপন তাহাদের নিকট সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইয়াছিল। ভারতবাসীদের সম্বন্ধেও তাহাই। সুদূর অতীত কালে আমরা দেখিতে পাই, রাজা ও ব্রাহ্মণেরা "জাতের" ব্যবহার ও প্রথা মানিয়া চলিতেছে। সকল রাজারই আমলে জাতের পঞ্চায়ৎ, ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার নিষ্পত্তি করিতেছে। কোন কোন জাতের মধ্যে, পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তি, কিংবা সমগ্র পঞ্চায়ৎ, মৃত্যুদণ্ডপর্য্যন্ত বিধান করিতে পারিত। সকল শাসনাধীনেই গ্রামের 'মোড়ল' কিংবা পঞ্চায়ৎ স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছে। লৌকিক প্রথার দ্বারা গঠিত, ভারতবাসীরা ইংরেজের "মুনিসিপাল" ও "জুরী"-পদ্ধতি আত্মসাৎ *করিতে সমর্থ হইয়াছে; এই দুই পদ্ধতি* উহাদিগকে প্রতিনিধিমূলক শাসনপদ্ধতির জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিবে।

জাপানী ও ভারতবাসীরা স্বকীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিপুষ্টিসাধনের চেষ্টা না করিয়া য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের যে দাবী করিয়াছে, তাহার দুই কারণ আমরা দেখাইতে পারি। একদিকে, বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উহাদের সভ্যতার অভিব্যক্তি স্থগিত হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অবনতি ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে অন্য দেশের লোকের নিকট শিক্ষা করা প্রত্যেক জাতির পক্ষেই বৈধ ও আবশ্যক। তাছাড়া, এ বিষয়ে জাপানী ও ভারতবাসীরা—জর্ম্মান, ইতালীয়, স্পেনীয়, হঙ্গারীয়, রুস ইহাদেরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছে। উহারা সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে উদারনৈতিক ইংলণ্ড ও বৈপ্লবিক ফ্রান্সের প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি

ভৈরবী—তেতালা

।। ৪ ।। র২ নো১ নো১ । ধ২ প১ মগ১ । ম২ নো১ নো১ । ধ১ ধপ১
গা ই . ব আ মি – আ মা র সু – –

প১ ধপ১ ।। ম১ প১ ধ১ র্স১ । নো১ ধ১ প১ ধপ১ । ম১ মগো১ র১ ম১ ।
রে – তো – 'দে র সু র টি – না – ই ক

গোর১ স১ র২ ।। র্১ র্২ র্স১ । নো১ ‿ নোধ১ প১ ধ১ । র্১ র৩ । র্সনো১
জা – না ম রু দে শে – – র সা হা রা

ধ১ প১ ধপ১ ।। ম১ প১ ধ১ র্স১ । নো১ ধ১ প১ ধপ১ । ম১ ‿ মগো১
– শো ন্ আ – মা র রা – গে – নে –

র১ ম১ । গোর১ স১ র২ ।।
ই সা হা – না

শেষ।

নোপ২ প২ । নো২ নো১ র্স১ । র্২ র্গো১ র্স১ । র্৪ ।। ম্২ ম্১ র্গ১ ।
ধূ ধূ বা লু র মূ র্চ্ছ না তায় ঝ ঞ্ঝা –

ম্২ র্গম্১ প১ । ম্১ ম্১ র্রর্গো১ ম্১ । র্গোর্১ র্স১ র্২ ।। নো২ র্১ র্স১ ।
উ ঠে – মে লি য়ে – ডা – না ক র্ম্ম –

র্২ র্গো১ র্১ । র্স১ র্সনো১ ধ১ র্স১ । র্সনো২ ধ১ ম১ ।। ম১ প১ ধ১ র্স১ ।
না শা – মী ড়ে – – মী ড়ে – মু – র্ম্ম –

নো১ ধ১ প১ ধপ১ । ম১ মগো৩ র১ ম১ । গোর১ স১ র২ ।। র্১ র্২ র্স১ ।
না – শা – গ ম – ক হা – না আ মা র

নো১ ধ১ প১ ধ১ । র্৩ র্স১ । নো১ ধ১ প১ ধপ১ । ম১ প২ ধ১ র্স১ ।
গা – ন টি নাই শু নি – লি – সা – হা –

নো১ ধ১ প১ ধপ১ । ম১ ‿ মগো১ র১ ম১ । গোর১ স১ র২ ।।
রা – সে – ন – য় সা হা – না

নো১ নো২ প১ । নো২ নো১ স১ । র২ গো১ স১ । র৪ ।। স১ গ২ গ১ ।
অ চ ল ঠা টে র বা হি রে ধায় তী – ব্র

ম২ গম১ প১ । ম১ গো১ গো১ গো১ । রগোর১ স১ র২ ।। র২ নো২ ।
ক ড়ি – কো – ম ল না – না বাঁ ধা

ধ২ নো১ ধ১ । প২ ধ১ প১ । ম২ পম১ গ১ । গ১ গ৩ । ম২ গম১ প১ ।
সু রে র জ্ঞা নে – বা ধে – শু নিস্ নে রে –

ম২ মগো২ । গোর১ স১ র২ ।।
মা নিস্ মা – না

নোপ১ প২ প১ । নো২ নো১ র্স১ । র্র২ র্গো১ র্স১ । র্র৪ ।। র্ম২ র্ম১
ম রী চি কা র — মি থ্যা ঝ লক ঝল্ সে

র্গ১ । র্ম২ র্গর্ম১ র্প১ । র্ম২ র্রর্ম১ র্গো১ । র্রর্স১ র্র৩ ।। নো২ র্র১ র্স১ ।
— আঁ খি — কর বে কা না — ধূ স র

র্র২ র্গো১ র্র১ । র্স১ র্সনো১ ধ১ ধর্স১ । র্সনো২ ধ২ । ম১ প১ ধ১ র্স১ ।
ব র্ণ প্রা — ণে র আ মার শু ন্ বি —

নো১ ধ১ প১ ধপ১ । ম১ মগো১ র১ ম১ । গোর১ স১ র২ ।। র্র১ র্র২ র্স১ ।
য — দি এ আ লা — প খা — না ম রু দে

নো১ ধ১ প১ ধ১ । র্র১ র্র৩ । র্সনো১ ধ১ প১ ধপ১ । ম১ প১ ধ১ র্স১ ।
শে — — র সা হা রা — গা ই আ — মা র

নো১ ধ১ প১ ধপ১ । ম১ মগো১ র১ ম১ । গোর১ স১ র২ ।।
রা — গে — নে — ই সা হা — না

(আ-প্র)

শ্রীসরলা দেবী।

মনে-মনে

(গল্প)

বন্ধু-সভায় তর্ক চল্‌ছিল যে বাঙালি-জীবনে লভে পড়্‌বার কোনো সুযোগ আছে কি না? অনেক তর্কের পর অধিকাংশের মত এই দাঁড়াল যে, না—কোনো সুযোগই নেই।

একজন বল্লেন—"তবে যে বাংলার কাব্যে ও গল্পে এত লভের ছড়াছড়ি—সেটা কি?"

উত্তর হ'ল—"সে কবি-কল্পনা ও গাল-গল্প ছাড়া আর-কিছুই নয়।"

নবীন কিন্তু এ উক্তিটাকে গ্রাহ্য করতে রাজি হ'ল না। সে বল্লে—"আমাদের জীবনে যদি ঐ লভের সংস্পর্শ না ঘটত তাহ'লে কবি কখনোই সেটাকে নিজের রচনায় আমোল দিতে পারতেন না। আমাদের সাহিত্যে যে লভ্‌-সং এবং লভ্‌-ষ্টোরি তৈরি হচ্ছে এইটেই একটা মস্ত প্রমাণ যে আমাদের জীবনে লভ্‌ আছে।"

সতীশ বল্লে—"দেখ, তর্কের গোড়াতেই আমরা একটা মস্ত ভুল করে বসেছি। লভ্‌ বলতে তোমরা কি ধরে নিচ্চ সেটা আগে ঠিক করে নেওয়া দরকার।"

আমাদের দলের মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত কবিতা লিখতেন। সতীশ তাঁর কবিতা শুনে ভারি

টিট্‌কারি দিত। সেইজন্য লক্ষ্মীকান্তর ধারণা সতীশ-লোকটা একেবারে কাঠখোট্টা বেরসিক। তিনি সুযোগ পেলে সতীশের টিট্‌কারির শোধ তুলতে বিলম্ব করতেন না। তিনি বলে উঠলেন—"দেখ সতীশ, লভ্‌ বলতে কি বোঝায়, সে তুমি বুঝতে পারবেনা;—ও তোমার প্রভিন্স্‌ নয়।"

সতীশ বল্লে—"সরল স্বচ্ছ ভাষায় ছন্দ ঠিক রেখে বল্লেই আমি সব বুঝতে পারি। ভাব এবং ভাষার তোতলামি দেখলে আমার হাড় জ্বলে যায়!"

অখিল চীৎকার করে বলে উঠল—"কম্‌ টু দি পয়েণ্ট! কি বলছিলে হে সতীশ? লভ্‌ বলতে কি বোঝায়!"

সতীশ বল্লে—"হ্যাঁ। কারণ আমরা অনেকেই বিয়ে-থা করে পত্নীপ্রেমে বিভোর হয়ে দিন কাটাচ্ছি—এ যখন দেখতে পাই তখন তর্ক কোথায়? তবে তুমি যদি বল—ফ্রি-লভ্‌—"

সকলে সমস্বরে বলে উঠল—"অবশ্য, ফ্রি-লভ্‌ নিয়েই তর্ক।"

সতীশ বল্লে—"আচ্ছা তবে তর্ক চলুক।"

নবীন বল্লে—"আমি ত তাই বলছিলুম যে ঐ ফ্রি-লভ নিয়ে যখন কবিতা গল্প লেখা হচ্ছে তখন নিশ্চয় আমাদের মধ্যে ফ্রি-লভ্‌ আছে।"

বিপিন বলে উঠল—"এ তোমার কী রকম লজিক্‌?"

নবীন উত্তর দিতে যাচ্ছিল; যতীন বাধা দিয়ে বল্লে—"আমার কি মনে হয় জান? আমাদের বাস্তব-জীবনে ফ্রি-লভ্‌ না থাকলেও আমাদের মনোজগতে ফ্রি-লভের একটা স্বর্গ তৈরি হয়ে উঠেছে। সেটা অবশ্য তৈরি হয়েছে বিদেশী-সাহিত্যের অনেক মাল-মসলা আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে বিদেশী-সাহিত্যের আব্‌হাওয়াটা আমাদের মনের মধ্যে এমন জমাট বেঁধে উঠেছে যে বাইরে কোনো সুযোগ না থাকলেও মনে-মনে লভে পড়তে আমাদের কিছুমাত্র আটকায় না। সামাজিক ক্ষেত্রে যেটা খোঁড়া হয়ে আছে, মানসক্ষেত্রে সেটা মেলট্রেনের মতো চলে।"

নবীন বল্লে—"আমি ঠিক ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলুম। তুমি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লে হে!"

সকলকার মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল কথাটা ঠিক লেগেছে। কেবল লক্ষ্মীকান্ত একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন যাকে বলে অতিরিক্ত-মাত্রায় 'স্বদেশী'। বিদেশকে কোথাও একটু প্রাধান্য দিলে তাঁর বরদাস্ত হ'ত না। তিনি বল্লেন, জর্ম্মানযুদ্ধে যত কিছু আশ্চর্য্য যন্ত্রপাতি দেখা গেল, তা সমস্তই আমাদের এই ভারতবর্ষে ছিল। প্রমাণ চাইলে তিনি সংস্কৃত পুরাণ, উপপুরাণগুলোকে মন্থন করতে বলেন। নবীনের মুখে 'বিদেশী-সাহিত্যের নাম শুনে তিনি আগুন হয়ে বলে উঠলেন—"ফ্রি-লভের জন্যে আমরা অন্যদেশের ঋণ স্বীকার করতে যাব কেন? আমাদের দেশে কি ফ্রি-লভ ছিল না? শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের উপাখ্যানটা কি?"

যতীন বল্লে—"অবশ্য, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ফ্রি-লভের যথেষ্ট নজির আছে।

নইলে জিনিষটা যদি একেবারে 'ফরেন্' হ'ত তাহ'লে আমাদের মন সেটাকে গ্রহণ করতেই চাইত না। জমী আমাদের তৈরি ছিল, বিলিতি এন্‌জিনিয়াররা তাঁর উপর কোঠা বানিয়ে দিয়েছে মাত্র।"

অখিল বল্লে—"দেখ, তোমরা বলছ বটে, কিন্তু দুষ্মন্তের প্রেমকে ঠিক ফ্রি-লভ্ বলা যায় কি-না আমার সন্দেহ আছে। কারণ শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণ-কন্যা ভেবে তিনি প্রথমটা ভেবড়ে গিয়েছিলেন, তারপর যখন শুনলেন তিনি অপ্সরার মেয়ে তখনই তাঁর স্ফূর্তি হ'ল।"

যতীন বল্লে—"আচ্ছা তর্কের খাতিরে না হয় দুষ্মন্তের কথা ছেড়েই দিলুম। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রেম—গোপিনীদের প্রেম, সে-সব কি?"

সতীশ বল্লে—"ওহে ও-সব কথা ছেড়ে দাও। সেদিন ত লক্ষ্মীকান্তবাবুর বক্তৃতায় শুনলে—ও হ'ল 'ডিভাইন' জিনিষ। দুশ্চর তপস্যা না করলে ঐ স্বর্গীয় তত্ত্বরস লাভ করা যায় না।"

যতীন বল্লে—"ও নিয়ে তর্ক করবার ইচ্ছে থাকলেও আজ আমি নিরস্ত হলুম। যাই বল, মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে ফ্রি-লভ্‌টা আমাদের ভিতর এখন চলন না থাকলেও জিনিষটা একেবারে বিদেশী নয়।"

লক্ষ্মীকান্ত উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন —"আমিও তো তাই বলি। 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভূভারতে'—এই প্রবাদ বাক্যটা ভূয়ো ভিত্তির উপর তৈরি হয়-নি। আমাদের কি না ছিল? বিদেশের যে-সব চাকচিক্য দেখে তোমরা মুগ্ধ হচ্ছ ও সমস্তই আমাদের ছিল—এ পর্য্যন্ত কোনো শর্ম্মাই একটি কণাও নূতন করে যোগ করতে পারেন-নি—"

অখিল বাধা দিয়ে বলে—"সে-সব গেল কোথায়?"

লক্ষ্মীকান্ত মুখটাকে গম্ভীর করে নিয়ে বল্লেন—"আমাদের এই পূতপবিত্র ভারত—এই মহাভারত—ঐ সকল নশ্বর বস্তু-ভারের জড়তা অতিক্রম করে একদিন পুণ্যময় স্বর্গের পথে তীর্থযাত্রা করেছিল—সেই ছিল এই ভারতের সাধনা।"

অখিল বল্লে—"তাই বুঝি এই ভারতের স্বর্গ-প্রাপ্তি ঘটল!"

লক্ষ্মীকান্ত জোর করে বল্লেন—"হ্যাঁ! এ ঠাট্টা নয়। সত্যই ভারত স্বর্গের পথে যাত্রা করে শেষে স্বর্গে গিয়ে পৌচেছিল। সেই জন্য আমাদের প্রাচীন পুরুষরা দেবতাদের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁদের কাহিনী এখন দেব-কাহিনী হয়ে গেছে—সেগুলোকে তোমরা এই ধূলো-মাটির মানুষ এখন আজগুবি গল্প বলে উড়িয়ে দাও। কীটাণুকীট তোমরা সে অমৃত রসের মর্ম্ম কি বুঝবে?"

সতীশ বল্লে—"ও-ও-ও তাই বুঝি তুমি সেই "নরহরি" শীর্ষক কবিতাটি লিখেছিলে? এতক্ষণে বুঝতে পারলুম কেন ঐ নরহরি কথাটা নিয়ে একশ লাইন মক্স করা হয়েছিল!"

লক্ষ্মীকান্ত জোর দিয়ে বলেন—"সত্যিই ত! 'নরহরি'র মতো একটা কথা তুমি অন্য ভাষা থেকে খুঁজে বার কর দেখি! নর—এই নশ্বর নর, আর হরি—ঐ অমরলোকের

বৈকুণ্ঠবিহারী হরি—এই দুইকে যাঁরা এক-করতে পেরেছেন তাঁরা কি আর এই পৃথিবীর মানুষ ছিলেন!"

সতীশ বল্লে—"তাই নাকি? এ তত্ত্ব তুমি স্বয়ং আবিষ্কার করেছ? তাহ'লে তুমি শুধু কবি নও—একাধারে প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক।"

লক্ষ্মীকান্তবাবুর চেহারা দেখে মনে হ'ল সতীশের মুখ থেকে এতগুলো বিশেষণ লাভ করে তিনি মনে-মনে খুসি হয়েছেন। তিনি বল্লেন,—"দেখ সতীশ, খাঁটি কবিতা তৈরি করতে হ'লে ও তোমার দর্শনও চাই, ভাষাতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্বও চাই—এমন কি বিজ্ঞানকেও বাদ দেওয়া চলে না;—জীবতত্ত্ব বীজতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র তত্ত্বকে কেন্দ্রীভূত করে যে বিরাট, অনন্ত সৃষ্টিতত্ত্ব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে কাব্যসৃষ্টি তারই ছায়ামাত্র।"

সতীশ বল্লে—"দেখুন লক্ষ্মীকান্তবাবু, ঐ সব শক্ত শক্ত কথা কস্মিনকালে আমার হৃদয়ঙ্গম হয় না—সে হয় ত আমার স্বভাবের দোষ। কিন্তু এই সহজ কথাটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে নতুন করে আবার কাব্য তৈরি করবার দরকার কি? বিশেষত আপনার। কারণ আপনি বলে থাকেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যা-কিছু দরকার তা সব চূড়ান্ত করে চুকেছেন। তবে কি কেবল কাব্যটির বেলাই আপনার জন্য কিছু বাকি রেখে গেছেন? তাঁরা ওটারও চূড়ান্ত করে গেছেন বলে আপনার ঐ কটমট গান-গুলো লেখা যদি অনুগ্রহ করে বন্ধ করেন তো আমাদের কানগুলো রেহাই পায়।"

অখিল তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"শুধু গান কেন বলছ ভাই, ওঁর ঐ গুরুগম্ভীর প্রবন্ধগুলোও ঐ সঙ্গে বন্ধ করতে বলনা। তাহ'লে আমাদের এই মজলিসটা অনেকটা সরস হয়ে আসে।"

যতীন আর কাউকে অবসর না দিয়ে বল্লে—"দেখ, ফাঁক পাচ্ছিনা বলে একটা কথা তুলতে পারছিনা—লক্ষ্মীকান্তবাবুর ঐ নরহরি—"

সতীশ বল্লে—"আবার ঐ নরহরি!"

যতীন বল্লে—"ও-কথা তো তুমিই তুল্লে হে—"

সতীশ বল্লে—"তাই না কি! তবে কানমলা খাচ্ছি। দাও, আমার কানটা আচ্ছা-করে মলে দাও।"

যতীন বল্লে—"না, না, শোনোনা আমার কথাটা! 'নরহরি' শব্দের যে-রকম ব্যাখ্যা লক্ষ্মীকান্তবাবু করলেন, ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে তার অর্থ অন্যরূপও হ'তে পারে। যেমন ধর, নরের কিনা মানুষের জিনিষ যে হরণ করে অর্থাৎ চোর কি ডাকাত। অথবা নরকে যে হরণ করে অর্থাৎ যম কিম্বা আড়কাঠির দালাল।"

লক্ষ্মীকান্ত চটে উঠে বল্লেন—"তোমাদের এই ছ্যাবলামির আড্ডায় আমি থাকতে চাইনি।"

সতীশ তাঁর হাতদুটো ধরে বল্লে—"সেটি হচ্ছেনা দাদা! তোমার মতন চিজ্‌কে আমরা কিছুতেই ছাড়তে পারিনা। তাহ'লে এ সভার অর্দ্ধেক রসই শুকিয়ে যাবে।"

যতীন বল্লে—"চট কেন দাদা? কবি হয়ে রসিকতা বোঝনা।"

লক্ষ্মীকান্ত বল্লেন—“তোমাদের রসিকতা ক্রমেই ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করছে।”

সতীশ বল্লে—“আচ্ছা, তুমি যাতে ঠাণ্ডা হও তার জন্যে না হয় প্রাচীন ভারতের ভদ্রতা-সম্বন্ধে তোমার কবিতা কিম্বা প্রবন্ধ আমরা বুক-ঠুকে শুনতে রাজি আছি। আস্‌ছে-বারের প্রোগ্রাম না-হয় তাই রইল! এইবার তুমি খুসি ত!”

লক্ষ্মীকান্ত বল্লেন—“ঠাট্টার কথা নয়—সত্যিই ভদ্রতা কাকে বলে তোমাদের জানা দরকার। এবং সে সম্বন্ধে আমি তোমাদের শিক্ষা দিতে চাই।”

সতীশ বল্লে—“আচ্ছা গুরুদেব, আচ্ছা! এখন ধীরোভব!”

যতীন বল্লে—“দেখুন, আমার মনে হয় লক্ষ্মীকান্তবাবু ঠিকই বলেছেন। আমাদের দেশে ভদ্রতার বড়ই অভাব। একটা দৃষ্টান্ত—”

সতীশ বাধা দিয়ে বল্লে—“ওটা আসছে বারের জন্যে স্থগিত থাক্‌না ভাই।”

যতীন বল্লে—“আমি লক্ষ্মীকান্তবাবুকে সমর্থন করতে চাই।”

নবীন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এইবার অধীর হয়ে বলে উঠল—“ওহে তর্ক যে ক্রমেই নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।”

অখিল বল্লে—“ঠিক! ঠিক! কম্‌ টু দি পয়েণ্ট!”

সতীশ কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলে বল্লে—“তাইত! আমরা কি নিয়ে আরম্ভ করছিলুম বল ত?”

অখিল বল্লে—“ফ্রি-লভ্‌!”

সতীশ বল্লে—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে! কিন্তু কোন্‌ অবধি আমরা এসে পৌচেছি মনে পড়ছে না ত!”

যতীন বল্লে—“তাইত হে, ঐ ফ্রি-লভ্‌ সম্বন্ধে আমার কি একটা যেন বলবার ছিল, আর তার থেই খুঁজে পাচ্ছিনা।”

বিপিন বল্লে—“তর্কটাকে বেশ একটু জমাট করে আনা গিয়েছিল, তারপর কেমন এগিয়ে গেল—না?”

নবীন বল্লে—“আমি বলছিলুম এই কথা যে আমাদের সমাজে ফ্রি-লভ্‌ না থাকলেও আমাদের মনে ফ্রি-লভের জায়গা আছে।”

সতীশ চোখ-মটকে বল্লে—“এ সম্বন্ধে লক্ষ্মীকান্তবাবু কি বলেন?”

লক্ষ্মীকান্ত ফোঁস্‌ করে বলে উঠলেন—“আমি এমন জায়গায় কোনো কথাই বলতে চাইনে!”

বিপিন বল্লে—“যতীন, তুমি কিছু বল না হে?”

যতীন বল্লে—“যা বলব ভেবেছিলুম তা তো ভুলে গেছি; এখন কি বলব তাই ভাবছি!”

অখিল বল্লে—“আমার অবস্থাটা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে বলবার যেন কোনো উৎসাহই পাচ্ছিনা।”

সতীশ বল্লে—“উৎসাহ আমার খুব আছে; কিন্তু আমি ভাবছি নবীনের কথায় প্রতিবাদ করব, কি সায় দেব। লক্ষ্মীকান্তবাবু কি বলেন?”

লক্ষ্মীকান্তবাবু এবার সতীশের দিকে কেবল কটমট করে চেয়ে উঠলেন—কোনো জবাব দিলেন না।

নবীন বল্লে—“তোমরা যখন কেউ

কিছু বলতে চাও না, তাহলে আমিই বলি।"

সবাই বলে উঠল—"বেশ! বেশ!"

নবীন বল্লে—"ফ্রি-লভ্ নিয়ে আর শুক্‌নো তর্ক না করে ওরই সম্বন্ধে আমি তোমাদের একটা সত্যঘটনামূলক কাহিনী শোনাতে চাই।"

অখিল বিস্ফারিত চোখে বল্লে—"অ্যাঁ সত্য ঘটনা?"

নবীন বল্লে—"হ্যাঁ, সত্য ঘটনা।"

সতীশ বল্লে—"দাঁড়াও হে, আমি একটা সিগারেট পাকিয়ে নিই।"

নবীন তার টেবিলের টানা থেকে একখানা খাতা বার করে বল্লে—"এই সেই কাহিনী। এ কার লেখা, কেমন-করে আমার কাছে এল, সে সব কথা চাপা থাক্; এখন ঘটনাটা শোনো।"

সতীশ সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বল্লে—"আচ্ছা বল।"

নবীন খাতা খুলে পড়তে লাগল—

একপিঠের কথা

তার সঙ্গে আমার প্রথম-দেখা—সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশ, সামনে তীব্রগতি স্বচ্ছ নদীর কুলুকুলু তান, পূর্ণিমার রজতকিরণে উচ্ছ্বসিত রজনী, গাছে-গাছে কোকিল-কোয়েলার কলসঙ্গীত, বসন্তের মলয় সমীরণ—এ সমস্ত কিছুই ছিল না। ঘোর অমাবস্যা নিশীথে বিজন বনে একাকিনী দস্যুহস্তে লাঞ্ছিতা হয়ে সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী সুন্দরী আর্ত্তনাদ করছিল, আমি অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হয়ে তাকে উদ্ধার করলুম—দস্যুর অস্ত্রাঘাতে আমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, সে বহু-যত্নে শুশ্রূষা করে আমাকে সুস্থ করলে; তারপর আমার উপকারের বিনিময়ে তার হৃদয়টি আমার হাতে তুলে দিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল—আমি অবাক হয়ে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে, সেই অমূল্য উপহারটি গ্রহণ করে, একবার মাথায়, একবার বুকে ঠেকিয়ে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলুম—এমন কবিত্বময় ব্যাপারও ঘটেনি।

কোনো নিরালায় নির্জ্জনে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি;—তাকে দেখেছিলুম আমি এক ভীষণ জনকোলাহলের স্রোতের মধ্যে; —ঠেলাঠেলি, ঘেঁসাঘেসি, তাড়াতাড়ি, হুড়ো-হুড়ি, ছুটোছুটি, লুটোপুটি তারই মাঝখানে! স্থানটি কোনো মেলাক্ষেত্র না হলেও, মেলার চেয়েও সেখানে ঢের বেশী ভিড়; বিরাট বক্তৃতা-সভা না হলেও ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল সেখানে। জায়গাটি একেবারে আব্রুহীন খোলা মাঠের মতন নয়, অথচ মনে হয় যেন হাট কি বাজার। অর্থাৎ সেটি হাওড়া ষ্টেশন।

আমি যাচ্ছিলুম হাওয়া বদলাতে দেওঘরে। সঙ্গে ছিল কেবল চাকর ও বামুন। পাঞ্জাব মেলের এক দ্বিতীয়-শ্রেণীর কামরায় একটা জান্‌লা দিয়ে মুখ-বাড়িয়ে চুপ করে বসে-ছিলুম। অসুস্থ দেহের দুর্ব্বলতা বিদেশযাত্রা কাতর মনটাকে ক্রমেই যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। শেষে এমন মনে হতে লাগল যেন আমার দেহ-মন সমস্ত আস্তে-আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে। চোখের সামনে লোকজন ছুটোছুটি করছে, মালপত্র বয়ে নিয়ে

যাচ্ছে, গাড়ির দরজা টানাটানি করে খুলে পিল্ পিল্ করে লোক সেঁধচ্ছে, মুটের সঙ্গে ঝগড়া, সঙ্গী নিয়ে ডাকাডাকি [illegible] চলেছে—এ সমস্ত শুধু চোখেই দেখছিলুম, কানেই শুনছিলুম,—মনের যেন কোনো সাড় ছিল না।

হঠাৎ আমার সেই তন্দ্রার উপর একটা ধাক্কা দিয়ে একটি ভদ্রলোক আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে জায়গা হবে কি ?"

আমি বল্লুম— একটা জায়গা আছে বোধ হয়।"

ভিড়ের সময় রেল-কামরার যে দরজা খোলা হয় সেই দিকে সবাই ছোটে। ভদ্রলোকটি দরজা খুলতেই তাঁর আশপাশে অনেকগুলি লোক এসে দাঁড়াল। তারপর, আর জায়গা নেই দেখে আবার ছুট দিলে।

ভিড় সরে গেলে দেখি আমার সাম্‌নে এক বৃদ্ধ একটি মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে কি ভাবছেন। হঠাৎ আমার মনের উপর এই ছবিটি একটা ঝট্‌কার মতো এসে লাগল—তাইতে আমার সেই তন্দ্রা একেবারে ছুটে গেল। আমি অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। তার গায়ের রং, তার সেই মুখ, চোখ, ঠোঁট, ভুরু,—এমন-কি তার সেই ফিরোজা রঙের সাড়িখানির ভাঁজগুলি পর্য্যন্ত আমার মনের উপর কেঁপে-কেঁপে দাগ কাটতে লাগল। তার সেই কালো চোখের পাতার কাঁপুনি, তার হাতের চুড়ির ঠুন্‌ঠন্, তার পায়ের আলতার আভাটি পর্য্যন্ত বাদ গেল না;—এই সমস্ত রং ও শব্দের রেখা নিয়ে আমার মনে যেন একখানি জীবন্ত প্রতিমা জেগে উঠল।

আমি তার দিকে তন্ময় হয়ে চেয়েছিলুম; হঠাৎ সে আমার পানে টানাটানা চোখ তুলে একবার চাইলে। যেমন দেখা সেই দৃষ্টি একেবারে সোজা আমার অন্তরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছল। অমনি আমার সমস্ত হৃদয়-মন সেই দৃষ্টিকে বরণ করে তুলে নিলে।

এত ব্যাপার ঘটে গেল একমুহূর্ত্তের মধ্যে! বৃদ্ধটি খুব অল্পক্ষণই সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি মেয়েটির হাত টেনে ডাকলেন। মেয়েটি চলে গেল। তার পায়ের পাঁয়জোরের ঘুঙুর বাজতে লাগল—ঝুন্ ঝুন্ ঝুন্! আমার মনে হল সেই সুর যেন আমায় ডেকে গেল। আমি উঠতে পারলুম না, কিন্তু আমার চোখ ঐ সুরের সঙ্গী হয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে শেষে হতাশ হয়ে একা ফিরে এল।

আমি বসে বসে ভাবছিলুম। সেই ভাবনার মধ্যে চারিদিকের গোলমাল, চারিদিকের আলো যেন নিভে গিয়ে, সব ঠাণ্ডা নিস্তব্ধ হয়ে এল। তখন কেবল সেই মেয়েটির ছবি স্বপ্নের মতো চোখের উপর ভাসতে লাগল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে। আমি চোখ-বুজে শুয়ে পড়লুম। আমার অসুস্থ শরীর-মন ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগল। সেই ঝিম্‌ঝিমানির ভিতরে ভিতরে তার চুড়ির ঠুন্‌ঠুন্, পাঁয়জোরের ঝুন্‌ঝুন্‌শব্দ কোন্ সুদূর থেকে এসে বেজে বেজে মিলিয়ে যেতে লাগল।

গাড়ি যতক্ষণ চলছিল ততক্ষণ মনে এইরকম একটা তৃপ্তির আবছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল যে মেয়েটি কাছে না থাকলেও সঙ্গে আছে। কিন্তু যেই বর্দ্ধমানে এসে গাড়ি থামল, লোকজনের নামা-ওঠা সুরু

হ'ল, যখন দেখলুম কারা দুজন দূরে গাড়ি থেকে নেমে প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে চলে গেল, অমনি আমার বুকটা যেন হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল। মনে হতে লাগল আমার জীবনের শুকতারাটি বুঝি চিরদিনের মতো ঐ অস্ত যায়। একবার সন্দেহ হ'ল বোধ-হয় সে নয়; কিন্তু সন্দেহটাকে দৃঢ় করবার কোনো সুযোগই পেলুম না। বুকের ভিতরটা হায়-হায় করে উঠল,—কেবলই মনে হতে লাগল —সে ঐ চলে গেল,—কোন্ অজানা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেল!—আর তার দেখা পাব না! কত মানুষই চলে গেল দেখলুম, কিন্তু তার যাওয়াটিই হৃদয়-মাঝে বিদায়ের একটি নিবিড় ব্যথা জাগিয়ে দিয়ে গেল।

গাড়ি আবার ছেড়ে দিলে। এতক্ষণ আমি স্বেচ্ছায় যাচ্ছিলুম, এইবার আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে চল্ল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল যেদিক দিয়ে সে চলে গেল সেই-দিকটিতে চোখ-মেলে চুপ করে পড়ে থাকি, কিন্তু তা হল না, নিমেষের মধ্যে সেখান থেকে যেন আমায় উড়িয়ে নিয়ে গেল!

আমি হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লুম। গাড়ি দোল খাইয়ে-খাইয়ে আমাকে ঘুম-পাড়াতে লাগল। সেই দোলার উপর আমার সমস্ত শরীর-মনকে ছেড়ে দিয়ে আমি অসাড় হয়ে পড়ে রইলুম—আমার অলক্ষ্যে ঘুম এসে আমাকে আত্মসাৎ করলে।

কবিরা যে বলেন প্রেম অন্ধ—একথা খুব ঠিক! প্রেম যে মানুষের চোখে ধাঁধা লাগায় এর প্রমাণ আমি যেমন পেয়েছি, আর-কেউ পেয়েছেন কি-না জানি না। সে মেয়েটি সমস্ত পথটা আমাদের সঙ্গেই গাড়িতে ছিল, সকালবেলা আমার সাম্নে গাড়ি থেকে নেমেছে, আবার গাড়িতে উঠেছে, আবার নেমেছে—অথচ একবারও আমার চোখে পড়েনি। আমি নিশ্চয় কাণা হয়ে ছিলুম, নইলে বারবার এমন করে কখনো সে আমার চোখ এড়িয়ে যায়?

পরদিন সকালে তাকে দেওঘরে দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। গত রাত্রের সেই ঘন হতাশার কুয়াসা ঠেলে আমার বুকের মাঝে যেন সূর্য্য উঠলেন। আমার কেবলই মনে হ'তে লাগল, কেমন করে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্ভব হ'ল। এ যেন স্বপ্ন! একি সেই অদৃষ্টদেবীর খামখেয়ালি খেলা, যিনি আড়ালে থেকে মানুষকে নিয়ে মজা করেন? ঐ দেবীটির মনে কি গূঢ় মতলব আছে জানি না, কিন্তু আমার মন আনন্দে মেতে উঠল।

তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে-যাবার পথে। তখন সূর্য্যাস্তের রাঙা রং মেঘের গায়ে লেগে মাটির উপর ছড়িয়ে পড়েছে—পাখীরা চারিদিকে কলরব করে উঠেছে। এই রং আর সুরের শতদলটির উপর হঠাৎ তার আবির্ভাব হ'ল। আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি;—মনে হ'ল স্বপ্ন। কিন্তু না, স্বপ্নের দুয়ার ঠেলে সত্যই সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। সত্যই তাকে চোখের সাম্নে দেখলুম।

পরদিন সকালে আরো আশ্চর্য্য হয়ে দেখি

যে তারা আমার ঠিক সাম্‌নের বাড়িতেই এসে উঠেছে। এত কাছে যে "গলার আওয়াজটি পর্য্যন্ত কানে এসে লাগে।

আমার বসবার বারন্দা থেকে তাদের বাড়ির একটুখানি ভিতর দেখা যেত। সেই দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার অলস দিনগুলি কাটিয়ে দিতে লাগলুম। প্রথম-প্রথম সে স্থানটা শূন্যই থাকত, আমার মনের আশা দিয়ে তাকে ভরিয়ে রেখেছিলুম। কখন্ একটিবার সে আসে এই প্রতীক্ষায় তাঁর না-আসার সময়টা উদ্বেগের আনন্দে কাটত।

ক্রমে ক্রমে একটু-একটু করে আসা সুরু হল। তখন আমার মনে হতে লাগল—"সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে।" যাওয়া-আসার তাল তারপর একটু ঘন হয়ে এল। আমি চুপ-করে চোখ-মেলে পড়ে থাকতুম;—স্বপ্ন দেখার মতন দেখতুম সে আমার সাম্‌নে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। কখনো আসতে-আসতে হঠাৎ থম্‌কে একবার দাঁড়িয়ে ফিরে যেত; কখনো এসে শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকত—সে কতক্ষণ ধরে।

এই নির্জ্জন নিরালার গোপনতার মধ্যে বসে ছবির মতো তাকে দেখাটি আমার ভারি ভালো লাগত। এইরকম সুযোগ না পেলে আমার মনটিকে অম্‌নি করে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে আমার দেখবার অবসর হত না। সে একটু দূরে ছিল বলে আমার চোখটি খুলত ভালো—সঙ্কোচে তার ডানা মুদে আসত না। এই কারণে ঐ ব্যবধানটুকুর জন্যে আমার মনে কোনো দিন কোনো খেদ হয় নি।

আমার এই অশ্রান্ত দেখার কোনো ব্যাঘাত ছিল না। কেবল হঠাৎ এক-একবার তার দৃষ্টি এসে আমাকে চম্‌কে দিত। তাতে আমার দেখার একটানা ছন্দের মধ্যে যতি পড়ে আমার দেখার সুরকে বিচিত্র করে দিত এবং ঐ চম্‌কানির আন্দোলনে আমার নিস্পন্দ বুক নাড়া পেয়ে সজীব হয়ে উঠত।

আমি ঐ জায়গাটি ছেড়ে নড়তে পারতুম না। কোথাও যাবার তাড়া পড়লে আক্ষেপ হ'ত—যদি এসে ফিরে যায়—দেখাতো হবে না! আমি কৃপণের মতো তার দেখা-পাওয়াটিকে আঁকড়ে ছিলুম; সেখানে একতিল লোকসান আমার কিছুতেই বরদাস্ত হ'ত না।

কেউ যদি এখন জিজ্ঞাসা করে এ দেখার মধ্যে কি ছিল, যার জন্যে তোমার এত টান? তা হ'লে আমি তাকে কোনো জবাবই দিতে পারি না। ভাবতে গেলে দেখার মধ্যে সত্যই কিছু ছিল না; তবু এই দেখাকে কোনো দিন আমার ফাঁকা মনে হয় নি।

এক-একবার মনকে প্রশ্ন করি শুধু কি দেখবারই লোভ ছিল, দেখাবার সাধ কি মনে-মনে ছিল না? মনে হয়, ছিল বোধ হয়। নইলে তার চোখের একটি চাহনির জন্যে মনটা অমন কাঁপতে থাকত কেন? যাতে সে এদিকে চেয়ে মুহূর্ত্তের জন্যেও ফাঁক না দেখে তার জন্যে ভিতরে-ভিতরে অত উৎকণ্ঠাই বা জাগত কেন?

যখনই তাকে সাম্‌নে পেতুম চোখ-ভরে দেখে নিতুম, তার একটা মুহূর্ত্তও আমি কখনো বিফল হ'তে দিইনি! একই ছবি উল্টেপাল্টে দেখতুম—প্রতিবার নূতন দেখার সঙ্গে নব-নব বৈচিত্র্য ফুটে উঠত। একবার

দেখা আর একবার অ-দেখার লুকোচুরির মধ্যে পড়ে আমার ব্যাকুলতা পুরোনো হ'তে পারত না। সেই জন্যে দিনের পর দিন ধরে আমি দেখেই চলেছিলুম।

শুধু দেখা নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হ'তে পারে আমার জীবনে আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি। তার সঙ্গে পরিচয়ের কোনো বন্ধনই ঘটেনি, তবু আমার মন জানে সে আমার কতখানি পরিচিত। তার কিছু জানতে আমার বাকি নেই; আর আমার বিশ্বাস সেও আমার সব জেনেছে —ঐ দেখার ফাঁকে-ফাঁকে।

সে আমার এতটা জানা হয়ে গিয়েছিল যে কোনো শব্দ না পেলেও আমি বুঝতুম সে এইবার আসচে; কোনো ইসারা না পেলেও আমি টের পেতুম সে এইবার চলে যাবে। কথা কইতে না পেলেও কথা যে আটকায় না, তা যারা শুধু চোখের কারবার করেছে তারাই জানে।

আমার প্রতিদিনের সকালটি আসত তারই দেখা-পাবার আশা নিয়ে, সন্ধ্যা আসত তারই বিরহব্যথা বুকে জাগিয়ে। আমি আমার সকালটিকেও যেমন অভিনন্দন করতুম, সন্ধ্যাটিকে তেমনি অভিনন্দন করতুম— কারণ সে আমার দেখার সাধটিকে রাত্রের অন্ধকারে ঘনিয়ে তুলত,—যার জন্যে সকালের আশাটি আমার অত উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত।

আমার ঐ দেখাটির মধ্যে দিয়ে আমার মনের সমস্ত সাধ আমি মেটাবার চেষ্টা করতুম। কখনো তাকে মনের আনন্দ নিবেদন করতুম, কখনো দুঃখটিকে তার চোখের সাম্‌নে তুলে ধরতুম। কখনো অভিমান জানাতুম, কখনো সেধে তার পায়ে লুটিয়ে পড়তুম। কখনো গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিতুম, কখনো খেলনা নিয়ে খেলা করতে বসতুম। কখনো তার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতুম, কখনো বা লীলাভরে তাকে অবহেলা করতুম। কখনো তিরস্কার করতুম, কখনো আদর করতুম— এমনিতর কত কি!

সে এসব বুঝত কি-না, গ্রহণ করত কি-না, এ সন্দেহ অনেকবার হয়েছে; কিন্তু তাতে মন কখনো নিবৃত্ত হয়নি। সে রোজ রোজ নতুন-নতুন খেলা নিয়ে এত মেতে থাকত যে এদিকে তার গ্রাহ্যই ছিল না—বিফলতার অবসাদ গ্রহণ করবার তার অবসরই ছিল না।

এই একজায়গায় বসে-বসে আমি কত ছবিই না দেখলুম, কত বিচিত্র পথেই না ঘুরলুম, কত দোলাতেই না দুললুম, কত স্বপ্নই না সৃষ্টি করলুম! তবু আমার চোখের শেষ-ক্লান্তিটি কখনো এলনা।

চুপ-করে বসে দেখতে-দেখতে আমার এক-একসময় মনে হ'ত এ-বাড়ি ও-বাড়ির মধ্যে এই যে সরু পথের ব্যবধান এটাকে আমার চোখ যেন একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে,—আমরা দুজনে এত কাছা-কাছি এসে পড়েছি যে পরস্পরকে মুখোমুখি দেখে লজ্জায় একেবারে জড়সড়, তখন কে কোথা দিয়ে পালাব পথ খুঁজে পেতুম না।

ওগো কে, তুমি কে, যে আমাদের এমনি করে খেলাচ্ছ—একবার কাছে নিয়ে গিয়ে, একবার দূরে রেখে, একবার চোখের

সামনে এসে, একবার চোখের আড় করে? এ কী নূতনতর খেলা—এর দুঃখই যে আনন্দ, এর আনন্দই যে দুঃখ!

তার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে এক-একবার ভারি ইচ্ছে হ'ত একটি কথা তাকে বলি। কেমন-করে বলব তা জানতুম না, তবু মনে হ'ত বলি। মনের ভিতর উল্টেপাল্টে কথাটি ঠিক করে নিতে আমার এক-একটি দিন শেষ হয়ে যেত। তারপর সন্ধ্যার সময় মনে আক্ষেপ হ'ত এমনি করে দিন ত বৃথায় গেল তবু মনের কথা তৈরি হ'য়ে উঠল কৈ? বেশী ত বলা যাবেনা, বেশী ত সময় পাবনা—একটি কথায় মনের সব-কথা শেষ করতে হ'বে। —কিন্তু কৈ তেমন কথা? কোথায় পাব সে কথা?

আমার অলস-জীবনে তখন এই কথা-খোঁজার কাজ আমি পেলুম। অমনি আমার সমস্ত অবসরটি যেন ভরে উঠল। ঐ একটি কথা খুঁজতে গিয়ে কত কথাই জড়ো করলুম—যেন একটা কথার সমুদ্র সৃষ্টি হয়ে গেল। তবু তো সেই মনের কথাটি বাছতে পারলুম না। সে যখন সামনে এসে দাঁড়াত আমার চোখ ঐ কথার সমুদ্র থেকে স্নান করে উঠে তার অভিষেক করত—নব-নব কথা দিয়ে তার অভিনন্দন জানাত। সে বোধ হয় উত্তর দিত—চোখ দিয়ে উত্তর দিত। কারণ তা নইলে আমার চোখের মন ঠাণ্ডা হ'ত কি করে? আমি সে-সব কথা ঠিক বুঝতে পারতুম না, বোধ হয় আমার চোখ বুঝত। নইলে তার আনন্দের ধারা আমার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ত কেমন করে?

উল্টোপিঠের কথা

চিঠিপত্র

(১)

ভাই সরি,

তুই আমাকে বলেছিলি, রোজ একখানা করে চিঠি লিখতে হ'বে নইলে আমার সঙ্গে আড়ি। তাই এইখানে পৌঁছেই তোকে চিঠি লিখতে বসেছি। এই তো তোর সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি, ঘণ্টাকতক গেছে মাত্র, এর মধ্যে এমন-কি ঘটেছে যার কথা তোকে লিখি, খুঁজে পাচ্ছি না। হাঁ, একটা কথা মনে হয়েছে বটে। হাওড়া ষ্টেশনে এমন ভিড় দেখলুম যে তেমন কখনো দেখিনি। বাপরে বাপ, এত লোকও বিদেশে আসে! কত-রকমের মানুষই যে দেখলুম তার ঠিক নেই। মানুষের মুখ-চোখ যে এত রকমের হ'তে পারে আমার জানা ছিল না; তারা যে এত রকমের কাপড় পরতে পারে তাও আমি কখনো ভাবিনি। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে হরেক-রকম জানোয়ার দেখে যেমন আশ্চর্য্য হতে হয়, আমি ঠিক তেমনি আশ্চর্য্য হয়েছিলুম। সহরের কাছে এমন-একটা খোলা চিড়িয়াখানা যে আছে তা বোধ হয় তুই জানিস্ না। পারিস্ ত একদিন গিয়ে দেখে আসিস্। খুব মজা পাবি।

গাড়িতে এমন ভিড় হয়েছিল যে বাবা জায়গা খুঁজে পাননি। জানিস তো আমাদের তাড়াতাড়ি চলে আসতে হ'ল তাই আগে-থাকতে গাড়ির বন্দোবস্ত হয়-নি। মেয়ে-কামরায় তিলমাত্র জায়গা

নেই দেখে, বাবা বল্লেন, পুরুষদের সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। শুনে আমার ভারি লজ্জা হ'তে লাগল বটে কিন্তু মনে মনে একটা কৌতূহলও জাগছিল—দেখিনা পুরুষদের ধরণধারণ কেমন?

পুরুষদের একটা কামরায় একটুখানি জায়গা বোধ হয় ছিল। বাবা আমাকে নিয়ে সেইদিকে গেলেন। কিন্তু সেখানে পৌছবার আগেই কে-একটা লোক এসে সেটা দখল করে নিলেন।

সেই গাড়িতে দেখলুম জান্‌লা দিয়ে মুখ-বাড়িয়ে একটি লোক বসে আছেন। তিনি চোখ চেয়েছিলেন বটে, তবু মনে হচ্ছিল যেন ঘুমচ্চেন। আমার মনে হল যেন কোন্ মায়াবী তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ করে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আমার ভারি ইচ্ছে হ'তে লাগ্‌ল' হয় খুব নাড়া দিয়ে তাঁর ঘুমটা ভাঙিয়ে দিই, নয়ত ঐ মায়াবীটার মন্ত্র ভেঙে দিয়ে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে জব্দ করে দিই। মানুষকে এমন অসহায় দেখলে আমার ভারি মায়া করে!

লোকটাকে দেখে আমার দয়া হচ্ছিল, কিন্তু তার ব্যবহারে আমি ভারি চটে গেলুম। যতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল ততক্ষণ তাকে দোষ দিই না, কিন্তু সে যখন দানো-পেয়ে উঠল তখন তার উচিত ছিলনা কি আমাদের জন্যে একটু জায়গা করে দেওয়া? সে একটা বেঞ্চি পুরো দখল করে কাৎ হয়ে পড়েছিল। ইচ্ছে করলেই সে একটু সরে আমাদের জায়গা দিতে পারত। আমি রেগে উঠে বল্লুম—"বাবা, এখান থেকে চল!"

তারপর অবিশ্যি আমরা জায়গা পেয়েছিলুম; কিন্তু সমস্ত রাত বসে আসতে হয়েছে। সে আমার বেশ লাগল। ঘুমিয়ে এলে কিছুই দেখতে পেতুম না। এ বেশ সমস্ত রাতটি বসে-বসে, অন্ধকারে চেনা-জিনিষের চেহারা কেমন অদ্ভুত দেখায় তাই দেখতে-দেখতে এলুম।

আজ এই পর্য্যন্ত। তোদের সব খবর দিস্।

(২)

ভাই সরি,

তোর চিঠি আসবার এখনো সময় হয়নি; আসবার আগেই আমাকে লিখতে হচ্ছে; কারণ এখন না লিখলে আজকের ডাক পাবনা। তোর চিঠিখানা পেলে তবু কিছু লেখবার কথা পেতুম, শুধু-শুধু কি লিখি তাই ভাবছি।

এখানে আমাদের বাড়িটি বেশ নির্জ্জন জায়গায়। খান-চারেক বাড়ি আছে। চারদিক বেশ খোলা। পৃথিবীতে বাতাস যে এত প্রচুর এবং আকাশটা যে এত বড় তা এই খোলা মাঠে এসে প্রথম দেখলুম। আমরা কি ঘুপ্‌টির মধ্যেই থাকি। বাবাকে বল্‌ছি এইখানে একখানা বাড়ি কিনে বসবাস করতে। তিনি বলেন যে তোর জন্যেই তো ভাবনা, তোকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারিনা, তা নইলে কি আমি এমন জায়গা ছেড়ে সহরে পড়ে থাকতুম! তুই যদি এখানকার একটা সাঁওতাল ছেলে বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতিস তাহ'লে—। সরি, কি বলিস্ তুই—একটা সাঁওতাল বিয়ে করব না কি?

এখানে সময় আমার বেশ কাটছে; *কেবল তোর জন্যে বড় মন-কেমন করে।* তুই যদি আস্‌তিস্‌ তাহ'লে আমার আর কোনো দুঃখ থাকত না। যাই হোক, এখানে একটা সঙ্গী জোটাতে হচ্ছে—নইলে দিন কাটবে না। কিন্তু তোর মতন সই পাব কোথা? কাজেই দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। সইয়ের সন্ধানে এইবার অভিযান করতে হবে। শুনচি আমাদের পাশের বাড়িতে কলকাতার কে চাটুয্যে আছে; তাদের মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে হ'চ্ছে। তারপর কোন্‌ বাঙালদেশের জমীদার আছেন; তাঁদের ওখানে যাব কি না ভাবছি। এঁরাই হলেন আমাদের প্রতিবেশী। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি। সেই যে হাওড়া ষ্টেশনের লোকটির কথা বলছিলুম, তিনি এই দেওঘরেই এসেছেন – আমাদের ঠিক সাম্‌নের বাড়িতে আছেন। লোকটার উপর থেকে আমার রাগ এখন একেবারে পড়ে গেছে—আহা, বেচারার মুখখানি দেখে। বেচারা বোধ হয় অনেকদিন কোনো কঠিন রোগে ভুগেছে। এখনো মুখখানি এমন শুক্‌নো যে দেখলে মায়া করে। তার সেই ঘুমন্ত ভাব এখনো ভালো-করর কাটেনি;—চলে-ফেরে যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে। চেয়ে থাকে—সেও যেন কেমন রকম চাওয়া। চোখ দেখলে মনে হয়, যেন খুব-একটু-খানি তেল নিয়ে একটা প্রকাণ্ড প্রদীপ জ্বলছে।

বেচারা একলা এখানে এসেছে। আহা, ওর মা-বোন বোধ হয় কেউ নেই;—নইলে এমন রোগা ছেলেকে কেউ কখনো একলা ছেড়ে দেয়? সত্যি বলতে কি ওর জন্যে *আমার ভাবনা হয়।*

আমরা ভালো আছি। তোর চিঠির আশায় রইলুম।

(৩)

সরি,

তোর চিঠি পেলুম। কিন্তু এমন রাগ হ'ল কি বলব? ঐটুকুখানি চিঠি এক-নিমেষেই শেষ হয়ে গেল! একটু বড়-করে লিখতে পারিস না? তাহ'লে কিছুসময় তবু কাটে! তোর চিঠি পেয়ে মনে হ'ল তুই নিজে যেন এসেছিস, আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করেছিস। কিন্তু যেমন আরম্ভ, অমনি শেষ! একটু দেখা দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেলি তার ঠিক নেই। বল্‌ দিকিন্‌ এতে রাগ ধরে কি না!

কিন্তু তোকে দোষ দেওয়া বৃথা। চিঠি বড়-করে লেখা সত্যিই শক্ত। কি মাথামুণ্ড লিখব খুঁজে পাওয়া যায় না। কলকাতায় বসে আমি যখন কাউকে চিঠি লিখেছি দু-দশ লাইনের বেশি কখনো লিখতে পারিনি। কিন্তু এখানকার জলহাওয়ার দেখছি আশ্চর্য্য গুণ! চিঠি লিখতে সুরু করলে শেষ হতে চায় না। এত কথা লেখবার ইচ্ছে হয় যে লিখতে-লিখতে হাত ব্যথা করে। এবং যা-তা লিখতে কিছুমাত্র বাধেনা। যেমন ধর্‌না কেন, আমি আমার ঘরে বসে চিঠি লিখছি, আর সেই হাওড়া ষ্টেশনের লোকটি জান্‌লার পাশে বসে আমার দিকে চেয়ে আছে এ-কথাটা লেখবার কোনো দরকার নেই, তবু মনে হচ্ছে লিখে দিই।

আহা, বেচারার মুখখানি এখনো তেমনি

শীর্ণ আছে। এখানকার এমন ভালো জল-হাওয়া, তবু ওর উপকার হচ্ছেনা কেন? বোধ হয় যত্ন-আত্তির অভাব। পুরুষমানুষ নিজে সব দেখে-শুনে করতে পারেনা—চাকর-বামুনের পরেই ভরসা। তারা পর; তাদের কি বয়ে গেছে? বড় জোর তারা বাঁধা-ধরা কাজগুলো চুকিয়ে দেয়; তার পর পড়ে-পড়ে ঘুমোয়।—এর বেশী ত কিছু করেনা। তাতে কি আর রুগ্ন মানুষের চলে? রোগীর জন্য চাই যত্ন; কিন্তু সেই যত্ন ওকে কে দেবে? সত্যি, বেচারাকে দেখে বড় মায়া করে।

তাছাড়া আমার মনে হয় বুড়োধাড়ি হলেও ও যেন নেহাৎ ছেলেমানুষ! নিশ্চয় শরীরের অনিয়ম করে—নইলে সার্‌তে পারছে না কেন? শুধু সেবা নয়, ওকে একটু শাসন করাও দরকার। সে-ভারটা যদি আমার উপর পড়ে তাহ'লে আমি ওকে দুদিনে শুধরে দিতে পারি।

মরুকগে, পরের জন্যে এত ভাবনা কেন? যা হয় হবে।

তুই এবারকার পূজোর নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াচ্ছিস কেমন? এখানে পূজো নেই বটে কিন্তু পূজোর আমোদটা নিতান্ত কম বলে মনে হচ্ছেনা। গাছের ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় বাতাস লেগে যে বাঁশির সুর এবং পাখীর ডাকে-ডাকে যে গান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার কাছে ঐ পূজোর সানাই লাগেনা।

(৪)

সরি,

ভেবেছিলুম, ঐ লোকটির কথা আর লিখব না; কিন্তু তুই কথাটাকে আবার খুঁচিয়ে তুল্লি। তোর চিঠি এবার বেশ-একটু বড় হয়েছে দেখছি। তার স্পষ্ট কারণ ঐ লোকটি। ঐ লোকটির নাম শুনে তুইও যে অনেক লেখবার কথা খুঁজে পেয়েছিস লো! তোর চিঠির আগাগোড়া প্রায় ওরই কথা।

কি আশ্চর্য্য দেখ্! ও-লোকটি আমাদের কেউ নয়, তবু যেন আত্মীয়ের মতো হয়ে পড়ল। ওর খবরাখবর না দিলে যেন আমাদের চিঠি সম্পূর্ণই হয় না। আমি যেম্‌নি ওর কথা লিখেছি, তুইও লিখতে আরম্ভ করেছিস। আমি তবু ওকে চোখে দেখেছি, তুই তাও দেখিস্‌নি। আমরা কেউই ওকে জানিনা, চিনিনা, তবু ও-ই আমাদের কথার অনেকখানিটা জুড়ে আছে। আমি ভাবি, কেমন-করে পর এমন আপনার হয়?

যতই দিন যাচ্ছে, যতই ওকে দেখছি, ততই ওর উপর থেকে আমার মনের সঙ্কোচ কেটে যাচ্ছে। প্রথম-প্রথম ওর চোখে পড়লে আমার ভারি লজ্জা করত। কিন্তু এখন আমি ওর সাম্‌নে বেশ সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। ওর চাহনিটি এমন সরল, সহজ, যে, ওর চোখের সাম্‌নে দাঁড়াতে কিছুমাত্র বাধে না। মনে হয় ওকে ভয় বা লজ্জা করবার কিছুই নেই—যেন খুব নিকট-আত্মীয়।

পরপুরুষ বলতে আমাদের মনে একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা আছে বটে কিন্তু এখন দেখছি সব পরপুরুষ সমান নয়। তাদের মধ্যে এমন লোকও থাকতে পারে, যারা পর হলেও বন্ধু হবার যোগ্য।

মানুষটি সত্যিই বড় ভালো। বেচারা জীবনে স্নেহ, ভালোবাসা বোধ হয় কখনো পায়নি। এমন-করে চায় যে মনে হয় চোখদুটি যেন ভিক্ষা করছে। ও যদি আমাদের বাড়ির কেউ হ'ত তা'লে ওর ঐ স্নেহের অভাব পূরণ করে দিয়ে আমি খুসি হ'তে পারতুম।

সরি, তুই যদি ওকে দেখতিস্ তোরও মায়া করত। তুই তাহলে আমার মনের ক্ষোভটা বুঝতে পারতিস। আমার হাতে এত সময় যে ফেলে-ছড়িয়েও শেষ হয় না, কাজ এত কম যে তার আঁচ গায়েই লাগেনা, তবু ওর জন্যে কিছুই করতে পারছি না। এতে ক্ষোভ হয় না? সত্যি ওর সেবার দরকার। অথচ এখানে ওর সেবা-করবার কেউ নেই।

(৫)

সরি,

তোর মেজ-দার অসুখ শুনে ভারি চিন্তিত হলুম। কেমন থাকে লিখিস। আমাদের বাড়ীর সামনে ঐ রুগ্নমানুষটিকে দেখে অবধি রোগের উপর আমার কেমন-একটা ভাবনা ধরেছে। রোগ হলে মানুষ বড় অসহায় হয়ে পড়ে; তখন তার অনেকখানি দরকার হয়,—শুধু দেহের নয়, মনেরই বেশী করে। সেই দরকারটুকু পূরণ না হ'লে তাদের কি মর্ম্মান্তিক দুঃখ তা আমি ঐ লোকটির মুখ দেখেই বুঝতে পারি। ঐ অভাবটুকু সামান্য; কিন্তু সংসার যে দুর্ভিক্ষে ছেয়ে গেছে। তাই বা কেন বলি? থাকলেও কি সবায়ের দান-করা ঘটে ওঠে?

একটা নতুন খবর আছে। চাটুয্যে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কিন্তু এ আলাপ যে বেশিদিন টেঁকে এমন বোধ হয় না। কারণ গোড়া থেকেই তারা আমাকে একটু অদ্ভুত-রকম-করে দেখতে আরম্ভ করেছে। এত বয়স পর্য্যন্ত যে আমার বিয়ে হয়নি এটা তাদের ভারি আশ্চর্য্য করেছে। আমাকে তারা জিজ্ঞাসা কোরে-কোরে অস্থির করে তুলেছে যে আমার বিয়ে হয়নি কেন? দেখ দিকিন্, আমি এর উত্তর কি দেব? আমার বিয়ে হয়নি কেন তা আমি কি জানি?

এদের বাড়ি অনেকগুলি ছোট ছোট বৌ আছে—বেশ সুন্দর-সুন্দর দেখতে। আমি যখন ওখানে যাই তারা সবাই এসে আমাকে ঘিরে বসে। আমার মনে হয় যেন একঘর চীনেমাটির পুতুল সাজানো আমি তাদের নিয়ে পুতুল খেলছি।

আমার চেয়ে বয়সে তারা ছোট বই বড় হবেনা, তবু মনে হয় তারা যেন একএকটি ক্ষুদে গিন্নী! মাগো মা, এর মধ্যে এত গিন্নি-পানাও শিখেছে। আমাকে তারা বলে, তোমার এত বয়েস হ'ল তবু তুমি এত ছেলেমানুষ কেন? এত বয়েস বলতে তারা আন্দাজ করে যে আমি যে-বয়েস বলেছি তার চেয়ে অন্তত দশ বছর বয়স আমার বেশী—বিয়ে হয়নি বলে কমিয়ে বলছি। মানুষকে এমন থাম্‌কা অবিশ্বাস করা কেন বল দেখি?

যাক্, বয়েস নিয়ে আমি তর্ক করতে চাইনে; কিন্তু ওদের সঙ্গে আমার পোষাবে না। মনের মতন মানুষ না পেলে আলাপ করে সুখ নেই। সরি, এই সব দেখেশুনে

তোর জন্যে আমার ভারি মন-কেমন করছে। তোর মতন সই পাব কোথা ?

(৬)

সই,

আজ তোর চিঠি পেলুম না কেন? ভেবেছিলুম তোর চিঠি না পেলে কখ্খনো তোকে লিখব না। কিন্তু একটা কথা তোকে বলবার জন্যে মন ভারি ছট্‌ফট্ করছে, তাই না লিখে পারলুম না।

তোকে আগেই লিখেছি যে আমাদের বাড়ির সাম্‌নের সেই লোকটি সমস্তদিন এক-জায়গায় চুপ-করে বসে থাকে; সেখান থেকে আমাদের বাড়ির বারান্দাটুকু দেখা যায়। সেখান দিয়ে ঘুরতে-ফিরতে যেটুকু সে আমার নজরে পড়ত, সেইটুকুই আমি তাকে দেখতুম; আজ তার চেয়ে একটু বেশী করে দেখেছি।

এতদিন হয়ে গেল, ঐ এক-জায়গা থেকে ও নড়েনা কেন ভেবে আজ আমার ভারি কৌতূহল হ'ল। ও দিন-রাত এদিকে চেয়ে-চেয়ে কি দেখে? কাকে দেখে? ওর ঐ দেখার কি ক্লান্তি নেই? অবসাদ নেই? এই ভেবে আমি এগিয়ে গিয়ে বেশ-একটু প্রকাশ্যে তার সাম্‌নে দাঁড়ালুম। আমাকে দেখেই তার সেই স্বপ্নমাখা চোখদুটি ভারি খুসি হয়ে উঠল—কিন্তু সে তখনই চোখ নামিয়ে নিলে। আমি চুপ-করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখন তার সেই চুরি-করে-করে দেখার ফুর্ত্তি দেখে কে! আমার ভারি মজা লাগছিল। আমি যেন কিছুই টের পাইনি এম্‌নি-করে রইলুম। তাতে সে ভরসা পেয়ে আবার চোখ-তুলে দেখতে লাগল। একবার ভাবলুম চলে যাই। কিন্তু পিপাসিতের মুখের জল কেড়ে নিতে যেমন মায়া করে, আমার ঠিক তেমনি মায়া করতে লাগল।

আমাকে চোখ-ভরে দেখে তার সে কী আনন্দ! তার সমস্ত দেহখানি যেন আহ্লাদে ভরে উঠছিল। কিন্তু কেন বল্ দেখি? আমি ত তার কেউ নই, তবে কেন তার এ আহ্লাদ?

আমি চুপ-করে দাঁড়িয়েছিলুম; হঠাৎ কি একটা কাজে বাবা পিছন থেকে ডাকলেন; আমি চলে গেলুম। কিন্তু কেন তার এত আহ্লাদ?—এই প্রশ্নটা আমার মাথার মধ্যে এমন ঘুরপাক খাচ্ছিল যে প্রতি কাজেই আমার ভুল হ'তে লাগল। তারপর থেকে আজ সমস্তদিন যখনই পেরেছি ঐখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি—ইচ্ছে করে নয়, কে যেন টেনে এনেছে। আমি যে সমস্তক্ষণ তার দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে ছিলুম তা নয়। আমার দৃষ্টি ছিল নীল আকাশের একটা নির্জ্জন কোণে—যেখানে দুটো অচেনা পাখী খুব ঘেঁসাঘেসি করে স্বর্গপুরীর উদ্দেশে যাত্রা জমিয়েছে। আমি আকাশের দিকে চেয়েছিলুম, কিন্তু আমার বোধ হচ্ছিল আমার সাম্‌নে থেকে দুটি চোখের স্নিগ্ধকোমল স্পর্শ এসে আমার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে যাচ্ছে। থেকে-থেকে ভারি একটি আবেশ আসছিল। মানুষের ঐ ছোট্ট চোখের মধ্যে যে এত সুধা আছে আগে তা জানতুম না।

আমাকে দেখতে তার ভালো লাগে এ-কথাটা বুঝতে আমার বাকি নেই।

আমি এতদিন জানতুম আমি একটি সাদা-সিধে মেয়ে মাত্র;—আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা মানুষের ভালো লাগতে পারে এ খোঁজ কখনো পাইনি। আজ হঠাৎ এই খবর পেয়ে আমার বোধ হচ্ছে আমার সমস্ত মনের রং যেন বদলে গেল। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ নিজেকে দেখলুম; কিন্তু আমার মধ্যে কোথায় লোকের-ভালো-লাগার সেই মায়া-অঞ্জন লুকিয়ে আছে তার খোঁজ পেলুম না। আমার ত মনে হল আমি নিতান্ত সাদাসিধে।

সত্যি বলতে কি, সরি, আজ আমার এই গর্ব্ব হচ্ছে যে আমারও একটা মূল্য আছে। এতদিন আমার কাছে আমার কোনো দামই ছিল না। আজ আমার উপর এই যে দামের রেখা লাগল এর জন্যে আমার মন কৃতজ্ঞ হয়ে উঠছে—কার কাছে জানিস?—তার কাছে!

আজকের আমার জীবনের এই প্রথম-উৎসবটিকে আমি বরণ-করে হৃদয়-মন্দিরে তুলে রাখলুম। এর শঙ্খধ্বনি এখনো কানে বাজছে—এই চিঠি লেখার ভিতরে-ভিতরে তার ফুৎকার জড়িয়ে যাচ্ছে!

(৭)

সরি,

কালকের সেই দেখার পর থেকে অনেক নতুন জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। সেগুলো কি তা বলা ভারি শক্ত। এতদিনে জানলুম মানুষ যে শুধু মুখে কথা কয় তা নয়। তার চোখের পাতা, তার ঠোঁটের রেখা, তার আঙুলের ডগা, তার পায়ের নখটি পর্য্যন্ত কথা কইতে জানে। সে ভারি আশ্চর্য্য ভাষা। সে ভাষা স্পষ্ট শোনা যায় না, বোঝা যায় না, মনের উপর ছায়ার মতো এসে পড়ে। ছায়ার শীতলতা যেমন—এও তেমনি কেবল অনুভব করা যায়। এম্‌নি করে আজ সমস্ত দিন ঐ লোকটির কতকথাই শুনলুম। সে কি, মুখে তা বলতে পারবনা কিন্তু মনে তার ছাপগুলি লেগে আছে।

ওর সঙ্গে কোনো আলাপই হয়-নি, তবু মনে হচ্ছে খুব আলাপ হয়ে গেল। এ কি মজা বল্‌ দেখি?

তোরা কে কেমন আছিস?

(৮)

সরি পোড়ারমুখী,

তুই চিঠি লিখছিস্‌নি কেন? এখানে তোর চিঠিই আমার একমাত্র সঙ্গী তা জানিস? চাটুয্যে-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছি। চিল্‌মারির জমিদারদের বাড়িতে যাওয়া আমার পোষাল না। তাদের মেয়েরা এমন পর্দ্দা-বন্দী যে সকাল-সন্ধ্যা একটু বেড়াতেও বেরোয় না। পবন-দেব জোরজার করে যে হাওয়াটুকু গিলিয়ে দেন সেই পথ্যটুকুই তাদের বোধ হয় যথেষ্ট। খুব উঁচু পাচিল দিয়ে সমস্ত বাড়িটা আগাগোড়া ঘেরা—প্রবেশের জন্য যে ফাঁকটুকু আছে, তার মুখে প্রকাণ্ড পাগড়ি-বাঁধা রক্তচক্ষু প্রহরী! বাইরে থেকে একটু-কিছু যেতে হলে হিসেব দিয়ে যেতে হয়। কেউ ঢোকে সাধ্যি কি! আমি তো কোন্‌ ছার, সে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও ভয় পান। কাজেই বুঝতে পারছিস; আমি একেবারে

একলাটি! এমন অবস্থায় তোর চিঠি না পেলে কি-রকম রাগ ধরে বল্-দিকিন!

হ্যাঁ, তোর কাছে মিছে কথা বলব না। আজ ভোরে উঠেই ভারি-চমৎকার একটি বন্ধু পেয়েছি। এমন ফুটফুটে সুন্দর, এমন তুলোর মতন নরম, কি বলব! দেখে অবধি সে আর আমাকে ছাড়তে চায় না। একদিনেই আমার সঙ্গে এত ভাব করে ফেলেছে যে তাকে একদণ্ড ছাড়তে আমারও কষ্ট হয়। শুনে তোর হিংসে হচ্ছে বোধ হয়। তুই যে কি-রকম হিংসুটে তা ত আমার জানতে বাকি নেই! সেই সরমার সঙ্গে আমার যখন ভাব হল তখন কেঁদে-কেটে কি কাণ্ডটাই না করলি! তার সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হ'লি!

কিন্তু সত্যি কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলব, সরমার চেয়ে এর সঙ্গে আমার ঢের বেশী ভাব হয়েছে। এমন কি, তুই যদি নেহাৎ চিঠি না লিখিস তাহলে একে নিয়ে আমার দিন বেশ কেটে যাবে। এ যাতে না পালায় তার বন্দোবস্ত করতে হচ্চে।

(৯)

সরি,

আজও তোর চিঠি পেলুম না। ভাগ্যিস্ ঐ লোকটি ছিল, তাই একরকম করে দিন কাটচে, নইলে কি করতুম তাই ভাবি। তোর চিঠি না পেয়ে আজ মন এত খারাপ হয়ে গেল, কি বলব? বোধ হয় তার ছায়া আমার মুখের উপর এসে পড়েছিল। নইলে আজ দুপুরে আমাকে দেখবামাত্রই ও-বাড়ির ঐ লোকটির মুখচোখ অমন কাতর হয়ে উঠল কেন? মনে হ'ল তার চোখদুটি যেন উদ্বিগ্ন প্রশ্নে ভরা। কেবলই যেন জিজ্ঞেস্ করচে—তোমার কি হয়েছে? কি হয়েছে? ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, ওগো অত ভেবোনা, এমন কিছু হয়-নি! কিন্তু অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা কই কেমন করে? বেচারা সমস্ত দিন এমন কাতর হয়ে আছে যে দেখে মায়া করে। কিন্তু সরি, আমার জন্যে ওর অত ভাবনা কেন? আমি মরি-বাঁচি তাতে ওর যায়-আসে কি? না হয় মরলেও বুঝতুম—আহা একটা মানুষ মরে গেল গা—তার জন্যে লোকের দুঃখ হ'তে পারে। কিন্তু আমার একটু মন-খারাপ হয়েছে তাতে ওর অত মাথাব্যথা কেন বুঝতে পারি না।

তুই হয় ত বল্বি আমাকে, যে, তোর অত লক্ষ্য করবার দরকার কি? ও জন্যে তোর অত ভাবনাই বা কেন? কিন্তু কি জানিস্ সরি, তুই যদি দেখিস্ কেউ তোর জন্যে ভাবছে, তোর একটুখানি দুঃখে তার চোখে জল আসছে, তাহ'লে তুই তার কথাটা একবার মনে না করে থাকতে পারবি না।

(১০)

সরি,

তোর চিঠি পেলুম। তুই লিখেছিস্ এই লোকটিকে দেখবার তোর ভারি ইচ্ছে হচ্ছে। আমারও ইচ্ছে হচ্ছে, যদি পারতুম তোকে দেখাতুম। কিন্তু আবার ভয়ও হয়। তুই দেখলে হয়ত ওর বিস্তর খুঁৎ বার

করবি। তোর যে খুঁৎ বার করা স্বভাব! খুঁৎ যে নেই তা আমি বলছি না। মানুষ আবার নিখুঁৎ হয়েছে কবে? কিন্তু মানুষটির স্বভাবের ভিতর ভারি একটি চমৎকার শ্রী আছে। আর যদি নাই থাকে, তাতে তোরই বা কি, আমারই বা কি!

লোকটিকে দেখে-দেখে আমার কি ইচ্ছে হয় জানিস্? ওর সঙ্গে একটু ভাব করি। এতদিন আমাদের কাছাকাছি রইল অথচ আমরা ওর কোনো খবরই নিলুম না—এটা আমার ঠিক ভালো লাগছে না। আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম নিশ্চয় ওর সঙ্গে আলাপ করতুম। কিম্বা ও যদি মেয়ে হ'ত তাহ'লে ত' কথাই ছিল না।

কিন্তু তাও ঠিক নয়। আমি যা আছি তাই এবং ও যা আছে তাই থেকেও যদি আমাদের আলাপ হ'ত ত সেইটেই সবচেয়ে ভালো হ'ত। যাক গে, যা হবার নয় তা নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ কি?

তবু, ও ছিল-বলে' আমার এই একলা দিনগুলো একরকম কেটে যাচ্ছে। ও অত দূরে থাকলেও মনে হয় যেন খুব কাছে একজন সঙ্গী আছে।

ওর গলা কখনো শুনিনি—এক-একবার ভারি ইচ্ছে হয় ওর গলা শুনতে। কিন্তু ও দিন-রাত মুখটি বুজেই আছে। তাহ'লেও ও যে একেবারে নীরব, তা নয়। ওর ভাবের এক-একটা ইসারা চুপিচুপি আমার মনে এসে লাগে আর আমি চম্‌কে উঠি! হঠাৎ কখনো কখনো মনে হয় ও যেন আমায় ডাকছে। এক-একসময় এমন করে চায় যে ঠিক মনে হয় যেন ওর ঐ চোখদিয়ে আমার আরতি করছে! মাগো, আমার গা কেঁপে ওঠে! আমি মানুষ, আমাকে আরতি করা কেন?

কিন্তু ঐ জন্যেই ওকে আমার আরো বেশি-করে ভালো লাগে। ওতো আমায় ঠিক মানুষের মতন-করে দেখেনা! সে দেখা,—সে এক-রকমের দেখা! সেইজন্যে সে-দেখাতে কোনো সঙ্কোচ আসেনা, লজ্জা লাগে না।

কিন্তু তবু ওর গলাটি শোনবার জন্যে আমার মন দিন-দিন ব্যাকুল হয়ে উঠছে। আমি কান খাড়া করে থাকি—যদি কোনো ফাঁকে একটু শুনতে পাই। ও কথা কয় না কেন, সরি, বলতে পারিস্?

(১১)

সরি,

আজ ভারি মজা হয়েছে। ও লোকটার ভিতরে-ভিতরে দুষ্টুমি আছে। আজ সকাল থেকে ইচ্ছে-করে ঐ জান্‌লাটার কাছে যাইনি। দুপুরবেলা যখন গেলুম তখন দেখি ওর মুখ ভার। আমি অনেক-ক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, আমার দিকে একবার চাইলেও না। আমি মনে-মনে ভাবলুম, রোসো মজা দেখাচ্চি; বলে, সেখান থেকে চলে গেলুম এবং খুব-একটা শব্দ করে জান্‌লাটা বন্ধ করে দিলুম। বারোটার সময় তার খেতে যাবার সময়, আমি জান্‌লার ফাঁক দিয়ে দেখচি তার বামুন এল, চাকর এল, তবু সে খেতে উঠল না। বামুনটা খাবারের থালা সাম্‌নের টেবিলের উপর ধরে দিয়ে চলে গেল। সে

তার দিকে চাইলেও না, ছুঁলেও না। দেখে প্রথমটা আমার মায়া করতে লাগল, পরে ভাবনা হ'তে লাগল—বেচারা না খেয়ে শেষে অসুখে পড়বে! আমি ধপাস্ করে জানলাটা খুল্লুম। সে-শব্দে সে চোখ তুল্লেনা, যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। আমার তখন মহা ভাবনা হ'ল—তাইত, কি করি?

তুই ত জানিস, আমাদের খাওয়া হয় অনেক দেরিতে—বিশেষতঃ বিদেশে আরো দেরি হয়ে যায়। বাবার খাবার কোনো তাড়া নেই, সেইজন্যে তিনি আমাকে আগে খেয়ে নিতে বলেন। তা যদি না হ'ত আজ ভারি মুস্কিলে পড়তুম। বাবার সঙ্গে খেতে হ'লে আমাকে খেতে বসতেই হ'ত—না বলতে ত পারতুম না। কিন্তু আজ যখন দাসী এসে খবর দিলে খাবার এসেছে, আমি বারান্দা থেকে চীৎকার করে বল্লুম—"যা, আজ আমি খাব না।"

যেমন আমার এই কথা শোনা, দেখি, ঐ লোকটি সুড়্সুড়্ করে খাবারের থালার কাছে এগিয়ে গেছে। আমার হাসিও পাচ্ছিল, দুঃখও হচ্ছিল। আহা, বেচারাকে আজ ঠাণ্ডা খাবার খেতে হ'ল। দাসী জিজ্ঞাসা করলে—"কেন খাবেনা দিদিমণি?" আমি বল্লুম—"যা, যাচ্ছি।"

তারপর বিকেলে দেখি, তার মুখ আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। আমি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, সকালবেলা ঐখানটিতে যাওয়া কোনো দিন আর বন্ধ করব না। শেষে কি একটা লোক না-খেয়ে মরবে!

(১২)

ওলো সরি,

তোর অত মান-অভিমান, রাগ-বিরাগ কেন লো! সে তোর সতীন নয়, সে একটা বেড়াল-বাচ্ছা! বেচারা আমাদের বাড়িতে এসে পড়েছিল, তাই তাকে একটু যত্ন করি। এক বাবা-ছাড়া আর আমার যত্ন-করবার কে আছে বল? তাই যাকে পাই, তাকেই যত্ন করতে ইচ্ছে করে। এই মিনিটাকে নিয়ে এখন আমার অনেকটা সময় কাটে—ওর জন্যে তবু খানিকটা কাজ পেয়েছি। ওকে বুকে তুলে যখন আদর করি, ও ল্যাজ-নেড়ে মিউ-মিউ করতে থাকে; পুট্‌পুটে চোখ তুলে আমার দিকে এমন-করে চায় যে মনে হয়, বেড়াল হ'লে কি হয়, সব বোঝে। ও বোধ হয় মায়া জানে, নইলে বেড়াল হয়ে আমাকে মুগ্ধ করলে কেমন-করে? আমাকে এমনি-করে তুলেছে যে দিনরাত ওটাকে থেকে-থেকে বুকের মধ্যে চেপে না ধরলে বুকটা কেমন ফাঁকা বোধ হয়।

(১৩)

সুরি,

ও লোকটি সেদিনে আমাকে যেমন মুস্কিলে ফেলেছিল, আজ নিজে তেমনি জব্দ হয়েছে।

ব্যাপারটা

মিনি গিয়েছিলেন আজ ওদের বাড়ি বেড়াতে। নিশ্চয়, কিছু দুষ্টুমি করেছিল। হঠাৎ বারান্দায় গিয়ে দেখি ঐ লোকটি সজোরে জুতো ছুঁড়ে মিনিকে মারলে।

মিনি কুঁইকুঁই করতে-করতে একেবারে আমার কাছে পালিয়ে এল। আমি তাকে বুকে তুলে নিতেই লোকটির যা লজ্জা তা আর তোকে কি বলব!' বোধ হয় জানত না ওটি আমার পোষ্য। আমি মিনির পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। যতই হাত বুলোতে লাগলুম ততই ঐ লোকটির অনুতাপ বুক-ফেটে উঠতে লাগল। আমার কাছে একটা মালিসের কৌটো ছিল, সেইটে ঘর থেকে বার করে এনে আমি মিনির পিঠে ঘস্‌তে লাগলুম; দাসীকে গরম জল আনতে বলে সেঁক দিতে লাগলুম। মিনির এসব কিছুই দরকার ছিল না, তার এমন বিশেষ-কিছু লাগেনি। আমি কেবল দুষ্টুমি করে এত কাণ্ড করছিলুম। এই সামান্য ব্যাপারটাকে আমি ক্রমে এত ঘনিয়ে তুল্লুম যে লোকটি শেষে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল। আমার মনে হতে লাগল যেন তার চোখদুটি আমার পায়ে লুটিয়ে-পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। আমার এমন হাসি আসছিল কি বলব! লোকটা যদি একটু চোখ দিয়ে দেখত, তাহলে তখনই আমার দুষ্টুমি ধরা পড়ত। কারণ, মিনির যে কিছুই হয়-নি, সে তার স্ফূর্ত্তির লাফালাফি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।

বেচারার অনুতাপ এখনো কাটেনি। ওর ঐ মনের ছট্‌ফটানি দূর করতে হ'বে। কি করে করব তাই ভাবছি।

(১৪)

সরি,

সাধে বলি কি তুই বেজায় হিংসুটে! তোরও অম্‌নি একটা বেড়াল-বাচ্ছা চাই? পাব কি না জানিনা, তবে খোঁজ করব। যদি না পাই একটা পাখী নিয়ে যাব।

হ্যাঁ, মিনির কথায় একটা কথা মনে পড়ল। এর-মধ্যে বেহায়া মিনি আবার একদিন ও-বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওমা, দেখিনা, টেবিলের উপর উঠে ঐ লোকটির পাশে চোখ-বুজে বসে আছেন; আর তিনি তার পিঠে হাত-বুলিয়ে আদর করছেন। তার ল্যাজ দেখে বুঝলুম কোথায় একটি কালির দোয়াত উল্‌টেছেন। তাতে আজ ঐ লোকটির একটুও রাগ দেখা গেল না। তিনি বোধ হয়, সেদিনকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন। হঠাৎ মিনি চোখ তুলে সেখান থেকে আমায় দেখতে পেয়ে মিউ-মিউ করে উঠল। তিনি ঘাড় তুলে আমাকে দেখলেন। আমার এমন লজ্জা করতে লাগল কি বলব! মনে-মনে বল্লুম, মিনিটা বাড়ি আসুক না একবার, মজা টের পাওয়াব। তিনি খুব করে তাকে আদর করতে লাগলেন। আমি সেই আদর দেখচি দেখে তার মনের সেই ছট্‌ফটানি কমেচে বলে বোধ হ'ল।

সরি, এ কি মুস্কিলে পড়লুম বল্ দেখি? যেমন-করে হোক তার কথা কি এসে পড়বেই! ঐ মানুষটিকে চোখ থেকেও যেমন সরাতে পারছিনা, মন থেকেও তেমনি! ও কোথা-থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল বল্ দিকিন্!

এখানে আমার চোখের সাম্‌নে আর-কেউ নেই বলে ও অত বড়-হয়ে উঠেছে;—যেন সমস্ত দৃষ্টিকে রোধ-করে একমাত্র ঐ-

মানুষটি বিরাজ করছে। নির্জ্জনতার এই বড় মুস্কিল যে তার মধ্যে যেটিকে দেখা যায় সেটি বড় গুরুতর হয়ে ওঠে। ঐ মানুষটিকে আমার জীবনে হয়ত মনে রাখবার কোনো দরকার নেই, তবু ও মনে থাকবেই। ওর সঙ্গে আমার জীবনের কোনো সংশ্রব নেই তবু ও এমন-করে জড়িয়ে গেল যে এ জট হয় ত কখনো খুলতে পারব না। অথচ এর মজা এই যে এ জট আমরা কেউ ইচ্ছে করে পাকাইনি।

কিন্তু তাই বলে' এঁর প্রতি আমি যেন কোনো অবিচার না করি! তাঁর পরে আমার কোনো নালিশ নেই। তিনি অ মার মনের ভাণ্ডারে যেটুকু দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা তুলে রেখেছি। এই কৃতজ্ঞতা যেন আমি ইহজীবনে না ভুলি!

(১৫)

সরি,

ছি ছি, ছি! তুই এমন কদর্থ করবি জান্‌লে আমি তোকে আমার এই সব মনের কথা লিখতুম না। তুই ঠাট্টা করেছিস্ কিন্তু ঐ ঠাট্টাটা হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। তুই ঠাট্টার ছলে আমার নারীত্বকে এমন অপমান করেছিস যে তোর সঙ্গে আমার কথা কয়বার ইচ্ছে হচ্ছে না। আমারই ভুল হয়েছে। এ-সব মনের কথা আমার মনে-মনে গোপন রাখাই উচিত ছিল। মনের জিনিষ বাইরের আব-হাওয়ায় এম্‌নি করেই বিকৃত হয়ে ওঠে! আমার মনের কথা তোকে আমি আর-কখ্‌খনো লিখব না। এই শেষ!

প্রথম পিঠের কথা

ডায়ারির ছেড়া-পাতা

কবি বলেছেন—

"গোপনে থাকে প্রেম যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।"

কিন্তু আমি আমার দেবীর চরণে কুসুম দিতে পারলুম কৈ? আমার মনের বাগানে যে ফুল ফুটেছে তার সৌরভ দেবীর কাছে পৌঁচেছে কি না জানিনা; সে গোপন-বিজনের ফুল না হয় গোপনেই থাক্! কিন্তু আমার এই কুটীরের আশে-পাশে স্তরে-স্তরে রাঙা-সাদা নানা রঙের ফুল যে ফুটেছে, এ তো আর কারু কাছে গোপন নেই, তবু এরই একটি ডালি তাঁকে ত উপহার দেওয়া হ'লনা! দেবী আমার ফুল ভালোবাসেন, সে তাঁর ফুলের উপর চাহনি দেখেই আমি বুঝেছি।

আমার এক-একসময় মনে হয় ঐ যে নানা রঙের ফুলগুলি ফুটেছে, ওরা যেন আমার মনের গোপন-কথা—আমার হৃদয়ের স্বপ্ন যেন ওরা! তাই ত আমার রোজই ইচ্ছে করে, যে, ঐ ফুলের একটি-একটি-করে তুলে দেবীকে উপহার পাঠাই। তাহ'লে দিনে দিনে এক-একটি ফুলের কথায় আমার হৃদয়ের কাব্যটি দেবীর সাম্‌নে ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে। কিন্তু হায়, কৈ দেওয়া হ'ল আমার ফুল? আমার চোখের সাম্‌নে কতবার তারা ফুটল, কতবার ব্যর্থ হয়ে ঝরে পড়ে গেল, আমার দিকে চেয়ে তারা কত মিনতিই জানালে, তবুতো আমি কিছু করতে পারলুম না।

(২)

রোজ দেখি দুপুরবেলা উনি বসে-বসে চিঠি লেখেন। এ সম্বন্ধে এতদিন কোনো কৌতূহল হয়-নি, আজ হঠাৎ মনটা কেমন করছে। উনি এত যত্ন করে ঐ চিঠিগুলি লেখেন কাকে? মনে হয় সমস্ত মনটি যেন চিঠির উপর ঢেলে দিয়েছেন। ঐ মন-ঢালা চিঠিগুলির প্রত্যাশায় কে পথ চেয়ে বসে আছে? ঐ চিঠি যখন তার কাছে পৌছবে, না-জানি সে কত খুসি হয়ে উঠবে!

সে কে? কে জানে কেমন সে দেখতে? কি জানি ওঁদের দুজনের কেমন ভাব। কিছুই জানিনা, তবু সেই মানুষটির একটি ছায়া আমার মনে এসে লাগছে। ভারি ইচ্ছে করছে ওঁদের দুজনের চিঠির কথাগুলি চুপি-চুপি উঁকিমেরে দেখে নি।

উনি এখনো ঐ বসে-বসে লিখছেন। কি-কথা লিখছেন, কার কথা লিখছেন, কে জানে?

(৩)

ও-বাড়ির বুড়োটি আজ আমার সঙ্গে দেখা-করতে এসেছিলেন। লোকটি ভারি মিষ্টি। এত বয়স হয়েছে তবু আমার মনে হ'ল যেন আমারই সমবয়সী। তিনি এসেই বল্লেন—"দেখুন, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। আপনি আমার নিকটতম প্রতিবেশী তবু এদ্দিনের মধ্যে একদিনও আপনার কাছে আসিনি!"

আমি বল্লুম—"যদি এটাকে দোষ বলেন তাহ'লে তা উভয়েরই হয়েছে।"

উনি বল্লেন—"না। কিজানেন, আমি যখন বয়েসে বড়, তখন আমারই উচিত সবপ্রথম—"

আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"আমি যখন বয়েসে ছোট, তখন আমারই উচিত ছিল সবপ্রথম আপনাকে একটি নমস্কার জানিয়ে আসা।"

উনি প্রসন্নমুখে বল্লেন—"তাহ'লে আমি খুবই খুসি হতুম বটে। কিন্তু ত্রুটিটা আমারই হয়ে গেছে স্বীকার করতে হ'বে।"

তারপর উনি বল্লেন,—"দেখুন, আমি জানতুম না যে আপনি এই বিদেশে একলাটি আছেন। তাহ'লে কখনোই এই অবহেলা ঘটতে দিতুম না। আজ আমি এই প্রথম শুনলুম।"

ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করি, কার মুখে শুনলেন? কিন্তু মুখ-ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। আমার কেবলই মনে হ'তে লাগল বৃদ্ধের এই কুশল প্রশ্নের ভিতর দিয়ে আমার দেবী তাঁর মনের দূতটিকে আমার কাছে পাঠিয়েচেন। বৃদ্ধের সমস্ত কথার মাঝ থেকে আমি তাঁরই গলার সুর শুনছিলুম।

(৪)

একটি ঘটনায় আমার মনকে আজ ভারি চঞ্চল করেছে। আজ আমি খাইনি, উনি কি টের পেয়েছেন? নইলে সমস্ত দিন অমন মুখ-শুকিয়ে আছেন কেন? আমার শরীর ভালো নেই, একথা ত ওঁর জানা সম্ভব নয়, তবু কেন মনে হচ্ছে উনি আমার জন্যে ভারি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠছেন? যেন কেবলই প্রশ্ন করছেন—আমি কেমন আছি? আমার কি হয়েছে?

আমি বারবার মনে-মনে হেসে-উঠে বলবার চেষ্টা করছি—আমার কিছুই হয়নি,—ও কিছু নয়! কিন্তু তবু ত ওঁর মন ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

ওঁর ঐ শুক্‌নো মুখ দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে বটে কিন্তু যেমন ভাবছি আমার জন্যেই ওঁর ঐ মুখটি শুকিয়ে উঠেছে অমনি ভিতরে-ভিতরে ভারি একটি আনন্দ লাভ করছি।

(৫)

আমার হৃদয়টি যে তাঁর পায়ে নিবেদন করেছি, এ খবর কেউ না-জানলেও আমার মনের কাছে তা তো গোপন নেই। দেবী আমার নিবেদন গ্রহণ করেছেন কি-না মনের এ সন্দেহ এ দিন পরে বোধ হয় মিটল। কারণ তার পরিচয় একটু-একটু করে আমার মনের ভাণ্ডারে এসে জমা হতে আরম্ভ করেছে। আমার প্রতি তাঁর চাহনির রং যেন বদ্‌লে গেছে। তার মাঝে প্রেমের উজ্জ্বল শিখাটি জ্বলে উঠছে কি-না বলতে পারি না, কিন্তু একটি আকর্ষণের টানে ভাবের রেখা যে বিচিত্র হয়ে উঠছে এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কে-জানে এ দেখা আমার ভুল কি-না। হয়ত আমারই মনের রঙে আমার চোখের দেখা রঙিন হয়ে উঠছে। এ ভুলই হোক, আর সত্যই হোক এর আনন্দ ত মিথ্যে নয়। সেইটিই আমার পরম লাভ।

(৬)

আজ বৃদ্ধটি এসে আমায় নিমন্ত্রণ করে গেলেন। তিনি ব'ল্লেন যে আমি একলা থাকি, নিশ্চয় আমার খাওয়া-দাওয়ায় কষ্ট। এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমার ভারি লজ্জা করছিল, কিন্তু এড়াতেও মন-সরছিল না। মনে হচ্ছিল এ নিমন্ত্রণের মধ্যে দেবীর একটি সাদর আহ্বান প্রচ্ছন্ন আছে। আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম।

দেবী-মন্দিরে আমার নিমন্ত্রণ! আজ সমস্ত দিন আমার বুকটা দুর্‌দুর্‌ করছে।

(৭)

কাল নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলুম। দেবী আমার সাম্‌নে আসেন্‌নি, কিন্তু গৃহে প্রবেশ-মাত্রই তাঁর হাতের পরিচর্য্যা চারিদিক থেকে আমাকে অভিনন্দন করে উঠল। এমন কি, তাঁর সাম্‌নে-আসার অভাবটি পর্য্যন্ত আমায় অনুভব করতে দিলেন না,—এমন নিবিড়ভাবে তাঁর নিজের আভাসটিকে চারিদিকে জাগিয়ে রেখেছিলেন।

দেবীর প্রসাদ ত আমি গ্রহণই করলুম। কিন্তু তাঁকে কিছু দিতে পারলুম কৈ? দেবীর হয়ত কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু তা বলে মন ত মানে না—তার যে একটা দেবার কান্না আছে।

(৮)

আজ ওঁর ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে, আমি এতদিন ভারি ভুল বুঝে এসেছি। যা দেখেছি সে শুধু স্বপ্ন! দেবী যে ধীরে ধীরে আমার হৃদয়-মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছেন, সে আমার মনের কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। আমার এত-দিনের আশার জগৎ আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

ব্যাপারটা খুবই সামান্য; কিন্তু তার আঘাত বড় ভয়ানক! দেবী ঐখানে দাঁড়িয়েছিলেন; আমি আজ একটু সাহসী হয়ে একটুখানি এগিয়ে গিয়েছিলুম মাত্র; কিন্তু তিনি আমাকে দেখেই চলে গেলেন। আমার সেই ব্যাকুলতার প্রতি এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

মূঢ় আমি। ভেবেছিলুম ওঁর মনটি

আমি জয় করেছি! যা জয় করবার জন্যে জগতে বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, আমি ঘরের কোণে বসে তাই জয় করেছি? বাতুল ছাড়া এমন কথা কে ভাবতে পারে?

(৯)

বৃদ্ধটি আবার আজ দেখা করতে এসেছিলেন। হাতে কিছু খাবার এনেছিলেন। ওঁদের মৌখিক আলাপ ক্রমেই আত্মীয়তায় এসে জমছে। কিন্তু কেন এ আত্মীয়তা? যার মূলে কিছুই নেই, হৃদয়ের বাঁধুনি যেখানে আল্‌গা, সেখানে আত্মীয়তা নিয়ে কি হবে? এঁদের এই আত্মীয়তা আজ সমস্ত দিন আমার বুকে বিঁধেছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি যখন ইনিয়ে-বিনিয়ে আমাকে স্নেহ দেখাচ্ছিলেন, তখন আমি কিছু বলতে পারিনি, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয়-মন অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। তাঁর কথা আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। ইচ্ছে করছিল তাঁকে কোনোরকমে বিদেয় করে দিয়ে চুপটি করে পড়ে থাকি।

(১০)

না, না, না! কাল্‌কের আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভুয়ো। আজ সকালে উঠে ওঁর মুখখানি দেখেই আমার মনের সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেছে। অমন প্রসন্ন দৃষ্টি—যা আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল করে দিলে তা কখনো মিথ্যা হ'তে পারে না।

আমি কি ভুলই বুঝেছিলুম!—ঐ বৃদ্ধটির প্রতি তখন কি অবিচারই করেছিলুম! এখন আমার অনুতাপ হচ্ছে। আজ সমস্ত দিন কেবল ওঁদের কথাই ভেবেছি। তাতে আমার বারবার মনে হয়েছে ওঁরা আমাকে এত স্নেহের উপহার দিচ্ছেন, আমি কি কিছুই দিতে পারি না? কিন্তু কি দেব? দেবার মতন জিনিস কী আছে?

হঠাৎ মনের গোপন কোণ থেকে এই কথাটা খোঁচা মেরে উঠল—তোমার বাগানে এত ফুল—কিছু ফুল পাঠাও না। হায়রে আমার ফুল!

(১১)

উনি হারমনিয়মের সঙ্গে আজ একটি গান গাইছিলেন। তার সব-কথা আমার মনে নেই, কিন্তু একটি কথা এত বার-বার করে বলছিলেন যে এ জীবনে তা ভোলা অসম্ভব।

"সখী,প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে?
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।"

ঐ গান শুনে অবধি তাঁর মাথার ঐ একটি-কুসুম পাবার লোভ মন কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না!

(১২)

শুনেছি এবং পড়েছি প্রেম মানুষকে অসমসাহসী করে' তোলে! কিন্তু আমার মধ্যে সাহসের একটু কণাও জেগে উঠল কৈ? আজ পর্য্যন্ত সাহস করে তাঁর সঙ্গে একটি কথাও কইতে পারলুম না! ছি, ছি, ছি! নিজের প্রতি আমার ঘৃণা হচ্ছে। মনের একটি ক্ষুদ্র সঙ্কোচ দিয়ে বিধাতার এতবড় একটি শ্রেষ্ঠ দান আমি ব্যর্থ করে ফেলুম! হায়, হতভাগ্য আমি!

(১৩)

উনি মধ্যে-মধ্যে গান করেন; আমি শুনি। আমি খুব ভালো-রকমই জানি, গানের লক্ষ্য আমি নই—এবং হয় ত এ

দুনিয়ায় কেউই নেই—তবু এক-একটা লাইন শুনে আচ্‌মকা মনে হয় আমার উদ্দেশেই যেন ঐ গান ভেসে আসচে। সুরের সঙ্গে কথাগুলো এমন-করে জড়িয়ে আসে যে তার ধাক্কায় আমায় স্বীকার করতেই হয় আমি ছাড়া ও কথা আর-কারো জন্যে নয়। একএকসময় জোর করে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করি—না, তা নয়। অমনি মনে হয় গানের যেন কোনো অর্থই পাওয়া যাচ্ছে না, সুর যেন তার সঙ্গে মিশতেই চাইছে না।

এক-একসময় দেখি আমারই মনের কথাটি উনি গেয়ে উঠলেন।—যেন আমারই হয়ে গাইছেন। যে কথা আমি বলিনি অথচ বলবার অপেক্ষায় ছিলুম—এ হুবহু সেই কথা! গান শেষ হ'লে আমার মনটা নিশ্চিন্ত হয়—যাক্, আমার কথাটাও তবু বলা হ'ল।

(১৪)

আজ সমস্ত দিন নিজের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। কেন হ'বে না?—কেন হবে না? তার সঙ্গে একটি কথা-কওয়া কেন হবে না? ভিতর থেকে কে যেন বলেছে, যা হয় না, তা কি করে হ'বে? আমি বল্লুম, যা হয় না, তা হওয়াতে হ'বে। সে বল্লে, আচ্ছা, তোমার চোখ-রাঙানি মানলুম কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নেমে এস দেখি! অম্‌নি মনে হ'ল তাইত, কি সুরে তার সঙ্গে কথা কই? কোন্ সুযোগে তার চোখের সাম্‌নেটিতে গিয়ে দাঁড়াই? ঝগড়ার এইখানে আমার মনটি একেবারে কুঁচ্‌কে গেল। কথা-কওয়ার সাধটি হতাশার অন্ধকারে, বুকের মাঝে হায়-হায় করে ফিরতে লাগল। তাকে শান্ত করতে পারলুম না!—পারলুম না! কত আশার স্বপ্ন দিয়ে ঐ সাধটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলুম—একে-একে তার দলগুলি ঝরে যেতে লাগল।

মনে-মনে তো তার সঙ্গে অনেক কথা কয়েছি, মুখ-ফুটে কথা বলবার এবং তার মুখের কথা শোন্‌বার পিপাসা ত তবু মিটচে না! গলার সুরে যে সুধাটি আছে সেটি পান করবার জন্যে সমস্ত হৃদয় যে তৃষিত হয়ে উঠল।

আমি এই সব কথা লিখচি আর তাঁর উজ্জ্বল দুটি-চোখের দৃষ্টি জান্‌লার ফাঁক্ দিয়ে আমার এই লেখার উপর এসে পড়চে—আর আমার লেখাগুলি সুধাসিক্ত হয়ে উঠ্‌ছে। আমার হাতের অক্ষর দেখে আমি নিজেই খুসি হয়ে উঠছি।

ওগো দেবী, এ আমি কি লিখচি, কার কথা লিখচি তা কি তুমি টের পেয়েছ? দেখবার জন্যে তোমার আঁখিদুটি কি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে? কৌতূহলে কি তোমার সমস্ত হৃদয়টি ঝুঁকে পড়েছে? এই লেখাটি পড়তে পেলে কি তুমি খুসি হবে?

(১৫)

আজ দেবীকে আমি খুব স্পষ্ট করে দেখ্‌লুম। আমার মনে হ'ল দেবী সত্যই পাষাণী! কৈ, ঐ চোখে ত কিছুরই আভাস দেখিনা—ও তো একেবারে শূন্য। তবে এতদিন কি আমি ঐ শূন্যতারই পূজা করে এসেছি?

এই কথা ভাব্‌ছি এমন সময় হঠাৎ ওঁরা দুজনেই আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। আমি একেবারে চম্‌কে গেলুম; আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল!

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—"এ দীনের কুটীরে দেবীর যে পায়ের ধূলো পড়ল,—এ সৌভাগ্য আমায় কে এনে দিলে?"

বৃদ্ধটি বল্লেন—"আপনাকে আমরা একটু বিরক্ত করতে এলুম!"

আমি মনে-মনে বল্লুম—"এতবড় আনন্দের সওগাদ জীবনে আর কখনো পাব কি?"

বৃদ্ধ বল্লেন—"শুনলুম, এই বাড়িটা বিক্রি। আমার এখানে একটা বাড়ি কেনবার ইচ্ছে আছে, তাই বাড়িখানা একবার দেখতে এলুম। কিছু মনে করবেন না।"

আমি মনে-মনে বল্লুম—"ধন্য আমি!"

বৃদ্ধ আমার সঙ্গে কথা কইছিলেন; দেবী তাঁর পাশে মুখনীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁর দিকে একবার চেয়েই মাথা নীচু করে নিলুম। আমি একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিলুম। বৃদ্ধ আমার পিঠে হাত দিয়ে বল্লেন—"চলুন, বাড়িটা দেখেনি।"

আমি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে সমস্ত বাড়িখানা দেখাতে লাগলুম। আমার মনের মধ্যে এমন-একটা ঝড় বইতে লাগল যে দেবীদর্শনের আনন্দটি মনের উপর থিতিয়ে বসতে পেলেনা। কোনো-কিছুরই ছাপ পড়ল না; সবই যেন তাড়াতাড়ি নড়ে-নড়ে সরে চলে গেল। নিমেষের মধ্যে মনের ভিতর যে কত তুফান বয়ে গেল তার ঠিক নেই!

দেবী আমার ফুলের বাগানটি অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন। হায়, আমার ফুলের বাগান! এর একটি ফুলও যদি ঐ হাতে তুলে দিতে পারতুম! ইচ্ছে হ'ল বলি, দেবী, একটি ফুল তুলে নিয়ে আমার জীবনকে সার্থক কর। কিন্তু মুখ-ফুটে বলতে পারলুম না। এতবড় সুযোগটা বহে গেল!

বৃদ্ধ আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় দেবীর চোখের দিকে একবার দেখলুম; কিন্তু চোখ তাঁর উঠল না কেন?

(১৬)

দেবী দয়া করে আমার ঘরে এসেছিলেন, আমি তাঁর অভ্যর্থনা করতে পারলুম কৈ? আজ এই কথাটা কেবলই মনে হয়ে সমস্ত হৃদয় হায় হায় করছে। আজ সারা দিন আগাগোড়া বাড়িখানা আমি খুঁজেছি—কোথায়-কোথায় তাঁর পায়ের চিহ্ন পড়েছে। বাতাসের গায়ে হাত দিয়ে-দিয়ে দেখেছি—কোথায় তাঁর স্পর্শটুকু লেগে আছে। তাঁর মাথা থেকে ফুলের একটি পাপ্‌ড়ি ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, আমি তখন তুলে নিতে পারিনি—যতক্ষণ তাঁদের সঙ্গে ঘুরেছি লুব্ধ মন ঐ পাপ্‌ড়িটির উপর পড়েছিল। তাঁরা চলে যেতেই সেটিকে বুকে তুলে নিয়ে বাক্সবন্দী করেছি। এটি তাঁর সেই গানের—'আমার মাথার একটি কুসুম!'

(১৭)

বাড়ি থেকে রোজ প্রশ্ন আসছে, আমি কবে ফিরে যাব? এখানে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই, তবু যেতে মন চাইছে না। যাবার কথা উঠলেই মনে হয় কি বুঝি তাড়াতাড়িতে ফেলে যাচ্ছি। আজ লিখে দিলুম আমি এখন যেতে পারব না।

(১৮)

আজ বেড়াতে যাবার সময় আমার ফুলের বাগানের বেড়ার পাশটিতে দেবী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন। কী মমতা-ভরা চোখ-দুটি দিয়ে তিনি ফুলগুলিকে দেখছিলেন! ফুলের গাছেরা মাথা নুইয়ে দেবীকে অভ্যর্থনা করলে; ফুলেরা হেসে-হেসে তাঁকে ডাকতে লাগল। দেবীর পা-দুখানি একবার একটু এগিয়েই সঙ্কোচে পিছিয়ে এল; হাতখানি বাড়াতেই লজ্জা সেটিকে টেনে নিলে। দেবী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমার ইচ্ছে হ'ল ছুটে গিয়ে বলি, এস দেবী, এস, এই ফুল-বাগানে এস, যত খুসি ফুল তোল; ফুলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দাও! কিন্তু কিছুই বলতে পারলুম না। দেবী চলে গেলেন। আমি ছুটে এসে মালিকে বল্লুম, "ওরে, শিগ্‌গির একটা ডালি সাজা।" মালি রং-বেরঙের ফুল দিয়ে ডালি সাজালে কিন্তু তার সাজানো আমার পছন্দ হ'ল না। আমি সমস্ত দিন ধরে নিজের হাতে ডালি সাজালুম। তারপর সেই ডালি হাতে নিয়ে কতক্ষণ বসে-বসে ভাবলুম; মনে-মনে কতবার সেটি দেবীর পায়ে নিবেদন করলুম, কিন্তু হাতে তুলে দেওয়া আর হ'ল না। আমার ডালি-ভরা ফুল শুকিয়ে গেল।

(১৯)

আজও ডালি-ভরে ফুল সাজালুম, আজও পাঠাতে পারলুম না। আজকের ফুলও শুকিয়ে গেল।

(২০)

প্রতিদিনকার ডালির ফুল যেমন করে শুকিয়ে যাচ্ছে, আমার মনে হচ্চে অমনি করে আমার হৃদয়-দলের উপর ব্যর্থতার তপ্ত নিশ্বাস পড়ে-পড়ে সেগুলিও শুকিয়ে উঠ্‌ছে। চারিদিক থেকে কেবলই অবসাদ এসে জমছে। এতদিন যেগুলো সত্য বলে বিশ্বাস হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে সে স্বপ্নমাত্র! দেবীর ঐ যাওয়া-আসা ঐ চোখতুলে চাওয়া,—ঐ গান, ঐ হাসি, সবই যেন স্বপ্ন! এই স্বপ্নের মধ্যে জাগরণের সমস্ত উৎকণ্ঠা রয়েছে কিন্তু কিছু করবার শক্তিসামর্থ্য নেই!

এখন দেবী কি-চোখ দিয়ে আমায় দেখছেন কে জানে! তাঁর দৃষ্টি আমার হৃদয়ের অলিগলির ভিতর কেবলই ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে আমি অনুভব করছি, কিন্তু সেখান থেকে যে সাড়াটুকু উঠছে, সেটুকুতেই কি তাঁর মনের তৃপ্তি হচ্ছে? আরো কিছু পাবার—দুটি কথা, একটু হাসির জন্যে তাঁর মনে কি আকাঙ্ক্ষা জাগচে না? জানবার ভারি ইচ্ছে হয়। দূর হ'ক গে! কি হবে আমার জেনে? জেনে আমি কি করব?

এই অবসাদের মধ্যে এখন মনে হচ্ছে, আমার দিবারাত্রের এই স্বপ্নটি যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে,—কেবল তার স্মৃতিটুকু রেখে দিয়ে!

ঐ যে দেখছি দেবী আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। আবার আমার স্বপ্ন ঘোরালো হয়ে উঠল। এতক্ষণ যা মিথ্যা মনে হচ্ছিল আবার তা সত্য হয়ে উঠল। যাই, দেবীর জন্যে ফুল সাজাইগে।

(২১)

রোজ সন্ধ্যাবেলা আকাশের ঐ তারাটিকে আমি দেখি। ওর নাম জানিনা, ওর পরিচয় জানিনা, তবু ওটিকে আমি বড় ভালো-বাসি। কেন ভালোবাসি তাও জানিনা।

দিন-দিন দেখছি ও উদয়ের পথ ছেড়ে অস্তের পথে এগিয়ে চলেছে। ঐ আকাশের তারা, ও কখনো কাছে আসবে না, ওকে কাছে কখনো পাবনা, তবু মন ওরই সঙ্গে ছুটেছে—থামতে চায় না। ওর জন্যে আসন্ন-বিরহব্যথা এরই মধ্যে আমার বুকে জেগে উঠেছে।

আমার হৃদয়-আকাশে যে-তারাটি উঠেছে সেও ঠিক ওরই মতন। তারও নাম জানিনা, পরিচয় পাইনি, তবু তাকে আমি ভালোবাসি। সে কখনো কাছে আসবে না, তবু মন তারই দিকে ছুটেছে। এক-একবার মনে হয় বুঝিবা ঐ-তারাটির মতো আমার এই-তারাটিও হৃদয়-আকাশ থেকে অস্তাচলের পথে এগিয়ে চলেছে;—কবে বুঝি আমার সমস্ত হৃদয় অন্ধকার করে দিয়ে অদৃশ্য হবে!

(২২)

কাল রাত্রে খুব ঝড় হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে যখন সেই ঝড়ের গর্জ্জন শুনছিলুম তখন টের পাইনি যে তার ধাক্কা আমার জীবনে এসে লাগচে। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়েছিলুম। জেগে-জেগে ফুলের স্বপ্ন দেখছিলুম। সকালে উঠে, আবার কি-রকম করে ডালি সাজাব তারই কল্পনায় মনকে রঙিন করে তুলছিলুম। বাইরের ঝড় আমার অন্তরের এই রঙিন বাতির উপর অলক্ষ্যে ফুৎকার দিচ্চে তার আভাসটি পর্য্যন্ত পাইনি।

সকালে উঠে বাগানে গিয়ে দেখি ঝড়ের ঝাপটায় আমার ফুলের বাগান উজাড় হয়ে গেছে। বাগানের সেই অবস্থা দেখে আমার মনে হ'ল যেন একটা মূর্ত্তিমান তিরস্কার চোখ-রাঙিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

হায়, হায়, আমার এত সাধের আশার উপর এ কি বজ্রাঘাত হ'ল! কাল মনের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়েছিলুম যে আজ ফুলের উপহার পাঠাবই। কিন্তু কি নিয়ে এখন সে উপহারের ডালি সাজাই?

আবার ফুল ফুটবে—সে কতদিনে কে জানে? ততকাল কি অপেক্ষা করা চলবে?

এখন ঐ বারান্দাটিতে গিয়ে বসতে আমার লজ্জা করছে। ছি, ছি, কি করে তাঁকে আমি মুখ দেখাব? আজ কি নিয়ে তাঁর সাম্‌নে দাঁড়াব?

কিন্তু পারলুম না, বারান্দায় গিয়ে বসতে হ'ল। অনেকক্ষণ ওবাড়ির দিকে মুখ তুলে চাইতে পারিনি। হঠাৎ চোখ-তুলে দেখলুম বাড়ি শূন্য!—মন্দির আঁধার করে যেন দেবী অন্তর্হিত হয়েছেন!

আমি চৌকি ছেড়ে উঠে, ছুটে গিয়ে বারান্দার একেবারে শেষ-কিনারায় দাঁড়ালুম। সত্যই বাড়ী শূন্য! আমি কিছু বুঝতে পারলুম না। আমার মনে হ'ল কাল্‌কের ঝড়ে সমস্ত পৃথিবীখানা বুঝি ওলটপালট হয়ে গেছে। এতবড় বিরাট শূন্যতা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। আমার মনে হ'তে লাগল আমার খালি বুক-খানার ভিতর দিয়ে কাল্‌কের ঝড়ো হাওয়া হুহু শব্দে বহে চলেছে—কোথাও একটু বাধছে না, এমনি সেটা শূন্য!

আমি টেবিলের উপর মাথা দিয়ে পড়ে রইলুম। বুকের ঝড় থেমে বর্ষণ আরম্ভ হ'ল!

ও-বাড়ির চিঠি

কল্যাণীয়েষু,

হঠাৎ আমায় চলে যেতে হচ্ছে। যাবার আগে দেখা করে যেতে পারলুম না। এত রাত্রে আর তোমায় বিরক্ত করব না। আমার মেয়ের বিয়ের একটি ভালো সম্বন্ধ এসেছে; তাই এত তাড়াতাড়ি।

এইখানে গল্প থামল।

যতীন বল্লে—"তার পর ?"

নবীন বল্লে—"তার পর আর কি ? দেওঘর থেকে সেই রাত্রে সে-ও বাড়ি ফিরে এল।

যতীন বল্লে—"তার পর ?"

সতীশ বল্লে—"তার পর সে মনের দুঃখে কাল কাটাতে লাগল।"

যতীন বল্লে—"তার পর ?"

সতীশ ধমক দিয়ে বল্লে—"তার পর আর নেই।"

অখিল বল্লে—"নবীন, এটা কি তোমার ঠিক ফ্রি-লভের কাহিনী হ'ল হে ?"

সতীশ বল্লে—"হ'ল বৈ কি ? আমাদের দেশে ওর বেশী আর কি হ'বে।"

যতীন বল্লে—"হ্যাঁহে এটা কি সত্যিই সত্যি ?"

নবীন বল্লে—"হ্যাঁ !"

অখিল বল্লে—"তার প্রমাণ ?"

নবীন বল্লে—"তার প্রমাণ আমি স্বয়ং।"

যতীন বল্লে—"তাহলে এ গল্পের নায়ক তুমি ?"

সতীশ বল্লে—"তাই, নাকি ? ওরে নব্‌নে, তুই যে বেজায় লায়েক হ'য়ে উঠেছিস্ দেখছি। থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার লায়েক।"

লক্ষ্মীকান্তবাবু গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"ঐ নায়িকাটি কে হে ?"

সতীশ বল্লে—"ওটা জিজ্ঞাসা করাই অভদ্রতা হয়েছে, উত্তর দিলে আরও অভদ্রতা হবে।"

যতীন বল্লে—"কিন্তু নবীন, একটা বড় 'ধাঁধা' লাগছে। তুমি ঐ নায়িকার চিঠিপত্র-গুলো পেলে কেমন করে ? তার সঙ্গে তো তোমার আলাপ হয় নি।"

নবীন বল্লে—"আচ্ছা, অনুমান কর না।"

সবাই ভাবতে সুরু করলে। বিপিন ফস্-করে বলে উঠল—"আমি বলতে পারি।"

চারিদিক থেকে অমনি শব্দ উঠল—"কি ? কি ?"

বিপিন বল্লে—"ঐ যে নায়িকার সই—সরি না, কি ? তিনি নিশ্চয় নবীনবাবুর ভগিনী হবেন—হয় মামাতো, কি পিস্‌তুতো কি মাস্‌তুতো! তিনি সমস্ত ঘটনা কোনো-রকমে টের পেয়ে চিঠিগুলো নবীনবাবুকে পাঠিয়ে খুব-এক-চোট মজা করে নিয়েছেন। এরকম মজার ব্যাপার আমি গল্পে পড়েছি।"

সবাই বল্লে—"কি বল হে নবীন ?"

নবীন বল্লে—"হ্যাঁ, কতকটা ঠিক—"

বিপিন উৎসাহে বুক ফুলিয়ে বল্লে—"দেখলেন, আমি বলেছি !"

অখিল বল্লে—"সত্যি তিনি তোমার ভগিনী ?"

নবীন বল্লে—"তাকে ঠিক ভগিনী বলা যায় কি-না বলতে পারি না—সহচরী বলতে পার।"

সতীশ বল্লে—"এ আবার সহচরীটি কে এল হে? এতক্ষণ ত এর কথা ফাঁস করনি।"

যতীন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"সে কে হে?"

লক্ষ্মীকান্তবাবু বল্লেন—"কোনো ভদ্র-মহিলার প্রসঙ্গ প্রকাশ্য-সভার মধ্যে উত্থাপন করা আমি বিশেষ আপত্তিজনক মনে করি।"

সতীশ বল্লে—"ওহে নবীন, এখন থাক্। এর পর আমাদের সকলকার কানে-কানে—অবশ্য লক্ষ্মীকান্ত ছাড়া—চুপি চুপি বলে দিও।"

অখিল বল্লে—"দেখ নবীন, তোমার ঐ প্রেম-কাহিনীটি আমাদের সমাজের ভারি উপযোগী হয়েছে। এতে কারুর কিছু বলবার যো নেই।"

যতীন বল্লে—"ও যে সত্য ঘটনা কাজেই—"

লক্ষ্মীকান্ত বাধা দিয়ে বল্লেন—"শুধু উপযোগী বল্লে কম বলা হয়; ওটি আমাদের আইডিয়াল্ প্রেমের গল্প হয়েছে।"

যতীন বল্লে—"তাহ'লে আমাদের দেশের ফ্রি-লভের চেহারা কি অমনিধারাই হবে?—যা-কিছু সব মনে-মনে?"

সতীশ বল্লে—"কাজেই! প্রেমের সদর দরজা যখন বন্ধ তখন মনের অন্তঃপুরে বসে প্রেমের স্বপ্ন দেখেই আমাদের কাল কাটাতে হ'বে!"

অখিল বল্লে—"তবে উপায়?"

সতীশ বল্লে—"উপায়—এই বলে ডাক ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠা যে"—বলে সে তুড়ি দিয়ে সুর-করে গেয়ে উঠল—

"তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত,
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।

"এবং এইটেই বার বার করে বলা"—বলে অখিল ধরলে—

"তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি!
কোনো সুলগনে হ'ব না কি কাছাকাছি!"

হঠাৎ সতীশ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে উঠল—"ওহে রাত যে বারোটা!"

—"অ্যাঁ বারোটা!"—বলেই সব দুড়্-দাড়্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

লক্ষ্মীকান্ত গম্ভীরভাবে বল্লেন—"নবীন, তুমি যে এমন চমৎকার নির্দোষ প্রেমকাহিনী লিখ্‌তে পেরেছ তার জন্যে আমি তোমায় অভিনন্দন করচি!"

সতীশ একটু দাঁড়িয়ে, লক্ষ্মীকান্ত চলে গেলে পর নবীনের হাত ধরে বল্লে—"ভাই নবীন, আমার হৃদয়ের সমবেদনা জানাচ্চি।"

নবীন একলাটি খানিকক্ষণ চুপ-করে দাড়িয়ে রইল। তারপর খাতাখানি দেরাজে বন্ধ করে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

বেহারা এসে আলো নিভিয়ে অন্ধকার ঘর চাবিবন্ধ করে দিলে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

অকর্ম্ম

দণ্ড দুয়ের কাণ্ড শুধু—সংসারে এই সং সাজা,
পণ্ডিতে কয় মিথ্যা সবি; সন্ন্যাসী বা হোক্ রাজা—
চিত্ত সবার প্রার্থী সুখের—সুদ্ধ তারি আশ্বাসে
ঘূর্ণীবেগে ঘুরছে সবাই ভ্রান্ত মনের বিশ্বাসে!

ধর্ম্ম বল' কর্ম্ম বল'—ভণ্ডামি সব জুচ্চুরি,
চক্ষু মুদে' আস্‌বে যখন, খোঁজ থাকেনা কিচ্ছুরি;
স্পষ্ট চোখে দেখছে লোকে সঙ্গে কিছুই যাচ্ছেনা,
জন্ম ভরে' কর্ম্ম করে' ফল কোন তার পাচ্ছেনা।

দেখ্‌তে বড় শুন্‌তে বড় স্বার্থত্যাগের কল্পনা,
মন-ভুলান' ভেল্কী শুধু লোক-ঠকান' জল্পনা;
মৃত্যু এসে এক নিমেষে সমজে দেবে সত্য যা,
ধর্ম্ম তারে ধর্‌ত যদি—মর্‌ত কি সে? মর্‌ত না।

বল্‌ছ মুখে কর্ম্ম গীতা—কর্ম্মযোগের অন্ত নাই,
কর্ম্মভোগের সুখ কি শুনি—জন্ম ত যায় যন্ত্রণায়;
কর্ম্ম লাগি' জন্ম যদি, চট্ করে' তা টুট্‌ত না,
কর্ম্মফলে জন্ম হলে' ফুলটি তারো ফুট্‌ত না!

মিথ্যা সবি ফক্কিকারী, স্ফূর্ত্তি শুধু মিথ্যা নয়,
অর্থ তাহার বুঝতে পারি, ভোগটা যে তার মর্ত্ত্যে হয়!
হাস্য করি নৃত্য করি দিব্যি খাসা প্রাণ ভরে'—
খাদ্যে পানে পেটটি ভরে' জন্ম কাটাই গান করে'।

পুষ্প ঝরে গন্ধে বিভোর—চক্ষু ভুলায় বর্ণ তার,
কর্ণ জুড়ায় বাদ্যগীতে, স্ফূর্ত্তি যে তার কর্ণধার;
মদ্য মিটায় সদ্য তৃষা, মাংস স্বাদে মন হরে,
মুগ্ধ প্রিয়ার দ্রাক্ষা-অধর স্বর্গ ভুলায় মন্তরে।

ফুলটি ফুটে মৌন মধুর—বল্‌ত কি তার কর্ম্ম ভাই,
ঝরণা ছুটে মত্ত মুখর, ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম নাই!
চাঁদটি উঠে জ্যোৎস্না ফুটে, অর্থ কি তার—হাস্য সার!
গন্ধ লুটে মন্দ মলয়—আর কিছু না, লাস্য তার!

বিশ্ব যুড়ি' স্ফূর্ত্তি মেলা—কর্ম্ম সে ত যন্ত্রণা,
ক্ষিপ্ত যারা নিত্য শুনায় কর্ম্মপথের মন্ত্রণা।
দুঃখে দায়ে রাত্রে দিনে অশ্রুগলদঘর্ম্মসাজ,
বৃষ্টি ঝড়ে রৌদ্রে শীতে মূর্খে করুক কর্ম্ম কাজ।

ভবিষ্যতের দাস্য করে—দৃষ্টি তারি অদৃষ্টে,
অনিশ্চিতের পোষ্য যারা চিন্তা তারি অনিষ্টে!
চিত্ত সুখের নিত্য সেবক স্ফূর্ত্তি মোদের সব কাজে,
বর্ত্তমানের শিষ্য মোরা—আজকা মোদের আজকা যে!

ভাবনা বটে অর্থ চাহি—পাওনা কিছু শক্ত যা'র,
দূর কর ছাই—কর্ব্বে যোগাড় যেমনে পারুক ভক্ত তার;
চক্ষু বুজে বুদ্ধি করে' আনন্দে পয়েই শুদ্ধ তা—
শুদ্ধ আমোদ দেয় যে তাতে—সেও ত কিছু বুঝ না!

স্ফূর্ত্তি কর স্ফূর্ত্তি কর প্রত্যহ ও প্রত্যেকে,
আজকে আছি আজ ত বাঁচি—অন্য কথা ভাবছে কে?
মূর্খে থাকুক কর্ম্ম নিয়ে ধর্ম্মে দিয়ে মন বাঁধা,
সত্যে ছেড়ে মিথ্যা তেড়ে ধরতে যাবে কোন্ গাধা?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

প্রতিভার খামখেয়াল

যে সকল প্রতিভার অবতার সভ্যতার ইতিহাসের গোড়া থেকে পৃথিবীতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তাঁদের জীবনী আলোচনা করে দেখলে আশ্চর্য্য হোতে হয়। কারণ, তাঁদের প্রায় সকলেই একটু-না-একটু বাতিকগ্রস্ত, মানসিক অবসাদগ্রস্ত অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন!

আধুনিক যুগের লেলা মোরিও, লম্ব্রজো প্রমুখ কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত বলেন, প্রতিভার সঙ্গে উন্মাদ-রোগের খুব নিকট-সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মোরিও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন যে প্রতিভা জিনিষটা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের একটা রূপান্তর মাত্র; তারই কিছুদিন পরে লম্ব্রজো এই মতের সমর্থন করেন। লম্ব্রজো বলেন, বেশীর ভাগ প্রতিভাশালী লোকের বংশের ইতিহাস খোঁজ করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, সেখানে উন্মাদ-রোগ বর্ত্তমান। হেগেল ও রয়্যডেষ্টক প্রমুখ কয়েকজন জার্ম্মান পণ্ডিতও মোরিওর মতের সমর্থন করেন; অপর পক্ষে লক্, হেলভেসিয়াস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ঐ মতের পোষকতা করেন না।

চার্লস ল্যাম্ব এই সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখছেন, মানুষের ধারণাশক্তি শেকস্‌পীয়ারের মতন লোককে পাগল বলে কল্পনা করতে অক্ষম।

মোরিও যখন প্রতিভাকে উন্মাদ-রোগের অতি নিকট-আত্মীয় বলে প্রচার করলেন, তখন চারিদিকে মহা হুলুস্থুল বেধে গেল। বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ ফ্লাউরেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এই মতের বিরুদ্ধে এক পুস্তক প্রকাশিত করেন; তিনি বলেন, প্রতিভা এবং বাতুলতাকে এক কোঠায় পোরাও যা, পাপ আর পুণ্যকে এক পৈঠেতে স্থান দেওয়াও তা। পৃথিবীতে যদি আজ পাপ খুব উন্নতিলাভ করে ত পুণ্যের তাতে কিছুই লোকসান হবে না। আজ পর্য্যন্ত যেমন পাপ, পুণ্যের কিছুই করে উঠতে পারে-নি, তেমনিধারা বিজ্ঞানও প্রতিভার কিছুই করতে পারবে না; মোট কথা প্রতিভা চিরকালই পৃথিবীতে নিজের সম্মান বজায় রেখে আসছে ও রাখবে। ফ্লাউরেনের এই গা-জুরি যুক্তি তেমন সারবান বলে পণ্ডিতেরা গ্রহণ করতে পারেননি; ফ্লাউরেন ছাড়া ইংলণ্ডের গ্যালটন, মড্‌স্‌লি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মোরিওর মত খণ্ডন করবার যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। এঁরা বলেন, অনেক প্রতিভাবানের নানারকম খেয়াল ছিল বটে;— সক্রেটিস, প্যাস্‌ক্যাল প্রভৃতির খেয়ালের কথা কে না জানে? কিন্তু এই খেয়ালগুলোকে বাদ দিলে কি তাঁদের নাম জগতের ইতিহাস থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে? কখনই না।

কিন্তু সাধারণ লোকে,—যারা প্রতিভার মর্ম্ম বোঝে না, তারা যদি এঁদের সঙ্গে গারদের পাগলাগুলোর তুলনা করে দেখে, তাহলে বোধ হয় বিশেষ-কিছু প্রভেদ দেখতে পাবে না।

কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সাধারণ পাগল এবং এই শ্রেণীর পাগলদের খেয়ালগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, পরস্পরের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

এরিষ্টটল্ বলেছেন যে, তিনি এমন অনেক লোককে দেখেছেন যাদের মস্তিষ্কের রোগ হওয়ার পর প্রতিভা স্ফুরিত হয়েছে। এমন কি সক্রেটিস্, এমপিডক্লস্, প্লেটো প্রভৃতি লোকের মধ্যে এবং বিশেষ করে কবিদের ভিতরই এই রোগ দেখা যায়। ইউরোপের প্রায় অধিকাংশ প্রতিভাবান ব্যক্তিই জীবনের অন্তত কয়েকটা বছরও এই রোগে ভুগেছেন।

আধুনিক যুগের ফ্যারিনি, ব্রাউহ্যাম্, সাদে, গোভেন, মাংগে, ফারসি, কাউপার, রোচিয়া, রিকি, ব্যাটজুয়েকভ্, মুলার, উইলিয়ম কালন্স, ফন ডার ওয়েষ্ট, হ্যামিলটন্, পো ও উহল্‌রিচ—এঁরা কেউই ঐ রোগ থেকে অব্যাহতি পান-নি।

মারটিনি বলেন, ফরাসীদেশের অনেক ভাল ভাল কবি যৌবনবয়সেই এই রোগে মারা গিয়েছেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে গুনডারওড এবং ষ্টিগ লিট্‌জ্ এঁরা দুজনেই আত্মঘাতী হয়েছিলেন, ব্র্যাকমান এবং এস, ই, ল্যান্‌ডন্ এঁরা দুজনেও উন্মাদ-রোগে মারা যান।

মনটেনাসের ধারণা হয়েছিল, তাঁর দেহটা একটা ছোলায় পরিণত হয়েছে এবং পাছে পাখীরা ছোলা মনে করে তাঁকে খেয়ে ফেলে অথবা কোন্‌দিন বা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় এই ভয়ে তিনি ঘরের বাইরে বার হতেন না। হ্যারিংটনের যখন মাথা খারাপ হয়ে গেল তখন তাঁর মনে হোত, রাজ্যের যত ব্যারাম মশা আর মাছির রূপ ধরে তাঁকে কামড়াতে আসছে! এই সব কাল্পনিক মশা আর মাছির ভয়ে তিনি সবসময়ে দরজা বন্ধ করে হাতে ঝাঁটা নিয়ে বসে থাকতেন। বিখ্যাত রসায়নবিদ্ আমপেয়ার রসায়নতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলেন; তাঁকে যখন কারণ জিজ্ঞাসা করা হল তিনি বল্লেন, সেটা তাঁর নিজের লেখা নয়, তাঁর ঘাড়ে একটা ভুত চেপেছিল সেই সেটা লিখেছে।

চিত্রকর কালো ডল্‌সির হঠাৎ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ এত বেড়ে উঠল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন ম্যাডোনার চিত্র ছাড়া আর অন্য ছবি আঁকবেন না, যদিও সে সব ম্যাডোনা-মূর্ত্তি বল্‌ডুইনির মূর্ত্তির নকল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর বিবাহের রাত্রে নিমন্ত্রিত সকলেই এসে পৌছল, কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না! শেষটা অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল একটা গির্জ্জার বেদীর উপর তিনি নিশ্চিন্তমনে শুয়ে পড়ে রয়েছেন। ন্যাথ্যানিয়েল লি একবার খুব শক্ত ব্যারামে পড়ে অনেক-দিন ধরে ভুগেছিলেন, রোগের যন্ত্রণা উপশম করবার তাঁর একমাত্র ঔষধ ছিল, গল্প লেখা। যতক্ষণ যন্ত্রণা থাকত ততক্ষণ তিনি লিখতেন। এই রোগ-শয্যায় পড়ে পড়ে তিনি তেরটি বিয়োগান্ত উপন্যাস শেষ করেছিলেন।

টমাস লয়েড কবিতা লিখে সেগুলোকে ভাঙা কাঁচ চাপা দিয়ে রেখে দিতেন। তিনি বলতেন, যে তাঁর লেখার ভিতর কোথাও খারাপ কিম্বা ভুল থাকলে ঐ কাঁচে সেগুলো ঠিকমত পালিশ হয়ে থাকবে। তিনি

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাবারের সঙ্গে কয়লা, কাগজ, তামাক ইত্যাদি যা পেতেন তাই খেয়ে ফেলতেন আর বলতেন, এতে শরীর খুব ভাল থাকে।

চার্লস ল্যাম্ব ছেলেবেলায় একবার পাগল হয়ে গিয়েছিলেন; এই রোগ তাঁর বংশের অনেকরই মধ্যে দেখা গিয়েছিল। কোলরিজকে সেই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করে তিনি একখানা চিঠি লিখেছিলেন;—"অবিমিশ্র আনন্দ জীবনের মধ্যে শুধু সেই সময়টা উপভোগ করেছি, সেই দিনগুলো ফিরে পাবার জন্যে আমার প্রাণটা ছটফট করে, তুমি বুঝতে পারবে না যে সে কি আনন্দ!"

রবার্ট স্যুমান্ যৌবনে যখন আইন পড়তেন তখন তিনি একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েন। এই মেয়েটি খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারতেন, রবার্ট প্রায়ই এঁর বাজনা শুনতেন। কিছুদিন পরেই তাঁর মাথার রোগ দেখা দিল; তাঁর মনে হোত মেণ্ডেলসন্, বিথোভেন প্রভৃতি ভাল ভাল গাইয়ে-বাজিয়েরা কবর থেকে উঠে এসে তাঁকে গান-বাজনা শোনাচ্ছে। একসময় পাগলামির ঝোঁকে তিনি রাইন নদীতে লাফিয়ে পড়েছিলেন; তারই কিছুদিন বাদে একটা পাগ্‌লা-গারদেই তিনি মারা যান।

জেরার্ড ডি নাভালেয়র পাগলামিতে বেশ মজা দেখা যেত; বছরের মধ্যে ছ-মাস তাঁর এত স্ফূর্ত্তি চাপত যে, তিনি যেখানে যেতেন সে জায়গাটা তাঁর হাসির গর্‌রায় ভরে উঠত, আর ছ-মাস তাঁর মনে এত অবসাদ আসত যে, তাঁকে দেখলে লোকের দুঃখ হোত। একবার গারদে তাঁর এক বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন জেরার্ড তাঁকে বলেছিলেন—"এখানকার সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট মনে করে যে সে একটা পাগ্‌লা-গারদের তত্ত্বাবধান করছে; কি করি, সেইজন্যে আমরা সবাই পাগ্‌লা সেজে বেচারাকে একটু খুসি রাখতে চেষ্টা করি।" একদিন ছাদের উপর বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হ'ল কে বুঝি আকাশ থেকে তাঁকে ডাকচে। সেই ডাক শুনে তিনি উপরে ওড়বার জন্য ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রায় মারা যাবার যোগাড় হয়েছিলেন। এরই কিছুদিন পরে তিনি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

বদ্‌লেয়ারের জীবনী পড়লে দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনিও এই রোগ থেকে অব্যাহতি পাননি। এঁদের সকলের রোগ একরকম না-হলেও মস্তিষ্কের রোগ যে ছিল এ-কথা জোর করে বলা যেতে পারে। বদ্‌লেয়ারের পরিবারে অনেকেই এই রোগে ভুগেছেন। তাঁর যখন এই রোগ প্রথম দেখা দিল তখন তিনি নিজের বাড়ীর সাম্‌নের দোকান-গুলোর বড় বড় কাঁচের দরজা-জান্‌লার উপর ইঁট ছুড়তেন, কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "কাঁচ ভাঙবার শব্দ শুনতে ভারি ভাল লাগে।" বদ্‌লেয়ার মাসে অন্ততঃ একবার করে বাসা বদলাতেন। বাড়ীর লোকেরা তাঁর এইরকম মতিগতি দেখে তাঁকে কাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকবার জন্য ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হয়ে একজন নিগ্রো রমণীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশে ফিরে এলেন। একটা নতুন-কিছু করবার

ঝোঁকে তিনি এমন-সব কাণ্ড করতেন যে, সকলে আশ্চর্য্য হয়ে যেত। তিনি শীতকালে গরমের, আর গরমের সময় শীতের পোষাক পরতেন। মাথার চুলে সবুজ কলপ লাগাতেন। তাঁর আরও এমন-সব কুৎসিত খেয়াল ছিল যে শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। তিনি সমস্ত দিন ধরে, কখন্ কি করতে হবে, কখন্ কোন্ কোন্ বিষয় লিখতে হবে তারই তালিকা তৈরি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন,—আসল কাজের দিকে ঘেঁসতেনও না।

অনেকে বলেন, অঙ্কশাস্ত্রে যাঁরা প্রতিভা দেখিয়েছেন কিংবা এদিকে যাঁদের বিশেষ প্রতিভা আছে তাঁদের এ রোগের বালাই থাকে না। কিন্তু এ-কথা একেবারে ঠিক নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ নিউটন এন্‌ফ্যান্‌টিন, আরকিমেডিস্, প্যাস্ক্যাল্, কোড্যাজ্জি এঁদের সকলেরই একটু-না-একটু ছিট্ ছিল। বোলারির (জ্যামিতিবিদ্) শেষ-জীবনে পাগলামির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তিনি প্রায় ছ'মাস অন্তর বন্ধুদের কাছে নিজের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাতেন! কারডানের জীবনীতে দেখতে পাওয়া যায়, তিনি সারাজীবন ধরে ঐ রোগের যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। এই কারডান বনিয়াদী পাগল ছিলেন। তাঁর বাপ থেকে তিন পুরুষ ধরে তাঁরা পাগলামীর চাষ করে গিয়েছেন। তিনি কখনও কোন জায়গায় স্থির হয়ে কাটাতে পারতেন না, সর্ব্বদা একদেশ থেকে অন্যদেশে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াতেন; তাঁর মনে হোত তিনি যেখানে যান সেখান-কারই গবর্ণমেণ্ট তাঁকে ধরবার ফিকিরে ষড়যন্ত্র করে। প্যাভিয়া-বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবার জন্য যখন নিমন্ত্রণ করে পাঠানো হল, তখন সেখানে গিয়ে তাঁর কেমন খেয়াল হল যে, সেখান্‌কার অধ্যাপকরা তাঁকে বিষ খাওয়াবার মতলোবেই এই নিমন্ত্রণের ছুতো করেছেন। যেম্‌নি এই কথা মনে হওয়া অমনি সেখান থেকে তাঁর পলায়ন! এই রোগে ভুগে-ভুগে শেষটা তাঁর চেতনা-শক্তি এত বিগড়ে গিয়েছিল যে কোনো রকম একটা শারীরিক যন্ত্রণার উত্তেজনা না-পেলে তিনি সুস্থ বোধ করতে পারতেন না; তাই সব-সময়েই তিনি শরীরকে যন্ত্রণা দিয়ে মানসিক কষ্টের উপশম করতেন। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় সাধারণ পাগলরা হাত-পা কাম্‌ড়ে কিম্বা দেয়ালে মাথা ঠুকে নিজেদের যন্ত্রণা দেয়; এথেকে বুঝতে পারা যায়, আর-একটা কোনো কষ্ট ভুলে থাকবার জন্যই তারা এই কাণ্ড করে। বাইরন বলতেন, পালাজ্বর তাঁর বেশ ভাল লাগে, কারণ জ্বর ছাড়বার সময় যে আবেশময় অনুভূতি সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হোতে থাকে, সেটা বড় আনন্দদায়ক।

রুশো, হ্যালরের মতন কারডানও তাঁর কষ্টময় জীবনের শেষদিনগুলো আত্মচরিত লিখে কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

রুশো, শোপেনহয়র, ভল্‌টেয়ার, সুইফ্‌ট্, ট্যাসো, ফোডেরো প্রভৃতি প্রতিভাবানদের জীবন যে কি-রকম রোগ-যন্ত্রণায় কেটেছে —তা তাঁদের জীবনচরিত পড়লে বোঝা যায়।

অনেকের জীবনে, পুরোদস্তুর পাগলামী দেখা না-গেলেও সেটা যে আংশিক ভাবে

বর্ত্তমান ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হয়েছে সকল প্রতিভাবানই যে একরকম রোগে ভুগেছেন তা নয়, চিকিৎসকেরা তাঁদের রোগগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে এক-এক শ্রেণীতে এক-একজনকে ফেলে তাঁদের জীবনী বিশ্লেষণ করেছেন।

যে সকল প্রতিভাশালী লোক পাগ্‌লামীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাঁদের অনেককেই আবার অন্যরকম স্নায়বিক রোগে ভুগতে হয়েছে। লেনো এবং মনটেকি যখন লিখতেন, তখন তাঁদের পা ভয়ানক কাঁপতে থাকত। বাফোঁ, জন্‌সন্, স্যান্টিনেল, ক্রেবিলন, লোম্বার-ডিনি প্রভৃতির মুখ এতটা বেঁকে গিয়েছিল যে, তাঁদের দেখলে মনে হোত যেন তাঁরা কাউকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছেন। জন্‌সন্ সম্বন্ধে আর-একটা মজার কথা শুনতে পাওয়া যায়। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় তিনি নাকি প্রত্যেক ল্যাম্প-পোষ্ট ছুঁয়ে যেতেন। যদি এক-আধটা মাঝে বাদ পড়ে যেত তখনি আবার ফিরে এসে সেগুলোতে হাত ঠেকিয়ে তবেই ফের চলা সুরু করতেন। টমাস ক্যাম্বেলের ঠোঁট সর্ব্বদা কাঁপত। চ্যাটার-ব্রাণ্ড অনেকদিন ধরে হাত-কাঁপুনি-রোগে ভুগেছিলেন। জুলিয়স সিজার, ডষ্টয়এভিস্কি, প্রেতার্ক, মলেয়ার, ফ্লবেয়ার, পঞ্চম-চার্লস, সেণ্ট-পল ও হ্যাণ্ডেল এঁদের সকলকেই মৃগী-রোগে ভুগতে হয়েছে। গেটে ও ফ্লবেয়ার প্রভৃতি কয়েকজনকে মানসিক-অবসাদ রোগে অত্যন্ত কষ্ট পেতে হয়েছে। গেটে এক জায়গায় লিখেছেন—"আমার মনের ভিতর আনন্দ ও দুঃখের ধারা একসঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে। আমি অত্যন্ত আনন্দ থেকে হঠাৎ নিরতিশয় দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হই।" ফ্লবেয়ার একস্থলে উল্লেখ করেছেন, "আমার জীবন আনন্দ-উপভোগের জন্য সৃষ্ট হয়-নি।" এই মানসিক-অবসাদ-রোগে ভুগে-ভুগে কত প্রতিভাশালী লোক যে আত্মহত্যা করেছেন তার একটা ছোট-খাট রকমের তালিকা দেওয়া গেল। জেনো, এরিষ্টটল্ (?), সিপ্পাস, হেগে, সিপ্পাগ, ক্লিনথেস, ষ্টিলপো, ডাওনিসাস (of Heraclea.) লুক্রোটিস্, ল্যুমান, চ্যাটারটন, ক্লাইভ, ক্রিচ, ব্রাউনট, হেডান, ডোমেনিচিনো, স্প্যাগ্‌নোলেটো এবং ন্যুরিট। এ-ছাড়া আরো কতজন যে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছেন তার আর সংখ্যা নেই।

প্রতিভাদের মধ্যে আর-একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁদের ভিতর অনেকেই অত্যন্ত নেশাপ্রিয় ছিলেন (বিশেষ করে মদ্য পান), এবং অনেকেরই নীতিজ্ঞান এত কম ছিল যে, শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

আলেকজান্দার টেবিলে বসে একপাত্র দুপাত্র করে হারকিউলিসের নাম নিয়ে মদ খেতে খেতে—দশপাত্র পান করেই পঞ্চত্ব পেয়েছিলেন। সিজারকে প্রায়ই তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা মাতাল-অবস্থায় বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যেত। সক্রেটিস, সেনেকা, এলসিবিয়াডস্, কেটো, পিটার দি গ্রেট (তাঁর স্ত্রী ক্যাথারিন, এবং মেয়ে এলিজাবেথ), এঁরা সকলেই মদ্যপ ছিলেন। কনষ্টেবল ডি বুরবোঁ এবং এভিসেনা এঁরা দুজন জীবনের শেষার্দ্ধভাগ মদ খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলতেন, 'প্রথম-জীবনে লেখাপড়া করে যে

পাপ করা গেছে শেষ-জীবনে মদ খেয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করা যাচ্ছে।'

মারগার, জেরার্ড ডি নারভাল, এলফ্রেড ডি মুসে, ক্লিষ্ট, পো, হফ্‌ম্যান, এডিসন, ষ্টিল, ক্যারু, সেরিডান, বার্‌ন্‌স্‌, চার্লস ল্যাম্ব, জেমস টমাস, মেলাথ, হারটলি কোলরিজ—এঁদের সকলেরই মদের প্রতি বিশেষ টান দেখা যেত। ট্যাসোর একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছেন—"অস্বীকার করছি না যে আমি পাগল,—কিন্তু অত্যধিক নেশা ও প্রেমই আমায় পাগল করেছে।"

কোলরিজ এই মদ ও আফিংএর নেশার জন্য জীবনে অনেক কাজ করতে পারেন নি। আবার তাঁর ছেলে হারটলি কোলরিজ ছেলেবেলা থেকেই এত-বেশী মদ খাওয়া সুরু করেছিলেন যে, সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়। লোকে তাঁর সম্বন্ধে বলত, "He wrote like an angel and drank like a fish." স্যাভেজ শেষ-জীবনটা একরকম মদ খেয়েই বেঁচেছিলেন, বলতে হয়। শেষকালে তিনি ব্রিষ্টলের জেলের ভিতরে মারা যান। ম্যাডাম ডি ষ্টিল এবং ডি কুইনসির আফিং খাওয়ার কথা ত সর্ব্বজন-বিদিত। সঙ্গীতে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে ডুসেক্‌, হ্যাণ্ডেল, গ্লুক প্রভৃতি অত্যন্ত মদ্য-প্রিয় ছিলেন;—অর্থ, মদ এবং যশ এই তিনটি ছিল তাঁদের বিশেষ উপাস্য। তাঁরা বলতেন, প্রথমটি হাতে এলেই দ্বিতীয় পদার্থটি কেনবার সুবিধে হবে এবং সুরার অনুপ্রেরণায় তাঁরা যে সৃষ্টি করবেন তা থেকে যশোলাভ করা যেতে পারবে। এঁদের মধ্যে গ্লুক মদ খেতে-খেতেই ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

জর্জ্জ স্যাণ্ড শেষ-জীবনে লিখেছিলেন, "যেখানে তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব সেখানে সততা বোকামির নামান্তর মাত্র। যেখানে শক্তি নেই সেখানে সততা একটা ভাণ। যেখানে বুদ্ধিও আছে শক্তিও আছে সেখানে সততা প্রায়ই টিঁকতে পারেনা। কারণ সেখানে অভিজ্ঞতা এবং বহুদর্শিতা থেকে সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা জন্মলাভ করে। যাঁরা খুব মহৎ অভিপ্রায়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁরা প্রায়ই ভারি কঠোর এবং উগ্র।"

আর-এক স্থানে তিনি বলছেন—"বড়লোকের নামে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। যতদিন বেঁচে থাকে তারা ভারি বদমায়েস অত্যাচারী খামখেয়ালী ইত্যাদি।"

থেমিসটোক্‌লসের জীবনী লিখতে লিখতে ভেলেরিয়া ম্যাক্সিমাস বলেছেন, "তাঁর যৌবনের ইতিহাস আলোচনা করে যখন দেখতে পাই, একদিকে তাঁর পিতা তাঁর নীচ ব্যবহারের জন্য তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন, অপর দিকে তাঁর মা এরূপ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন বলে আত্মহত্যা করলেন, তখন আর বেশী দূর অগ্রসর হোতে ইচ্ছা হয় না।"

সেলাষ্ট ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধ লিখতেন বটে কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবনটা লাম্পট্যের ইতিহাসে পরিপূর্ণ। পুস্‌কিন একদিন প্রকাশ্য থিয়েটারের ভিতর গবর্ণর-জেনারেলের স্ত্রী কাউণ্টেসের ঘাড় সুন্দর দেখে লোভ সামলাতে না-পেরে কামড়ে দিয়েছিলেন! স্পিয়াসিপ্পাস (প্লেটোর শিষ্য) ব্যভিচারে যখন উন্মত্ত সেই সময়েই হত হয়েছিলেন। ডেমোক্রিটাস নিজের চোখ নষ্ট করে

ফেলেছিলেন; তিনি বলতেন স্ত্রীলোক দেখলেই আমার মন ভারি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

থিয়োগনিস জন-সাধারণকে অনেক নীতি উপদেশ দিয়ে শেষে মরবার সময় তাঁর পরিবারবর্গকে বঞ্চিত করে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি এক বেশ্যাকে দান করে গিয়েছিলেন।

নারীপ্রতিভার মধ্যে স্যাফো, ফিলেনা, এলিফ্যানটিনা, লিওনসন্ (দার্শনিক ও সন্ন্যাসিনী), ডিমোফিলা প্রভৃতির নাম চরিত্র-হীনতার জন্য দেশ-বিদেশে রটে গিয়েছিল। সেলাষ্ট, সেনেকা ও বেকনকে, তহবিল-ভাঙার অপরাধে পাকড়াও করা হয়েছিল। ক্রেমানি জাল করতেন, ডেমি বিষ খাইয়ে লোককে পরলোকে পাঠাতেন, এভিসেনা শেষ-বয়সে এত-বেশী ইন্দ্রিয়সেবী হয়েছিলেন আর আফিংএর মাত্রা এত বেশী চড়িয়েছিলেন যে লোকে বলত, "তাঁর চরিত্র শোধরাতে শাস্ত্র যেমন হার মেনেছে তাঁর শরীরকে সুস্থ রাখতে ওষুধও তেমনি নিস্ফল হয়েছে।" এই রকমে বনফ্যাডি, রুসো, এরিটিনো, কারসা, ক্রনেটো ল্যাটিনি, ফ্র্যাঙ্কো, ফস্‌কোলো, বাইরণ প্রভৃতি মনস্বীরা নিজেদের প্রতিভাবলে যেমন অক্ষয় যশ ও কীর্ত্তি রেখে গেছেন, অন্যদিকে হীন-চরিত্রের জন্য আপনাদের জীবনে কলঙ্কের দাগ চির-কালের জন্য লেগে দিয়ে গেছেন। সৎ আর অসতের এ-রকম অপূর্ব্ব সমাবেশ সাধারণ-চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায় না।

অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির খুব কম-বয়সেই প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাওয়া গিয়েছে; আবার অনেকে ছেলেবেলায় অত্যন্ত বোকা ছিলেন, বয়স হবার পরে হঠাৎ একসময় তাঁদের প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। থেয়ারস, পেষ্টালোজি, ওয়েলিংটন, ডুগেসক্লিন্, গোল্ডস্মিথ, বারনস্, ব্যালজ্যাক, ক্রেসনেল, ডুমা (বড়), হুমবোল্ট, সেরিডান্, বোকাসিও, পিয়ার টমাস্, লিনাস, ভলটা, এলফেরি,—এঁরা ছেলেবেলায় বিশেষ বুদ্ধিমান ছিলেন না; নিউটনও অঙ্ক ছাড়া স্কুলের অন্য পড়া করতে পারতেন না। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ ক্ল্যাপস্য়ার্থ যখন বার্লিনে পড়াশুনা করতেন তখন তাঁকে শিক্ষকেরা অত্যন্ত বোকা বলেই জানতেন। পরীক্ষার সময় কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারতেন না বলে একদিন তাঁর শিক্ষক ঠাট্টা করে বলেছিলেন, —"তুমি কোন বিষয়েরই কিছু জান না দেখছি।" শিক্ষকের কথা শুনে ক্ল্যাপসয়ার্থ বলেছিলেন—"মাপ করবেন মশায়, আমি চীনে ভাষা জানি এবং বার্লিনে বোধ হয় এমন কোন অধ্যাপক নেই যিনি আমার চেয়ে চীনে ভাষা ভাল জানেন।"

প্রতিভাবানদের মধ্যে আর-একটা জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়েছে। একদিকে তাঁদের শারীরিক অনুভব-শক্তি যেমন কমে যায় অন্য-দিকে তেমনি মানসিক অনুভব-শক্তি এতটা বেড়ে যায় এবং সামান্য সামান্য ঘটনাকে তাঁরা এত বড় ও বেশী করে দেখেন যে, তাই থেকেই মানসিক-অবসাদ প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ফস্কোলোর এক বন্ধু তাঁকে একবার কি-একটা ঠাট্টা করেছিলেন; বন্ধুর বিদ্রূপ শুনে তিনি বল্লেন, "তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও?"—এই বলে দেয়ালে এত জোরে তিনি মাথা ঠুকতে আরম্ভ করলেন যে কেউ ধরে না-ফেললে তাতে তাঁর মৃত্যু

হতে পারত। বিখ্যাত চিত্রকর ফ্রাসিয়', র‍্যাফেলের আঁকা একখানা ছবি দেখে আনন্দের আতিশয্যে মারা গিয়েছিলেন। সোপেনহয়রের নাম কেউ যদি ছুটো P দিয়ে বানান লিখত তাহলে সে তাঁকে অপমান করেছে বলে তিনি তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দিতেন। বার্থেজের কোন এক পুস্তকে একটা বানান ভুল হয়েছিল বলে তারপর থেকে তিনি রাত্রিতে আর ঘুমোতে পারতেন না। ম্যালহারবের মৃত্যুর সময় যখন পাদ্রী এসে তাঁকে ধর্ম্ম উপদেশ দিচ্ছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'লোকটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও, ওর বলবার ভঙ্গী বড় খারাপ'!

প্রতিভাশালী লোকদের জীবন, ধর্ম্ম অধর্ম্ম সৎ অসৎ ও নানারকম ভাবের সংমিশ্রণে এত বৈচিত্র্যময় যে সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে থাকতে হয়; এতগুলি বিচিত্র লক্ষণ ছাড়াও প্রতিভাবানদের জীবন আরো অনেক চমকপ্রদ ইতিহাসে পরিপূর্ণ; ভবিষ্যতে সেগুলি আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

স্বপ্ন-সুন্দরী

(গান)

ঘুম দিয়ে!—
নিঝুম্ দিয়ে!—
ওকি আওয়াজ-হারা হাওয়ায় এল গো
চাঁদ-চারণের ভূম দিয়ে!
ঢুলঢুলে ওই চোখের চাহনি
ভুলিয়ে নিল ঝিল্লিরই ধ্বনি!
ওকি জোনাক্-জ্বালা তারার আলো গো
(সব) শীতলে দিল চুম্ দিয়ে
ওকি জ্যোৎস্নাটুকু ফুরিয়ে এল অস্ত-লগনে
ফুলের বাসে ঝামর আঁচল ঢুলিয়ে গগনে
মূর্চ্ছা ও কি রূপ ধরেছে রে!
হরেছে মোর মন হরেছে যে!
ভরেছে যে হর্ষে আকাশ গো
তারারি কুঙ্কুম দিয়ে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কৃষি ও কৃষক

(ক্রপটকিন হইতে)

'অর্থশাস্ত্রের প্রতি অনেকের অবিশ্বাসের একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, তার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত প্রায়ই ভ্রান্ত মত-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থ-তাত্ত্বিকেরা বলেন, মানুষের কার্য্য-শক্তি ও ফসল-বৃদ্ধির একমাত্র প্ররোচনা নিজ-নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনের মধ্যেই নিহিত।

এই অপবাদ ও অবিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। কিন্তু যে-যুগে দেশের কৃষি-শিল্প-সম্পদে মানুষ উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়েছে সে সময়ে সর্ব্বসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই সকলের লক্ষ্য ছিল, আত্ম স্বার্থসাধনের ক্ষুদ্রতা তাদের মনকে মলিন করতে পারেনি। এ-কথা খুব জোর করেই বলা চলে যে বিশ্বের বিখ্যাত উদ্ভাবক ও আবিষ্কর্ত্তারা মানব-সাধারণের উন্নতি ও মুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করেছেন এবং আত্ম-কৃত কার্য্যের উন্নতির অনুপাতে নিজের নিজের শ্রম সার্থক জ্ঞান করেছেন। আমরাও বিশ্বাস করি যে, কল-কারখানার উদ্ভাবক মনীষিরা যদি বুঝতেন, তাঁদের উদ্ভাবনার ফলে মানব-সাধারণের জীবন-সংশয় হবে তবে কোন্-কালে সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট করে' ফেলতেন। কেবল মান ও অর্থের খাতিরে নয়, বিশ্বের উন্নতির দিকেই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

ধনবিজ্ঞানের আর একটি তত্ত্ব এই রকম ভ্রান্ত। অর্থশাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই নিতান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেন যে, যদি কোনো দেশে বছরের পর বছর ফসলের প্রাচুর্য্য ঘটে এবং তাতে যদি দেশের লোকের সকল অভাব মেটে, তবে দেশের লোক পারিশ্রমিকের লোভেও আর দেহ বিক্রয় করবে না এবং তার ফলে কল-কারখানা, খনির কাজ, কর্ম্মীজনের অভাবে অচল হয়ে উঠবে। ধন-বিজ্ঞানের নানা সিদ্ধান্ত এই মত-বাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; এগুলি অর্থ-তাত্ত্বিকের পণ্ড-পাণ্ডিত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমরা এই ভ্রান্ত-তত্ত্বের নিরসন পূর্ব্বেই করেছি।

মানুষের অভাব ও সেই অভাব মেটাবার উপায় আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কি শিল্প আর কি কৃষিকার্য্যে সাধারণের অভাব মোচনের নানা সম্ভাবনাই আছে; কিন্তু সেই সঙ্গে এদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কৃষি-শিল্প-সঞ্জাত সমস্ত ফসলে প্রকৃত অভাব দূরীকরণের বন্দোবস্ত হয়। নিজের অভাব মিটলে, ক্ষুদ্র স্বার্থ-সাধনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেলে মানুষ বাঁচার আনন্দে সকল কাজেই যেচে হাত লাগাবে; তখন তাকে আর পারিশ্রমিকের লোভও দেখাতে হবে না, কোনো-রকম শাসন-তন্ত্রের শক্তি-সাহায্যে বাধ্য করবার প্রয়োজনও হবে না।

যন্ত্র-শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ করাই চলে না,—কলে কারখানায় খনিতে আজ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে তাতে পরিশ্রমের হ্রাস ও উৎপাদনী-শক্তির বৃদ্ধি এই দুয়েরই

যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং এই সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টার উপর মানব-সাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করছে।

কৃষি-সম্বন্ধেও একথা বিশেষভাবে প্রযুজ্য। কারখানার কর্ম্মীর মত কৃষকও তার জমির উৎপাদনী-শক্তি অনেক পরিমাণে বাড়াতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পরিশ্রমও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেতে পারে। আমাদের কাম্য সামাজিক পরিবর্ত্তন সার্থক হলে বর্ত্তমানের মহাজনী বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই লোপ পাবে। তখন কৃষক তার নবলব্ধ শক্তি সম্পূর্ণভাবে দেশের ও দশের কাজে লাগাবার সুবিধা পাবে এবং দেশের প্রকৃত অভাব মোচনের সুচারু বন্দোবস্তের কোনো ত্রুটি হবে না।

কৃষির কথা মনে হলেই কৃষকের একটা ছবি আমাদের মানস-নেত্রে ফুটে ওঠে।—লাঙলের উপর ঝুঁকে পোড়ে, কর্ম্মক্লান্ত শীর্ণদেহ কৃষক জমিতে এলোমেলো ভাবে বীজ ছড়াচ্ছে; ফসলের ভালো মন্দের জন্য সময়ের উপর বরাত দিয়ে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কায় কাতর হচ্ছে; কিংবা একটা পরিবারের সকল-লোক সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে কঠিন শয্যা, যৎসামান্য খাদ্য, জঘন্য পানীয় ও ছিন্নবসনে তুষ্ট থাকতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের শিল্পে-সাহিত্যে কর্ম্মীজনের এই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী ছবিটা নানা আকারে অঙ্কিত হয়েছে। এবং এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানব-সন্তানের দুঃখলাঘবের জন্যে সমাজ বড়-জোর তার দেয় কর বা খাজনা কমাবার বন্দোবস্ত করে। সমাজের স্তম্ভ যাঁরা, তাঁরা কোনোদিন ভাবতেও সাহস করেন না যে কৃষক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তারও অবকাশ ও আনন্দ মিলতে পারে এবং কৃষির হাজার রকমের উন্নতি সম্ভব! এ বিষয়ে চিন্তায় ও কাজে যে উন্নতি হয়েছে তা কৃষি-কার্য্যের বিস্তৃতি মাত্র। আমেরিকায় বিস্তৃত-কৃষির উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখা ছাড়া সোসিয়ালিষ্ট দল আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন-নি।

কিন্তু কৃষিবিদের ধারণাশক্তি ক্রমশ যথেষ্ট প্রসার ও গভীরতা লাভ করেছে। আবহাওয়া, ঋতু-পরিবর্ত্তন এবং জল ও বায়ুর সকল রকমের বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে মাটিকে নিজের কাজের উপযোগী করে গড়ে নেবার জন্যে তিনি প্রাণপণ করেছেন; আনন্দে ও স্বেচ্ছায় যে সময়টুকু কাজ করা চলে সেই সময় এবং অল্প জায়গার মধ্যে সকলের উপযোগী ফসল জন্মানো তাঁর প্রধানতম লক্ষ্য। আধুনিক কৃষির গতি এই দিকেই। কৃষিতত্ত্বের থিওরী নিয়ে বিজ্ঞানবিদেরা যখন যন্ত্রাগারের বদ্ধতার মধ্যে ভুলের পর ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন, তখন কর্ম্মী-জন নিজ নিজ স্বাধীন চেষ্টায় এর অন্তর্নিহিত রহস্যোদ্‌ঘাটনের পথ বার করেছেন। তাঁরা এ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হয়েছেন, যা ভাবতেও মানুষ দ্বিধা বোধ করে! এঁরা যে সবাই উচ্চশিক্ষিত তা নয়; বরং এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক শবজী-বাগানের মালী, আর আবাদী চাষা! ছোট জায়গার মধ্যে কেমন করে শুধু একটা পরিবারের নয়—তার চেয়েও ঢের বেশী লোকের অশন-বসন, এমন-কি বিলাসিতার উপকরণ পর্য্যন্তও যোগানো যায় তার রহস্যটা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

এখানে সমস্ত খুঁটিনাটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু কয়েকটা সাধারণ মন্তব্য প্রচার করতে চাই, যাতে সবাই বেশ বুঝতে পারেন যে, এটা কবি বা অলস লোকের স্বপ্ন নয়,—কর্ম্মীজনের যত্নে ও চেষ্টায় বস্তুত এটি সম্পূর্ণ সম্ভব। অধিকন্তু, এই কথাগুলি বিশেষরূপ উপলব্ধি করতে পারলে সামাজিক পরিবর্ত্তনের পক্ষে অনেকটা জোর পাওয়া যাবে।

নানা দেশে রাজকর বা জমিদারী খাজনার নানারকম তারতম্য থাকলেও এটা নিঃসন্দেহ সত্য যে, শাসনতন্ত্র ও জমিদারশ্রেণী কৃষকের সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন। মহাজন দাদন দিয়ে কৃষকের মূলধনের অভাব পূরণ করে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে তার একলার নয়—উত্তরাধিকারীদের জন্যেও যে ঋণের ফাঁস রচনা করে, তা-থেকে আমরণ কারও মুক্তি নেই। মাঝারি দল বা আমলা-দালালের অত্যাচার ত তার জীবনে নিত্য ঘটনা! তারপর, নানারকমে খরচের ভার এড়িয়ে বাকি যা-কিছু থাকে তাতে কোনো রকমে যমের ও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়াই করা চলে। কৃষক যদি কোনোরকমে তার ফসল-বৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করে এবং যত্ন ও পরিশ্রমে সফলকাম হয় তবে আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে খাজনা-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কোনোদিক থেকেই তার নিস্তার নেই। তাই দেখা যায়, এত বছরের আবিষ্কার ও উদ্ভাবন কৃষি-ব্যাপারকে সামান্যই উন্নতি দান করতে পেরেছে। কিন্তু তবু মানুষের শক্তি ও দৃঢ় চেষ্টা সমস্ত বিপরীত ব্যবস্থাকে জয় করবার পণ ছাড়ে না; তাতে অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে!

আমেরিকায় আজকাল যে-নিয়মে আবাদ করা চলছে অন্য দেশে তা একরকম অসম্ভব; কারণ সেখানে নূতন ক্ষেত্রের অভাব হয়নি এবং অদূর-ভবিষ্যতে না-হবার সম্ভাবনাই বেশী। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে যে চাষ চলেছে তার মধ্যে বর্ত্তমানের সুযোগ ও সুবিধা যথেষ্ট। নব-উদ্ভাবিত যন্ত্রশক্তির সাহায্যে এবং এতদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় চাষী যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে সে যেন একটা বিরাট সামরিক ব্যাপার, সৈন্যদলের কুচ কাওয়াজের মত বা প্রথানির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে তার সমস্তটাই যন্ত্রের মত চলে;—কোনোদিকে অযথা-অপব্যয় নেই—সময়েরও নয়, শক্তিরও নয়। কিন্তু এর বন্দোবস্ত যত সুন্দর হোক এবং ক্ষেত্রের ও কৃষির বিস্তৃতি যত বেশী হোক, প্রকৃতির কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়—মাটির উৎকর্ষ-বিধানের কোনো চেষ্টা এর মধ্যে নেই। যেদিন ক্ষেত্রের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে, সেদিন তাকে পরিত্যাগ করে নতুন জমির সন্ধানে ফিরতে হবে। কিন্তু মানুষ এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে-নি;—শুধু তাই নয়, আবশ্যকের ও অভাবের দায়ে তাকে উন্নতির চেষ্টা করতে হয়েছে, কারণ নতুন জমি সব দেশে সব সময়ে পাওয়া যাবে না; শুধু বর্ত্তমান নয়, ভবিষ্যতের দায়ও কম নয়!

কৃষির এই উন্নতিকে কৃষি-বিজ্ঞানের নূতন অধ্যায় বলা যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে চাষ করে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল লাভ করা। জমিতে সার দিয়ে, নানারকমে তার পাট করে'

এবং শক্তি কেন্দ্রীভূত করে' জমির উর্ব্বরতাকে বাড়িয়ে তোলাই উন্নত কৃষির প্রধান বিশেষত্ব। যন্ত্রশক্তির সাহায্যে এটি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব; এবং সভ্য দেশে এই নিয়মেই কাজ চলছে। তার ফলে কোথাও-বা চার, কোথাও-বা পাঁচ গুণ ফসল লাভ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যন্ত্রের সফল-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমেরও যথেষ্ট লাঘব হচ্ছে। চাষের আগে মাটির পাট করতে হলে যা-কিছু করা দরকার, যন্ত্রে তা অতি অল্প সময়েই সম্পন্ন হচ্ছে। মাটির পাট করলে চাষের কত সুবিধা, তা বোধ হয় কারুকে বোঝাতে হবে না। অবশ্য পাট করা ব্যাপারটা কিছু অদ্ভুত নয়,—কারণ কেবলমাত্র আগাছা মুক্ত করার ফলে কোনো-কোনো জমিতে দ্বিগুণ ফসল হোতেও দেখা গিয়েছে।

আমরা কৃষির রোমান্স রচনা করতে চাই না;—আমরা শুধু দেখাতে চাই যে, মানুষের চেষ্টায় ও যত্নে সাধারণ ক্ষেত্রেও আশ্চর্যাপ্ত ফসল পাওয়া যেতে পারে, অথচ পরিশ্রম ও সময়ের মোটেই অপব্যবহার হয় না।

বর্ত্তমানের নানা রকমের অসুবিধার মধ্যেও যদি এতটা উন্নতি সম্ভবপর হয় তবে ভবিষ্যতে স্বাধীন সমাজে এর চেয়ে বেশী উন্নতি আমরা আশা করতে পারি! সভ্য দেশের বড় বড় সহরে অকেজো অলস লোক ছাড়া শত শত শ্রমোপজীবী কর্ম্মহীন ও বেকার থাকতে বাধ্য হচ্ছে; বর্ত্তমান ব্যবস্থার এই দোষ দূর করলে কর্ম্মীর সংখ্যা বেশী হবে এবং যন্ত্র-বলের সঙ্গে লোক-বলের সংযোগ-ফলে অন্ন-সংস্থানেরও অভাবনীয় সুবিধা হবে।

কিন্তু বিদ্রোহ বা সামাজিক পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে বর্ত্তমানে বা অদূর-ভবিষ্যতে এটা সম্ভব হতে পারে না। শাসনতন্ত্র, জমিদার ও মহাজন এই উন্নতির গতিরোধ করবার যথেষ্ট চেষ্টা করছে; কারণ এতে তাদের কোনো স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই। অথচ এই পরিবর্ত্তনের ফলে যারা সত্যই উপকৃত হবে সেই কর্ম্মীজনের এ সমস্ত বোঝবার মত না-আছে বিদ্যা না-আছে শক্তি,—না আছে অর্থ। অধিকন্তু, নিজের ও দেশের জন্যে সারাজীবন পরিশ্রম করে' এ-সব চর্চ্চা করবার মত তার অবকাশই বা কোথায়? মূর্খ দরিদ্র কর্ম্মীদের কাছে এ-সব কথা স্বপ্ন বলে মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়!

য়ুরোপীয় মধ্যযুগে এই ভূমিই একদিন রাজশক্তির ও ভূস্বামীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে চাষীকে মুক্তি দিয়েছিল এবং আমরা সর্ব্বান্তকরণে আশা করি, আধুনিক উন্নত-কৃষিও, মাঝারি-দলের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে চাষীকে যথেষ্ট শক্তি প্রদান করবে।

কাগজে-কলমে কৃষক-সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্গতির আলোচনা আমরা যথেষ্ট করে' থাকি এবং তাদের জন্যে বেদনা-প্রকাশও বড় কম করছি না; কিন্তু তাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই—তাই আমাদের সহানুভূতিতে আন্তরিকতার অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। আমরা কোনোদিন খবর রাখি না যে, এই সব চাষীর দল ভারবাহী পশুর জীবন যাপন কোরে, মানুষের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেও মানুষের জন্যে তারা যা করেছে এবং করছে তা মানুষের পক্ষে গৌরবের বিষয়। মাটিকে মানুষের কাজে লাগাতে

হলে, তার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তিকে সফল সার্থক করে' তুলতে হলে, যা-কিছু করা দরকার সে শিক্ষা আমরা তাদের কাছ থেকেই পেয়েছি। প্রকৃতির সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে' স্থান-কালের সমস্ত বিপরীত ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে নানা উপায়ে বেশী পরিমাণ ফসল আদায়ের চেষ্টায় যারা জয়ী হয়েছে, সেই সমস্ত মালী আর চাষীকে মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে!

আমাদের জীবনের চারিদিকে নানা সম্ভাবনার নানা বীজ ছড়ানো আছে;—সেই সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু নানা অকাজের দায়ে আমরা নিজেদের অকেজো করে' তুলছি—নিজের শক্তি উপলব্ধি করবার অবকাশটুকুও আমাদের নেই। মানুষ যদি জানত সে কি করতে পারে, এবং যদি সে আপনার শক্তিকে নিপুণভাবে কাজে লাগাত, তবে এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত মিথ্যা সংস্কার ও পণ্ড-পাণ্ডিত্যের জীর্ণ প্রাসাদ আজ তাদের অভাব অনটনের সঙ্গে-সঙ্গেই ধুলায় লুটিয়ে পড়ত। মানুষের কর্ম্মশক্তির অভাব নয়,—মনের ভীরুতাই স্বাধীনতা-কামীর পক্ষে সব-চেয়ে বড় শত্রু। পুরানো ব্যবস্থার ত্রুটীকে দূর করতে হলে শক্তির দরকার হয় বটে, কিন্তু নিজের শক্তির উপরে শ্রদ্ধা না-থাকলে এগিয়ে চলা একেবারেই অসম্ভব।

শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

কবিতার ছন্দ

ইংরাজী "আর্য্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ পর্য্যায়ক্রমে কবিতার রূপ ও স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় তিনি কবিতার ছন্দ সম্বন্ধে লিখিতেছেন :—"metre বলিতে আমরা সুনির্দ্দিষ্ট এবং সমান ওজনবিশিষ্ট ধ্বনির বিভাগ বুঝি এবং তাকেই আমরা 'মাত্রা' বলিয়া থাকি। সেই 'মাত্রা' বস্তুটা কবিতার বিচিত্র গতিলীলার প্রথাগত ভিত্তিমাত্র নয়; তাহা যথার্থই তার আসল ভিত্তি।

"যদিও আধুনিক কালে এই প্রথাকে অস্বীকার করিবার একটা ঝোঁক দেখিতে পাই। হুইটম্যান-কার্পেণ্টারের কাব্য এবং ফরাসী ও ইতালী দেশে যাঁরা vers libre বা অসমমাত্রিক ছন্দে * কাব্য লিখিতেছেন তাঁদের রচনাই তার প্রমাণ। এই সব রচনা বাঁধা মাত্রার বাঁধনকে ঠেলিয়া ফেলিতে চায়। যথার্থ সত্য, স্বাধীন এবং স্বাভাবিক কবিত্বের ছন্দকে বাঁধা মাত্রার বাঁধে ফেলিলে নিতান্ত হাল্কা, পল্কা ও ছেঁদো করিয়া তোলা হয়, বাঁধা মাত্রার বিরুদ্ধে হয়ত এও এদের একটা অভিযোগ। কিন্তু এ মত

---

* গতবারের মাসকাবারিতে রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" সম্বন্ধে নবপ্রকাশিত প্রবন্ধের 'সম' 'অসম' ও 'বিষম' শব্দগুলি কিছু স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল—vers libreকে বিষম ছন্দ বলা হইয়াছিল—আমার অর্থে অনর্থের 'বিষম' সম্ভাবনা দেখিয়া পলায়ন শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি।—লেখক।

শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিতে পারেনা বলিয়া আমার বিশ্বাস; কেননা ইহা টিঁকিবার যোগ্য নয়। যে পর্য্যন্ত না এই হালের অসমমাত্রিক ছন্দ এমন সকল সৃষ্টিতে আপনাকে সার্থক করিয়া তোলে যাদের পাশে প্রাচীন বড় বড় ওস্তাদ্ গায়ন্ কবিদের সৃষ্টি পরিষ্কার নীচের দরে পড়িয়া যায়, সে পর্য্যন্ত ইহারি জিৎ স্বীকার করা যায় না।...

"কানটাকে চট্ করিয়া দখল করিয়া বসে এমনতর ছন্দে-গাঁথা মনোহারী ভাষায় যে বাক্য লেখা হয়, তাকেই সাধারণতঃ আমরা কবিতা নাম দেই। কিন্তু ছন্দের ছলার সঙ্গে ভাষার খানিকটা জোর-বলাকে জুড়িয়া দিলেই সেটা উচ্চ দরের কাব্যকলা হয় না। সেটা কাব্যের বাহ্য রূপ বা ছায়া হইতে পারে, তার স্বরূপ বা কায়া হয় না।

"বিশেষ শক্তিমান কবিরা—সময়ে সময়ে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কবিরা—একটা বাঁধা হার্ম্মণি বা রাগসঙ্গতি কিম্বা একটা বাঁধা মেলডি বা একটানা রাগরাগিণীতে গান বাঁধিয়া খুসি থাকেন। বাইরের কাণে সে সুর মধুর; আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধকেও সে একরকম সরল বৈশিষ্ট্যহীন সুখের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। এই সহজ রাগ-সঙ্গতি বা রাগিণীর ছাঁচে কবিরা তাঁদের পূর্ণ্যমান, ধাবমান কল্পনাকে অবাধে ঢালিয়া দেন—আর-কোন নিবিড়তর উৎকর্ষের প্রয়োজন তাঁরা অনুভবই করেন না। এরকম কবিতাকে আমরা সুন্দর কবিতা বলি; আমাদের রসবোধ, কল্পনা, কান সমস্তকেই ইহা পরিতৃপ্ত করে—কিন্তু ঐ খানেই ইহার মোহিনীশক্তির অবসান। একবার ইহার ছন্দ শুনিলে আর নূতন কিছু প্রত্যাশা করিবার থাকেনা; ভিতরকার কানের দ্বারে নব নব বিস্ময় দেখা দেয় না; আত্মার পক্ষে অজানা গভীরতার ভিতরে সহসা প্রবাহিত হইয়া যাইবার কোন বিপদ্ দেখা যায় না।"

কবিতা সম্বন্ধে এই সুন্দর আলোচনায় vers libre বা অসম-মাত্রিক ছন্দ সম্বন্ধে অরবিন্দ বাবু সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য সমমাত্রিক ছন্দে রচিত প্রাচীন উৎকৃষ্ট সকল কাব্যের পাশে অসমমাত্রিক ছন্দে রচিত হালের কাব্যগুলিকে তুলনায় খাটো হইতে হয়, একথা সত্য। কিন্তু তার কারণ ইহা নয় যে এ ছন্দের ভাবী উৎকর্ষের সম্ভাবনাই নাই; বরং তার কারণ এই যে, সে সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার মত কবি-প্রতিভা ইউরোপে এখনো দেখা দেয় নাই। যেমন ধরুন্, বিখ্যাত আধুনিক লেখক Emile Varhaaren তাঁর নাট্যে ও কাব্যে এই অসমমাত্রিক ছন্দ বা vers libre ব্যবহার করিয়াছেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। তবে তাঁর প্রতিভা উচ্চদরের নয়; সেই জন্য বড় বড় গুণী ওস্তাদের সৃষ্টির পাশে তাঁকে দাঁড় করাইতে গেলে তাঁর ছন্দের সুর অত্যন্ত ঢিমে আওয়াজ দিতে থাকিবে। অরবিন্দ বাবু কাব্যে যে "intensest rhythm" বা নিবিড়তম ছন্দের আন্দোল-লীলা দেখিতে চান্, সে ধরণের কাব্য পৃথিবীতে যে বিরল তাহা তিনি নিজেই কবুল করিয়াছেন। vers libre ছন্দে সেই একান্ত নিবিড়তাকে, সেই নব নব বিস্ময়কে, এখনি এই দণ্ডেই

প্রত্যাশা করা চলে না। কেননা,এ ছন্দবাহনের যোগ্য দেবতা এখনো দেখা দেন্ নাই।

তবে যদি কোন দেশে এমন কোন বড় কবি থাকেন যিনি সমমাত্রিক ছন্দে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া তার পরে অসমমাত্রিক ছন্দকেও আয়ত্ত করিয়া তার ভিতরকার রহস্যগুলিকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তখন কাব্যামোদীর পক্ষে এই দুই ছন্দের প্রকৃতির পার্থক্যটা কোথায় তাহা দেখিবার একটা চমৎকার সুযোগ হয়। বাংলা দেশে কবি রবীন্দ্রনাথ "গীতালি" পর্য্যন্ত সমমাত্রিক ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া "বলাকা" হইতে তাঁর আধুনিকতম কবিতাগুলিতে অসমমাত্রিক ছন্দ ব্যবহার করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, তাঁর কাব্যে এই দুই ছন্দেরই সমান উৎকর্ষ দেখা যায়। তবে দুয়ের স্বাদ একেবারে ভিন্ন।

অরবিন্দবাবু যে লিখিয়াছেন যে, অধিকাংশ কবিই বাঁধা ছন্দে কাব্য লিখিয়া তৃপ্ত থাকেন এবং সে ছন্দ তার ধ্বনিমাধুর্য্যে কানকে সুখ দেয়, রসবোধকে তৃপ্তি দেয় এবং কল্পনাকে মুগ্ধ করে—তার প্রমাণ তো স্বয়ং রবিবাবুর চিত্রা, সোনারতরী প্রভৃতি কাব্য-গুলিই বটে। কিন্তু তিনি যাকে "highest intensest rhythm" বলিয়াছেন,—যে নিবিড় ছন্দে প্রত্যেক ধ্বনিটিরই একটি বিশিষ্ট তাৎপর্য্য আছে, বাঁধা ঢালা ছন্দে সে ঐ-কান্তিকতা সে ধ্বনিবৈশিষ্ট্য থাকে কৈ? কোথাও বা ধ্বনির সংরুদ্ধ বিরতি, কোথাও বা তার উচ্ছ্বসিত স্ফীত বিস্তৃতি,—কোথাও তাহা মুখর কোথাও মন্থর; কোথাও কৌতুকে হাস্যে দ্রুত কোথাও বা বিষাদে বিলম্বিত বা স্তম্ভিত—বাঁধা ছন্দে এত বৈচিত্র্যের অবকাশ থাকে কি? বরং দেখি যে রবীন্দ্রনাথের অসমমাত্রিক ছন্দেই এই বৈচিত্র্যগুলি অধিকতর দীপ্যমান—সমমাত্রিক ছন্দে এত বৈচিত্র্য, পদে-পদেই এত বিস্ময় ত ছিলনা। বাঁধা রাজপথ এবং গ্রামের পায়ে পায়ে চিহ্নিত আঁকা-বাঁকা মেঠোপথের মধ্যে যে প্রভেদ, বাঁধা ছন্দ এবং অসমমাত্রিক এই বাঁধাবাঁধনহীন ছন্দের মধ্যে সেই প্রভেদ। মেঠো পথের প্রত্যেকটি বাঁক মনকে আর ফাঁক দেয়না, বিস্ময়ে আবিষ্ট করে। বাঁধা পথের সরল ঔদার্য্য পদে-পদেই ঔৎসুক্য জাগায় না—একেবারেই মনকে ঘরের কোন্ হইতে টানিয়া বাহির করে।

বাংলা সাহিত্যে চল্‌তি ভাষার রচনাই চল্‌তি হইতে শীঘ্র চায়না; সুতরাং এই সৃষ্টিছাড়া বেয়াড়া ছন্দ বাঙালীর কানে অভ্যস্ত হইয়া তার মনে রসোদ্রেক করিবে, তার যথেষ্ট বিলম্ব আছে।

কিন্তু সে জন্য আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। কেননা আমরা সকলেই জানি যে, ভারতবর্ষের একমাত্র সাধনা ছিল মুক্তি-সাধনা। সেইজন্য কি সমাজে, কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি সঙ্গীতে, মুক্তির নাম শুনিলেই ধৈর্য্যরক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। মুক্তি সম্বন্ধে ইংরাজীতে যাকে বলে sensitive —আমরা তাই। ওটা আমাদের সহ্য হয়না। ওটা যক্ষের ধনের মত;—ওকে আগ্‌লাইয়াই বসিয়া আছি—খাটাইয়া খাইতে সাহস হয়না।

আধুনিক ফেরঙ্গ যুগে দুইজন কবি ছন্দকেও মুক্তি দিবার জন্য ছন্দ-সরস্বতীর

পায়ের বাঁধামাত্রার বেড়ি খুলিয়া দিয়াছেন এবং তার গতিকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। একজন মাইকেল, আর একজন রবীন্দ্রনাথ। দুজনের মধ্যে আর-কোনজায়গায় মিল না থাক্—দুজনেই বিধর্ম্মী ও ফেরঙ্গ-ভাববিশিষ্ট এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর দুজনেই সমাজদ্রোহী, সুতরাং দণ্ডের যোগ্য। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, দুজনেরই ঠিক সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যায়না। পাওয়া গেলে কতকটা সান্ত্বনার কারণ ছিল।

অতএব মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সমস্ত নকল যেমন নাকাল হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের এই অসমমাত্রিক বন্ধনমুক্ত ছন্দের নকলও যথেষ্ট সফল হইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

এস্‌রাজের পর্দ্দা বাঁধা; সেখান হইতে সুর আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সারঙ্গী বা সেতার হইতে সুর আদায় করা কঠিন, সেখানে যে বাঁধা পথ নাই।

বিরামযতির সংস্থান-বৈচিত্র্যের জন্যই মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল্য। হেমচন্দ্র সেই বৈচিত্র্যকে ধুইয়া মুছিয়া পয়ারের মত ৮।৬ ভাগে অত্যন্ত ধ্যাবড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ বৃত্রসংহারে চালাইলেন। তাতে বৃত্র অসুর সংহার হোক্ আর না হোক্, কাব্য-সুরের সংহার হইয়া গেল।

আশঙ্কা হয় যে লম্বালম্বা পংক্তিতে এবং যা-তা মিল দিয়া এ vers libre ছন্দেরও চলন অচিরাৎ দাঁড়াইবে। কিন্তু যারা এই সব নূতন অ-সুর কাব্য লিখিবে, নিশ্চয়ই তারা বাহবা পাইবে।

রচনার নমুনা

"আমায় কেহ বলিতে পার, কেন বাঙ্গালাদেশ হইতে বাঙ্গালী চলিয়া গেল? কোন্ পাপে? কিসে বাঙ্গালী সব হারাইল? এত যদি সংস্কার, এত যদি, বিরাট্ এবং ইত্যাদি, তবে এবং তবু অর্থাৎ তথাপি, আজ সে বাঙ্গালীর এ দশা কেন?

* * * * *

"নারায়ণ রথে উঠিয়াছেন। তাঁহার রথ চলিবে। পঞ্চাসূতা, এমন কি মিনিসূতার টানেও এ রথ চলিবে। থামিবে না। * * *

* * * *

"বাঙ্গালীর ধর্ম্ম, দর্শন ও সাহিত্য একে একে ধাপে ধাপে কি করিয়া সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে... আমি গাধার চীৎকারে বাঙ্গালীকে তাহাই শুনাইতে দাঁড়াইয়াছি।"

—নারায়ণ, চৈত্র সংখ্যা ১৩২৪।

এই শেষ পংক্তিটা পড়িয়া বুঝা গেল বাংলাদেশ ছাড়িয়া বাঙালী কেন, চলিয়া গেছে।

সমাজের স্থিতি ও উন্নতি

বৈশাখ সংখ্যার 'মানসী' ও মর্ম্মবাণী'তে শ্রীযুক্ত শশধর রায় 'সমাজের স্থিতি ও উন্নতি' শীর্ষক এক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সমাজের ধ্বংস-নিবৃত্তি কি কি উপায়ে হইতে পারে প্রধানত সেই বিষয়েই আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন:—

"বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতাই সামাজিক অবনতির এবং পরিণামে ধ্বংসের প্রধান কারণ। অর্থাৎ ঐরূপ প্রতিযোগিতায় পড়িয়া যে সমাজ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, সে সমাজ ক্রমে অবনত এবং শেষে ধ্বংস হইয়া

যায়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে প্রতিযোগী সম্প্রদায় অথবা জাতির উপর জয়ী হইতেই হইবে। নচেৎ ধ্বংস নিবারণের কোন উপায় নাই। স্বজাতি মধ্যে প্রতিযোগিতা করা আপনা-আপনি বলক্ষয় করা মাত্র। সুতরাং সমাজপতিগণের কর্ত্তব্য যে, স্বসমাজ ও স্বজাতি মধ্যে প্রতিযোগিতা যথাসম্ভব হ্রাস করা। এইরূপে স্ব-সমাজ বলী হইতে পারে এবং অপর সমাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইলে জয়যুক্ত হইতে পারে।" * * * *

"সমাজ-ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ, চিরাগত আচার ব্যবহারের ও প্রণালীর সম্যক্ পরিবর্ত্তন। 'মহাত্মা, ডারুইন অসভ্য ও সভ্য সমাজ—উভয়ের সম্বন্ধেই এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।" * * * *

" ডারুইন সর্ব্বজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,… … "সভ্যজাতিগণ গৃহপালিত জন্তুর ন্যায়, ইহাদিগের মধ্যেও চিরাগত আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে কখন কখন জননশক্তিহীনতা উৎপন্ন হইয়া থাকে;" এই মহাবাক্য সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। কোনও প্রসিদ্ধ ও সুপণ্ডিত বিলাত-ফেরতের সহিত একদিন এই সাহেবিয়ানা সম্বন্ধে আমার আলাপ হয়। তিনি উপরের উক্তি স্বীকার করেন না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাঁহার পিতার যেরূপ দীর্ঘায়ু ও বহু-সন্তান-জনন-ক্ষমতা ছিল, তাঁহার সেরূপ ছিল না। তাঁহার অপত্যগণ প্রায় সকলেই অল্প বয়সে মারা যান।" * * * * *

"সমাজস্থিতির মূল ও শেষ কথা ধর্ম্ম। যে জাতির অস্থিমজ্জা মধ্যে ধর্ম্মভাব, সে জাতি কালজয়ী। হিন্দুজাতি তাহাই।" * * * *

লেখকের এ আলোচনাকে কোনমতেই বৈজ্ঞানিক আলোচনা বলিতে পারিনা।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবল প্রতি-যোগিতার দরুণ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া অনেক সমাজ যে লোপ পায়, তার উদাহরণ ইতিহাসে প্রচুর মেলে। পরজাতির আক্রমণে অভিভূত হইয়া প্রাচীনকালে বিস্তর জাতি ধ্বংস পাইয়াছে। হঠাৎ যদি কোন সমাজের আবহমান সমস্ত রীতিনীতি ও ব্যবস্থাদি উলোট পালোট হইয়া যায়, তবেও তার ধ্বংস লক্ষ্য করা যায়। নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীদের উদাহরণ ডারুইন্ দিয়াছেন, লেখকও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন; আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান্দের ধ্বংসেরও ঐ একই কারণ। নূতন অবস্থার সঙ্গে তাদের খাপ করিয়া বনিবনাও হইতেছেনা বলিয়াই তাদের মধ্যে জননশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া সমস্ত জাতিটাই মৃত্যুমুখে পড়িয়া গেছে।

সমাজ-তত্ত্বের এই সকল মূল সত্যগুলি লইয়া লেখকের সঙ্গে কারো বিবাদ হইতে পারে না। কিন্তু দেশকালপাত্র-ভেদে এই সত্যগুলির রূপ-বৈচিত্র্য না দেখিয়া যখন তখন তাহাদিগকে আমাদের দেশীয় সমাজের উপর নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হয় বলিয়াই বিবাদ ঘটে। কেননা, তখন যে বৈজ্ঞানিক সতর্কতা আবশ্যক, তথ্য সম্বন্ধে যে নিশ্চয়তা থাকা আবশ্যক তার অভাব পদে-পদেই লক্ষ্য করা যায়। যথেষ্ট সমীক্ষা ও পরীক্ষা (observation and experiment) ভিন্ন কোন অনুমান (inference) বৈজ্ঞানিক মূল্য কতটুকু? বিজ্ঞানে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত বা হাইপথিসিস্ খাড়া করিতে গেলেও বিস্তর তথ্য জড় করিয়া ও পরীক্ষা করিয়া তবে সেটা খাড়া করা সম্ভাবনীয় হয়।

যেমন, লেখকের জনৈক বিলাত-ফেরত বন্ধুর পিতা দীর্ঘায়ু ও বহু সন্তানের জনক ছিলেন, কিন্তু ঐ বন্ধুটির নিজ পিতার মত

দীর্ঘায়ু ও বহু সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতা দেখা যায় নাই এবং তাঁর ছেলেরাও অল্প বয়সে মারা গিয়াছে। অতএব এইরূপ দুটি একটি দৃষ্টান্তের উপর ভর করিয়া যদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে 'চিরাগত আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে' জননশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়'—এই তো তার হাতে হাতেই প্রমাণ—তবে সেটাকে কি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিতে পারি? প্রাকৃত-জনের অজ্ঞতাসুলভ অবীক্ষার সঙ্গে ইহার তফাৎটা কোথায়? বিলাত-ফেরত বন্ধুটির যথেষ্ট সন্তান না হওয়ার কত রকমের কারণ থাকিতে পারে—তারপর, কারণটা তাঁর দিক্ দিয়া না হইয়া তাঁর স্ত্রীর দিক্ দিয়াও হইতে পারে। তাঁর জননশক্তির হীনতাই যে বহু সন্তান না হওয়ার একমাত্র কারণ একথা লেখকের কেন মনে হইল? আমরা এমন বিস্তর বাঙালী সাহেবকে জানি যাঁদের পিতা পিতামহ হইতে তাঁদের পরমায়ুও কম নয় এবং সন্তান-জননক্ষমতাও বিন্দুমাত্র কম নয়। সুতরাং বিলাতী আচার ব্যবহার হিন্দু সমাজে কতক কতক প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই যে হিন্দুজাতির মধ্যে জন্মের হার কমিয়া যাইতেছে, এ সিদ্ধান্ত একটা শূন্য কল্পনামাত্র—একে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া খাড়া করা চলে না।

বরং আমাদের সাবেক গ্রাম্য জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা যে একালের সহুরে ব্যয়সাধ্য শিক্ষাদীক্ষা আইন আদালত কর্ম্ম-ব্যবসায় প্রভৃতির হঠাৎ আমদানিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়ার দরুণ আমাদের পরিবার ও সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং এই নূতন অবস্থার সঙ্গে তাদের ভাল করিয়া বনিবনাও হইতেছে না—এবং এই কারণেই আমাদের প্রাণশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, ডারুইনের সিদ্ধান্তের প্রয়োগ-হিসাবে এ কথা বলা চলিত। কেননা, স্পষ্টই দেখিতেছি, আমাদের অভাব বাড়িয়াছে, অথচ পূরণের উপায় নাই—আমাদের আদর্শের বদল হইয়াছে, কিন্তু তার উপযুক্ত উপকরণ আমাদের হাতে নাই। পল্লীসমাজ ভাঙিয়া গেছে, অথচ রাষ্ট্রীয় সমাজ গড়িয়া ওঠে নাই। জমি ছাড়িলাম, ভিটা ছাড়িলাম; অথচ শাসন-শিল্প-বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হইল না। এইজন্য আমাদের খাদ্যের অভাবের চেয়েও শক্তির অভাব, স্ফূর্ত্তির অভাব অনেক বেশি। সমস্ত দেশ নির্জ্জীব, নিষ্প্রভ। এইটেই যথার্থ "আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন।" তার পর কেউ টিকি রাখেন কি কেউ রাখেন না, কেউ ধুতি 'পরেন' কি কেউ পরেন না, কেউ হাতে খান কি কেউ কাঁটা চাম্‌চেয় খান—এসব তুচ্ছ আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে জননশক্তি বাড়েওনা কমেও না। এগুলি অবান্তর।

কোন সভ্য প্রাচীন সমাজই সম্পূর্ণরূপে এবং চিরকাল ধরিয়া পরানুকরণ করিতে পারে না; সে পরজাতির সংঘর্ষে পরজাতির সম্পদকে আয়ত্ত করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইতে চেষ্টা করে। যে পরিমাণে সে আত্মসাৎ করিতে পারে, সেই পরিমাণে সে বল লাভ করে। জাপানে বিজাতীয় পরিচ্ছদ, ক্রীড়া কৌতুক, এমন কি বিজাতীয় ধর্ম্মমতও সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়—তাই বলিয়া

কি জাপানের নিজস্ব প্রকৃতি কিছু নাই? সেকি ইউরোপীয় জাতির অনুকরণ মাত্র? উপর উপর দেখিলে তাহাই মনে হইতে পারে; কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সে একদিকে প্রাচীন অন্যদিকে নবীন—সে তার পুরাণো রুচি ও সংস্কারের সঙ্গে এ কালের সভ্যতার নূতন নূতন ভাব ও সংস্কারকে মিশ্ খাওয়াইবার মস্ত সাধনায় রত আছে। জাপানের অন্তর্নিহিত মর্ম্মস্থানে 'জাপানী সভ্যতা' বলিয়া যদি কোন বিশিষ্ট পদার্থ না থাকে, তবে জাপান যে অনুকরণ করিতেছে সে বুদ্বুদের মত একদিন আপনাকেই আপনি ফাটাইয়া ফেলিবে। আর যদি তার নিজস্ব কোন প্রকৃতি থাকে, তবে সে এই কালের তাপে নূতন করিয়া মঞ্জরিত হইবে—নব বিকাশ লাভ করিবে। আজ পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই জাতি-সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীনে নবীনে বোঝাপড়া চলিতেছে। অমন প্রাচীন চীনেরও টিকি কাটা পড়িল; নবযুগের জন্য তাকে প্রস্তুত হইতে হইল। এই প্রবল সংঘাতে প্রাচীন মরিবেনা, নবজীবন লাভ করিবে—অবশ্য যদি তার মধ্যে জীবনের বীজ কোথাও লুকানো থাকে।

ডারুইন বলিয়াছেন ভবিষ্য সমাজে "virtue will be triumphant"—অতএব লেখকের মতন যদি সিদ্ধান্ত করি যে, হিন্দুজাতি ধর্ম্মপ্রাণ, তাহা কোন কালেই মরিবে না—তবে সে কথা ডারুইনের মতের পোষক হয় কি? কেননা হিন্দুজাতির ধর্ম্ম একালে প্রাণধর্ম্ম কি জড়ধর্ম্ম তাহাই যে গোড়ায় বিচার্য্য। ডারুইন একথা কোথাও বলেন নাই যে যারা জড়ধর্ম্মী তারাই সমাজের স্থিতির সহায় হইবে। মানিলাম যে, হিন্দু এক সময়ে ধর্ম্মপ্রাণ জাতি ছিল—তখন সে অধ্যাত্ম সাধনার চরমতম শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু তার সাধনার ধারাবাহিকতা কোথায়, এ কালের সঙ্গে তার অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র কোথায়? হিন্দুর ধর্ম্ম যখন পুঁথির বা প্রথার জিনিস ছিল না, তখনই হিন্দুর দ্বারে সমস্ত এশিয়া শিক্ষার্থীর বেশে আসিয়াছিল। এই ধর্ম্ম সভ্যতার প্রাণবীজ তখন দেশ বিদেশে নীত হইয়া নবনব সভ্যতার মহীরুহ সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দুর সেই ধর্ম্ম যদি এখনও প্রাণের জিনিস থাকিত, তবে তার সমাজ এমন বিশ্লিষ্ট-বিচ্ছিন্ন হইত না। কালের বিপুল পদক্ষেপের সঙ্গে হিন্দু আজ আর তাল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না। পর জাতির দ্বারা অভিভব নহে, পর জাতিকে আত্মসাৎ করিবার মন্ত্রই আজ হিন্দুর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। নহিলে ধ্বংস হইতে এ জাতিকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪২শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৫ [৩য় সংখ্যা

ভোলা

হঠাৎ আমার হল মনে
শিবের জটার গঙ্গা যেন শুকিয়ে গেল অকারণে ;—
থাম্‌ল তাহার হাস্য-উছল বাণী ;
থাম্‌ল তাহার নৃত্য-নূপুর ঝর্‌ঝরানি ;
সূর্য্য-আলোর সঙ্গে তাহার ফেনার কোলাকুলি,
হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্তব্ধ হল একনিমেষে
বিজু যখন চলে গেল মরণ-পারের দেশে
বাপের বাহুর বাঁধন কেটে।
মনে হল আমার ঘরের সকাল যেন মরেচে বুক ফেটে।
ভোরবেলা তার বিষম গণ্ডগোলে
ঘুম-ভাঙনের সাগর মাঝে আর কি তুফান তোলে ?
ছুটোছুটির উপদ্রবে
ব্যস্ত হ'ত সবে,
হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত "আরে আরে করিস্ কি তুই" বলে' ;
ভূমিকম্পে গৃহস্থালি উঠ্‌ত যেন টলে'।

আজ যত তার দস্যুপনা, যা-কিছু হাঁক্ ডাক্
চাক-ভরা মৌমাছির মত উড়ে গেছে শূন্য করে' চাক।
আমার এ সংসারে
অত্যাচারের সুধা-উৎস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে ;
তাই এ ঘরের প্রাণ
লোটায় ম্রিয়মাণ
জল্-পালানো দিঘির পদ্ম যেন।
খাট পালঙ্ক শূন্যে চেয়ে শুধায় শুধু, "কেন, নাই সে কেন ?"

সবাই তারে দুষ্টু বল্‌ত, ধরত আমার দোষ,
মনে করত, শাসন বিনা বড় হলে ঘটাবে আপশোষ।
সমুদ্র-ঢেউ যেমন বাঁধন টুটে'
ফেনিয়ে গড়িয়ে গর্জ্জে' ছুটে'
বারে বারে ফিরে ফিরে ফুলে ফুলে কূলে কূলে পড়ে লুটে লুটে
ধরার বক্ষতলে,
দুরন্ত তা'র দুষ্টুমিটি তেম্‌নি বিষম বলে
দিনের মধ্যে সহস্রবার করে'
বাপের বক্ষ দিত অসীম চঞ্চলতায় ভরে'।
বয়সের এই পর্দ্দা-ঘেরা শান্ত ঘরে
আমার মধ্যে একটি সে কোন্ চির-বালক লুকিয়ে খেলা করে ;
বিজুর হাতে পেলে নাড়া
সেই যে দিত সাড়া।
সমান-বয়স ছিল আমার কোন্‌খানে তার সনে,
সেইখানে তার সাথী ছিলেম সকল প্রাণে মনে।
আমার বক্ষ সেইখানে এক-তালে
উঠ্‌ত বেজে তারি খেলার অশান্ত গোলমালে।
বৃষ্টিধারা সাথে নিয়ে মোদের দ্বারে ঝড় দিত যেই হানা
কাটিয়ে দিয়ে বিজুর মায়ের মানা
অট্ট হেসে আমরা দোঁহে
মাঠের মধ্যে ছুটে গেছি উদ্দাম বিদ্রোহে।

পাকা আমের কালে
তারে নিয়ে বসে' গাছের ডালে
দুপুর বেলায় খেয়েছি আম করে' কাড়াকাড়ি,—
তাই দেখে সব পাড়ার লোকে বলে গেছে, "বিষম বাড়াবাড়ি।"
বারে বারে
আমার লেখার ব্যাঘাত হত, বিজুর মা তাই রেগে বল্‌ত তারে
"দেখিস্‌নে তোর বাবা আছেন কাজে ?"
বিজু তখন লাজে
বাইরে চলে যেত, আমার দ্বিগুণ ব্যাঘাত হত লেখাপড়ায় ;
মনে হ'ত "টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায় !"

ভোর না হতে রাতি
সেদিন যখন বিজু গেল ছেড়ে খেলা, ছেড়ে খেলার সাথী
মনে হল এতদিনে বুড়ো-বয়সখানা
পূরল ষোলো আনা।
কাজের ব্যাঘাত হবে না আর কোনোমতে,
চল্‌ব এবার প্রবীণতার পাকা পথে
লক্ষ্য করে বৈতরণীর ঘাট,
গম্ভীরতার স্তম্ভিত ভার বহন করে প্রাণটা হবে কাঠ।
সময় নষ্ট হবে না আর দিনে রাতে
দৌড়বে মন লেখার খাতার শুক্‌নো পাতে পাতে,—
বৈঠকেতে চল্‌বে আলোচনা
কেবলি সৎপরামর্শ কেবলি সদ্‌বিবেচনা।

ঘরের সকল আকাশ ব্যেপে
দারুণ শূন্য রয়েচে মোর চৌকি টেবিল চেপে।
তাই সেখানে টিঁকতে নাহি পারি ;
বৈরাগ্যে মন-ভারী
উঠোনেতে করছিনু পায়চারী।

এমন সময় উঠল মাটি কেঁপে

হঠাৎ কে এক ঝড়ের মত বুকের পরে পড়ল আমার ঝেঁপে।

চমক লাগল শিরে শিরে,

হঠাৎ মনে হল বুঝি বিজুই আমার এল আবার ফিরে।

আমি শুধাই, "কে রে, কি রে ?"

"আমি ভোলা" সে শুধু এই কয়,

এই যেন তার সকল পরিচয়,

আর কিছু নেই বাকি।

আমি তখন অচেনারে দু-হাত দিয়ে বক্ষে চেপে রাখি।

সে বল্লে "ঐ বাইরে তেঁতুল গাছে

ঘুড়ি আমার আট্‌কে আছে

ছাড়িয়ে দাওনা এসে।"

এই বলে সে

হাত ধরে মোর চল্ল নিয়ে টেনে।

ওরে ওরে এই মত যার হাজার হুকুম মেনে

কেটে ছিল ন'টা বছর তারি হুকুম আজো মর্ত্ত্যতলে

ঘুরে বেড়ায় তেম্‌নি নানান ছলে!

ওরে ওরে বুঝে নিলেম আজ

ফুরোয়নি মোর কাজ!

আমার রাজা, আমায় সখা, আমার বাছা আজো

কত সাজেই সাজো!

নতুন হয়ে আমার বুকে এলে,

চিরদিনের সহজ পথটি আপনি খুঁজে পেলে!

আবার আমার লেখার সময় টেবিল গেল নড়ে',

আবার হঠাৎ উল্টে পড়ে'

দোয়াৎ হল খালি

খাতার পাতায় ছড়িয়ে গেল কালি।

আবার কুড়োই ঝিনুক শামুক নুড়ি,

গোলা নিয়ে আবার ছোঁড়াছুঁড়ি।

আবার আমার নষ্ট সময় ভ্রষ্ট কাজে
উল্‌টপাল্‌ট গণ্ডগোলের মাঝে
ফেলা-ছড়া ভাঙাচোরার পর
আমার প্রাণের চির-বালক নতুন করে বাঁধল খেলাঘর
বয়সের এই দুয়ার পেয়ে খোলা।
আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর্ট ও কবিত্ব

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বঙ্গসাহিত্যের সুর যে একপর্দ্দা চড়ে গিয়েছে, এ-সত্য সাধারণের কাছে সুস্পষ্ট না হলেও, আমার বিশ্বাস, অসাধারণের কাছে আর অস্পষ্ট নেই; পৌরাণিক যুগের বেড়া টপ্‌কে গণস্যাগ্রতো সাহিত্যিকরা যে অতঃপর ঔপনিষদিক যুগের ফাঁকা ময়দানে এসে হাঁফ ছাড়বার উপক্রম করেছেন, এ কথা "সঙ্গীতের মুক্তি". শীর্ষক প্রবন্ধেই বিঘোষিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগের অর্থ হচ্ছে সেই যুগ, যা' কিছু-মুক্ত কিছু-বা-জড়িত—আর ঔপনিষদিক যুগ হচ্ছে সম্পূর্ণ মুক্তির যুগ।

এতদিন যে কবিত্ব-জ্যোৎস্নার বন্যার উপর দিয়ে আমরা আধজাগা ঘুমঘোরে ভেসে আসছিলুম, আজ যদি তা বিশুদ্ধ আর্টের দিবালোকে কেন্দ্রস্থ হবার উপক্রমই করে' থাকে তা'হলে আমাদের দুঃখ পাবার কথা নয়,—কিন্তু দুঃখ যে পাচ্ছি, সে শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টি কবির আশ্বাস-বাণীতে পুরো বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি নে বলে।

যে-যুগ সম্মুখে এসে সবেমাত্র দাঁড়াচ্ছে, সেই art for arts sakeএর যুগ-সম্বন্ধে, যদি এমন কথা আজ শোনা যায় যে, তা' বাতিলই হ'য়ে গিয়েছে—তা' হ'লে এই ভেবে মানুষের চোখ স্বভাবতঃই বিস্ময়-বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, যে এরই মধ্যে সে এলই বা কবে আর গেলই বা কোথায়?

রূপের জন্যে বা রূপোর জন্যে প্রেম বুঝতে পারা যায়,—কিন্তু 'প্রেমের জন্যেই প্রেম' যে নিতান্তই বাজে কথা তাতে সন্দেহ করবার লোক খুবই কম সত্য; তবু যাকে আরম্ভ করবার জন্যেই এত চেষ্টার পর চেষ্টা, আজ যদি তা' আকার লাভ করে' থাকে, তা' হলে রাগ করে' তাকে অস্বীকার করতে চেয়ে আমরা অস্বীকৃত রাখ্‌তে পারব কি?

এই art for arts sakeএর যুগ-

সম্বন্ধে কি, বোঝা চলতে পারে, তা' দেখবার আগে কি বুঝতে চাওয়া গিয়েছে, তাই দেখি :—

আমরা স্বীকার করেছি যে একালের অধিকাংশ কলাসৃষ্টিতে 'সমস্যার বিচিত্রতা' থাকলেও 'রসের অখণ্ডতা' নেই, এবং তার কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ যা', নির্ণয় করতে চেয়েছি তা' এই :—

"একালের চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত ব্যাপারগুলিকে যখন কতকটা নির্লিপ্তভাবে, দূরে স্থাপন করিয়া সমগ্র-দৃষ্টিতে আর্টিষ্ট দেখিতে পারিবেন, তখনই আধুনিক সৃষ্টির মধ্যে নিত্যরসের আভাস জাগিবে। সেই পরিপ্রেক্ষণটী না থাকার জন্য একালের অধিকাংশ কলাসৃষ্টিতেই সমস্যার বিচিত্রতা আছে বটে কিন্তু রসের অখণ্ডতা নাই। কিন্তু তার কারণ এই যে আর্টের পরিধিটা হঠাৎ বিস্তৃত হইয়াছে ; এ-যুগে আর্টসৃষ্টি বৃহত্তর সভ্যতা-সৃষ্টিরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ আর্টের চর্চ্চা এখন আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়।"

পরিপ্রেক্ষণটির অভাবই যে রসের অখণ্ডতাটিকে বেষ্টন করে' ধরতে না পারবার কারণ, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই, কিন্তু ঐ অভাবটাই যে বৃহত্তর সভ্যতা-সৃষ্টি করবার জন্যে অত্যাবশ্যক, এ-কথা বললে একটু অনাসৃষ্টি কথাই বলা হয়! কেন, তা' বলি :—

আমাদের ধারণা ছিল যে কেন্দ্রচ্যুত মানব-সভ্যতা এতাবৎকাল তার সভ্যতা-বুদ্ধিকে কেন্দ্রস্থ করবারই পথ খুঁজে আসছে ; —তবু তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে কেন্দ্র থেকে ক্রমাগত তা' দূরেই সরে চলেছে (কেননা কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই পরিধি বৃহত্তর হয়ে থাকে), তা' হলেও কথা দাঁড়ায় এই যে, 'পরিধি' যদি তা' হয় তবে 'অখণ্ড' না হয় কেন? end থেকে বা কেন্দ্র থেকে যদি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তবে সে দৃষ্টির পরিধি যতদূরেই যাক্ না কেন, রসের অখণ্ডতাটি তো থাকবেই তার মধ্যে!

দ্বিতীয়তঃ, 'নির্লিপ্ততা' বা 'সমগ্রদৃষ্টিতে-দেখা' ব্যাপারটির যে অর্থ নির্দ্দেশ করা হয়েছে, তাতেও অনর্থ ঘটবার সম্ভাবনা। দেখতে পাওয়া যায় যে হিমালয়-শীর্ষ সর্ব্বকালের বিক্ষোভকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে স্থানুর মতন বসে (সম্ভবতঃ) হাই তুলছে ; ওকে যদি আমরা আর্টিষ্ট ভাবি, তা' হলে আর্টের ধর্ম্মকে হীন করতে পারব না; কিন্তু আপনআপন বিচার-শক্তিরই জড়ধর্ম্ম প্রকাশ করবো! আর্টিষ্টের জাগ্রৎ-দৃষ্টিতে সমগ্রকে নির্লিপ্ততার মধ্যে দেখা, আর জড়ত্বের নির্লিপ্ত-দৃষ্টিহীনতায় 'কোনো-কিছুকেই দেখতে না চাওয়া' ঘুলিয়ে ফেলে লাভ নেই।

তা ছাড়া, গুটি-আষ্টেক লাইনের মধ্যেই, আর্টের আসন একবার সুদূর ভবিষ্যতে নির্দ্দেশ করে' ('কালের বিক্ষোভে' মাথা ঠিক রাখতে না পারার দরুণ) যদি ঐ দূর-ভবিষ্যৎকে "এখন আর" বাক্য-যোগে আবার অতীতের দিকে একদম ঘুরিয়ে দিই—তা' হলে আমাদের আশঙ্কা হয় যে এ-সাহিত্য দুদিনেই প্রলাপে পরিণত হবে।

রহস্য যাক্—আমার বিশ্বাস, এ-সাহিত্যের

ভবিষ্যৎ যুগ আর্টেরই যুগ হবে, এবং তা' এই কারণে যে, কবিত্ব তার চরম পরিণতি লাভ করেছে। এখন ওদিকে কেউই কিছু অগ্রসর করতে পারবেন না; যা' পারবেন তা' শুধু দাগা বুলুতে, আর না হয় এমন কিছু গড়তে যা' কাব্য-ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য বাড়াবে না, জায়গা জুড়বে মাত্র। এখন দেখা যাক্—কবিত্ব ও আর্টে তফাৎটা কি :—

(ক)

বিশ্ব-বস্তুর সীমাগুলিকে আকুল মনের উপর তুলে নিয়ে তার মধ্যে অসীমের সুর বাজিয়ে তোলার নাম কবিত্ব। ভোগও সর্ব্বস্ব মনে হচ্ছে না, অথচ যোগও পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে না—এই অবস্থায় যা সম্ভব, তাই কবিত্ব। আর আর্ট কথাটির যদি কোনো অর্থ থাকে তবে সে অর্থ হচ্ছে—যাবতীয় বন্ধনের লিপ্ততাকে মুক্তির নির্লিপ্ততায় উদ্ভাসিত করে' তোলবার শক্তি। এর চেয়ে সোজা, সঠিক ও পরিষ্কার বাংলায় ও-শব্দদুটির মানে বোঝানো যায় কি না তা' আমাদের অজ্ঞাত।

কালের চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত ব্যাপারকে পাশ কাটানো নয়—কিন্তু শিবের মতন ঐ বিক্ষোভের বিষ গলাধঃকরণ করে' নির্ব্বিকার নির্লিপ্ততায় তাকে অমৃত-পরিণাম দান করাই আর্টিষ্টের কাজ; অপর কথায় সমস্ত অনিত্যতাকে নির্লিপ্ততার নিত্য রসে যুক্ত করে' মুক্তি দেবার শক্তিই আর্ট।

সত্যকথা যে, যে-যুগের বেড়া আমরা টপ্‌কে এলুম সে-যুগের সৃষ্টি বিচিত্র হলেও টুক্‌রো টুক্‌রো ছিল—আর, আমরা অধিকাংশ লেখকই আজ পর্য্যন্ত ঐ টুক্‌রো সৃষ্টিরই জের টেনে চলেছি। এর কারণ, যেখান থেকে জাল ফেল্‌লে সমস্তটাই গুটিয়ে তোলা যায় সে-জায়গাটার সচিত্র চেহারা ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নি—আর সম্প্রতি আবিষ্কৃত হলেও, গ্রাহ্য করে' নিতে আমাদের এমন একটা জায়গায় টান পড়ছে যা' সব-চেয়ে-বেশী মোহের জায়গা।

এতদিন আমাদের 'পথটী চিনে চিনে'ই কেন্দ্রের দিকে এগুতে হচ্ছিল—এ-কাজে একটা মস্ত-বড় সুবিধা ছিল এই যে মনোজগতের সমস্ত স্তরই আমাদের আকুল-হয়ে-চলার ছোঁয়াচ লেগে স্থিতিশীলতা পরিহার করতে বাধ্য হচ্ছিল। সম্প্রতি আমাদের কবিত্বের আহ্বানে কেন্দ্রের দিক থেকেও একটা শক্তিকে নেমে আসতে দেখা যাচ্ছে—এ-শক্তিটির মধ্যে মনোরাজ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম details নেই, কিন্তু ঐ মনখানাকে সবসুদ্ধ ই গিলে ফেল্‌বার একটা অপূর্ব্ব-পরিচিত শক্তি আছে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে তাতে বল্‌তে পারা যায় যে জ্ঞানে ও প্রেমে আর্টে ও কবিত্বে, শক্তিবাদে ও ভক্তিবাদে শুভসম্মিলন ঘটবার মাহেন্দ্রক্ষণ আগত-প্রায়। কথাটা ক্রমেই স্পষ্ট করছি।

কবির কাজ—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা; আর্টিষ্টের কাজ—চাতুর্য্য বৃষ্টি করা। যাঁদের মতে 'সৌন্দর্য্য' অর্থে আকাশকুসুম-বৎ অলীক ও অনাবশ্যক একটা কিছু, আর 'চাতুর্য্য' অর্থে Sly Foxএরই অনুরূপ কোনো একটা গুণ, তাঁদের কথা বল্‌তে পারিনে—কিন্তু ঐ দুটি বিরুদ্ধ ব্যাপারই অল্পাধিক-পরিমাণে চর্চ্চার ফলে নিজের

অভ্যন্তরে যে ক্রিয়া-সম্বন্ধে আমরা কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ কর্‌তে পেরেছি, তারই উপর নির্ভর করে' রহস্যটা জানাচ্ছি।

সৌন্দর্য্যের ধারণ-ক্ষেত্র মানুষের মন; কবি তাঁর অন্তরের মধ্যে যে প্রণালীতে বহির্জগৎকে ভোগ করেন তা' বিমোহন করে' তুলে পাঠকদের মন মুগ্ধ করেন। চাতুর্য্যের প্রেরণ-ক্ষেত্র মানুষের প্রজ্ঞা; আর্টিষ্ট তাঁর আত্মার সঙ্গে যে প্রাণালীতে ঐ বহির্জগৎটা যোগ করেন পাঠকের প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে তা' প্রেরণ করে' তাদের মুক্ত কর্‌তে থাকেন।

Intellectএর শিখাটির সাম্‌নে বিশ্ব-বৈষম্যে-ভরা মনখানাকে বিছিয়ে দিয়ে যখন আমরা সেটিকে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যে সুন্দর করে' তুলি, তখন পাঠকের মনেও অনুরূপ বর্ণ-প্রতিধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। এতে তার মনের বৈষম্য দিন দিন বৈচিত্র্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ বিরোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বোধের মিষ্ট সান্ত্বনা আসে। কিন্তু কবির সঙ্গে পাঠকের যে উপভোগ পার্থক্যটি এখানে ঘটে, তা' বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার জিনিস—কেননা, আর্ট সম্বন্ধে পরে যা' বল্‌বো, এই পার্থক্যটির স্পষ্ট ধারণা তা' গ্রাহ্য করবার পক্ষে দরকার হবে।

কবি যখন প্রজ্ঞার যাদুদণ্ড-সাহায্যে তাঁর স্মৃতিচিত্রগুলিকে সুবিন্যস্ত কর্‌তে থাকেন' তখন তাঁর মনের অন্দর-পিটে বহ্নির কাজ চলে বটে, কিন্তু সদরপিট ঐ বহ্নিটি চেপে দীপ্তিটাকে মাত্র ছাড়পত্র দেয়। এতে ফল হয় এই যে, কবিকে যে-সৃষ্টি মুক্তির দিকে টানে, পাঠককে সেই একই সৃষ্টি মোহের দিকে ঠেলে। কবি যে ইচ্ছা করে' তাঁর পাঠককে hypnotise করেন তা' সত্য নয়, তবে পাকেচক্রে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে যায় তাই—কেননা, ও-কাজের ঐ দস্তুর। যতক্ষণ মন জিনিসটা চাঁদের মতন সূর্য্যালোককে আড়াল করে' থাকে এবং বহির্জগৎ তাকে ভোগ্য যোগায়, ততক্ষণই কবিত্ব। জগতের দিক থেকে শেষ-বন্ধন-গ্রন্থিটিও যখন মনের মধ্যে কাটা পড়ে যায়, তখন লঘুভার মন Intellectএর সঙ্গে মিলে-মিশে গিয়ে তার direct raysকেই এগিয়ে দেয়। প্রাণের যে আনন্দ সূর্য্যের ভিতর দিয়ে চাঁদে পড়ে' জগৎ-সংসারকে জ্যোৎস্নায় মুড়ে দেখাচ্ছিল, অতঃপর তা পূর্ণরূপে সৌরমণ্ডলটি দেখাবার সুযোগ পায়। ঐ মনের আনন্দ হচ্ছে কবিত্ব—আর এই জ্ঞানের আনন্দের নাম আর্ট। এখানে মন চাঁদের কাজ করে না, কিন্তু আতস-কাঁচের কাজ করে—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শিখাটিকেই মুক্তি দেয়। বলা বাহুল্য, মন দিয়ে মনের মধ্যে যা দেওয়া যায় তা সাময়িক—কিন্তু brain-centreএ যা পৌঁছে দেওয়া যায় তা' চিরদিনের।

আমাদের বিশ্বাস, সত্বগুণের শেষ জ্যোতিষ্ক নিখিলেশের মস্তকে লগুড়াঘাত করে' কবি বল্‌তে চেয়েছেন যে তাঁর মানব-প্রকৃতি-পরিদর্শন-কার্য্যটি শেষ হয়েছে। মানবজাতির জন্য idealise করবার মতন আর কিছুই বাকি নেই। এখন ব্যক্তিগতভাবে যাতে তাঁর ideaটি realised হয়; যাতে মানুষ গুণ-যুক্ত স্বভাবকে অতিক্রম করে' তার সত্য-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার সহায়তা দরকার। কিন্তু কোথায় সেই

স্বভাব, যেখানে মানুষ তার গুণযুক্ত স্বভাবকে অতিক্রম করে' আছে?

উত্তর—"অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মুর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে"। অতএব ঐ মুর্দ্ধা থেকেই অতঃপর আর্টের জাল নেমে আসুক। এখন যিনি সাহিত্য-সাম্রাজ্যে কবির উত্তরাধিকারী হবেন তাঁর সৃষ্টির ক্রিয়া মানুষের মনকে আশ্রয় করে' আরম্ভ হবে বটে, কিন্তু সে-সৃষ্টিকার্য্যের শেষ যেখানে গিয়ে তার রেশ মিলিয়ে দেবে; সেটি যেন, হৃদয় না হয়ে মস্তিষ্ক হয়। এ-কার্য্যের ফল হবে এই যে, কবিসৃষ্ট আদর্শ-জগৎটি—যার বহির্দ্দেশকে দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলগাড়ীর মতন বেষ্টন করে' করে' আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলুম,—অতঃপর আমাদিগকে চূড়ায় দাঁড় করিয়ে তার অন্তর্দ্দেশটিও দেখিয়ে দেবে। এক কথায়—এ চেষ্টার ফলে কবির idea ভবিষ্যৎ বংশীয়দের কাছে real হয়ে উঠ্‌বে।

(খ)

প্রবন্ধান্তরে বলেছি যে জগতে যাঁরা ভক্তিযোগী তাঁদেরই বলে কবি। এখন বলা যাক্—জগতে যাঁরা শক্তিসাধক তাঁরাই হচ্ছেন আর্টিষ্ট।

এই ভক্তিবাদ ও শক্তিবাদ বিবাদ কিম্বা প্রতিবাদ নয় সত্য, কিন্তু পরস্পরের অনুবাদও নয়। এর একটি অপরটিকে অনুপ্রাণিত করে না, করতে পারে না—কিন্তু দুটিকেই যুগধর্ম্ম অনুপ্রাণিত করে' থাকে। প্রথমটি দ্বৈতবুদ্ধিকে আশ্রয় করে' নীচু থেকে উপর-দিকে ওঠে, দ্বিতীয়টি অদ্বৈতবুদ্ধিকে অবলম্বন করে' উপর থেকে নীচুদিকে নামে।

ভক্তিবাদে—'মর্ত্ত্য স্বর্গে ওঠে প্রেমে'।

শক্তিবাদে—'মুক্তি স্বর্গে আসে নেমে'।

এ-কথা শুনে কেউ যেন মনে না করেন যে কবি 'মুক্তি চাহিনা হরি' বলে তাঁর ঐ ভক্তিপিপাসাতেই থেমে পড়তে বাধ্য, অথবা সর্ব্বসাধারণকে মুক্তিদান-কার্য্যটি সুদূর ভবিষ্যতে আর্টিষ্ট-কর্ত্তৃকই সম্ভাব্য। শক্তিবাদ যে মুক্তির আভাস ভক্তিবাদের জন্য বহন করে' আনে, তাকে চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত করে' দেবার ভার কবিরই—কেননা বিশ্বের চিত্ত-বৈষম্যের সূত্রগুলি তাঁরই চিত্ত-বৈচিত্র্যের মধ্যে বিধৃত। বস্তুতঃ, সাধারণ যদি কখনও মুক্তি পায়, তবে সে তার কবির হাত থেকেই তা' গ্রহণ করবে। কবি যাতে বাঁধা পড়ে' সকলকে বেঁধেছেন—কবিই যেদিন তাকে তুচ্ছ করে' বেরুবেন সেদিন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মুক্তির অগ্নিশিখা স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করবে। আর্টের যে আগুন আজ সাহিত্যে শিখা-বিস্তার করছে, কবির পরিণামেই তার বৈদ্যুতিক শক্তিকে আমরা জীবন্ত দেখে যেতে পারবো। ত্যাগী নিখিলেশকে যিনি বেদনার মধ্যে এঁকেছেন,—দেহাত্মিকা মূর্তিকে নষ্ট করার অর্থ যে তাকে স্ত্রী দেহাত্মিক মতিত্বে স্পষ্ট করা, এ-কথা যিনি প্রবলকণ্ঠে অস্বীকার করেছেন—নিখিল-রহস্য সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা তাঁরই চরম আনন্দ থেকে দিগ্বিদিকে ঠিক্‌রে পড়বে।

কেউ কেউ মনে করেন যে চাতুর্য্য-চর্চ্চার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হওয়ায় সৌন্দর্য্য-চর্চ্চাকে অবহেলা করা হয়। প্রত্যুত্তরে যদি মনে করা যায় যে সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার প্রতি বেশী ঝোঁক দিলে চাতুর্য্যকে বিবাগী করা

হয়, তা' হলে ঐ মনে-করাকরি কালক্রমে *মন-কষাকষিতে পরিণত হয়ে মানব-জগতে* শক্তিবাদ ও ভক্তিবাদের পুনর্ব্বিরোধ সৃষ্টি করবে। বলা বাহুল্য, প্রাচীন মানব-সভ্যতার এই বিরাট ধ্বংস-লীলার সাম্‌নে দাঁড়িয়েও ও-কার্য্য আমাদের কাম্য হওয়া ঠিক হবে না,—অতএব ও-দুটিকেই সমান-ভাবে গ্রাহ্য করে' নিয়ে জীবনকে শক্ত ও সুন্দররূপে দাঁড় করানোই মঙ্গলের হবে।

অবশ্য অন্তরে ফতুর হয়ে চতুর হতে চাওয়া দোষের—অপর-পক্ষে, হৃদয়ে কৃপণ হয়ে ধনী হতে চাওয়াও নির্দ্দোষের নয়। হুল লুকিয়ে মধু ছড়ানোর নাম কবিত্ব হলে মধু লুকিয়ে হুল ফোটানোর নামও আর্ট হবে। হুল হচ্ছে সেই লিপ্ততা যা' পাঠককে অচেতন করে, আর মধু হচ্ছে সেই নির্লিপ্ততা যা তাদের সচেতন করে' দেয়।

কবির আত্মপ্রকাশ সবিনয়—আর্টিষ্টের আত্মপ্রকাশ সাহঙ্কার। এর একটা যদি খাদ হয় তবে অপরটাও নি-খাদ নয়। একদিকে বিনয়ের hollow আছে—অপরদিকে অহঙ্কারের billow আছে; পরস্পরকে তিরস্কৃত করে'ই ও-দুটি মোক্ষলাভ করবে। আসল কথা এই যে, কবি ভক্তিবাদী হলেও অশক্ত নন, আর আর্টিষ্ট শক্তিবাদী হলেও অভক্ত নন,—তফাৎটা শুধু এই, কবিত্বে শক্তির মুখ ভিতর দিকে আর আর্টে ঐ মুখটিই বাইরের দিকে।

(গ)

এইমাত্র আর্টের যে-দিকটির কথা বললুম, তা' স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্যমূলক, আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে—বৈষম্য নষ্ট করা। এই বিনাশ-শক্তি কবি-প্রকৃতির ভিতর থেকেও প্রকাশ পায় —*কিন্তু কবির গড়বার হাত ও ভাঙ্‌বার* হাত আলাদা আলাদা, আর আর্টিষ্ট একহাতেই ঐ দুটি কাজ করেন। কবির impulsive nature তাঁকে একবগ্‌গা ছুটিয়ে নিয়ে যায়; ফলে, বিরুদ্ধমতের পাঠক বিরক্ত হলে তা' প্রকাশ করবার পথ পায়। আর্টিষ্ট সকল দিকের কথাই বলে দিয়ে যান—সুতরাং পাঠকের বিরক্তি আত্মপ্রকাশ করবার পথ না পেয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে তার বুকের রক্তেই রূপান্তরিত হয়ে যায়। তা' ছাড়া, সরল রেখায় বা সহজপথে মন্তব্যটি না চালিয়ে একটু ঘুরপথে চালানো স্থলবিশেষে দরকারও হয়,—তা' এইজন্যে যে, 'পেরেক' জিনিসটির চেয়ে 'স্ক্রু' জিনিসটির জোর কম নয়; আর সকল কাঠে পেরেক ঠোকাটা নিরাপদও নয়, যে-হেতু তাতে কাঠ চিরেও যেতে পারে।

* * *

এইবার "বৃহত্তর-মানব-সভ্যতার" ও বিশুদ্ধ আর্টের যোগাযোগের কথা বলে' প্রবন্ধ শেষ করি।

আমার প্রথম কথা এই যে, 'সভ্যতা' পদার্থটিকে বিশুদ্ধতার উল্টো-কিছু বলে' মনে করা অসভ্যতা। সভ্যতা বল্‌তে যা বোঝায়, তা' "সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি" ছাড়া অন্য কিছুই নয়—অন্ততঃ 'মহত্তম সভ্যতা'র ঐটিই হচ্ছে অর্থ। এখন, এই বিশুদ্ধ সভ্যতাকে অশুদ্ধ থেকে অশুদ্ধতর করতে করতে চারিয়ে দেওয়াই যদি 'বৃহত্তর সভ্যতা' গড়বার উপায় হয়, তা' হলে ব্যাপারটা একটু আশঙ্কাজনকই হয়ে ওঠে।

চেতনা আপনাকে বিস্তার করতে করতে যে-ভাবে জড়-বিশ্বে বিরাম লাভ করেছে—'সভ্যতা' সম্বন্ধে আমাদের চেতনাও যদি তাই করে, তবে মানুষ প্রথমে পশু, তৎপরে উদ্ভিদ এবং সর্ব্বশেষে জড়পিণ্ড হয়ে পূরোসভ্য হবে। আশা করি, সভ্যতাকে এ-ভাবে degrade করে' বৃহত্তর করে' তুলতে আমরা রাজি হব না; কেননা, তাতে শিব গড়তে অন্য-কিছুই গড়া হবে।

অবশ্য যদি এ-কথা বলা যায় যে বিশুদ্ধ আর্ট গ্রহণ করবার যোগ্যতা এখনও আমাদের হয়নি—অতএব endএর মর্য্যাদা বুঝে নেবার আগে এখনও কিছুকাল means to attain that endএর চর্চ্চা চালাবো, তবে তাতে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু এ-কথা যেন আমরা না বলি যে, 'নির্লিপ্ততা'র উদ্ভাবনা দোষের হয়েছে বা কাজের হয় নি।

সত্যের মর্য্যাদা না রাখতে শিখলে সত্যযুগের আবির্ভাবকে আমরা পেছিয়েই রাখবো;—যে-সত্যের মর্য্যাদা রাখবার জন্যে 'নিখিলেশ' মানুষের সব-চেয়ে বড়-মোহ থেকেও প্রাণপণে আপনাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছে, সেই নিখিলেশ-স্রষ্টার দীক্ষাকে অপমান করবার অধিকার তাঁর কোনো ভক্তেরই নেই, এ-কথা যেন আমরা না ভুলি।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

খেয়ালের খেসারৎ

(গল্প)

ও-বাড়ির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা যে কি-রকম তা বলা শক্ত; ওদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সংস্রব নেই,—থাকতেও পারেনা; তবু তিন-পুরুষ ধরে' ওদের সঙ্গে আমাদের দাদা, দিদি, কাকা, খুড়ি, পিসি প্রভৃতি সম্পর্ক চলে আসছে। কোন্ সময় কেমন-করে এই আত্মীয়তা আরম্ভ হয়, সে-ইতিহাস বলবার লোক এখন আমাদের পরিবারেও নেই, ওদের পরিবারেও নেই—অর্থাৎ বুড়োর দল দু-পরিবার থেকেই সরে পড়েছেন। এখন আমরা যারা আছি ঐ আত্মীয়তার সম্পর্ক উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছি। আমাদের বাড়ির এখনকার ছেলেরা কেউই এ প্রশ্ন করেনা যে ওরা কায়স্থ, আমরা ব্রাহ্মণ, ওদের আমরা দাদা দিদি বলি কেন? কিম্বা ওদের বাড়ির কেউই, আমরা ব্রাহ্মণ বলে' যে আমাদের বিশেষ-একটা মর্য্যাদা দেয় তাও নয়। তারা যেটুকু শ্রদ্ধাভক্তি করে তা আত্মীয়-গুরুজনের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং আমাদের প্রতি তাদের যে ভালোবাসা তাতে প্রাণের টানেরই পরিচয় বেশী।

কোনো গোল ছিলনা; গোল বাধালেন আমার দাদা। কেমন-করে ব্যাপারটা ঘটল

তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আমি ঠিক জানিনা; হঠাৎ দেখি দাদা এম-এ পাশ করে ছুটির সময় ভারি হিঁদু হয়ে উঠেছেন। তাঁর ছোট-বড়-করে ছাঁটা চুল চৌরস হয়ে গিয়ে পিছনে এক সরু টিকি গজিয়ে উঠেছে; পৈতে-গাছটা শুচিতার ঘর্ষণে সাবানের ফেনার মতন সাদা, এবং তিরিক্ষি-মেজাজ লোকের মতন কড়া হয়ে রয়েছে। একদিন তিনি আমায় গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"স্বাখ্ নবীন, আর এ-সব চলবেনা। আমাদের অনাচারে আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ দিন-দিন অধঃপাতে যাচ্ছে; আমরা ব্রাহ্মণরা অনেক দিন ধরে কর্ত্তব্যে অবহেলা করে এসেছি, এবার কর্ত্তব্যভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমাদের শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে।"

আমি বল্লুম—"বেশ ত!"

দাদা বল্লেন—"শুধু বেশ ত বল্লে চলবে-না; তোকেও কাজে লাগ্‌তে হ'বে। তুই আমার ভাই, আমার পাশে এসে তোকে দাঁড়াতে হ'বে।"

আমি বল্লুম—"কি করতে হ'বে?"

দাদা বল্লেন—"পয়লা নম্বর—তোকে টিকি রাখতে হ'বে।"

আমি বল্লুম—"তা আমি পারবনা।"

দাদা একটা ভ্রূকুটি হেনে বল্লেন—"পার্‌বিনে কেন?"

আমি বল্লুম—"কালেজের ছেলেরা তাহ'লে ভারি উৎপাত লাগাবে।"

দাদা বল্লেন—"তুই coward! যা ভালো বুঝবি তা করবার সাহস যদি তোর না থাকে তাহ'লে তোর মতন কাপুরুষ দুনিয়ায় নেই!"

আমি বল্লুম—"দাদা, তুমি ভারি ভুল করছ। আমার কাপুরুষতা তখনই প্রমাণ হবে যখন আমি স্বীকার করব টিকি-রাখাটা ভালো।"

দাদা চম্‌কে উঠে বল্লেন—"তুই টিকি-রাখার পক্ষপাতী ন'স?"

আমি বল্লুম—"মোটেই না!"

দাদা বল্লেন—"কেন?"

আমি বল্লুম—"তর্কশাস্ত্র-অনুসারে কেন টিকি রাখব এর জবাব দিতে তুমি বাধ্য। তোমার ঐ 'কেন'র দায় আমার নয়।"

দাদা রেগে গিয়ে বল্লেন—"থাম্। তুই ভারি ফাজিল হয়েছিস!"

দাদার আজ্ঞায় আমি চুপ করে গেলুম। কিন্তু সেটা তাঁর আদৌ মনঃপূত হ'লনা। কারণ তাঁর তর্ সইছিল না; তিনি মনে-মনে চাচ্ছিলেন যে এই তর্কটা কোনোরকমে মিটে গিয়ে আমি এখনই তাঁর দলভুক্ত হয়ে পড়ি। তিনি অধীর হয়ে বলে উঠলেন—"টিকি রাখব এই জন্যে যে ওটা আমাদের জাতীয়তার একটা গৌরবের নিশানা।"

আমি হেসে বলে উঠলুম—"গৌরবকে মাথায় রাখতে হয় স্বীকার করি, কিন্তু সে তোমার অম্‌নি-করে কথায়-কথায় তর্জ্জমা করে নাকি! তাহ'লে তুমি যে এম-এ সেটাও কপালে টিকিট-মেরে জাহির করে বেড়াও না!"

দাদা চটে-উঠে বল্লেন—"জানিস্ এ-সব ঠাট্টার বিষয় নয়!"

আমি বল্লুম—"ঠাট্টা কি আমি করছি? তোমার ঐ জাতীয় গৌরবটাকে তুমিই ত একটা বিরাট ঠাট্টা করে তুলছ!"

দাদা বাধা পেয়ে মনে-মনে খানিকক্ষণ

ছটফট্ করতে লাগলেন। তারপর ধীরে ধীরে বল্লেন—"দ্যাখ্, ঐ টিকিটি হ'ল—(আমি হেসে বল্লুম—"কি? ভবপারের টিকিট?" দাদা কটমট্ করে উঠলেন।) —ঐ টিকিটা হ'ল আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের সঙ্গে একটা পরিচয়ের বন্ধন;—ঐ বন্ধন খুলে দিলে আমাদের পরিচয়ের কোনো মর্য্যাদাই থাকেনা।"

আমি বল্লুম—"কিন্তু দাদা, পূর্ব্বপরিচয় ভালো-করে বজায় রাখতে হ'লে অনেক পুরোনো জিনিসই ফিরিয়ে আনা দরকার। তাহ'লে এই ক্ষুদ্র দেহটিকে একটি প্রকাণ্ড যাদুঘর করে তুলতে হয়। মাথায় যদি টিকি রাখ তাহ'লে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের ল্যাজটাই বা দোষ করলে কি!"

দাদা এবার ভয়ঙ্কর রেগে উঠলেন। আমার সাম্নে আর মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়ালেন না; রাগে গস্-গস্ করতে-করতে চলে গেলেন!

দাদার সঙ্গে সেদিন যে এই তর্ক করেছিলুম সে আমি ভেবে-চিন্তে করিনি;—কথার পিঠে যা মুখে এসেছিল বলে গিয়েছিলুম মাত্র। দাদাও যে তৈরি হয়ে আমার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে ছিলেন তা মনে হয় না। কারণ সেটা তাঁর স্বভাব নয়; তাঁর স্বভাব ঝোঁকের মাথায় কাজ-করা। উৎসাহের তোড়ে তিনি যখন মেতে ওঠেন তখন তিনি মনে করেন জগৎ-সুদ্ধ-সবাই বুঝি তাঁর সঙ্গে সমান মেতে উঠেছে;—কোথাও যে বিরুদ্ধতা থাকতে পারে এ কথাটা তিনি মনে করতেই পারেন না। তারপর, সত্যি বলতে কি, আমার দাদা—তাঁকে তো আমি জানি—তিনি যে এমন হঠাৎ-হিন্দু হয়ে উঠে এই সব কথা অন্তরের সঙ্গে বলছেন এটা আমার তখন সত্যিই বিশ্বাস হয়নি। তাঁর ঐ টিকি রাখার কথাটা আমার কানে অনেকটা ঠাট্টার মতোই শোনাচ্ছিল। তা-ছাড়া আমার তখন সব-চেয়ে ভাবনার বিষয় ছিল কোনো-রকমে এম-এটা পাশ করা। হিন্দুধর্ম্ম গেছে কি আছে তখন এ-প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। কাজেই দাদার কথাগুলোর জবাব উচিত-মতো করে দিতে পেরেছিলুম বলে আমার মনে হয় না; এবং তার জন্য যে মনে কোনো ক্ষোভ হয়েছিল তাও নয়। দাদা কিন্তু আমার কথাগুলোকে মর্ম্মান্তিক-করে নিয়েছিলেন। তিনি এমন রেগে গেলেন যে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিলেন। আমাকে বাদ দিয়েই তাঁর কাজ সুরু হল।

আমার এম-এ-পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে দেখি আমাদের বৈঠকখানার বাঁ-দিকের ঘরটায় দাদা বেশ-একটি আড্ডা জমিয়ে বসেছেন। পাড়ার অনেকগুলো ছোট-বড় ছেলে এসে জুটেছে। টেবিল চেয়ার উঠিয়ে দিয়ে ঘরময় কুশাসন বিছানো হয়েছে। যে-সব তাকে চীনেমাটির পরী, ফুলদান প্রভৃতি সাজানো ছিল সেখানে এখন বিরাজ করছে কাঁশর ঘণ্টা শাঁক কোশাকুশি পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি। কেরোসিনের আলোটা সরিয়ে একটি ছোট্ট ঘিয়ের প্রদীপ বসেছে। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। আমি সেই ঘরে উঁকি মারতেই দাদা মুখ-ফিরিয়ে নিলেন। আমি ব্যস্তসমস্ত হয়ে যেমন ঘরে ঢুকতে যাব অমনি চারিদিকে একটা হাঁ-হাঁ শব্দ উঠল। আমি থমকে একটু পিছিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা

করলুম—"ব্যাপার কি?" সকলে ঘাড়-নেড়ে বলে উঠল—"উঁহু, জুতো-পায়ে আসবেন না এখানে!" আমি জুতো খুলতে যাচ্ছি এমন সময় দাদা গম্ভীরভাবে বল্লেন—"জুতো খুল্লেও ওঁর এ-ঘরে ঢোকবার অধিকার নেই।" সত্যি বল্‌তে কি, সকলকার সাম্‌নে দাদার এই রূঢ় কথাটা আমার প্রাণে বড় বাজ্‌ল। আমি গুম-হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বসলুম।

এর পর থেকে দাদার আড্‌ডায় আর ঢোকবার ইচ্ছে করিনি। পাশের ঘরে বসে প্রায় শুনতুম সেখানে কখনো খুব উচ্চস্বরে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে, কখনো বা শাঁকঘণ্টা বাজছে। আমি নির্ব্বাসিতের মতো একলাটি নিজের ঘরটিতে পড়ে থাকতুম। একে-একে দাদা আমার বন্ধুদেরও আকর্ষণ করে নিতে লাগলেন। লোক বশ করবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। তাঁর হৃদয়টি এমন স্নেহপ্রবণ যে চারদিকের সবাইকে তিনি যেন আঁকড়ে ধরেন। তাঁকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া শক্ত। আমাকে ছেড়ে বন্ধুরা যে তাঁর কাছে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি! ওদের ঐ আড্‌ডা ভাঙবার জন্যে আমার মন এমন নিশ্‌পিশ্‌ করতে থাকত কি বল্‌ব! আর-কিছু ভেবে না পেয়ে আমি থেকে-থেকে খুব চীৎকার করে ইংরেজি কবিতা পড়তুম; কখনো বা একটা হাতুড়ি নিয়ে দুম্‌দাম্‌-শব্দে দেয়ালে পেরেক ঠুক্‌তুম।

দাদার মাথার চুল যে অত বাড়ন্ত এর পূর্ব্বে আমি কখনো লক্ষ্য করিনি। দেখতে-দেখতে তাঁর টিকিটি বেশ লম্বা হয়ে উঠেছিল। আমি সেইটেকে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে-করে দেখতুম বলে দাদা বোধ হয় ভাবতেন আমি মনে-মনে ঠাট্টা করচি। তাই তিনি মুখে কিছু না বল্লেও ভিতরে-ভিতরে যে চটে উঠতেন তা আমি বুঝতুম। দাদা একরকম স্থির করেই নিয়েছিলেন যে ঐ টিকি নিয়েই যখন তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া তখন ঐ টিকি যত দীর্ঘ হচ্ছে বিবাদও তত বাড়ছে বই কমছে না। সেই জন্যে তিনি আমাকে দলে টানবার আর চেষ্টাই করলেন না। এবং আমি না হলেও যে তাঁর চলে এটাও বোধ হয় তিনি দেখানো দরকার মনে করতেন। এর জন্যে আমি দুঃখিত ছিলুম না; কারণ আমি জানতুম দাদার সঙ্গে আমার এ মান-অভিমানের পালা এক-দিন-না-একদিন শেষ হয়ে যাবেই। কিন্তু এখনকার এই ছুটির দিনগুলো একলা-একলা কাটে কেমন করে? দাদার আড্‌ডায় প্রবেশের উপায় না পেয়ে শেষে আমি ও-বাড়ির অন্দরে প্রবেশ কর্‌লুম। একেবারে অন্দরে যাবার কারণ এই যে ও-বাড়ির বৈঠকখানা তখন একরকম বন্ধই থাকত। ওখানকার সতীশ এবং যতীশ আমাদের সমবয়সী দুই ভাই দাদার আড্‌ডায় যোগ দিয়ে অষ্টপ্রহর আমাদের বাড়িতেই পড়ে থাকত।

ও-বাড়ির মধ্যে সব-চেয়ে আমি ভালো-বাসতুম পিসিমাকে। ছেলেবেলা থেকে তাঁর হাতের যত প্রহার এবং আহার খেয়েছি সে-সব এখনো আমার মনে গাঁথা আছে। পিসিমার প্রধান গুণ এই ছিল যে প্রহারের সঙ্গে আহারের মিল না দিলে যে রসভঙ্গ হয় এটা তিনি ভালো-

রকমই জানতেন। সেই জন্যে আমাদের কাছে ঐ প্রহারটা কখনো বেতালা হয়ে ওঠেনি। আমরা ঐ মিলের লোভে অনেক সময় দুষ্টুমি করে মার খেয়েছি। এটা যে তিনি বুঝতেন না তা নয়; তবুও যে তিনি আমাদের প্রশ্রয় দিতেন তার কারণ আমাদের ঐ দুষ্টুমিটা তিনি যে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতেন।

তিনি অল্প বয়সে বিধবা হ'ন। তাঁর ছেলেপুলে ছিল না। আমাদের দুটি ভাইকে অতৃপ্ত বুকের সমস্ত স্নেহটুকু বিলিয়ে দিয়েও তিনি যেন তৃপ্তি পেতেন না। আমার মায়ের ছেলেমেয়ে অনেকগুলি; সবাইকে তিনি সাম্‌লে-উঠতে পার্‌তেন না; তার জন্যে আমাদের দু-ভায়ের যে অভাব-টুকু হ'ত পিসিমা তার সুদসুদ্ধ পুষিয়ে দিতেন—এমন-কি তার অতিরিক্তও দিতেন। তাঁকে আমরা কখনো পর-বলে' ভাবতে পারিনি। মায়ের চেয়ে তাঁর দিকেই আমাদের টান ছিল বেশী। পিসিমা কাকে বেশী ভালোবাসেন -এই নিয়ে আমাদের দু-ভায়ের মধ্যে এখনো ঝগড়া চলে। বাইরের এই ঝগড়া না মিটলেও আমাদের মনের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই। কারণ, দাদার বিশ্বাস পিসিমা তাঁকেই বেশী ভালোবাসেন এবং আমি মনে-মনে জানি আমার চেয়ে পিসিমা কাউকে ভালোবাসেন না। অনেক ছেলে-মানুষী আমাদের কেটে গেছে বটে কিন্তু পিসিমার ভালোবাসা নিয়ে আমাদের দু-ভায়ের হিংসা এখনো কাটেনি। তার কারণ পিসিমার কী আশ্চর্য্য গুণ আছে যাতে তাঁর কাছে গেলেই আমরা যে বড় হয়েছি এ-কথাটা একেবারে ভুলে যাই।

পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম বলে' অনেক-দিন পিসিমার কাছে আসা হয়নি। আমাকে দেখে তাঁর আহ্লাদ যেন সর্ব্বাঙ্গ-দিয়ে উপ্‌চে পড়তে লাগল। আমি যখন গেলুম তখন তিনি রান্না-ঘরে ছিলেন। আমার গলা-পেয়েই ছুটে বেরিয়ে এলেন। আমার হাত-ধরে টেনে একেবারে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে-গিয়ে হাজির করলেন। পিছনে-পিছনে এক দাসী ছুটে এসে বল্লে—"ও পিসিমা, তোমার ঘিয়ের কড়া জ্বলে গেল যে!" পিসিমা ব্যস্ত হয়ে বল্লেন,—"ঐ যাঃ, কড়াটা নামিয়ে রেখে আসতে ভুলে গেছি! বস বাবা নবীন, আমি এলুম বলে'।" বলেই তিনি ছুটে গেলেন। হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এসে বল্লেন,—"হ্যাঁরে, তোর দাদা এলনা যে!"

আমি বল্লুম—"তিনি এখন ভারি ব্যস্ত।"

—"ব্যস্ত? কিসের জন্যে এত ব্যস্ত রে!"

আমি বল্লুম—"জাননা বুঝি? তিনি এখন হিন্দুধর্ম্ম উদ্ধার করছেন।"

পিসিমা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"সে কী রে?"

আমি বল্লুম—"সে যে কি মাথামুণ্ডু তা তিনিই জানেন।"

পিসিমা বল্লেন—"বল্‌না; আমি যে বুঝতে পারছিনা।"

আমি বল্লুম—"পিসিমা, আমিও ও-সব তেমন বুঝিনা।"

পিসিমা বল্লেন—"সে সমস্ত-দিন কি করে বল্‌ত?"

আমি বল্লুম—"দেবদেবীর স্তোত্রপাঠ করে, শাঁখঘণ্টা বাজিয়ে পূজা করে—আর কি করবে ?"

পিসিমা বল্লেন—"আহা, তা করুক! ধর্ম্মেকর্ম্মে মতি কি সবায়ের হয় রে! তাকে বলিস একদিন যেন আমার গোপালের আরতিটি সে করে দিয়ে যায়—তার হাতের আরতি দেখবার আমার বড্ড সাধ হয়েছে।"

আমি মুখ-ভার করে বল্লুম—"পিসিমা, আর আমার উপর বুঝি কোনো সাধ নেই ?"

পিসিমা তাড়াতাড়ি বল্লেন—"ওরে তোর মুখে রামায়ণ-শোনবার সাধ আজ কতদিন যে মনে পুষে রেখেছি কি বলব! তুই সেই ছেলেবেলায় মিষ্টি-মিষ্টি-করে রামায়ণ পড়তিস—সে আমার কানে এখনো লেগে আছে।"

আমি বল্লুম—"এখন একটু পড়ে শোনাবো ?"

পিসিমা বল্লেন—"রোস, আগে তোকে কিছু খেতে দিই।"

ক্ষিধে না থাকলেও পিসিমার হাতের খাবার কখনো ফেরাতে পারা যায় না। খাবারের থালাটি হাতে-ধরে অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে তিনি যখন সামনে এসে দাঁড়ান তখন তাঁর হাতের অন্ন প্রত্যাখ্যান করতে মনে হয় বুঝি সর্ব্বস্ব খুইয়ে দেউলে হয়ে গেলুম।

একখানি ছোট্ট রেকাবিতে কিছু খাবার নিয়ে এসে পিসিমা বল্লেন—"আজ বেশি-কিছু নেই—তুই যে আস্‌বি তাতো জানতুম না—গোপালের ভোগ থেকে কিছু নিয়ে এলুম।"

রেকাবিখানি হাতে-করে ধরেছি মাত্র এমন সময় দাসীটা এসে বল্লে—"পিসিমা কল্লেন কি! ঠাকুরের যে এখনো ভোগ হয়নি—খাবার এঁটো করতে দিলেন!"

পিসিমার মুখখানি একবার শুকিয়ে গেল। আমি ব্যস্ত হয়ে রেকাবিখানা নামিয়ে রেখে বল্লুম—"পিসিমা, এখন থাক্‌না; ভোগ হয়ে গেলে সন্ধ্যার পর খাব এখন!"

পিসিমা আমার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বল্লেন—"ওরে না, না, না! এতদিন পরে এলি, তোর মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নেব? গোপাল আমার কোনো অপরাধ নেবেননা—তুই খা। তুইও যে বাছা আমার গোপাল!" বল্‌তে-বল্‌তে তাঁর গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল।

পিসিমার সঙ্গে আমার দিনগুলি বেশ কাটছিল। রোজ দুপুরবেলা তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করে, তাঁকে রামায়ণ শুনিয়ে এবং তাঁর হাতের নানান্ খাবার খেয়ে আমার পেটও যেমন ভরত, হৃদয়ও তেমনি ভরে উঠত। তিনিও ভারি খুসিতে থাকতেন। মনে হ'ত আমার প্রত্যেক স্পর্শ, আমার শব্দ, আমার নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত তাঁর অন্তরের থলিটিতে অতি মমতার সঙ্গে ভরে ভরে নিচ্চেন! দাদার কথা তিনি অনবরত তুলতেন। তাঁর অভাবে পিসিমার আনন্দটি যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছেনা এ আমি খুব বুঝতে পারতুম। তিনি প্রায়ই বলতেন—"তোরা যেন কানাই-বলাই দুই ভাই—তোদের একসঙ্গে না দেখলে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হয়।"

আমি একদিন অভিমান দেখিয়ে বল্লুম—"পিসিমা, তুমি দেখচি দাদার জন্যে হেদিয়ে

উঠেছে। তুমি তাঁকে নিয়েই তাহ'লে থাক; —আমি আর আসবনা।"—বলেই উঠে দাঁড়ালুম।

পিসিমা আমার এই কথা-শুনে যেন কেমনতর হয়ে গেলেন। তিনি কিছু বলতে পারলেন না, শুধু আমার হাত-ধরে টেনে তাঁর কোলের কাছে বসিয়ে নিলেন।

এর পর থেকে দাদার কথা আমার সাম্‌নে তিনি আর পাড়তেন না। আমি দেখতুম তাঁর মন ছট্‌ফট্‌ করছে, তবু তিনি চুপ-করে আছেন—যেন উপায় নেই! তিনি নিশ্চয় মনে-মনে কামনা করতেন দাদার কথাটা আমিই পাড়ি। আমি প্রথম-প্রথম চুপ করে থাকতুম; শেষে পিসিমার মুখ দেখে এমন মায়া করত যে দাদার কথা না তুলে পারতুম না। তিনি গম্ভীরভাবে শুধু জিজ্ঞাসা করতেন—"সে কেমন আছে?" দেখতুম উত্তরের অপেক্ষায় তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে কিন্তু তিনি দেখাতে চাইতেন যেন তাঁর তেমন কোনো আগ্রহ নেই। যদি কোনো দিন বলতুম, দাদা বোধ হয় তোমায় ভুলে গেছে 'পিসিমা,' অমনি তাঁর চোখমুখ ছলছল্‌ করে উঠত। যদি বলতুম, কাজে ব্যস্ত তাই বোধ হয় তোমার কাছে আসবার সময় পায়না, অমনি তাঁর সমস্ত দেহ মন আশ্বস্ত হয়ে উঠত। পিসিমার হৃদয়টি ছিল এত কোমল যে সামান্য-একটু আঘাতও সইত না।

বাড়ি ফিরে রোজই দেখতুম পিসিমা এক-থালা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি কিছু বলে দিতেন না, কিন্তু আমি বুঝতুম এগুলি দাদার জন্যে। আমি খেয়ে এসেছি, দাদা খেতে পায়নি—মনের এ আপশোস্‌ তাঁর পক্ষে সহ্য করা শক্ত। দাদা স্বপাকে আহার ধরেছেন কাজেই তিনি সে-সব ছুঁতেন না। কিন্তু এ-কথাটা আমাকে পিসিমার কাছে চেপে যেতে হ'ত; কারণ দাদা তাঁর খাবার খান্‌নি শুনলে তিনি হয় ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেই বসে থাকবেন।

দাদার হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারটা যে তাঁর বৈঠকখানার ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ রইল তা নয়। তিনি বাড়ির ভিতরেও নানা হেঙ্গাম সুরু করে দিলেন। আমাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মধ্যে যে এতগুলো খুঁত আছে, এতদিন তা কারুর নজরেই পড়েনি। দাদা সেগুলো খুঁটে-খুঁটে বার করে স্তূপাকার করে তুল্লেন। তখন দেখা গেল এই আবর্জ্জনার মধ্যে আমাদের বাপ-পিতামহের ধর্ম্ম কোথায় তলিয়ে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এবং ক'পুরুষ ধরে আমরা এমন-সব শাস্ত্রছাড়া অনাচার করে বসে আছি যার প্রায়শ্চিত্তের বিধান মনুর শাস্ত্রের মধ্যে মাথা-খুঁড়ে মরলেও মেলেনা। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে শাস্ত্র মান্‌তে গেলে আমরা যে হিন্দু আছি একথা মানা চলেনা। আমি হতাশ হয়ে বল্লুম—"তবে উপায়?" দাদা বল্লেন—"এইটেই ত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব—কিছুতেই এর মরণ নেই; বহুকালের তপস্যায় এ অমর হবার বর লাভ করেছে।"

পাড়ার এক মিশনারি-স্কুলে আমাদের বোন তিনটি পড়ত। দাদা বল্লেন—"এ সব আর চলবেনা। ওদের আবার নূতন-করে শিক্ষার পত্তন করতে হবে। ভোরবেলা

শিব-পূজা করা চাই, দুপুরবেলা নানা দেব-দেবীর স্তোত্র এবং মন্ত্র মুখস্থ এবং সন্ধ্যা-বেলা, উপদেশ;—আমি সেই সময় পুরাণ থেকে সতীসাবিত্রীর উপাখ্যান পড়ে-পড়ে শোনাবো।"

ঠাকুমা দাদার কথায় সায় দিলেন; কিন্তু মা রাজি হ'লেননা। তিনি দাদাকে বল্লেন—"তোর দু-দিনের সখ দু-দিনেই মিটে যাবে—মধ্যে থেকে মেয়ে-তিনটের পড়াশুনো মাটি হবে।" তাই শুনে দাদা চটে-উঠে মায়ের মুখের উপর এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লেন! তার মধ্যে অনেক-গুলো সংস্কৃত শ্লোক ছিল এইটুকু শুধু আমার মনে আছে।

দাদা ফুস্‌লে-ফাস্‌লে দেখি কাজ হাসিল করেছেন। এর মধ্যে ঠাকুমা নিশ্চয় ছিলেন, নইলে হ'তনা। মা যে ঠাকুমার মুখের উপর কথা বলতেন না এইটেতে দাদার সুবিধে হয়ে গিয়েছিল। বুড়ি, নেড়ি আর ফুলির স্কুল-যাওয়া দিন-পাঁচ-সাত বন্ধ রইল দেখলুম। তারপর একদিন সকালে দেখি তারা আবার স্কুলের বই খুলে বসেছে। দাদা কোত্থেকে ছুটে এসে বল্লেন—"কৈ তোরা আজ শিবপুজো করতে গেলিনে?"

বুড়ি বল্লে—"বাবা! ভোরবেলা এই শীতে ওঠা যায়!"

নেড়ি বল্লে—"রোজ সন্ধ্যেবেলা অং-মং-করে তুমি কি বকে যাও ভাল্‌-লাগেনা বাপু!"

ফুলি বল্লে—"অ্যাঁ-া! ওঁর জন্যে আমাদের সেই রূপকথার শেষটা শোনা হ'ল না!"

বলেই তিন-বোনে ছুটে পালালো।

দাদা তাদের ধরে-এনে খুব ধমক দিতে লাগলেন। ঠাকুমা বল্লেন—"ওরে, ওরা ছেলেমানুষ—এই শীতে কি ভোরবেলা উঠতে পারে? যখন নাত-বৌ আসবে তাকে তোর ঐ মন্ত্রতন্ত্র শেখাস! আহা, ওরা দু-দিন-বাদে পরের বাড়ি চলে যাবে—ওদের অত ধম্‌কাস্‌নে।"

ঠাকুমার এই কথায় দাদার নিশ্চয় অভিমান হয়েছিল, নইলে সে-দিন বাড়ির ভিতরে খেতে এলেন না কেন? ঠাকুমা অনেক-করে ডাকাডাকি করলেন তবু এলেন না। তাঁর সেই পূজোর ঘরে স্পিরিট ষ্টোভে মাল্‌সা চাপিয়ে ভাতে-ভাত-করে খেলেন। এতে ঠাকুমার ভারি ভাবনা হ'ল। মা তাঁকে বল্লেন—"কিছু ভেবোনা মা তুমি! ওর পাগ্‌লামির ঘোর দু-দিনেই কেটে যাবে; ওকে যত বল্‌বে, তত বাড়াবে।"

ঠাকুমা বল্লেন—"ও ঠিক ওর দাদা-মশায়ের মতো হয়েছে। কখন্ যে কী খেয়াল চাপে কিচ্ছু ঠিক নেই।"—বলে' দাদামশায়ের কবে বুঝি কি-একটা যজ্ঞ করবার সখ হয়েছিল তার আমূল বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন:-"কাশী থেকে এল ফর্দ্দ —ভূর্জ্জিপত্রে লেখা, যেন একখানা পুঁথি। কোত্থেকে সব বিকটাকার লোক এসে হাজির —দেখলে তাদের ভয় করে! উঠোনটাকে খুঁড়ে-চষে একাকার করে ফেল্লে। কতক-গুলো মাটির ঢিপি তৈরি হ'ল। জলে-কাদায় বাড়ি প্যাচ্-প্যাচ্ করতে লাগল। তিন দিন ধরে যজ্ঞ চল্‌ল; তার পর সেই যজ্ঞের ধোঁয়ায় কর্ত্তার চোখ এমন ফুলে উঠল যে

ছ'টি মাস তিনি চোখে হলদে কাপড় বেঁধে বিছানায় পড়ে রইলেন। তার পর থেকে ঐ হোমের ধোঁয়ার উপর তিনি এমন গেলেন চটে যে, বৌমা মনে পড়ে বোধ হয়, তোমার বিয়ের সময় হোমই দিলেন বন্ধ করে! পুরুতরা মহা চেঁচামেচি করতে লাগল। কর্ত্তা ধমকে উঠে বল্লেন, যাও, যাও, ওর জন্যে কিছু মূল্য ধরে দিলেই হবে! আমি ত ভয়ে কোনো কথা বলতে পারলুম না।"

দাদা তাঁর দলে আমাকেও পেলেন না, ছোট বোন্-তিনটিকেও পেলেন না। ঠাকুমার প্রতি বোধ হয় তাঁর তত লোভ ছিল না। বাকি রইলেন মা। তাঁকে বেশী-কিছু উপদেশ দিতে গেলেই তিনি ধমক-দিয়ে উঠতেন—"থাম্, থাম্, তোর আর ফাজ্‌লামি করতে হবে না।" দাদা এই সব দেখে-শুনে একদিন অভিমান করে বল্লেন—"এখানে আমার আর থাকা চলেনা দেখচি;—চারিদিকে যে অনাচার!" আমি ভাবলুম বলি—"শুধু এখানে কেন, তাহলে তোমার থাকাই চলে না।" কিন্তু দাদা যে অভিমানী, না-বলাই ভালো। ঠাকুমা দাদার কথা শুনে মহা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। মাকে বল্লেন—"বৌমা, তোমার ছেলে বলে কি গো! তুমি বাপু ওর একটা বিয়ে-থা দিয়ে দাও;—শেষে কি ও সন্ন্যাসী হয়ে যাবে?" মা বল্লেন—"তা যাক্‌না;—সন্ন্যাসী-হওয়ার কত মজা একবার দেখুক না!"

মায়ের এই কথায় দাদার বুকের কোমল পর্দ্দাটিতে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগল। তা না হলে তিনি মায়ের মুখের উপর দুটো কথা শুনিয়ে 'না' দিয়ে ছাড়তেন না। তিনি একেবারে চুপ-হয়ে রইলেন। দাদা ছিলেন আদরের কাঙাল। তাঁর মনের-মতন কাজ হচ্ছিল না বলে তিনি ভাবতেন তাঁর আদর বুঝি বাড়ির চারিদিক থেকে ক্রমেই শুকিয়ে আসছে। তাই তিনি অনেক সময় মুখটি শুকিয়ে থাকতেন। তার পর মা-হয়ে যখন এমন ভাব দেখালেন যে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেও তাঁর কোনো ভাবনা নেই তখন দাদার মনে যে কতখানি লাগল তা আমি তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম। আমি শপথ-করে বলতে পারি তিনি যে বাড়ি-ছাড়বার কথাটা বলেছিলেন সে তিনি সত্যিই বাড়ি ছেড়ে যাবেন বলে' বলেন নি; তিনি বলেছিলেন এই আশায় যে তাঁর বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় বাড়ি-সুদ্ধ সকলের মন কাতর হয়ে তাঁকে চারদিক থেকে স্নেহের বন্ধন দিয়ে ঘিরে ধরবে। এইটের প্রতি তাঁর মনের লোভ ছিল। তিনি চুপ-করে দাঁড়িয়ে রইলেন; তাঁর চোখ দেখে আমার মনে হ'তে লাগল তিনি সাম্‌নে যা দেখছেন তা যেন একটা শুষ্ক মরুভূমি! দাদার সেই রকম মুখ দেখে আমার ভারি মন-কেমন করতে লাগল। আমি বলে উঠলুম—"দাদা, পিসিমা তোমায় ডেকেছেন!" পিসিমার নাম শুনেই দাদার দৃষ্টির সেই শুষ্কতা কেটে গিয়ে চোখদুটি ভরে উঠল। আমি তখনই তাঁর হাত-ধরে টেনে একেবারে পিসিমার কাছে হাজির করলুম।

দাদাকে দেখে পিসিমার বোধ হয় আহ্লাদের চেয়ে বিস্ময়টা বেশি হ'ল।

তিনি তাঁর দিকে চেয়ে-চেয়ে বলতে লাগলেন —"ওমা, এ কি চেহারা করেছিস? আমি ভাবলুম, কে বুঝি গোঁসাইঠাকুর এল।"

দাদা চুপ-করে রইলেন।

পিসিমা বল্লেন—"ওরে নারে, না! সত্যি তোকে কী সুন্দর দেখাচ্চে কি বলব! ইচ্ছে হচ্চে তোকে একটা গড় করি!"

দাদা বল্লেন—"পিসিমা, কেমন আছ?"

পিসিমা বল্লেন—"বাবা, আমার আবার থাকা-থাকি! তোরা ভালো থাকলেই আমি ভালো থাকি।"—বলে' তিনি দাদার গায়ে হাত-বুলোতে লাগলেন। বুলোতে-বুলোতে বল্লেন—"হ্যাঁরে যোগীন, তুই না কি ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন দিয়েছিস? আহা, বেশ বাবা, বেশ!"

দাদা উৎসাহিত হয়ে বল্লেন—"দেখ পিসিমা, আমাদের কারো ধর্ম্মকর্ম্মে মন নেই বলেই ত আমরা অধঃপাতে যেতে বসেছি।"

পিসিমা নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্লেন—"তোর এই বুড়ো পিসিমাকে ভুলিস্‌নে বাবা;—একেও তোর ধর্ম্মকথা কিছু-কিছু শোনাস্‌।"

দাদা বল্লেন—"নিশ্চয়! তোমাকে পিসিমা অনেক-কথা আমার বলবার আছে।"

পিসিমা বল্লেন—"তা কি আমি জানিনে বাবা! পিসিমাকে সকল-কথা না বল্লে ছেলেবেলায় তোর ঘুমই হ'ত না—"

দাদা বাধা দিয়ে বল্লেন—"না না, এ সে-সব ছেলেমানুষী কথা নয়! এ সব কথা তোমায় মন দিয়ে শুনতে হ'বে—পালন করতে হবে।"

পিসিমা বল্লেন—"শুনব বৈ-কি বাবা! তোর ঐ মিষ্টি-মিষ্টি কথা শোনবার জন্যেই তো হাঁ-করে বসে থাকি।"

দাদা বল্লেন—"আমি যা-যা বলব সব ঠিক-ঠিক করতে হ'বে কিন্তু।"

পিসিমা বল্লেন—"সে কি আর বলতে হবে রে তোকে!"

দাদা মহা খুসি হয়ে উঠলেন। তাঁর এই কাজে পিসিমার মতন এমন বুক-ভরা সহানুভূতি যে কোথাও পান্‌নি সে-দুঃখ যেন একনিমেষে ডুবে গেল। দাদা বলে উঠলেন—"দেখ পিসিমা, আমার মনে হয় তুমিই আমার সত্যিকারের মা!"

আনন্দের আবেগে পিসিমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

দাদা তখনি হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—"চল্লুম পিসিমা, আমার সময় হয়ে এল।"—বলেই তিনি ছুট দিলেন।

পিসিমা চীৎকার করে বলতে লাগলেন—"ওরে শোন্, শোন্!" সে-কথা দাদার কানেই গেলনা।

পরদিন দুপুরোস্তে দাদা দেখি হন্‌-হন্‌ করে বেরিয়ে চলেছেন। আমি বল্লুম—"কোথা যাও দাদা?"

দাদা বল্লেন—"পিসিমার কাছে।"

আমি বল্লুম—"চল, আমিও যাবো।"

দাদা মনে-মনে একটু খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগলেন, কিন্তু মুখে কিছু বল্লেন না। পিসিমার ঘরে হাজির হয়েই চাদরের ভিতর থেকে একখানা বই বার-করে তিনি বল্লেন—"পিসিমা, এই মনুসংহিতা এনেচি—এর থেকে আমি ঠিক-করে বেঁধে দেব তোমার কি-কি করা উচিত।"

পিসিমা বল্লেন—"আচ্ছা বেশ; এখন একটু জিরিয়ে নে দেখি!"

দাদা বসে' বইয়ের মধ্যে নীল পেন্সিলের দাগ-দেওয়া অংশগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিতে লাগলেন। পিসিমা বল্লেন—"তোরা দু ভায়ে ততক্ষণ গল্প কর, ময়দা মাখা আছে, আমি চট্-করে লুচি ভেজে নিয়ে আসি!"

দাদা বইখানা মুড়ে রেখে চুপ-করে বসে কি ভাবতে লাগলেন। আমি সেখানা তুলে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে-দেখতে দাদাকে বল্লুম—"দেখ দাদা, আমি তোমার কথা ভেবে দেখেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে কাজে লাগতে হ'লে আমার আগে একটু তৈরি হয়ে নেওয়া দরকার। এই ছুটিতে কিছু-কিছু শাস্ত্রীয় বই পড়ে নেব ভাবছি। কি, কি পড়ি বল দেখি?" দাদা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে-দিয়ে দেখতে লাগলেন; বোধ হয় সন্দেহ হচ্ছিল আমি ঠাট্টা করছি। দাদা কি বলতে যাবেন এমন সময় পিসিমা লুচির থালা-হাতে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঝি এসে দুখানা আসন পেতে দিয়ে গেল। আমি বসতে যাচ্ছি এমন-সময় দাদা বল্লেন—"আমি তো খাবো না।"

পিসিমা চিন্তিত হয়ে বল্লেন—"খাবিনে কেন? অসুখ করেছে না কি?"

দাদা বল্লেন—"না, অসুখ করেনি।" বলে তিনি মনুসংহিতার পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

পিসিমা বল্লেন—"অসুখ করেনি ত খাবিনে কেন?"

দাদা বই থেকে মুখ তুলে দৃঢ়-কণ্ঠে বল্লেন—"আমি যে ব্রাহ্মণ!"

পিসিমা কথাটা বুঝতে পারলেন না; হাসতে-হাসতে বল্লেন—"তোকে তো আমরা কেষ্টাকলুর জামাই বলি;—তুই ব্রাহ্মণ হ'লি কবে থেকে?"

দাদা ভুরু-কুঁচকে বলে উঠলেন—"না পিসিমা, আমি খেতে পারব না!"

পিসিমা বিস্মিত-হয়ে বল্লেন—"কেন বল্ ত?"

দাদা বল্লেন—"তোমার হাতে খাওয়া চলবে না!"

পিসিমা বল্লেন—"শোনো একবার কথাটা! তুই যে চিরকাল আমার হাতে খেয়ে এলিরে! ছেলেবেলায় আমি হাতে-কুরে ভাত খাইয়ে না-দিলে তুই যে খেতিস না।"

দাদা বল্লেন—"তার জন্যে আমায় প্রায়শ্চিত্ত-করে শুদ্ধ হ'তে হবে!"

পিসিমা কথাটা শুনেই থম্‌কে গেলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হ'ল যে তাঁর হাতে খাওয়াটা আমাদের পক্ষে এতই সহজ যে এর মধ্যে কোনো বাচ-বিচার আছে একথা কোনো দিন তাঁর মনেও আসেনি। এমন-কি, দাদা যখন নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে ফুক্‌রে উঠলেন সে-সময়ও তাঁর মনে ও-কথাটা জেগে ওঠেনি। কিন্তু হঠাৎ এই প্রায়শ্চিত্তের নাম শুনে তিনি এমন থম্‌কে গেলেন যে তাঁর মুখ পাথরের মতো অসাড় হয়ে গেল। তিনি যে রাগ করলেন—তা মনে হ'ল না; বেদনা পেলেন—তাও মনে হ'ল না। পাথরের মূর্ত্তিটির মতো তিনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। দাদা সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে মুখ নীচু করলেন। আমি একবার

ডাকলুম—"পিসিমা!" তাঁর ঠোঁটটি একটু কাঁপল মাত্র—কোনো শব্দ হ'লনা। আমি ছুটে-গিয়ে খাবার আসনে বসে পড়লুম। দাদা আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি যতক্ষণ খেলুম—পিসিমা চুপ-করে দাঁড়িয়ে রইলেন—একটি কথাও কইলেন না। আমি কত আব্দার করলুম, কত অভিমান করলুম, তিনি কোনো সাড়া দিলেন না। আমি দাদাকে ধরে-আনবার জন্যে অস্থির হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলুম। বাড়ি এসে শুনলুম তিনি গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেছেন। আমি একলা আমার ঘরে বসে পিসিমার কথা ভাবতে লাগলুম।

এর পরে যখনই পিসিমার কথা মনে করতুম, তাঁর সেই অসাড় মূর্ত্তিটি আমার চোখের উপর ভাসতে থাকত, আমি আর তাঁর কাছে যেতে পারতুম না। নির্লজ্জ দাদা কিন্তু যাতায়াত বন্ধ করেন নি। তিনি আমার কাছে এসে প্রায়ই শুনিয়ে যেতেন—"পিসিমা যে এমন আশ্চর্য্য ভক্তিমতী রমণী তা আগে জানতুম না।" শুনলুম ইতিমধ্যে তিনি তাঁকে দিয়ে গোটাকতক প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন। দাদা যে তাঁর কাছে খুবই উৎসাহ পাচ্ছিলেন সে তাঁর হাবভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু আমি ভাবতুম না-জানি কী মর্ম্মান্তিক মূল্য দিয়েই দাদার এই খেয়ালগুলোকে পিসিমার পুষতে হচ্ছে! দাদা একদিন নতুন উৎসাহের ঝোঁকে এসে বল্লেন—"নবীন, তুমি যে সেদিন বলছিলে আমার সঙ্গে যোগ দেবে—"

আমি চীৎকার করে বলে উঠলুম—"তোমার সঙ্গে যোগ?—তোমার মতো নিষ্ঠুরের সঙ্গে!"

দাদা উঠে চলে যাচ্ছিলেন, আমি ধরে বল্লুম—"শোনো, তুমি যে সেদিন পিসিমার সঙ্গে অমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করলে তার জন্যে তোমার অনুতাপ হচ্ছেনা?"

দাদা বল্লেন—"দেখ নবীন, তোমার সঙ্গে যখন আমার মতের মিল নেই, তখন এসব কথা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইনে।"

আমি বল্লুম—"এ তো মতের কথা নয়!—এ হৃদয়ের কথা!"

দাদা বল্লেন—"শুধু হৃদয় নিয়ে ত মানুষ নয়—তার উপরে আত্মা আছে—তার সদ্গতি করা চাই!"

আমি বল্লুম—"পিসিমাকে অমন-করে আঘাত দেবার তোমার কোনো অধিকার নেই!"

দাদা বল্লেন—"পিসিমা যে তাঁর নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে চলছিলেন, তাই ত তাঁকে এই সংঘর্ষের আঘাত খেতে হ'ল। তাঁর অধিকার কতটুকু তা আমি তাঁকে এখন স্পষ্ট করে নির্দ্দেশ করে দিচ্ছি।"

আমি বল্লুম—"তার মানে তুমি তাঁকে পলে-পলে বধ করছ।"—আমি আরো বলতে যাচ্ছিলুম দাদা আমার হাত ছাড়িয়ে চলে গেলেন।

আমি সেদিন দুপুরবেলা যখন পিসিমা'র কাছে গেলুম, তখন তিনি দালানে বসে রামায়ণ শুনছিলেন। আমাকে দেখে পড়া থামিয়ে গল্প করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে আমি বল্লুম—"পিসিমা আমার ক্ষিধে পেয়েছে।" পিসিমা বল্লেন—"তোর মিথ্যে

কথা! এই খেয়ে এলি, এরই মধ্যে ক্ষিধে?" আমি বল্লুম—"না পিসিমা, আজ আমার ভালো-করে খাওয়া হয়নি।" পিসিমা আমার মুখের দিকে সস্নেহে চাইতে লাগলেন; তাঁর মুখ-শুকিয়ে উঠল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন—"আজ তো ঘরে কিছু নেই বাবা!" আমি বল্লুম—"দুখানা লুচি ভেজে দাওনা—নুন দিয়ে খাবো।" পিসিমা বল্লেন—"আহা নুন দিয়ে খাবি কেন?"—বল্‌তে-বল্‌তে তাঁর চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠল। আমি বলে উঠলুম—"পিসিমা, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে!" পিসিমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, বল্লেন—"রোস্ দেখি!" বলে আস্তে-আস্তে তিনি চলে গেলেন। অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবু পিসিমা ফিরে এলেন না। অন্য সময় দেখেছি তিনি আমাদের সাম্‌নে বসেই ময়দা মাখতে-মাখতে গল্প করতেন—আজ কিন্তু তা করলেন না। আমি দেরী দেখে তাঁর শোবার ঘরের দিকে গেলুম। গিয়ে দেখি ঘর খিলবন্ধ। আমি কতক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করলুম—কোনো সাড়া পেলুম না। মনে হ'ল যেন ভিতর থেকে একটা কান্নার নিশ্বাস আসছে।

বাড়ি ফিরে দেখি আমার ঘরে সতীশ-যতীশ দুই ভাই বসে আছে। আমি বল্লুম—"কি সৌভাগ্য! আজ যে আমার ঘরে? দাদার ঘরে যাওনি?"

সতীশ বল্লে—"অনেক দিন তোমার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া হয়নি তাই একবার এলুম।"

যতীশ বল্লে—"নবীন, তোমার ঘরটি বেশ লাগছে ভাই। ভারি একটি স্নিগ্ধ ভাব আছে;—শরীরটা বেশ-একটু আরাম পায়।"

সতীশ বল্লে—"তোমার দাদার ঘর থেকে এসে মনে হচ্ছে যেন বুকটা হাঁফ-ছেড়ে বাঁচল! ওখানে যে ধুনোর ধোঁয়া!"

যতীশ বল্লে—"আমার তো ভাই ঐ ধোঁয়ায় শিরঃপীড়া হব্বার যো হয়েছে।"

সতীশ বল্লে—"তোমার দাদাকে কতবার বলেছি, ঐ ধোঁয়াটা একটু কম কর, তোমার দাদা সে কথা কানেই তোলেনা। তার বোধ হয় বিশ্বাস যে ঐ পবিত্র ধোঁয়া যত বেশী পাকিয়ে উঠবে বাহির এবং অন্তরের ময়লা ততই সাফ্ হয়ে গিয়ে আমরা শুদ্ধ হয়ে উঠব।"

হঠাৎ দেখি মহিমচন্দ্র দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে এল। তার মতন ছেলেও যে দাদার আড্ডায় যোগ দিয়েছে তা আমি জানতুম না। শুনলুম এই তার প্রথম দিন। সে আমার ঘরের চারদিকটায় চোখ ফিরিয়ে বল্লে—"বাঃ তোমরা যে তোফা বসে আছ হে! আমার ভাই, এতক্ষণ সিগারেট না খেয়ে পেট ফুলছিল। এ তোমাদের কি-রকম ক্লাব হে, যে সিগারেট খাবার যো নেই?" বলেই রূপোর কেস্ বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সজোরে এক টান মেরে প্রায় এক-এঞ্জিন ধোঁয়া ছেড়ে দিলে।

আমি বল্লুম—"সন্ধ্যে হ'ল, চায়ের আয়োজন করা যাক্—কি বল?"

মহিম মহা ফুর্ত্তির সঙ্গে বল্লে—"বহুৎ আচ্ছা!" যতীশ এবং সতীশ একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব দেখাতে লাগল। আমি একটা

ষ্টোভে চায়ের জল এবং আর-একটায় ডিম-সিদ্ধ চড়িয়ে দিলুম। যতীশ বল্লে—"ওহে নবীন, ডিমটা আজ থাক্।" মহিম ভ্রূকুটি করে বল্লে—"মাইরি!" তারপর যখন ডিম ও চা তৈরি হল তখন মহিমের গলার এবং গায়ের জোরের কাছে যতীশ-সতীশের মনের বল বেশীক্ষণ টিঁকল না। আমার ঘরে খুব হল্লা চলতে লাগল। একা মহিমই একশ! তার গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে দাদার সন্ধ্যা-আরতির ঘণ্টার ক্ষীণ শব্দ আমাদের কানে এসে বাজতে লাগল।

আমার ঘরে আড্ডা ভেঙে গেছে, দাদার ঘরের গুঞ্জনও আর শোনা যাচ্চে না, এমন সময় হরিপদ চোরের মতো আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলে। ছেলেটি বড় ঠাণ্ডা। আমার তাকে ভারি ভালো লাগত। সে আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, আমাদের নীচে পড়ে, আমাদের সঙ্গে সম্ভ্রম রেখে কথা কয়। আমি বল্লুম—"এস, হরিপদ বোস। এত রাত্রে কোথা থেকে?"

—"আজ্ঞে এতক্ষণ ঐ দাদার ঘরে ছিলুম।" এই কথাটুকু বলেই সে চুপ করে রইল। আমি তার মুখ-দেখে বুঝলুম সে কিছু আমায় বলতে এসেছে, কিন্তু সঙ্কোচ হচ্চে।

আমি বল্লুম—"হরিপদ, কি মনে করে এসেছ বলনা।"

হরিপদ যেন অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ চমক-ভেঙে বল্লে—"আজ্ঞে না, কিছু না। রাত হ'ল আপনাকে আর বিরক্ত করবনা।" বলেই সে উঠে দাঁড়াল।

আমি বল্লুম—"সত্যি বলতে কি হরিপদ, তোমার ঐ মনের কথাটি না শুনলে রাত্রে আমার ঘুম হবেনা।"

হরিপদ চোখ নীচু করে ধীরে ধীরে বলতে লাগল—"দেখুন, নবীনবাবু আপনার দাদা আমার উপর ভারি চটে গেছেন।"

আমি বল্লুম—"কেন বল ত?"

হরিপদ বল্লে—"দেখুন আমি ওঁকে ভক্তি করি, উনি আমার অনেক উপকারও করেছেন, কিন্তু—"

আমি বল্লুম—"কিন্তুটা কি?"

সে বল্লে—"কিন্তু তিনি বলেন আমি যে শূদ্র একথাটা ভুল্লে চলবেনা, আমাকে শূদ্রের মতোই থাকতে হবে।"

আমি বল্লুম—"তার মানে?"

—"তার মানে ওঁদের ঐ ঘরে আমার আসনে বসবার অধিকার নেই—আমাকে মাটিতে বসতে হ'বে।"

—"তুমি তাতে রাজি হয়েছ?"

—"আজ্ঞে অত লোকের সামনে দাদার মুখের উপর আমি কিছু বলতে পারিনা, মাটিতেই বসে থাকি। কিন্তু আমার মনে যে কি হয় তা আপনি বুঝতে পারছেন।"

আমি রেগে বল্লুম—"তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেনা কেন?"

হরিপদ বল্লে—"আপনি ত জানেন আপনার দাদা আমার কত উপকার করেছেন।"

আমি বল্লুম—"তা বলে দাদা যা-খুসি করবেন? এ দাদার ভারি অন্যায়!"

হরিপদ বল্লে—"দেখুন আপনার দাদাকে আমি ভালোবাসি; উনি আমাকে যে-রকম

স্নেহ করেন তাতে আমার মনে হয় উনি আমার সত্যিকার দাদা। ওঁর জন্যে না হয় ঐটুকু অপমান সহ্য করলুম! কিন্তু উনি এখন বলেন শুধু অমন চুপ-করে বসে থাকলে চলবেনা, আমাকে কাজে লাগতে হ'বে।"

আমি বল্লুম—"কাজটা কি?"

—"উনি বলেন আমাদের বিধিদত্ত কাজ যা নির্দ্দিষ্ট আছে তাই আমাকে গ্রহণ করতে হ'বে।"

আমি বল্লুম—"সেটা কি?"

হরিপদ বল্লে—"সেবা!" বলেই সে একটু চুপ-করে আবার বলতে লাগল—"উনি বলেন প্রথমে আমায় সামান্য সেবা নিয়ে আরম্ভ করতে হ'বে—যেমন রোজ খানিকক্ষণ করে ব্রাহ্মণের পদসেবা। দাদার পদসেবা না হয় একটু করলুম, সে আমি খুসি হয়ে করতে পারি, কিন্তু উনি চান ওঁর দলে যত ব্রাহ্মণ আছে সকলের পায়ে হাত বুলোতে হ'বে। এ কী করে পারি বলুন দেখি!"

আমি বল্লুম—"দাদা ক্ষেপে গেল নাকি!"

হরিপদ বল্লে—"উনি ঐ নিয়ে ভারি জিদ ধরেছেন। ওঁর দলেরই অনেক ব্রাহ্মণ এতে মহা আপত্তি করছেন; তাঁরা বলছেন, থাম্‌কা একজন এসে পা টিপতে থাকবে এ কেমনতর হবে! এই নিয়ে দলের মধ্যে মহা ঝগড়া বেধে গেছে।"

আমি রেগে বল্লুম—"দেখ হরিপদ, তুমি যদি দাদার এই জবরদস্তি মেনে নাও তাহ'লে আমি তোমার মুখদর্শন করব না।"

হরিপদ বল্লে—"যার-তার পায়ে হাত দেওয়া আমার দ্বারা হবেনা—কেটে ফেল্লেও না।"

আমি হরিপদর পিঠ-থাবড়ে বল্লুম—"এই ত ঠিক কথা!"

এর দিন-দুই পরে দুপুরবেলা দাদা চটে এসে বল্লেন—"দেখলে, হরিপদর আক্কেলটা দেখলে! তার জন্যে আমার কাজ আটকে রয়েছে; তাকে দুদিন ধরে ডাকাডাকি করছি তবু রাস্কেলের দেখা নেই। অকৃতজ্ঞ কোথাকার!"

আমি মুখে কিছু বল্লুম না। মনে মনে ভাবলুম—দাদার হরিপদও এবার গেলেন!

ক্রমে ব্যাপার মন্দ হ'ল না। মহিমচন্দ্রের দৌলতে দাদার আড্ডা দিনে-দিনে কৃশ হয়ে আমার আড্ডা স্থূল হ'য়ে উঠতে লাগল। দাদার ঘরের ছেলেদের দিকে কটাক্ষ করে সে বলত—ডিম, চা, চুরুট যেখানে বুদ্ধিমানের বাসা সেইখানে। তার কথায় বোকারা চট্‌পট্ বুদ্ধিমান হয়ে উঠতে লাগল। তাতে করে আমার ডিমের খরচটা একটু বেশী হতে লাগল বটে কিন্তু তা আমি গ্রাহ্য করলুম না। দাদার শিষ্যেরা প্রথম-প্রথম ভদ্রতার খাতিরে ধীরে ধীরে আমার ঘরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলেন এবং ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই তাড়াতাড়ি উঠতে পারলেন না। কাজেই তাঁদের আসন কায়েমী হয়ে যেতে লাগল। তার পর, মহিম-চন্দ্র সমস্ত আটঘাট গানে গল্পে এমন ভরপুর করে রাখত যে গোলে-পালাবার ফাঁক কোথায়? তার উপর সে একখানা প্রহসনের রিহার্সাল জুড়ে দিয়ে আসর সরগরম করে তুলেছিল। দাদা এক-একদিন নিজের ঘরে লোক না পেয়ে আমার ঘরের পাশ দিয়ে কট্‌মট্ করে চেয়ে চলে যেতেন। আমি মজা দেখে মনে-মনে হাসতুম।

এর পর ব্যাপার গিয়ে কোথায় দাঁড়াল সহজেই অনুমান করা যায়। শেষে এমন অবস্থা হল যে দাদার পুজোর মন্দিরে সন্ধ্যা-প্রদীপটি জ্বালবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন তাঁকে নিজের হাতে ঘর-পরিষ্কার থেকে আরম্ভ করে পূজা, আরতি সব একাই করতে হ'ত। তাতে তাঁর অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছিল; এবং বাড়ির ভিতর শোনা গেল প্রতিদিন হবিষ্যি করে তাঁর শরীরও কাহিল হয়ে এসেছে। তার পর, তাঁকে দেখলেই এখন পাড়ার ছেলেরা পাশ-কাটিয়ে পালায়। অতএব —অতএব যে কি হল তা না বলাই ভালো। দাদা প্রথমটা খুব চটে উঠে শেষে নিশ্চয় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কারণ একদিন আমাকে একলা-পেয়ে তিনি বল্লেন—"ভাখ্, আমাদের জাতটা একেবারে গেছে—কি বলিস!"

আমি বল্লুম—"নিশ্চয়।"

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"তবে বৃথা চেষ্টা।"

আমি বল্লুম—"তার আর সন্দেহ!"

আমার এই কথাটাতে দাদা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর মন অনেকটা আশ্বস্ত হল দেখলুম। এর পর থেকে তিনি আমার জমাট আড্ডার আশপাশ দিয়ে মধ্যে মধ্যে লোলুপ দৃষ্টিতে চলে যেতে লাগলেন। নিজে সেধে আসতে তাঁর লজ্জা হবারই কথা, তাই আমি তাঁকে একদিন সন্ধ্যেবেলায় চায়ের নিমন্ত্রণ করলুম। তিনি বল্লেন—"চা তো আমি খাব না। তবে একবার ঘুরে যেতে পারি। কিন্তু আমার একটা কাজ আছে, তাই ভাবছি।"

দাদার কাজ যে কোথায় গেল জানিনা, সন্ধ্যাবেলা দেখি তিনি ঠিক হাজির হয়েছেন। তবে চা খেলেন না।

দাদা লোক না পেলে থাকতে পারেন না; কাজেই একটু-একটু-করে আমার দলে আসতে-আসতে শেষে জমে যেতে লাগলেন। তার পর, মহিম তাঁকে বুঝিয়েছিল যে হিন্দুধর্ম্ম-উদ্ধারের প্রকৃষ্ট পথ হচ্চে হিন্দুধর্ম্ম-মূলক প্রহসন বা নাটকের অভিনয় করে দেশসুদ্ধ লোককে দেখানো। নাটকের দ্বারা যতটা কাজ হয় এমন আর কিছুতে নয়;—নাটকই যে একটা জাতকে তোলবার প্রধান উপায় একথা বড় বড় ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করে গেছেন। সেইজন্য দাদা মহা উৎসাহের সঙ্গে মহিমকে নিয়ে হিন্দুনাটক অভিনয়ের প্ল্যান করতে লেগে গেলেন। কাজেই তাঁকে রোজই আমার আড্ডায় আসতে হ'ত। সকলকার সঙ্গেই তিনি মিশতেন কেবল চায়ের পেয়ালাটি ছুঁতেন না। শেষে সেটাও টিঁকলনা; কারণ মহিমচন্দ্র একদিন বল্লে কোন্ বাংলা মাসিকপত্রে নাকি বেরিয়েছে যে চা-জিনিষটা পুরাকালে হিন্দুদের মধ্যে চলত। তবে ডিম নিয়ে তর্ক সহজে মিটল না। দাদার অনেক বাহুল্য ঝরে গেল বটে কিন্তু তিনি টিকিটি চট্ করে ত্যাগ করতে পারলেন না। কারণ তিনি বোধ হয় মনে করতেন আমার এবং আমার জাতীয় লোকের পরিহাসের বজ্র ধরবার জন্যে ওটাকে খাড়া রাখা দরকার। যাই হোক, বেচারা শিখাও যে দিন-দিন শুকিয়ে আসছিল এ আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার হত না।... ...

ল-কালেজ খুলতে পড়াশুনার চাপে দাদার

ঘাড়ের ভূতটা যে কোথায় পালাল তারও টিকি দেখা গেল না। তখন একদিন দাদাকে বল্লুম—"দাদা, পিসিমার হাতে খেতে তোমার এখন আর কোনো আপত্তি নেই বোধ হয়।"

দাদা বল্লেন—"বড় কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস্—অনেক দিন তাঁর কাছে যাওয়া হয় নি, না?"

আমি বল্লুম—"তুমি তাঁকে কি মন্ত্র দিয়েছ, তেষ্টায় মরে যাচ্ছি বল্লেও আমার মুখে এক ফোঁটা জল দিতে চান না।"

দাদা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"তাই না কি?"

আমি বল্লুম—"বেশী পীড়াপীড়ি করলে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে' ওঠেন—ওরে অমন করে বলিসনি—তোর পায়ে কি আমি মাথা-মোড় খুঁড়ে মরব!"

দাদা বল্লেন—"নিশ্চয় তুই পিসিমাকে চটিয়েছিস্! তোর ঐ সব ছেলেমানুষী উৎপাতগুলো সহ্য করবার শক্তি কি তাঁর এ বয়সে আছে?"

আমি বল্লুম—"দাদা—"

দাদা বাধা দিয়ে বল্লেন—"জানি জানি, তোকে আমি খুব চিনি—তোর আর ইয়ে করতে হ'বে না। তোর এতটা বয়েস হ'ল পিসিমার মুখ চেয়ে একটু বুঝে চলতে পারিস্না। তোর মতন বুড়োধাড়ির ধকল কি সামান্য?"

আমি বল্লুম—"দাদা তুমি ভুল করছ—"

দাদা জোর দিয়ে বল্লেন—"আমি ঠিক বলছি। চ-দিকিন তাঁর কাছে, কেমন তিনি আমায় ফেরান দেখি!"

আমি বল্লুম—"তুমি গিয়ে হাত পাতলে হয়তো তিনি ফেরাতে পারবেন না।"

দাদা বল্লেন—"তাই বল; অপরাধ করবি তুই নিজে, আর দোষ হবে পিসিমার।"

ব্যাপারটা যে তা নয়—এ নিয়ে দাদার সঙ্গে আর তর্ক করলুম না। আমার মনে আশা হচ্ছিল হয় ত দাদা গিয়ে হাত পাতলে পিসিমার রুদ্ধ-স্নেহ বাঁধ-ভেঙে উপচে পড়বে। সত্যি বলতে কি, তাঁর হাতে খাওয়া না পেয়ে আমার অন্তর-আত্মা ক্ষুধায় ক্রন্দন করছিল। তাঁর কাছে খাওয়া না পেলে যে কিছুই পাওয়া হয় না। তাঁর সমস্ত অন্তরের স্নেহটিকে তিনি যে অন্নপূর্ণারূপেই আমাদের বিতরণ করে এসেছেন। তাঁর হাতে থালা না দেখলে যে তাঁকেই দেখতে পাই না। এ দুঃখ তখন আমার সব-চেয়ে বড় দুঃখ হয়ে উঠেছিল। আমি দাদার হাত ধরে বল্লুম—"দাদা, চল পিসিমার কাছে।"

দাদা যেতেই পিসিমা বল্লেন—"যোগীন, আমাকে কি ভুলে গেলি বাবা? তোর এই পাপী পিসিমাকে মাঝে-মাঝে দুটো ধম্মকথা শুনিয়ে যাস্।"

দাদা হঠাৎ চমকে উঠলেন। তারপর গম্ভীর-ভাবে বল্লেন—"ও-সব ছেড়ে দিয়েছি পিসিমা।"

পিসিমা বল্লেন—"বেশ করেছিস বাবা!—এই কি তোর ধম্মকম্মের সময়? ছেলে-মানুষ তোরা;—এখন হেসেখেলে বেড়াবি।" বলে দাদার ও আমার গায়ে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে তিনি গল্প করতে লাগলেন।

কথার মধ্যে দাদা হঠাৎ বলে উঠলেন—"পিসিমা, আজ তোমার এখানে খাবো বলে' বাড়িতে খেয়ে আসিনি।"

পিসিমা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইতে লাগলেন।

দাদা বল্লেন—"দেখচ কি পিসিমা? আমার ক্ষিধে পেয়েছে এখনো টের পাওনি?"

পিসিমা বল্লেন—"আহা, তাই বুঝি তোর মুখখানি এমন শুকিয়ে গেছেরে?" বলেই পিসিমা ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটুখানি গিয়েই থমকে পড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে আবার ফিরে এসে চুপটি করে আমাদের পাশে বসলেন।

দাদা বল্লেন—"কি হ'ল পিসিমা?"

পিসিমা নিরুত্তর।

দাদা বল্লেন—"যাও পিসিমা, বসলে কেন? বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে!"

পিসিমার কাতর মুখখানি কান্নার বিহ্বলতায় ভরে উঠল; চোখদুটি ছল্ ছল্ করতে লাগল, তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

দাদা প্রথমটা কেমন থম্‌কে গেলেন। তার পর একটু চুপ করে তিনি পিসিমার হাত ধরে বল্লেন—"কি হ'ল পিসিমা তোমার?"

পিসিমা চোখের জল সাম্‌লে বল্লেন—"তুই ত সব জানিস বাবা, কেন তবে—" বলতে-বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

দাদা কি বলতে যাচ্ছিলেন তাঁরও কথা আটকে গেল। পিসিমা ছল্-ছল্ চোখে চাইতে লাগলেন তাঁর মনের সেই নিরুপায়তার অস্ফুট ছটফটানি দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে বল্লুম—"পিসিমা, তুমি যদি না খেতে দাও তবে—"

পিসিমা আঁৎকে উঠে তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে ছিট্‌কে দূরে চলে গেলেন। তাঁর মুখখানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। দেখলুম তাঁর দু-চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরের বিভীষিকায় নিদারুণ ভীত হয়ে উঠছে। তিনি আর্ত্তনাদ করে বলে উঠলেন—"ওরে আমায় রক্ষে কর—রক্ষে কর!—আমার পরকাল নষ্ট করিস নি।"

আমরা তাঁর সেই ভয়াচ্ছন্ন সুদূর-প্রসারিত চোখের দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

পিসিমা হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমাদের হাত ধরে বল্লেন—"বোস্ বাবা, তোরা বস।"

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

ক্ষণিক-মিলন

মধুবসন্ত আসেনি তখনো হায়,
দ্বিধাভরে পিক উঠে নাই ফুকারিয়া;
মৃদুল মধুর বহেনি দখিন-বায়,
প্রথম তোমারে দেখেছিনু যবে প্রিয়া!

সন্ধ্যা তখন নামিছে আলোর শেষে,
থেমে গেছে যত দিবসের উচ্ছ্বাস।
একাকিনী তুমি সন্ধ্যা-রাণীর বেশে
দাঁড়াইয়াছিলে পরি ঘন-নীলবাস!

সরল আঁখির নিবিড় দৃষ্টি দানে
এনে দিলে প্রাণে দুঃসহ রসাবেশ !
আধ-তন্দ্রায় আমি শুধু তব পানে
তৃষিত, কাতর, চেয়েছিনু অনিমেষ।

দখিণ-বাতাস লাগিল নিমেষে বুকে,
দুরু দুরু করি দুলিয়া উঠিল হিয়া ;
শিরায় শিরায় না-জানি কি কৌতুকে
আকুল সেতার উঠিল ঝঙ্কারিয়া !

পরাণ মথিয়া প্রণয়-অমৃত আনি
ভরিয়া দিলাম দুখানি ললিত মুঠি ;
স্ফুরিত ওষ্ঠে ফুটিলনা তব বাণী,—
মুখ 'পরে শুধু রাখিলে নয়ন দুটি !

হাতে হাতে দোঁহে রহিনু নীরবে চেয়ে,
আঁখিতে আঁখিতে মুগ্ধ, নিমেষ-হত !
মদির আবেশ ফেলিল দোঁহারে ছেয়ে,
মিলনের সুখ বাজিল দুখের মত !

ঘনায়ে আসিল ক্রমে বিদায়ের ক্ষণ,
মোহাবেশ টুটে গেল নিমেষের মাঝে ;
তপ্ত ললাটে দিনু এঁকে চুম্বন !
আজিও সে চুমা শুক-তারা হয়ে রাজে !

তার পরে হায় শুধুই অশ্রুজল,
শুধুই হুতাশ আকুল পাগল পারা,—
সুখী তবু আমি,—আছে মোর সম্বল,
আছে স্মৃতিটুকু,—আছে ওই শুকতারা !

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

য়ুরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের গতি

য়ুরোপে চপলা লক্ষ্মীর পদ্মাসন আজ রক্ত-সরোবরে টলমল। এই কুরুক্ষেত্রের কারণ যে যাহাই বলুক, ব্যবসা ও বাণিজ্যের কথাটা যে ইহার মূলে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই।

লড়াই সুরু হইতেই আমাদের শিল্প-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানি, বেচাকেনা, সোণা-রূপার দেনা-পাওনা সমস্ত ব্যাপারেই খুব একটা নাড়াচাড়া পড়িয়াছে। আমরা য়ুরোপীয় মালপত্তরের দাস—প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমাদের ইহা একান্ত আবশ্যক ; অতএব এই সকল জিনিষের রপ্তানি কমিতে সুরু হইলে আমাদের ঘরে-বাইরে নানা উপসর্গ দেখা দিল। যে দেশে তুলা, পাট জন্মে সে দেশে পরিধানের বস্ত্র নাই, যে-দেশে কাগজ-তৈরীর মাল মসলা আছে, সেখানে লিখিবার কাগজ নাই, যে-দেশ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র চামড়া সরাবরাহ করা হয়, সে-দেশে জুতার মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে আর যে-দেশ লবণসমুদ্রে পরিবেষ্টিত সেখানে লবণ না পাইয়া বিদ্রোহের সূত্রপাত হইতেছে।

দেশের এই অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিবার সময় কি আসে নাই? মনে ত হয় এই

দিকে রাজপুরুষগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে, নতুবা এমন দুর্দ্দিনেও কি কমিশনের বৈঠক বসে? ভারতবর্ষের বৈষয়িক অবস্থা কমিশনরগণ চোখ মেলিয়া দেখেন ত অনেক তথ্য ইঁহারা অবগত হইবেন যাহা লড়াইয়ের এই মহা অশান্তির মধ্যেই অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষ চিরকাল য়ুরোপকে কাঁচামাল জোগাইবে আর য়ুরোপ কল-কারখানার সাহায্যে তাহা রূপান্তরিত করিয়া এ-দেশে বিক্রয় করিবে ইহাই ত ছিল ইংলণ্ডের বাণিজ্যনীতির মূল কথা। এই জন্য আমাদের মনেও সন্দেহ হইতেছে যে এ-দেশের কাঁচামালের খবর লওয়াই কমিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। লড়ায়ের পর হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন করিয়া চালানো হইবে ইহা লইয়া রাষ্ট্রমন্ত্রীগণ অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন। আমাদের চিরপরিচিত লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন:—"ভারতবর্ষে যত-কিছু পণ্যদ্রব্য প্রয়োজন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য তাহা সম্পূর্ণ জোগাইতে না পারিবার কোনো হেতু নাই; আর, তদ্‌পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্যের হাটে ভারতবর্ষের কাঁচামাল বিক্রয় করিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিলে এই অদলবদল উভয়পক্ষেরই মঙ্গলজনক হইবে।" এই সব শুনিয়া আশঙ্কা হয় চিরকালই ভারতবর্ষ অন্যলোককে কাঠখড় জোগাইয়া দিবে আর তাহার নিজের আবশ্যকীয় তৈজসপত্তরের জন্য তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে সমুদ্রের দিকে।

কিন্তু আমাদের মতন অবস্থা পৃথিবীর মধ্যে আর কাহারো নাই। কোনো অর্থনীতি-শাস্ত্র এই বাণিজ্য-সম্বন্ধকে স্বাভাবিক বলিয়া ইহার পক্ষসমর্থন করিবে না। কেবলমাত্র কৃষির উপর আমাদের নির্ভর করিতে হইলে আমাদের দুর্দ্দশা বাড়িবে বই কমিবে না। ইংলণ্ডের কলকারখানার সুবিধার দিকে তাকাইয়া আমাদের দেশের বৈষয়িক উন্নতি সাধন করা সম্ভব নহে।

দেশের লুপ্তশিল্প আমাদের প্রয়োজন জোগাইতে পারে না বলিয়াই আজ জার্ম্মানির পরিবর্ত্তে জাপান আসিয়া হাটবাজার দখল করিয়া বসিয়াছে। এই সুযোগের প্রতীক্ষায় জাপান দীর্ঘকাল বসিয়াছিল। চীন ও ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যাকে মালপত্তর জোগাইয়া জাপান অর্থ সঞ্চয় করিবে ইহাই তাহার অনেক দিনের আশা। তারপর, জাপানের সমরশক্তির সঙ্গে অর্থবল যোগ হইলে হয়ত সমস্ত এসিয়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার পাইবে জাপান।

কিছুদিন হইতে শিল্প ও বাণিজ্যের কথাটা আমরাও ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখানে সেখানে কিছু-কিছু কাজও হইতেছে। অতএব এই সময়েই য়ুরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য, কেন না এতকাল ধরিয়া য়ুরোপ যাহা গড়িয়াছে তাহার ফলাফল না জানিয়া আমরা কাজে হাত দিতে গেলে ভুল করিবার আশঙ্কা আছে। য়ুরোপে শিল্প-ইতিহাস যাহা সাক্ষ্য দিয়াছে এবং যে পথ দিয়া ইহা বিস্তার লাভ করিল তাহা জানা থাকিলে ভুলচুকগুলার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইব। ইহা ত সুস্পষ্ট দেখিতেছি এই বাণিজ্য

লইয়া যুরোপীয় সমাজে, রাষ্ট্রে, এমন কি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে। শ্রমজীবী ও ধনীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়া সমাজের নানা অঙ্গে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে—তারপর এই বিরাট বাণিজ্য-যজ্ঞের আগুন লইয়াই আজ সমস্ত যুরোপ জ্বলিয়া উঠিল।

যুরোপীয় শিল্পইতিহাসকে যাঁহারা বাহির হইতে বিচার করেন তাঁহারাই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহারা ভাবেন বাংলাদেশে শ্রীরামপুরকে ম্যান্‌চেষ্টারের মতন গড়িয়া তুলিবেন আর বোম্বে হইবে ভারতবর্ষের ল্যাঙ্কাসায়ার। অর্থাৎ দেশের প্রকৃতি ও বিশেষ অবস্থা বিচার না করিয়া ইঁহারা যুরোপকেই বাণিজ্যগুরু বলিয়া মানিয়া লইতে ইচ্ছুক। যে পথ দিয়া যুরোপ তাহার শিল্প ও বাণিজ্যের বহু ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে ভারতবর্ষকেও সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে, ইহাই ইঁহাদের অভিমত।

আমি কয়েকটি প্রবন্ধে এই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, দেশের প্রকৃতিগত কতকগুলি বিশেষ অবস্থার হিসাব না করিয়া অন্ধ-অনুকরণের দ্বারা আমরা কোনো লক্ষ্যই ভেদ করিতে পারিব না। তারপর, যাহাকে যুরোপীয় শিল্পনীতি (Industrial Policy) বলিয়া জানি, এই শতাব্দীতে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কেন্দ্রীভূত শিল্প-বাণিজ্যের দিন আজ অস্তগত।

সভ্যতার ভিত্তি গঠনে জাপান যুরোপের মালমসলা ব্যবহার করিয়াছে সত্য কিন্তু যে-পরিমাণ মালমসলা জাপানের প্রকৃতিগত সভ্যতার সঙ্গে মিশ খায় নাই, সেই পরিমাণে ইহা নানা বিকারের সৃষ্টি করিয়াছে। সেখানেও মহাজন ও শ্রমজীবীর সংঘর্ষ ক্রমশই তীব্র হইয়া উঠিতেছে, প্রতিযোগিতার ফলে নিষ্কর্ম্মার দল বৃদ্ধি পাইতেছে, কারখানার সঙ্গে কৃষিজীবীর নিকট-সম্বন্ধ আর নাই;—এমন-করিয়া যুরোপের সবগুলি উপসর্গ প্রাচ্যসভ্যতার অঙ্গে দেখা দিয়াছে এবং একদিন এই সকল সমস্যাই জাপানের অঙ্গহানি করিবে সন্দেহ নাই।

এইবার যুরোপীয় অর্থ-শাস্ত্রের গোড়ার দুই-একটি কথা পাড়িয়া বাণিজ্য ও শিল্প ইতিহাস আলোচনা করিব।

যাঁহারা যুরোপীয় অর্থশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা য়্যাডাম স্মিথের সুবিখ্যাত গ্রন্থে—Wealth of Nations—যে সকল মৌলিক তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা অবগত আছেন। এক যুগ পূর্ব্বে য়্যাডাম্ স্মিথ যাহা লিখিয়াছেন এতকাল ধরিয়া যুরোপীয় অর্থনীতি কেবল উহারই ভাষ্য করিয়াছে মাত্র।

শ্রমবিভাগ (Division of labour) দ্বারা জাতীয় ধন-বৃদ্ধি হয় এই কথাটা য়ুরোপ অর্থনীতি শাস্ত্রজ্ঞের মুখে শুনিয়া আসিতেছে, অতএব তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পে শ্রমবিভাগের চূড়ান্ত দেখা যায়। বিপুল কারখানায় বিভাগের পর বিভাগ সৃষ্টি হইয়া মানুষকে কলের মতন করিয়া তোলা হইয়াছে।

নিউইয়র্কে এক জুতার কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম; সেখানে একজন বৃদ্ধ কারিগরের সঙ্গে কথা বলিয়া জানিলাম,

যখন সে আট বছরের বালক তখন এই কারখানায় সে প্রথম কাজ গ্রহণ করে; আজ তাহার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর। এতকাল পর্য্যন্ত এই কারখানায় হুক্ বসানো মেসিনের মধ্যে কেবল জুতাগুলোকে আগাইয়া দেওয়াই ছিল তাহার কাজ। সাতান্ন বৎসর একটা লোকের জীবন কাটিল কেবল জুতায় হুক্-বসানো মেসিনের দাসত্ব করিয়া! যে অর্থনীতি অনুসরণের ফলে ইহা সম্ভব হইতে পারে তাহা কিছুতেই দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না।

আজ য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল কথাগুলি লইয়া সে-দেশের পণ্ডিতেরা ভাবিতে সুরু করিয়াছেন এবং এতকাল যাহা বলিয়া আসিয়াছেন তাহার সুরে কিছু পরিবর্ত্তনও দেখা যাইতেছে। শ্রমবিভাগ দ্বারা আশু ফল পাওয়া গেলেও সমাজের পক্ষে ইহা কল্যাণকর নহে এ কথা য়ুরোপের কোনো কোনো অর্থনীতিজ্ঞ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শক্তির বিকাশের পথে ইহা অন্তরায়। অতএব ইঁহারা আশা করেন শ্রমজীবীগণের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারা (integration of labour) শিল্পোন্নতি করিবেন এবং তাহা হইলে সমাজের স্তরে স্তরে আবর্জ্জনারাশি আর জমিয়া উঠিতে পারিবেনা। তারপর যেদিন ষ্টীম্ আবিষ্কৃত হইল সেই দিন হইতেই কল-কারখানার সৃষ্টি,—আর সেই কারখানাতেই সমস্ত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। শিল্পী তাহার হাত-গড়া নানা কৌশল ত্যাগ করিয়া কলকব্জার সাহায্যে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে লাগিল আর কারখানার কাজ করিবার জন্য পাড়া-গাঁ ছাড়িয়া কুলী-মজুরেরা আসিয়া জুটিল। যে শিল্পীগণ আশ্চর্য্য নিপুণতার সঙ্গে বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত, কলের প্রতিদ্বন্দিতায় তাহারা হার মানিল। ইংলণ্ডের পণ্ডিতেরা বলিলেন, আমরা সমস্ত পৃথিবীকে তৈরী-মাল জোগাইব আর সমস্ত পৃথিবী আমাদের কাঁচমাল দিবে। নিজেদের দেশে ফসল উৎপন্ন করিবার ভাবনায় আমাদের প্রয়োজন কি? রুসিয়া, হাঙ্গেরি,—যাহারা আমাদের মত কলকারখানার মালিক নয়—তাহারা মাঠে চাষ করিয়া ফসল উৎপন্ন করুক। বেলজিয়ম্ মেষ চরাইয়া আমাদের পশম দিবে, ভারতবর্ষ তুলা, পাট, তৈলশস্য দিবে, ক্যানাডা ফলমূল পাঠাইবে, নিউজিল্যাণ্ড মাংস পাঠাইবে আর আমরা ইহাদের কল-কারখানার তৈরী নানবিধ পণ্যদ্রব্য পাঠাইব।

যাহা হোক্, ইংলণ্ড কিছুকাল এই ভাবে উৎপন্ন দ্রব্য আমদানি করিয়া কলকারখানার সাহায্যে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা সুরু করিল আর পৃথিবীর চারিদিকে তাহা রপ্তানি করিয়া প্রভূত ধনের অধিকারী হইতে লাগিল। য়ুরোপের অন্যান্য দেশে তখনও ষ্টীমের কলকারখানা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, অতএব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের ছিল তখন একছত্র রাজত্ব। তারপর যতই অর্থাগম হইতে লাগিল ইংলণ্ডের অর্থনীতিশাস্ত্রজ্ঞগণ ভাবিলেন, শ্রমবিভাগ দ্বারা দেশের অর্থ বৃদ্ধি পায় এ-সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই, কেননা এই উপায়েই ইংলণ্ডের মহাজনেরা লাভবান হইতেছে আর ক্রমশই জাতীয় ধন বৃদ্ধি পাইতেছে।

কিন্তু চিরদিন এইরূপ ব্যবস্থা কি

আর চলে? কেন্দ্রীভূত হইয়া শিল্প বাণিজ্য আর কতদিন কেবল ইংলণ্ডকে প্রভূত ধনের অধিকারী করিবে? তারপর যখন দেখা গেল য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও কলকারখানা স্থাপিত হইয়া তাহাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য তাহারা নিজেরাই প্রস্তুত করিতে পারিতেছে তখন হইতেই ইংলণ্ডকে তাহার মালপত্র চালাইবার কথা লইয়া মাথা ঘামাইতে হইয়াছে।

ইংলণ্ডের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা সে দেশের ইতিহাস পাঠে অবগত হই। ১৮১০ হইতে ১৮৭৮ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড যেমন আশ্চর্য্য দ্রুতবেগে বাণিজ্য-বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল তেমন আর কোনো দেশে সম্ভব হয় নাই।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির আমদানি ৩০ টন্ হইতে ৩৮০,০০০,০০০ টন্, কারখানার তৈরী দ্রব্যাদির রপ্তানি ৪৬ হইতে ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল সত্তর বৎসর মধ্যে! ইংলণ্ডে এই সময়ের মধ্যেই রেল প্রস্তুত হইয়াছিল পনর হাজার মাইলেরও উর্দ্ধে। কয়লার খনি হইতে এই সময়ের মধ্যে ১০ টন্ হইতে ১৩৩,০০০,০০০ টন্ কয়লা উঠিয়াছিল। এই সময়েই মহাজনেরা বিপুল ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন। আজ ইংলণ্ডের ধনকুবেরদের ঘরে যে বিপুল অর্থ সঞ্চিত, তাহার অধিকাংশই, এই সময়ের উপার্জ্জিত এবং কেন্দ্রীভূত ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে প্রাপ্ত।

ইংলণ্ডের Statistical Societyর এক পত্রিকায় একজন সভ্য এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের মহাজনেরা বিদেশে নানা-ব্যবসায়ে কি পরিমাণ অর্থ খাটান, তাঁহাদের বাৎসরিক আয় হইতেই সেটা বুঝা যাইবে।

বিদেশীয় বাজারে খাটানো মূলধন হইতে ইংলণ্ডের বাৎসরিক আয় ৩০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪,৫০০,০০০,০০০ টাকা। এই অঙ্ক ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লওয়া হইয়াছিল— এখন নিশ্চয়ই ইহা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তবে কি মূল্য দিয়া ইংলণ্ড এই বিপুল বাণিজ্যের অধিকারী হইয়াছিল তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। ১৮৪০ হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা দেশের শ্রমজীবীগণের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য এক কমিশন বসাইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে যে সকল লোমহর্ষক কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে দেহ-মন শিহরিয়া উঠে। ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাসের সেই অধ্যায় পাঠ করিয়াও যদি কেহ সুবৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠিত করাকে কোনো দেশের এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মনে করেন, তবে বলিতে হইবে যে, তিনি ইতিহাসের ভিতর দিয়া বিধাতার আদেশ শুনিতে পাইলেন না।

শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের একচ্ছত্র রাজত্ব দীর্ঘকালস্থায়ী না হইলেও অল্পকালের মধ্যেই সে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে এবং এখনও পৃথিবীর মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ইংলণ্ড বিশিষ্টস্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ড যে সুবিধা ও সুযোগ পাইয়াছিল আর কোনো জাতি তাহা পায় নাই। একদিকে বিজ্ঞানের

অভ্যুদয় এবং অপরদিকে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন কর্ম্মক্ষেত্র এমন সুযোগ আনিয়া দিয়াছিল যে, ইংলণ্ড বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতিসাধন ভিন্ন আর কোনো সাধনার দিকেই বেশী ঝোঁক দেয় নাই।

নগরে নগরে কারখানা স্থাপন, পৃথিবীর চারিদিক হইতে কাঁচামালের আমদানী আর কল-কারখানার সাহায্যে তাহা রূপান্তরিত করিয়া রপ্তানি করা—এই সমস্ত কার্য্য ইংরেজ-জাতটাকে যেন পাইয়া বসিল। কারখানার মালিকদিগকে সুবিধা করিয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আইনকানুন করিলেন। য়ুরোপের অনেক দেশে ও এসিয়ায় তখনও কলকারখানা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সেই সকল দেশেই হাটে বাজারে যত সস্তামাল স্বদেশী পণ্যকে আপন ভিটা হইতে উৎখাত করিয়াছে। তারপর, এই বাণিজ্য রক্ষার ও বিস্তারের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে রণতরী।

এদিকে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তে য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলিও সচেতন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালী কাহারো একচেটিয়া নহে, অতএব কোনো শিল্পই এক বিশেষ দেশমধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকিল না। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের সর্ব্বত্রই ইহার বিস্তারের লক্ষণ দেখা গেল।

তারপরই সুরু হইল যুদ্ধবিগ্রহের দৌরাত্ম্য! ফরাসীদেশে সবেমাত্র তরুণ শিল্প ও বাণিজ্য মাথা তুলিয়া উঠিতেছে এমন সময়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে লড়াই বাধিল। ইংলণ্ড দেখিল জার্ম্মানি ও ইতালীর বাণিজ্য ও শিল্প তখনও শৈশবে, অতএব ফ্রান্সের বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পকে যদি কোনোরকমে পঙ্গু করা যায় তাহা হইলে ইংলণ্ড আরো কিছুকাল শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিষ্কণ্টক রাজত্ব ভোগ করিতে পারে।

বাণিজ্যরক্ষার জন্য ফ্রান্সও রণতরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল কিন্তু ইংলণ্ডের নৌ-শক্তির কাছে টিঁকিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। ফ্রান্স অনেকদিনের চেষ্টায় যাহা গড়িল, যুদ্ধের বিপ্লবে তাহা ধূলিসাৎ হইলেও ঊনবিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার ফ্রান্সের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য মাথা তুলিতে পারিল। এখন আর ইংলণ্ডের রপ্তানি দ্রব্যের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় না। যাহা তাহার আবশ্যক সে নিজেই তাহার অধিকাংশ প্রস্তুত করিয়া লয় এবং যে পরিমাণ মাল সে রপ্তানি করিতে পারে তাহার মূল্য ইংলণ্ডের রপ্তানি মালের প্রায় অর্দ্ধেক। ফ্রান্সের রপ্তানি তালিকার মধ্যে বস্ত্রাদিই অধিক।

কিন্তু ফ্রান্সের বহির্বাণিজ্যনীতির সঙ্গে ইংলণ্ডের কিছু প্রভেদ আছে। রপ্তানি জিনিষের কাটতি বাড়াইবার ও অপর দেশের শিল্পকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্যূহবদ্ধ আয়োজন ফ্রান্স করে নাই। ফরাসীরা প্রধানতঃ চেষ্টা করিয়াছে নিজেদের প্রয়োজন মিটাইতে—তারপর যে-পরিমাণ দ্রব্য তাহাদের নিজেদের আমদানী করিতে হয়, বাণিজ্যের তুলাদণ্ড ঠিক রাখিবার জন্য সেই পরিমাণ রপ্তানিও করা প্রয়োজন। কিন্তু এই রপ্তানির জন্য ফ্রান্স কোনো উপনিবেশের প্রতি উৎপাত করে নাই, কেবল ইহাই চেষ্টা করিয়াছে যাহাতে ফ্রান্সকে অপর কোনো-

দেশের উপর কোনো দ্রব্যের জন্য নির্ভর করিতে না হয়।

এইবার ফ্রান্সের আমদানি ও রপ্তানির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ফ্রান্সের যে যে পরিমাণ শস্য আবশ্যক তাহার দশভাগের এক ভাগ আমদানি করিতে হয়। কিন্তু যেমন দ্রুতবেগে এদেশে কৃষি উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে, ফ্রান্সে (এলজিরিয়া বাদ দিয়া) ফসলের পরিমাণ শীঘ্রই এত বৃদ্ধি পাইবে যে, শস্যের আমদানি ত বন্ধ হইবেই বরং অতিরিক্ত ফসল পাওয়া যাইবে।

কফি ও রাইতিলতিসি-জাতীয় তৈল সঞ্চিত বীজ ফ্রান্স প্রচুর পরিমাণে আমদানি করে। এই জাতীয় শস্য ফরাসিদেশে উৎপন্ন করা সম্ভব কিনা তদ্বিষয়ে কৃষিবিভাগ অনুসন্ধান করিতেছেন।

ফ্রান্সে কয়লার খনিগুলি ইংলণ্ডের মতন সুপরিচালিত নহে। সে জন্য ফ্রান্সকে বেলজিয়ম্, জার্মানি ও ইংলণ্ড হইতে কিছু কিছু কয়লা আমদানি করিতে হয়, কিন্তু স্বদেশের কয়লা-খনিগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হইলেই এই আমদানিও বন্ধ হইবে।

কিছু তুলা, কিছু পশম ও কিছু রেশম ফ্রান্সে আমদানি করা হয়। তৈরী বস্ত্রাদির আমদানি অতি সামান্য, কিন্তু ১৯০৯-১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৩৪,৪৪০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র রপ্তানি করা হইয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের আমদানি হইয়াছিল প্রায় ৬৮,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের কিন্তু রপ্তানি হইয়াছিল ১৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের তৈজস-পত্র;—কাঁচামাল নয়। অল্পকাল মধ্যে ফ্রান্স নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়াও প্রচুর দ্রব্য রপ্তানি করিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রীয় সাহায্য ভিন্ন ফ্রান্সে কি কখনো ইহা সম্ভব হইত? (ক্রমশ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

জলের-আল্পনা

এক

গাছের মাথায়-মাথায় সকালের কচি রোদটি আসিয়া পড়িয়াছে—ঘন সবুজের উপরে যেন ফিকে সোণার-জলের ঝিক্‌-মিকে ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে!

সেনেদের বাড়ীর মস্ত বাঁধানো উঠানের উপরে দাঁড়াইয়া এক বৈষ্ণব-ভিখারী আনন্দ-লহরী বাজাইয়া গান ধরিল—

"রাই তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে,
মথুরায় তার মাল্যবদল হবে না-জানি কারসনে।
কেন গাঁথ চিকণ মালা,
ছেড়ে যাবে চিকণ কালা,
শেষে কেবল ঐ মালা—জপমালা হবে মনে।"

বাড়ীর গিন্নী অন্নপূর্ণা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "বৈরাগী-ঠাকুর, ও দুঃখের গান আজকের দিনটায় আর গেয়ো না—ছেলেটা আজ কল্‌কাতায় যাবে!"

ভিখারী মাথা নাড়িয়া নূতন গান ধরিল—

"এসে এক রসিক পাগল, বাধালে গোল
নঁদের মাঝে দেখ্‌সে তোরা,—
পাগলের সঙ্গে যাব, পাগল হব,
হেরব রসের নব গোরা!—"

ভিখ্ পাইয়া ভিখারী চলিয়া গেল।

অন্নপূর্ণা আস্তে-আস্তে উপরে উঠিয়া একটা ঘরের সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দরজা ঠেলিতে-ঠেলিতে ডাকিলেন, "গৌরী, অ গৌরী! বলি, একগলা রোদ হোল, এখনো তোমার ঘুম ভাঙ্‌ল না বাছা!"

ঘরের ভিতর হইতে সাড়া আসিল, "যাই মা, যাই!"

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল একটি পনেরো কি ষোল বছরের মেয়ে, তাহার রংটি ফর্‌সা নয় বটে, কিন্তু পূরন্ত মুখখানি এবং নিটোল গড়নটি লাবণ্যে যেন ঢলঢল করিতেছে। আসন্ন যৌবনের দখিন হাওয়ার সাড়া পাইয়া তাহার রূপের কুঁড়ি আজ ফুলের মত পাপড়ি মেলিয়া ফুটি-ফুটি করিতেছে!

অন্নপূর্ণা তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও আমার পোড়াকপাল! তাইত বলি, সবাই উঠ্‌ল, আর আমার গৌরীর রাত এখনো পোয়াল না ক্লেন? হ্যাঁরে হাবা মেয়ে, কাল সারারাত জেগে-জেগে বুঝি কান্না হয়েছিল? জয় আজ কল্‌কাতায় যাবে বলে তোর মন-কেমন করেছিল বুঝি?"

গৌরী টোল্-খাওয়া গাল-ছুটি রাঙা করিয়া মুখ নামাইয়া লইল; না-বলিবার যো নাই,—তাহার মুখের উপরে এখনো শুষ্ক অশ্রুর দাগ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

অন্নপূর্ণা তাহার চিবুকে হাত দিয়া স্নেহভরে বলিলেন, "ছিঃ মা, কান্না কিসের? জয় ছুটি হলেই ত ফের এখানে আসবে! হরি করুন, সুভালাভালি তার লেখা-পড়াটা সাঙ্গ হয়ে যাক্, আমিও তোকে তার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তি হই!"

গৌরীর গায়ের উপরে কাহার ছায়া আসিয়া পড়িল; চোখ তুলিয়া তাহাকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলাইয়া গেল!

অন্নপূর্ণার পিছনেই একটি যুবক আসিয়া কখন্ যে দাঁড়াইয়াছে, কেহই তাহা জানিতে পারে নাই।

যুবার রং অত্যন্ত গৌর, বাঙালীর মধ্যে তেমন রং সহজে চোখে ঠেকে না। মাথায় বড় বড় কোঁকড়ান চুল;—চোখদুটি যেমন শান্ত তেম্‌নি স্বপ্নালস; নাকটি প্রতিমার নাসিকার মত টিকলো; ঠোঁটদুখানি পাত্‌লা, মৃদুমৃদু হাসিমাখা; তাহার ফাঁক্ দিয়া সারি-বাঁধা শ্বেতপাথরের টুক্‌রোর মত দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে; ঠোঁটের উপরে ছোট্ট একটি ভোম্‌রা-কালো গোঁফের রেখা—যেন তুলির একটিমাত্র নিপুণ টান! দেহটি একহারা হইলেও বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘ।

গৌরী আচম্বিতে লজ্জা পাইয়া পলাইয়া গেল কেন, বুঝিতে না-পারিয়া অন্নপূর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যুবককে দেখিয়া

হাসিয়া বলিলেন, "ও, বুঝেচি। তুই বুঝি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুন্‌ছিলি ?"

—"তোমার কথা কাণে এসে ঢুক্‌ল, কি করি বল মা ? তা, গৌরীর অত লজ্জা কেন ?"

—"তুই কল্‌কাতায় যাবি বলে গৌরী কেঁদে চোখ রাঙা করেচে! আমি ধরে ফেলেচি কিনা, তাই অত লজ্জা!"

যুবক দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ নীরবে কি ভাবিল, তারপর আস্তে-আস্তে নীচে নামিয়া গেল।

যুবকের নাম জয়ন্ত, অন্নপূর্ণা তাহাকে জয় বলিয়া ডাকেন।

সেদিন দুপুরে জয়ন্ত যখন খাইতে বসিল, অন্নপূর্ণা তাহাকে পরিবেষণ করিতে-করিতে বলিলেন, "জয়, আবার কবে ফির্‌বি বাবা ?"

দুটি ভাত ভাঙিয়া জয়ন্ত বলিল, "সেই পূজোর ছুটিতে মা!"

অন্নপূর্ণা তাহার সাম্‌নে রান্নাঘরের চৌকাঠের উপরে বসিয়া বলিলেন, "তা দ্যাখ্‌ বাবা, গৌরীকে আর ত রাখা চলে না।"

জয়ন্তের মুখ হঠাৎ কালো হইয়া গেল। ঘাড় গুঁজিয়া অস্বাভাবিক মনোযোগের সহিত সে ভাতের উপরে ডাল ঢালিতে লাগিল—হাঁ, না, কোন জবাব দিল না।

অন্নপূর্ণা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিরে, চুপ করে' রইলি যে ?"

—"আমি ত বলেছি মা, পাশ না করে' বিয়ে কর্‌ব না!"

—"তোকে ত পেটের দায়ে পাশ দিতে হচ্চে না! বিয়েটা হয়ে গেলে আমি যে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচ্‌তে পারি!"

—"মা, পেটের দায়ে পাশ না দি, লেখা-পড়ার জন্যে ত দিচ্ছি বটে!"

—"বিয়ে কর্‌লে কি লেখাপড়া হয় না ?"

—"আপাতত আমাকে মাপ কর্‌তে হবে মা! আগে এম-এ টা দি, তারপর এ-সব ভাব্‌বার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে!"

—"তোর যা মনে হয়, কর্! কিন্তু আমি যে সত্যি করেচি তা যেন মিথ্যে না হয়!"

জয়ন্ত চুপ মারিয়া মুখে ভাতের গরস্‌ তুলিতে লাগিল। তাহার মুখের দিকে আর-একবার সন্দিগ্ধ চোখে চাহিয়া, অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর জয়ন্ত আপনার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, পাণের ডিবা হাতে করিয়া গৌরী দাঁড়াইয়া আছে।

গৌরীকে দেখিয়া জয়ন্ত আজ যেন কেমন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।

গৌরী পাণের ডিবাটি তাহার হাতে আগাইয়া দিল।

জয়ন্ত কোন কথা না কহিয়া ডিবাটি টেবিলের উপরে রাখিয়া অন্যমনস্ক ভাবে নাড়িতে-চাড়িতে লাগিল।

জয়ন্তের আজ্‌কের ভাবগতিক দেখিয়া গৌরী ভারি অবাক্‌ হইয়া গেল। অন্য-অন্য বারে ছুটির শেষে কলিকাতায় যাইবার দিনে, যে-জয়ন্ত কাতর মুখে ছলছল চোখে তাহার সঙ্গে আবোল-তাবোল কত কথাই কহিত, সেই মানুষই আজ এত চুপ্‌চাপ্‌, এত আন-মনা, এত চিন্তিত কেন ?

গৌরী খুব মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি অসুখ করেচে ?"

জয়ন্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, অসুখ কর্‌বে কেন ?... ...আচ্ছা গৌরী, এবার কল্‌কাতায় গিয়ে তোমাকে কি কি বই পাঠাতে হবে বল দেখি ?"

—"ঘরে-বাইরে, বলাকা, চতুরঙ্গ।"

—"আচ্ছা।"

—"রোজ চিঠি লিখো।"

—"হুঁ।"

জয়ন্ত জান্‌লার দিকে মুখ ফিরাইল। বাঁশঝাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে রোদ-ভরা খোলা মাঠের কতক-কতক দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে উদাসীন চোখে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ চুট্‌কীর আওয়াজে জয়ন্তের চটক ভাঙিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিল, মুখখানি ম্রিয়মান করিয়া গৌরী ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছে। সে তাহাকে ডাকিতে গেল, —কিন্তু কি ভাবিয়া আবার থামিয়া পড়িল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, জয়ন্ত একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

... ...

জগদীশপুরের সেনেরা পুরাতন বনিয়াদি বংশের বিখ্যাত পরিবার। জয়ন্ত এখন এই বংশের একমাত্র কুলপ্রদীপ।

জয়ন্তের পিতা অনঙ্গমোহনের দুই বিবাহ। সূতিকাগৃহে জয়ন্তকে প্রসব করিয়াই অনঙ্গমোহনের প্রথম স্ত্রী পরলোকে চলিয়া যান। জয়ন্তের বয়স যখন একবৎসর, তখন তিনি অন্নপূর্ণাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বিবাহের ছয়বৎসর পরেই অনঙ্গমোহনের অকাল-মৃত্যু হয়।

মা-হারা জয়ন্ত কিন্তু কোনদিনই মায়ের অভাব বুঝিতে পারে নাই। জয়ন্তকে কোলে পাইয়া বন্ধ্যা অন্নপূর্ণাও মাতৃত্বের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। অনেক বয়স পর্য্যন্ত জয়ন্ত জানিত অন্নপূর্ণাই তাহার আপন মা।

সন্তান হয় নাই বলিয়া কেহ যদি কখনো দুঃখপ্রকাশ করিত, অন্নপূর্ণা অম্‌নি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিতেন, "ষাঠ, ষাঠ! জয় আমার শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক-শো বছর বেঁচে থাক্—ওযে আমার সাত-রাজার ধন এক মাণিক! আমার আবার ছেলের অভাব, অমন কথা কেউ মুখে এননা!"

অন্নপূর্ণার এক বাল্যসখী ছিলেন, মেনকা। একই গ্রামে তাঁহাদের দুজনের জন্ম হয়—একই গ্রামে তাঁহাদের দুজনের বিবাহ হয়। তবে অন্নপূর্ণার মত মেনকাও ধনীর হাতে পড়েন নাই।

গঙ্গাসাগরে গিয়া মেনকার সঙ্গে অন্নপূর্ণা যেদিন 'সাগর' পাতান, সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "তোর যদি মেয়ে হয় ভাই, আমার জয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দেব!"

মেনকা বলিলেন, "এখন তুই এ-কথা বল্‌ছিস্ বটে, কিন্তু গরিবের মেয়েকে শেষটা তোর মনে ধর্‌বে কেন ভাই ?"

রাগ করিয়া মেনকার গালে তিন ঠোনা মারিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমাকে তুই এমন কথা বল্‌লি সাগর! আমি কি তোকে সেই চোখে দেখি ? তোর মেয়ে হোলে তার সঙ্গে আমার জয়ের বিয়ে দেব, দেব, দেব, -এই গঙ্গাজল ছুঁয়ে তিনসত্যি কর্‌লুম! জানিস্ ত, ছেলেবেলা থেকে সজ্ঞানে আমি কখনো মিছে কথা বলি-নি!"

ভগবান যেন এই দুই সখীর মনের সাধ মিটাইয়া দিলেন—মেনকার একটি মেয়েই হইল। অন্নপূর্ণা সাগরের মেয়ের নাম রাখিলেন, গৌরী।

তারপর অল্পবয়সেই মেনকা মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। আসন্নমরণা মেনকা, গৌরীকে অন্নপূর্ণার হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন। সেই দিন হইতে গৌরী এই সংসারে অন্নপূর্ণার আপন কন্যার মতই আছে। এবং অন্নপূর্ণাও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলেন নাই।... ... ...

বাল্যকাল হইতেই জয়ন্ত জানে গৌরী তাহার বউ, গৌরী জানে জয়ন্ত তাহার বর। মুখের কথায় তাহাদের গোপন প্রেম কখনো বাহিরে প্রকাশ পায় নাই, বটে, কিন্তু দুজনের মন জানিত—তাহাদের মনের কথা কি!

জয়ন্ত যতদিন দেশে থাকিয়া পড়াশুনা করিত, গৌরীকে সে লিখিতে-পড়িতে শিখাইত। কলিকাতায় গিয়াও জয়ন্ত গৌরীর লেখাপড়ার কথা ভুলে নাই; যখন-তখন তাহার কাছ হইতে গৌরী ভালো-ভালো বই উপহার পাইত।

এতদিন গৌরীর সঙ্গে জয়ন্তের বিবাহ কোন্‌কালে হইয়া যাইত। কিন্তু বাল্য-বিবাহে জয়ন্তের অত্যন্ত আপত্তি ছিল বলিয়াই এই শুভকর্ম্মটি ঘটিয়া উঠে নাই।

দুই

বিবাহ করিয়া জগৎবাবু বন্ধুমহল হইতে 'স্ত্রৈণ' নামক বিখ্যাত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

জগৎবাবু ঘাড় নাড়িয়া অভিযোগকারী বন্ধুবর্গকে বলিতেন, "কিন্তু আমার স্ত্রীর মতে আমার মত অমনোযোগী স্বামী দুনিয়ায় আর দুটি নেই।"

বন্ধুরা চটিয়া বলিতেন, "তোমার স্ত্রীর মত্ যাই হোক্, আমাদের মতে তুমি একটি একের নম্বরের স্ত্রৈণ।"

জগৎবাবু খুব খুসি হইয়া জবাব দিতেন, "হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস।"

তাঁহার এই অপরিসীম নির্লজ্জতায় বন্ধুদের মুখ বোবা হইয়া যাইত!

এ অনেকদিনের কথা। তারপর জগৎবাবুর প্রিয়তমা পত্নী সংসারের মায়ার বাঁধন ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন—স্বামীর কোলে দুটি মেয়েকে স্মৃতিচিহ্নের মত রাখিয়া।

'পুত্রার্থে' দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য জগৎবাবুকে অনেকে অনেক সাধ্য-সাধি করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের পাকা দাড়ির দিকে চাহিয়া এমন কাঁচা কাজ করিতে তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। তাঁহার মতে বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্য্যা যতটা লোভনীয়, ততটা শোভনীয় নয়।

জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত জগৎবাবু লক্ষ্মী বা সরস্বতীর পায়ে হেঁটমুখে গড় করেন নাই; অথচ যে দুটি জিনিষের লোভে লোকে প্রাণপণে ঐ দুই দেবীর মোসাহেবী করিয়া থাকে, জগৎবাবুকে কোনদিন তাহার অভাব ভুগিতে হয় নাই!

ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্‌লাদেশে একশ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছেন—হিন্দুর তেত্রিশকোটি বা অহিন্দুর ঈশা-মুসা প্রভৃতি কাহাকেও কোন-কিছু ক্রয়দান করিতে

তাঁহারা নেহাৎ নারাজ। রামপক্ষীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিলেও এঁরা ফিরিঙ্গি নন; আবার হিন্দুসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলেও টিকি বা পৈতার কোনই মর্য্যাদা রাখেন না। সাহেবরা বলে, দেশে যত অশান্তি সব এঁদের জন্যই এবং বাঙালীদের মতে, এঁরা কালাপাহাড়—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মুখে চুণ-কালি মাখাইতেই এঁরা ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জগৎবাবু বয়সে নবীন না হইলেও এই অপ্রবীণ দলেরই একজন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরে জগৎবাবু বড়ই অসহায় হইয়া পড়িলেন। অন্তঃপুরের শূন্যতা তাঁহার মনকে অত্যন্ত উদাস করিয়া দিত, তাই সদর মহলেই তাঁহার বেশীর ভাগ সময় কাটিয়া যাইত।

বন্ধুদের কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে বলিতেন, "ওহে, আমার আর একলা থাকতে ভালো লাগে না। তোমরা এসে যদি দুটো গল্পগুজব্ কর, তাহলে তবু একটু শান্তি পাওয়া যায়।"—থামিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে আবার বলিতেন, "ভূমিহীন মহারাজা এদেশে অনেক আছে বটে, কিন্তু স্ত্রী-হীন স্ত্রৈণ বোধহয় একটিও নেই —কি বল?"

বন্ধু হয়ত কোন জবাব দিতেন না। জগৎবাবু তামাক টানিতে-টানিতে জড়িত স্বরে বলিতেন, "কিন্তু স্ত্রৈণ হওয়ায় ঢের সুবিধে আছে হে, এমন উপাধি থেকে আমি বঞ্চিত হলুম!"—স্ত্রীর মুখ মনে করিয়া একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া যাইতেন।

জগৎবাবুর আহ্বানে বন্ধুরা রোজ নিয়মিত ভাবে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া আসর জমাইয়া তুলিলেন।

এই আসরে যেমন চা-চুরুট-সিগারেট এবং সেইসঙ্গে প্রায়-পেট-ভরা জলখাবারের বন্দোবস্ত ছিল, অন্য-কোথাও তেমন বড় একটা দেখা যাইত না। অতএব, এই বৈকালী সভাটির সভ্যসংখ্যা যজ্ঞিবাড়ীর লোকের মত ক্রমেই হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছিল এবং সে বন্ধু-সভা শীঘ্রই যে সর্ব্বসাধারণের সভা হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতেও কোন সন্দেহ ছিল না!

... ...

সেদিন বৈকালে জগৎবাবুর বৈঠকখানা তখনো তেমন জমিয়া উঠে নাই।

একখানি সোফার উপরে পা-ছড়াইয়া বসিয়া, জগৎবাবু মাঝে-মাঝে কথা কহিতে-ছিলেন এবং মাঝে-মাঝে আল্‌বোলার নলে ফুড়ুক্-ফুড়ুক্ করিয়া এক-একটি টান মারিতেছিলেন। জগৎবাবুর স্ত্রী স্বামীর এই তামাক খাওয়াটা দু-চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। স্ত্রীর মুখ চাহিয়া জগৎবাবু সংসার ছাড়িয়া বনবাসে যাইতে রাজি ছিলেন,—কেবল এই তামাক ছাড়িবার হুকুম পাইলেই তিনি কিন্তু ভয়ানক বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন। তাই তাঁহার স্ত্রী এই আল্‌বোলাটিকে সতীনের মতই ঘৃণা করিতেন। আর জগৎবাবুও, পাছে এই আল্‌বোলাটি প্রিয়তমার পাল্লায় পড়িয়া গবাক্ষপথে কোনদিন-বা রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়, এই ভয়ে সর্ব্বদাই তটস্থ হইয়া থাকিতেন এবং আপনার উত্তমার্দ্ধার সম্মুখে আল্‌বোলার নলে কখনো চুম্বন করিতে ভরসা পাইতেন না! স্ত্রী

এখন পরলোক, সুতরাং জগৎবাবু আজকাল চব্বিশঘণ্টাই বিপুল উৎসাহে নির্ব্বিঘ্নে ধূম-উদ্গীরণ করিতে থাকেন। সময়ে সময়ে আল্‌বোলার উপরে কলিকা থাকে না—কিন্তু জগৎবাবুর মুখ হইতে তখনো নলটি খসিয়া পড়ে না!

জগৎবাবুর ঠিক সাম্‌নেই যে লোকটি বসিয়াছিল, তাহার নাম অবনী,—তুর্নীতির সে নাকি পরম শত্রু! দেখিতে সে শ্যামবর্ণ—তাহার মুখ-শ্রীও মন্দ নয়। কিন্তু প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া উস্কখুস্ক চুলে এবং ততোধিক প্রকাণ্ড একরাশ অন্ধকারের মত কালো দাড়ী-গোঁফে তাহার মুখমণ্ডল এম্‌নি জঙ্গলাকীর্ণ যে, সেই তুর্ভেদ্য আবরণের মধ্য হইতে মুখের কোন শ্রী-ছাঁদ আবিষ্কার করা একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। সুধু মুখের দাড়ী-গোঁফ বলিয়া নয়, অবনীর দেহটিও যে মানুষের পূর্ব্বপুরুষের মত রোমশ, পাত্‌লা পাঞ্জাবীর ভিতর হইতে একটা ঘনকৃষ্ণ আভা ফুটিয়া উঠিয়া সেটাও জাহির করিয়া দিতেছে। প্রবাদে আছে 'এই বিড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয়' কিন্তু এই মানুষই যে বনে না-গিয়াও অনায়াসে বনমানুষ বনিতে পারে, সেটা প্রবাদে বা আর-কোথাও শোনা বা দেখা যায় না; এবং এই অবনীকে স্বচক্ষে না-দেখিলে এ-কথাটা বিশ্বাস করাও ভয়ানক শক্ত!

অবনীর পাশে বসিয়াছিল, তাহার বন্ধু স্বর্ণেন্দু। লোকটি কিছুকাল হইতে ওকালতি সুরু করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মক্কেলরা ছিল মাছের মত পিচ্ছল; তাই আজ-পর্য্যন্ত তাহার কবল হইতে তাহারা, অতিশয় সন্তর্পণে, আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু স্বর্ণেন্দু তবু হাল ছাড়ে নাই,—যেমন যথাসময়ে সে এই বৈঠকে আসিয়া হাজির হয়, তেম্‌নি যথাসময়ে প্রত্যহ আহার আদালতে যাওয়া চাই-ই-চাই! স্বর্ণেন্দুর গায়ের রং বেজায় কটা; দেহখানি জিরাফের মতন লম্বা এবং বকের ঠ্যাংএর মত সরু-লিক্‌লিকে; তার উপরে আবার সাহেবী পোষাক,—বাঁখারিতে যেন কোট-পেণ্টলুন শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে। সেই ঢ্যাঙা এবং রোগা দেহের সঙ্গে মানান রাখিয়া সমঝদার বিধাতা তাহার মুখখানিও এম্‌নি সরুঙ্গে ও লম্বাটে করিয়া গড়িয়াছেন যে, সে মুখের তুলনা খুঁজিতে গেলে নর-রাজ্য ছাড়িয়া ঘোটক-রাজ্যে যাত্রা করিতে হয়।

ঘরের ভিতরে আর-একটি লোক, যিনি কোঁচার খুঁট পাকাইয়া নাকে পুরিয়া ক্রমাগত হাঁচিতেছেন, আর হাঁচিতেছেন, তাঁহার নাম কৈলাসবাবু। দিন-কে-দিন ভুঁড়ির বহর বাড়িয়া যাইতেছে এবং জামা পুরাতন না-হইতেই ~~আবার~~ নূতন জামার ফরমাজ দিতে হইতেছে বলিয়া আজকাল তিনি জলপান ছাড়িয়া স্যাণ্ডোর শিষ্য হইয়াছেন।... ... ...

অবনী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতেছিল, "এ একটা ফ্যাসান্‌, জগৎবাবু, এ একটা ফ্যাসান্‌! নইলে যাঁর কবিতার মানে খুঁজতে গেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হয় সেই রবিবাবুকে নিয়ে লোকে এত ধেই-ধেই করে' নাচে কেন?"

জগৎবাবু হুস্ করিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "জয়ন্ত যদি, এখানে থাকৃত, তাহলে সে নিশ্চয়ই আপনার কথার প্রতিবাদ কর্‌ত।"

অবনী অবজ্ঞাভরে ঠোঁটদুখানা নীচের দিকে বাঁকাইয়া বলিল, "জয়ন্তবাবুর আপত্তি-টাপত্তি আমি গ্রাহ্যই করি না।"

স্বর্ণেন্দু মুখ হইতে সিগারেট নামাইয়া বলিল, "বাস্তবিক জগৎবাবু, অবনী হক্ কথাই বল্‌ছে! রবিবাবুর পদ্য শুধুই যে বোঝা যায় না, তা নয়—আমার মেজমামা সেদিন বল্‌ছিলেন যে, রবিবাবু নাকি অক্ষর গুণে পদ্য লিখতে পারেন না।"

জগৎবাবু স্বর্ণেন্দুর দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আপনার মেজমামা দেখছি কাব্য-চর্চ্চাও করে' থাকেন! সাধু, সাধু!"

স্বর্ণেন্দুর এক দূর-সম্পর্কের মেজমামা আছেন, তিনি খেতাবী রাজা; এক দূর-সম্পর্কের মেশো আছেন, তিনি সি-আই-ই; এক নিজ-সম্পর্কের ভাই আছেন, তিনি সওদাগরী অফিসের কেরাণী। স্বর্ণেন্দু যখন কথাবার্ত্তা কহিত তখন মেজমামার নাম করিত বারংবার, মেশোর নাম করিত মাঝে-মাঝে, ভাইয়ের নাম একবারও-না। ভাই যে কেরাণী—তার নাম কি করা যায়—আরে ছোঃ! এইজন্য স্বর্ণেন্দুর আড়ালে সকলে তাহাকে 'মেজমামা' বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

অবনী পা নাচাইতে-নাচাইতে বলিল, "আজকাল দেশে একদল ছোক্‌রা দেখি, 'রবি-ঠাকুর রবি-ঠাকুর' করেই' তারা অজ্ঞান। ঐ চ্যালাদের অতি-ভক্তির ঠ্যালায় আমরা ত অস্থির হয়ে উঠলুম মশাই! আমাদের জয়ন্তবাবুর যদি একটুও রসবোধ থাকৃত, তাহলে তিনি রবিবাবুর এমন অন্ধ নির্লজ্জ গোঁড়ামী কর্‌তে পার্‌তেন না। আমি কিন্তু—"

হঠাৎ দরজার দিকে চাহিয়া অবনী থতমত খাইয়া একসঙ্গেই পা-নাচানো এবং রবিবাবুর সমালোচনা বন্ধ করিয়া ফেলিল; তারপর তাড়াতাড়ি স্বর বদলাইয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে, জয়ন্তবাবু! আসুন—আসুন, এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল যে!"

জয়ন্ত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি আস্‌তে-আস্‌তেই সব শুন্‌তে পেয়েছি!"

জগৎবাবু আল্‌বোলার নল ফেলিয়া বলিলেন, "দেশ থেকে কবে ফির্‌লে হে?"

জয়ন্ত বলিল, "আজ সকালে।... ... তারপর অবনীবাবু, আপনি গোঁড়ামী আর রসবোধের কথা কি বল্‌ছিলেন না?"

অবনী দুটো ঢোঁক গিলিয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "না, না, এমন-কিছু নয়—এমন-কিছু নয়।"

কৈলাসবাবু নাকে কোঁচার খুঁট ঢুকাইয়া হ্যাঁচ্চো-হ্যাঁচ্চো করিয়া দুবার হাঁচিয়া, দুষ্টামি-মাখানো হাসি হাসিয়া বলিলেন, "জয়ন্তবাবু, অবনীবাবু বল্‌ছিলেন যে রবিবাবু কবি নন, আর আপনার রসবোধ নেই, আর—"

অবনী রাগে গস্‌গস্ করিতে-করিতে হুম্‌কি দিয়া উঠিল, "বল্‌ছিলুম ত বল্‌ছিলুম,—তাতে হয়েছে কি?"

জয়ন্ত রাগ সাম্‌লাইয়া বলিল, "না,

এমন-কিছু হয়-নি! তবে কি জানেন, আপনার দুটি মত্ই ভ্রান্ত!"

—"ভ্রান্ত কিসে?"

—"অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, আর, আমার রসবোধ আছে!"

—"মহাকবি! যিনি মহাকাব্য লেখেন-নি, তিনি মহাকবি!"

জয়ন্ত কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, এমনসময় চাকর আসিয়া টেবিলের উপরে খাবারের থালা আনিয়া রাখিল।

অমনি কৈলাসবাবু হাঁচি থামাইয়া টপ্-করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং শূন্যে দুহাত তুলিয়া বলিলেন, "শান্ত হোন, শান্ত হোন, আপনারা শান্ত হোন! খাবার ভরা থালা যখন সাম্‌নে এসে অপেক্ষা করে, তখন হাত-গুটিয়ে মুখবন্ধ করে' তর্ক শোন্‌বার ধৈর্য্য আমাদের নেই! অতএব—"

অতএব কৈলাসবাবু অতুল উৎসাহে বিপুল ভুঁড়িটি দুলাইয়া এবং সাগ্রহে দুই থাবা পাতিয়া খাবারের থালাকে সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ করিলেন।

তিন

জগৎবাবুর বাড়ীর পিছনে খানিকটা খোলা জমি আছে।

সেইখানে একখানি লোহার বেঞ্চির উপরে বসিয়া জগৎবাবুর বড় মেয়ে ইন্দুলেখা আপনমনে গুণ্‌গুণ্ করিয়া গান গাহিতে-ছিল। এমনসময় পিছনে পায়ের শব্দ পাইয়া সে গান বন্ধ করিল। পিছন না-ফিরিয়াই বলিল, "কে?"

—"আমি।"

—"কে জয়ন্তবাবু?"—বলিয়াই ইন্দু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

—"হ্যাঁ, আমি। তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলুম।"

—"দেশ থেকে কবে এলেন?"

—"আজ সকালে।"

—"ভালো আছেন ত?"

—"হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ ইন্দু?"

—"ভালোই আছি। বসুন।"

জয়ন্ত বেঞ্চির একপাশে গিয়া বসিল।

ইন্দুলেখার গড়নটি ছিপ্‌ছিপে—সাধারণ বাঙালী স্ত্রীলোকের তুলনায় সে একটু দীর্ঘাকার—কিন্তু সে দীর্ঘতা তাহার দেহ-খানিকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার ছোট্ট কপালখানির উপরে একরাশি কোঁক্‌ড়া চুল নাচিয়া-নাচিয়া উঠিতেছে। ভুরু-দুখানি যোড়া—যেন এতটুকু একখানি ছবির ধনুকের মতন। ঘনপল্লবের মাঝে উজ্জল ও আয়ত দুটি চোখ—তার দৃষ্টি এমন চঞ্চল, যে দেখিলেই মনে হয়, এ যেন কালো মেঘের মধ্যে রহিয়া-রহিয়া যুগল বিদ্যুতের চমক! ঠোঁটদুখানি পাত্‌লা, যেন রক্তকমলের হাল্‌কা পাপ্‌ড়ি। চিবুকের উপরে একটি তিল—যেন তার চোখের তারা আঁকিবার সময়ে বিধাতার তুলির মুখ হইতে একতিল কালি এখানে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে! বাহুদুখানি নধর-নিটোল, সে পেলবতার তলায় কঠিন হাড় আছে বলিয়া বোঝাই যায় না। ইন্দুর গায়ের রংটিও অপূর্ব্ব,—যেন ভোরের আকাশ হইতে খানিকটা গোলাপী আভা ছানিয়া আনিয়া কে তার সর্ব্বাঙ্গ ছোবাইয়া দিয়াছে।... ...

জয়ন্তের পাশে বেঞ্চির উপরে বসিয়া ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু, আপনি ত দেশে গিয়ে বেশ দিনকতক কাটিয়ে এলেন, আমার কিন্তু এখানে আর মন টিঁকছে না। বাবাকে 'এত ক'রে' বলছি দিনকতক আমাদের নিয়ে বেড়িয়ে আস্‌তে, তা যাচ্চি-যাব ক'রে' এস্তানাগাৎ তাঁর যাওয়া আর হোলই না! কল্‌কাতা ছাড়্‌তে তাঁর গায়ে যেন জ্বর আসে—বাবা বাবা, এমন মানুষ আর ত দেখি-নি!"

—"হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে দেশবিদেশে বেড়িয়ে এলে মনের সঙ্গে-সঙ্গে শরীরেরও উন্নতি হয়।"

ইন্দু তাহার শ্বেতপদ্মের মত শুভ্র পা-দুখানি ঘনসবুজ ঘাসের উপরে দুলাইতে-দুলাইতে বলিল,—"আপনি বেশ আছেন জয়ন্তবাবু, কল্‌কাতা যদি একঘেয়ে লাগে অম্‌নি দেশে পালিয়ে যেতে পারেন। আমাদেরও দেশ আছে, শুনেছি সেখানে নাকি মস্ত তিন-মহল বাড়ীও আছে, কিন্তু আজ-পর্য্যন্ত সব রূপকথার মত শুনেই আস্‌ছি—কিছু চোখে দেখা আর হয়ে উঠল না।"

—"কেন, ইচ্ছে করলেই ত সেখানে তোমরা যেতে পার!"

—"ওরে বাস্‌ রে, কার এমন সাধ্যি আছে বাবাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারে! দেশের নাম না-করতেই বাবা ভয়ে একেবারে আঁৎকে উঠ্‌বেন—চোখ কপালে তুলে বলবেন, সেখানে ঘরে আছে ম্যালেরিয়ার জাগ্রত মশা, বাইরে আছে গোখ্‌রো সাপ আর পুকুরের জলে আছে কলেরার বীজ!"

জয়ন্ত হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তোমার বাবার অম্‌নি-কতকগুলো ছিট্‌ আছে বটে! আর সুধু তিনি কেন, তাঁর সঙ্গে থেকে-থেকে তোমাদেরও ঐ-সব বাতিকে ধরেছে!"

—"কিন্তু জয়ন্তবাবু, পাড়া-গাঁ আমার এত ভালো লাগে যে, কি আর বলব!"

—"কখনো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাক-নি, তাই এ কথা বলছ—সেখানে গিয়ে থাক্‌তে হোলে হয়ত দুদিনেই অরুচি ধরে যেত!"

ঘাড় নাড়িয়া খোঁপা দুলাইয়া চোখ নাচাইয়া ইন্দু বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তা বৈকি, কখ্‌খনো অরুচি ধর্‌ত না! অনেক-দিন আগে রেলগাড়ী ক'রে' আমরা একবার গিরিডি গিয়েছিলুম। পথে যেতে-যেতে দু-ধারে কত যে পাড়া-গাঁ দেখলুম! কোথাও-বা মাঠের ধারে গ্রাম, কোথাও-বা নদীর ধারে, কোথাও-বা সবুজ গাছপালা ঝোঁপ-ঝাড়ের ভিতরে! কত-সব কুঁড়েঘর—পাতা আর খড়ে গড়া, ছোট্ট-ছোট্ট, তাদের আশেপাশে কলাগাছের নিশান উড়ছে, কত-সব তাল-নারকেল-খেজুর গাছ, বাঁশ-বনের 'ঝুপ্‌সী' ছায়ার তলায় পুকুর-ঘাটে কেমন জল থৈ-থৈ করছে, গাঁয়ের মেয়েরা সেখানে কলসী-কাঁখে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে, কত-সব ছোট-ছোট আঁকাবাঁকা পথ—তার কোনটি গাঁয়ের ভিতরে গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেছে, কোনটি-বা মস্ত মাঠের মধ্যে কে-জানে কোথায় কোন্‌দেশে চলে গেছে! সত্যি জয়ন্তবাবু, আমার ভারি ইচ্ছে করে, সেই পথ ধরে ধূ-ধূ-করা মাঠের মধ্যিখানে রাখালের বাঁশীর গান শুনতে-শুনতে খালি-ছুটি আর ছুটি আর ছুটি!"

জয়ন্ত হাস্তমুখে ইন্দুর এই উচ্ছ্বাসভরা প্রাণের কথা চুপচাপ শুনিয়া যাইতেছিল। সে থামিলে বলিল, "আচ্ছা, তুমি যখন গাছপালা এতই ভালোবাস, তখন তোমার এই বাগানটি যাতে নানানরকম গাছে ভরে ওঠে, এবার থেকে আমি সেই চেষ্টা করব।"

এমনসময় জগৎবাবু সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন। তাহাদের দুজনকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা বুঝি এইখানে অন্ধকারে ভূতের মতন বসে আছ? আর আমি সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

ইন্দু বলিল, "এমন চাঁদের আলোতে তুমি অন্ধকার দেখচ বাবা!"

জগৎবাবু হাসিয়া বলিলেন, "চাঁদের আলো দ্যাখবার বয়স আর কি আমার আছে মা! নে, উঠে পড়্—এস জয়ন্ত, ঘরের ভিতরে এস!"

জয়ন্ত উঠিয়া বলিল, "বাইরের ঘর থেকে ওঁরা সব চলে গেছেন নাকি?"

—"হ্যাঁ, আজ একটু সকাল-সকাল আসর ভেঙে গেছে।"

সকলে বাড়ীর ভিতরে একটি ঘরে গিয়া বসিলেন।

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া জগৎবাবু বলিলেন, "এর-মধ্যে নটা বেজে গেছে! ইন্দু, ঠাকুরকে খাবার দিতে বল, জয়ন্ত আজ এইখানেই খেয়ে যাবেন।"

জয়ন্ত বলিল, "না, আজ থাক্—বাসায় খাবার তৈরি হয়েছে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "না-হয় সেগুলো আজ ফেলাই যাবে!"

একটু পরে জগৎবাবুর সঙ্গে জয়ন্ত খাইতে বসিল। ইন্দুলেখা পরিবেষণ করিতে লাগিল।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ইন্দু তখন কতকগুলি আম ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিল।

জগৎবাবুর পাতে আম ও মিষ্ট দিয়া ইন্দু যেমনি জয়ন্তের পাতে দিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে, জগৎবাবু অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ইন্দু, দিস্-নে—দিস্-নে।"

ইন্দু তাড়াতাড়ি হাত গুটাইয়া লইল। জগৎবাবু রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হাঁকিলেন, "ঠাকুর! শীগ্গির এদিকে এস!"

রাঁধুনে বামুন যখন আসিল, তাহার দিকে কট্মট্ করিয়া চাহিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "আম আজ সিদ্ধ কর-নি কেন?"

মুখ চুণ করিয়া বামুন বলিল, "আজ্ঞে, ভুলে গেছি!"

—"ভুলে গেছ! লোককে প্রাণে মারবার ফিকির, না?"

কথাটা এই। জগৎবাবু আম প্রভৃতি ফল আগে একবার গরমজলে না-ডুবাইয়া খাইতেন না। পাছে কোনরকম রোগের 'জার্ম্' বা বীজ বিনা-নোটিসে শরীরে ঢুকিয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতেন! যে-সব ফল সিদ্ধ করা চলিত না, সে-সব তিনি নিজেও খাইতেন না এবং বাড়ীর আর কারুকেও খাইতে দিতেন না। বাজারের কোন মিষ্টান্নও এ বাড়ীতে কেউ খাইতে পাইত না—

পাছে কোন সংক্রামক ব্যাধি সেই ফাঁকে দেহের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিয়া বসে!

যাহা হৌক,—বাবুর হাতে-পায়ে ধরিয়া বামুনের চাকরিটি সে যাত্রা টিকিয়া গেল বটে, জয়ন্তের ভাগ্যে সেদিন কিন্তু আম খাওয়া আর হইল না!

জগৎবাবুও পাতের আম পাতেই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন; চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "ওরে বাস্‌রে, এখনি হয়েছিল আর কি, ও আম খেলে আর দেখতে-শুনতে হোত না—ও কি আম, ও যমালয়ে যাবার পরোয়ানা! বড্‌ড বেঁচে যাওয়া গেছে হে জয়ন্ত!"

বহুকষ্টে হাসির বেগ্ সাম্‌লাইয়া জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ তবে আসি!"

ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু, কাল একটু সকাল-সকাল আস্‌বেন।"

ইন্দুর হাত হইতে পাণ লইয়া জয়ন্ত বলিল, "আচ্ছা।"

... ...

আজ বহুদিন হইল, জয়ন্তের সঙ্গে জগৎবাবুদের আলাপ হইয়াছে।

বাসা বদ্‌লাইয়া জয়ন্ত যে নূতন বাড়ীখানি ভাড়া করে, সেখানি ঠিক জগৎবাবুর বাড়ীর সাম্‌নেই, এ ফুটপাথের উপর।

জয়ন্ত গান-বাজ্‌না বড় ভালোবাসিত। সে যখন হারমোনিয়ামের সঙ্গে গান ধরিত, কিংবা আপন মনে বাঁশী বাজাইত, তখন রাস্তার উপরে লোকের পর লোক জমিয়া যাইত। এমন মিষ্ট গান বা এমন চমৎকার বাজ্‌না সহজে যেখানে-সেখানে শোনা যায় না। সে সুরের মন্ত্রে মরামানুষও যেন জাগিয়া উঠে।

সাম্‌নের বাড়ীর জগৎবাবুর কাণেও সে সুর গিয়া পৌঁছিল। বাঙ্‌লাদেশে পাড়ায়-পাড়ায় হামেসা যে-রকম গান-বাজ্‌না হয়, কাণের পোকা বাহির করা ছাড়া তার আর-কিছু সার্থকতা থাকে না;—এমন-কি, সময়ে-সময়ে পুলিস ডাকিয়া পল্লীবাসী তানসেনদের স্তব্ধ করিতে না-পারিলে প্রাণ-বাঁচানো শক্ত হইয়া উঠে! কিন্তু জয়ন্তের গানে এ বিভীষিকা ছিল না!

অতএব, কৌতূহলী জগৎবাবু এর-তার মুখ হইতে খোঁজ লইতে লাগিলেন, এই গীতসিদ্ধ যুবকটি কে!......শুনিলেন, সে মফস্বলের এক জমিদারের ছেলে, কলিকাতার কোন কলেজে এম-এ পড়ে এবং তাঁহাদেরই স্বজাতি!

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায়, জয়ন্তের বাঁশী পূরবীর উদাস সুরে ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছে, হঠাৎ জগৎবাবু আসিয়া তাহার বৈঠকখানায় ঢুকিলেন।

বাজ্‌না থামাইয়া জয়ন্ত বলিল, "আসুন, বসুন।"

জগৎবাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "আমি সাম্‌নের বাড়ীতেই থাকি—আপনার বাজ্‌না আজ আমাকে বাড়ী থেকে এখানে টেনে এনেছে।"

একটু হাসিয়া জয়ন্ত তার বাঁশীতে আবার ফুঁ দিল। জগৎবাবু চোখ বুঁজিয়া তালে তালে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। বাঁশীর

রাগিনী আবার বাজিতে লাগিল—কখনো উর্দ্ধে, কখনো নিম্নে, কখনো কড়িতে, কখনো কোমলে। বিভোর হইয়া অনেকক্ষণ বাজাইয়া জয়ন্ত যখন থামিল—জগৎবাবুর মাথা-নাড়াও তখন একেবারে থামিয়া গিয়াছে, এবং মুখখানি বুকের উপরে একপেশে হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

জয়ন্ত দু-একবার ডাকিয়া সাড়া না-পাইয়া বুঝিল, তাহার এই অপূর্ব্ব শ্রোতাটি এখন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন!

পরদিনই জগৎবাবু আসিয়া জয়ন্তকে নিজের বাড়ীর আসরে জোরজার করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। তাহার গানে আর বাজনায় সেদিনকার আসরটি একেবারে জমজমাট হইয়া উঠিল।

কিছুদিনের আলাপ-পরিচয়েই জগৎবাবু বুঝিলেন যে, এই যুবকটি সুধু রূপ, অর্থ ও বিদ্যা সম্পদেই ধনী নয়, চরিত্র সম্পদে এবং হৃদয়-ধনেও তাহার সমকক্ষ সহজে মেলা দুর্ঘট।... ...তিনি জয়ন্তকে অনুরোধ করিলেন, ইন্দুলেখাকে গান শিখাইবার জন্য। জয়ন্তেরও তাতে অমত হইবার কোন হেতু ছিল না।

এম্‌নি-করিয়া জয়ন্তের সঙ্গে এই পরিবারের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতায় একজনের চোখ বিষম টাটাইয়া উঠিল; সে অবনী।

অবনী, জগৎবাবুরই এক প্রতিবেশী। তাহার বাপ দালালী করিয়া যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তা অত্যন্ত অসামান্য না-হইলেও নিতান্ত সামান্য নয়। তার উপরে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলারসিপ পাওয়াতে বিয়ের বাজারে অবনীর পসার বাড়িয়া গিয়াছিল যৎপরোনাস্তি। আজকাল বড়-বড় ঘর হইতে তাহার যে সমস্ত সম্বন্ধ আসিতেছে—তাহাতে সম্মতি দিলে সে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও একটি রাজকন্যা না-পাইলেও একটি রূপসী মেয়ে এবং অন্তত হাজার-দশেক টাকা অনায়াসে হাতাইতে পারে! কিন্তু রাঙা বউ এবং চকচকে টাকার প্রতি যথোচিত টান্ থাকিলেও এ-সব সম্বন্ধে সে একেবারেই গা করিতেছে না।

জগৎবাবুর একটি মস্ত গুণ ছিল,—ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই তিনি সমান ভাবে মিশিতে পারিতেন। তাই বয়সে অনেক ছোট হইলেও অবনীর সঙ্গে তাঁহার মেলা-মেশায় কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। অন্য সকলে যেমন যায়, অবনীও তেম্‌নি নিয়মিতরূপে জগৎবাবুর বন্ধুসভায় গিয়া হাজির হইত।

পর্দ্দা খাটাইয়া এবং পাঁচিল গাঁথিয়া অন্তঃপুরের নারীদের অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া তুলিতে জগৎবাবুর যথেষ্ট আপত্তি ছিল সত্য; কিন্তু তা-বলিয়া তিনি অন্তঃপুরে সকল বন্ধুকেই ঢুকিতে দিতেন না। তাঁহার যে দু-চারজন বাছা-বাছা বন্ধুর এ সৌভাগ্য ছিল, অবনীও তাহাদের একজন।

অবনীর মুখের এবং বুকের আধখানা যুড়িয়া যে অত্যন্ত-গম্ভীর দাড়ীর অরণ্য, তাহার মধ্যে যে কোনরকম কোমল বৃত্তি বাসা বাঁধিতে পারে, এটা চট্ করিয়া বুঝিয়া উঠা ভারি শক্ত ছিল। কাজে-কাজেই জগৎবাবু একদিনও এমন সন্দেহ

মনে আনেন নাই, তাঁহার কন্যা ইন্দুলেখাকে সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক !

অবনী এখনো মুখ ফুটিয়া জগৎবাবুর কাছে তাঁহার কন্যার পাণিপীড়নের প্রস্তাব দাখিল না-করিলেও প্রায়ই জগৎবাবুকে শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিত, "অমুক জমিদার মেয়ে নিয়ে তাকে ভারি সাধাসাধি করছে। অমুক ডেপুটি তাকে এত টাকা আর নিজের একমাত্র মেয়েকে দিতে প্রস্তুত। সে কিন্তু রাজি নয়।"—ইত্যাদি।

জগৎবাবুও মনে-মনে ভাবিতেন, 'এ লোকটির পক্ষে বিবাহ করার চেয়ে না-করাই হচ্ছে পরম স্বাভাবিক; কেন না এ-হেন দাড়ির আবির্ভাবে বাসর-ঘরে বিদ্রোহ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা।' কিন্তু এমন ভালো-ভালো সম্বন্ধে অবনীর এতটা অরুচির আসল কারণ যদি জগৎবাবু বুঝিতে পারিতেন, তাহাহইলে তিনি জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতেন !

যাহা হোক্—এম্‌নি ভাবে দিন যাইতেছিল; কিন্তু এর-মধ্যে আচম্বিতে জয়ন্তের আগমনে সমস্তই ওলট্‌পালট্ হইয়া গেল। কারণ, প্রথমত—কথাবার্ত্তায়, গানে-বাজনায় জয়ন্ত একেবারে আসর জম্‌কাইয়া তুলিল; দ্বিতীয়ত—জয়ন্তের প্রতি জগৎবাবুর পক্ষপাতিতা ক্রমেই চরমে উঠিতেছে; তৃতীয়ত এবং প্রধানত—ইন্দুলেখাও যেন জয়ন্তকে অত্যন্ত পছন্দ করে বলিয়া সন্দেহ হয় !

—অতএব, জয়ন্তের উপরে অবনী হাড়ে-হাড়ে চটিয়া গেল। ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মুদ্রাযন্ত্র

(ফরাসী হইতে)

ধর্ম্মঘটিত সংস্কার, সামাজিক সংস্কার রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার—এই সমস্ত সংস্কার, মুদ্রাযন্ত্র ও সাহিত্যের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে মুদ্রাযন্ত্রও সাহিত্যের এই সকল সংস্কারের মুখ্য উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

মুদ্রাযন্ত্রের ক্রমোন্নতির মধ্যে ভারতীয় সমাজের ক্রমাভিব্যক্তি আমাদের নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। পূর্ব্বে, লিখিবার অধিকার, চিন্তা করিবার অধিকার একটি বিশেষ জাতের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল; আজিকার দিনে, সকলেই নিজ মতামত সংবাদ-পত্রাদিতে প্রকাশ করিতে পারে, সংবাদ-পত্রাদির মতামত সকলেই প্রকাশ্যভাবে বিচার-আলোচনা করিতে পারে। তাছাড়া, মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা প্রকাশ পায়, ভারতীয় সভ্যতা ও য়ুরোপীয় সভ্যতা উত্তরোত্তর কেমন বেশ মিশিয়া যাইতেছে। মুদ্রাযন্ত্ররূপ এই সম্পূর্ণ ইংরেজী প্রতিষ্ঠানটি লক্ষ লক্ষ হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনের একটি মুখ্য উপাদান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অন্য সকল বিষয়েরই ন্যায় মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধেও,

উত্তমের বেগটা জেতৃজাতি হইতেই আসিয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র বাহির হয়; দেশীয় ভাষার প্রথম সংবাদপত্র ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মিশনরীরা মুদ্রিত করেন।

তাহার কিছুকাল পরেই—বিশেষত ১৮৩৫ অব্দের অপেক্ষাকৃত উদার আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর—দেশীয় লোকেরা সাহসপূর্ব্বক এই কাজে প্রবৃত্ত হইল। বঙ্গদেশে মানসিক চেষ্টা-উদ্যমের নেতা ছিল দুইটি সংবাদপত্র;—"সংবাদ প্রভাকর" ১৮৩০ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। এই সংবাদপত্র পুরাতন পন্থীদিগের মুখপত্র ছিল; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার পর অক্ষয়কুমার দত্তকর্ত্তৃক সম্পাদিত "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা" নব-হিন্দুদিগের দাবীদাওয়ার সমর্থন করিত।

১৮৬৭ অব্দের আইনে, মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য-প্রসার খুব বাড়িয়া গেল; কিছুকাল পরে, লর্ড-লিটন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিলেন, কিন্তু লর্ড-রিপন্ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ-পুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত সমস্ত বারণ-বাধা উঠাইয়া দিলেন। (১)।

ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের কতটা উন্নতি ও বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য কতক-গুলি সংখ্যাঙ্ক নিম্নে দিতেছি।

১৯০০—১৯০১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ৬৯৫, বোম্বাই প্রদেশে ৪৬৩ (তন্মধ্যে গুজরাটিতে ২২৮, মারাঠীতে ১০১ ও ইংরাজীতে ৭৭) সাময়িক পত্র বাহির হয়; মাদ্রাজে ১৩০ সংবাদপত্র; ১৮৯৯—১৯০০ অব্দের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যায় ৮৬ সংবাদপত্র; পঞ্জাবে ১১৭ সাময়িক পত্র, তন্মধ্যে ইংরেজীতে ২৪, ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় ১, গুরুমুখীতে ২, হিন্দিতে ২।

* * * *

ভারতের সরকারী সংবাদপত্র—Gazette of India। প্রাদেশিক বিভাগগুলিতেও ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় তাহাদের স্বকীয় গেজেট আছে।

ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র। একদিকে ভারতের ইংরেজদিগের জন্য ইংরেজদিগের সংবাদ-পত্র। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—Allahabad Pioneer—গবর্ণমেণ্টের সরকারী পত্র; Calcutta Englishman, Bombay Gazette, Indian Daily News এবং Timnes of India.

পক্ষান্তরে, ইংরেজী ভাষায় লিখিত দেশীয় লোকের এবং য়ুরোপীয়ধরণে শিক্ষিত হিন্দুদের সংবাদপত্র। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য—M. Malabari's Indian Spectator; তাহার পর Voice of India—ইহাও মালাবারীর কাগজ; তার পর Hindu Patriot, Indian Mirror (বঙ্গদেশে)।

প্রধান প্রধান দেশীয় সংবাদপত্র:—"বঙ্গবাসী" (গ্রাহক-সংখ্যা ২০,০০০), "দৈনিক চন্দ্রিকা"; "সাহিত্য-সংহিতা"—ইহা একটি উল্লেখযোগ্য দার্শনিক ও সাহিত্যিক পত্র। হিন্দী:—বেনারসের "ভারত-জীবন" (গ্রাহক-

(১) Sir Charles Metcalfeএর আইন,—১৮৩৫; ১৮৬৭ অব্দের X.X.V. আইনের দ্বারা ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র, ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায় সমান স্বাধীনতা লাভ করে,—এবং একই বারণ-বাধা স্থাপিত হয়।

সংখ্যা ১৫০০), উর্দ্দ :—লাহোরের Paisa Akhbar (গ্রাহক-সংখ্যা ১৩,০০০)।

*   *   *

ইংরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে অনেকগুলিই বেশ যোগ্যতা ও ধীরগাম্ভীর্য্য সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে; তদ্বিপরীতে আর কতকগুলি, মান্য ব্যক্তিদের প্রতি অবমাননার শেষ সীমায় গিয়া উপনীত হইয়াছে।

ইংরেজী সংবাদপত্র—Bengal Times হইতে পূর্ব্বে যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত হয়, সেটি এই ধরণের।

দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুইটী প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, উহাও এই প্রকার! উহার মধ্যে একটি প্রবন্ধ ১৮৮৮ অব্দে "দৈনিক 'চন্দ্রিকায়" প্রকাশিত হয়; ইহা লর্ড-ডফরীনের বিদায়-সম্ভাষণ উপলক্ষে লিখিত। লর্ড-ডফরীন পাঁচ বৎসর রাজ-প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার কাজ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান :—

"ডফরীন, তুমি নিজ গৃহে ইংরেজদিগের মধ্যে ফিরিয়া যাও। তোমার প্রস্থানে আমরা একটুও দুঃখিত নহি, বিনা অশ্রুপাতে আমরা তোমাকে বিদায় দিতেছি। কারণ, "আভার কৌণ্ট" বলিয়াই আমরা তোমাকে জানি। ভারতবাসীর প্রতি তোমার একটুও মমতা নাই। তোমার একটু হৃদয় আছে শুনিয়াছিলাম; যাহারা এইকথা বলে, তোমার প্রতি তাহাদের হৃদয়ের অনুরাগ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিজের নিতান্তই মস্তিষ্কের অভাব সন্দেহ নাই। অ্যাঙ্‌লো আইরিস্ জমিদার! তোমার মতে, ভারত শুধু ভারতীয় ইংরেজের সুখ-সুবিধা ও ধনসঞ্চয়ের জন্যই অবস্থিত; রুসিয়ার সহিত যুদ্ধের অছিলায়, তুমি ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ গ্রহণ করিয়াছ।"

২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ অব্দে চন্দ্রনগরে প্রকাশিত "প্রজাবন্ধু" নামক বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ইংরেজরা মূর্ত্তিমতী শঠতা; উহারা কাহারও ভালো দেখিতে পারে না, কাহারও উন্নতি সহিতে পারে না। ইংরেজের সম্মুখে নত হও, ইংরেজ তোমার কিছু উপকার করিবে; মাথা উঁচু কর—তোমাকে দুচক্ষে দেখিতে পারিবে না ... ... ইংরেজ, মুসলমানদিগকে আশ্রয় দেয়, এবং হিন্দুদিগকে উৎপীড়ন করে। কিন্তু ইংরেজকে একদিন ইহার ফল ভোগ করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অসহিষ্ণু হইয়া, হিন্দু ও মুসলমান কোন অপকর্ম্ম করিতেই পরাঙ্মুখ হইবে না। এইরূপ প্রজাদিগের মধ্যে বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত করাতেই সিরাজুদ্দৌলার রাজত্ব ইংরেজের হস্তগত হয়। সম্পদের শিখরে উঠিয়া সিরাজুদ্দৌলার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। ইংরেজেরও কি মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে?"

ইহা অপেক্ষাও উগ্রধরণের প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; সেই প্রবন্ধে, পূর্ব্ব বল-বীর্য্য হিন্দুদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ও ম্লেচ্ছনিধনে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য দুর্গার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, হত্যা ও বিদ্রোহ করিতে লোকদিগকে আহ্বান করা

হইয়াছে; এই নৈতিক মারী হইতে যে সকল হাঙ্গাম উপস্থিত হয় তাহার দরুণ অনেকগুলি সংবাদপত্র খুব কঠোর দণ্ড-ভোগ করিয়াছিল। (২)

* *
*

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করায় অনেকে লর্ড রিপণের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু, কে শত্রু, কে মিত্র তাহা জানা এবং স্বেচ্ছাতন্ত্র-শাসনের দরুণ যে-সকল বিপদের আশঙ্কা আছে তাহা পূর্ব্ব হইতে অবগত হওয়া,—ইহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে, বিশেষত স্বেচ্ছাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কি বাঞ্ছনীয় নহে? এবং ইহাও কি স্বাভাবিক নহে, যে-দেশের লোক বহুকাল হইতে উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছে, শেষে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিলে প্রথম-প্রথম তাহারা সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করিবে?

আমার মতে, যাহা মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হয়, তাহাই আধুনিক ভারতের হুবহু প্রতিরূপ, আধুনিক ভারতের অনিশ্চিততা, উগ্রতা, ভীরুতা, পাপ, পুণ্য, এবং য়ুরোপের সভ্যতা যাহাকে যুগপৎ আকর্ষণও করে পরাঙ্মুখও করে সেই যে এসিয়াবাসীর অন্তরাত্মা সেই অন্তরাত্মার আশ্চর্য্য ইতস্তত: ভাব ও সঙ্কোচ দ্বৈধভাব—এই সমস্তই উহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হাত-ফের

(গল্প)

নিবারণ বাড়ীর বড়-ছেলে হলেও সংসারের সব-চেয়ে বড় বোঝাটা মাথায় তুলে নেবার মত শক্তি তার কাঁধে তখনো হয়নি। তার বাবা তিন-চারিটি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার-সমুদ্রে কোনোরকমে টাল খেতে-খেতে একটা অজানা আঘাটায় তাদের নামিয়ে রেখে যখন সরে পড়েছিলেন, তখন সে নিতান্ত শিশু।

তার মা গ্রামের লোকেদের বাড়ি কাজ-কর্ম্ম করে কোনোরকমে তাদের ছোট সংসারটি চালিয়ে নিত; কিন্তু সে-রকম করে বেশীদিন আর চলল না; দু'এক বছর যেতে-না-যেতেই দেশে দুর্ভিক্ষ এল; কিছু দিন বাদে, যারা তাদের সাহায্য করত তাদেরই দিন-চলা ভার হয়ে উঠল।

নিবারণ তখন গ্রামের এনট্রেন্স্ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তার মা তাকে অনেক কষ্টে লেখা-পড়া শেখাচ্ছিল, কিন্তু

(২) মুদ্রাযন্ত্রের অপরাধ-ঘটিত কোন ভারতীয় আইন নাই; কিন্তু ইংরেজি আইনের ন্যায়—যাহারা অপরাধ করিতে মন্ত্রণা দেয় তাহারা অপরাধী ব্যক্তির সহচর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। উক্ত দুই প্রবন্ধ, H. Samuelson-এর India Past and Present গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শেষে এমন হল যে দিন আর চলে না। ছোট ভাই-বোনদের ক্ষিধের কান্না আর মায়ের বুকফাটা চোখের জল দেখে-দেখে নিবারণের দিন-কাটানো অসহ্য হয়ে উঠল। সে শুনেছিল সহরে গিয়ে চেষ্টা করলে নাকি অর্থ উপায়ের সুবিধা হতে পারে। লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে বড়-লোক হ'য়ে সংসারের দুঃখ ঘোচাবার একটা দুরাশা অনেকদিন তাকে প্রলুব্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু শেষটা তাকে বাধ্য হয়ে তার মায়া কাটাতে হল।

একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে কলকাতায় চলে এল। রইল তার পড়া-শুনো, রইল তার ভবিষ্যতের সেই রঙিন ছবিগুলো—কল্পনার তুলি দিয়ে যে-গুলোর উপরে এতদিন ধরে সে হাত-বুলিয়ে এসেছিল।

বর্ষার একটা সন্ধ্যায় সে সহরে এসে নাম্‌ল। এখানে কারো সঙ্গে তার পরিচয় নেই। সে এখন যায় কোথায়? একটা রেলের কুলি তাকে যাত্রীদের বিশ্রামের ঘরখানা দেখিয়ে দিলে; সেইখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবার জন্যে হাজার-হাজার যাত্রীর মধ্যিখানে একটু জায়গা করে নিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

রাত্রিটা একরকম জেগেই কেটে গেল। এত আলো সে জন্মে-কখনো দেখে-নি; আর এত গোলমালও এর আগে কখনো শোনে-নি। এই হট্টগোলের ভিতরেও মানুষ এমন স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পারে দেখে সেদিন সে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল।

সকালবেলা ষ্টেশন ছেড়ে সে সহরের ভিতর ঢুকল। ঘোড়ার গাড়ী, ট্রামগাড়ী, মটরগাড়ীর মাঝখানে পড়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে বেচারী পদে-পদে আপনাকে বিপন্ন করে তুলতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সহরের চারিদিকে ঘুরে প্রায় সন্ধ্যার সময় একটা দোকান থেকে দু-পয়সার মুড়ি কিনে খেয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে সে বসল।

গঙ্গার ধারটা সহরের অন্য জায়গায় চেয়ে অনেকটা নিস্তব্ধ। ঘাটের একটা ধাপের উপর চুপ করে বসে-বসে সে ভাবতে লাগল—মা, ভাই, বোন। সুদূর সেই পল্লীগ্রাম থেকে তাদের কান্না যেন বাতাসে ভেসে এসে তার কানে পৌঁছতে লাগল।

তার চোখে জল আসছিল। কি করবে সে একা এই সহরে? অসহায় অপরিচিত সে কি করে অর্থ-উপায় করে বাড়ীতে পাঠাবে? তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। একবার ভাবলে যাই বাড়ী ফিরে, যেমন করে হোক দিন সেখানে কেটে যাবে; না-হয় সকলে একসঙ্গে গলাগলি হয়ে মরে থাকব! ট্যাঁকে তার যে ক'টা পয়সা ছিল একবার বার করে গুণে দেখে আবার সেগুলো ট্যাঁকেই গুঁজে রাখলে। তারপর আবার মনে হ'ল বাড়ীর সবাই অনাহারে দিন কাটাচ্ছে, আমার আশাতেই পথ চেয়ে বসে আছে। এই সব ভাবতে ভাবতে তার কান্নার বেগ ক্রমেই বেড়ে গেল,—মুখে কাপড় দিয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—"কিরে ছোঁড়া, এখানে বসে কি কচ্ছিস?"

নিবারণ চম্‌কে উঠল। সহরে এসে অবধি কারো সঙ্গে তার কথা হয়-নি। হঠাৎ এই সম্ভাষণে সে একেবারে ভড়্‌কে গেল।

সে পাশ ফিরে দেখলে, একটা লোক—যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। অন্ধকারে তার মুখখানা ভাল দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার চোখদুটো জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বল্‌ছিল। সেই চেহারা দেখে নিবারণের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। তার কান্না থেমে গিয়েছিল কিন্তু তখনো তার গলা দিয়ে থেকে-থেকে কান্নার একটা হেঁচ্‌কি উঠছিল। সে কি উত্তর দেবে কিছু ভেবে ঠিক করবার আগেই লোকটা বলে উঠল—"ইস্, আবার কান্না হচ্ছে? আদুরে গোপাল আমার রে! কাঁদছিস্ কেন? ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?"

অজ্ঞাতসারে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"হ্যাঁ।"

ক্ষিদে তার পেয়েছিল সত্যি। সমস্ত দিন অনাহারের পর দু-পয়সার মুড়ি খেয়ে পাড়াগেঁয়ে ছেলের পেট ভরেনা, কিন্তু সে-লোকটাকে ক্ষিদের কথা জানাবার তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

লোকটা নিবারণের হাতখানা ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বল্‌লে—"ক্ষিদে পেয়েছে ত এখানে বসে কি কচ্ছিস্? চল্।"

মন্ত্রচালিতের মত নিবারণ তার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে লোকটা বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে তাকে বল্‌লে—"ক্ষিদেই যদি পেয়ে থাকে তবে গঙ্গার ধারে মরতে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাবি খেয়ে-দেয়ে হাত-মুখ ধুতে, বুঝলি ছোঁড়া!"

নিবারণ ভয়ে-ভয়ে একটা ছোট্ট "হ্যাঁ" বলে তার সঙ্গে সঙ্গে সুড়্‌সুড়্ করে চলতে লাগল।

তারপর এ-গলি সে-গলি—এম্‌নি করে প্রায় আধঘণ্টা ঘুরে তারা একটা হোটেলে গিয়ে ঢুকল।

হোটেল-ওয়ালাকে খাবার দিতে বলে লোকটা পকেট থেকে একটা মদের বোতল বার করে গেলাসে ঢেলে মাঝে মাঝে তাতে চুমুক মার্‌তে লাগল।

খাবার যা এল তার আকার আস্বাদন সবই নিবারণের কাছে একেবারে নতুন। ক্ষিদের ঝোঁকে দু-এক কামড় খাবার পর তার আর খেতে প্রবৃত্তি হল না। মদ আর মাংসের একটা বিকট মিশ্র-গন্ধে তার পেটের ভিতর থেকে বমি ঠেলে উঠতে লাগল। সে-লোকটা মদের গ্লাসটা নিবারণের দিকে এগিয়ে দিয়ে জড়ান-জড়ান স্বরে বল্লে—"একটু খাবি?"

নিবারণ ঘাড় নেড়ে জানালে—"না।"

একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করলে—"তোর নাম কিরে?"

সে ভয়ে ভয়ে বল্লে—"নিবারণ।"

এক গাল হেসে লোকটা বলে উঠল—"বা-রে, বেড়ে নাম ত—নি-বা-র-ণ!"

একটু চুপ করে থেকে খানিকটা আধসিদ্ধ মাংস চিবোতে চিবোতে সে আবার বল্লে—"আমার নাম কেষ্ট, বুঝলি?" আবার খানিক চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে—"এখানে কি করিস্?"

নিবারণ উত্তর দিল—"টাকা রোজগারের চেষ্টায় এসেছি!"

হো-হো করে একটা বিকট হাসি হেসে কেষ্ট বলে উঠল—"বা-রে আমার মাণিক! টাকা রোজগারের চেষ্টায় গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেছিলি?—টাকা রোজগার করতে চাস তো আমার সঙ্গে চল্। তুই নৌকো বাইতে পারিস্?"

নৌকো বাইবার কথা শুনে নিবারণের মনে স্ফূর্ত্তি দেখা দিলে; ছেলেবেলা থেকে খেলার মধ্যে এইটেই তার প্রধান খেলা ছিল। সে উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল—"নৌকো চালানো? ওঃ, সে আমি খুব পারব।"

কেষ্ট তার পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বল্লে—"তুই ত খলিফা ছেলে দেখছি,—নে, নে, একটু টেনে নে।"

এই টেনে নেওয়ার কথাটার মানে যে কি, নিবারণ ভাল করে বুঝতে পারলে না। সে একটু থতমত খেয়ে নিজের চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি টান্‌ব?"

গেলাসটা একটু এগিয়ে দিয়ে কেষ্ট বল্লে—"নে, এইটুকু চোঁ-করে মেরে দে।"

নিবারণ মাথা নেড়ে বল্লে—"না, ও-সব আমি খাই না।"

"খাস্‌না?"—বলেই সে গেলাসটা এক-চুমুকে নিঃশেষ করে হাত ধুয়ে তাকে বল্লে—"চল্। পারবি ত? দেখিস্!"

নিবারণ জোরে মাথা নেড়ে উত্তর দিলে—"হুঁ, খুব পারব।"

তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে তারা আবার গলি-ঘুঁজি দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে গঙ্গার ঘাটে এসে পড়ল। জেটির ধারে একখানা ছোট নৌকো বাঁধা ছিল, তার উপরে তারা চড়ে বসল।

নিবারণের হাতে একটা দাঁড় তুলে দিয়ে কেষ্ট নিজে গিয়ে হালে বসল। তার পর একটু-একটু করে নৌকোখানাকে মাঝ-গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে বল্লে—"নে, দাঁড় টান, কিন্তু দেখিস্, বেশী তাড়াতাড়ি করিস্‌নি। অনেক দূর যেতে হবে, হাঁপিয়ে যাবি।"

—"আচ্ছা" বলে সে আস্তে আস্তে দাঁড় ফেলতে লাগল।

রাত্রির প্রথম-প্রহর তখন প্রায় কেটে গেছে। বর্ষার এক-আধখানা পাতলা মেঘ চাঁদের পাশ দিয়ে দৌড়-দৌড়ি করছে। ক্রমে মেঘগুলো সব একজোট হয়ে চাঁদ-খানাকে একেবারে ঢেকে ফেল্লে। চারিদিকে অন্ধকার, কেবল দূরে প্রাসাদের মতন বড়-বড় জাহাজগুলোর ছোট ছোট জান্‌লা দিয়ে মাঝে মাঝে এক-একটা আলোর টুকরো নদীর জলের উপর লম্বা হয়ে পড়ে তখনি আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল। একখানা জাহাজ থেকে একটা তীব্র বাঁশীর আওয়াজ নদীর দুকূল ঝনঝনিয়ে আবার হাওয়ার গায়ে মিলিয়ে গেল। জাহাজের বাঁশীকে যেন লজ্জা দেবার জন্যেই আকাশ থেকে একখণ্ড মেঘ একটা ছোটখাট হুঙ্কার ছেড়ে তখনি আবার চুপ করলে। মনে হল যেন উপরকার ঐ বিরাট কালো দেহটা নিজের গলাটাকে একটু শানিয়ে নিলে। অন্ধকারে উঁচু-উঁচু জাহাজের মাস্তলগুলো দেখে নিবারণ ভয়ে-ভয়ে কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলে—"ওগুলো কি?"

কেষ্ট ত্রস্তভাবে একবার চারদিকে তাকিয়ে

নিয়ে বললে—"কোথায় কি? নে, নিজের কাজ কর্।"

—"ঐ যে উঁচু-উঁচু।"

—"ক্যাব্লা ছেলে! ওগুলো জাহাজের মাস্তুল। নে, নে, তাড়াতাড়ি বেয়ে চল্।"

জাহাজের ভিড়ের মধ্যে সরু সরু গলির ভিতর দিয়ে তারা সাবধানে বেয়ে চলতে লাগল।

কেষ্ট আস্তে আস্তে নিবারণকে বল্লে,—"ত্মাখ্, বেশী সপ্সপ্ আওয়াজ করিস্নি, জাহাজের লোকেরা টের পেলে বড় ফ্যাসাদ বাধাবে।" তারপর আপনা-আপনি বলতে লাগল,—"ব্যাটারা আজকাল ভারি ধর-পাকড় স্বরু করেছে।"

কথাগুলো নিবারণের কানে যেতেই তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। ভয়ে তার হাত-ছুখানা গুটিয়ে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে, আওয়াজ না-করে দাঁড় ফেল্তে ফেল্তে কখন্ যে তার দাঁড়-টানা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল সে নিজেই বুঝতে পারলে না। কেষ্ট দাঁত-খিঁচিয়ে বল্লে—"কিরে, থামলি বড় যে?"

হঠাৎ তাড়া খেয়ে সে আবার ঝপ্ ঝপ্ করে দাঁড় বেয়ে চলতে লাগল।

এবার কেষ্ট তার জায়গা ছেড়ে উঠে এসে তার সাম্নে দাঁড়িয়ে হাত-ছুটো নেড়েনেড়ে বলতে লাগল—"ফের্ শব্দ করে! শেষটা নিজেও মরবি, আমাকেও মারবি! যা বল্‌চি তা যদি না শুনিস্ তবে একটি চড়ে কাবার করে দিয়ে এই গঙ্গার জলে তোকে ভাসিয়ে দেব।"

কেষ্টর সেই বিকট হাবভাব দেখে নিবারণের অন্তরাত্মা ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল। তার কেবলই মনে ভয় হ'তে লাগল এ কোন্ অজানার দিকে সে নৌকো বেয়ে চলেছে, আর অলক্ষ্যে চুম্বকের মত একটা বিপদ তাকে আকর্ষণ করছে। আজ্কের এই ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে যে লোকটা তার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার কর্ণধার, কে জানে সেই-বা কে! নানান ভয় ও ভাবনায় বেচারী একেবারে মুস্ড়ে পড়ল। আরো-একটু নৌকো বাইবার পর সে কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"আর কতদূর যেতে হবে?"

সাম্নের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে কেষ্ট উত্তর দিলে—"আর একটু।"

আরও কিছুক্ষণ দাঁড় ঠেল্বার পর কেষ্ট উঠে তাকে বল্লে—"ত্মাখ্, ঐ যে আলোটা ত্মাখা যাচ্ছে, ওটা একটা ঘাঁটি, ঐটে, পেরোলেই আর কি—"

আস্তে আস্তে দম বন্ধ করে নিবারণ জায়গাটা পার হয়ে চলে গেল। তারপর একটা সরু জেটির কাছে এসে কেষ্ট নৌকো ভিড়িয়ে নৌকোর খোলের ভিতর থেকে কতকগুলো কি জিনিষ বার করে নিয়ে নেমে গেল। যাবার সময় বলে গেল।—"যতক্ষণ-না আমি আসি এইখানে বসে থাক্!"

নিস্তব্ধ সেই জায়গাটায় বসে থাকতে-থাকতে নিবারণের গা ছম্ছম্ করতে লাগল। তার বুকের ভিতর এতক্ষণ ভাবনা আর ভয় এই ছুটো জিনিষেরই লড়াই চলছিল, এবার ভাবনাটা গিয়ে ভয়টাই তার মনের উপর সওয়ার হয়ে বসল। সে নিজের

শরীরটা যতদূর সম্ভব ছোট-করে এককোণে সরে গিয়ে বসল। একবার মায়ের মুখখানা মনে পড়ল, তারপর ছোট-ছোট অনাহারক্লিষ্ট ভাইবোনদের! ভয়ে দুঃখে যখন সে প্রায় আধমরা হয়ে নৌকোর খোলের উপর নিজের দেহটা বিছিয়ে দিয়েছে তখন হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে কেষ্ট ফিরে এল।

কেষ্ট নৌকোতে পা দিয়েই নিবারণকে একটা লাথি মেরে তুলে দিয়ে বল্লে—"চল্, চল্, আর এক-মিনিটও দেরি নয়, পাহারা বদ্‌লাবার আগেই আমাদের ঘাঁটি পেরিয়ে যেতে হবে।"

নিবারণ তাড়াতাড়ি উঠে আবার দাঁড়ে গিয়ে বসল।

নৌকোখানা একটু চলবার পরই কেষ্ট তাকে বল্লে—"তুই বেশ ছোকরা, তোকে আজ্‌কের কাজের জন্যে দশ টাকা দেবো।"

নিবারণ কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর করলে—"আমার এক পয়সাও চাই না, আমায় ছেড়ে দাও।" সে মনে মনে এতক্ষণ প্রতিজ্ঞা করছিল, একবার এই লোকটার পাল্লা থেকে উদ্ধার পেলে, সটান বাড়ী চলে যাবে, সহরে এক দণ্ড আর থাকবে না।

কেষ্ট একটুখানি কি ভেবে বল্লে—"কেন দশটাকা কি কম হল? আচ্ছা, যা তোকে আরো পাঁচ টাকা দেবো; কিন্তু দেখিস্—আজ্‌কের কথা কাউকে বলিস্‌নি যেন।"

অতগুলো টাকা একসঙ্গে পাবার কথা শুনে নিবারণের একটু লোভ হতে লাগল। পাওয়া দূরে থাক্, অত টাকা পাবার আশাও সে করতে পারে-নি। সে মনে-মনে একটা হিসেব করে দেখলে তাতে তাদের দু-মাস বেশ সুখে চলে যেতে পারবে। কিন্তু ভয়টা তখনও পুরো-মাত্রায় তার মনের উপর রাজত্ব করছিল, কাজেই সে একটা ছোট-রকমের 'আচ্ছা' বলে আবার দাঁড়-বেয়ে চলতে লাগল।

একটু এগোবার পরই কেষ্ট হঠাৎ চম্‌কে উঠে তাকে দাঁড় থামাতে বল্লে।

"এই রে, বুঝি দেখতে পেয়েছে! ঐ ভাখ্, দূরে একটা আলো নাড়চে—দেখেছিস্?"

নিবারণ দেখলে নদীর ধারে একটা লাল লণ্ঠন যেন হাওয়ায় দুলচে। তার মনে হতে লাগল বুকের ভিতরের হাড়-গুলো যেন খাঁচার পাখীর মতন ছট্‌ফট্ করে পাঁজরা-ভেঙে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে,—ভয়েতে তার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দিয়ে একটা কাঁপুনী ধরল, অজ্ঞাতসারে তার হাত থেকে দাঁড়টা খসে পড়ে গেল। কেষ্ট তখনি দাঁড়টা জল থেকে তুলে নিলে। নিবারণের সেই রকম অবস্থা দেখে তার ভয়ানক রাগ হল, তার পেটের ভিতর থেকে একটা গালাগালির ঢেঁকুর উঠে অস্বাভাবিক আওয়াজ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

নদীর ধারের আলোটা খানিকক্ষণ নড়ে-চড়ে আবার স্থির হয়ে গেল, নিবারণও একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার নৌকো বাইতে আরম্ভ করলে; অন্ধকারে মিশিয়ে তারা ঘাঁটি পার হয়ে গেল।

ভয়ের সীমানা পেরিয়ে আসবার পর নিবারণ যেন একটু ভরসা পেলে। টাকা

পাবার লোভটা তখন তার মনের কোণে একটু-একটু করে আবার উঁকি মারতে সুরু করেছে। সে ভাবছিল টাকাগুলো কতক্ষণে পাওয়া যাবে! কিন্তু একেবারে কেষ্টকে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে সাহসে কুলোচ্ছিল না; বুদ্ধি খাটিয়ে সে তাই জিজ্ঞাসা করলে—"ও পুটুলিতে কি আছে?"

কেষ্ট উত্তর দিলে—"ওতে কোকেন আছে। ওর দাম কত জানিস্? হাজার টাকার ওপর! আচ্ছা যা—তোকে আরো পাঁচটাকা দেবো—কেমন, খুসি ত?"

পাওনার মাত্রা আরো বেড়ে গেল দেখে তার ফুর্ত্তির জোয়ারে নতুন স্রোত এসে লাগল; মনের আনন্দে সে বেয়ে চলতে লাগল।

কেষ্ট জিজ্ঞাসা করলে—"তোর বাড়ী কোথায় রে?"

নিবারণ বল্লে—"বিষ্ণুপুর।"

—"বিষ্ণুপুর! সে ত অনেকদুর রে!" বলেই সে একটা তান ধরে দিলে—"বিষ্ণুপুরের তামাক এনেছি, খাও-সে রাজা আমোদ করে।"

রাত্রির সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারও তখন খুব ঘন হয়ে এসেছে, আকাশে একটা তারাও দেখা যাচ্ছিল না; রাস্তার আলোগুলো এমন ভাবে জলের উপর এসে পড়েছে যেন আকাশের ঐ সব তারাগুলো নেমে এসে নদীর দুদিকে সার-বেঁধে বসে গিয়েছে। অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে তাদের ছোট্ট নৌকোখানা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। দুজনের কারো মুখে কথা নেই; থেকে-থেকে কেষ্ট এক-একটা গানের এক-আধটা পদ গেয়ে উঠছে,—কোনোটা হাসির, কোনোটা দুঃখের, কোনটা প্রেমের। তার প্রাণের ভিতর ফুর্ত্তির যে তুফান বইছিল তারই একটু-আধটু আভাস তার গানের সুর দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল। গান গাইতে-গাইতে সে চেয়ে-চেয়ে নিবারণকে দেখতে লাগল। হঠাৎ কি মনে ক'রে নিবারণকে জিজ্ঞাসা করলে—"এই টাকা নিয়ে তুই কি করবি?"

নিবারণ বল্লে—"বাড়ী পাঠাব।"

নিবারণ এমন আকুল-মমতার সঙ্গে বাড়ীর নামটা উচ্চারণ করলে যে কেষ্টর মনের ভিতর কেমনতর একটা ধাক্কা লাগল। কেষ্ট যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে —"বাড়ীতে তোর কে আছে রে?"

"মা, ভাই, বোন।"—বলেই নিবারণ তাদের সেই দুঃখের সংসারের কথাগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বলতে সুরু করলে। এতক্ষণ পরে দুঃখ জানাবার একজন লোক পেয়ে তার মন খুলে গেল। একই কথা একশ-বার করে বলেও যেন তার ভাল করে বলা হচ্ছিল না। নিবারণের সেই ব্যাকুল কথার ভিতর থেকে সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের গায়ের উপর একটি করুণ ছবি ফুটে উঠে কেষ্টর মনকে কেমন উতলা করে তুলতে লাগল। কেষ্ট সেই ছবিটাকে মন-থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কিছুতেই সেটা গেল না। গঙ্গার জলস্রোতের সঙ্গে নিবারণের কণ্ঠস্বর মিশে কেমন-একটা কান্নার মত সুর তুলতে লাগল যাতে কেষ্টর বুকের ভিতরটা ঝির্-ঝির্ করে কাঁপতে লাগল।

বাড়ী! বাড়ী ছেড়ে আজ কতদিন সে এসেছে। এই নিবারণেরই মত সেও অর্থের চেষ্টায় বাড়ী ছেড়ে এসেছিল।

তারপর? তারপরের কথা মনে করতে গিয়ে কেষ্টর বুকের ভিতরটা টন্‌টন্ করে উঠল। সে চোখ বুজে অসাড় হয়ে পড়ে রইল;—নৌকো ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

বাড়ীর কথা ত তার মনে ছিল না; আজ কতদিন হ'ল তার স্মৃতি থেকে বাড়ীর ছবি একেবারে মুছে গেছে। তার পর থেকে তা মনে করবার তার অবসরই হয়নি—কেউ মনে করিয়েও দেয়নি। তার এই জীবনের মধ্যে যারা সঙ্গী ছিল তাদের কারোর মুখে সে কখনো বাড়ীর কথা শোনেনি। আজ হঠাৎ এই নিবারণ কোথা থেকে এসে তাকে বাড়ীর কথা মনে করিয়ে দিলে! তার ঐ গলার স্বরে, তার ঐ মুখের ভাবে কি ছিল যাতে কেষ্টর সমস্ত হৃদয়টা তোল্‌পাড় করে উঠল। সে চুপ্‌টি করে পড়ে সেই কথা ভাবতে লাগল। অনেক দিনের অনেক পুরোণো ছবি অস্পষ্টতার কুয়াসা ঠেলে তার চোখের সাম্‌নে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

নিবারণ দাঁড় টান্‌তে-টান্‌তে ভাবছিল টাকার কথা। সহরে এসে কি করে টাকা উপায় করবে এই তার ভাবনা ছিল। সে কী জানে যে কিছু করবে? সামান্য এই নৌকো চালানো—যা ছেলেবেলায় সে খেলাচ্ছলে শিখেছিল—তাই তার সৌভাগ্যের পথ খুলে দিলে ভেবে সে যেমন আশ্চর্য্য হচ্ছিল তেমনি তার আহ্লাদও হচ্ছিল। টাকাগুলো হাতে নিয়ে নাড়চাড়া করবার জন্যে তার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করতে লাগল। সে আর থাকতে না পেরে বলে ফেল্‌লে—"টাকাটা কখন্ দেবে?"

কেষ্টর প্রাণে তখন জাগছিল জল-ভরা ডব্‌ডবে দুটি চোখ,—কি বেদনা, কি মর্ম্ম-ব্যথা সেই দুটি চোখ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল! টাকার কথা কিছু না বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে নিবারণকে বল্‌লে—"নিবারণ, তুই বড় ভাল ছেলে রে, আমার আজ যা উপকার করলি—"

আর নিবারণ ভাবছিল, বেশ ব্যবসা ত! খাটুনি নেই, কিছু নেই, এক রাতেই এত টাকা! এক মাসের ভিতরেই বড় লোক!

আরো অনেকক্ষণ বেয়ে আসার পর তারা একটা জায়গায় এসে নৌকো থামিয়ে ফেল্‌লে। কেষ্ট নিবারণকে বললে—"সারারাত্রি ঘুমোস নি, এখন একটু ঘুমিয়ে নে, আমার আসতে একটু দেরি হবে, কোথাও যাস্‌নে যেন।"

নিবারণের ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে আসছিল, সে গুঁড়িগুড়ি মেরে নৌকোটার ভিতর শুয়ে পড়ল। কেষ্ট একলাফে নৌকো আর ডাঙার ব্যবধানটুকু পেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

কেষ্ট যখন আবার নৌকোয় ফিরে এল তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। সে নিবারণের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে তাকে তুলে দিয়ে পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে তার হাতে দিয়ে বল্লে—"নিবারণ, তোকে এই একশো টাকা দিলুম। এখুনি বাড়ীতে পাঠিয়ে দে! তুই আমার বড় উপকার করেছিস্ রে।"

নিবারণ নোটগুলো হাতে করে তুলে নিলে। তার হাত ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।... ...

এই তার সহরের প্রথম অভিজ্ঞতা, এই তার প্রথম রোজগার। এমন সহজে যে এত রোজগার হ'তে পারে এ-কথা নিবারণ

কোনোদিন কল্পনায়ও আনতে পারেনি। এর মধ্যে একটু ভয় আছে বটে, কিন্তু সে ভয়কেও তো এড়ানো যায়—কেষ্ট তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আর ঐ ভয়টুকুর যে পুরস্কার সে তো সামান্য নয়! কাজেই রোজগারের এই পথ নিবারণকে প্রলুব্ধ করে তুল্লে। পরদিন কেষ্টর খোঁজে সে সন্ধ্যাবেলা থেকেই গঙ্গার ধারে এসে বসে রইল। কেষ্ট আর এলনা বটে সে কিন্তু তাই বলে কেষ্টর সেই নৌকোখানার মালিকের অভাব হলনা। রাত-দুপুরে কেষ্টরই মত একটা লোক এসে যখন সেটাতে চড়ে বসল তখন নিবারণ স্বেচ্ছায় তার কর্ণধার হ'ল। এমনি করে তার ব্যবসার সূত্রপাত হ'ল। এবং কেষ্টর সঙ্গে সে যে-যাত্রা সুরু করেছিল তারই আবৃত্তি রাতের পর রাত ধরে চলতে লাগল। ক্রমে সে চাকর থেকে মনিবের দলে গিয়ে উঠল। আশাতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন হতে লাগল। মা-ভাই-বোনের দুঃখ দূর হ'ল। তখন মাসে-মাসে যথাসময়ে বাড়ীতে টাকা পাঠাতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত হ'ত। তার পর সেই নিশ্চিন্ত-মনটাকে নিয়ে সে যা-খুসি-তাই করতে লাগল। ক্রমে এই নিশ্চিন্ততার ফাঁক দিয়ে মা-ভাই-বোনের মুখ যে কবে সরে পড়ল, সে তা টেরও পেলেনা। যারা তার সঙ্গী ছিল তাদের কারো কোনো দায় ছিলনা। একটা দায় ঘাড়ে করে থাকাকে তারা পরিহাস করত। ক্রমে নিবারণেরও সেইটে সহজ অবস্থা হয়ে এল। তখন জীবনের মধ্যে যা রইল তা কেবল ঐ অন্ধকার রাত্রের কাজ, আর হল্লা-করে স্ফূর্ত্তি করা!

আদালতে সেদিন কয়েকটা পাকা বদমায়েসের বিচার হচ্ছিল। আসামীদের মধ্যে নিবারণকেও ধরে আনা হয়েছে। এখানে এই তার প্রথম আসা। এতদিন সে স্ফূর্ত্তি করে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল;—ভয় একটা ছিল বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই ভয়ের চেহারাটার সঙ্গে এমন চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। আজ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তার ব্যবসার ফাঁকে-ফাঁকে কী-সব ভয়ঙ্কর বিপদ জড়িয়ে আছে তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে, তার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠতে লাগল। তার মনে হতে লাগল এই সব বিপদের সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে সে কি-করে এতদিন কাটিয়ে এসেছে! উঃ!

নিবারণের চোখের সাম্‌নে তার সঙ্গীদের জেল হয়ে গেল। প্রমাণ-অভাবে সে-ই কেবল ছাড়া পেলে। সে তাড়াতাড়ি কাঠগড়া থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এল। দরজার সাম্‌নে জেলখানার গাড়ি দাঁড়িয়ে। কতবার এই গাড়ীখানার কথা সে বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনেছে। কৌতূহলের ঝোঁকে অন্যলোকদের মত সেও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। খানিক পরে হাতকড়া-লাগানো তার বন্ধুদের পিঠে রুলের গুঁতো মারতে-মারতে গোরা পুলিশ সেই গাড়ীখানার অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে তাদের ধাক্কা মেরে তুলে দিতে লাগল। তাই দেখে নিবারণের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। উঃ, ওই গাড়ীটার ভিতর কি ঘুট্‌-ঘুটে অন্ধকার!—একটু আলো নেই, বাতাস ঢোকার পথও বন্ধ! উঃ, জেল!—

তার পা-দুটো থর-থর করে কাঁপতে লাগল। একদণ্ডও আর সেখানে দাঁড়াতে না

পেরে সেখান সে থেকে সরে পড়ল। তারপর আস্তে-আস্তে হাবড়ার পুলের কাছে এসে দাঁড়াল।

পুলের দুদিক দিয়ে লোক চলছে। নীচেকার জলস্রোতের মতন উপরকার জন-স্রোতেরও বিরাম নেই। নিবারণ অন্যমনস্কে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগল। হঠাৎ কে যেন তার নাম ধরে ডাকলে—"কিরে নিবারণ, চিনতে পারিস্? ওঃ, কত বড় হয়ে গিছিস্ রে!—আমি কেষ্টরে—কেষ্ট!"

নিবারণ প্রথমটা তাকে চিনতে পারেনি। সে নিজের নাম বলতেই তাকে চিনে ফেল্লে।

—"কেষ্ট! ওঃ তোমাকে সেই দেখে-ছিলুম; কতদিন দেখা হয়নি।"

নিবারণ কেষ্টকে বহুদিনের পুরোনো বন্ধুর মত হাত ধরে টেনে নিয়ে চলতে লাগল।

কেষ্ট তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"তারপর; কেমন আছিস?"

কেষ্টকে পেয়ে নিবারণের মন যেন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। সে তার হাত ধরে টান্‌তে-টান্‌তে কাছাকাছি একটা হোটেলে নিয়ে গেল। হোটেলওয়ালাকে খাবার দিতে বলে নিবারণ কেষ্টকে নিয়ে একটা পর্দ্দা-ঘেরা ঘরের ভিতর গিয়ে বসল। তারপর একটা চাকরকে ডেকে বলে দিলে—"ওরে একটা পাঁট্ নিয়ে আয় ত।"

দুটো গেলাসে মদ ঢেলে নিবারণ একটা কেষ্টর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—"নাও দাদা, টেনে নাও।"

কেষ্ট একটু অপ্রস্তুত-ভাবে বলে উঠল—"না ভাই, ও-সব ছেড়ে দিয়েছি।"

নিবারণের বুকের ভিতর দিয়ে ছুঁচের মতন কি একটা তীক্ষ্ণ জিনিষ যেন ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। কেষ্ট মদ ছেড়ে দিয়েছে? যদিও কেষ্টর সঙ্গে তার মোটে একরাত্রির পরিচয় কিন্তু সেই একরাত্রেই সে তাকে যতটা চিনেছিল ততটা বোধ হয় আর-কাউকে চিনতে পারেনি। তার কথাটা নিবারণের কাছে একটা রহস্যের মত ঠেক্‌ল; সে একটু অভিমানের সুরে বল্লে—"খাবেনা?"

কেষ্ট একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বল্লে—"না; তুই খা-না।"

—"আচ্ছা বেশ, তবে আমিই খাই।" বলে উপরি-উপরি দুটো গেলাসের মদ চোঁ-চোঁ করে দু-চুমুকে সাবাড় করে ফেল্লে।

কেষ্ট হাসতে-হাসতে বল্লে—"খুব ওস্তাদ হয়েছিস্ যে রে!"

নিবারণের মুখের উপর থেকে মদের তীব্র আস্বাদনের বিশ্রী ছবিটা তথনো একেবারে মিলিয়ে যায় নি; একটা হাঁসের ডিমের আধখানা কামড়ে নিয়ে সে বল্লে—"ওস্তাদ ত তুমিই করেছ দাদা।"

নিবারণের এই কথাগুলো কেষ্টর বুকে হঠাৎ একটা ধাক্কা দিলে। সে নিবারণের ভাব-ভঙ্গী কথাবার্ত্তা যতই দেখতে লাগল ততই অবাক হয়ে যেতে লাগল। তার মনে হতে লাগল—সেদিনকার সেই ছোঁড়াটা! মদের নাম শুনে যার মুখ সিঁটকে উঠত—আজ তার এ কী!

হঠাৎ নিবারণ তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"আজকাল কি হচ্ছে?"

কেষ্ট বল্লে—"চাষবাস সুরু করেছি!"

নিবারণ অবাক হয়ে বল্লে—"অ্যাঁ, চাষ-বাস!"

কেষ্ট বল্লে—"হ্যাঁ। তাতে আমার দিন বেশ কাটচে।"

নিবারণ তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে বেশ-একটা তৃপ্তি এবং নিশ্চিন্ততায় সে মুখখানি ভরে আছে। সমস্ত শরীরের উপর একটি আরামের আবেশ বিছিয়ে রয়েছে। নিবারণ বারবার তাকে দেখতে লাগল। তার মনে জেগে উঠল আজকের আদালতের তার সঙ্গীদের সেই অবস্থা, তার নিজের সেই ভয়ের উৎকণ্ঠা! এতদিন সে ও-সব কিছু ভাবেনি, কিন্তু আজ আদালত থেকে বেরিয়ে পর্য্যন্ত তার বুকটা থেকে থেকে দুর্-দুর্ করচে।

কেষ্ট বল্লে—"বড় বেঁচে গিয়েছি নিবারণ! সব ছেড়েছুড়ে বাড়ী না গেলে জাহান্নামে গিয়েছিলুম আর কি!"

জাহান্নামে! নিবারণের বুকটা কেমন ধড়্ফড়্ করে উঠল। সে আর এক গেলাস মদ এক-চুমুকে টেনে নিয়ে বল্লে —"হঠাৎ কাজ-গুটিয়ে পালালে যে?"

কেষ্ট বল্লে—"এখানে আর মন টিঁকল না। মনে আছে তোর সেই-রাত্রের কথা —যেদিন তোকে নিয়ে নৌকোয় বেরিয়ে ছিলুম?—তুই তোর বাড়ীর কথা বল্তে লাগলি, আর আমারও বাড়ীর জন্যে প্রাণটা কেঁদে উঠল। কাজ-কর্ম্ম ভাল লাগল না।"

নিবারণ আর-এক গ্লাস মদ নিঃশেষ করে একটা গম্ভীর শব্দে "হুঁ" বলে, ঠক্ করে গ্লাসটা টেবিলের উপর আছড়ে রাখলে। সে যতই কেষ্টর সেই নিশ্চিন্ত মূর্ত্তি দেখতে লাগল ততই কেমন-একটা হিংসেয় তার শরীরের মধ্যে জ্বালা ধরতে লাগল। সে সেই জ্বালার উপর প্রাণ ভরে মদের ধারা ঢালতে লাগল।

দুজনে খানিকক্ষণ চুপচাপ হয়ে রইল। তারপর কেষ্ট স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা কল্লে —"বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছিস্ ত নিবারণ?"

কেষ্টর মুখে এই বাড়ীর কথায় নিবারণের দেহের রক্ত যেন সাপের মত এঁকে-বেঁকে তার মাথার ভিতরে গিয়ে জমা হতে লাগল। তার মনে জাগতে লাগল সেদিনকার কথা— যেদিন এই লোকটার সঙ্গে ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে নৌকো বেয়ে সে চলেছিল, সেদিন-কার জীবন-যাত্রায় এই লোকটাই ছিল কর্ণধার! আজ তাকে মাঝ-দরিয়ায় ফেলে সে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে! আর সে নিজে কোথায় এসে পড়েছে! কেষ্ট যাকে বল্লে জাহান্নাম—তারই ত পথে! কে তাকে এখানে এনে ফেল্লে? এখন কোথায় পড়ে আছে, তার সেই মা, তার সেই ভাই-বোন—যাদের দুঃখ দূর করবার জন্যে সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিল!

কেষ্টর দিকে চেয়ে-চেয়ে তার মনে হতে লাগল, কেষ্ট যেন দূরে দাঁড়িয়ে তার অবস্থাটা দেখে মুচ্‌কে-মুচ্‌কে হাসছে। তার সেই হাসিতে নিবারণের মনে হল যেন সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরে উঠল। দেখতে-দেখতে তাদের সেই গ্রাম, তাদের সেই বাড়ী, তার ভাই-বোন-মা সবাই যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল! চোখের সামনে জাগতে লাগল কেবল শূন্যতার অন্ধকার!

প্রাণপণ-শক্তিতে সেই শূন্যতার ভিতর দিয়ে চোখ-দুটোকে ঠেলে বার করে নিবারণ কেষ্টকে দেখতে লাগল।

তার সেই-রকম চাহনি দেখে কেষ্ট ভয়ে-ভয়ে ভাঙা চেয়ারটা একটু পিছনে সরিয়ে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"কিরে মারবি নাকি ?"

কি করলে যে নিবারণের মনের ঐ জ্বালাটা দূর হয় সে এতক্ষণ ঠিক করতে পারছিল না ; হঠাৎ কেষ্টর মুখে মারের কথা শুনে সে যেন একটা উপায় দেখতে পেলে। দাঁতের উপর দাঁত দিয়ে সে বল্লে —"মারলেও তোর যথেষ্ট সাজা হয় না, আমার কি করেছিস জানিস্ ?"

কেষ্ট তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লে "বেশী চালাকি করিস্ নি, এখুনি পুলিস ডেকে দেবো ; নেশা ছুটে যাবে।"

—"পুলিশ দরকার হবেনা"—বলেই সে বাঘের মত লাফিয়ে গিয়ে কেষ্টর টুঁটিটা চেপে ধরলে।

তারপর ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ, গেলাস ভাঙবার ঝন্‌-ঝন্‌-শব্দ, গোলমাল, লোক-জনের হাঁকাহাঁকির ভিতর কখন্ যে কি হয়ে গেল তা তাদের দুজনের কেউ ঠিক করে বলতে পারেনা।

তারপর নিবারণকে যখন জমাদার এসে ধরলে তখন তার কথা এড়িয়ে এসেছে, ভাল করে দাঁড়াতে পাচ্ছে না। পাহারাওয়ালার গুঁতোর চোটে মাঝে-মাঝে তার চেতনা ফিরে আসছিল, আবার তখুনি তাদের গায়ে নেতিয়ে ঢলে পড়ছিল। খানিকটা হিঁচড়ে আর খানিকটা কোলপাঁজা করে তারা তাকে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

কেষ্ট দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিল! নিবারণের পিঠে রুলের গুঁতোগুলো যেন দ্বিগুণ জোরে এসে তার বুকে বাজতে লাগল ; তার মুখের অস্ফুট এড়ানো কথাগুলো সহস্র অর্থ নিয়ে তার কানে এসে ঢুকতে লাগল। পথ-চল্‌তি অনেক লোক সেখানে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল, কেউ বুঝুক আর না-বুঝুক সে কিন্তু কথাগুলোর মর্ম্ম বুঝতে পারছিল। ভিড় ঠেলে সে একটু ফাঁকে এসে দাঁড়াল। নিবারণের সঙ্গে তার সেই প্রথম দেখার দিনের কথা মনে পড়্‌ল, তার সেই ফুঁপিয়ে কান্না, সেই সরল হাব-ভাব, সেই ত্রস্ত সভয় মুখ—সমস্ত ছবিগুলো তার চোখের সাম্‌নে এক-এক করে ফুটে উঠতে লাগল।

দিনকয়েক পরে এই মারপিঠের মোকদ্দমা উঠল। নিবারণের সাম্‌নে যখন জেলের ছবি জাজ্জ্বল্য হয়ে উঠছে, এমনসময় কেষ্ট সাক্ষী দিতে এল। সবাই ভাবলে এইবার নিবারণের দফা শেষ! কিন্তু তার সাক্ষীতেই মোকদ্দমা একেবারে ফেঁসে গেল। নিবারণ বেকসুর খালাস পেয়ে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় বেরুতেই কেষ্ট ছুটে এসে নিবারণের হাত-দুটো চেপে বল্লে—"চল ভাই, আমার সঙ্গে চল।"

নিবারণ তার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে জনস্রোতের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কেষ্ট নিরুপায় হয়ে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

স্বাধীন-ত্রিপুরার ঠাকুরগণ

আজ প্রাতঃকালে আমি বঙ্গের একটি তীর্থস্থানে সমাগত হয়ে ধন্য বোধ করছি। সে কিসের তীর্থ? স্বাধীনতার তীর্থ। বহুকাল ধরে পড়ে আসছি এই হেয় নিন্দিত বঙ্গদেশেরই বক্ষে সেই দুটি হিন্দু-রাজ্য বিরাজ করছে যারা কখনো পরাধীনতা মানেনি;—সে দুটি কোচবিহার ও ত্রিপুরা-রাজ্য। বিজয়ী মোগলেরা ভারতবর্ষের আর সকল স্থানেই প্রায় নিজেদের ধ্বজা প্রোথিত করেছিলেন শুধু কোচবিহার ও ত্রিপুরা ছাড়া। জাপানীরা ও জাপানের ইতিহাস-পর্য্যালোচক ইংরাজেরাও জাপানের মাহাত্ম্যের অন্যতম একটি কারণ এই দেখিয়ে থাকেন যে দুই হাজার বৎসরাবধি একাদিক্রমে একই রাজবংশের হাতে জাপানের রাজ্য-শাসন চলে আসছে। ত্রিপুরার ইতিহাস পাঠেও জানা যায় যে মানব-স্মৃতি যতদূর পৌছায় ততদূর হতে একই রাজকুল ত্রিপুরা-রাজ্যের রাজদণ্ড বহন করে আস্‌ছেন। সুতরাং হে ত্রিপুরারাজ-সন্তানগণ, হে ঠাকুরগণ! তোমাদের আভিজাত্যের নিকট আধুনিক ভারতবর্ষের আর-সকল রাজকুমারগণ পরাস্ত। কিন্তু তোমাদের কমনীয় কান্তি দেখতে-দেখতে মনে এই প্রশ্ন উদয় হয় ভারতের অন্যান্য প্রান্তের ঠাকুরেরা বীরত্ববিষয়ে তোমাদের কত পিছনে ফেলে গেছেন তার কোনো হিসাব খতিয়ে দেখেছ কি? এক মহারক্তের অক্ষুণ্ণ ধার বাহিকতার যে গৌরব তা তোমরা দাবী কর; কিন্তু সেই রক্তের উপযোগী সে কর্ম্মপ্রবাহ, সে তেজ, সে পৌরুষ, সে পুরুষম্মন্যতাও তোমাদের মধ্যে আছে কি? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শুধু যে শত্রুহস্ত থেকে নিজেদের স্বাধীনতা-ধন রক্ষা করেছিলেন তা নয়; সে-কালের বীরত্বের আদর্শে, পরদেশজিগীষায়, বলের দ্বারা পরের স্বাধীনতা অপহরণ করেছিলেন; চট্টগ্রাম আরাকান প্রভৃতি পর-রাজ্যকে নিজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

এই ন্যায়ের যুগে, ধর্ম্মের যুগে, ব্রিটিশ-রাজ্যের চক্রবর্ত্তিত্বে পররাজ্য-হরণবৃত্তি তোমাদের রুদ্ধ করতে হয়েছে, কিন্তু তাই বলে ক্ষত্রিয়ের স্বভাবসুলভ সব রকম ক্ষাত্রস্পৃহাই কি তোমাদের নিভে গেছে?

তোমরাও 'ঠাকুর' এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের রাজসন্তানেরাও ঠাকুর। কিন্তু অন্যদের তুল্য ক্ষত্রিয়ভাব তোমাদের কোথায়? ক্ষত্রিয়-বেশ কোথায়? তোমরা দেখি সমতলস্থ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থেরই মত ধুতির কোঁচা ঝুলিয়ে বেড়াও! বীরের বসন আর তোমাদের নিত্য-পরিধান নয়, তোমাদের পাজামা চাপকান উষ্ণীষে বীরভাবে দেহ মণ্ডিত নয়, তোমাদের কোষে আর অসি বা খড়্গ ঝুলান থাকেনা; চোদ্দ দেবতার নাম নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবমান হওয়ার মত চেহারা আর তোমাদের নয়! ভারতবর্ষের অন্য ঠাকুরেরা তোমাদের এ বিষয়ে লজ্জা দিচ্ছে।

একদিন ছিল যখন এই ত্রিপুরারাজ্যে এক-লক্ষ পদাতিক ও সহস্র গজারোহী সৈন্য ছিল। এখন নাকি এখানকার সৈন্যসংখ্যা কেবল

একশত মাত্র? একলক্ষ মানুষ কি আর এদেশে নেই? তোমরা, আভিজাত্যগর্ব্বস্ফীত ঠাকুরেরা থাকতে ত্রিপুরায় আজ এক সহস্র সৈন্যও নেই? তোমাদের মহারাজ যদি তোমাদের বীরত্বের পথে পুনর্যাত্রা করতে অনুনয় বা অনুজ্ঞা করেন তোমরা নাকি ঘোঁট কর, কমিটি কর, চক্রান্ত কর, চুকলি কর; সর্ব্বতোভাবে তাঁর সাধু ইচ্ছা ব্যর্থ করে, নিজেদের আভিজাত্য প্রমাণ কর!

তোমাদের ভাইবন্ধু—তোমাদের 'কুটুম্ব নেপালীরা শুধু স্বদেশে নয়, ব্রিটিশ রাজ্যে দলে দলে চিরকালই সেনানীভুক্ত। আজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তোমাদেরও ডাকছেন। আজ এমন সুযোগের দিনেও তোমাদের লুপ্ত ক্ষাত্র-গৌরবের উদ্ধার করবে না? তবে কিসের তোমাদের আভিজাত্যের অভিমান? কিসের অভিমান রাজ-রক্তের? মহারাজ বিজয়মাণিক্য জয়ন্তিয়া-রাজকে একবার হাতী উপঢৌকন পাঠালে, জয়ন্তিয়া-রাজ যখন সে উপঢৌকনে রাজার প্রতি রাজার সৌজন্য না চিনে, মন্তব্য প্রকাশ করেন যে বিজয়মাণিক্য তাঁর প্রতাপে ভয়-ভীত হয়ে এই উপহার পাঠিয়েছেন, তখন বিজয়মাণিক্য জয়ন্তিয়া-রাজের ভুল-ভাঙ্গানর জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করে তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করেছিলেন;—"ভয়-ভীত" বলে আখ্যাত হওয়ার কলঙ্ক সহ্য করেন নি। সেই বিজয়মাণিক্যের রক্ত তোমাদের ভিতর আছে। জগৎ যখন বলবে ত্রিপুরার কুমারেরা আজকের দিন সৈনিক হচ্ছেনা, কারণ বোধ হয় তারা ভয়ভীত, তখন তোমরা এ নিন্দা উদরস্থ করবে? বিজয়মাণিক্যের বংশধরেরা যে ভয়ভীত হতে পারেনা, তাদের রক্তে ভয়-জিনিষটাই যে নেই তা দলে-দলে সেনাদলভুক্ত হয়ে, এমন কি নিজেদেরই একটা কম্পানী গঠন করে তা প্রমাণ করবে না কি?

হে দেববর্ম্মণেরা, হে ক্ষত্রিয়-ভাই-সব, আজ আর কথার দিন নেই, কাজের দিন এসেছে। আজ প্রত্যেক ক্ষত্রিয়-অভিমানী সূর্য্যবংশের চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব,—সূর্য্যবংশত্ব বা চন্দ্রবংশত্ব যুদ্ধের কষ্টিপাথরে যাচিয়ে নেওয়া হবে। এ পরীক্ষায় ভারতের বাকী ক্ষত্রিয়ম্মন্য জাতিরা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—তোমারাই শুধু বাকী রয়েছ।

মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর তাঁর কৈশোরে রাজকুমারগণের সভায় পাঠের জন্য ত্রিপুরার ইতিহাস হতে একটি মহাবীরকীর্ত্তি উদ্ধার করে কুমারগণের উৎসাহ প্রজ্বলিত করেছিলেন। সে কীর্ত্তিকাহিনী আবার স্মরণ কর।

"মহারাজ ধর্ম্মধরের পুত্র কীর্ত্তিধর দেববর্ম্মন্ ১৭৩৬ ত্রিপুরাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহাঁর শাসনসময়ে হীরাবন্ত খাঁ নামে একজন ধনাঢ্য বণিক্ ছিল। হীরাবন্তের জন্মভূমি পশ্চিম প্রদেশে হইলেও এরাকানাদি পূর্ব্ব প্রদেশীয় বাণিজ্যই তাহার সম্পত্তির মূল কারণ। এইরূপ বাণিজ্যে নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হইবার অভিপ্রায়ে সে গৌড়েশ্বরকে উপঢৌকনাদিদ্বারা সন্তুষ্ট করিবার সংকল্প করিল। ত্রিপুররাজ্যের পশ্চিম সীমাবর্ত্তী পদ্মা অথবা অন্যান্য নদী দিয়া বিনানুমতিতে নৌকা-যোগে যাতায়াত করার সম্বন্ধে ত্রিপুররাজার দৃঢ় নিষেধ ছিল। হীরাবন্ত খাঁ গর্ব্ববশতঃ সেই নিষেধ আজ্ঞা জানিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস না করিয়া গৌড়েশ্বরের উদ্দেশে উপঢৌকনস্বরূপ কয়েকটি বহুমূল্য রত্ন সমভিব্যাহারে পদ্মা নদী দিয়া যাইতেছিল। ত্রিপুর

মহারাজ এই সংবাদ-শ্রবণে দূতদ্বারা স্বীয় নিষেধ-বিধি প্রচার করাইলেন, বণিক্ তখন অনুমতি প্রার্থনা করিল। গৌড়েশ্বর ত্রিপুর-মহারাজের চিরশত্রু; বণিক্ এরূপ শত্রুর সম্মাননার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, শুনিয়া ত্রিপুর-নরপাল সসৈন্যে তাহার সমুদয় লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। বণিক্, গৌড়েশ্বরের নিকট ত্রিপুর-মহারাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। গৌড়েশ্বর উপঢৌকনে বঞ্চিত হইয়া তিন লক্ষ সেনা, ত্রিপুরায় যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ ভয়ে সন্ধির উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজমহিষী নিম্নলিখিতরূপে সৈন্যদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া সমরে প্রবেশ করিলেন। গৌড়সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

বীরপুত্রগণ মম হও আগুয়ান,
আমি বাছা তোমাদের মায়ের সমান;
মাতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি,
এস সবে ত্বরা করি,
বীর দম্ভে করে ধরি অসি খরসান;
এস, দেব-আশীর্ব্বাদে হইবে কল্যাণ।

২

"চৌদ্দদেবতার জয়—জয় ত্রিপুরেশ;"
বলি সবে রণ-ক্ষেত্রে করহ প্রবেশ,
চল চল ত্বরা চল,
আমি বাছা পক্ষ-বল,
শত্রু শেষ-সৈন্য আজি করিয়া নিঃশেষ,
রণবেশ ছাড়ি—লব রমণীর বেশ।

৩

"কি ভয় কি ভয় রণে, কি ভয় কি ভয়,"
বলিব না, হেন কথা বলিবার নয়।
ত্রিপুরের বীরচয়
নয় এত ভীরু নয়
রণ-মুখে নারী-কণ্ঠে শুনিয়া অভয়,
বান্ধিবে কবচ,—হবে নির্ভয় হৃদয়।

৪

এই বাছা তোমাদের কলঙ্ক অশেষ,
এই বাছা তোমাদের মৃত্যু-নির্ব্বিশেষ,
শুনি শত্রু ভেরী রব
না সাজিতে বীর সব
ধরেছিল নারী এক সমরের বেশ;
ধোও এ কলঙ্ক, করি সমরে প্রবেশ।

৫

ঐ শুন রণ-বাদ্য বাজিছে আবার
ঐ শুন শত্রুদের প্রলয়-হুঙ্কার;
ঐ শুন প্রতিধ্বনি,
সে ধ্বনি শুনি অমনি,
প্রতিরব ছলে সবে করিছে ধিক্কার—,
সহে কি এ অপমান তিল-আধ আর?

ঐ শুন রণ-বাদ্য বাজিল আবার,
সচল পাষাণ-ময় অচল এবার।
তোমাদের রক্তময়
শরীরে কি নাহি হয়
শিরায় শিরায় বল বিদ্যুৎ-সঞ্চার?
ধর অসি—কর সবে শত্রুর সংহার।

৭

জন্ম-ভূমি তুলা মাত্র মাতার সহিত
সেই মাতৃভূমি এই রবেতে কম্পিত
মাতৃআজ্ঞা শিরে ধরি,
মাতৃভূমি মনে করি,
সমরে মরণ-ভয় কর বিদূরিত;
সমরে মরণ—এ ত—বীরের বাঞ্ছিত।

৮

কোথা ত্রিপুরেশ আজি এমন সময়,
সে কথা স্মরণ করি কিবা ফলোদয়?
লোহার শিকল হেলে,
যে করি ভাঙ্গিয়া ফেলে,
বল মায়াময় বিধি সমর্থ কি নয়;
বান্ধিতে তৃণেতে সেই হস্তি-পদ-চয়?

৯

কীর্ত্তিতে যাঁহার নাম জানে সর্ব্বজন,
তাঁহার অকীর্ত্তি আজি বিধির লিখন ;
বিধাতা পুরুষবরে,
অবলার সম করে,
অবলায় বল আজি করিল অর্পণ,—
কি কাজ সে কথা আর করিয়া স্মরণ।

১০

মনে কর নরবরে রোগের শয্যায়,
ভাব হে সদয় রাজা পাঠালে আমায়,
প্রাণ-প্রিয়া বলি যার,
রাজাদর অনিবার,
তার প্রাণ তুচ্ছ বোধ করি, নররায়,
দেশ হেতু পাঠালেন, সমরে আমায়।

১১

ভোল ও সকল কথা, করহ স্মরণ,
যদ্যপি তোমরা আজি নাহি কর রণ
জানিবে জানিবে তবে,
মাতৃহত্যা পাপে সবে.
স্পর্শিবে—আমার প্রাণ সমরে মরণ ;
এস সবে—বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।

১২

মনে কর পলাইয়া রাখিলে জীবন,
মনে কর জয়লাভ করিল যবন।
স্মরণে হৃদয় হায়,
যেন বিদরিয়া যায়,
ডুবিবে পাপেতে যত ত্রিপুর ভবন,
স্পর্শে যদি একবার যবন-পবন !

দেখিয়া রাণীর বেশ, শুনি উপদেশ,
রণবেশ করি সবে, রাখিবারে দেশ ;
অসি করে পশিলেক, সমর সাগরে,
বীরমদে বীরদল, আপনা পাশরে।
প্রবল-প্রবাহ-মুখে তৃণের মতন,
অস্থির ত্রিপুর-বলে, যতেক যবন।
"জয় চৌদ্দদেব জয়—ত্রিপুরেশ জয়,—
জয় মাতা ঈশ্বরীর," বলি সৈন্যচয়,
যবন দমন করি বিজয় উল্লাসে,
উঠাইয়া চন্দ্রবাণ সুনীল আকাশে,
ত্রিপুর ভবনে সবে করিল প্রবেশ ;
ছাড়িলেন মহারাণী সমরের বেশ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি মুরতি মোহন,
আকুল তরঙ্গ হতে কমলা যেমন।"

ত্রিপুরার ঠাকুরেরা আবার "জয় চৌদ্দদেব জয়, ত্রিপুরেশ জয়, জয় মাতা ঈশ্বরীর" বলে তোমাদের অন্তরস্থ কাপুরুষতা-যবনকে দমন করে বিজয়-উল্লাসে মহাসমরে সংলীন হবে ?

শ্রীসরলা দেবী।

মাসকাবারি

মত ও ব্যক্তিত্ব

পুরাণে আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন। সেই গঙ্গার পাবনী মৃত্তিকাতেই "বাংলার মাটি বাংলার জল" পুণ্য হইয়াছে। কিন্তু "জলরেখাবলম্বিত" মাটিটুকুই যদি আমাদের সব সম্বল হইত, তবে আমরা মাটীই হইতাম ! আমাদের এই জাতির মধ্যে বৃহৎ জীবনের ধারাকে নিঃসারিত করিয়া নূতন করিয়া জাতীয় মনটাকে "সুজল সুফল" করার প্রয়োজন ছিল। এযুগে সেই ভাব-গঙ্গাকে আনিলেন

এ যুগের ভগীরথ, রাজা রামমোহন রায়।

যে বাংলাভাষার আজ এত সম্পদ্, একদিন ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ বেদান্ত-রত্নে সেই ভাষাকে রামমোহন সাজাইয়াছিলেন। গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচিয়া এবং বাংলা গদ্যের অঙ্গ হইতে সমাস-সন্ধির শিকল খুলিয়া ফেলিয়া রামমোহন সংস্কৃত-নিরাধার বাংলাভাষার নিজ প্রতিভাকে প্রথম অভিনন্দন জানাইলেন। নিখিল হিন্দুশাস্ত্রের সকল বিরোধকে সমন্বয় করিয়া হিন্দু সভ্যতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং অপর অপর সভ্যতার সহযাত্রী করিয়া মহামানবের ইতিহাসের বিরাট রঙ্গভূমিতে তাহাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে স্বারাজ্যের জন্য আজ আমরা আন্দোলন করিতেছি, সেই স্বারাজ্যের মহনীয় বরণীয় আদর্শ তিনি তাঁর মানস-চক্ষে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন। সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জাতীয় জীবনের সকল বিভাগে, নবজীবনের ধারাকে তিনি বহাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া আজ তার কলধ্বনি গ্রাম হইতে গ্রামে নগর হইতে নগরে মুখরিত, উচ্ছ্বসিত, পরিব্যাপ্ত!

রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সভ্যতার রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, আইন, আচারব্যবহার প্রভৃতির বিচিত্র মহালের নানা গোপন দরজা খুলিয়াছিলেন এবং সেখানকার প্রহরী-পাহারার তর্জ্জনী না মানিয়া ভিন্ন ভিন্ন মহালের পরস্পরের মধ্যে সহজ ও অবাধ প্রবেশের নানা সঙ্কেত, নানা পথঘাট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁর সেই বিরাট বিশ্ব-প্রাসাদের মহালে মহালে তাঁর সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করা শক্ত। কিন্তু যিনি তাঁর পরে এ দেশকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় উদ্বোধিত করিলেন, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু হিন্দুসভ্যতার মহালার মধ্যেই দেশকে টানিয়া লইয়া চলিলেন এবং সেখানকার বন্ধ দরজা-জানালা খুলিয়া দিয়া দেশকে তার আপন পরিত্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উৎসব জমাইলেন। তাঁর কাজ রামমোহনের চেয়ে সংকীর্ণতর। কিন্তু সংকীর্ণ খাতে নদীর বেগ যেমন বাড়ে, তেম্‌নি সংকীর্ণক্ষেত্রে—দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রে—দেশের ধারাকে আকর্ষণ করিয়া তিনি তাকে গভীর, নিবিড় ও প্রখরবেগশালা করিয়া তুলিলেন। আমাদের দেশাত্মবোধের তিনিই জনক, এ কথা মনে রাখা উচিত।

রামমোহন বাংলাভাষার প্রতিভাকে অভিনন্দন করিলেন; দেবেন্দ্রনাথ সেই ভাষাকে কলাসৌষ্ঠববতী করিয়া সকল জন-হৃদয়ের পক্ষে রমণীয় করিলেন। শুধু সাহিত্যকে যে তিনি সৃজন ও পরিপোষণ করিয়া এদেশের মানস-আকাশকে জ্যোতির্ম্ময় করিলেন তাহা নয়; সেই সঙ্গে সাহিত্যের সহচরী শিল্পকলা, সঙ্গীতকলাকেও দেবেন্দ্রনাথ আবাহন করিয়া আনিলেন। শাস্ত্রকে মানিয়াও তার শৃঙ্খল হইতে ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া তার চিন্তার স্বাধীনতাকে তিনি অবারিত করিলেন—'আত্মপ্রত্যয়' যে সকল প্রত্যয়ের মূল এবং মূল্য তাহা নিজ জীবনের ভিতর হইতে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করিয়া, সেই বাণীর

দ্বারা দেশের ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এবং ক্রমে, সকল জিজ্ঞাসাকে তিনি নূতন করিয়া জাগাইয়া দিলেন।

অস্থিতত্ত্বের হিসাবে যেমন মানুষের দেহ-পরিচয় মেলেনা, তেম্‌নি মতামতের বা তত্ত্বের হিসাবে কোন মনীষীর ব্যক্তিত্বের (Personality) পরিচয়ও পাওয়া যায় না। রামমোহনকে শাস্ত্র-মীমাংসক কিম্বা দেবেন্দ্রনাথকে ব্যক্তি-তান্ত্রিক বলিলে সেটা তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হয় না। কেননা, তাঁদের ব্যক্তিত্ব কোন অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব মাত্র নয়, তাহা সকল তত্ত্বের ও মতের চেয়ে বড়, এমন কি তাঁদেরই সকল রচনা-আলোচনা সকল ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যানের চেয়ে বড়। কিসের জোরে একজন ব্যক্তি যুগ-চালক হইয়া বসেন এবং আর এক জন হন না—এ প্রশ্নের উত্তর সে ব্যক্তির কোন মতবাদের মধ্যে নাই—তাঁর অখণ্ড ব্যক্তিত্বের মধ্যেই ইহার উত্তর রহিয়াছে। হীরার নানা মুখ হইতে যেমন রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, বৃহৎ ব্যক্তিত্বের নানা মুখ হইতে তেম্‌নি নানাভাবের ও রসের আলোক পাওয়া যায়। সেই তাঁর সমস্ত জীবনের আলোকে, ব্যক্তিত্বের আলোকে, তাঁর রচনা যিনি পড়েন তাঁর কাছেই তাঁর রচনাও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

কিন্তু যিনি কেবলমাত্র মত-বিচারক, তিনি কেবল পুঁথির মত-বাদ লইয়া বিবাদ করেন। ব্যক্তিত্বের আলোয় মতকে দেখেন না বলিয়া কোন মতের মূল্য নিরূপণ করা তাঁর সাধ্য নয়। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও মনস্বিতা বাদ দিলে তাঁর মতের সঙ্গে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সদ্য পাশ-করা ছোকরা কিম্বা কোন নব্য তার্কিক উকীলের দুইটা বুলি-কপ্‌চানো মতের সঙ্গে পার্থক্যটা থাকে কোথায়?

"মহাভারতের মধ্যে ঢুকেছেন কীট,
কেটে কুটে ফুঁড়েছেন এপিঠ-ওপিঠ।
পণ্ডিত খুলিয়া দেখে হস্ত হানে শিরে,
বলে, ওরে কীট তুই একি করিলিরে!
তোর দন্তে শান দেয়, তোর পেট ভরে—
হেন খাদ্য কত আছে ধূলির উপরে।
কীট বলে, হয়েছে কি, কেন এত রাগ,
ওর মধ্যে ছিল কিবা, শুধু কালো দাগ।
আমি যেটা নাহি বুঝি সেটা জানি ছার
আগাগোড়া কেটে কুটে করি ছারখার!"

—(কণিকা)

সমাজ-চ্যুতাদের কথা

খবরের কাগজে প্রায়ই পড়া যায় যে, কুলনারীদিগকে ফাঁকি দিয়া হরণ করিয়া দুষ্টলোক তাহাদিগকে সমাজের আশ্রয় হইতে বিচ্যুত করিবার ব্যবসা চালাইতেছে। সুবাসিনীর ঘটনা সকলেই খবরের কাগজে পড়িয়াছেন। সে নির্দ্দোষ; তার শরীরে কলুষ স্পর্শ করিলেও তার মনের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায়, কোন কালিমার দাগ পড়ে নাই। যে সমাজ এ-হেন নির্দ্দোষকে আশ্রয় না দিয়া পাপের পথে ঠেলিয়া দেয়, সে সমাজে ভাঙন ধরিবেই এবং একদিন তার ভিত্‌ শুদ্ধ ধসিয়া যাইবে—একথা নিঃসংশয়েই বলা যায়।

শুধু ধর্ষিতা স্ত্রীলোককে পুনর্গ্রহণ করাই যে সমাজের কর্ত্তব্য তাহা নয়—যারা সমাজ-চ্যুতা, তাদের সম্বন্ধেও সমাজের

কর্ত্তব্য আছে। অথচ কেবলমাত্র এই দেশের সমাজই সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

হিন্দুসমাজে দয়া-দাক্ষিণ্য, স্বজন-বাৎসল্য, অতিথি-সেবা প্রভৃতি অনেক মহত্ত্বের নিদর্শন আছে—কিন্তু নাই একটি বড় জিনিস। ব্যক্তিগত কিম্বা সমষ্টিগত ভাবে মানুষের পরে একটা সহজ অনুকম্পা একটা অকৃত্রিম দরদ—সে পড়িয়া গেলে তার হাতখানি ধরিয়া তাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা— এই বস্তুটার অসদ্ভাব এ দেশের সমাজে পদে-পদেই লক্ষ্য করা যায়।

ইউরোপের সমাজে পাপ নানা আকারে দেখা দেয়—সেখানে সমাজ-চ্যুতার সংখ্যা যথেষ্ট, জারজ সন্তানের সংখ্যা প্রবল, কুৎসিত রোগাক্রান্তের সংখ্যাও অসংখ্য। কিন্তু ইউরোপের কোন দেশই এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের মত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। তারা এই সব ব্যাপারের তথ্য তন্ন তন্ন করিয়া সংগ্রহ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক দিক্ দিয়া ইহাদের কারণ অনুসন্ধান করিতেছে, এবং এইসব অমঙ্গল-নিবারণের নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। ইউ-রোপের নৃতত্ত্ববিদ্ (anthropologist) সমাজতত্ত্ববিদ্ (Sociologist) সৌজাত্য-তত্ত্ববিদ্ (Eugenist) চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্ প্রভৃতি, এ সকল বিষয়ে কত যে গবেষণা ও পরীক্ষা করিতেছেন, তার হিসাব লইলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ইউরোপের তুলনায় পণ্যাস্ত্রীর সংখ্যা এদেশে কম হইলেও ইউরোপে তাদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ বিস্তর আছে, অথচ এদেশে একটিও নাই। এ সম্বন্ধে M. Ryan, Tait, Wardlaw, Lombroso প্রভৃতির কেতাব ইংরাজীতে পাওয়া যায়—Sex বা মিথুন সম্বন্ধীয় যে কোন কেতাবেই এই সকল গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। Lombroso-লিখিত "Woman as criminal and prostitute" একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মিথুন-তত্ত্ব (Sexual science) সম্বন্ধে গ্রন্থের ত অভাবই নাই। অথচ এই সব সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল জাগা দূরে থাকুক, তথ্য সংগ্রহ করিতেও কারো উৎসাহ হয় না। স্বীকার করি যে, ইউরোপের সমাজের সঙ্গে আমাদের দেশের সমাজের নানা বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য আছে বলিয়া ইউরোপের তুলনায় সামাজিক দুর্নীতি এ দেশে যথেষ্ট কম। তবু যাহা আছে, তার তথ্য ও তত্ত্ব নির্ণয় করা দরকার নয় কি? কত ডাক্তার আছেন—চিকিৎসার্থ তাঁহাদিগকে পণ্যা-নারী-দের সংসর্গে আসিতে হয়। তাঁরা অনায়াসে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা প্রচার করিতে পারেন। কিন্তু তাঁরাও এ বিষয়ে উদাসীন।

ইহার ফলে হইয়াছে এই যে, আমরা অনেকেই বিদেশের মিথুন-তত্ত্ব আলোচনা করিতে সুরু করিয়াছি, কিন্তু আমাদের নিজেদের দেশের মিথুন-জীবনের (sex-life) কোন জ্ঞান আমাদের নাই। অথচ যে সকল অবস্থায় সমাজের মধ্যে মিথুন-বোধ (sex consciousness) অত্যুগ্র হইয়া মানুষের মনকে বিষাইয়া তোলে, আমাদের সমাজে সে সমস্ত অবস্থাই ক্রমে ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। বড় বড় সহরে Public House, Dancing saloon না থাকুক, শৌণ্ডিকাপণ, কদর্য্য থিয়েটার, বায়স্কোপ, অপেরা-হাউস্, কি-

পরিচারিত মেস, এবং cafe'র বদলে পান-ওয়ালীদের দোকান এ সমস্ত উপকরণই উপস্থিত। এ গুলিকে রাতারাতি বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই।

নাগরিক জীবনটাতে আমরা ক্রমেই অভ্যস্ত হইতে চলিয়াছি। পৃথিবীর অন্যান্য সকল সমৃদ্ধ নগরের মত বাংলাদেশের ছোট বড় নগরগুলিতেও শ্রমী-ব্যবসায়ী-ব্যাপারীর দলবৃদ্ধি হওয়ায় স্ত্রীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশি। কেননা, অনেক পুরুষই নগরে একক বাস করে। তার ফলে পণ্যানারীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। তারপর সহরের আবহাওয়া নিরানন্দ, সমস্ত দিন ক্লান্তিকর পরিশ্রম—অতএব, সন্ধ্যার পর একটা কিছু উত্তেজনা দরকার হইয়া পড়ে। সুতরাং নানাপ্রকার লঘু আমোদে মানুষ আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া বাঁচে। কিন্তু এসকল বিষয়েই যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা গোড়ায় দরকার।

এরি সঙ্গে আমাদের দেশের বিবাহ, পরিবারের গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট কথা নূতন করিয়া ভাবিবার আছে। কেননা, আগে যে সমস্যার কথা বলিলাম, তার সঙ্গে এগুলি সংশ্লিষ্ট। গতানুগতিক সংস্কার জিনিসটা ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভালো যতক্ষণ মানুষ সেটা যে সংস্কার এই কথাটা না বোঝে। মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ যখন হয়, তখন চোখ-ফোটা পক্ষিশাবকের মত সেই সংস্কারের কুলায়ে তাহাকে আর কুলায় না—তার দৃষ্টির ক্ষেত্রটা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তার সঞ্চরণ-ক্ষেত্র ও বিহার-ক্ষেত্রও বাড়িয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহরা সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত এই সব মিথুন-মনস্তত্ত্ব, বিবাহ, প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আলোচনার কোন সংবাদই জানিতেন না। কাজেই তাঁদের চেতনার নূতন নূতন দরজা খুলিয়া যায় নাই। কিন্তু আমরা একালের মিথুন-মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিয়া এবং নিজেদের মিথুন-জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুঝিতেছি যে, আমাদের জীবনে আজ যে মিথুন-রাগের লীলা বিচিত্র ভাবে লীলায়িত, তার সঙ্গে মানুষের আদিম কাম-প্রবৃত্তির কোন সাযুজ্য বা সারূপ্য নাই। অথচ সেক্স্-ঘটিত কোন প্রসঙ্গ তুলিলেই এদেশের অধিকাংশ লোকের মনের মধ্যে ইন্দ্রিয়ভোগের লালসাপূর্ণ স্থূল দিক্‌টাই মূর্ত্ত হইয়া উঠে। যে মিথুন-রাগের কথা বলিতেছি, তাহা মানুষের জীবনের সৌন্দর্য্যানুভূতি, প্রেমানুভূতি, এমন কি, অধ্যাত্ম অনুভূতি পর্য্যন্ত, সকল অনুভূতি ও প্রেরণাকে অনির্ব্বচনীয় রংয়ে রঞ্জিত করিয়া মানুষের সমস্ত চেতনাকে আবেগ-চঞ্চল করিয়া তোলে। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানুষের হৃদয়-মনের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের আদিম স্থূল কামপ্রবৃত্তি এই সূক্ষ্ম সর্ব্বরঞ্জক মিথুন-রাগে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এইজন্য একজন মিথুন-তত্ত্ব-রচয়িতা এই অভিনব মিথুন-রাগকে "Rhythmo-tropism" বলিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, এই অভিনব মিথুন-রাগের প্রেরণাটা ইন্দ্রিয়জও বটে হৃদয়জও বটে—ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে হৃদয়-মনের ছন্দের অপূর্ব্ব মিল্। সুতরাং এখনকার কাব্যে ছবিতে গানে কাব্যে, স্ত্রীপুরুষের অঙ্গ-সজ্জায় গৃহ-সজ্জায়,

স্ত্রীপুরুষের সামাজিক মিলনে, হাস্তে পরিহাসে আলাপনে, কত শতসহস্র মধুর ছলার ভিতর দিয়া মানুষের মনের তারে ও ইন্দ্রিয়ের তারে এই মিথুন-রাগের অনির্ব্বচনীয় ঝঙ্কার হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। এ হিল্লোলের ফল যে খারাপ, এমন কথা কে বলিবে? এই হিল্লোল-চাঞ্চল্যই ত সাহিত্য-শিল্পে, সমাজ-জীবনের স্তরে স্তরে লীলায়িত। রোমাণ্টিক সাহিত্যের মূলে মনসিজের এই বিচিত্র প্রভাবই তো প্রত্যক্ষ। রুশোর New Heloise হইতে সুরু করিয়া গ্যয়টে, শ্লেগেল, হাইনে, মোপার্সাঁ, গোতিয়ে, বদ্‌লেয়ার, ব্রাউনিং এবং একালের ইব্‌সেন্-ষ্ট্রীন্‌ড্‌বার্গ পর্য্যন্ত, শুধু মিথুন-রাগের সাহিত্য কি কম এবং তার প্রভাব কি আমাদের মনের পরে সামান্ত? বাংলা সাহিত্যের কোন কবি বা ঔপন্তাসিকের নাম না করিলেও সকলেই জানেন যে, এখনকার গল্প-উপন্তাসের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়—এই অভিনব মিথুন-রাগের বিচিত্র লীলা।

সেই জন্য, এখন এই সেক্‌স্-জীবনের পরিবর্ত্তনটাকে যদি একালের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধে জোর করিয়া অস্বীকার করি, যদি বলি যে জবরদস্তির দ্বারা এ পরিবর্ত্তনস্রোতকে নিরোধ করিব তবে ফল হইবে এই যে, নবজাগ্রত এই সুস্থ বিকাশে সমাজে মিথুন-বোধের (Sex-consciousness) যে সাহিত্য-শিল্প-সৌন্দর্য্যের হিল্লোল বহিত, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে সহজ করিত, বিবাহকে স্বাধীন নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিত—তার সম্ভাবনা বন্ধ হইয়া যাইবে। মানব-প্রকৃতি যদি আপনার স্বাভাবিক বিকাশের পথ না পায়, তবে সে বিকৃত হইয়া উঠে। বহুযুগ-রূপান্তরিত হৃদয়জ মিথুনরাগ সমস্ত জীবনকে ও হৃদয়কে মধুর রংয়ে রঞ্জিত করিতে না পারিলে, তাহা অস্বাভাবিক কাম-বিকারে পর্য্যবসিত হইবেই। তখন সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্র-সঞ্চারিত সেই বিষকে ঠেকাইবে কে?

যে সকল কদর্য্য সামাজিক অবস্থায় এই সব বিষ উৎপন্ন হইতেছে ও ছড়াইয়া পড়িতেছে, তার গোটাকতককে উন্মূলিত করিলেই যে সমস্যা চুকিয়া যাইবে তাহা নয়। থিয়েটার বন্ধ করিলেই যে সহরের যুবক ও অন্যান্ত লোক দুর্নীতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে তাহা নয়। অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জায়গায় স্বাস্থ্যকর অবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কলুষিত আমোদের জায়গায় ভদ্র আমোদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। থিয়েটারও চাই, গান-বাজনাও চাই—এমন কি নাচও হয়ত চাই। কিন্তু কি ভাবে চাই, কি আকারে চাই—তারি উপর এর সুফল-কুফলের নির্ভর। শ্রমীর শ্রম লাঘব করা ও শ্রমের মধ্যে মর্য্যাদাকে জাগানো এবং তার আনন্দের ও অবসরের ব্যবস্থা করা—শ্রমীকে পতন হইতে রক্ষা করিবার একটা উপায়। কিন্তু এ সমস্ত ব্যবস্থাই এত গুরুতর পরিবর্ত্তন-সাপেক্ষ যে, সমাজ সে সব পরিবর্ত্তনের ছায়াপাতেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিবে। . . . .

তাই বলিতেছিলাম যে, কোন সমস্যারই আনুমানিক সমাধান স্থির না করিয়া প্রোজন দরকার তথ্যসংগ্রহ। সামাজিক ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য সংগৃহীত হইলে, তারপর নানা থিওরি স্বভাবতই দাঁড়াইবে। তারপর নানা

পরীক্ষা উপস্থিত হইবে এবং ক্রমশ থিওরির পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকিবে। এমনি করিয়া সমাজ-বিজ্ঞানের উপকরণ প্রস্তুত হইবে। এবিষয়ে যাঁরা ভাবুক ও চিন্তাশীল, তাঁরা অনুসন্ধানে ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা আশা করিয়া রহিলাম।

পল্লী সভ্যতা

ইস্কুলে যখন পড়িতাম, তখন মাষ্টার মহাশয় পল্লী ও সহরের সুবিধা-অসুবিধা তুলনা করিয়া রচনা লিখিতে দিতেন, মনে পড়ে।

তখন পল্লীর স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-সরলতার কথা লিখিয়া পল্লীর তুলনায় সহরকে খাটো করিবার চেষ্টা করিলে মাষ্টার বলিয়াছিলেন যে, সহরই সভ্যতার জন্মভূমি—সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান, বাণিজ্য-ব্যবসায়, ধনৈশ্বর্য্য, রাজ্য-সাম্রাজ্য, সমস্তই তৈরি হয় সহরে। পল্লী আছে শুধু সহরের পুষ্টিসাধনের জন্য।

বেশি বয়সে দুচারটে অর্থবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে কেতাব নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি যে, পল্লী সম্বন্ধে আমাদের ইস্কুল-মাষ্টার যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তারি সমর্থন পাওয়া যায়। মাল-জোগানের দিক্ দিয়া পল্লীর সঙ্গে সহরের যে সম্বন্ধ, তার চেয়ে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধের কোন আঁচ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভাব এই যে, পল্লীতে যেন মানুষ নাই এবং সে মানুষদের সম্বন্ধে ভাবিবারও কোন দরকার নাই—সেখানে শুধু ফলে ফসল এবং সেই ফসল ও কাঁচামাল সহরের হিসাবেই প্রয়োজন।

রুশো পড়িয়া, ওয়ার্ডস্বার্থ পড়িয়া প্রথম বুঝি যে, যারা প্রকৃতির সহবাসে বাস করে, তাদের মধ্যে এমন কতকগুলা সম্পদ্ দেখা দেয়, যাহা সভ্যতার কৃত্রিম আব্‌হাওয়ায় মানুষ যারা, তাদের মধ্যে বিরল। তারপর কার্লাইল, রাস্কিন্ পড়িয়া প্রকৃতির সহবাসের মূল্যটা আরও বেশি করিয়া মনে দাগা দিল। যে সভ্যতা প্রকৃতির বুকের মধ্যে লালিত হয় না, সে শতপাক আবরণে জড়ানো—সেই আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া মানুষকে নগ্ন হইতে হইবে, এইতো কার্লাইলের বাণী। যে শিল্প, যে ব্যবসায়, প্রকৃতির নিগূঢ় অন্তঃপুরের সৌন্দর্য্য ও মহিমার দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়, সে শিল্প মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হয়, সে ব্যবসায় ঘোরতর যান্ত্রিক হইয়া উঠে—এইতো রাস্কিন্ ও উইলিয়ম ম্যারিসের কথা। সুতরাং পল্লীটা যে শুধু ফসল ফলাইবার জায়গা, সেখানে আর কিছু ফলিবার সম্ভাবনা নাই—এ ধারণাটা ক্রমশ আঘাত পাইতে লাগিল।

বাংলা দেশে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, পল্লী-সভ্যতাকেও সৃষ্টি করিয়া তোলা যায়। অতএব, বাংলা পল্লীগুলির মধ্যে বিশ্বের হাওয়া বহাইয়া দিতে হইবে। পল্লীকে এমন করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে সেখানকার মানুষ শ্রমকে ও ব্যবসায়কে 'ব্যূহবদ্ধ' করিয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং অবকাশ পায় এবং সেই অবকাশকে শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্য প্রভৃতির দ্বারা রমণীয় করিয়া তুলিতে পারে। ভদ্রলোক-ছোটলোক—এই ব্যবধানটা ঘুচাইয়া সকলে মিলিয়া জোট বাঁধিয়া কাজে নামিলে গ্রাম আর গণ্ডগ্রাম থাকিবে না, সেখানে জীবনের বেগ স্বতঃ দেখা দিবে।

রবীন্দ্রনাথের এই "স্বদেশী সমাজের"

আইডিয়াটা প্রথমে বুঝি নাই। মনে হইয়াছিল যে, কবি-মানুষ প্রকৃতির সহবাসে আনন্দ পান্, গণ্ডগ্রামে বসতি করিয়া ম্যালেরিয়া ও প্লীহা সঞ্চয় করিলে তখন যে আনন্দটা কি রকম দাঁড়ায় তাহা ভাবিয়া দেখেন না। তারপর সেখানে মানুষ কোথায়? কোথায় নানা চিত্তের ঘাতপ্রতিঘাত? জ্ঞানের চর্চ্চার সেখানে সুযোগ কোথায়? বেশিদিন গাঁয়ে থাকিলে গাছপালার সামিল হইতে হয়—জীবনের মধ্যে সরলতা জাগিতে পারে, কিন্তু নিশ্চলতা ও নিঃসাড়তা জাগিবে তার আগে।

দুটো কথা তখন ভাবি নাই।

১। সকল দেশেই—বিশেষতঃ এদেশে—তথা-কথিত ছোট লোকের সংখ্যাই ভদ্র লোকের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেখানে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, সেখানেও শ্রমীরা ধনীদের অধীন এবং তাদের অবস্থা সেকালের ক্রীতদাসদের চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নয়। তফাৎ এই যে, ক্রীতদাসকে চাবুক মারিয়া কাজ করানো হইত, আর শ্রমী-মজুরদের হাতে না মারিয়া 'ভাতে মারিয়া' খাটানো যায়। গণতন্ত্রে এই গণদের স্থান কোথায়? শ্রমকে যখন মূল্য দিয়া কেনা যায়, তখন এই আধুনিক দাসদেরই বা ক্রীতদাস না বলি কেন? সুতরাং যে সভ্যতায় বা গণতন্ত্রে অধিকাংশ মানুষ ক্রীতদাস, তাকে উঁচুদরের সভ্যতা বলা চলে না।

২। আধুনিক সভ্যতা নাগরিক সভ্যতা হওয়ায় পল্লী হইতে মানুষের মনের স্রোত সরিয়া যাওয়ায় সেখানে প্রাণ মরিয়া যাইতেছে। সেখানে অস্বাস্থ্য, সেখানে নিরানন্দ, সেখানে নিঃসাড়তা। যে দেশে কৃষি ও কৃষক মরে, সে দেশটাও ক্রমশ ধ্বংসের মুখে পড়ে। প্রাচীন ইতালী এই কারণে মরিয়াছিল। ইংলণ্ডে এই ব্যাধি ঢুকিয়াছে; আয়র্লণ্ডে মানুষ বিদেশে পলায়ন করিতেছে, কেননা দেশে আনন্দ নাই। ভারতবর্ষেও, বিশেষ ভাবে বাংলাদেশে, পল্লী সব জীর্ণ হইয়া ঝুরিয়া গেল প্রায়। এই যে ক্ষয়, ইহা নিবারণ করিতে না পারিলে সভ্যতা দাঁড়াইবে কিসের উপর? পল্লীতে বিচ্ছিন্ন মানুষ আছে; ব্যূহবদ্ধ সমাজ নাই—সুতরাং সভ্যতা নাই। পল্লীতে যদি শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আনন্দ-ধর্ম্ম প্রভৃতি আমদানি করা যায় এবং সমাজ গড়া যায় তবেই সভ্যতা বাঁচে।

উপরে যে দুটো কথার অবতারণা করা গেল, তাহা পাইলাম একজন আইরিশ কবি, A.E.'র 'The National Being' নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থে। এই দিক্ দিয়া এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহ চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া জানিনা। পল্লী যে সভ্যতার কেন্দ্র হইয়া সভ্যতাকে রক্ষা করিতে পারে, একথা আমাদের মনে হয় নাই। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আজকের সভ্যতায় যারা এর বিলাস-বিভবের অংশীদার নয়, তারা আমাদের মন হইতে পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। তারাই যে সংখ্যায় বেশি সে কথাটা বেমালুম ভুলিয়া যাইতে হয়। পশ্চিমে এই অবজ্ঞাত শ্রমী সমবায়-ধর্ম্মের প্রভাবে মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে। তবু এখনও পর্য্যন্ত যে সব Trade-unionism বা Socialism এর

চেহারা দেখি, তাহা বেশীরভাগ সহরের শ্রমীদের মধ্যেই দেখি। সহরে তারা নগণ্য; তাদের স্থান সঙ্কীর্ণ। তারা সহরে পড়িয়া নেশায় জীর্ণ, বিলাসের আবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান, পাপের কলুষে আকণ্ঠ নিমগ্ন। সামাজিক দুর্নীতি সম্বন্ধে যে কোন বই পড়িলে দেখা যায় যে, পল্লী হইতে যে সব দরিদ্র স্ত্রীলোক সহরে দাসীবৃত্তি করিতে আসে, ক্রমে তারাই পণ্য-স্ত্রীতে পরিণত হয়। আর সহরের অস্বাস্থ্যকর সংকীর্ণ আবাসে, নিরানন্দ পরিবেষ্টনে, পুরুষেরা নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল আমোদের মধ্যে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া বাঁচে। এ পাপ হইতে রক্ষার জন্যও শ্রমকে ও ব্যবসায়কে সহরে কেন্দ্রীভূত না করিয়া পল্লীতে বিস্তারিত করিয়া দেওয়া দরকার। পল্লী যদি ব্যূহবদ্ধ হয়, তবে পল্লীতে ও জিলায়, জিলায় ও দেশে, একটা অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যাইবে। তখন সমস্ত দেশ এক সজীব-কলেবর-বদ্ধ হইবে। এইতো রবিবাবুর স্বদেশী সমাজের আদর্শ।

কবি, এ,ই, লিখিয়াছেন যে, "এই "স্বদেশী সম্রাজ" গড়িতে না পারিলে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের বন্ধনে মানুষের ঐক্য হয় না। সামাজিক ঐক্যের ভিত্তির উপর তবে রাষ্ট্রীয় ঐক্য পাকা রকম দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ বরাবর বলিয়াছেন যে, ষ্টেটের দিকে না তাকাইয়াই এই স্বদেশী সমাজ গড়া দরকার। এ,ই, বলেন তার কারণ:—

"Big Empires and republics do not create real citizenship because of the loose organisation of society. Men failing to understand the intricacies of the vast and complex life of their country, fall back on private life and private ambitions and leave the making of laws etc to professional politicians."

বাংলাভাষায় উচ্চশিক্ষা

গত সাহিত্য-সম্মিলনের সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অভিভাষণ তাঁরই উপযুক্ত হইয়াছে। বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করা সম্বন্ধে তিনি অনেকের মতামত উদ্ধার করিয়া বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে ক'টি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা নীচে দেওয়া গেল:—

"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিশ্বাস,—বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব আরও প্রসার বৃদ্ধি হওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি আপাততঃ সত্বর অবলম্বন করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি, এ শ্রেণী পর্য্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্য পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা গ্রহণে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(খ) প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন।

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-বিজ্ঞান এম এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত-ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঙ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে৭"

সভাপতি মহাশয়ের (ক) প্রস্তাব সম্বন্ধে, অর্থাৎ প্রবেশিকা হইতে বি, এ, পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পাঠ্য-তালিকা তৈরি সম্বন্ধে এখনি ভাবা দরকার। এ বিষয়ে আমরা বাংলা সাহিত্যের ও বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের রথী-মহারথীদিগের কিরূপ সঙ্কল্প তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। যাঁরা ইচ্ছুক আছেন, তাঁরা যদি পাঠ্য-তালিকা তৈরি করিয়া আমাদিগকে পাঠান্, তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের কি পরিমাণে এবং কতদূর পর্য্যন্ত স্থান হইতে পারে, তার একটা ধারণায় সকলেই উপনীত হইতে পারেন। বলাবাহুল্য, প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য, নাট্য, উপন্যাস, সাহিত্য-সমালোচনা, জীবনী, গল্পপ্রবন্ধ, হাস্য-কৌতুক ও ব্যঙ্গকৌতুকের রচনা, প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগ হইতেই পাঠ্যপুস্তক বাছাই করিতে হইবে। ভরসা করি, বাংলাসাহিত্য বলিতে হীরেন্দ্রবাবু পণ্ডিত-মহাশয়দিগের সংস্কৃত-রীত্যনুসারে লিখিত ও সংস্কৃত ব্যাকরণ-সঙ্গত, অত্যন্ত দুষ্পাচ্য ও বি-ীষিকাপ্রদ গুটিকতক কেতাব স্মরণ করেন না'ই। বাংলা যে সংস্কৃত নয়—এ জ্ঞান অনেক পণ্ডিত-মহাশয়ের না থাকিলেও "বেদান্ত-রত্ন" হীরেন্দ্রবাবুর যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

জাতির জীবনীশক্তি-হীনতা

জাতির মধ্যে অতিরিক্ত রোগ-প্রবণতা ও শিশু-মৃত্যু জাতির জীবনীশক্তি-হীনতার পরিচায়ক একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জাতির জীবনীশক্তি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন সে আর পূর্ব্বের মত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে 'খাপ্' খাইয়া চলিতে পারে না। ফলে তাহার মধ্যে নানা ব্যাধি ও বিকৃতির সূচনা দেখা যাইতে থাকে।

কোনো জাতি যখন আদিম অবস্থা ছাড়িয়া "সভ্য" হইতে থাকে, তখন সে নানারূপ আরাম ও সুবিধা ভোগ করিবার সুযোগ পায় সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি অসুবিধাও আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন যে তাহার সাধারণ-জীবনীশক্তি কমিয়া যায়, রোগ-প্রবণতার আধিক্য দেখা দেয়, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। স্পেন্সার বলেন যে

সভ্যজাতি রোগ-নিবারণের যে-সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করে তাহাতেই তাহাদের রোগ-প্রবণতা আরও বাড়িয়া যায়। নানারূপ কৃত্রিম উপায়ে বহিঃপ্রকৃতির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া দেহের সহিষ্ণুতা-শক্তি কম হইয়া পড়ে ও তাহাতে ভবিষ্যতে আরও বেশী করিয়া রোগের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায়।

"The very precautions against death are themselves in some measure new causes of death. Every further appliance for meeting an evil, every additional expenditure of effort, every extra tax to meet the cost of supervision, becomes a fresh obstacle to living". (Study of Sociology—p.341.)

ফলতঃ, সভ্যতা অনেক স্থলে মানবজাতির পক্ষে আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ তাহা ঠিক করা কঠিন। সভ্যতা অর্থে যদি নানারূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিকাশ বুঝায়, তবে এ-কথা দুঃখের সহিত বলিতেই হইবে যে, এই সকলের দ্বারা প্রায় কোনো সভ্যজাতিই শেষ-পর্য্যন্ত জীবন-যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। আদিম ও বর্ব্বর যুগের যুদ্ধ-প্রবণতা ও কঠোর জীবন-প্রণালী ছাড়িয়া যখনই কোনো জাতি শান্তশিষ্টভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে বসিয়াছে, তখনই তাহারা "নির্বীর্য্য" হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের দৈহিক বল ও সহিষ্ণুতার হ্রাস হইয়াছে। ফলে প্রান্তবাসী দুর্দ্দান্ত অর্দ্ধসভ্য বর্ব্বর জাতিদের আক্রমণে তাহাদিকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে ও অধিকাংশ স্থলেই দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিতে হইয়াছে। আর্য্যজাতি যখনই নিশ্চিন্ত মনে গঙ্গাতীরে বেদ বেদান্তের চর্চ্চা করিতে বসিয়াছিলেন, তখনই শক, হূণ, মোগল ও তাতার জাতির অত্যাচারে তাঁহাদের বিধ্বস্ত হইতে হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীকজাতি যে অতিরিক্ত কাব্য-দর্শন আলোচনার ফলেই দুর্দ্দান্ত রোমের কবলে বন্দী হইয়াছিল এ-কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বর্ব্বর গথেরা রোমক সভ্যতার সুরম্য হর্ম্ম্য আপনাদের বিপুল বর্শার আঘাতে চুরমার করিয়া দিয়াছিল। "সভ্যতার" ফলে নানারূপ বিলাসিতা ও দুর্নীতি আসিয়া সমাজের ভিত্তিমূল যে ক্ষয় করিয়া দেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহা ছাড়া ইহাতে জাতি শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ হইয়া পড়ে; যুদ্ধবিদ্যা ভুলিয়া কেবল তানপুরা ভাঁজিয়া ও পুঁথি ঘাঁটিয়া তাহাদের শরীর-মন অনেকটা কোমল-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে এবং ফলে নানারূপ দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার প্রাদুর্ভাব হয়।

"সভ্য" জাতি বর্ব্বর জাতির তুলনায় নানা বিষয়ে শান্তিপ্রিয় হইয়া পড়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আবার সভ্য জাতির জীবন নানারূপ কৃত্রিম চঞ্চলতায় ভরিয়া উঠে। একদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যাভাব ঘটে ও জীবন-ধারণের জন্য নানারূপ কষ্টকর ও কদর্য্য উপায়ে আহার সংগ্রহ করিতে হয়; অন্যদিকে স্থানাভাবে সহর ও গ্রামগুলি মধুচক্রের মত জনবহুল হইয়া সাধারণ মানুষের বাসস্থান সঙ্কীর্ণ এবং আবর্জ্জনাময় হইয়া উঠে। ফল-

কারখানা ও রেল, ষ্টীমার, মোটর-কার প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে পারিবারিক জীবনের শান্তি ও পবিত্রতায় অনেকখানি ব্যাঘাত আসিয়া পড়ে. নানারূপ কৃত্রিম আমোদ-প্রমোদ লোকের মনকে লঘু ও তরল করিয়া তোলে এবং জীবনকে গভীরভাবে গ্রহণ করিবার অবসর দেয় না। এই সকলের ফলে সভ্যজাতির মধ্যে অনেক নূতন নূতন ব্যাধির সৃষ্টি হয়। কতকগুলি ব্যাধি কেবল সভ্যজাতির নিজস্ব; বর্ব্বর জাতির মধ্যে তাহার অস্তিত্ব দেখা যায় না। যেমন যক্ষ্মা, বহুমূত্র প্রভৃতি।

এইরূপে সভ্যতার ফলে জীবনীশক্তি-হীনতা জাতি-সমূহের মধ্যে অনেকটা সাধারণ; কিন্তু আর একটা বিশেষ কারণে কোনো কোনো জাতির জীবন-শক্তি-হীনতার উপর ঘা পড়ে। দুইটি সম্পূর্ণ-বিভিন্ন-জাতীয় ও অসম-সভ্যতাবিশিষ্ট জাতির যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন এইরূপ ঘটে। এই অবস্থায় প্রবল সভ্যতাবিশিষ্ট জাতির সংস্পর্শে আসিয়া দুর্ব্বল জাতির জীবন-প্রণালীতে ঘোরতর উলটপালট ও গণ্ডগোল বাধিয়া যায়। দুর্ব্বল জাতি যে অভ্যাস ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিল, প্রবল জাতির সংঘর্ষে আসিয়া তাহার অধিকাংশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ফলে নূতন অভ্যাস ও নূতন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে অধিকাংশ স্থলেই সে অশক্ত হইয়া পড়ে। তাহার মধ্যে নানারূপ দৈহিক ও মানসিক ব্যাধির আবির্ভাব হয়। তাহার জীবনশক্তি হ্রাস হইয়া যায়, রোগ-প্রবণতা বাড়িয়া উঠে, জীবন-যুদ্ধে পদে-পদে তাহাকে প্রতিহত হইতে হয়। ভারতবর্ষের অবস্থা যে অনেকটা এইরূপ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রবল ইউরোপীয় জাতি-সমূহের সংঘর্ষে আসিয়া, তাহার প্রাচীন শান্ত জীবন-যাপন-প্রণালীতে আঘাত লাগিয়াছে; তাহাকে চির-পুরাতন অনেক অভ্যাস ত্যাগ করিয়া, নূতন নূতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে 'খাপ' খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে হইতেছে। জীবন-সংগ্রামের ব্যস্ততা, উদ্বেগ ও কৃত্রিম চঞ্চলতা তাহার মধ্যে বাড়িয়া গিয়াছে। যদি তাহার জীবনীশক্তি প্রবল থাকিত, তবে হয়ত এ আঘাত সে সহ্য করিতে পারিত; কিন্তু বহু-শত-বৎসরের নানা উপদ্রব ও বিড়ম্বনায় তাহার জীবনীশক্তি স্বভাবতঃই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই এ নূতন আঘাত সহিবার ক্ষমতা তাহার কমিয়া যাইবারই কথা। ফলে নানারূপ নূতন নূতন ব্যাধি তাহার মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইতেছে।

ভারতে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রসিদ্ধ ডাক্তার মাদ্রাজবাসী C. Muthu M. D. M. R. C. S. একটা খুব বড় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতে এই ব্যাধির আসল কারণ "tremendous impact between the ideals of the East and the West." প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন; আর সেই দুই সম্পূর্ণ-ভিন্নজাতীয় আদর্শের সংঘর্ষেই এই নূতন সভ্যতা-ব্যাধি ভারতে দেখা দিয়াছে। বাস্তবিক আধুনিক ডাক্তারেরা রোগের নিদান নির্ণয় করিতে

গিয়া জীবাণু-তত্ত্বের উপরে খুবই বেশী ঝোঁক দেন ;– কোন্ জীবাণু কোন্ রোগের নিদান তাহার গবেষণা করিতেই অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন ; কিন্তু এই সকল রোগ উৎপত্তির ভিতরে যে জীবন-বিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞানের (Biology & Psychology) একটা দিক আছে তাহা মোটেই দেখেন না। আচার্য্য ডারুইনের দৃষ্টিতে কিন্তু এদিকটা এড়ায় নাই। প্রবল জাতির সংস্পর্শে দুর্ব্বল জাতির মধ্যে রোগ-সৃষ্টির কথা বলিতে গিয়া তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন--

"It further appears, mysterious as is the fact, that the first meeting of distinct and separated people generates disease." (The Descent of Man—P. 283.).

কিন্তু ডারুইনের পরে এই রহস্যপূর্ণ ব্যাপারটি লইয়া বিশেষরূপে আর কেহ আলোচনা করেন নাই—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

জাতির মধ্যে জীবনীশক্তিহীনতার একটা লক্ষণ—জাতীয়জীবনের আয়ুঃপরিমাণের হ্রাস। যে জাতির জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া পড়িয়াছে, সে জাতির মধ্যে লোক প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না ;—তাহার অন্তর্গত ব্যক্তি-সমূহের আয়ুঃপরিমাণ তুলনায় সুস্থ ও সবল জাতির লোকদের আয়ুঃপরিমাণ হইতে অনেক কম। আমাদের এই ভারতবর্ষেই তাহার শোচনীয় দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে। ব্যাপার কিরূপ গুরুতর দাঁড়াইয়াছে, নিম্নের তালিকা হইতে বেশ তাহা বুঝা যাইবে :—

বিভিন্ন দেশের লোকের আয়ুর গড় পরিমাণ :—

দেশ	অব্দ	পুরুষ	স্ত্রী
সুইডেন	১৮৯১—১৯০০	৫০.৯	৫৩.৬
ডেন্মার্ক	১৮৯৫—১৯০০	৫০.২	৫৩.৬
ফ্রান্স	১৮৯৮—১৯০৩	৪৫.৭	০৯.১
ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	১৮৯১—১৯০০	৪৪.১	৪৭.৭
মার্কিনদেশ	১৮৯৩—১৮৯৭	৪৪.১	৪৬ ৬
ইতালী	১৮৯৯—১৯০২	৪২.৮	৪৩.১
জার্ম্মাণী	১৮৯১—১৯০০	৪১.০	৪৪.৫
ভারতবর্ষ	১৯০১	২৩.০	২৪.০

উপরি-লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, কোনো পাশ্চাত্য জাতির আয়ুঃপরিমাণ চল্লিশ বৎসরের নীচে নাই। ভারতবাসীর আয়ুঃপরিমাণের গড় উহাদের তুলনায় অর্দ্ধেক। হয়ত জল-বায়ুর জন্য কিছু ইতর-বিশেষ ঘটিতে পারে ; কিন্তু এতটা বেশী পার্থক্য যে ভারতবাসীর জীবনশক্তিহীনতারই লক্ষণ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের কথা ত এই। কিন্তু শুধু বাংলাদেশের কথা ভাবিলে, বোধ হয় অবস্থা আরও শোচনীয় দেখা যাইবে। বাঙালীর আয়ুঃপরিমাণ যারপরনাই কমিয়া গিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সন্দেহ করেন। বাংলা দেশের ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও আয়ু লইয়া আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক আলোচনা ও আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ছাত্রমহলে নহে, আমাদের আশঙ্কা যে বাঙালী-জাতি-সাধারণের মধ্যেই এই আয়ুঃ-হীনতা দেখা দিয়াছে। পল্লীতে ম্যালেরিয়া এবং সহরে যক্ষ্মা ও বহুমূত্র—যেখানে এই তিন দস্যু সর্ব্বদা হানা দিতেছে, সেখানে

যে অকালমৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

বিশেষ-করিয়া বাংলার প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমানদের মধ্যে এই অকাল-মৃত্যুর আধিক্য দেখা যাইতেছে। ব্যক্তির পক্ষে যেমন মস্তিষ্ক, জাতির পক্ষে তেমনই প্রতিভাশালী লোকেরা। তাঁহারাই জাতীয় আদর্শের স্থাপয়িতা, জাতীয় উন্নতির পথ-নির্দ্দেশক। যে-জাতির মধ্যে প্রতিভাশালীর বাহুল্য, তাহার ভবিষ্যৎ আশাসূচক। প্রতিভাশালীদের অকালমৃত্যু জাতির পক্ষে ঘোরতর ক্ষতিকর; তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলে জাতিকে যে-সকল জ্ঞান ও ভাবসম্পদ দান করিতেন, অকালমৃত্যুর ফলে জাতিকে সে-সকল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। কেন যে বাংলাদেশে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী লোকেরা বেশীদিন বাঁচিতে পারেন না তাহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল পর্য্যন্ত সকলেই অকালে আমাদিগকে কাঁদাইয়া গিয়াছেন। বোধ হয় ভগবৎ-দত্ত প্রতিভা তাঁহারা যে-পরিমাণে লাভ করেন—সে পরিমাণে তাঁহাদের দেহ বাহ্যজগতের ধাক্কা সহিবার উপযোগী হয় না। জাতির সাধারণ জীবনী-শক্তি-হীনতার ফলে তাঁহাদের ক্ষীণ দেহ নিজেদের কর্ম্মবহুল জীবনের গুরুতর চিন্তা ও কঠোর পরিশ্রম বোধ হয় বেশীদিন সহ্য করিতে পারে না। কারণ যাহাই হউক—ইহা যে আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে আশাপ্রদ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি আমাদিগকে বাঁচিতে হয়, তবে আমাদের এই জীবনীশক্তিহীনতার মূল কারণ নির্ণয় করিয়া, তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

কলঙ্কিনী

বৈশাখের অপরাহ্ন ; তপ্ত রবি অগ্নি-আঁখি হানে,
পদপ্রান্তে পড়ে' আছে অনিমেষে চেয়ে তারি পানে
মুহ্যমান মৌন ধরা ; শূন্যদৃষ্টি সরোবরতীরে
নারিকেলতরুকুঞ্জ মর্ম্মরিয়া কাঁপিতেছে ধীরে
দুলায়ে চামর-পত্র ; তীরাস্তৃত বেতসের বন
বিম্বিত ছায়াটি তারি বিস্মিত করিছে নিরীক্ষণ।

তীরের কুটীর ছাড়ি' গ্রীষ্মতাপে সেথা জম্বুমূলে
বসিয়াছিলাম একা আঁখি রাখি' সরোবরকূলে।

সহসা হেরিনু দূরে প্রশস্ত বনপথ দিয়া
ত্বরিত চরণ ফেলি' দীঘিজলে নামিল আসিয়া
অবীরা চণ্ডালকন্যা—পল্লীকলঙ্কিনী সেই তারা।
টুটিল অলস স্বপ্ন ; মূর্ত্তিমতী বিদ্রোহের পারা
ভাঙিল সহজ শান্তি ; সুনির্ম্মল সরোবর-বারি
শিহরি' উঠিল যেন অসংযত অঙ্গস্পর্শে তারি।

তবু রহিলাম চাহি'—অদৃশ্য তাহার নেত্রপথে,
সঙ্কোচের আবরণ সাধ্বসে সরায়ে কোন মতে।

চঞ্চলা ও রঙ্গময়ী তরঙ্গেরই নর্ম্মসঙ্গিনী সে—
রসে-ভরা অঙ্গখানি সরসীর সঙ্গে গেছে মিশে' ;
আয়ত উরস 'পরে উর্ম্মিগুলি হেসে করে খেলা ;
কুঞ্চিত চিকুরজাল তরঙ্গিত শৈবালের মেলা

ভাসে মুখপদ্ম বেড়ি'; আন্দোলিত বাহু-মৃণালের
ললিত লাবণ্যভঙ্গী ইঙ্গিত যেন সে আনন্দের!
লীলায়িত তনুখানি সঞ্চারিয়া উদ্দাম কৌতুকে,
সৃজি নব ইন্দ্রধনু মুখজলে, মুক্তামালা বুকে—
দাঁড়াইল স্নানশেষে তীরপ্রান্তে বিচিত্র বসনে
উচ্ছলিত যৌবনের বন্ধুরতা কসিয়া শাসনে।
সহসা ফিরায়ে মুখ আর্ত্তকণ্ঠে 'ওমা! ওকি', বলি'
চকিতে নামিয়া নীরে দ্রুত সন্তরণে গেল চলি'
ওপারের তীর লক্ষ্যি; সবিস্ময়ে চাহি' সেই পানে
হেরিনু গোবৎস এক ঊর্দ্ধমুখে সন্ত্রস্ত নয়ানে
মুক্তি-আশে পঙ্কমাঝে করিতেছে প্রাণান্ত প্রয়াস;
শৈবালে আচ্ছন্ন দেহ, চরণে জড়ায়ে গেছে ফাঁস।
উদ্‌ভ্রান্তের মত বালা ক্ষিপ্রপদে পঁহুছি' সেথায়,
ত্বরিতে বিপুল বলে বাহুপাশে তুলিয়া তাহায়
বহুযত্নে, শিশুসম অংসোপরি রাখি' মুখখানি
সাবধানে জল হ'তে তীরে তারে কোনরূপে টানি'
আনিলা অনেক কষ্টে; রাখি' ধীরে তীরলগ্ন ঘাসে
বাহুপাশে বাঁধি তার গ্রীবাখানি বসি' তার পাশে,
করটি বুলায়ে ধীরে চোখে মুখে—স্নেহ-সুকোমল,
একান্ত আগ্রহভরে, বারেক তাহার গণ্ডস্থল
চুম্বিলা নিবিড় স্নেহে—মাতা যেন কাতর সন্তানে!
পরিপূর্ণ মমতার শেষে তারে রাখি' সেইখানে
সরোবর অতিক্রমি' পুনরায় সন্তরণ দিয়া
এপারে যখন ধীরে উপজিল, দেখিনু চাহিয়া—
পরিপাণ্ডু মুখচ্ছবি, বক্ষ কাঁপে, নয়ন অলস,
শ্রান্ত দেহ অবনত, বাহুমূল শিথিল অবশ!
ফিরিলা গৃহের পথে মন্থর চরণ দুটি ফেলি',
স্নেহস্নিগ্ধ সুধারসে সুস্মিত নয়ন দুটি মেলি'।

সহসা বিটপীশাখে ঊর্দ্ধে মোর পল্লবেতে ঢাকা—
অজানা বিহঙ্গ এক অন্ধকারে ঝাপটিল পাখা!

একদণ্ড পূর্ব্বে যারে ভাবিয়াছি কলঙ্কের ডালি
পঙ্কিল পরশ ভাবি' মনে মনে পাড়িয়াছি গালি,
সেই নারী-কলঙ্কিনী নিমেষে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি'
দৃষ্টির সম্মুখে মোর সৃষ্টিরে সুন্দরতর করি'
উদ্ভাসি' উঠিল চক্ষে রমণীর বিপুল গৌরবে।
পূর্ণশশী উঠে যবে—কলঙ্ক কে দেখে তার কবে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সমালোচনা

—মণিমঞ্জীর। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ প্রণীত। প্রকাশক, আশুতোষ লাইব্রেরী, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ঢাকা, আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি ছোট গল্পের বই; সর্ব্বসমেত দশটি ছোট গল্প ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি মৌলিক ও বাকী অনুবাদ। অনুদিত গল্পগুলি সরস, এবং সেগুলির ভাষা পরিষ্কার, স্বচ্ছ; কোথাও একটু আড়ষ্ট ভাব নাই; রচনার গুণে সেগুলিকে অনুবাদ বলিয়াও মনে হয় না। মণিমঞ্জীর গল্পটি আকারে বড় এবং সেইটির নাম লইয়াই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। এ গল্পটিতে ভারতের অতীত যুগের প্রণয়-লীলার একটি মনোজ্ঞ ছবি সুন্দর ফুটিয়াছে। "মহামুস্কিল" নিতান্তই ব্যর্থ রচনা—রচনা বহুকালের—তবে এ রচনাটির মায়া লেখকের একেবারেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য ছিল। "গর্দ্দভের গান" গল্পটিও বিশেষত্বহীন; এ গল্পটির হাস্যরস এবং করুণতা কিছুই তেমন সহজ-সুন্দর হয় নাই। গ্রন্থে মুদ্রাকরের প্রমাদের মাত্রা একটু বেশীই লক্ষ্য করিলাম। ছাপা কাগজ বাঁধাই চমৎকার হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ।

মানসগামী রাজহংস।

ভারতী

৪২শ বর্ষ]　　　শ্রাবণ, ১৩২৫　　　[৪র্থ সংখ্যা

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুন্‌তে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল করে চল্‌ছিল সাবধানী।
আমি ছিলাম ছাতে
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে'
দেখ্‌তে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেচে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, "কি হয়েছে বামি?"
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি!"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশ-পানে চেয়ে
আমার বামীর মতই যেন অম্‌নি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চল্‌চে ধীরে ধীরে।
নিব্‌ত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি'
আকাশ ভরে' উঠ্‌ত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খেলাঘর*

নাটিকা

পাত্র-পাত্রী

হেমন্ত
নীরদা
রণেন্দ্র
কামাখ্যাচরণ
হেমন্তের তিনটি পুত্র-কন্যা
আমি
বলাই
দাসী

প্রথম অঙ্ক

হেমন্তের সুপ্রশস্ত, সুসজ্জিত কক্ষ; কাল—প্রভাত।

নীরদা ও আমি

নীরদা। এই জিনিষগুলি আর এই ফুলের টুকরিটি আমি, সাবধানে লুকিয়ে রেখে দাও ত। ছেলেরা যেন টের না পায়! সমস্তদিন আজ আমি একটুও ফুরসৎ পাব না দেখ্‌চি। খাওয়া-দাওয়ার উদ্যুগ তুমিই কর গে। আমি ততক্ষণ এ-দিক্‌কার কাজ যতটা পারি এগিয়ে রাখি। এই খেলনা আর পুতুলগুলো বাইরেই বরং নিয়ে যাও। ছেলেরা বেড়িয়ে ফিরে এলে তাদের হাতে দিও। এ-সব পেলে তারা সমস্ত দিন মেতে থাকবে, এদিকে বড় আর ঘেঁসবেও না; তা হলে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে পারব। দেখ, সামনের ঐ টেবিলটার উপর লতা পাতা আর ফুল দিয়ে একটা গাছ তৈরি করতে হবে,- আর ঐ জায়গাটা ভাল

* হেনরিক্ ইবসেন রচিত "Doll's House" নাটক-অবলম্বনে

করে সাজাতে হবে। লুকিয়ে এ-সব করতে হবে, কিন্তু। উনি কি আর-কেউ যদি হঠাৎ এদিকে এসে পড়েন, তাহলে তাড়াতাড়ি ওই পরদাটা টেনে দিতে হবে। কাউকে এখন দেখানো হবে না। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালা হলে ব্যাপার দেখে সকলের তাক্ লেগে যাবে। হাঃ হাঃ, কি মজাই হবে তখন!

হেমন্ত। (পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে) আজ ভোর থেকেই যে ভারী ব্যস্ত দেখ্‌চি। ব্যাপারখানা কি?

নীরদা। কেমন চমৎকার চমৎকার সব জিনিষ আনিয়েচি, দেখবে এস না!

হেমন্ত। তোমার চমৎকার জিনিষ দেখবার এখন আমার সময় হচ্ছে না যে!

নীরদা। বেশ! যাও, দেখতে হবে না!

হেমন্ত। আহা, না, না, দেখাও, আমি আসচি।

(ক্ষণেক পরে পাশের দরজা খুলিয়া নীরদার নিকটে আসিয়া দাড়াইলেন)

কি এ-সব! কিনে আনিয়েছ বুঝি? এ-সব ত দেখ্‌চি ছেলেদের জামা-কাপড়। একরাশ খেলনাও দেখচি যে। হঠাৎ আজ এ রকম খেয়াল মাথায় ঢুকলো যে! নাঃ, তুমি দেখ্‌চি নেহাৎ ছেলেমানুষ। এত বাজে খরচও করতে পার!

নীরদা। ছেলেমানুষ নই গো, আর বাজে খরচও কিছু করছি না যে বকবে! আজ তোমার জন্মদিন্ কি না, সেই জন্যেই এ সব আনিয়েছি। আজ সন্ধ্যাবেলা দু'চার জনকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে হবে।

হেমন্ত। ওঃ বুঝলুম এতক্ষণে। তা এত বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। একটু বুঝে-সুঝে খরচ করা উচিত নয় কি? অত পেরে উঠবো কেন?

নীরদা। তোমার কেবলই ঐ ভাবনা! যখনই একটু খরচ করতে যাই, তখনই তুমি —না, আজ আমি কোন কথা শুনছি না। দেখ ভগবান আজ মুখ তুলে চেয়েছেন, ব্যাঙ্কের সেই বড় চাকরিটি ত তুমি দু'এক দিনেই পাবে, তবে তোমার আর ভয় কিসের? এখন থেকে আমরা বেশ সচ্ছলভাবেই খরচ করতে পারব।

হেমন্ত। চাকরিই না হয় পেয়েচি। কিন্তু একমাস কাজ না করলে ত আর বেশী টাকা হাতে আসচে না। দু'দিন কি করে চলে?

নীরদা। এই কটা দিন বইত নয়! ধার-ধোর করে চালিয়ে নেব।

হেমন্ত। এইটিই ত তোমার ছেলেমানুসি। ধার যে করবে বলচ, কি ভরসায় ধার করবে? ধর, আজ তুমি দু'শ টাকা ধার করে সব তোমার স্বামীর জন্মোৎসবে খরচ করে বসলে, আর কাল যদি তোমার স্বামীর মাথায় ছাদ ভেঙ্গে পড়ে, তখন—?

নীরদা। আহা, কি যে অলক্ষুণে কথা বল তার ঠিক নেই! থাক্, থাক্, বাবু তোমাকে আর অত বকতে হবে না, তুমি নিজের কাজ করগে।

হেমন্ত। আচ্ছা, ধর যদি তাই-ই হয়, তা হলে তুমি কি কর?

নীরদা। যাও, যাও, তোমার সঙ্গে আমি বাজে বকতে পারি না।

হেমন্ত। যদিই ভেঙ্গে পড়ে, বল না, তখন কি হবে?

নীরদা। তখন টাকা ধার থাকুক বা না থাকুক, আমার ভারী বয়ে যাবে কি না!

হেমন্ত। তোমার না হয় বয়ে যাবে না, কিন্তু যারা ধার দেবে তারা ত ছাড়বে না!

নীরদা। করুকগে তাদের যা ইচ্ছে, আমার কি! যাও তুমি! (চোখে কাপড় ঢাকিল)

হেমন্ত। ছেলেমানুসি আর কাকে বলে? আমি ঠাট্টা করলুম, আর তোমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। যাক্ এ-সব কথা। দেখ নীরো, তবে শোনো, আমার মনের কথা ত তুমি জান! আমি চাই—একটি পয়সাও ধার করব না—ঋণগ্রস্ত কখনো হব না। যে সংসারে একবার ঋণের অশান্তি ঢুকেছে, সেখানে কি কখনো সুখ থাকতে পারে? এদ্দিন যখন আমরা কষ্টেস্‌ষ্টে সোজা পথ ধরে চলে এসেচি, তখন বাকী কটা দিনের জন্য ঋণগ্রস্ত হয়ে কেন আর অস্বস্তির বোঝা ঘাড়ে চাপাই? সত্যি তুমি ক্ষুন্ন হয়ো না—কথাটা বুঝে দেখ।

নীরদা। না, এতে ক্ষুন্ন হবার কি আছে? তবে তুমি বড় চাকরি পেয়েচ, তার উপর আজ তোমার জন্মদিন, তাই আমি একটু আমোদ করতে চাচ্ছি! আমার আজকের ইচ্ছাগুলি তুমি অপূর্ণ রেখো না, লক্ষ্মীটি! আজ আমায় সাধ মিটিয়ে উৎসব করতে দাও।

হেমন্ত। আচ্ছা বেশ, তাই হোক্ তবে। আমি এখন কাজ করিগে। ও আবার কি! মুখ ভার করে রইলে তবু? চোখের পাতা ভিজে রইলো যে! নাঃ, তুমি দেখচি নেহাৎ ছেলে মানুষ। আচ্ছা, কত টাকা হলে তোমার এই আজকের খরচ চলে, বল, দশ—পনেরো—বিশ—পঞ্চাশ? তুমি কি ভাব আমি একটা আন্দাজ করতে পারি না? আচ্ছা, এই নাও পঞ্চাশ টাকা। কেমন, এতে হবে ত?

নীরদা। (টাকাগুলি নাড়াচাড়া করিয়া—সস্মিত মুখে) ঢের হবে। এথেকে বরং দিন কতক সংসার-খরচও চলবে।

হেমন্ত। নিশ্চয়?

নীরদা। জিনিষপত্তর কেনাতে যে বেশী খরচ করি আমি, তা তুমি বলতে পারো না। কেমন সস্তায় এ-সব কাপড়-জামা ছেলেদের জন্য আনিয়েচি! খেলনাগুলিও দেখ! বড় খোকার জন্য এই বন্দুকটা। ছোট খোকার জন্য এই ঘোড়া আর ড্রাম্। খুকীর জন্য এই পুতুল আর ঝুমঝুমি। আর বেশী দিয়ে কি হবে? হাতে পড়ামাত্রই ত ভেঙ্গে ফেলবে। বুড়ী আন্নির জন্য এই কাপড়খানা আনিয়েচি। বেচারীকে এর চেয়ে একটু ভাল জিনিষ দিলে হত ভাল, কিন্তু পাব কোথায় সে খরচ?

হেমন্ত। আর ঢাকা রয়েছে, ওগুলো কি?

নীরদা। না, না, ও-সবে হাত দিয়ো না। সন্ধ্যের আগে ও-সব খোলা হচ্ছে না।

হেমন্ত। বেশ কথা। এ-সব যেন হল। এখন বল দেখি, নিজের জন্য তুমি কি চাও?

নীরদা। কি চাই আবার! কিছু না —আমার ত কিছুরই দরকার নেই।

হেমন্ত। তোমার দরকার না থাকতে পারে, আমি কিন্তু কিছু দিতে চাই যে। বল, কি নেবে?

নীরদা। (কাপড়ের খুঁট আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে) যদি দিতে চাও, ত একটি জিনিষ দাও। তুমি আমায় শুধু— শুধু তুমি—

হেমন্ত। আহা, বলেই ফেল না—

নীরদা। আমায় শুধু কিছু টাকা দাও। যা পার। তার পর এরই ভিতর একদিন আমি নিজের পছন্দমত কিছু কিনিয়ে আনাব।

হেমন্ত। ওহো, বুঝেচি। এখনও বুঝি কিছু কিনতে বাকী আছে, তাই টাকার দরকার? না, না, নগদ টাকা দেব না তোমায়। টাকা হাতে পেলে এখনই ছাই-ভস্ম কতকগুলো কি কিনিয়ে আনাবে, কিম্বা সংসারে লাগিয়ে দেবে। তার পর আবার আমায় দো-কর দিতে হবে।

নীরদা। না গো না, ও-টাকা আমি তোমার সামনেই বাক্সে তুলে রেখে দেব না হয়। কি এত বাজে খরচ আমি করি? তুমি জাননা, তাই অমন বল। যতদূর পারি আমি বাঁচাতেই চেষ্টা করি।

হেমন্ত। (হাসিয়া) বাঁচাতে চেষ্টা কর, তা জানি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটী সিকি-পয়সাও বাঁচাতে পেরেছ কি?

নীরদা। দেখ, তুমি কিছু বোঝ না, তাই অমন কথা বল। গেরস্থালীর ধারণাই যার তোমার নেই।

হেমন্ত। গেরস্থালীর ধারণা না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার খরচ-পত্রের ধারণা অনেকটাই আমার আছে। তোমারই বা দোষ কি, বল? ছেলেবেলায় যেমন শিখে এসেচ, তেমনি ত করবে। শ্বশুরমশায় ছিলেন একজন মস্ত খরচে লোক; তাঁরই মেয়ে তুমি! রক্তের সম্পর্ক যাবে কোথায়!

নীরদা। আহা, বাবা আমার স্বর্গে গেছেন। তাঁর ধনদৌলত না হোক্, তাঁর গুণগুলিও যদি পেতুম!

হেমন্ত। তাঁর কোন-কিছুই তোমার পেয়ে কাজ নেই। যেমন আছ, তেমনিটিই থাক তুমি। আমার ঘরের লক্ষ্মী—নয়নের আলো—হৃদয়ের সুখ! তুমি আমার এমনিই থাক, তাহলেই আমার সব থাকবে। আচ্ছা, আজ তোমায় একটু বিমর্ষ দেখচি কেন?

নীরদা। রোজই ত তুমি তাই দেখ!

হেমন্ত। সত্যি! ভারী তোমায় শুক্‌নো দেখ্‌চি আজ। আচ্ছা, তাকাও দেখি আমার দিকে।

নীরদা। ওই করি আর কি! নাও, সকালে উঠেই এলেন আমার সঙ্গে রঙ্গ করতে। যাও, যাও! আমার আর কাজ নেই না কি? ও আন্নি, ও বুড়ি—কোথায় গেলি আবার? আয় না এদিকে। চটপট্ সব গুছিয়ে ফেলি। বেলা হয়ে পড়্‌লো যে!

হেমন্ত। আচ্ছা, আমি তবে বাইরে চল্লুম। বলাইয়ের হাতে টাকা পাঠিয়ে দিচ্চি।

নীরদা। ঠাকুরপোকে ওবেলা এখানে খাবার কথা বলে দিও। আর যাকে-যাকে বলবার বলে এসো।

হেমন্ত। হ্যাঁ, রণেনকে আবার আলাদা

করে কি বলবে? সে ত রোজই আসে, বলা যাবে তখন। আজ সন্ধ্যেটা বেশ আমোদেই কাটাব তা হলে, এ্যাঁ? আজ হল তোমার স্বামীর জন্মোৎসব! কি বল?

নীরদা। তুমি ঠাট্টা করছ, কিন্তু আজ আমার যে কি আনন্দ, তা আর তোমায় কি বলব!

হেমন্ত। ঠাট্টা করব কেন? তোমার আনন্দে আমিও আনন্দ বোধ করচি। তোমার চোখে মুখে যে কি নির্ব্বাক আনন্দ উথলে উঠেছে তা কি আমি বুঝতে পাচ্চি না?

(ভৃত্য বলাই প্রবেশ করিল)

বলাই। একটি স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

হেমন্ত। আমি চল্লুম।

বলাই। ডাক্তারবাবু এসে বসে আছেন। অনেকক্ষণ তিনি এসেছেন।

(প্রস্থান)

হেমন্ত। রণেন এসেছে? তা বলতে হয় এতক্ষণ!

(বাহির হইয়া গেলেন)

(সঙ্কুচিতভাবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে, লীলাবতী প্রবেশ করিলেন)

লীলাবতী। কেমন আছ নীরদা?

নীরদা। (সন্দিগ্ধ ভাবে) আপনি ভাল আছেন?

লীলাবতী। তুমি এখনো আমায় ভাল চিনতে পারনি বোধ হয়?

নীরদা। হাঁ, না—কৈ ভাল মনে পড়চে না ত!—বোধ হয়—বোধ হয়—ওহো, হয়েচে, হয়েচে। তুমি আমাদের সেই লীলাবতী—লীলা দিদি?

লীলাবতী। হাঁ, আমি সেই লীলাবতী।

(নীরদা সানন্দে লীলাবতীকে জড়াইয়া ধরিলেন; তারপর উভয়ে সোফায় উপবেশন করিলেন)

নীরদা। আমি ত ভাই চিনতেই পারিনি তোমায়! কি রকম যে বদলে গেচ তুমি!

লীলাবতী। হাঁ বোন, ন-দশ বছর ত কম কথা নয়! অনেক ঝড় মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। তারই চিহ্ন এখন শরীরে পড়ে আছে।

নীরদা। ওঃ, আজ কদ্দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল দিদি! তোমাদের আশীর্ব্বাদে ভাই, আমি বেশ সুখেই ঘরকন্না কচ্চি। তুমি কিন্তু, দিদি, বড্ড কাহিল হয়ে গেছ।

লীলাবতী। আর বুড়োও হয়েছি।

নীরদা। নাঃ, বুড়ো তেমন কি! তবে শোকে-তাপে—(হঠাৎ থামিয়া বিষণ্ণভাবে) মাপ কর দিদি। আমি স্বার্থপরের মত নিজের সুখের কথাই বলে যাচ্চি। তোমার কথা—

লীলাবতী। কেন, কি হয়েচে তাতে?

নীরদা। তোমার পোড়া অদৃষ্টের কথা আমি শুনেছি।

লীলাবতী। হাঁ বোন্, তিন বছর হল, আমি বিধবা।

নীরদা। সবই অদৃষ্ট! যখন এ-কথা শুনলুম, কতবার তখন মনে হল, তোমায় চিঠি লিখি। কিন্তু দিদি, সংসারের নানান্ ঝঞ্ঝাটে চিঠি লিখেও তোমার খোঁজ নিতে পারিনি। তুমি কি মনে করেচ, না জানি!

লীলাবতী। না বোন্, আমি তোমায় ভাল রকমই চিনি।

নীরদা। আহা, কি কষ্ট তোমার দিদি! স্বামী নেই, পুত্র নেই, কেউ নেই। সঙ্গতিও কিছু রেখে যাননি বোধ হয়?

লীলাবতী। কিছু না, বোন।

নীরদা। ছেলে-পিলেও কিছু হয়নি?

লীলাবতী। না।

নীরদা। তা হলে ত কোন চিহ্নই নেই!

লীলাবতী। না, এতটুকুও চিহ্ন নেই। স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা সেও এক মস্ত সুখ। তাও আমার অদৃষ্টে নেই। যাক সে কথা। তোমায় আজ দেখতে পেয়ে বড় সুখী হলুম। তোমার ছেলে মেয়ে কটি? কোথায় তারা?

নীরদা। দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। তারা সব বেড়াতে গেছে, এল বলে। তুমি নিজের কথা চাপা দিচ্চ কেন দিদি? তুমি এখন কি করচ, কোথায় এসে রয়েচ? সব আমায় বল, শুনি!

লীলাবতী। এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রয়েচি, তার গলগ্রহ হয়ে। আমার কথা আর কি শুনবে? তোমার ঘরকন্নার কথা কও যে শুনে সুখী হই। তোমার স্বামী কি করেন?

নীরদা। এই ক' বছর ধরে ত কোর্টে বেরুলেন, কিন্তু সুবিধে কিছুই হল না। তা ভগবান এবার মুখ তুলে চেয়েচেন, ব্যাঙ্কে আটশ' টাকার একটা চাকরি তিনি পেয়েচেন। এই ক'টা দিন গেলে বাঁচি। তা হলে পয়সার মুখ দেখতে পাব। পয়সার কষ্ট আর সইতে পারি না। দশটা নয়, পাঁচটা নয়,—তিনটি ছেলে, তাদেরও মনের মত কোন জিনিষ দিতে-থুতে পারি না!

লীলাবতী। (ঈষৎ হাসিয়া) নীরদা, দেখচি তুমি ইস্কুলের সেই নীরদাই আছ। তেমনি ছেলেমানুষ, তেমনি সাদাসিধে, তেমনি সব। পয়সার অভাব মোটেই সহ্য করতে পার না!

নীরদা। (হাসিতে হাসিতে) ইনিও আমায় ঠিক ঐ কথাই বলেন বটে। কিন্তু যাই বল তোমরা, নীরদা এখন আর বোকা নয়। এখন কি আর বাজে খরচ করবার আমাদের অবস্থা? দুজনেই আমরা হাড়হদ্দ খেটে অস্থির।

লীলাবতী। তোমাকেও খুব খাটতে হয়, বুঝি?

নীরদা। টানাটানির সংসারে না খাটলে চলবে কেন, ভাই? (নিম্নস্বরে) ওঃ, কি বিপদই যে আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে!

লীলাবতী। বিপদ?

নীরদা। হাঁ, ওকালতিতে প্রথম প্রথম যখন ওঁর একেবারেই কিছু হ'ত না; তখন উনি রাত্রি জেগে খবরের কাগজের জন্য লিখতেন কি না! একে হাড়হদ্দ খাটুনি, তার উপর রাত্রি জাগা, সইবে কেন? ভয়ানক ব্যারামে পড়লেন। ডাক্তার বল্লে, হাওয়া বদলাতে।

লীলাবতী। সে আমি শুনেচি। ওয়াল্‌টেয়ারে না কোথায় তোমরা এক বচ্ছর ছিলে না?

নীরদা। ওয়ালটেয়ারে। সে কি দিদি সহজ ব্যাপার? তখন সবে আমার বড় খোকাটি হয়েচে আর কি। সুন্দর জায়গা কিন্তু ওয়াল্‌টেয়ার। আর ধন্যি সেখানকার

জল-হাওয়া। অত যে অসুখ, সেখানে পা দেওয়া মাত্রই কমে গেল। কিন্তু দিদি, বিস্তর টাকা খরচ হয়ে গেছে।

লীলাবতী। তা ত হবেই।

নীরদা। একশ' আধশ' হলে ত কথা ছিল না। একেবারে হাজার টাকা! ব্যাপারখানা বুঝে দেখ!

লীলাবতী। ভাগ্যে সেই বিপদের সময় অত টাকা জুটেছিল, তাই রক্ষে!

নীরদা। তা আর বলতে দিদি! বাবাই সব টাকা দিয়েছিলেন।

লীলাবতী। সত্যি! তাহলে ত ভালই হয়েছিল। তিনি ঠিক সেই সময়েই মারা যান না?

নীরদা। হ্যাঁ। বল দেখি, কি রকম মুস্কিলে তখন পড়েছিলুম। মেজ খোকা পেটে—আমার নিজেরই ওঠবার সামর্থ্য নেই; তার উপর উনি ব্যারামে পড়লেন—ওদিকে বাবা মৃত্যুশয্যায়—তেমন বিপদে আমি আর কখনো পড়িনি।

লীলাবতী। স্বামীগতপ্রাণ তোমার, তা ত জানি বোন।

নীরদা। টাকাটা হাতে এসে পড়ল, আর ওদিকে ডাক্তারও খোঁচাতে লাগলেন, কাজেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু বাবার সঙ্গে শেষ-দেখা আর হল না।

লীলাবতী। তোমার স্বামী নীরোগ হয়ে ফিরে এসেচেন ত?

নীরদা। হাঁ।

লীলাবতী। তবে আবার তোমার বাড়ীতে ডাক্তার কি জন্য?

নীরদা। কোন্ ডাক্তার?

লীলাবতী। এই না তোমাদের চাকর বলছিল যে ডাক্তার বাবু এসে বসে রয়েছেন।

নীরদা। ওঃ, উনি হলেন আমাদের আপনার লোক। সম্পর্কে ওঁর ভাই হন, রোজ এমনি বেড়াতে আসেন। তোমাদের আশীর্ব্বাদে দিদি, এখন আর আমাদের কারো অসুখ-বিসুখ নেই। কিন্তু আমি ত নিজের কথাই বলে যাচ্চি। কি স্বার্থপর আমি। আচ্ছা, কিছু না মনে করত একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীতে তেমন সদ্ভাব ছিল না শুনেচি। কেন?

লীলাবতী। মা তখন বেঁচে। তুমি জানতে না, বোধ হয় যে, বাবা মারা যাবার পর আমরা জেনানা মিশনে আশ্রয় নিয়েছিলুম, সেখানে আমায় হাড়ভাঙ্গা মেহন্নৎ করতে হত। মা আগে থেকেই কঠিন রোগে ভুগছিলেন, ক্রমে ব্যামো আরো বেড়ে গেল—আর এদিকে ভাই-দুটিরও দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। এই রকম কষ্টে পড়ে পাঁচজনের কথা অত না ভেবে-চিন্তে' মা আমার বিয়ে দিয়ে ফেল্লেন, মনে কল্লেন, আমার একটা হিল্লে হবে আর ভাই দুটিরও সাহায্য হবে।

নীরদা। সে ত ভালই হয়েছিল। শুনেছি তোমার স্বামী বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন।

লীলাবতী। তিনি কারবার করতেন। যখন বেঁচে ছিলেন, সংসার তখন ভালই চলত। কিন্তু মারা গেলে দেখা গেল, বিস্তর দেনা। যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও সে দেনা শোধ হল না। আমায় পথে বসতে হল।

নীরদা। তারপর?

লীলাবতী। তারপর আর কি! আবার আমি জেনানা মিশনে চাকরি নিলুম। কিন্তু সেখানে বেশী দিন পোষাল না। মিশনের চাকরি ছাড়ব-ছাড়ব কচ্চি এমন সময় একটি ভদ্রলোক আমাকে তাঁর দুটি মেয়ের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত কল্লেন। এই রকম পাঁচ জায়গায় ঘুরে ভাইদুটিকে কোন রকমে মানুষ করেচি। বড়টি ত্রিশ টাকার এক চাকরি পেয়েচে। ছোটটি পড়চে। ভাই দুটিই এখন আমার ভরসা। মা কিন্তু আর বেঁচে নেই।

নীরদা। তুমি তাহলে এখন নিশ্চিন্ত?

লীলাবতী। হাঁ, অনেকটা বৈ কি! কিন্তু বড়ই যেন হাল্‌কা ঠেক্‌চে। সংসারে কোন বন্ধন নেই—কোনরকম দায়িত্বই নেই, তাই বোধ হয় একজায়গায় বেশী দিন থাকতে পারি না। এদিকে এসে পড়লুম, সুবিধা-মত একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায়—যদি তাতে মন বসে।

নীরদা। দেখ দিদি, তোমার শরীরটা কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে গেছে। দিনকতক কোথাও গিয়ে নয় হাওয়া বদলে এস।

লীলাবতী। আমার কি বাপ আছে নীরদা, যে তিনি তার খরচ জোগাবেন?

নীরদা। রাগ কল্লে দিদি?

লীলাবতী। রাগ নয়, বোন্, দুঃখ কচ্চি। যে রকম দুরবস্থায় আমি পড়েচি তা আমিই জানি। কাউকে এখন আর খাওয়াতে পরাতে হয় না বটে, কিন্তু নিজের পোড়া পেটটা ত আছে! যৎসামান্য হলেই চলে, কিন্তু তাই-বা জোটে কই? অভাব আমায় এম্‌নি স্বার্থপর করে তুলেচে, যে বল্লে হয়ত বিশ্বাস করবে না, যখন তুমি বল্লে যে তোমার স্বামীর বড় চাকরি হয়েচে, তখন সেই কথা শুনে তোমাদের উন্নতির জন্য যত না আনন্দ হয়েছে, আমার নিজের লাভের আশায় তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ হচ্ছে।

নীরদা। ভাল বুঝলুম না ভাই তোমার কথা। তোমার কি ধারণা ইনি তোমার কোন উপকার করতে পারেন?

লীলাবতী। হাঁ, কি জানি কেন, আমার সেই ধারণাই হয়েচে।

নীরদা। ওঁর যদি সামর্থ্য থাকে, অবশ্য করবেন বই কি। নিশ্চয় করবেন। তোমার কথা ওঁকে আমি বলব। যেমন করে পারি, তোমায় সাহায্য করব।

লীলাবতী। (গদ্গদ স্বরে) ছেলেবেলার সেই ভাব এখনো যে তোমার বজায় আছে, তুমি এখন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের কর্ত্রী হয়েও যে আমার মত অনাথার সঙ্গে আলাপ করচ—আমার দুঃখে দুঃখিত হচ্চ, এ-যে আমার কি সৌভাগ্য—কি আনন্দের, তা আর বলতে পারিনে। নীরদা, তুমি সংসার ঠিক চিনেচ কি? এত সরল তুমি যে, সংসারের কিছুই বোধ হয় এখনও জান না?

নীরদা। আমি? কিছুই আমি জানি না,—বল কি দিদি?

লীলাবতী। (ঈষৎ হাস্যে) হাঁ, নীরদা। তোমার ত এই ছোটখাট সংসার! তার আবার ঝঞ্ঝাট কি? তুমি ত এখনো ছেলে-মানুষ বোন্।

নীরদা। (সহাস্যে) তুমিই বা আর গিন্নী কিসে, দিদি?

লীলাবতী হাসিলেন।

নীরদা। আর পাঁচজনে যা বলে, তুমিও তাই বলচ। সবাই বলে, শক্ত কাজ একটুও আমার দ্বারা হয় না।

লীলাবতী। তবেই বোঝ।

নীরদা। আর সংসারের কোন কষ্ট আমাকে কখনো ভোগ করতে হয় নি।

লীলাবতী। না। দুঃখ-কষ্ট সকলকে একটু না একটু পেতেই হয়। এই মাত্র ত তুমি তোমার কষ্টের কথা আমায় বলেচ!

নীরদা। হায় দিদি! ও সব কষ্ট ত কষ্টই নয়। (নিম্নস্বরে) আসল কথাই তোমায় বলি নি।

লীলাবতী। আসল কথা! সে আবার কি?

নীরদা। তুমি আমায় কেবল ছেলে-মানুষ বলেই ঠাউরে রেখেচ। কিন্তু সে তোমার ভুল, দিদি।

লীলাবতী। তবে নিজের কথা বলি ভাই, মা যে আমার শেষ বয়সে কষ্ট পান নি, ভাবনা-চিন্তার হাত থেকে তাঁকে রেহাই দেবার উপায় ভগবান যে আমার হাতে জুটিয়ে দিয়েছিলেন, তা মনে হলে আমার খুবই আনন্দ হয়।

নীরদা। তোমার ভাইদুটিকে যে তুমি মানুষ করতে পেরেচ, সে জন্যে তোমার গর্ব্বও হয় ত?

লীলাবতী। তা একটু হয় বই কি।

নীরদা। আমার ত হয়। তবে শোন দিদি, তোমায় সব কথা বলি। আমিও এমন কাজ করেচি, যার জন্যে আমার ভারী আনন্দ হয়—আর গর্ব্বও হয়!

লীলাবতী। তুমি কি বলচ, আমি ঠিক বুঝতে পাচ্চি না।

নীরদা। চুপ। আস্তে কথা কও। উনি যেন শুনতে না পান। উনি—শুধু উনি কেন, জগতের কেউ যেন না টের পায়—

লীলাবতী। কি এমন কথা?

নীরদা। সরে এস দিদি, আস্তে কথা কও। চল, ওই কোণটাতে যাই। দেখ, আমার স্বামীর প্রাণ আমিই রক্ষা করেছিলুম।

লীলাবতী। তুমি করেছিলে? কি রকমে?

নীরদা। আগেই ত বলেচি, ওয়ালটেয়ারে ওঁকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে গেছলুম। সেখানে না গেলে কি উনি বাঁচতেন?

লীলাবতী। তা ত বুঝলুম। কিন্তু তোমার বাবাই না সব খরচ দিয়েছিলেন?

নীরদা। ইনি তাই বুঝেছিলেন, বটে। অপরেও তাই জানে।

লীলাবতী। আসল কথা তবে কি?

নীরদা। বাবা একটি পয়সাও দেন নি। আমি নিজেই টাকার জোগাড় করেছিলুম।

লীলাবতী। তুমি করেছিলে? সব টাকার?

নীরদা। হাঁ দিদি, এক হাজারের সব টাকাই আমি জোগাড় করেছিলুম।

লীলাবতী। অবাক্ করলে বোন। অত টাকা কোথায় পেলে তুমি?

নীরদা। হুঁ-হুঁ (গুন্‌গুন্ স্বরে—সস্মিত মুখে) আঁচ কর না?

লীলাবতী। ধার অবিশ্যি করতেই পার না।

নীরদা। (চমকিয়া) কেন? ধার করতে পারি না কেন?

লীলাবতী। স্বামীর অমতে কি করে ধার করবে? তাও কি হতে পারে?

নীরদা। (মাথা দোলাইয়া) পারে গো,—যদি স্ত্রীর কাজের বুদ্ধি থাকে, স্ত্রী যদি একটু চালাক চতুর হয়, তাহলে—

লীলাবতী। কি বলচ তুমি, নীরদা? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নীরদা। বুঝে আর তোমার কাজ নেই। আমি ত এখনও বলিনি যে আমি ধার করেচি। অন্য উপায়ে পেয়ে থাকতে পারি। (অবসন্নভাবে মেঝেতে শুইয়া পড়িলেন) রূপের ফাঁদ পেতে জোগাড় করেছি।

লীলাবতী। তুমি পাগল।

নীরদা। কেমন, ইচ্ছে হচ্ছে না জানবার?

লীলাবতী। শোন নীরদা, যদি তাই করে থাক, তাহলে কাজটি ভালো হয় নি।

নীরদা। (উঠিয়া বসিলেন) কেন? ভালো নয় কিসে? স্বামীর প্রাণ রক্ষা করা?

লীলাবতী। তাঁর অমতে—তাঁকে না জানিয়ে—?

নীরদা। কিন্তু তাঁকে না জানতে দেওয়াই যে দরকার ছিল, দিদি। কি রকম সাংঘাতিক ব্যামোয় তিনি পড়েছিলেন, সেইটে তাঁর জানতে না পারাই দরকার হয়েছিল যে! ডাক্তার আমায় আড়ালে ডেকে বল্লেন, হাওয়া-বদলানোই হল এ রোগের একমাত্র ওষুধ। কিছুদিন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে না থাকলে কিছুতেই রোগ সারবে না। আমি তাঁকে রাজী করিয়েছিলুম কি করে, জান? তাঁকে বুঝিয়ে ছিলুম যে আমার নিজেরই বেড়াবার ইচ্ছে। বল্লুম যে ওয়াল্‌টেয়ার ভারি চমৎকার জায়গা,—আমার বড্ড ভাল লাগে সেখানে থাকতে। চোখের জল ফেলতেও, বাকী রাখিনি। তবু কি তিনি শোনেন? কিন্তু আমিও নাছোড়-বান্দা। বললুম, আমার শরীরের এখন যা অবস্থা, তাতে এ সময় অন্তত আমার আবদার তাঁর রাখা উচিত। না হয় কিছু ধারই হবে। ধারের নাম করতেই তিনি চটে উঠলেন, বল্লেন, স্বামীর কর্ত্তব্য তিনি ভাল রকম বোঝেন—আমার খেয়ালের প্রশ্রয় তিনি কিছুতেই দেবেন না। তাছাড়া আমি বোকা, আহাম্মক, আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এই রকম কত কথাই আমায় শুনিয়ে দিলেন। আমিও সঙ্কল্প করেছিলুম—তুমি যত বাধাই দাও না, তোমাকে রক্ষা আমি করবই। তোমার প্রাণ বড়, না, পয়সা বড়? তার পর দিদি, বুঝলে—বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আমি ঐ উপায়ই ঠিক করেছিলুম।

লীলাবতী। তোমার বাবা যে টাকা দেন নি, সে কথা কি তিনি তারপর কখনো ওঁকে বলেন নি?

নীরদা। না। তিনি ঠিক সেই সময়েই মারা গেলেন কি না! আমার মতলব ছিল বাবাকে এ কথা জানিয়ে রাখবার—যাতে তিনি কথাটা গোপন রাখেন। কিন্তু তাঁর তখন বড্ড অসুখ—সেই অসুখই

শেষ কাল হল। আর তাঁকে ও কথা জানানোই হল না।

লীলাবতী। তোমার স্বামীকে তাহলে এ কথা মোটেই বল নি?

নীরদা। সর্ব্বনাশ! তাহলে কি আর রক্ষে থাকত দিদি? ওঁরই অসুখের দরুণ এত টাকা খরচ করেছি শুনলে উনি কি আর আমার মুখ দর্শন কর্ত্তেন? তাহলে আজ আমাদের এই যে সুখের সংসার দেখ্‌চ, এ কোন্‌দিন ভেঙ্গে যেত।

লীলাবতী। তাহলে তোমার মতলব, কস্মিনকালেও তাঁকে এ কথা জানাবে না?

নীরদা। (অন্যমনস্কভাবে) তা—হয়ত—কোন দিন না কোন দিন—ধর, অনেক বছর পরে—এই যখন বুড়-সুড় হব, বুঝলে কি না?—তুমি হাস্‌চ যে! এই, মনে কর না, যখন আমার এত বেশী বয়স হবে যে উনি আর আমায় নিয়ে মজে থাকবেন না। যাও দিদি, তুমি ভারী দুষ্টু। কি যে মাথামুণ্ডু বকাচ্চ, তার ঠিক নেই। সে দিন কিন্তু আসবে না। কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না। আচ্ছা দিদি, তোমার এখন কি মনে হয়? তবু কি আমায় বোকা বলবে? এই ধার নিয়ে যে আমি কি নাকাল হচ্চি, তা আমিই জানি। এই টানাটানির সংসারে এত টাকা শোধ দেওয়া কি মুখের কথা? তিনমাস অন্তর টাকা দিতে হচ্চে—ভাবো দিকিন্‌ ব্যাপারটা একবার।

লীলাবতী। তাইত! ভারী মুস্কিলেই ত পড়েচ তুমি!

নীরদা। সে কথা আর বল্‌তে! হাজার-দুহাজার রোজগার নেই যে তা থেকে কোন রকমে বার করে নেব। বেশ বুঝেসুঝেই চলতে হয়। তার ওপর ওঁর আবার পাই-পয়সার হিসেব থাকে। তবু তারই ভিতর থেকে নানা অছিলায় কিছু কিছু আদায় করে নি। একবার উনি একমাসের জন্য মফঃস্বলে গেছলেন। সেই সময়টা দিন-রাত খেটে অনেক ভাল ভাল উলের কাজ তৈরী করি। সেগুলো বিক্রী করে দু'তিন দফার টাকা শোধ করে দি। এই রকম কত ফিকির যে খাটাতে হয় দিদি, দেনা শোধ করবার জন্য!

লীলাবতী। কত শোধ করেচ?

নীরদা। তা ঠিক জানি না। তবে এই জানি যে একটি পয়সাও যখনি বাঁচাতে পেরেচি, তখনি সেটি দেনায় দিয়েচি। সময়-সময় দিদি, আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। ভেবে যখন কুল-কিনারা পাই না, তখন চুপ করে বসে আকাশ-কুসুম ভাবি। যেন আমি ওয়াল্‌-টেয়ারে সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্চি, বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে একটা পাথরের উপর বসে পড়লুম, সন্ধ্যা হয়-হয়,—এমন সময় পাথরটা হঠাৎ নড়ে উঠল। আমি চম্‌কে লাফিয়ে পড়লুম। লাফিয়েই দেখি একটা মস্ত গর্ত্ত, আর গর্ত্তের ভিতর এক ঘড়া মোহর।

লীলাবতী। হা আমার কপাল!

নীরদা। কিন্তু আমার আকাশ-কুসুম সত্যি সত্যি ফলে গেল। মোহরের ঘড়া না হোক্‌ টাকার ঘড়া ত দেখব। ওঁর চাকরি বজায় থাকলে, এক বছরের মধ্যে

সব টাকা হেসে খেলে শোধ দিতে পারব। (বাহিরের দিকে চাহিলেন) ও কে ওখানে উঁকি মারচে? (ভৃত্যকে ডাকিলেন) দেখ্‌ত বলাই, ওখানে কে?

লীলাবতী। আমি এখন আসি তবে।

নীরদা। না, না, তুমি বস। এখানে কেউ আসবে না।

(ভৃত্য প্রবেশ করিল)

ও কে, বলাই?

বলাই। খাতাঞ্জি বাবু।

নীরদা। খাতাঞ্জি বাবু আবার কে?

বলাই। সেই যে—ব্যাঙ্কে কাজ করেন।

(দরজার পার্শ্ব হইতে আওয়াজ আসিল) আমি কামাখ্যাচরণ। (কামাখ্যাচরণ প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লীলাবতী ত্রস্তভাবে এককোণে সরিয়া গেলেন)

নীরদা। (অগ্রসর হইয়া কম্পিতস্বরে) কি, তুমি হঠাৎ যে? এমন অসময়ে কি মনে করে?

কামাখ্যা। খাবার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি, সুতরাং অসময়ে নয়, সময়েই এসেচি। তবে কোন কষ্ট দেব না। এখন একবার বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করেই চলে যাব।

নীরদা। তা হলে তাঁর কাছে না গিয়ে এখানে হাজির হবার প্রয়োজন?

কামাখ্যা। রাগ করবেন না। যে কাজে এসেচি, তাতে আপনারও হাত আছে। তাই প্রথমেই আপনাকে একবার দেখা দিয়ে গেলুম। আমি চল্লুম তবে তাঁর কাছে। ফেরবার সময় সব বলে যাব।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

লীলাবতী। ও কে ভাই?

নীরদা। সম্পর্কে ভগ্নীপতি হয়। আমার মামাত বোন কিরণের সঙ্গে ওর বে হয়েছিল। বাবাই উদ্‌যুগ করে বে দিয়েছিলেন— তারা বড্ড গরিব ছিল কি না!

লীলাবতী। ও তা হলে সেই লোক!

নীরদা। তুমি ওকে চেন?

লীলাবতী। খুব চিনি। ও আমাদের ওখানে মোক্তারি করত।

নীরদা। হাঁ, মোক্তারিই বরাবর করত। তারপর কি সব কাণ্ড করে এখন ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়েচে। সেই ব্যাঙ্কেই উনি কাজ পেয়েছেন।

লীলাবতী। লোকটা কিন্তু ভয়ঙ্কর বদলে গেছে।

নীরদা। ছাই বদলেছে! ভগ্নীপতি বলে পরিচয় দিতে মাথা কাটা যায় আমার।

লীলাবতী। স্ত্রীটি মারা গেচে না?

নীরদা। হ্যাঁ, মরেচে না বেঁচেছে! বেচারী অনেকগুলি ছেলেপিলে রেখে গেছে কিন্তু।

লীলাবতী। শুনেচি লোকটা অনেক রকমের কাজ কারবার করে।

নীরদা। কি কারবার যে ও না করে!

* * * *

[রণেন্দ্র হেমন্তর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতে আসিতে]

রণেন্দ্র। (হেমন্তকে লক্ষ্য করিয়া) না দাদা, তোমার কাছে বসে মিথ্যে বেলা বাড়াব না।—এখন একবার বৌদির সঙ্গে দেখা করে বাড়ী যাব।

(নীরদার কক্ষে যেমন প্রবেশ করিতে

যাইবেন, অমনি লীলাবতীকে দেখিয়া হঠিয়া আসিলেন)

রণেন্দ্র। মাপ্ করবেন, আপনারা আছেন তা আমি জানতুম না।

নীরদা। না, না, এস তুমি। ইনি আমার লীলাদিদি। ছেলেবেলায় একসঙ্গে আমরা পড়েছিলুম।

রণেন্দ্র। (লীলাবতীর প্রতি) নমস্কার। আপনার নাম আমি অনেকবার শুনেচি। আমি যখন এখানে আসি, ফটকের কাছে আপনিই দাঁড়িয়ে ছিলেন না?

লীলাবতী। হ্যাঁ, আমিও আপনাকে আগে দেখেছি।

রণেন্দ্র। আপনাকে ভয়ঙ্কর দুর্ব্বল দেখ্‌ছি। চিকিৎসা করাতে এখানে এসেচেন বুঝি?

লীলাবতী। না, তা নয়। আমাকে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয় কি না, তাই শরীরটা এমন হয়েচে।

রণেন্দ্র। ও—, আপনি তা হলে বেড়াতে এসেচেন—দিন কতক বিশ্রাম করতে?

লীলাবতী। না, আমি এসেচি, কাজের সন্ধানে।

রণেন্দ্র। কেন? সেটা বুঝি হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ওষুধ?

লীলাবতী। বেঁচে থাকতে হবে ত, ডাক্তার বাবু।

রণেন্দ্র। হাঁ, বেঁচে থাকাটা নিশ্চয় দরকার। কারণ, দুনিয়ায় সকলেই তা চায়।

নীরদা। নিজেই তা' হলে স্বীকার কচ্চ ত ঠাকুরপো?

রণেন্দ্র। তা কচ্চি বই কি। যত দুর্গতিই হোক না, প্রাণটা দেহ ছেড়ে চলে যাক্, এ আর কে চায় বল? আমি অন্তত হাজারটা রোগী এ পর্য্যন্ত দেখেছি, দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও এমন কাউকে দেখিনি, যে মরতে চেয়েচে। যারা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত—একেবারে যারা পাপের চরম সীমায় পৌঁছে সয়তানের দাস হয়ে পড়েচে, তারাও ত কই একটিবারও মরতে চায় না! ভয়ঙ্কর মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত একটা লোককে এখনই আমি দেখে এলুম, লোকটা ওই ঘরে বসে কথা কইছে—

নীরদা। কার কথা বলচ, ঠাকুরপো?

রণেন্দ্র। ঐ কামিখ্যের কথা। চেন ত তাকে? কি ঘৃণিত জীবন লোকটার! কিন্তু তা সত্ত্বেও উঁচু গলায় ও বলতে ছাড়চে না যে ওর বাঁচা চাইই।

নীরদা। কি বল্‌চে?

রণেন্দ্র। ভাল শুনিনি। লোকটাকে দেখেই আমি বেরিয়ে এলুম। কি ব্যাঙ্কের কথা কইচে।

নীরদা। কামিখ্যের সঙ্গে আবার ব্যাঙ্কের কি কথা?

রণেন্দ্র। একটা চাকরি চায় আর কি।

নীরদা। (হাসিয়া উঠিলেন)

রণেন্দ্র। হাসলে যে বড়!

নীরদা। আচ্ছা, বলত ঠাকুরপো, ব্যাঙ্কে যে সব লোক চাকরি করে, সকলেই কি এঁর নীচে?

রণেন্দ্র। এই কথা?

নীরদা। হাঁ, এত লোক আমার স্বামীর অধীনে কাজ করে—অতখানি ওঁর কর্ত্তৃত্ব? ঐ যে উনি আসচেন।

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন)

রণেন্দ্র। পাজিটার হাত থেকে ছাড়ান পেয়েচেন ?

হেমন্ত। হ্যাঁ, এইমাত্র উঠে গেল।

নীরদা। (হেমন্তের প্রতি) ইনি আমার বন্ধু লীলাবতী—

হেমন্ত। ভারী খুসী হলুম।

নীরদা। ছেলেবেলায় যখন একসঙ্গে পড়তুম, আমরা দুটিতে একপ্রাণ ছিলুম।

হেমন্ত। ও—(উৎসুক নেত্রে চাহিলেন)

নীরদা। কেবল তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ইনি এতদূর কষ্ট করে এসেচেন।

হেমন্ত। আমার সঙ্গে ?

লীলাবতী। না, না, তা নয়—তবে—

নীরদা। এঁর দুটি ছোট ভাই আছে, বড়টি বেশ লেখা-পড়া জানে।

হেমন্ত। বেশ !

নীরদা। তা জানলে কি হবে ? মুরুব্বি ত কেউ নেই। সে এখন ত্রিশটি টাকা মাত্র মাহিনা পায়। তুমি কেন তাকে ব্যাঙ্কে একটি ভাল চাকরি দাও না ?

হেমন্ত। আচ্ছা দেখবো, হতেও পারে হয়ত। ঠিক ! আপনি বেশ সময়ে এসেচেন।

লীলাবতী। এর জন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম।

হেমন্ত। না, না, ওসব কথা বলবেন না। (নীরদার প্রতি) আমি এখন একবার বেরুব।

রণেন্দ্র। আমিও চলি।

নীরদা। বেশী দেরী করো না যেন।

হেমন্ত। না, দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরব।

লীলাবতী। আমিও তবে এখন আসি।

নীরদা। তুমি কোথায় যাবে দিদি ? আজ এখানেই থাক না ?

লীলাবতী। আমার কি অসাধ ? তবে তাঁদের বলে আসা হয় নি কি না ! কাল আবার আসব'খন।

নীরদা। কাল নয়। ওবেলা তা হলে এস। নিশ্চয়, নিশ্চয়। সন্ধ্যের আগে এখানে এসে পৌঁছুনো চাই। আজ এঁর জন্মদিন —একটু আমোদ-আহ্লাদ করব ভাবছি।

(বাহিরে ছেলেদের চীৎকার শুনা গেল)

ওই যে ছেলেরা এসেচে। ওদের দেখে যাও দিদি। (দরজার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া) আয় না রে তোরা, এদিকে।

(ছেলেরা উল্লাসে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল এবং নীরদাকে জড়াইয়া ধরিল। নীরদা তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিলেন)

হেমন্ত। চল হে ডাক্তার, আর এখানে থাকা নয়। ছেলের মা ছাড়া এখানে আর কারো এখন টেঁকে থাকা শক্ত হবে।

হেমন্ত ও রণেন্দ্র বাহির হইয়া গেলেন।

(লীলাবতী ছেলেগুলিকে সস্নেহে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করিতে লাগিলেন)

নীরদা। (গদ্‌গদ ভাবে) বাছারা যেন আমার সোনার পুতুল ! নয় দিদি ?

লীলাবতী। আহা বেঁচে থাকুক্। তবে এখন আসি ভাই।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

(ছেলেদিগকে লইয়া নীরদা ফরাসের উপর বসিলেন। ছেলেরা কেহ তাঁহার মাথায় কেহ পিঠে চড়িয়া মহা উৎপাত লাগাইয়া দিল এবং সকলে একসঙ্গে মিলিয়া নিজের নিজের কথা বলিতে লাগিল। তিনিও তাহাদের কথার জবাব দিতে লাগিলেন)

নীরদা। তুমি গাড়ী টানছিলে?—আঁ্যা, মেজ খোকা আর টুনি দুজনে বসেছিল— আর একা তুমি তাদের টেনে নিয়ে গেছলে? —বাঃ, খুব বাহাদুর ত! আয়ি, দাও একবার টুনিকে আমার কোলে—আমার ক্ষুদুরাণীকে একবার আদর করি। (ছোট ছেলেটিকে লইয়া নাচাইতে লাগিলেন, আর দেখাদেখি অন্য ছেলেদুটিও নাচিতে লাগিল) তোমরা খুব ছুটোছুটি কচ্চিলে?—হাঃ হাঃ- ভারী মজাই হয়েছিল তাহলে।—আমিও একদিন তোমাদের সঙ্গে যাব—আর সকলে মিলে মাঠে ছুটোছুটি করব। আয়ি, তুমি নিজের কাজে যাও—আমি এদের কাপড়-জামা তুলে রাখব'খন।

(ছেলেদের গা হইতে কাপড় জামা খুলিয়া লইয়া মেঝেতেই ফেলিয়া রাখিলেন একপা ছড়াইয়া বসিয়া পুনরায় তাহাদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলেন)

আঁ্যা সত্যি? একটা কুকুর তোমাদের পেছনে পেছনে দৌড়েছিল—কামড়ায় নি ত? নাঃ, টুকটুকে ছেলেদের কি কুকুরে কামড়ায়?—না, না, ওদিকে যেওনা—খবরদার!—কি ওগুলো?—ভারী খুসী হবে, কিন্তু দেখলে—না, না, ও ভারী বিশ্রী জিনিষ। যেওনা ওদিকে। এস আমরা খানিকক্ষণ খেলা করি—আচ্ছা, কি খেলা যায়, বল দেখি?—লুকোচুরি? তাই ভাল। মেজখোকা আগে লুকুবে কিন্তু—আমি আগে লুকুব?—আচ্ছা, তাই ভাল—আমিই আগে লুকুই।

(ইহাদের হাস্যধ্বনিতে ঘরখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। নীরদা চুপিচুপি বড় টেবিলের নীচে গিয়া লুকাইলেন; ছেলেরা চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে নীরদার চাপা হাসির আওয়াজে টেবিলের কাপড় তুলিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিল—এবং সকলে হাসিয়া উঠিল। নীরদা হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইলেন এবং ভাঁরী গলায় কৃত্রিম আওয়াজে ছেলেদের ভয় দেখাইলেন, অমনি আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। এমন সময় দরজায় কে ঘা দিল, কিন্তু কেহ তাহা টের পাইল না। দরজা একটু ফাঁক হইল এবং কামাখ্যাচরণ প্রবেশ করিল। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুনরায় খেলা চলিতে লাগিল)

কামাখ্যা। (গলার সাড়া দিলেন)

নীরদা। (ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিলেন) কে? (তিনি যেমন হাঁটুতে ভর দিয়াছিলেন, তেমনই ভাবে কামাখ্যার দিকে চাহিলেন) কি চাও তুমি?

কামাখ্যা। মাপ করবেন। দরজাটা খোলাই ছিল। বিশেষ জরুরি কথা বলেই—

নীরদা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু ওঁরা এখন বাহিরে গেছেন—

কামাখ্যা। তা আমি জানি।

নীরদা। তবে এখানে তোমায় কি দরকার এখন?

কামাখ্যা। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

নীরদা। আমার সঙ্গে কথা! (ছেলেদের প্রতি) আয়ির কাছে তোমরা যাও'ত বাবা।

একটু পরে আবার আমরা খেলা করব।

(ছেলেরা চলিয়া গেল)

আমার সঙ্গে কথা ?

কামাখ্যা। হাঁ, আপনার সঙ্গেই !

নীরদা। আজই কথা ?—আজ ত পয়লা তারিখ নয়।

কামাখ্যা। না, এখনো তার এক হপ্তা দেরী আছে। আর এক হপ্তা পরেই আপনাদের অবস্থা ফিরবে, কিন্তু তখনকার সে দিনগুলি সুখে কি দুঃখে কাটানো, সে আপনারই হাতে।

নীরদা। কি চাও তুমি ?—আজ একেবারেই পারব না—তোমাকে কিন্তু—

কামাখ্যা। না, সে কথা আমি বলচি না—এ একেবারে পৃথক ব্যাপার—ফুরসৎ হবে ত আপনার—মন দিয়ে শুনবেন ?

নীরদা। (ব্যস্ত হইয়া) হাঁ, হাঁ, শীগগির বল—যদিও আজ আমার—

কামাখ্যা। বেশ। এখান থেকে বেরিয়েই আমি মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম। দেখলুম হেমন্ত বাবু আর ডাক্তার চলে গেলেন। সে স্ত্রীলোকটিকেও যেতে দেখ্‌লুম।

নীরদা। কোন্ স্ত্রীলোকটি ?

কামাখ্যা। এই একটু আগেই এখানে যিনি বসেছিলেন।

নীরদা। ও—

কামাখ্যা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, সেই স্ত্রীলোকটির নাম কি লীলাবতী ?

নীরদা। হাঁ—লীলাবতীই। এইমাত্র তিনি এখান থেকে গেলেন।

কামাখ্যা। সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু ? কেমন, না ?

নীরদা। হাঁ, বিশেষ অন্তরঙ্গ—কিন্তু এ সব কথা—

কামাখ্যা। এক সময় আমার সঙ্গেও ওঁর পরিচয় ছিল।

নীরদা। আমি তা শুনেছি।

কামাখ্যা। ওঃ, জানেন তবে সব ? তা হলে অন্ধকারে ঢিল না মেরে এখন আসল কথাটাই পেড়ে ফেলি। লীলাবতীর ভাই কি ব্যাঙ্কে একটা চাকরি পেয়েছে ?

নীরদা। তোমার তাতে প্রয়োজন ? তুমি আমার আত্মীয়, স্বীকার করি, কিন্তু ভুলে যাচ্চ কেন, যে তুমি আমার স্বামীর একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী মাত্র। বেশ, জিজ্ঞাসাই যখন কল্লে, তখন বলি। হাঁ, লীলাবতীর ভাই ব্যাঙ্কে চাকুরি পাবে—সে একরকম পাকা।

কামাখ্যা। আমি তবে যা ভেবেচি, তাই ঠিক।

নীরদা। (টেবিলের উপরস্থ ফুলদানিটি অনাবশ্যকভাবে নাড়াচাড়া করিতে করিতে) সব দিন সমান যায় না। কোন-না কোন রকমের ক্ষমতা মানুষের হাতে কোন দিন না কোন দিন আসেই। স্ত্রীলোক বলে বুঝি তার—? দেখ, উপরওয়ালার অধীনে যাকে কাজ করতে হয়, তার সে রকম লোককে চটানো সুবুদ্ধির কাজ নয়, যার—

কামাখ্যা। যার হাতে ক্ষমতা আছে ?

নীরদা। হ্যাঁ।

কামাখ্যা। (সুর বদলাইয়া) সে ত ভালই। আমারও তা হলে আশা আছে

আপনি আপনার ক্ষমতা আমার কাজে একটু লাগাবেন।

নীরদা। তার মানে?

কামাখ্যা। যাতে আমার চাকরিটা বজায় থাকে আপনি সে চেষ্টা করবেন, এই আর কি!

নীরদা। তোমার কথা বুঝলুম না। কে তোমার চাকরি কেড়ে নিচ্ছে?

কামাখ্যা। ছলনা করে আর লাভ কি? আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুটি আমার অন্ন কেড়ে নিজের পেট ভরাবার চেষ্টা করচেন। এ বুঝতে আমার বাকী নেই।

নীরদা। কিন্তু এসব কথার কিছুই আমি জানি না।

কামাখ্যা। তা না জানতে পারেন। এখন তবে কাজের কথা বলি, শুনুন। আপনার উচিত এ সময় আমাকে সাহায্য করা—যতদূর আপনার ক্ষমতা, এতে বাধা দিন, যাতে আমার চাকরিটি না যায়।

নীরদা। কিন্তু আমার এতটুকুও ক্ষমতা নেই তাতে বাধা দেবার।

কামাখ্যা। সে কি? এইমাত্র না আপনি বলছিলেন—

নীরদা। সে কথার যে ও-রকম মানে করবে, তা ভাবিনি। আচ্ছা, কি দেখে তোমার ধারণা হল যে আমার স্বামীর উপর ও-ধরণের ক্ষমতা আমার আছে?

কামাখ্যা। আপনার স্বামীকে আমি খুব ভালরকমই জানি। সচরাচর স্বামী-মশায়রা যে রকম হয়ে থাকেন তিনি যে তা থেকে পৃথক, আমার ত তা মনে হয় না।

নীরদা। দেখ, আমার স্বামীর সম্বন্ধে যদি ও-রকম তাচ্ছিল্যভাবে কথা কও, তাহলে বাড়ী থেকে তোমায় বার করে দেব।

কামাখ্যা। আপনার সাহস আছে, বলতে হবে।

নীরদা। তোমাকে আর আমি ভয় করি না। আর মাস কতকের মধ্যেই আমি সব দায় থেকে নিষ্কৃতি পাব।

কামাখ্যা। (নিজেকে সংযত করিয়া) শুনুন তবে আসল কথা। চাকরিটি আমি সহজে ছাড়চি নে। দরকার হলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করব, এটি বজায় রাখতে।

নীরদা। তাই দেখচি।

কামাখ্যা। শুধু টাকার জন্য নয়। টাকার পরোয়া আমি করি না—অমন চাকরি ঢের মিলবে। আসল কারণ আপনি হয়ত জানেন না। অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমি একটা বে-আইনি কাজ করে ফেলেছিলুম।

নীরদা। আমি তার কিছু কিছু শুনেচি।

কামাখ্যা। ব্যাপারটা আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়নি বটে, কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে আমার উন্নতির সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই আমি যে ব্যবসায়ে হাত দিয়েচি তা আপনারও কিছু কিছু জানা আছে। এতে অনেক রকমের ফন্দি-ফিকির খাটাতে হয়। যথার্থ বলতে গেলে অধর্ম্ম যে করি না, তা নয়। কিন্তু যা করবার করেচি, আর না। ছেলেপিলেগুলিও বড় হয়ে উঠলো, অন্ততঃ তাদের মুখ চেয়েও এবার এমন কাজ নিয়ে আমায় থাকতে হবে,

যাতে মান-ইজ্জত বজায় থাকে। ব্যাঙ্কের এই চাকরিটি আমি আমার উন্নতির প্রথম সোপানের মত পেয়েছি, কিন্তু আপনার স্বামী আজ আমায় সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে আবার নীচে ফেলে দিতে চান!

নীরদা। আমি কি করব, বল? এতে আমার কোন হাত নেই। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর—তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবার কোন ক্ষমতাই আমার নেই।

কামাখ্যা। ক্ষমতা নেই, না, ইচ্ছে নেই? কিন্তু জানেন আপনি, জোর করে আপনাকে দিয়ে কাজ করাবার উপায় আমার হাতে আছে!

নীরদা। (উদ্বিগ্নভাবে) তুমি নিশ্চয়ই এঁকে সে কথা বলবে না যে আমি তোমার কাছে টাকা ধার নিয়েছিলুম?

কামাখ্যা। ধরুন, যদি তাই বলি?

নীরদা। (ক্রুদ্ধ হইয়া) ভয়ানক অন্যায় হবে তাহলে! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমার সেই গোপন কথা যদি উনি জানতে পারেন—যেটি আমার আনন্দের জিনিষ, গর্ব্বের জিনিষ,—তাও আবার এই বিশ্রী রকমে—এই রকম লোকের কাছ থেকে—! ওঃ—কি ভয়ঙ্কর অশান্তি হবে তাহলে।

কামাখ্যা। শুধুই অশান্তি?

নীরদা। (গর্জ্জিয়া উঠিলেন) তাই বল তাহলে। এতে তোমারই যতদূর মন্দ হবার, তা হবে। উনি ত জানতেই পারবেন তোমার ভিতরটা কত নোংরা, তাছাড়া চাকরিও তুমি কোনমতে রাখতে পারবে না।

কামাখ্যা। আমি জিজ্ঞাসা করছিলুম যে, আপনি ভয় পেয়েচেন কি শুধু এই ভেবে যে আপনার গৃহটি অশান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে?

নীরদা। আমার স্বামী যদি ধারের কথা জানতে পারেন, তাহলে তখনি তোমার বাকী টাকা সব ফেলে দেবেন। তার পর তোমার সঙ্গে আর আমার কিসের সম্পর্ক?

কামাখ্যা। (সম্মুখে একপা অগ্রসর হইয়া) শুনুন তবে আপনি আমার কথা, হয় আপনার স্মরণ-শক্তি খুব অল্প, আর না হয় আপনি দেনা-পাওনার বিষয় কিছুই বোঝেন না। আরও গুটিকতক কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিই তবে!

নীরদা। কি কথা?

কামাখ্যা। আপনার স্বামী যখন পীড়িত, তখন আপনি আমার কাছে এসেছিলেন হাজার টাকা ধার নিতে—কেমন?

নীরদা। আর কাউকে জানতুম না, তাই।

কামাখ্যা। আমি টাকার জোগাড় করে দিতে রাজী হই—কেমন?

নীরদা। হ্যাঁ দিয়েও ছিলে।

কামাখ্যা। একটি সর্ত্তে আমি দিতে রাজী হয়েছিলুম। কিন্তু স্বামীর ব্যারামের দরুণ আপনি তখন এতই উতলা যে সর্ত্তের কথা ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা আপনার মোটেই ছিল না। তাই এখন একবার সে কথা মনে পাড়িয়ে দিচ্ছি! আমি একখানা কাগজ লিখে এনেছিলুম, স্মরণ হয়?

নীরদা। হাঁ, তাতে আমি দস্তখত করি।

কামাখ্যা। বেশ—কিন্তু আপনার দস্তখতের নীচে আরও দু'এক ছত্র কি লেখা ছিল, মনে আছে?—যাতে আপনার বাবা সেই টাকার জন্য জামিন হচ্চিলেন—যেখানটায় আপনার বাবারই দস্তখত করা উচিত ছিল—কেমন?

নীরদা। (চমকিত হইয়া) উচিত ছিল? কেন, দস্তখত ত তিনি করেছিলেন!

কামাখ্যা। তারিখের জায়গাটা আমি খালি রেখেছিলুম, অর্থাৎ আপনার বাবাই তারিখটা বসাতেন দস্তখতের পর—কেমন, মনে পড়চে কি?

নীরদা। পড়চে।

কামাখ্যা। তারপর সেই কাগজখানা আমি আপনাকে দিলুম, আপনার বাবার কাছে ডাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য—কেমন, তাই কি না?

নীরদা। হাঁ।

কামাখ্যা। আপনি অবশ্য তখনি তাই করেছিলেন—কেননা, পাঁচ দিন কিংবা ছ' দিন পরে কাগজখানা নিয়ে আমার কাছে গেলেন,—তাতে আপনার বাবার দস্তখত। আর তার পর আমি আপনাকে টাকা দিলুম। এই ত?

নীরদা। তোমায় কি আমি নিয়ম-মত টাকা শোধ দিয়ে আসচি না?

কামাখ্যা। তা দিয়ে আসচেন—নিশ্চয়ই। সে সময়টা আপনার পক্ষে ভারী কষ্টের সময় ছিল,—কি বলেন?

নীরদা। তা আর বলতে!

কামাখ্যা। আপনার বাবার তখন ভয়ঙ্কর ব্যামো—না?

নীরদা। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়।

কামাখ্যা। তারপর শীগ্‌গিরই তিনি মারা গেলেন—কি বলেন?

নীরদা। হাঁ।

কামাখ্যা। আচ্ছা, বলুন দেখি—আপনার কি মনে পড়ে কোন্ দিন তিনি মারা যান?—অর্থাৎ মাসের কোন্ তারিখে?

নীরদা। পঁচিশে ভাদ্র।

কামাখ্যা। বেশ কথা। আমিও জানি ঠিক ঐ তারিখে, আর এই জন্যই ত একটা ভুল দেখতে পাচ্চি—(জামার পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিলেন) সেটার কোন কূল-কিনারা আমি ঠাওরাতে পাচ্চি নে।

নীরদা। ভুল আবার কিসের? আমি জানি না—

কামাখ্যা। ভুলটা এই যে আপনার বাবা মারা যাবার তিন দিন পরে এই কাগজখানা তিনি দস্তখত করেছিলেন।

নীরদা। এঁ্যা?

কামাখ্যা। ২৫শে ভাদ্র আপনার বাবা মারা যান ত, কিন্তু এখানে দেখুন, তিনি তারিখ বসিয়ে দস্তখত করেচেন—আটাশে ভাদ্র। ভুলটা এইখানেই—কেমন, এটা ভুল ত? (নীরদা নীরব) কি করে এটা হল, বুঝিয়ে দিতে পারেন?—(নীরদা তথাপি নীরব) আরও বেশী আশ্চর্য্য এই যে '২৮ ভাদ্র' এই কথাগুলি আপনার বাবার হাতের অক্ষরে লেখা নয়। যাঁর হস্তাক্ষরে লেখা, তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু যাক্,

এ ব্যাপারটার সহজেই মীমাংসা হতে পারে। হয়ত আপনার বাবা তারিখ বসাতে ভুলে গেছলেন, তারপর আর-কেউ তাড়াতাড়িতে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পাবার আগেই তারিখটা বসিয়ে দিয়েছিল। যাক্, তাতে কিছু এসে যায় না। আসল জিনিষ হল এই নাম, তার উপরই সব নির্ভর কচ্চে। আপনার বাবাই নিজের হাতে নাম দস্তখত করেছিলেন, কেমন না?

নীরদা (কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—তারপর মাথা উঁচু করিয়া অবজ্ঞাভরে কামাখ্যার দিকে চাহিলেন) না—তা নয়, আমিই বাবার নাম লিখে দিয়েছিলুম।

কামাখ্যা। এটা আপনি স্বীকার করেন, তা হলে! কিন্তু এ কাজটা কত বিশ্রী, কত খানি বিপদ হতে পারে এতে, তা আপনি জানেন কি?

নীরদা। বিপদ আবার কি? তোমার টাকা ত তুমি শীগ্‌গিরই পাবে।

কামাখ্যা। একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি, কাগজখান' আপনার বাবার কাছে আপনি পাঠান্ নি কেন?

নীরদা। অসম্ভব বলেই পাঠাইনি। তাঁর তখন ভয়ানক ব্যামো, তিনি শয্যাশায়ী। তাঁর দস্তখত চাইলেই তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, অত টাকা আমি কি করব। নিজেই যখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, তখন কি করেই বা তাঁকে বলতুম, আমার স্বামী পীড়িত, তুমি জামিন হয়ে আমায় টাকা পাঠিয়ে দাও, আমি তাঁকে হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাই? না, টাকার কথা তখন আমি কিছুতেই বলতে পারতুম না।

কামাখ্যা। সে যাত্রা ওয়াল্‌টেয়ারে না গেলেই ভাল করতেন।

নীরদা। তাও অসম্ভব ছিল! না গেলে এঁকে হারাতে হত! অথচ টাকাও হাতে ছিল না!

কামাখ্যা। কিন্তু, একবারও কি আপনার মনে হল না, যে আপনি কত বড় প্রতারণা করছেন? একটা জাল—?

নীরদা। অত কথা আমার মনেও হয় নি তখন। একটার পর একটা ফ্যাসাদ্ বার করে তখন এমনি জ্বালাতন করছিলে তুমি, যে আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল, অথচ টাকা না নিলেও উপায় ছিল না।

কামাখ্যা। কি ভয়ঙ্কর কাজ করে বসেচেন আপনি, তা বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছেন না! তবে এই পর্য্যন্ত আপনাকে বলতে পারি, আমার সেই একটিমাত্র ভুল, যার জন্য আমি আমার মান-মর্য্যাদা সব খুইয়েচি, সেটি আপনার এই কাজের চেয়ে এতটুকুও বেশী গুরুতর ছিল না।

নীরদা। কি বলচ তুমি? তুমিও এমনি বিপদে পড়েছিলে?

কামাখ্যা। আইন কেবল দোষেরই বিচার করে—সে ত আর উদ্দেশ্য দেখে না!

নীরদা। তা হলে সে আইন অতি বদ!

কামাখ্যা। বদ হোক্ আর ভালই হোক্, এখন যদি এই কাগজখানি আমি আদালতে দাখিল করি, তা হলে সেই আইনেই আপনার বিচার হবে।

নীরদা। কখনো না। এ আমি বিশ্বাস করি না। মেয়ে তা হলে বাপের মুখ চাইবে

না, স্ত্রী তা হলে তার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করবে না! এ আইন আবার আইন? যাই হোক্, আইন-কানুনের আমি অত ধার ধারি না। আমার বিশ্বাস, তেমন আইন আছেই, যাতে ও-রকম কাজ কখনই দোষের হয় না। তুমি না মোক্তারি করতে! দেখ্‌চি, তুমি আইন-কানুনের কিছুই জান না।

কামাখ্যা। তা না জানতে পারি; কিন্তু দেনা-পাওনার কথা, যা নিয়ে আপনাতে-আমাতে লেখা-পড়া হয়েছিল—সে সবও কি বুঝি না, মনে করেন? আচ্ছা, যা বোঝেন, করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, চাকরিটি যদি আমার যায়, এবার যদি আমার মান-সম্ভ্রম নষ্ট হয়, তা হলে আপনারও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা দায় হবে। মনে রাখবেন এই কথা।

[বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন]

নীরদা। (নিস্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তারপর ঘাড় নাড়িলেন) ভারী বিশ্রী! কেবল আমায় ভয় দেখানোর মতলব! আমি এত বোকা নই! কিন্তু—(ছেলেদের জামা-কাপড় প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন) কিন্তু, তা হলেও—না, না, তা কি কখনো হতে পারে? প্রাণের টানেই ত এ কাজ করেছিলুম আমি—

ছেলেরা। (দরজার নিকট আসিয়া) মা—

নীরদা। এসো বাবা।

ছেলে। ও কে মা?

নীরদা। চুপ, ওর কথা কাউকে বলোনা যেন, বাবা, বুঝলে? বাবুকে পর্য্যন্ত না।

ছেলেরা। না মা, কাউকে বলব না। এখন এস না মা, আমরা খেলা করি।

নীরদা। না, বাবা, এখন আর না।

ছেলেরা। বা রে! তুমি যে তখন বল্লে, উনি চলে গেলেই আবার খেলা করবে!

নীরদা। বলেছিলুম। কিন্তু এখন আর পারচি নে। তোমরা উঠানে ছুটো-ছুটি করগে—আমার হাতে এখন অনেক কাজ। যাও, আমার মাণিকধনরা! আমি ততক্ষণ কাজ সেরে নি। (ছেলেরা চলিয়া গেলে নীরদা অবসন্নভাবে ফরাসের উপরই বসিয়া পড়িলেন। একটু পরে উঠিয়া একটা সেলাইয়ের কাজে মন দিলেন) নাঃ, এখন থাক্। (কাজ ফেলিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দাসীকে ডাকিলেন) ও ঝি, একবার এস ত এদিকে।—না না—অসম্ভব, তাও কি হয়!

(দাসী প্রবেশ করিল)

দাসী। আমায় ডাকচ?

নীরদা। হাঁ,—দেখ ঝি, না, না, তুমি এখন যাও, আমি এবার ফুল নিয়ে বসি।

(দাসী চলিয়া গেল)

নীরদা। (টুকরি খুলিয়া ফুল বাহির করিলেন) এই যে ফুল আর পাতা, এ দিয়ে একটা আস্ত গাছ তৈরী করতে হবে—না, গাছ তৈরী করে আর কাজ নেই—শুধু গোটা কতক বড় বড় তোড়া বেঁধে ফেলি—ঐ টেবিলটার উপর রেখে চারিদিকে বাতি জ্বেলে দিলে কি চমৎকার হবে! ওঃ—কামিখ্যেটা কি পাজী, কি বদমায়েস!—হ্যাঁ, ভারী ত কথা! অন্যায়ই বা কি করেচি আমি? কিছু না। মিছে কি সব ছাইপাঁশ

ভাবছি, দূর হোক্ গে!···শুধু তোড়াতে কিন্তু জমকালো হবে না, একটা গাছও তৈরী করে ফেলি। উনি যাতে আজ প্রফুল্ল থাকেন, তাই করতে হবে। যদি গান গাইতে বলেন, আজ আর আপত্তি না করে ভাল ভাল গান শুনিয়ে দেব—ভারী খুসি হবেন!

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হস্তে এক বাণ্ডিল কাগজ)

নীরদা। এই যে তুমি এরই মধ্যে এসেছ!

হেমন্ত। হাঁ, কেউ এসেছিল?

নীরদা। এখানে? কই, না!

হেমন্ত। আশ্চর্য্য! কামিথ্যেকে যেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখ্‌লুম না?

নীরদা। দেখ্‌লে? ও হ্যাঁ! আমি ভুলে গেছলুম—কামিথ্যে এক বার এসেছিল বটে!

হেমন্ত। আমি বুঝতে পেরেচি, নীরো, লোকটা তোমায় সুপারিস্ ধরতে এসেছিল।

নীরদা। হাঁ।

হেমন্ত। আর তুমিও তার জন্যে সুপারিস্ করতে অঙ্গীকার করেছ, বোধ হয়?

নীরদা। হাঁ।

হেমন্ত। কিন্তু—এ রকম ব্যাপারে তোমার থাকা উচিত নয়। কামিথ্যের মত লোকের সঙ্গে কথা কওয়া—তার সাহায্য করতে অঙ্গীকার করা ঠিক নয় নীরদা! এ কথা আবার লুকোচ্ছিলে তুমি, মিথ্যা বলে? ছিঃ!

নীরদা। মিথ্যা বলে?

হেমন্ত। হাঁ। তুমি না বল্লে যে কেউ এখানে আসে নি? (গলার সুর বদলাইয়া নীরদার নিকটবর্ত্তী হইয়া) আমার নীরো, আমার আদরের বুল্‌বুল্, কেবল সত্যি কথাই বলবে—মিথ্যে কথা কখনো মুখ দি'য়ে যেন না বেরোয়!

(নীরদাকে আলিঙ্গন করিলেন)

কেমন! ঠিক ত? বল। (আলিঙ্গন-মুক্ত করিলেন) আচ্ছা, থাক্। এ-সব কথা আর নয়।

(সোফার উপর বসিলেন)

বাঃ, ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা ত! ভারী আরাম! (কাগজ দেখিতে লাগিলেন)

নীরদা। (এক পাশে বসিয়া তোড়া বাঁধিতে লাগিলেন) দেখ—

হেমন্ত। কি, বল।

নীরদা। কতক্ষণে সন্ধ্যে হবে, আমি শুধু তাই ভাবছি।

হেমন্ত। তখন তুমি কি মজাটা দেখাও, আমিও তার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

নীরদা। নাঃ, মজা-টজা-কিছুই হবে না বোধ হয়, কেবল কোন রকমে নিয়ম রক্ষে আর কি!

হেমন্ত। বাঃ, এত অনুষ্ঠানের পর শেষ বুঝি তাই? না, তা হচ্ছে না!

নীরদা। (তোড়াবাঁধা রাখিয়া হেমন্তের পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন) তুমি এখন ভারী ব্যস্ত, না?

হেমন্ত। হাঁ, কেন বল দেখি।

নীরদা। এগুলো কি কাগজ?

হেমন্ত। ব্যাঙ্কের।

নীরদা। এরই মধ্যে—?

হেমন্ত। হাঁ, পুরোনো ম্যানেজার থাকতে থাকতেই খারাপ লোকদের সব তাড়িয়ে ভাল লোক বাছাই করে নিতে হবে কি না, তাছাড়া—

নীরদা। ও, তাই কামিখ্যে এমন হুমকি-ধুমকি হয়ে ছুটে এসেছিল?

হেমন্ত। হুঁ—

নীরদা। (ফুলের তোড়া একটা হাতে তুলিয়া লইয়া) এটা ভারী চমৎকার দেখাচ্চে, না? এ-রকম আরও পাঁচটা তৈরী করতে হবে—আচ্ছা দেখ, কামিখ্যে কি সত্যি সত্যি এমন কোন দোষ করেচে যার জন্য তার চাকরি থাকবে না?

হেমন্ত। হাঁ, সে একজনের নাম জাল করেচে।

(নীরদা শিহরিয়া উঠিলেন)

তার মানে কি, তুমি জান না বোধ হয়?

নীরদা। এমনও হতে পারে ত যে সে বেচারা ভয়ানক দায়ে পড়েই হয়ত এ কাজ করেছে!

হেমন্ত। যাই হোক্‌, প্রথমবার অপরাধের জন্য আমি তাকে কঠিন সাজা দিতে চাই না!

নীরদা। আমি জানি, তুমি তা কখনই পার না।

হেমন্ত। দোষ যখন করে ফেলেচে, তখন আর উপায় কি? প্রকাশ্যভাবে দোষটা স্বীকার করে নিলেই সব মিটে যেত—একটা নাম মাত্র সাজা হত তাতে।

নীরদা। সাজা হত?

হেমন্ত। কামিখ্যে কিন্তু সে সব স্বীকার করেনি, উল্টে চালাকি খেলে নিজেকে নির্দ্দোষ দেখাতে গেছলো।

নীরদা। তা হলে—

হেমন্ত। ভেবে দেখ একবার ব্যাপারখানা। অমন কাজ যে করে, তাকে কি রকম ভিতরে এক বাইরে আর করে সকলের সঙ্গে মিশতে হয়! কি রকম ভণ্ডামির মুখোস পরে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যাতায়াত করতে হয়! এমন কি, নিজের ছেলেপিলে, স্ত্রী—যারা সবচেয়ে আপন, তাদের সঙ্গেও কি কপটভাবে বাস করতে হয়! কি ভয়ানক ব্যাপার, একবার ভাব দেখি। এতে ছেলেপিলেদের অবস্থা একেবারে মারাত্মক হয়ে ওঠে। তাদের ভবিষ্যৎ—

নীরদা। (ত্রস্তভাবে) কি রকম?

হেমন্ত। কারণ মিথ্যার এই ঘৃণিত আবরণ ঘরের বাতাসকে পর্য্যন্ত বিষিয়ে তোলে, আর সেই বিষাক্ত বাতাস শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ছেলেদের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়ে তাদেরও বিষাক্ত কলুষিত করে,—

নীরদা। (অতি নিকটে গিয়া অধিকতর ত্রস্তভাবে) সত্যি?

হেমন্ত। সত্যি না ত কি! আমার পাঁচ বছরের ওকালতির অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা বলচি। অল্পবয়সে যারা-যারা অসৎ কাজ করেচে, প্রায় দেখা গেছে তাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই মা বদ ছিল।

নীরদা। কেবল মায়ের কথাই বলছ কেন?

হেমন্ত। কারণ মায়ের ক্ষমতাই ছেলেদের উপর বেশী কাজ করে কি না! বাপের দোষেও ছেলে খারাপ হয় বই কি! আইনের ব্যবসা যারা করে, তারাই এ কথা জানে। এই কামিখ্যে এখন থেকে তার ছেলেগুলোকে মিথ্যা আর কপটতার বিষে জর্জ্জরিত করচে। লোকটার নৈতিক বল একেবারে লোপ পেয়ে গেচে। তাই বলি, আমার নীরদা যেন ও লোকটার

কোন কথায় না থাকে—ও না খেতে পেয়ে মারা যেতে বসলেও যেন ওর কোন সাহায্য না করে। কেমন, এখন বুঝলে ত?—আর দেখ, ওকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ও রকম লোকের কাছে বসতে আমার গা যেন ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে।

নীরদা। (হেমন্তর নিকট হইতে সরিয়া গেলেন) ওঃ, এখানটা ভারী গরম বোধ হচ্ছে—অসহ্য! এখনও কত কাজ বাকী—

হেমন্ত। (কাগজপত্র রাখিয়া উঠিলেন) খাওয়া-দাওয়ার পর কতকগুলো কাজ সেরে ফেলতে হবে। তার পরই তুমি তাড়া লাগাবে ত? তোমার কাজও করে দেব বই কি! বাঃ, ভারী চমৎকার তোড়া বানিয়েচ ত! এত সব ডালপালা আবার কি হবে?—আচ্ছা, যা ইচ্ছে তোমার, কর। আমি চট্ করে নেয়ে নি তা হলে।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

নীরদা। (গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন—তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন) না, না—এ সব মিছে কথা। অসম্ভব—একেবারে অসম্ভব!

আয়ী। (আস্তে দরজা খুলিয়া) ছেলেরা যে তোমার কাছে আসবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে!

নীরদা। না, না,—আমার কাছে ওদের আস্তে দিও না—খবরদার—তুমিই ওদের নিয়ে থাক, আমি—

আয়ী। বেশ, বাছা! (দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল)

নীরদা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) বাছাদের আমার ডুবিয়ে দিলুম—সংসারটাকেও বিষাক্ত করলুম! (স্তব্ধ হইয়া রহিলেন) না, না, মিছে কথা! তাও কি হয়? এও কি সম্ভব? কখনো না!

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

সাহিত্য

(ফরাসী হইতে)

১

ইংরেজী গ্রন্থরচনা

মুদ্রাযন্ত্র অপেক্ষা সাহিত্যে সমাজের ক্রমবিকাশ অধিক পরিব্যক্ত হয়।

*
* *

প্রথমতঃ ইংরেজী সাহিত্য। প্রথমকার কালে, জেতৃজাতির সভ্যতা গ্রহণের জন্য বিজিতদিগের একটু মুগ্ধধরণের অবোধ-সরল উৎসাহাতিশয্য, স্বকীয় প্রচলিত সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা, ইংলণ্ডের 'রোমান্টিক' কবিদিগের প্রতি, বিশেষত বায়রণের প্রতি অগাধ ভক্তি পরিলক্ষিত হয়।

১৮৪০ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা ইংরেজী পদ্য রচনা করিতে ভাল

বাসিত। মধুসূদন দত্ত, যিনি আরো কিছুকাল পরে বাঙ্গলা রচনার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার "Captive Lady" এই সময়ে (১৮৪৯) প্রকাশিত হয়। তাঁহার বাগ্‌দত্তা ইংরেজ-প্রেয়সীকে তিনি এইরূপ বলিতেছেন:—

"Yes—like that star which
on the wilderness
Of vasty ocean wooes
the anxious eye
Of lonely mariner—and
wooes to bless—
For there be hope writ on her
brow on high:
He recks not darkling waves—nor
fears the lightless sky.

Oh! beautiful as inspiration,
when
She fills the poet's breast—her
fairy shrine;
Wooed by melodious worship!
welcome then;
Though ours the home of want,
I ne'er repine,
Art not thou there, even thou,
a priceless gem and mine?
(Literature of Bengal
গ্রন্থে উদ্ধৃত, p. 199)

কিন্তু শীঘ্রই এই উৎসাহাতিশয্য প্রশমিত হইল। হিন্দুরা বুঝিল, বিদেশী-ভাষার উপর তেমন দখল কখনই হইবে না, বিদেশীয় ভাষায় ওস্তাদী চলিবে না। বায়রণ টেনিসনের সহিত টক্করাটক্করী করা অপেক্ষা, ভাল ভাল ইংরেজী গ্রন্থ—বিশেষত এখন যাহা খুব লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে সেই সেক্‌স্‌পিয়ার দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিলে বেশী কাজ হইবে (১)।

কিন্তু তবুও, একটি অল্পবয়স্কা বালিকা, কুমারী দত্ত ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই মনোমুগ্ধকর কবিতাগুলি লিখিয়াছিল;—ইহাতে ভারতের অন্তরাত্মা ইংরেজের অন্তরাত্মার সহিত কি সুন্দর মিশিয়া গিয়াছে।

ইহা সাবিত্রীর ইতিহাস। সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর এইমাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছে:—

"এ কি?—এ কি প্রেম? কবিরা তবে মিথ্যা বলেন নাই, প্রথম দৃষ্টিতেই তবে ভালবাসা হতে পারে! দেবতা সাক্ষী:—অনেক সময়ে হৃদয়-নাথ হৃদয়ে বিদ্যুৎ-ছটার ন্যায় হৃদয়ে প্রবেশ করেন। খেলাধূলা করিতেছি আমোদ-আহ্লাদ করিতেছি, মনে কোন ভাবনা চিন্তা নাই—তারপর ঐ শোন, কার পদশব্দ—আর অমনি আনন্দময় জীবন, কিংবা নীরব নৈরাশ্যের আবির্ভাব···এইরূপে চারিচক্ষের মিলন হইল। সাবিত্রী মুনির কুটীরে প্রবেশ করিল। হৃদয়-পদ্ম একবার প্রস্ফুটিত হইলে আর মুদিত হয় না।"

মুনি আসিয়া যখন প্রকাশ করিলেন,—

(১) ১৯০০—১ খৃষ্টাব্দের নৈতিক উন্নতির বিবরণী'তে আমরা দেখিতে পাই, বঙ্গনাট্যসাহিত্যে সেক্‌স্‌পিয়ারের প্রভাব প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকগুলি নাটকে Duncanএর হত্যার পূর্ব্বে Lady Macbethএর কথার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৎসরে ম্যাক্‌বেথের একটি ভাল পদ্যময় অনুবাদ বাহির হইয়াছে। তা ছাড়া Banim কৃত Damon ও Pythias ও Sheridan কৃত Pizarroর অনুবাদ এবং Miltonএর অনুকরণে, "সুর-সঙ্গীত" পদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

এই বৎসরেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে, তখন সাবিত্রীর পিতামাতা এই বিবাহের বিরোধী হইলেন। কিন্তু সাবিত্রী :—

"আমি আমার হৃদয় দান করিয়াছি। মনে-মনে দান করিলেও তাহা আর ফিরাইয়া লইতে পারিব না। দানের বস্তু ফিরাইয়া লওয়া মহাপাপ, ভগবান তাহা হইতে আমাকে রক্ষা করুন। ফিরাইয়া লইবই বা কেন?—হৃদয় এমন কিছুইত করে নাই যাহার জন্য আমি হৃদয়কে তিরস্কার করিতে পারি।"

সাবিত্রীর পিতা :—"কন্যা বিবাহে আত্ম-সম্প্রদান করিতে পারে না, পিতা কিংবা মাতার সম্মতি ব্যতীত বিবাহের চুক্তি অসিদ্ধ হয়।"

সাবিত্রী :—"সকলেই একবার মাত্র ভবিতব্যতার বশীভূত হয়। ইহাই বিধাতার ইচ্ছা। রমণীও নিজের হৃদয় ও পাণি একবার মাত্র দান করে...আমি আমার হৃদয় দিয়া ফেলিয়াছি—সেই সঙ্গে বাগ্‌দানও হইয়া গিয়াছে। আর আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না। ওরূপ যে করে, সে ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়। মুখে উচ্চারিত না হইলেও, আমার শপথ কম গুরুগম্ভীর নহে। মুখের বাক্য লঙ্ঘন করা অপেক্ষা, হৃদয়ের বাক্য লঙ্ঘন করা কি কম পাপ? (২)

(২) What was the meaning—was it love?
Love at first sight as poets sing,
Is then no fiction! Heaven above
Is witness, that the heart its king
Finds often like a lightning flash;
We play—we jest—we have no care—
When harka step—there comes no crash,—
But life or silent slow despair,
Muni's eyes just met,—their past
Into the friendly Savitri hut,
Her heart-rose opened had at last—
Opened no flower can ever shut···

This was enough. That monarch knew
The future was no sealed book
To Brahma's son. A clammy dew
Spread, on his,brow,—he gently took
Savitris' palm in his, and said:
'No child can give away her hand,
A pledge is nought unsanctioned;
And here,:If right I understand,
There was no pledge at all,—a thought,
A shadow—barely crossed the mind—
Unblamed, it may be keenly forgot,
Before the gods it can not bind······

পণ্য যাহা হারাইয়াছে, গদ্য তাহা লাভ করিয়াছে। ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত নব-হিন্দুরা, ইংরেজ-প্রভুদের নিকট আপনাদিগের দাবীদাওয়া জানাইবার জন্য এবং তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে, সামাজিক ও অর্থশাস্ত্রসংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রশ্নাদির ব্যাখ্যা করিতে পারে,—ভারতীয় কোন ভাষাই এখনো সেরূপ গড়িয়া উঠে

In the meek grace of virginhood
Unblanched her cheek, and undimmed her eye.
Savitri, like a statue stood,
Somewhat austere was her reply.
"Once, and once only, all submit
To Destiny,—'tis God's command ;
Once and once only, so' tis writ,
Shall woman pledge her faith and hand ;
Once, and once only can a sire
Unto his well-loved daughter say,
In presence of the witness fire
I give thee to this man away.

Once and once only have I given
My heart and faith—'tis past recall ;
With conscience none have ever striven,
And none may strive, without a fall.
Not the less solemn was my vow
Because unheard, and Oh ! the sin
Will not be less, If I should now
Deny the feeling felt within.
Unwedded to my dying day
I must, my father dear, remain ;
"Tis well, if so thou will'st, but say
Can man balk Fate, or break its chain ?

কোন উচ্চবর্ণ বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে তরুদত্ত ৪ মার্চ্চ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপযাত্রা করেন এবং ১৮ বৎসর বয়সে Bengal Magazine পত্রে Leconte de Lisleএর উপর একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, "রেনেসান্স" ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদের রচনা হইতে চয়ন করিয়া এবং তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া "Sheaves Gleaned in French fields" নামক কবিতার গ্রন্থ প্রকাশ করেন; Du Bartas হইতে Andri chenier পর্য্যন্ত আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কোন পুরাতন গ্রন্থকারকেই তিনি প্রকৃত কবি বলিয়া মনে করিতেন না। ২০ বৎসর বয়সে, ৩০ অগষ্ট ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। Mlle. Clarisso Bader, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তরুদত্ত-রচিত এক ফরাসী উপন্যাস প্রকাশ করেন; "Le Journal de Mademoiselle d' Arvers"—Ancient ballads and legends of Hindustan, Edmond Gossএর ভূমিকার সহিত (১৮৮১)।

নাই; তাছাড়া ইংরেজী ভাষাই একমাত্র ভাষা যাহা সকল শিক্ষিত ভারতবাসীই জানে। প্রতিবৎসর সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থই বাহির হইতে দেখা যায় (৩)।

সামাজিক ইতিহাসের গ্রন্থ যথা:— M. Dutt প্রণীত "প্রাচীন ভারতের সভ্যতা" এবং M. Bose প্রণীত—"ইংরেজের আমলে ভারতের সভ্যতা"।

অর্থশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রন্থ; যথা—M. Dutt প্রণীত "ভারতের দুর্ভিক্ষ", এবং M. Naoraji প্রণীত "দারিদ্র্য ও ব্রিটিস-নীতিবিরুদ্ধ শাসনতন্ত্র"। দার্শনিক আলোচনা -যথা, M. Banerjiর "হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে কথোপকথন" এবং M. Ghoseএর "চৈতন্যের ধর্ম্মনীতি"।

সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ:—যথা, M. Duttএর "বাঙ্গালা সাহিত্য।"

বিদ্রূপাত্মক লেখা। যথা:-M. Malabariর "গুজরাট ও গুজরাটী"।

এই বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থের মধ্যে, পার্সি-পুরোহিত দস্তুরের বর্ণনা আছে; Malabari নিজে বোম্বায়ের একজন পার্সি।

দস্তুর।—"দস্তুরের উৎপত্তি, অভ্যুদয় ও অবনতি; তাহার রসাতলে দারুণ পতন; তাহার ব্যবহার; তাহার অনুরাগ, বিরাগ, ও কষ্ট; তাহাকে লইয়া এখন কি করা যায়।

দস্তুরই ধর্ম্মের অন্ধযুগের আলেয়ার আলো। স্বাধীন চিন্তার ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে একটা পৌরাণিক অলীক কথা বলিয়া মনে করে; পক্ষান্তরে ভক্তেরা তাহাকে পুরাতন Magiদিগের সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া দাবী করে; কিন্তু গ্রীক শব্দ Magiর অর্থ যদি maggot হয়, তবে এইরূপ ব্যাখ্যায় একটা সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়; কেন না, দস্তুরের ধর্ম্মমতটা আর যাই

(৩) মালাবারি (মেঃতা ৮ বেহরামজী মেরওয়ানজীর দত্তকপুত্র) এই কবি ও বিশ্বহিতৈষী পার্সি। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বরোদায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি Age of Consent আইন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য মন্ত্রণা দেন এবং "দাম্পত্য-অধিকার প্রত্যর্পণ" করিবার বিরুদ্ধে কাগজে খুব লেখালেখি করেন। ইহাঁর প্রধান গ্রন্থাবলী:— The Indian eye on English life (1893) The India Problem (1894). India in 1897 (1898) Anubhabik (Experiences of life) (1894). Man and his world (1898).

Dutt (রমেশচন্দ্র দত্ত) ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন; কলেক্টর মেজিষ্ট্রেট (১৮৮৮); বর্দ্ধমানের কমিশনার (১৮৯৪—০৫) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৯৫); কংগ্রেসের সভাপতি (১৮৯৯), লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সাহিত্যের অধ্যাপক। গ্রন্থাবলী:—Literature of Bengal (১৮৭৭). History of Civilization in Ancient India (১৮৮৮—৮৯)। A brief history of Ancient and Modern India. (1891) Lays of ancient India ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘোষ (যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ) ভারতীয় পজিটিভিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতা। এই নামে আরও অনেক গ্রন্থকার আছে। অনেক ভারতবাসীই তাহাদের নাম ইংরাজীধরণে পরিবর্ত্তন করিয়াছে; যেমন—দত্তের স্থানে ডট্‌।

১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, ভারতবর্ষে ১১৬৪ ইংরেজী গ্রন্থ এবং ১৯০০—১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১২২৯ ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অন্য য়ুরোপীয় ভাষায় লিখিত কতকগুলি গ্রন্থ ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

হোক্—বড়ই পোকা-ধরা (maggoty)। ডারুইন্ আভাস-ইঙ্গিতে যে বলেন—সাজারু প্রভৃতি প্রাণীরাও দস্তুর জাতির অন্তর্ভুক্ত—এ কথায় তিলমাত্র সত্য নাই। দস্তুর সাহেব বড়ই ধর্ম্মনিষ্ঠ, যে কেহ তাঁহাকে কিছু দক্ষিণা দিবে, তার জন্য তিনি দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

শ্মশানযাত্রায় তিনিই মুখ্য শোকপ্রকাশক এবং সেই জন্য তিনি বেশ দু-পয়সা পাইয়া থাকেন। বিবাহ এবং অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনিই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা, এবং এইসকল উপলক্ষে তাঁহার প্রাপ্য আরও বেশী। বিবাহের ঘটকালী ও বিবাহভঙ্গের কাজে তাঁর বেশ দক্ষতা আছে; এবং এই কাজে তাঁর পাওনা সবচেয়ে বেশী। এইগুলি তাঁর আয়ের পথ—যাহা তিনি নম্রতা ও দুঃখের সহিত বলেন "আয়ের জানলা।"

কোন দুঃখী বিধবা—অর্থাৎ যাহার বিপুল সম্পত্তি আছে কিন্তু উত্তরাধিকারী নাই—তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া দস্তুরের অন্তরাত্মা অনিবার্য্য আগ্রহের সহিত তাহার প্রতি ধাবিত হয়। সম্পত্তিশালী যুবতী বিধবারা অত্যন্ত বুনো ধরণের জীব; কিন্তু দস্তুর, ডাক্তার ও উকীলের হাতে পড়িয়া উহারা শীঘ্রই ভেড়া বনিয়া যায়।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রমণী-জীবন

অনেকদিন থেকে মহাবীর নেপোলিয়নের মহাবাণী পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি স্মরণ করে' আস্‌চে। সে বাণী হচ্চে এই যে, কোনো জাতিকে পৃথিবীর বক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে সে জাতির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, দেশে অগণন উপযুক্ত জননীর সৃষ্টি করা। অনেক মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করে আমরা দেখ্‌তে পাই যে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই চরিত্র-গঠনের পক্ষে জননীর সহায়তা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান ছিল। মহাপুরুষগণও মুক্তকণ্ঠে জননীর ঋণ স্বীকার করে' গেছেন।

জাতিমাত্রই নর ও নারীর সমষ্টি। অতএব নির্ব্বিকারে একথা আমরা বল্‌তে পারি যে, সুধু পুরুষের উন্নতিতেই কোনো দেশ উন্নত হয় না। নরনারীর জীবন-সম্বন্ধ এমন সুদৃঢ় সংবদ্ধ যে, ইহাদের উন্নতি-অবনতি চিরকাল পরস্পরসাপেক্ষ। কোন উন্নত জাতিকে লক্ষ্য করে' কেউ যদি বলে, ওদের পুরুষগুলোই ভাল, মেয়েগুলো অপদার্থ, তবে সে কথা আমরা সত্য বলে স্বীকার করতে পারিনে। কারণ, যে জাতির রমণী উন্নত নয়, সে-জাতি কখনো পুরোপুরি উন্নত হতে পারে না; জাতির অবনত অংশ নিজের অবনতির অনুপাতে তাকে অবনত করে' রাখবেই। আমরা জানি, ভীরু, উচ্চাকাঙ্ক্ষাশূন্য রমণী স্বামী-পুত্রের মহৎ আকাঙ্ক্ষা সফল করার পক্ষে যেমন বাধাস্বরূপ, তেমনি তেজস্বিনী উন্নতমনা নারী উন্নতির পক্ষে সাহায্যকারিনী। এই যে কতিপয় বাঙ্গালী যুবক পল্টনশ্রেণীভুক্ত

হয়েছে, এদের মধ্যে কয়জন যুবক মায়ের উৎসাহ পেয়ে সৈনিক-জীবনে প্রবেশ করেচে ? বাঙ্গালী ছেলেদের সৈনিক বিভাগে প্রবেশের প্রবলতম অন্তরায় এই যে, তারা পারিবারিক অসন্তোষ ও অশ্রুজলের বাধা উত্তীর্ণ হতে পারছেনা।

হিন্দুর দেশে একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, রমণী শক্তি-রূপিনী। কিন্তু সেই শক্তিকে আমরা স্বীকার করছি কই ? আজকের দিনেও যদি সেই শক্তিকে অবহেলা করি, তাহলে যে নবযুগের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় আমরা চঞ্চল হয়ে উঠেছি, তার কোনোই সার্থকতা থাকবে না। জাতীয়তার ক্ষেত্রে আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েও উহার মূলে যে সত্যটি বিদ্যমান রয়েছে, তাকেই যেন আমরা সকলের অন্তরালে অদৃশ্য করে' রাখতে চাচ্ছি। আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হ'ব, অথচ আমাদের রমণীকুল যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে, এমনতর ধারণা অনেকেই পোষণ করে থাকেন। আমি চাচ্ছি পাহাড়ে উঠবো, অথচ যাকে ছেড়ে এক পা এগিয়ে যাওয়া চলেনা, সে থাকবে নীচে পড়ে।, তার ফল হবে কি ? না, আমাদেরও পাহাড়ে ওঠা হবে না; নারীর অঞ্চললীন হয়ে, আমরাও পাহাড়ের তলদেশেই পড়ে থাকব।

রমণীদের উন্নতিসাধন বিষয়ে কোনো প্রস্তাবনার উল্লেখ করতে গেলেই একদল লোক খপ্ করে' জিজ্ঞাসা করবেন, যে দেশে পুরুষদেরই মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করবার সুবন্দোবস্ত নেই, মেয়েদের উন্নতির জন্যে সে দেশের এত মাথাব্যথা কেন ? আগে পুরুষগুলি মানুষের মতন হোক, তার পরে মেয়েদের কথা ভেবো। আমাদের মনে হয়, যাঁরা এমনতর ধারণা পোষণ করেন, তাঁরা নিজেরা যে উন্নত হতে চান, এ কথাই সত্য নয়। পূর্ব্বেই বলেছি, নরনারীর উন্নতি-অবনতি পরস্পরসাপেক্ষ। পৃথিবীতে কোনোকালে এমন জাতি ছিল না, বা নাই, কিম্বা হবেনা, যাদের পুরুষ ও রমণীর উন্নতি-অবনতি একই ক্রমে সংঘটিত হয়নি। পুরুষ ও রমণীর একজনকে পশ্চাতে রেখে অপরের উন্নতি আকাশ-কুসুম মাত্র।

তাই, যদি দেশে শিক্ষাবিস্তার করতে হয়, সে শিক্ষার আলো নরনারী উভয়ের মধ্যেই প্রয়োজনানুপাতে বণ্টন করে' দিতে হবে; যদি ধর্ম্মবলে, কর্ম্মবলে এ জাতিকে শক্তিমান করে' তুলতে হয়, তাহলে নরনারী সমান ভাবে সে শক্তির অংশীদার হবে।

সংসারে পুত্রও জন্মে কন্যাও জন্মে— এ বিধানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। কিন্তু পুত্রের জন্ম হ'লে প্রত্যেক পরিবারে, অন্তত বাঙ্গালীর উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, আনন্দের কোলাহল জেগে ওঠে; আর কন্যাসন্তান জন্মালে একটা বিষাদের ছায়াপাত হয়। অবশ্য একথা আমরা জোর করে' বলতে পারিনে যে, পিতামাতা স্বভাবত কন্যার চেয়ে পুত্রকে বেশি স্নেহ করেন। কিন্তু এটা দেখা যায় যে, পুত্র যতটা আদর-যত্ন লাভ করে' থাকে, কন্যা তার সিকিও পায় না। পুত্র বংশধর, ভবিষ্যতের আশাভরসা; আর কন্যা পরের জিনিষ, যতদিন রক্ষণীয়া তত দিন সংসারের বোঝা—এই ভাবে দুজনের বিচার চলে। পুত্র ও কন্যা উভয়ের জন্মের

জন্যেই পিতামাতা দায়ী, উভয়কে সমভাবে কেন যে তাঁরা মানুষ করে' তুলবেন না, সে কথা বোঝা দায়। যে আদর-যত্ন, যে খাদ্য, যে শিক্ষা ছেলের জন্যে তাঁরা ব্যবস্থা করেন, মেয়ের জন্যে তা তাঁরা করবেন না কেন? দু'জনেই সংসারের খেলা খেল্‌তে এসেচে, দু'জনকেই শরীর দিয়ে মন-প্রাণ দিয়ে সংসারের কর্ত্তব্য পালন করতে হবে; এক জনের প্রতি এত অনুগ্রহ কেন, আর আর একজনকে সুধু অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করে' ছেড়ে দেওয়াই-বা কেন? অনেকে বল্‌বেন, ছেলের জন্যে যা দরকার, মেয়ের জন্যে সে সকল দরকার নেই। আমরা তা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু একথা কি তাঁরা স্বীকার কর্‌বেন না যে, উন্নত স্বাস্থ্য, উদার প্রশস্ত মন, স্ফূর্ত্তিভরা প্রাণ উভয়ের পক্ষেই সমান প্রয়োজন? ভগবান নর ও নারীকে আলাদা করে' তৈরি করে'ও বিভিন্নতার ভিতর দিয়েও ঐক্যের বন্ধন সৃজন করে' রেখেচেন, তা' তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন কি? যেখানে নর ও নারীর ঈপ্সিত বস্তু অভিন্ন, সেখানে যদি সমাজ পথ রুদ্ধ করে' দাঁড়ায়, তবে সেখানে সমাজ ন্যায়কে অমান্য করে' আত্মহত্যা করে বই কি!

উন্নত স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠ মন, ন্যায়ানুবর্ত্তিতা,— উন্নত জাতির নরনারীর বিশিষ্ট চরিত্র। এই স্বাস্থ্য, মন এবং প্রাণের স্বাস্থ্যনীতি ও ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করা দরকার। ধরুন, যথাযোগ্য ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্য না হ'লে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। তেমনি মনের উন্নতির জন্যে ক্রীড়া, কৌতুক, সৎসঙ্গ ও সুশিক্ষার প্রয়োজন। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বালক ও বালিকার শরীর ও মনের উন্নতিসাধনের জন্যে আমরা কি নিরপেক্ষ বন্দোবস্ত করেচি? যদি না করে' থাকি, তবে তা'র জন্যে আমাদের জবাব দেবার কি আছে? আমাদের পুত্রগণ যতটুকু সুবিধা পেয়ে থাকে, মেয়েরা তার শতাংশের একাংশও পায়না কেন? কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন, মেয়েরা যে ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের স্বাস্থ্য-বিধানের পক্ষে তাইই যথেষ্ট। কিন্তু একথা একেবারেই মিথ্যা। যাঁরা রীতিমত ব্যায়াম করে' থাকেন, তাঁরা জানেন যে, নিয়মানুবর্ত্তিতা, মনোযোগিতা এবং প্রফুল্লতা ব্যায়াম-সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এই গুণত্রয় সংযোগে যে ব্যায়াম অবলম্বিত হয়, তাতেই মানুষের স্বাস্থ্য ভবিষ্য জীবনে সহায়কর হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রমণীবৃন্দের জন্যে এমন ধরণের ধারাবাহিক কোনো ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করে' আমরা রেখেচি কি? অবশ্য এমন কথা বলা হচ্ছে না, যে পুরুষের মতন রমণীরাও ফুটবল খেলবে বা ক্রিকেট ও হকি খেলতে ময়দানে ছুটবে। কিন্তু শরীররক্ষার্থ যে যে ব্যায়ামের দরকার, তাও যদি তাদের নিয়মিত করতে না-দেওয়া হয়, তবে তাদের শরীরের উন্নতির আশা আমরা কোনমতেই করতে পারিনে। এই যে ঘরকন্নার কথা, এটা কি একটা ভয়ানক বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যাপার নয়? আমরা তো দেখতে পাই অনেক জায়গাতেই অমিত পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ধ্বংস হচ্ছে, আবার কোনো-কোনো স্থলে অলসতায় নিমজ্জিত থেকে অনেকের স্বাস্থ্য একেবারে অকেজো হয়ে যাচ্ছে।

আহারে অনিয়ম, কর্ম্মে অনিয়ম, মানসিক অশান্তি বাঙ্গালী-রমণীর চরিত্রগত। বাল্যকাল থেকে তাদের শরীর ও মনকে এই কঠোর সংসারের ধাক্কা সাম্‌লে চলবার উপযুক্ত করে' দেওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করা হয়নি বলেই রমণী-জীবনের এই দুর্দ্দশা। মরুভূমির ভিতর দিয়ে যে পান্থদের অগ্রসর হতে হবে, যথেষ্ট পরিমাণ পানীয় সঙ্গে না নিলে, তাদের যেমন তেষ্টায় ছাতি ফেটে মর্‌তে হয়, আমাদের রমণীদেরও তেমনি ভাবে বাল্যকাল থেকে নিরাবলম্ব হয়ে সংসারে প্রবেশ করে' ভগ্নস্বাস্থ্যে দিনপাত কর্‌তে হয়। অথচ আমাদের ধারণা যে, মেয়েদের ব্যায়াম-সাধনার কোনো প্রয়োজন নেই! এর চেয়ে অন্ধ জড়ত্ব আর কি থাক্‌তে পারে?

তারপর বিয়ের পর থেকেই আমাদের বালিকাবৃন্দ পিঞ্জরলীন পক্ষীর মত অগাধ আকাশ, অবাধ বাতাস ও বিশ্বের জীবন-স্রোত থেকে বঞ্চিত হয়। তখন তাদের সাথের সাথী ও আলাপ করার পাত্র ও পাত্রী তাদের বয়সী অথবা বয়ঃকনিষ্ঠ বালক-বালিকাবৃন্দ। যে সময়টা সংসার-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার প্রকৃষ্ট সময়, সেই দুর্লভ কালটা তাদের কচি-কচি শিশুদের অনভিজ্ঞতার সঙ্গে খেলা করে' কাটে! স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে হয়ত সেই নিসুতি রাত্রে নিদ্রাজড়িত নেত্রে। তাতে স্বামীর কাছ থেকে বিশেষ কিছু অর্জ্জন করা বালিকা-বধূর পক্ষে সম্ভবপর নহে। অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের দ্বারা সাধারণত যে শিক্ষালাভ হয়ে থাকে, আমরা তার উপরই বেশি নির্ভর করি। কিন্তু এ শিক্ষা কি? প্রথমত এঁরা শিক্ষাদান কর্‌তে জানেন না, তার পরে গুরু ও শিষ্যার মধ্যে মনের ভাব আদান-প্রদানেরও কোনো বন্দোবস্ত নেই। "কি? এবং কেন?" প্রশ্ন করবার যেখানে সুবিধা এবং সাহস নেই সেখানে যে ভাল-কিছু শিক্ষা করা যায়, এমন হ'তেই পারেনা। সর্ব্বশেষে অতি কুণ্ঠিতভাবে এ-কথাও বল্‌তে আমরা বাধ্য যে, এখানে গুরুর উদ্দেশ্যই নয় শিষ্যাকে শিক্ষিত করা, গুরুর উদ্দেশ্য সুধু শিষ্যাকে খাটিয়ে মারা। খাটুনীর বন্দোবস্ত আছে, বিশ্রামের নেই; বকুনী আছে, আদর নেই; ঘাঁনি আছে, জাব্‌না নেই।

একটি বুদ্ধিমতী মহিলাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আমাদের রমণীদের স্বাস্থ্য যে এত খারাপ, তার প্রধান কারণ কি? তিনি বলেছিলেন, "হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, অথচ পেটে অন্ন নেই বলেই এমন হচ্ছে। মেয়েরা স্বভাবত লজ্জাশীলা, বিয়ের পর কোনো মেয়ে আপনা হ'তে খাবার নিয়ে খায় না, এবং কারুর কাছে খাবার চেয়েও নেয়না। যাঁরা গিন্নীবান্নী লোক তাঁরা প্রথম দু'চার দিন খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে যত্ন করে' থাকেন, কিন্তু বেশিদিন আর তাঁদের সে যত্ন থাকেনা!" এইটে যে সংকীর্ণ মন ও স্নেহহীনতার পরিচায়ক তাতে আর সন্দেহ নেই। নিজেদের মেয়েদের বেলায় এ অমনোযোগিতা তাদের দেখা যায় না, বউয়ের বেলায় সেটা সকলেই লক্ষ্য কর্‌তে পারে। এ ছাড়া আরও এমন অত্যাচার, অবহেলা, লাঞ্ছনা এদের উপর দিয়ে দুর্দ্দিনের ঝড়ের মত চলে যায়, যার জন্যে "কলিতে

অমর কঁনের শাশুড়ী”—এমন গানের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এমনি করে’ পাহাড়-প্রমাণ বাধাবিপত্তি, অভাব-অসুবিধার মধ্যে থেকে আমাদের রমণীকুলের জীবন ক্রমেই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করে।

আমাদের সাম্‌নে কতকগুলি কাজ আছে যা আমরা ভাল কাজ বলে থাকি; কিন্তু এমন আরো-কতকগুলি কাজ আছে যেগুলিকে ভক্তিভরে আমরা শ্রেষ্ঠ কাজ বলে আখ্যা দিই। মেয়েদের পক্ষে রীতিমত ঘর-কন্না করা, গুরুজনকে ভক্তি করা, লঘুজনকে আদর-যত্ন করা কর্ত্তব্য কার্য্য বা ভালকার্য্য। কিন্তু নাইডুর মতন বিদুষী হওয়া, নিবেদিতার ন্যায় জীবপ্রেমে আত্মনিবেদন করা, বা ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেলের ন্যায় আহতের সেবা করা মহৎ কার্য্য। অনেকের মুখে শুনে থাকি, আমাদের রমণীকুল সাংসারিক কর্ত্তব্য সাধনে যেমন তৎপর, তেমন আর কোনো দেশের রমণী নয়। কিন্তু যাকে আমরা শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলি আমাদের রমণীবৃন্দ তার ত্রিসীমায়ও পদার্পণ করে কি? যে দেশের যত অধিকসংখ্যক রমণী শ্রেষ্ঠ কাজ বরণ করে’ নেয় সে দেশের রমণী তত বেশী উন্নত। আর যেখানে ভালর সংখ্যা বেশি সেইখানেই শ্রেষ্ঠের উৎপত্তির সম্ভাবনা অধিক। আমাদের সমাজে যখন শ্রেষ্ঠ রমণীর আবির্ভাব হয় না, তখন আমাদের রমণীকুল যে খুব ভাল তার প্রমাণ হয় কিসে? ভাল কাজ বা শ্রেষ্ঠকাজের জন্য শ্রেষ্ঠ উপাদান চাই—শরীর ও মনের স্বতঃস্ফূর্ত্তি মানুষকে ক্ষুদ্রত্ব হ’তে মহত্বে নিয়ে যায়। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্ম্ম না হলে অন্তরের সুপ্তশক্তি জেগে উঠ্‌তে পারেনা। কিন্তু আমাদের রমণীবৃন্দের এই সুযোগ কোথায়? মানুষ হয়ে যারা জন্মেছে, ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ থেকে কে তাদের বঞ্চিত করে’ রেখেছে?

মনের সংকীর্ণতা, স্বাস্থ্যহীনতার যে সকল কুফল তা আপনারা সকলেই প্রতিনিয়ত দেখ্‌তে পাচ্ছেন। ঘরে ঘরে অবিশ্রান্ত কোন্দল, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়াঝাটি, হীন স্বার্থপরতা,——বাঙ্গালী-পরিবারের বিশিষ্ট পরিচয়। রুগ্না, ক্ষীণদেহা জননীর সুস্থসবল সন্তান সম্ভব নয়। ঘরে ঘরে তারই জন্যে যে হাসপাতালের সৃষ্টি হয়ে আছে, তার গৌণ কারণ খুঁজতেও আমাদের বাইরে যেতে হবে না। আমাদের মেয়েরা সন্তান পালন কর্‌তে জানে না, নিজেদের ভাঙ্গা স্বাস্থ্য নিয়ে সকল সময় সকল কাজ রীতিমত করে’ও উঠতে পারে না। তাদের স্তন্যও এমন পর্য্যাপ্ত বা পুষ্টিকর নয়, যাতে সন্তানের দেহ সুগঠিত হতে পারে। এতগুলি বাধা-বিপদের মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠা আমাদের ভবিষ্য বংশধরদের পক্ষে কত যে শক্ত ব্যাপার, তা’ সকলেই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। নেপোলিয়ন বলে গেছেন, দেশে উপযুক্ত জননী তৈরি কর্‌তে; আমরা কেমন জননী তৈরি কচ্ছি একবার সকলে মিলে তলিয়ে ভেবে দেখুন দেখি।

তারপরে অনেক মনীষী বলে থাকেন, শিশুরা প্রথম শিক্ষাটা জননীর কাছ থেকে পেলেই তাদের শিক্ষার ভিত্‌টা সুদৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয়। কথাটির ভিতরে যথেষ্ট

সত্য নিহিত আছে। কচি বয়সে শিশুরা জননীকেই একমাত্র আশ্রয় বলে জানে। তখন খেলার ছলে, আদরে-সোহাগে জননী যে-ভাব বা যে-কথা সন্তানের অন্তরে গেঁথে দেন জীবনান্ত পর্য্যন্ত মানুষ আর তা ভুলতে পারে না। কিন্তু বেতনভোগী মাষ্টার সুধু গুরুগম্ভীর চালে শিশুদের সুকুমার মস্তিষ্কের উপর শিক্ষার ভার চাপিয়ে দিতে উদ্যত হন্, তাতে শিশুগণ জীবনারম্ভ থেকেই শিক্ষাটাকে একটা ভয়াবহ জিনিষ বলে মনে করে। সহজ শিক্ষা ও কষ্ট-লভ্য শিক্ষার তারতম্য সম্বন্ধে বেশি কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। যে কাজে আনন্দ আছে সে কাজ দশদিক হাসিয়ে তোলে, আর যে কাজে আনন্দ নেই, তা সুধু সকলকে দগ্ধে মারে। আমরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হই, তা এই মাষ্টারমশায়ের দ্বারা গিলিয়ে-দেওয়া শেষোক্ত শিক্ষা; তা জননীর সহজ শিক্ষার আনন্দে ঝল্‌মল্ করে' ওঠেনা। দেশের রমণীবৃন্দ অশিক্ষিত, কে সুশিক্ষা দান কর্‌বে?

সমাজ যদি পুত্র ও কন্যার শিক্ষাবিধানে এমন পক্ষপাতিত্ব না কর্‌তো, সমাজ যদি নারীর মনপ্রাণকে বিকসিত করতে এতটা কার্পণ্য প্রকাশ না করতো, এত অল্পবয়সে যদি তাদের পিঞ্জরবদ্ধ পাখীর ন্যায় অন্দরে পূরে না রাখ্‌তো, তাহলে আমাদের জাতীয়ত্ব সকল দিক দিয়ে কিছুতেই এতটা খর্ব্ব হয়ে পড়্‌তো না।

তারপর মেয়েদের বিয়ের কথা। বিয়ের কথা বল্‌তে যাওয়াও বৃথা, কেননা এ সমাজে বিবাহ-ব্যাপারে ছেলে-মেয়ের কোনো হাত নেই। বাপ-মা যার সঙ্গে যাকে গেঁথে দেবেন, সেই তার জীবন্-মরণের সঙ্গী। এই কথা নিয়ে আমরা "স্বেচ্ছা বিবাহ" নামক প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলুম। তাতে আমাদের মোটামুটি বক্তব্য এই ছিল যে, সুসন্তান জন্মাতে হলে নরনারীর—ধরে-ভদ্রে ঘটানো নয়—প্রেম-সঞ্জাত মিলনের প্রয়োজন। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসন লাভ করে'ও, নর ও নারীর মিলনে যে একবিন্দু স্বাধীনতা নেই, এ-কথা গভীর ভাবে ভেবে দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়। প্রেমের পথে এই যে বিষম বাধা, আমাদের জাতীয় জীবনের এমন ঘোরতর জড়ত্বের তাই যে প্রধানতম কারণ নয়, তা' কে বল্‌তে পারে?

অনেকে আবার বলেন, য়ুরোপীয় যে স্বাধীন বিবাহ, তা' Spiritual marriage অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা সাত্বিক বিবাহ নয়, ও-একটা চুক্তিবদ্ধ বিবাহ মাত্র; আর আমাদের যে মিলন তা' হচ্ছে আধ্যাত্মিক; আত্মায় আত্মায় মিলন—যা' জীবনের পর-প্রান্তেও অটুট থাকে। কিন্তু আত্মায় আত্মায় যে মিলন তা কি, সমাজ ধরে-ভদ্রে ঘটিয়ে দিতে পারে? সে মিলন যদি চিরন্তন, তবে পুরুষ বহুবিবাহ করে কেন? আমাদের অনেক সময় মনে হয়, এই যে আমরা আধ্যাত্মিকতার বুলি কপ্‌চাই, ওটা একপক্ষে আমাদের মানসিক দুর্ব্বলতা, অপর পক্ষে ভণ্ডামি। তারপর ঐ রকম আধ্যাত্মিকতা সমাজ-সমস্যার মধ্যে রাখ্‌তে গেলে বাঁচা চলে না; কারণ এখানে কর্ম্মকলহ আছে, জাতি-সংঘর্ষ আছে; এখানে জন্ম-মরণ, অর্থ আর স্বাস্থ্য—এরই লড়ালড়ি।

কোনো বিদেশী মহিলা আমাদের লক্ষ্য করে' একদিন একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন, এ-জাতি যে এতটা অধঃপতিত, তার প্রধান কারণ, এরা নারীর সম্মান করতে জানে না। কথাটি শুনে তখন রাগও হয়েছিল ব্যথাও পেয়েছিলুম। কিন্তু যত অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল বুঝতে পারলুম, মেম-সাহেব খাঁটি কথাই বলেছিলেন। বাস্তবিকই রমণী আমাদের চক্ষে যতটা রমণীয় বা লোভনীয়, ততটা পূজনীয় নয়। তাই যদি না হ'তো, এত অবহেলার মধ্যে, এত অবিশ্বাসের আড়ালে আমরা তাদের ডুবিয়ে রাখতুম না—আর বঙ্কিমবাবুও রমণীর বুদ্ধিকে নারিকেলের মালার সঙ্গে তুলনা করতেন না। তবু, বিদ্যাবুদ্ধি যাদের আধখানা, মনপ্রাণ যাদের সিকিখানা তারাই আধ্যাত্মিক জগতে রমণী-সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করে' রয়েছে। এমন অহঙ্কার ঘরে বসেই করা সাজে। এদেশের শাস্ত্রেই আছে—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"। কিন্তু কেন এদেশ "নরকস্য দ্বারং নারী" এমন কুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচে? "নরকস্য দ্বারং নারী" যে দেশে রমণীর কল্পনা, সে দেশ যে সমগ্র ভাবে নরকগামী, এ ধারণা কেউ পোষণ করলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি? আবার, রমণী আমাদের কাছে আখ্যা পেয়েছে 'অবলা'। কিন্তু এ আখ্যা জাতীয় জীবনের পক্ষে গৌরবময় কি?

সকলেই জানেন সংকীর্ণ ডোবা পুকুরের মধ্যে যে সকল মাছ থাকে, তারা ক্ষীণদেহী ও স্বল্প-শক্তিবিশিষ্ট হয়ে থাকে, আর যারা বৃহৎ জলাশয়ে বাস করে, তাদেরই দীর্ঘকায় ও শক্তিমন্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আমাদের সংসারেও যে যতখানি বিশালতার মধ্যে বিচরণ করে, তার দেহ-মন ততটা বিশালতা প্রাপ্ত হয়। এরি জন্যে বোধ হয় যোগী-ঋষিগণ সকল ক্ষুদ্রত্বকে দূর করে' দিয়ে একেবারে সমস্ত পৃথিবীটাকে আপনার ঘর বলে বরণ করে' নেন এবং আপন-পর বিস্মৃত হয়ে সকল জীবকে আপন উদার বক্ষে স্থান দান করেন। বাস্তবিক, যে যতখানি মুক্তির আনন্দ লাভ করে তার ততটা জীবনের স্ফূর্ত্তি।

কিন্তু কোন্ স্বার্থলাভের আশায় আমরা নারীর মুখে ঘোমটা পরিয়ে দিয়েছি? নারীর চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বাকে ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে আটক করে' রেখেচি? আমাদের এই আঁটাআঁটি বন্দোবস্তে বাঙ্গলার নারী-শক্তি প্রস্ফুটিত হয়েছে, না ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে? নারী অবশ্য সর্ব্বত্র লোভনীয়, রমণীয়, কিন্তু তাই বলে তারা ত টাকা-মোহর নয়, যে সিন্দুকবন্ধ থাকবে! তাদের প্রতি আমাদের এই যে বিচার এতে কি আমাদেরই কাপুরুষত্ব প্রমাণ হচ্চে না?

ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে' দিয়ে একটি মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র খুলে রাখলে বাইরের যত রোগের বীজাণু ঐ ছিদ্র-পথে প্রবেশ করে' ঐ ঘরেই আটকা পড়ে যায়। তেমনি আমাদের সঙ্কীর্ণ দাম্পত্য-জীবনে যে বিষই প্রবেশ করুক না, সে এমনভাবে জমে বসে যে, সর্ব্বনাশ না করে' যায় না। খোলা হাওয়ার মত জীবনের ভিতরে একটা মুক্তির প্রবাহ রাখলে জীবন স্বাস্থ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে,—তাতে-করে' ছোট-বড় সব রকমের

বিপদের সঙ্গে যোঝবার ক্ষমতা জন্মায়, নইলে একটুতেই কাবু হয়ে পড়তে হয়। বন্ধ ঘুলঘুলির মুস্কিল এই যে তার ফাঁক দিয়ে চোখ বাড়াবার জন্যে মন অষ্টপ্রহর ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। এবং ভাল-মন্দ বিচার না করে' বন্দী প্রাণী কোনোরকম একটু ফাঁক পেলেই সেই-পথের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু যে খোলা জায়গায় আছে, সে কোন্‌ পথে যাবে না-যাবে তার বিচার করবার অবসর আছে। বাধার প্রলোভন এই যে, সে-বাধাকে ঠেলে ফেলবার একটা ভয়ঙ্কর আগ্রহ হয়। নিষিদ্ধ ফলভক্ষণ করার জন্যেই আদিম নর-দম্পতির ঝোঁক অস্বাভাবিকরূপে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

আমাদের তাই মনে হয়, আমাদের অন্দর-প্রথাকে আমরা যতই মাধুর্য্যে রঞ্জিত করে' বর্ণনা করি না কেন, এবং অভ্যাসের মোহে রমণীগণ এই অন্দর-জীবনকে যতই ভাল-বাসুক না কেন, এ প্রথা জীবধর্ম্মের পক্ষে অস্বাভাবিক। এতে তারাও যেমন শক্তিহীন হয়েচে, সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষগণও সমান অনুপাতে অধঃপতিত হয়েচে।

অনেকে বলে থাকেন, নারীবৃন্দ অন্দরে আবদ্ধ থাকেন বটে, কিন্তু তাঁরা ত সেখানকার রাণী! এ কথাটা শয়তানের সেই কথার মত—It is better to reign in hell than to serve in heaven অর্থাৎ স্বর্গে অধীনতার চেয়ে নরকে আধিপত্য করা ভাল।—কিন্তু অন্তঃপুরে যে তাঁরা রাজত্ব কচ্চেন এ-কথাও সত্য বলে মনে হয় না। কারণ ছোটোখাটো ব্যাপার থেকে বড় ব্যাপার পর্য্যন্ত কোথাও যে তাঁরা স্বাধীন হুকুম চালাতে পারেন কিম্বা তাঁদের হুকুম চলে এমন তো দেখ্‌তে পাইনে।

তাছাড়া অন্তঃপুর সংসারের কতটুকু অংশ? যেমন সাপ গর্ত্তে বাস করে, কেঁচো মাটির মধ্যে থাকে, মাছ জলে বাস করে, তেমনি-ধারা রমণী অন্তঃপুরের চৌকাঠের মধ্যে বন্ধ থাকবে,—ঘোমটা খুলে বিশ্বসংসারের দিকে চাইবে না, ভগবান এমন কোনো বিধান তাদের জন্যে মঞ্জুর করে' দিয়েছেন কি? গ্রামের লোককে পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে যে সবাই ঠাট্টা করে' থাকে, রমণী-জীবনও কি তেমনি উপহাসের যোগ্য নয়? আমাদের রমণীবৃন্দও পাড়াগেঁয়ে ভূতের মতন সংসারের কোনো বিশাল চিন্তার অংশ নিতে পারেনা, কোনো দুরূহ কার্য্যের সহায়তা করতে পারেনা, কোনো মহৎ ব্যাপারে তাদের শক্তি নিযুক্ত হতে পারে না। স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীর বালকের সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে আমরা পরামর্শ করে' থাকি, একটি বয়স্কা রমণীকে আমরা তারও যোগ্য জ্ঞান করিনে। "আজ কি রান্না হোল?" "বাজার থেকে কি আন্‌তে হবে?" "খোকা স্কুলে গেছে কি না?" "গয়নাটা মনের মতন হয়েচে কি না?"—এর বেশি কোনো বিষয়ে, কিছু আলোচনা করা আমাদের রমণীর সঙ্গে সম্ভবপর নহে। অবশ্য এ-সকল কাজ প্রয়োজনীয় স্বীকার করি, কিন্তু এর চেয়ে কি বড় কাজ আর বড় প্রয়োজন আমাদের সংসারে নেই?

নারীর স্নেহ-মমতাই নাকি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। আমাদের রমণীদের যে স্নেহমমতা অত্যন্ত বেশি, তা' কারুর অস্বীকার করবার

যো নেই। কিন্তু এই স্নেহমমতার ভিতরে একটা ঘোরতর দুর্ব্বলতাও যে বিদ্যমান রয়েচে, তা সকলেই লক্ষ্য করতে পারেন। তাদের বুক-ভরা প্রেম আছে সত্য, কিন্তু সে প্রেমের স্বাধীনতা নেই, তার সঙ্গে মনের পরিপূর্ণ যোগ নেই; কাজেই তা প্রায়ই ব্যর্থতায় নষ্ট হয়ে যায়। পিতামাতা যার-তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। মেয়ের তাকে ভালবাসতেই হবে, কেননা সে স্বামী। কাউকে ভালবেসে মেয়েরা তাকে স্বামীত্বে বরণ করে না, আগে স্বামীত্বে বরণ করে, তবে ভালবাসে। এ-যেন একটা উল্টো ব্যাপার। কে না স্বীকার করবেন যে ভালবাসার রাজ্য নিতান্ত দুর্জ্জেয়? কিন্তু এই দুর্জ্জেয় রাজ্যে আমরা এক বাঁধা রাজপথ তৈরি করে' দিয়েচি—এ যেন ভগবানের উপরেও কিস্তির চাল। এইখানেই নারীর স্বাধীন প্রেমের উপর সমাজের শাসনদণ্ড সংযম-শিক্ষার ছলে সরল প্রাণের সহজ গতিকে খর্ব্ব করে' রেখেছে।

বাঙ্গলাদেশের মেয়েদের একটা প্রশংসা এই যে তারা ভারি লজ্জাশীলা। লজ্জা রমণীর ভূষণস্বরূপ। এই লজ্জার রেখা রমণীর সৌন্দর্য্যকে যে বাড়িয়ে তোলে তার ভুল নেই; কিন্তু অতিরিক্ত লজ্জায় জড়সড় হলে সৌন্দর্য্যই একটা বিসদৃশ মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। যার জন্যে অনেকে আমাদের দেশের মেয়েদের পুটুলির সঙ্গে উপমা দিয়ে থাকেন। তাছাড়া এই লজ্জার আতিশয্যে তাদের কর্ম্মশীলতার দিকটা একেবারে চাপা পড়ে গেছে। চোখ তুলে চাইতে ভয়, এক পা চলতে প্রাণ দুরুদুরু করে, মুখ ফুটে কথা বলতে কে যেন গলায় পা দিয়ে বসে! বাঙ্গলার ভীম শ্যামাকান্ত তাঁর বেগম-নামে বাঘটাকে যখন বনে ছেড়ে দিতে যান তখন পিঞ্জরটা ছেড়ে যেতে সেও যেন লজ্জায় বিনম্র হয়ে পড়েছিল—পিঞ্জরের গুণ এমনি বটে! এই লজ্জার আবরণ নারীকুলকে যে কতটা দুর্ব্বল করে' রেখেচে তা তাদের প্রতি পদক্ষেপে লক্ষ্য করা যায়। প্রতিপদে তারা পরমুখাপেক্ষী; বহিঃসংসার তাদের কাছে ভয়াবহ স্থান; তারা এত অসহায় যে একটু-মাত্র বাইরে পা দিতেই একরত্তি শিশুর চেয়েও জড়সড় হয়ে পড়ে এবং সামান্য একটু বিপদেই কাবু হ'য়ে যায়। মান-ইজ্জত থাকে না।

এই লজ্জাশীলতার দরুণ রমণীবৃন্দকে বহু অত্যাচার অসুবিধা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়;—শিক্ষার অভাবে আমাদের শ্রমজীবীগণকে যেমন অত্যাচার-অবিচার ঘাড় গুঁজে হজম করতে হচ্ছে। মুখ-ফুটে মনের কথা যেখানে বলবার পর্য্যন্ত অধিকার নেই, সেখানে আর কি গত্যন্তর আছে? যে অত্যাচার বধূ-অবস্থায় তারা সহ্য করে, পরে গিন্নী হয়ে গ্রাম্যপাঠশালায় গুরুমশায়দের মতন তারাই আবার নববধূদের উপর দিয়ে সুদে-আসলে তা আদায় করে' নেয়। ধারাবাহিকরূপে এই হিংসার বীভৎস লীলা বংশ-পরম্পরায় চলে আসচে, এবং এর যা কুফল তাও আমরা বরাবর থেকে ভোগ করে' আসচি।

অনেকের ধারণা, য়ুরোপে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকার দরুণই সেখানকার রমণীবৃন্দ সতীত্বহীন। কিন্তু এ-কথা সত্য হতে পারে না। তাদের যদি অসতী বলে মানতেই হয়, তবে তার অন্য কারণ আছে। হয় ত

তা স্বাধীনতার অপব্যবহার। কিন্তু জিনিষের অপব্যবহার আছে বলে আসল জিনিষকে লোপ করতে হবে এমন পরামর্শ কেউ দেবেন না। উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করা দরকার; কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে কাউকে রক্ষা করবার জন্যে তার চিরদিনের স্বাধীনতা অপহরণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। যে দোষী তার জন্যে শাস্তি থাকা উচিত, কিন্তু দোষ করবার সম্ভাবনা আছে বলে মানুষ ত আগে-থাকতে চিরদিন শাস্তি ভোগ করতে পারে না! তবে দোষ যাতে না হয় তার জন্যে সাবধান হওয়া উচিত বটে। সেই সাবধানতা হচ্ছে জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার করা, জীবনের আদর্শকে উন্নত করে' তোলা;—হাত-পা বেঁধে কারাগারে ফেলে রাখা নয়। য়ুরোপের রমণীবৃন্দের চিত্র অঙ্কন করলে আমরা দেখতে পাই, স্বাধীন প্রবৃত্তি অনুযায়ী তারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কচ্ছে; স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ কচ্ছে; তাদের মানসিক স্ফূর্ত্তিকে সমাজ কোনো দিক দিয়ে বাধা দিচ্ছেনা। তারা পেট ভরে খেতে পায়, প্রাণ খুলে হাস্‌তে পারে এবং বিদ্যাবুদ্ধি অর্জ্জন করতেও তাদের কোনো বাধা নেই। এইটেই স্বাভাবিক।

চিরবৈধব্য নিয়ে আমরা বেশী আলোচনা করবো না, সুধু দু-একটা কথা বলব। শোনা যায় হিন্দুর বিবাহ আধ্যাত্মিক মিলন। মিলন যেখানে আধ্যাত্মিক সেখানে কাউকে পুনর্বিবাহ কর্‌তে আমরা বলিনে, সে হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, আর যেই হোক। কিন্তু সুধু মুখে বল্‌লেই তো হবে না, বাস্তবিক-পক্ষে এটা আধ্যাত্মিক কিনা তাই আগে বিচার করে' দেখা কর্ত্তব্য। আধ্যাত্মিকের আদর্শটা খুব শ্রেষ্ঠ জিনিষ নিঃসন্দেহ, কিন্তু এই আদর্শের আড়ালে মেকি জিনিষ চালাবার যে বন্দোবস্ত, তা অতি ভয়ানক। যারা সুশিক্ষালাভ করেচে, যারা প্রাণের গভীরতম কক্ষে তদ্গত চিত্তে স্বামীর জন্যে আসন পাততে পেরেছে, যাদের চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়ে গিয়ে সন্তান-স্নেহে প্রাণ ভরপুর হয়ে রয়েচে, তারা কখনোই পুনর্বিবাহ করতে চাইবে না; কিন্তু যাদের এই গুলি অর্জ্জন করা হয়নি, বরং উল্টো অবস্থা, তাদের ভিতরে পুনর্বিবাহের প্রচলন হওয়ায় কি বাধা থাকতে পারে? বরং এই বাধার দ্বারা সমাজে অনেকরকম পাপ গুপ্তভাবে প্রশ্রয় পাচ্চে। আর আধ্যাত্মিক মিলনটা কি সুধু মেয়েদেরই বেলায়? পুরুষ অবিশ্বাসী হলে তথাকথিত আধ্যাত্মিক মিলন যখন অটুট থাকে তখন অপূর্ণমনা মেয়ের বেলায়ও তা থাকবে না কেন? এমনতর বিচার যে নিরপেক্ষ বিচার, তা আমরা স্বীকার করতে পারিনে। এ ছাড়া আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি আমাদের সমাজে চিরবৈধব্যপ্রথা বিদ্যমান থাকার দরুণ শিক্ষিত পরিবারের যতটা ক্ষতি হোক আর নাই হোক, অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর ভিতরে ব্যভিচারের সংক্রামক ব্যাধি ভয়ানক রকম ছড়িয়ে পড়েছে।

বিবাহের উদ্দেশ্য, শরীর ও মনের মিলন সাধন। নর ও নারীর শরীর-মন পরস্পরকে আকর্ষণ করে। মানব-সমাজ এই স্বাভাবিক আকর্ষণকে শৃঙ্খলা দান করবার জন্যে বিবাহের সৃষ্টি করেচে। যাঁরা কেবলমাত্র মনের মিলনকে গুরুগম্ভীর বক্তৃতায় একান্ত ভাবে উঁচিয়ে তুল্‌তে চান, তাঁরা রক্তমাংসের শরীরটাকে ভুলে গিয়ে ভয়ানক গোলমালের

সৃষ্টি কচ্ছেন। শরীরটাকেই বাড়িয়ে তুল্‌লে নরনারীর মিলনটাকে যেমন কদর্য্য মনে হয়, তেমনি একমাত্র মনটাকে উঁচিয়ে তুল্‌লেও সেটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে ওঠে।

তারপর আধ্যাত্মিক বিবাহের মাহাত্ম্য জাহির করবার জন্যে যে-সব বিধবাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে তাদের দ্বারা সেই আধ্যাত্মিকতার সম্মান কতদূর রক্ষিত হচ্চে? এ-কথা ত অস্বীকার করলে চলবে না যে বালবিধবারা ও নিম্নশ্রেণীর বিধবারা প্রায়ই শুচিতা রক্ষা কর্‌তে পারেনা। পতিতাদের মধ্যে অনুসন্ধান করলে টের পাওয়া যাবে বোধ হয় শতকরা নিরনব্বই জন আমাদের বিধবাদের ভিতর থেকেই সে-পথে গেছে। এই কলিকাতা সহরেই নাম-লেখানো পতিতার সংখ্যা চল্লিশ সহস্র। আমাদের বোধ হয় গুপ্তভাবে যারা সমাজের মুখে চূণ-কালি মাখিয়ে দিচ্ছে, তাদের সংখ্যা আরো বেশি।

বৃদ্ধাদের জীবন-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা নিষ্প্রোজন। সকল দেশেই এরা নিষ্কর্ম্মা—তবে আমাদের দেশে বার্দ্ধক্য অপেক্ষাকৃত অকালেই দেখা দেয়—এই যা তফাৎ। বেশির মধ্যে আমাদের সমাজে এইটুকু লক্ষ্য করা যায়, যে অনেক সংসারে এদের ঝি-বাঁদীর মতন খেটে মর্‌তে হয় এবং কোথাও কোথাও এরাই কনে-বৌদের উপর দিয়ে বিগত অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলে নেয়। তাদের বরাবরকার মজ্জাগত সংকীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা, ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকে এবং তারাই পুরুষদের উন্নতির পথে পাষাণ চাপা দেয়।

আর একটি বিষয়ের প্রস্তাবনা করে'ই আমরা বিদায় হ'ব,—সে হচ্ছে আমাদের রমণীবৃন্দের ধর্ম্ম-জীবনের কথা। ঢের লোক বলে থাকেন, যদি এদেশে ধর্ম্মের নামগন্ধ একটুও কোথাও থাকে, তবে সে রমণীদের ভিতরে। দেশের পুরুষগুলি স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেছে, রমণীকুলই এখনো হিন্দুয়ানী বজায় রেখেছে। আমাদের যতটুকু দেখবার সুবিধা হয়েচে, তাতে করে' বলতে পারি, যারা হিন্দুয়ানীর বড় বেশি ধুয়া ধরে, এ তাদেরই কথা। ধর্ম্ম যে কাকে বলে, তাই নিয়েই আমরা লড়াই কচ্ছি। তবু আনুষঙ্গিক ধর্ম্মকেই যদি ধর্ম্মের মাপ-কাঠি রূপে আমরা ব্যবহার করি, তাতেই আমরা দেখ্‌তে পাই, রমণী ও শূদ্র হিন্দুর শাস্ত্রে ধর্ম্মের বহু অধিকার থেকে বঞ্চিত। ব্রাহ্মণের ঘরণী পর্য্যন্ত গৃহদেবতাকে স্পর্শ করতে পারে না, ওঁ কারের স্থলে নমো না বল্‌লে তাদের পাপ-লিপ্ত হতে হয়। তাদের জন্যে যে ব্যবস্থা আছে সে ছেলেখেলার মত—ব্রত-কথা, শিব-পূজা ইত্যাদি।

এই পুতুলখেলার মত ধর্ম্মকর্ম্ম নিয়ে মেয়েরা তুষ্ট কিনা, তা তারাই জানে। সত্যই যদি তারা এইটুকুতেই তুষ্ট থাকে, তাহলে বলতে হবে তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত। কে না দেখ্‌তে পায় যে, মেয়েদের ধর্ম্মজ্ঞান চির শিশুত্বেই বিলীন হয়ে রয়েচে? তারা লেখাপড়া জানে না, অথচ সংস্কৃত মন্ত্র অশুদ্ধ উচ্চারণ করে' দিনের পর দিন সেই একই পদ্ধতিতে পূজা সেরে যাচ্ছে। এই বিস্ময় ও রহস্য পরিপূর্ণ সৃষ্টিবিধানের তারা কোনো ধ্যান-ধারণা কর্‌তে চেষ্টা করে না; সুধু নাক টিপে ধরে' হাত নেড়ে আচমন করে' কলের পুতুলের মতন তারা

ধর্ম্মসাধন কচ্ছে। এমন করে' আপনাকে ফাঁকি দিয়ে যেখানে ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা, সেখানে ধর্ম্মলাভ করা যে সম্ভবপর, আমাদের ত তা' বিশ্বাস হয় না।

এতক্ষণ আমরা আমাদের নারী-জীবনের দুর্ব্বলতার দিকটাই দেখ্‌তে চেষ্টা করেছি। অনেকে বলবেন, তবে কি আমাদের নারী-চরিত্রে কোনো সৌন্দর্য্য, কোনো মহত্ব নেই? না, এমন অন্যায় কথা আমরা বল্‌তে চাইনে। তাদের যদি কোনো শ্রেষ্ঠ সম্বল না থাকতো, তাহলে পৃথিবী থেকে তাদের অস্তিত্বই এত দিনে বিলুপ্ত হয়ে যেতো। তবে আমরা যে নারী-চরিত্রের ব্যাধির দিকটাই ফুটিয়ে তুলছি, তার কারণ বর্ত্তমান যুগে নারী-জীবনকে ব্যাধি-মুক্ত করবার জন্যে উদার আহ্বান এসেচে। পৃথিবীর সমুন্নত জাতিবর্গের পাশাপাশি আমরাও মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছি। আমরাও রোগ, শোক, দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আত্মমহিমায় পরিপূর্ণ শক্তিতে জেগে উঠ্‌তে চাচ্ছি।

অনেকে বল্‌বেন, এই যে এত কথা বললুম, এর আড়ালে খৃষ্টান-সমাজের ছবি জেগে রয়েচে। কিন্তু ভালর জাতি-বিচার নেই। খৃষ্টান-সমাজেও ঢের মন্দ আছে; কিন্তু যে সত্য, তাকে আদর করে' বরণ করতে হবে, তা সে যেখানেই থাক্। শক্তি, যদি অত্যাচারে পীড়িত হয়, তবে সে অত্যাচারের ধ্বংসসাধন করাই হচ্ছে যথার্থ সত্যের সাধনা। পুরুষ যদি স্বাধীনতায় মণ্ডিত হতে চায়, তবে রমণীকেও তাঁর অনুরূপ স্বাধীনতা দিতে হবে, এই হচ্ছে সুবিচার। অনাবশ্যক কতক-গুলি আড়ম্বরে যদি রমণী-শক্তি পঙ্গু হয়ে গিয়ে থাকে এবং দেশ ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্য-সাধন না-করে' সে যদি চির-শিশুত্বে ডুবে থাকে, তবে সেই আড়ম্বরের আবর্জ্জনা ঝাঁটিয়ে সরিয়ে ফেলাই হচ্ছে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। কেন আমাদের রমণীবৃন্দ শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত? কেন তারা ভগ্ন-স্বাস্থ্যে চিরটা জীবন যাপন করে? কেন তাদের প্রতি এত অত্যাচার, এত অবিশ্বাস, এত অবিচার?

আজ জাতীয় জীবনে নব বসন্তের হিল্লোল এসে লেগেচে—আমাদের জীবন-তটিনী সবদিক দিয়ে কানায় কানায় যেন ভরে উঠ্‌তে চাচ্চে! কে আজ অন্ধ জড়ত্বকে আঁকড়ে ধরে থাকবে?—সে যে আত্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ! যারা ডেমক্রেসিকে সমর্থন করেছে, তাদের পক্ষে কোনো দেশকে পদদলিত করে' রাখা যেমন হাস্যকর, যারা স্বায়ত্বশাসন চাচ্ছে, সমাজের অন্দরমহলে স্বাধীনতার হাওয়া বইতে না-দেওয়াও তাদের পক্ষে তেমনি উপহাসের ব্যাপার।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

জলের আল্পনা

চার

পরদিন হইতেই জয়ন্ত ইন্দুলেখার উদ্যান-রচনায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল। এবং মাসদুয়েকের ভিতরেই সে নূতন-নূতন ছোট-বড় দেশীবিলাতী নানারকমের ফুলের গাছ আনাইয়া সেই পোড়ো জমিটাকে চমৎকার একটি বাগানে পরিণত করিয়া ফেলিল।

সেদিন জয়ন্ত বাগানের এককোণে কতকগুলি কলাগাছ পুঁতিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমনসময় ইন্দুলেখা আসিয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, বাগান ত হোল,—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের মত এখানে যে পাখী-টাখি ডাকে না তার কি হবে?"

জয়ন্ত বলিল, "সে আর এমন বেশী কথা কি!"

তারপরদিনেই জয়ন্ত টেরিটিবাজারের চিড়িয়াখানা প্রায় খালি করিয়া আনিল। মণিয়া, শ্যামা, কেনেরি, টিয়া, কাকাতুয়া, নীলমন, ময়না, ময়ূর—সে যে কত জাতের কত পাখী তা আর গুন্তিতে আসে না।

তাদের কিচির্‌মিচির্‌ শুনিয়া জগৎবাবু মহা বিস্ময়ে উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। ইন্দুলেখা তখন খুসি হইয়া বালিকার মত হাততালি দিয়া নাচিতেছে!

জগৎবাবু সহাস্যবদনে আড়ালে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ইন্দুলেখার হাসি-খুসি দেখিলেন। তারপর আগাইয়া গিয়া বলিলেন,—"ইন্দু, তোমার নাচ থামাও—তুমি এখন কচি-খুকিটি নও!"

ইন্দু ছুটিয়া গিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা—বাবা, কত পাখী দ্যাখ!"

—"তাইত, এত পাখী এল কোত্থেকে?"

—"কেন, জয়ন্তবাবু আমাকে উপহার দিয়েছেন যে! তা বুঝি জাননা?"

জয়ন্তের দিকে ফিরিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "খাম্‌কা তুমি এতগুলো টাকা নষ্ট করতে গেলে কেন বল দেখি?"

—"ইন্দু যে পাখীর গান শুন্‌তে চায়!"

—"ও পাগ্‌লী যদি আকাশের চাঁদ চেয়ে বসে তুমি তাও এনে দেবে নাকি? না না, সে হবে না—তোমার কত খরচ হয়েছে বল, আমি এখনি দিয়ে দেব!"

জয়ন্ত কিন্তু তাঁহার কথা কাণেই তুলিল না।

কৃত্রিম পাহাড়ের ঝরণার সাম্‌নে পাখীদের মস্ত-একটা খাঁচা তৈরি করা হইল। তাহার ভিতরে কতক পাখী রহিল—বাদবাকি রহিল গাছে-গাছে টাঙানো খাঁচায়।

পাখীদের জন্য বন্দোবস্ত শেষ হইল—কিন্তু ইন্দুলেখার মন তবু উঠিল না। মুখ-ভার করিয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, এখন বর্ষা পড়েছে—এ-সময়ে ব্যাং না ডাকলে এ-যায়গাটা ঠিক পাড়া-গাঁ পাড়া-গাঁ বলে মনে হবে না ত!"

জয়ন্ত মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "ব্যাং ত বাজারে কিন্‌তে মেলে না ইন্দু!"

ইন্দুলেখা বলিল, "তাহলে কি হবে! আমার কিন্তু ব্যাং চাই-ই চাই!"

জয়ন্ত খানিক ভাবিয়া বলিল, "হয়েছে! গোলদিঘিতে খুব ব্যাং ডাকে! সেখানে গিয়ে ঝুলি বোঝাই করে' ব্যাং ধরে আন্‌লেই হবে,—কি বল?"

তারপরদিন বাগানে যখন ঝুলি খুলিয়া ব্যাং ছাড়া হইতেছে, অবনী আসিয়া হাজির। রাশিরাশি কোলা ব্যাং দেখিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে বলিল, "অ্যাঁ—অ্যাঁ, একি কাণ্ড!"

পাছে দু-একটা ব্যাং গায়ে লাফাইয়া পড়ে, সেই ভয়ে ইন্দুলেখা তখন একটা উঁচু জায়গায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইখান হইতেই সে বলিল, "অবনীবাবু, পাড়াগাঁয়ের মত এখানেও যাতে ব্যাং ডাকে, তারি বন্দোবস্ত হচ্ছে।"

—"কিন্তু এত ব্যাং এল কোত্থেকে?"

—"কোত্থেকে আবার! গোলদিঘি থেকে!"

—"বুঝেছি, এ জয়ন্তবাবুর কাণ্ড!"

—"না, আমি বলেছি বলেই উনি ব্যাং আনিয়েছেন; তা নইলে পাড়াগাঁয়ের ঠিক ভাবটি ফুট্‌বে কেন?"

অবনী টিট্‌কারি দিয়া বলিল, "বাঃ জয়ন্তবাবু, বাঃ! কিন্তু পাড়াগাঁয়ে সুধু ত ব্যাং থাকে না—সাপ, বিছে, বাদুড়, শেয়াল এগুলিও যে পাড়াগাঁয়ের পুরণো বাসিন্দা। তাদেরও এখানে নেমন্তন্ন করে' আনুন—নৈলে মানাবে কেন?"

জয়ন্ত একটু হাসিয়া বলিল, "মনুষ্য-সমাজে ও-জীবগুলি যে কল্‌কে পায় না অবনীবাবু! ওদের সঙ্গে আমাদের কারবার নেই—কাজেই ইন্দুলেখার বাড়ীতেও তাদের নেমন্তন্ন বন্ধ!"

—"আপনার মাথার ঠিক আছে কিনা ভেবে আমি ভয় পাচ্ছি।"

—"ভয় পাবেন না অবনীবাবু, ভয় পাবেন না—অকারণে ভয় পাওয়াটাই হচ্ছে বেঠিক মাথার লক্ষণ!"

—"আপনার সব-তাতেই মৌলিকতা! বাগান করতে চান বাগান করুন—তার মধ্যে এত ফ্যাচাং কেন মশাই! বাগান ত আমারো আছে—কিন্তু তা ব্যাঙে ভরাও নয়, এমন উঁচু-নিচুও নয়।"

—"উঁচু-নিচুর কথা বল্‌ছেন? বাগানের জমি উঁচু-নিচু করাই ত উচিত, নৈলে বাহার হবে কেন? যে-কোন ভালো বাগান বা বাগান-সম্বন্ধে লেখা বই দেখ্‌লেই আপনি সেটা বুঝতে পারবেন।"

অবনী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "বেশ মশাই, বেশ! আপনার মত আমি ত সকলবিষয়ে পণ্ডিত নই, অত-শত জানি না!"

ইন্দুলেখা এতক্ষণ চুপ্‌চাপ্ থাকিয়া সকৌতুকে দেখিতেছিল, একটা গলা-ফোলা মস্তবড় কোলা ব্যাং লুকাইবার ঠাঁই না-পাইয়া অবনীর লম্বা কোঁচার ভিতরে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছে!

সে মুচ্‌কাইয়া হাসিয়া বলিল, "অবনী-বাবু, আপনার কোঁচার ভেতরে একটা ব্যাং গা-ঢাকা দিয়েছে!"

অবনী তড়াক্ করিয়া একটা লাফ মারিয়া, পিছনে হটিয়া ঘৃণাভরে বলিল, "ছি ছি, এমন জায়গাতেও মানুষ থাকে!" সে আর

দাঁড়াইল না—বারংবার কোঁচা ঝাড়িতে-ঝাড়িতে সরিয়া পড়িল।

যাইতে-যাইতে শুনিতে পাইল, জয়ন্ত ও ইন্দু পিছন হইতে হো-হো করিয়া হাসিতেছে!

* * * * *

জগৎবাবুর বাহিরের ঘর হইতে একে একে সবাই যখন উঠিয়া গেল, অবনী তখনো নড়িল না।

জগৎবাবু ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অবনীবাবু, রাত ৯টা বেজে গেছে—আজ্‌কের মত আসর ভঙ্গ করা যাক্—কি বলেন?"

অবনী একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—দরজার দিকে খানিক অগ্রসর হইয়া গেল। আল্‌বোলার নল ফেলিয়া জগৎবাবু উঠি-উঠি করিতেছেন—হঠাৎ অবনী ফিরিয়া আসিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

জগৎবাবু অবাক হইয়া অবনীর মুখের দিকে চাহিলেন। সে বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা জগৎবাবু!"

—"বলুন।"

—"দেখুন, আমি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতি। কিন্তু সেইসঙ্গে আমি এও চাই যে, সে শিক্ষাটা যেন কুশিক্ষা না-হয়ে ওঠে!"

—"আপনি হঠাৎ এ-কথাটা তুল্‌লেন কেন বলুন দেখি!"

—"কারণ আছে। আমি যা বল্‌লুম, সেটা সঙ্গত কিনা?"

—"হ্যাঁ, খুবই সঙ্গত। কিন্তু অবনীবাবু, অসময়ে অকারণে কোন প্রসঙ্গ তুললে, তা সঙ্গত হলেও শুনতে অসঙ্গত হয়।"

—"তাহলে কারণটা শুনুন। কাল বৈকালে আমি যখন আপনার বাড়ীতে এসেছিলুম, শুনলুম জয়ন্তবাবু আপনার মেয়েকে গান শেখাচ্ছেন।"

—"বেশত, তাতে হয়েছে কি! আপনি কি মেয়েদের গান-শেখানো অন্যায় বলে মনে করেন?"

—"নিশ্চয় করি না!"

—"তবে?"

—"কিন্তু মেয়েদের অশ্লীল গান শেখালে আমি সেটা অন্যায় মনে করি!"

—"অশ্লীল গান? তার মানে?"

—"জয়ন্তবাবু আপনার মেয়েকে এমন একটা কুরুচিপূর্ণ গান শেখাচ্ছিলেন, যা কোন ভদ্রমহিলারই গাওয়া উচিত নয়!"

জগৎবাবু বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বলেন কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"এ যদি সত্য হয় তাহলে জয়ন্তের অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বল্‌তে হবে।"

—"আমি স্বকর্ণে শুনেছি জগৎবাবু—এ মিথ্যা হতে পারে না। গানটা রবীন্দ্রনাথের।"

—"রবীন্দ্রনাথের গান অশ্লীল!"

—"গানটা শুন্‌লেই আপনি বুঝতে পার্‌বেন। তার কথাগুলো এই—

"তুমি যেওনা এখনি,
এখনো আছে রজনী।
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টক তরু গহন
আঁধার ধরণী—'

—প্রভৃতি। এর মানে কি? অর্থাৎ একটা কুচরিত্রের স্ত্রীলোক তার প্রণয়ীকে

সম্বোধন করে' বল্‌ছে যে—"বলিতে-বলিতে অবনী থামিয়া পড়িল, কারণ ততক্ষণে জগৎবাবু দুইহাতে পেট চাপিয়া অট্টহাস্যের বিষম তোড়ে সোফার উপরে চিৎ হইয়া পড়িয়াছেন!

অবনী একটু থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি হাস্‌ছেন কেন?"

কিন্তু জগৎবাবুর সে হাসি কি সহজে থামিতে চায়? অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া তিনি বলিলেন, "রক্ষে পাই! এই বুঝি আপনার অশ্লীল গান?"

—"অশ্লীল বলে না-মান্‌লেও এটা সকলকেই মান্‌তে হবে যে, এ অতি কুরুচিপূর্ণ গান।"

—"আপনাদের কুরুচি-টুরুচি আমি অত বুঝি-টুঝি না মশাই! স্থানে-অস্থানে অম্‌নি কুরুচির দুঃস্বপ্ন দেখ্‌তে বলে হিন্দুরা আগে ব্রাহ্মদের যৎপরোনাস্তি ঠাট্টা কর্‌ত! এখন দেখছি কথাবার্ত্তায় কাগজে-বইএ হিন্দুরা অকারণে কুরুচি কুরুচি বলে এত-বেশী চ্যাঁচাচ্ছে যে ব্রাহ্মরাও কখনো তত জোরে চ্যাঁচাতে পারে-নি। আপনাকেও এই দলের ভেতরে দেখে আমি দুঃখিত হলুম অবনীবাবু!"

অবনী হতাশ ভাবে চেয়ারের উপরে হেলিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি আপনার মত অতটা উদার হোতে পারলুম না জগৎ-বাবু! জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আপনারাও দেখছি রবি-ঠাকুরের গোঁড়া চ্যালা হয়ে পড়েছেন—নইলে এমন বিশ্রী গানটাও—"

জগৎবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "অনর্থক তর্কে কোন লাভ নেই। আপনার বোঝা উচিত, কবিতা বল্‌তে আহ্নিকের স্তব বোঝায় না। কবিরা হাল্‌কা রসকে 'বয়কট্', করলে যৌবনের মুখ যে একেবারে বোবা হয়ে যাবে!"

অবনী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "জগৎবাবু, আমি যা বললুম তা সরল মনে সরল বিশ্বাসেই বলেছি। আপনার মেয়েকে এ-সব গান গাইতে শুনলে সত্যই আমি দুঃখিত হই! ... ... কারণ,"—অবনী থামিয়া জগৎবাবু মুখের দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত স্বরে আবার বলিল, "কারণ,—আপনার মেয়েকে ... ... আমি ... ... ভালোবাসি!"

জগৎবাবু কিছু সন্দেহ না-করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মা ইন্দুকে সকলেই অম্‌নি ভালোবাসে!"

জগৎবাবু তাহার কথার আসল মানেটা বুঝিলেন না দেখিয়া অবনী নিরাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছে—আপনার মনের কথা খুলিয়া না-বলিয়া আজ সে এখান হইতে কিছুতেই নড়িবে না! অতএব ঘরের মেঝের দিকে তাকাইয়া আবার বলিল, "জগৎবাবু, আপনি আমার কথা বুঝতে পারলেন না।"

—"কেন? আপনি ইন্দুকে ভালোবাসেন, এই বলছিলেন ত? এ আর এমন দুর্বোধ কথা কি?

মরিয়া হইয়া অবনী একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ইন্দুলেখাকে আমি তাই বিবাহ কর্‌তে চাই।"

—"কি, কি বল্‌লেন?"

—"ইন্দুলেখাকে আমি বিবাহ কর্‌তে চাই।"

কিন্তু জগৎবাবু তখনো যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। একান্ত সন্দেহের সহিত তিনি অবনীর প্রায়নাভি-চুম্বনোদ্যত দাড়ির দিকে অবাকভাবে চাহিয়া রহিলেন,—ঐ কঠোর দাড়ির মধ্য হইতে বিবাহের মত কোমল কথাটা যে বাহির হইতে পারে, এ-যেন তাঁহার ধারণাতীত!

জগৎবাবুর চাহনির ভাব দেখিয়া অবনী আরো কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ঘাড় হেঁট্ করিয়া সে বলিল, "দেখুন, আপনার মেয়েকে বিবাহ কর্‌তে চাই বলে আমি অনেক বড় সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি মুখ্যু বা গরীব নই—আমার হাতে পড়্‌লে আপনার মেয়ে বোধকরি, অপাত্রে পড়্‌বে না!"

এতক্ষণে জগৎবাবুর বিশ্বাস হইল, অবনী ঠাট্টা করিতেছে না—সত্য-সত্যই সে ইন্দুলেখাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক! কিন্তু অবনী এমন আচম্বিতে কথাটা তুলিয়াছে যে তিনি প্রথমত তাহার কিছু জবাব খুঁজিয়া পাইলেন না। মেয়ের বিয়ে ত আর মুখের কথা নয়, যে আল্‌টপ্‌কা ফস্‌-করিয়া হাঁ বলিয়া ফেলিলেই হইল! অতএব, মাথার চুলের ভিতরে আঙুল চালাইতে-চালাইতে কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ থাকার পর জগৎবাবু বলিলেন, "অবনীবাবু, এত-শীঘ্র আমি আপনার কথার জবাব দিতে পারলুম না—আমাকে দু-চারদিন ভাব্‌বার সময় দিন।"

—"বেশ—তাহলে আজ আমি আসি" বলিয়া অবনী উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আপনমনে ভাবিতে-ভাবিতে জগৎবাবু হঠাৎ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন এবং আপনা-আপনিই বলিলেন, "অবনীকে দেখলে কি তার কথা শুন্‌লে কারুর বোঝবার সাধ্যি নেই যে, তার মনটা মরুভূমির মত নয়! আজ দেখ্‌ছি সেখানেও সবুজের আঁচ আছে আর সেখানেও বিয়ের ফুল ফুট্‌তে চায়! তাইত, অবাক কর্‌লে দেখছি!"

পাঁচ

ফোয়ারার পাশে একলাটি দাঁড়াইয়া ইন্দুলেখা লালমাছের খেলা দেখিতেছিল। পিছন হইতে জয়ন্ত আসিয়া বলিল, "হ্যাঁ ইন্দু, তুমি কি চব্বিশঘণ্টাই বাগানে বসে-বসে কাটাবে? চল, আজ তোমাকে সেই নতুন গানটা শিখিয়ে দিই-গে!"

ইন্দু বলিল, "কোন্ গানটা?"

—"রবিবাবুর সেই "দখিন হাওয়া'র গান!"

ইন্দু সবেগে মাথা নাড়িয়া ভুরু কপালে তুলিয়া বলিল, "ওরে বাস্‌রে, রবিবাবুর গান? উঁহু, অসম্ভব!"

জয়ন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আবার একি দুষ্টুমি!"

ইন্দু বলিল, "দুষ্টুমি নয় জয়ন্তবাবু, দুষ্টুমি নয়! হুকুম হয়েছে রবিবাবুর গান-টান আমি আর গাইতে কি শিখ্‌তে পারব না! আপনার রবিবাবু এবার গেলেন!"

—"হুকুম! এমন হুকুম দিলেন কে? তোমার বাবা?"

—"উঁহু!"

—"তবে?"

—"অবনীবাবু।"

—"অবনীবাবু? কেন শুনি?"

—"রবিবাবুর গান নাকি অশ্লীল।"

—"এ হুকুম মান্‌বে কে?"

—"আমি। নইলে তিনি নাকি আমায় বিয়ে কর্‌বেন না"—বলিয়াই দুষ্টু ইন্দু মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে-হাসিতে সাম্‌নের দিকে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িল।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল, "তোমার হাসি থামিয়ে ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি?"

ইন্দু হাসির তোড় থামাইয়া কহিল, "বললুম ত, অবনীবাবু আমাকে বিয়ে কর্‌তে চান! বাবার কাছে তিনি নিজেই নিজের জন্যে ঘট্‌কালি করে গেছেন।"—সে আবার হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিল।

জয়ন্তের মুখ মলিন হইয়া গেল। আস্তে-আস্তে বলিল, "তার জন্যে অত হাস্‌ছ কেন?"

—"অবনীবাবুর কথা মনে হচ্ছে আর আমার হাসি আস্‌চে! কি করি বলুন দেখি জয়ন্তবাবু, লোকে আমায় ভারি বেহায়া ভাববে,—না?"—তারপরেই ফের হাসি!

জয়ন্ত কোন জবাব দিল না, বসিয়া-বসিয়া আনমনে ভাবিতে লাগিল।

আকাশের মেঘপুরীর তোরণে তখন চাঁদের মশাল ধীরে-ধীরে উস্কাইয়া উঠিতেছে; নূতন ফাগুনের ঝির্‌ঝিরে বাতাস বাগানের থর্‌থরে ফুলে-ফুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছে; এবং আমগাছের কোন্‌ ডালে একটা বন্দী-কোকিল সে বাতাসে সুদূর বনের বার্ত্তা পাইয়া উদাসপ্রাণে বারংবার ডাকিতেছে কুহু, কুহু, কুহু!

জয়ন্ত মুখ তুলিয়া দেখিল, ইন্দুর হাসি তখন থামিয়াছে—চাঁদের দিকে মুখ তুলিয়া সে চুপ-করিয়া বসিয়া আছে।

জয়ন্ত গাঢ়স্বরে ডাকিল, "ইন্দু!"

—"উঁ!"

—"তুমি যা বল্‌লে তা সত্যি?"

—"অবনীবাবুর দাড়ির দোহাই! আমার একটি কথাও বানানো নয়!"

—"তোমার বাবার মত্‌ কি?"

—"কে জানে!"

—"তুমি কি বল?"

—"কিছু নাঃ!"

—"অবনীবাবুকে তুমি কি—"

—"উঁহুঃ! বিয়ে কর্‌লে কি হবে?"

—"না, ঠাট্টা নয় ইন্দু! আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাই।"

জয়ন্তের স্বর শুনিয়া ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইল। বলিল, "কি কথা জয়ন্তবাবু?"

একদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া জয়ন্ত বলিল, "এই—তোমার—তোমার বিয়ের কথা!"

—"ও ছাই কথা থাক্‌, আমার আদোপেই ভালো লাগ্‌চে না!"

জয়ন্ত ইন্দুর একখানা হাত আপনার মুঠোর ভিতরে চাপিয়া বলিল, "অনেকসময় অনেক কথা ভালো না-লাগ্‌লেও শুন্‌তে হয়।"

জয়ন্তের হাতে হাত রাখিয়া ইন্দুর মনে হইল, জয়ন্তের হাতের আঙুলগুলি যেন কথা কহিতেছে! সে কি কথা—কি কথা? ইন্দুর বুক কাঁপিয়া উঠিল।

ইন্দুও আধ্‌ফোটা কোরকের মত নত-নয়নের দিকে তরল চোখে চাহিয়া জয়ন্ত দেখিল তাহার মুখে আর সেই চপল হাসি নাই, সে অত্যন্ত গম্ভীর।

জয়ন্ত মৃদু স্বরে বলিল, "ইন্দু, তুমি যদি আশা দাও আমি তাহলে তোমার বাবার কাছে যেতে পারি।"

ইন্দুর ঠোঁটদুখানি কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। এক-গা ঘামিয়া আড়ষ্ট হইয়া সে বসিয়া রহিল; এবং কি-এক ব্যথাভরা সুখে তাহার ছোট প্রাণ্‌খানি একেবারে ভরিয়া উঠিল।

জয়ন্ত আবেগভরে বলিল, "ইন্দু, তোমার মন জানি না; কিন্তু আমার মন সুধু তোমাকে চায়—সুধু তোমাকেই! আমার চোখের সাম্‌নে আর কেউ যদি তোমাকে কেড়ে নিয়ে যায়, তোমাকে হারিয়ে আমি তাহলে কি-করে বেঁচে থাক্‌ব?"

জয়ন্ত আশা-নিরাশায় দুলিতে-দুলিতে ইন্দুর মুখের দিকে চাহিল—সে দৃষ্টির সুমুখে লজ্জায় ভাঙিয়া পড়িয়া ইন্দু ঘাড় ফিরাইয়া আপনার বাহুমূলে মুখ লুকাইল। একটা দম্‌কা বাতাসে ইন্দুর ফুলগন্ধী চুলের রাশি উড়িয়া জয়ন্তের মুখে চোখে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ইন্দুর হাত আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া জয়ন্ত কহিল, "বল, তোমার বাবার কাছে আমি এ-কথা তুল্‌ব কিনা? যদি তোমার মত্‌ না-পাই তাহলে আজ্‌কের এই দেখা তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা!"

দুইহাতে আপনার মুখ ঢাকিয়া খুব অস্পষ্ট স্বরে ইন্দু বলিল, "জয়ন্তবাবু!"

—"বল, তুমি আমাকে বিবাহ করবে?"

জবাব দিতে ইন্দুর নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিল। তবু সে প্রাণপণে বলিয়া ফেলিল, "হ্যাঁ!"

হ্যাঁ!—এই সামান্য একটি কথায় জয়ন্তের সমস্ত মন যেন বিশ্বের নিখিল ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! আনন্দের আবেগে অধীর হইয়া সে ইন্দুর শীতল ও নরম করপুটের উপরে আপনার তপ্ত ওষ্ঠাধর রাখিয়া একটি চুম্বন দান করিল!

গগনের জ্যোৎস্না-সায়রে কালো মেঘের ভাঙন-ধরা কূলে চাঁদ তখন ঠেকিয়া আছে—সে-যেন স্বর্গ-রূপসীর নিজের-হাতে ভাসিয়ে-দেওয়া আশার প্রদীপ! চারিদিকের সুপ্ততার ঘুম ভাঙাইয়া, ইন্দুর বাগানে তখন কোকিল ও পাপিয়া এ-উহাকে হারাইবার জন্য অবিশ্রান্ত গানের ঝঙ্কার তুলিয়াছে!

ছয়

সেদিন জগৎবাবুর বাড়ীতে সন্ধ্যার আসর কিছুতেই জমিতে চাহিতেছিল না—কাজেই সকলে বাধ্য হইয়া স্বর্ণেন্দুর মুখে তাহার 'মেজমামা'র চিরন্তন কাহিনী একান্ত অন্য-মনস্ক ভাবে শুনিতেছিলেন।

স্বর্ণেন্দু মাঝে-মাঝে সিগারেটে এক-একটা জোর-টান মারিতেছে এবং সেইসঙ্গে মহা উৎসাহের সহিত বলিতেছে, "বুঝলেন কিনা কৈলেশবাবু, মেজমামার চা-খাওয়া, সে এক অবাক কারখানা! পাকা গোয়ালঘরে তিন-তিন্‌টে হাতীর মতন ন্যদুস্‌-নুদুস্‌ ভাগল-পুরী গাই বাঁধা আছে। আমি বল্‌লুম 'হ্যাঁ মেজমামা, এ গরুগুলো আলাদা ঘরে বাঁধা কেন?' মেজমামা একটুখানি মুচ্‌কে

হেসে বল্লেন, 'জানিস্ না বুঝি? এযে চায়ের গরু!'—সে গরু তিনটে যত দুধ দেয়, সব ক্ষীর করে' চায়ে ঢালা হয়। আহা, মেজমামার বাড়ীর চা—সে ত চা নয় —বুঝলেন কিনা—সে হচ্ছে সুধা, সুধা!" —বলিয়া পাইপ হইতে দগ্ধীভূত সিগারেটের অবশিষ্টটা ফেলিয়া দিয়া সে আর-একটা সিগারেট ধরাইল।

জয়ন্ত মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি সিগারেটে কাঁশীর টান দিচ্ছেন যে! বিনামূল্যে সিগারেট পেয়েছেন বলে এতটা desperate হয়ে উঠ্‌বেন না!"

লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্ণেন্দু সিগারেট নামাইয়া জয়ন্তের দিকে ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া চাহিল।

এমনসময় ঘরের ভিতরে আর-একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল; সকলেরই কাছে তাহার মুখ চেনা-চেনা বোধ হইল, অথচ কেহই ঠিক চিনিতে পারিলেন না!

জগৎবাবু দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কাকে খুঁজচেন?"

—"একি, আমাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না!"

তাহার গলার স্বরে চম্‌কাইয়া সকলেই একসঙ্গে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "অবনী-বাবু!"

কৈলাসবাবু হাঁচিবার জন্য স্তিমিত চক্ষে মস্ত-একটা হাঁ করিয়াছিলেন—কিন্তু দাড়ি-কামানো অবনীকে দেখিয়া তাঁহার হাঁচি আট্‌কাইয়া গেল—তিনি বলিয়া উঠিলেন; "অ্যাঁ! অ্যাঁ! আপনার বিখ্যাত দাড়ি-গোঁফ কার জিম্মায় রেখে এলেন?"

চিবুকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে অবনী অতিশয় করুণ স্বরে বলিল, "কামিয়ে ফেলেছি!"

—"বলেন কি! আপনার দাড়ি দেখলে সন্দেহ হোত, দাড়ি আগে না আপনি আগে জন্মেছেন—তেমন বর্দ্ধিষ্ণু দাড়িটিকে আপনি কোন্ প্রাণে নির্ব্বাসিত কর্‌লেন?"

অবনী ফোঁশ করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে কথা যেতে দিন!"

শত-শত হাসি-ঠাট্টার চোখা চোখা বাণ যে দুর্ভেদ্য দাড়ির একগাছি চুলও খসাইতে পারে নাই, কত দুঃখে এবং গূঢ় কারণে অবনী যে তাহার সেই সনাতন শ্মশ্রুগুম্ফের উচ্ছেদসাধন করিয়াছে, এ-ঘরের এতগুলি লোকের মধ্যে কেবল জগৎবাবু ও জয়ন্ত ছাড়া আর কেউ তাহা টের পাইলেন না!

* * * *

সেদিনকার মত আসর যখন ভাঙিয়া গেল, জগৎবাবু ডাকিয়া বলিলেন, "জয়ন্ত, বোসো, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।"

জয়ন্ত জিজ্ঞাসুভাবে জগৎবাবুর দিকে চাহিল।

জগৎবাবু একবার দরজার দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলেন সকলে চলিয়া গিয়াছে কিনা! তারপর গলাটা একটু খাটো করিয়া বলিলেন, "অবনীবাবু হঠাৎ কেন দাড়ি কামালেন জান?"

জয়ন্ত মৃদুমৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিল, "জানি।"

জগৎবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "জান?, আচ্ছা, কেন, বল দেখি?"

—"অবনীবাবু বিয়ে করতে চান।"

—"কি করে' জানলে তুমি?"

—"ইন্দুলেখার মুখে শুনলুম।"

—"আমার হাবা মেয়ে বুঝি তোমার কাছে কোন কথাই লুকোয় না!... ... যাক্, ইন্দুর বিবাহ নিয়েই আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।"

—"কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।"

—"বল।"

জয়ন্ত মাথা নামাইয়া বলিল, "জগৎবাবু, জানবেন আপনার মতামতের ওপরে আমার ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ নির্ভর করছে।"

জগৎবাবু খরচোখে জয়ন্তের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন,—"তাইত হে, তোমার মুখখানা হঠাৎ যে-রকম গম্ভীর হয়ে উঠেছে তাতে বোধ হচ্ছে তোমার নিবেদনটা কিছু গুরুতর। কিন্তু জয়ন্ত, তুমি ত জানই, গম্ভীর মুখ আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না—আমার কাছে সহজভাবেই নিবেদন জানালে আমি খুসি হব।"

—"আজ্ঞে, আমি ইন্দুলেখার বিবাহের কথাই বলতে চাই।"

—"ইন্দুলেখার বিবাহের কথা বলতে চাও ত মুখের ওপরে অতবড় গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামিয়েছ কেন?"

জয়ন্ত লজ্জিত স্বরে বলিল, "আজ্ঞে, একটু কারণ আছে।"

—"আবার, কারণ! যৌবনের ধর্ম্ম হচ্ছে, অকারণে আপনাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া—পদে পদে কারণ খোঁজে, বার্দ্ধক্য! কিন্তু তোমরা—একালের যুবকরা, এম্নি বুড়ো হয়ে পড়েছ যে, অকারণে কিছুই করতে জান না! তোমরা কাব্য লিখ্বে—বিবাহের প্রীতি-উপহারের জন্যে; উপন্যাস লিখ্বে—সমাজ বা ধর্ম্মতত্ত্ব বা কৃষিকার্য্য শেখাবার জন্যে; লেখাপড়া শিখ্বে—চাকরি কর্বার জন্যে! কেন রে বাপু, এত কারণ খুঁজবার দরকার কি?"

জয়ন্ত মাথা তুলিয়া বলিল, "থাক্ জগৎবাবু, আজ্কে আমার নিবেদনটা চাপাই থাক্, আর-একদিন শুন্বেন তখন!"

জগৎবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এইত বাপু, যৌবনের ধর্ম্ম আপনি ফুটে উঠল! কারণ দেখিয়ে নিবেদন জানাতে এসেছিলে, এখন অকারণে রাগ কর্লে চল্বে না ত!"

—"আজ্ঞে, আমি রাগ করি-নি ত!"

—"রাগ কর-নি কি-রকম? খুব বেশী-রকমই রাগ করেছ! নইলে, যে কথার ওপরে তোমার ভবিষ্যতের সুখ-দুঃখ নির্ভর কর্ছে—সে কথাটা না-বলেই মুখবন্ধ কর্তে চাও?"

জয়ন্ত অপ্রস্তুত হইয়া অধোবদনে মাথা চুল্কাইতে সুরু করিল।

জগৎবাবু কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর কোমল স্বরে বলিলেন, "দ্যাখ জয়ন্ত, ইন্দুকে আমাদের অবনীবাবু বিবাহ কর্তে চান—তাই ভেবেছিলুম, তোমার সঙ্গে এ-বিষয়ে কিছু পরামর্শ করব। কিন্তু এখন দেখছি তোমার সঙ্গে পরামর্শ নিষ্ফল।"

—"বলুন না, নিষ্ফল কেন হবে জগৎবাবু?"

—"নিষ্ফল হবে না? যে বিচারক, সে আসামী হোলে মকদ্দমা চল্বে কেন হে?"

—"আপনি কি বল্‌ছেন!"

জগৎবাবু জয়ন্তের ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দেখিয়া হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। তারপর জয়ন্তের একখানা হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাপু হে, বুড়োদের তোমরা যতটা 'ফ্যুল' ভাব আসলে আমরা ঠিক ততটা হাঁদা নই! তুমি কি ভাবছ তোমার মুখ দেখে আর তোমার 'নিবেদনে'র ভূমিকা শুনে আমি তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পারিনি?"

জয়ন্ত হেঁটমুখে একেবারে চুপ!

জগৎবাবু তেম্‌নি হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "পাত্র-হিসেবে অবনী যে খারাপ, তা নয়! কিন্তু তোমাকে আমি বেশী পছন্দ করি—আর মা-ইন্দুও বোধ করি তোমাকে আমার চেয়েও বেশী পছন্দ করে। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাক!"

জয়ন্তের মনের আনন্দ তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল।

জগৎবাবু বলিলেন, "অবনীবাবু বোধ হয় চটে যাবেন! কিন্তু কি কর্‌ব, ইন্দু আমার বড়-আদরের মেয়ে, তার সুখ-অসুখে দৃক্‌পাত না-করে আমি ত আর অবনীবাবুকে খুসি রাখ্‌তে পারব না!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

দিন গেল

দিন গেল, এ দিনের কোন কিনারায়
পড়িল না তোমার কিরণ,
জাগিল না তাই প্রাণ মন,
ফুটিলনা কোন ফুল, গাহিল না পাখী
দুলালী হরিণী-বধূ মেলিল না আঁখি,
অশ্ব নাহি সাড়া দিল রুদ্ধ মন্দুরায়।

দিন গেল, এ ভবনে তোমার চরণ
দিয়ে নাহি গেল পদধূলি,
তাই সব আয়োজন ভুলি,
আনমনে তাই কভু ঘরে গিয়ে পশি;
উদাসী নয়ন লয়ে আঙিনায় বসি,
দিশাহারা পরবাসী যেন সমীরণ!

দিন গেল, মোর কাণে তব কণ্ঠস্বর
ঢালিয়া ত দিলনাক সুধা,
উপাসীর মিটিল না ক্ষুধা,
হায়, মালা-জপা মোর হ'লনাক আজ,
আরতি-বিহীন বৃথা গেল ভোর সাঁঝ,
অঙ্গিনে বসিয়া, ধ্যানে নাই অবসর!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

হাসি

(গল্প)

তাহাকে যেই দেখে সেই বলে—"আহা বেশ মেয়েটি ত।"

আমার কিন্তু মনে হয় যে, সে 'বেশের' চেয়েও একটু বেশী ভাল। তাহার সুদীর্ঘ পল্লবযুক্ত বড়-বড় চোখদুটি এমন স্বপ্নময় ভাবে ঢলঢল, ছোট ছোট সুগঠিত অধরৌষ্ঠ-দুখানি এমন হাসি হাসি, আর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণখানি এমন স্বাস্থ্য-লাবণ্যপূর্ণ যে অনেক সুরূপা গৌরীকে ফেলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

তাহার দিদিমার চোখে ত সে অদ্বিতীয় সুন্দরী,—তিনি ডাকেন তাহাকে রূপসী বলিয়া। কিন্তু আসল নাম তার সুগুণা। কি গুণের পরিচয় পাইয়া তাহার দাদা-মহাশয় অন্নপ্রাশনকালে সেই অবাক্‌দন্ত দশমাসের শিশুটির নাম দিয়াছিলেন সুগুণা, তাহা জানিনা; তবে কালে তাহার এ নাম সার্থক হইয়াছে। ঘর-বাহির তাহার গুণের পরিচয়ে মুগ্ধ। পিতার আর কেরাণী রাখিতে হয় না,—যত তাঁহার চিঠিপত্র সে টাইপ করিয়া দেয়; মায়ের জমাখরচ সেই রাখে; দিদিমাকে সে বাঙ্গলা পুস্তক পড়িয়া শুনাইয়াই পরিতৃপ্ত নহে, অবসর-সময়ে ইংরাজি উপন্যাসের তর্জ্জমা করিয়াও শুনায়। রন্ধনেও তাহার হাত ভাল। এমন কি, বালিকার হাতে তৈরি মিষ্টান্নের একবার যিনি আস্বাদ পাইয়াছেন, তাহার লোভে আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়াও যাচিয়া দ্বিতীয়বার তিনি মুখুয্যেবাড়ীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। গানবাদ্যেও বালিকা পটু, সে সঙ্গীত-সঙ্ঘের একজন ছাত্রী। এখন সে-কাল গিয়াছে! নব্যশিক্ষিত সমাজের ত কথাই নাই;—মেয়ে জন্মিবামাত্র পিতামাতাকে তাহার লেখাপড়া ও গানবাজনা শিক্ষার খরচটা আগে হইতে ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়; কিন্তু ঘোর হিন্দুসমাজেও আজকাল মেয়ের গানবাজনা-শেখাটা দোষণীয় নহে, বরঞ্চ প্রশংসনীয়—কারণ ইহা সুপাত্র লাভের একটি উপায়। দরকারের নিকট আইনকানুন আপনা হইতে শিথিল হইয়া পড়ে।

কিন্তু বালিকার সকল গুণের সেরা গুণ—তাহার কোমল প্রকৃতি, তাহার আত্ম-গর্ব্বহীন সরলতা। সদাবিকাশিত মিষ্ট হাসিতে, অমায়িক সহজ কথাবার্ত্তায় তাহার মনের এই রূপটুকু আত্ম-অজানিত কি সুমধুর ভাবেই বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে!

দিদিমা কিছু-কিছু সংস্কৃত জানেন; তিনি তাহাকে শুনাইয়া যখন-তখন আওড়ান—

"পয়সা কমলম্ কমলেন পয়ঃ,
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ।
মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি,—
মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।" ইত্যাদি।

ইহার ভাবার্থ এই, জলে যেমন পদ্ম, পদ্মে যেমন জল এবং উভয়ের সম্মিলনে সরোবর যেমন শোভা পায় সেইরূপ তাহার নাতনীটির রূপ তাহার গুণকে, এবং গুণ রূপকে ফুটাইয়া উভয়ে মিলিয়া তাহার আধারকে সুশোভিত করিতেছে। দিদিমার

প্রশংসায় নাতনীটি হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে—কিন্তু গর্ব্ববোধ করেনা।

শ্রীকৃষ্ণের শতনাম। আর-কিছুতে না হউক, এই আদর্শে বালকবালিকার নামের পশ্চাৎ একাধিক নেজুড় টানিয়া—আমরা যে ভক্তজাতি ইহার প্রমাণ দিতে পারি না কি? বাঙ্গালী-ঘরে বোধ হয় এমন ছেলেমেয়ে নাই যাহার একাধিক নাম না আছে। আমাদের নায়িকাটিও যে এ সম্বন্ধে বর্জ্জিত-বিধির মধ্যে গণ্য নহেন—তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। কিন্তু উল্লিখিত দুই নাম ছাড়া তাহার আরও একটি নাম আছে। বালিকা সদাহাস্যময়ী বলিয়া পিতা তাহার নাম দিয়াছেন হাসি।

ভাবে অনুভাবে বালিকার পক্ষে এ নামটি এত সঙ্গত যে ক্রমশ ইহাই তাহার ডাকনাম হইয়া পড়িয়াছে।

হাসির হাসিটি তাহার বাপমার নিকট কি সুমধুর! দিদিমার নিকট কি বিশ্ব-বিমোহিনী! তাহার প্রিয় আত্মীয়স্বজন সখা-সখীদিগের নিকটও অতি সুন্দর। তথাপি ইহার শোভা বাদানুবাদবিবর্জ্জিত, সর্ব্ববাদী-সম্মত নহে। মেয়েছেলের মুখে সারাদিন এমন হাসি কাহারও-কাহারও মনে বড় বাড়াবাড়ি অশোভন বলিয়াই ঠেকে।

আশ্চর্য্য নাই! যে পঞ্চভূতের সমষ্টি এই মানব তাহার সর্ব্বপ্রধান ভূত কি? আমি ত বলি তাহার ভেদ-বুদ্ধি! স্বয়ং ভগবানের অস্তিত্ব লইয়াই যখন নানামুনির নানামত; আমি আছি-বা নাই ইহাতেও যখন মতভেদ তখন হাসির হাসিটুকুতেও যে কেহ-কেহ চন্দ্রের কলঙ্ক দেখিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

সত্যই হাসি না হাসিয়া কথা কহিতে পারে না—বা না হাসিয়া গম্ভীরভাবে কাহারও কথা সে শুনিতে পারে না। এইরূপে শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের মধ্যে রসিকতার কোনো প্রচ্ছন্ন প্রয়াস লুক্কায়িত না থাকিলেও সে অকারণে হাসে; আর কারণ থাকিলে ত কথাই নাই, প্রফুল্ল কমলের মত হাসিতে সে ঢলিয়া পড়ে। অতএব এত হাসি সকলের সহ্য হইবে এমন আশা করা যায় না।

কিন্তু শ্বশুর-গৃহ তাহার এই হাসি সহ্য করিবে কি না আপাততঃ এই চর্চ্চাতে দু-একজন প্রৌঢ়া হিতাকাঙ্ক্ষিণীর অতি-দুঃখেতেও বেশ সুখে সময় অতিবাহিত হইতেছে। নিজের মেয়ের কালোরূপ এবং বধূর ঘুমটধারী গুমট-মুখের প্রতি হতাশ নয়নে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক গোপনে যাঁহার যতই দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া ওঠে মুখে ততই সজোরে তিনি বলেন—"মেয়েছেলের রূপ লইয়া আর কে ধুইয়া খায়?" প্রিয়সখী অমনি পাল্টা উত্তরে যখন ধুয়া ধরেন —"তা তো বটেই, মেয়েছেলের "স্বভাবটাই" আসল, তোমার-আমার বৌয়ের মুখে কি কেউ কখনো হাসি দেখতে পায়?" তখন হাস্যে ভাষ্যে প্রসঙ্গটা উত্তরোত্তর অতিরিক্ত-মাত্রায় জমিয়া ওঠে।

কিন্তু ঘরের মধ্যেই এই আন্দোলন আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। হাসির পিতা-মাতাকে এ সম্বন্ধে সাবধান করাটা তাঁহারা একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন।

দিদিমা কিন্তু এরকম অযাচিত উপদেশে জ্বলিয়া যান। রাগিয়া বলেন—"বিধাতা আগে বর গড়িয়া তবে কনে সৃষ্টি করেন। হাসির বরকে মুগ্ধ করিবার জন্যই হাসিকে তিনি এমন

হাসি দিয়া গঠিত করিয়াছেন।" হাসির পিতা, তাঁহার মাতারই একেলে সংস্করণ,—তাঁহার মনের গঠন মাতারই অনেকটা অনুরূপ; তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সংস্কৃত মাত্র। তিনি এরূপ উপদেশে রাগেন না, হাসিয়াই বলেন—"দরকার না থাকিলে হাসির হাসি আপনিই সংযত হইয়া আসিবে, সেজন্য আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই।" মা কিন্তু কথাটাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না মনে-মনে ইহার সারবত্তা মানিয়া লইয়া মেয়েকে সাবধান হইতে শিক্ষা দেন। মেয়ে যখন উত্তরে সানুনয়ে বলে—"আচ্ছা মা আমি আর হাসব না।"—এবং কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়াও থাকে তখন মা কিন্তু দুই চক্ষে অন্ধকার দেখেন।

তবে নক্ষত্রের অন্তরে মহাবিপ্লব না ঘটিলে তাহার জ্যোতিহীনতা যেমন ক্ষণস্থায়ী সেইরূপ হাসির হাসিও মাতার সাদর উপদেশ ভুলিয়া কিছু পরে মেঘমুক্ত জ্যোতির ন্যায়ই পুনঃপ্রকাশিত হইয়া মাতার ক্ষোভের কারণ দূর করিয়া দেয়।

এইরকম করিয়া হাসি-খুসীর মধ্যেই হাসি আঠার বছরের মেয়েটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহার এখনো বিবাহ হয় নাই। বড় কি নূতন কথা! নব্য-সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া,—ঘোর হিন্দু সমাজেই বা কয়জন পিতা আজকাল অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাদানে গৌরীদানের পুণ্য লাভে কৃতকৃতার্থ!

অতএব আমি কৈফিয়েৎ-আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া উপন্যাসলেখকের জয়পতাকা উড়াইলাম! পতাকা পত-পত-শব্দে কি বলিতেছে শোন :—

"জয় ঔপন্যাসিকের জয়! এখন আর বাঙ্গালী-ঘরে বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা বা প্রেম-পরিণয় লেখকের কল্পনামাত্র নহে, ইহা ঘরের কথা, দৈনন্দিন ঘটনা।" আমিও পতাকার সহিত সমস্বরে নিজের জয়ধ্বনি গাইয়া পুনরায় সগর্ব্বে বলিতেছি অষ্টাদশ বর্ষীয়া হাসি এখনো অবিবাহিতা।

সুরূপা, সুগুণা, ধনী পিতামাতার স্নেহের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা হাসির আর-কিছুরই অভাব নাই, অভাব কেবল একটি সুপাত্রের। সংসারে সাধারণ মিল সহজে মিলে, অসাধারণের মিল পাওয়াই দুর্ঘট; এই কারণেই বোধ হয় তাহার এখনো বিবাহ হয় নাই। অথচ তাহার বরের যে নিতান্ত অভাব তাহাও নহে; হাসির রূপ-গুণের সমজদার বিস্তর। প্রচুরতা বশতঃই সম্ভবতঃ তাহার মধ্য হইতে কোনো-একটিকে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া পিতামাতার পক্ষে এতটা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের চোখে যাহার রূপ লাগে তাহার গুণের অভাব হয়, যাহার রূপগুণ দুইই দেখিতে পান, ধনমর্য্যাদায় অথবা বংশমর্য্যাদায় সে খাট হইয়া পড়ে; আর যে ছেলেটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে হাসির যোগ্যবর বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাকে জামাতা করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, কেননা হয়ত বা সে ভিন্নবর্ণ অথবা ভিন্ন গোত্র।

এইরূপে ছাঁট্‌ছোট্ বাদ্‌সাদ্ দিয়া তবুও দুইটি পাত্র তাঁহাদের হাতে আছে। দুই-জনের মধ্যে বিধাতা কার ভাগ্যে হাসিকে লিখিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন।

একজন ধনীপুত্র, কিন্তু পাশের যাচাইয়ে তাহার বাজার-দর কম। ইউনিভারসিটি পরীক্ষায় পাশ অপেক্ষা ফেল-নম্বরই তাহার অধিক। অথচ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধিরও অভাব নাই, অভাব কেবল সেই উদ্যমটুকুর—সেই প্ররোচনার—যাহার বলে সাধারণতঃ আমাদের দেশের অনেক স্বল্পবুদ্ধি ছেলেও বুদ্ধিমান বনিয়া যায়। চাকরি-করার সেই তাগাদাটুকু বিজনকুমারের ছিলনা বলিয়াই বুঝি তাহার বুদ্ধিতে উদ্যমের যোগাযোগ ঘটিতেছিল না।

আর একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান; ২৪ বৎসরের মধ্যেই ডাক্তারির শেষ-পরীক্ষা দিয়াছে—পাশ যে হইবে তাহা একরূপ স্থিরনিশ্চয় তবুও তাহার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—কেননা নিজের ভাগ্য তাহাকে নিজেই গড়িয়া লইতে হইবে; ইহাতে বাধাবিঘ্ন বিস্তর।

হাসির মাতার তাই ইচ্ছা ধনীপুত্র বিজনকুমারকেই জামাতা করেন। পুত্র সুরেনের সে হৃদয়বন্ধু; সেই তাহাকে প্রথমে এখানে আনে। বিজনকুমার দেখিতে ভাল, কথাবার্ত্তাতেও বিনয়ী, আর হাসির পিতার দিকের একটা কি দূর-সম্পর্কের দাবীতে কাকিমা-সম্বোধনে যখন-তখন কাছে আসিয়া তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের অনেকখানি সে অধিকার করিয়া লইয়াছে।

শরৎকুমারও তাঁহাদের অনুগত, ছেলে-বেলা হইতেই যাওয়া-আসা করে, কিন্তু পড়াশুনার চাপে অনেকদিন হইতেই সে বড় বিব্রত; সুতরাং তাহার অবসর কম। তথাপি সে এখানে একেবারে যে আসে না এমন নহে, কিন্তু যাহার টানে আসে তাহাকে সে প্রায়ই কর্ত্তার ঘরে দেখিতে পায়, সেই জন্যই বিশেষতঃ অন্তঃপুরে তাহাকে আর বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যেখানে অধিক ইচ্ছা সেইখানেই প্রায় সফলতায় বিলম্ব দেখা যায়। তাই রক্ষা—নহিলে উপন্যাসলেখকের বড় দায় হইয়া উঠিত। বিজনকুমারের সহিত হাসির বিবাহেও একটি বিষম বাঁধা ঘটিয়াছে। বরপক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে কোনই প্রস্তাব আসিতেছে না। তাহার বাপের ইচ্ছা বি-এটা পাশ করিলেই তাহাকে বিলাত পাঠাইবেন আর যতদিন না পাশ করে ততদিন তাহার বিবাহ দিবেন না। কিন্তু বিজনকুমার কাকিমার কাছে ঘরের অনেক কথা বলিলেও একথাটা চাপিয়া গিয়াছে। হাসির মাতা ভাবেন বিজনকুমারের ত এদিকে টান দেখিতেছি, লজ্জায় সম্ভবতঃ সে এবিষয়ে আপনা হইতে বাপকে কিছু বলিতে পারে না। কিন্তু ছেলে যখন ভাল, সর্ব্বতোভাবে মনোমত, তখন গর্ব্ব করিয়া তাহাদের প্রস্তাবের জন্য বসিয়া থাকাটা নির্বুদ্ধিতার কার্য্য। বড়মানুষের ছেলে, কাল শুনিব তাহার বিবাহ হইয়া গেছে। তিনি সেইজন্য কর্ত্তাকে ক্রমাগত তাড়া দেন যে, "চেনাশুনা ঘর, বরের বাপের সঙ্গে তোমার একটু সম্পর্কও আছে; তুমিই আপনা হইতে কথাটা ওঠাও।"

কর্ত্তা ফিলজফার লোক, অতএব অলস-প্রকৃতি, কোনো কাজে তাঁহাকে ভিড়ান বড় সহজ নহে। যতক্ষণ তিনি অন্যকাজ করিবেন ততক্ষণ তাঁহার দর্শনতত্ত্ব লেখায় ব্যাঘাত ঘটিবে। তাঁহার মতে মানুষের যাহা দরকার তাহা সহজেই মেলে, তাহার জন্য

অতিরিক্ত প্রয়াস অনাবশ্যক। যদি সহজে বিজনকুমারকে পাওয়া যায় ত ভাল, আর না পাওয়া যায় তাহাও মন্দ নহে, শরৎকুমার ত আয়ত্তের মধ্যেই রহিয়াছে।

এ রকম মনের গঠন বেশ সুখের সন্দেহ নাই, তবে অনেক সময় দুঃখেরও কারণ হইয়া ওঠে। এজন্য সময়-সময় গৃহিণীর নিকট তাঁহার বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই উপভোগের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা বশতঃ গৃহিণীর সকল অনুরোধ, সকল ভারই তিনি যেরূপ বিনাবাক্যব্যয়ে শিরোধার্য্য করেন, সেইরূপই দ্বিধাহীন চিত্তে অন্যের স্কন্ধে তুলিয়া দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। গৃহিণীর অনুরোধ-পালনের ভারটি চুপে-চুপে বন্ধুবর হেমচন্দ্রের মাথায় চালাইয়া আপনি নিশ্চিন্ত মনে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদাভেদ-রহস্য-নির্ণয়ে নিযুক্ত হইলেন। গৃহিণী কিন্তু একথা জানেন না, জানিলে সম্ভবতঃ অন্য চেষ্টা দেখিতেন।

কর্ত্তাবাবু একটি অনতিবিস্তৃত গৃহে ছিন্ন কাগজ-বেষ্টনীর মধ্যে, একটি ছোট টেবিলের নিকটে বসিয়া কাগজের পর কাগজে নানা ফিগার আঁকিয়া—জিওমেট্রির সাহায্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মবাদ প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। বৃত্ত বা লাইন—যাহা জগতের সার-নিদর্শক তাহা বিন্দুর সমষ্টি বই আর কিছু নহে,—ইহাই বিশ্বকোষ, অথচ এই বিন্দুগুলি স্বস্ব-প্রধান; বৃত্তের মধ্যে ইহার প্রভাব অসীম কিন্তু তফাৎ করিয়া লও ইহা বিন্দু-মাত্র; অতএব পরমাত্মাতেই জীবাত্মার এবং জীবাত্মাতেই পরমাত্মার বিকাশ। বহুদিন ধরিয়া এই তত্ত্ব নির্ণয় জন্য তিনি 'ফিগার' আঁকিতেছেন; কিন্তু এই জড়চিত্রে জ্ঞানময় আত্মার প্রতিষ্ঠা দ্বারা কিরূপে বিপক্ষ-যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করিবেন তাহার ভালরূপ মীমাংসা হইতেছে না। আজ তাঁহার মাথায় সেই তত্ত্বের উদয় হইয়াছে। শব্দ-শাস্ত্রের সাহায্যে ওঁ শব্দ দ্বারা বহুকাল হইতে এই সত্য প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে হঠাৎ এই জ্ঞানে তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। জিওমেট্রির ফিগার লেখা কাগজগুলি সব ফেলিয়া দিয়া একখানা নূতন কাগজে দেব-নাগরী অক্ষরে ওঁ শব্দটি বেশ বড় ছাঁদে তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় গৃহিণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কই সে বিষয়ের কি হোল?"

বাধা পাইয়া কর্ত্তা বড়ই আহত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাগ-প্রকাশের সাহস নাই, কাগজের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়াই বলিলেন "কোন্ বিষয়ে?"

"ভুলে গেছ নাকি?"

কর্ত্তার অক্ষরের একটা দিক একটু ধ্যাবড়া হইয়া পড়িল; তিনি একটু অসংযত স্বরেই বলিলেন—"আঃ ভুলব কেন? তবু বল না?"

"গিয়েছিলে কি, বিজনের বাপের কাছে?"

এইবার কর্ত্তা অক্ষর হইতে মুখ তুলিয়া গৃহিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার যাওয়াটা কি ভাল দেখায়? হেমকে ভারটা দিয়েছি!"

"হেমকে ভার দিয়েছ ?" গৃহিণী রাগিয়া গেলেন—"ঠিক জুড়িদারটিই বটে !"

"না—আমাকে সে কথা দিয়েছে—কাজটা হাসিল করে তবে অন্নজল গ্রহণ করবে। তুমি একটুও ভেবোনা—"

"দেখ, মেয়ে বড় হয়ে উঠলো—তোমার—"

কর্ত্তা অধীর হইয়া পড়িলেন, সানুনয়ে বলিলেন—"দেখ গিন্নি—একটা মস্ত প্রমাণ আমার মাথায় এসেছে, লক্ষ্মীটি তুমি এখন—"

"তুমি কি ক্ষেপলে ? মেয়ে বড় হয়েছে তার জন্য ভাবনা নেই—কেবল—"

"তোমার দুটি পায়ে পড়ি—"

"দেখ আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরব—"

"আঃ জ্বালালে তুমি ! আচ্ছা বল কি করতে হবে ? বলে ফেলো।"

"তোমার ঐ কাগজগুলো কিন্তু আমি ছিঁড়ে ফেলব।"

কি জানি কথাটা গৃহিণী কার্য্যেই যদি পরিণত করিয়া বসেন ! কর্ত্তা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ে হাস্যমুখে বলিলেন—"কি করতে হবে বলই না, কোন্ কথাটা বল দেখি তোমার না শুনি ?"

"হ্যাঁ শোন বটে, কিন্তু এক কান থেকে অন্য কানে আর পৌঁছয় না। আর-কিছু তোমার করতে হবেনা, তুমি নিজে গিয়ে বিজনের বাপকে একবার নেমতন্ন করে এস।"

"শুধু-শুধু নিমন্ত্রণ ! ক্ষেপলে নাকি ?"

"তা শুধু-শুধু কি নিমন্ত্রণ করতে নেই ! খোকা পাশ হয়েছে—তাই যেন আহ্লাদ করে খেতে বলছ, আপনার জন ত সে তোমার, এতে আর দোষ কি ?"

"তা বেশ তাই হবে। আগে কিন্তু এই লেখাটা শেষ করতে দাও। নইলে যতক্ষণ এটা না শেষ হচ্ছে—ততক্ষণ বেশীক্ষণ ধরে কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা কওয়াটা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

কর্ত্তা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ফলটা ভাল হইল না ; গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "আমি চল্লুম তবে। তুমি যে-রকম জ্বালাচ্ছ কিরোসিনের তেলে জ্ব'লে দেখছি আমাকে ঠাণ্ডা হতে হবে।"

গৃহিণীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কাগজ-পত্র ফেলিয়াও কর্ত্তার উঠিতে হইল। তাড়াতাড়ি তাহাকে ফিরাইয়া তিনি সাদরে বলিলেন—"রাগ করোনা আমার যাদুটি, তোমার চোখে আগুন দেখলেই যে আমার প্রাণে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়—"

গৃহিণী যখন বাঁকা-নয়নে চাহিয়া একটু হাসিলেন, তখন আশ্বস্ত হইয়া কর্ত্তা আবার বলিলেন—"আচ্ছা আমি একটা কথা বলি শুনবে ?"

"চিরদিনই ত শুনে আসছি।"

"একেই ত বলে লক্ষ্মীটি ! আচ্ছা বিজনকে যদি নাই পাওয়া যায় তাতে এমনি কি ক্ষতি ! শরৎ ত আমাদের হাতেই রয়েছে—এমন গুণবান ছেলে আর কোথায় পাবে বল। এমন অল্পবয়সেই ডাক্তারির শেষ-পরীক্ষা দিয়েছে—আর পাশও—"

গৃহিণীর আর ধৈর্য্য রহিল না—"বুঝেছি বুঝেছি—এইজন্যেই তুমি বিজনের বাপের সঙ্গে দেখা করতে চাও না,—এই অভিপ্রায়েই তুমি এতদিন আমাকে ঠকিয়ে আসছ। তোমার ভাল ছেলে তোমার থাক্

—আমি কিন্তু অমন গরীব ছেলেকে মেয়ে দেব না—আমার প্রাণ থাকতে ত নয়ই,—এ ঠিক জেনো।"

গৃহিণী রাগিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ত্তা যে ইতিপূর্ব্বেই শরৎকে কন্যাদান করিবেন বলিয়া একরূপ কথা দিয়াছেন সে কথাটা তাঁহাকে বলিতে কর্ত্তার আর সাহসে কুলাইল না!

(২)

হাসির পিতামাতা নিজেদের ইচ্ছার ভারেই ভারাক্রান্ত করিয়া কন্যার ভাগ্য তৌল করিতে ব্যস্ত। হাসির ইচ্ছারও যে এ তৌলদণ্ডে অন্ততঃ একটুখানিও স্থান হওয়া উচিত, একথাটা তাঁহাদের মনেই পড়ে না। উপন্যাসলেখক ছাড়া সাধারণ সকল বাঙ্গালীরই পক্ষে বোধ হয় ইহা বিস্মৃতির বিষয়। আমি কিন্তু অনেকবার হাসির মনের কথাটি ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু পারি নাই। বাস্‌রে মেয়ে কি চাপা! যতই কেন একথা পাড় না, তাহার হাসি দিয়াই সেটাকে সে চাপিয়া ধরে। আজকাল কার মেয়েদের সরলতার অর্থে যদি কেহ ভাবেন যে সে মনের কথাটি সকলের কাছে খুলিয়া ধরিবে তবে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করিবেন। হয়ত বা আমিও তাহাকে ভুল বুঝিয়াছি—হয়ত বা তাহার ভিতরে প্রেমের আঁচড় এখনো পড়ে নাই, নয়ত বা নিজের মনের গোপন ভাব নিজেই সে বোঝে না—বুঝিবার অবসর ঘটে নাই। তাহা নহিলে কি এমন সরল ছেলেমানষি হাসিটুকু সর্ব্বদাই তাহার মুখে ফুটিয়া থাকিত! কে জানে? সে যে কাঁদিতে জানে, সেইদিন কিন্তু জানিতে পারিয়াছি। তখন সে পিতার ঘরে যাইতেছিল, মাতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনিয়া দ্বারদেশে বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল। শুনিল—"অমন গরীব ছেলেকে কখ্‌খনো মেয়ে দেবো না!" শরৎকুমার মাতার এতদূর অবজ্ঞাভাজন! ছি ছি! সজোরে তাহার মাথায় যেন লৌহদণ্ডের আঘাত বাজিল। বেদনায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কেহ দেখিবার পূর্ব্বেই সে নিজের ঘরে আসিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। * * *

সেদিন তাহার সঙ্গে যাইবার দিন নহে। সেতারের পুরাতন গৎগুলা সে অভ্যাস করিতে বসিল। মা একবার এঘরে আসিয়া তাহাকে বাজাইতে দেখিয়া আর ডাকিলেন না, নিজেই রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। দাসী আসিয়া বিজুলি-বাতির কলটা টিপিয়া দিয়া সন্ধ্যা-বাতি জ্বালিয়া গেল। হাসি অন্যমনে সেতারে ঝঙ্কার তুলিতে লাগিল,—কিন্তু বাজনাটাকে সে আজ কিছুতেই সুরে ঠিক করিতে পারিল না। গৎগুলা সুরে তালে কেবলি বেসুরা-বেতালা বাজিতে লাগিল। সেতারটার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক হইয়া হাসি একটুখানি বিরক্তির হাসি হাসিল, তাহার পর উঠিয়া পাশের গাড়ীবারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের আস্তাবলের দিক হইতে একটা আনন্দসঙ্গীতের হিল্লোল কানের মধ্য দিয়া তাহার প্রাণে গিয়া পৌঁছিল।

পূর্ণিমার ভরা চাঁদখানা আকাশের এক প্রান্তে উঠিয়া সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী আলোকে ভরিয়া দিয়াছিল। বাগানের বকুল-গাছ ঝাউগাছ ও আমগাছের ছিদ্রের মধ্যে

আর আলোক-অন্ধকারে ভেদ ছিল না। একটা কোকিল আমগাছের ডালে বসিয়া উষার আগমন-গীতিতে সন্ধ্যাকে আহ্বান করিতেছিল। আর হাস্নুহানার সুগন্ধ—জোয়ানীর হৃদয়মথিত আনন্দসঙ্গীতের সহিত মিলিয়া পূর্ণিমার আলোকময়ী রজনীকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল।

জোয়ানী হাসিদের সহিসের বোন; বয়স ২০ বৎসর; দুই চারিদিনের মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। এতদিন সে ভাইয়ের নিকটেই আছে,—এইবার নিজের ঘর করিতে যাইবে। সে চুলার উপরে হাঁড়ি চাপাইয়া নীচে কাঠ দিতে-দিতে গান ধরিয়াছিল—"সঁইয়া পরদেশে, পরসিনো,—ধৈরয কৈসে ধঁরু মৈ।"

বিরহের গানটা মিলন-সঙ্গীতের ন্যায়ই তাহার কণ্ঠ হইতে আনন্দ ধ্বনিত করিতেছিল। হাসি বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া—আর সকল কথা ভুলিয়া গিয়া লুব্ধকর্ণ পাতিয়া গানটি শুনিতে লাগিল; সেই সঙ্গীতের আনন্দস্পর্শ বসন্ত-সমীরের ন্যায় তাহাকে পুলকিত করিয়া তুলিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "হাসি?"

হাসি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"শর-দা—তুমি?"

"একটা সুখবর দিতে এসেছি!"

"সুখবর! বল বল?"

"কি দেবে আগে বল?"

"কি চাও তুমি?"

"না কিছু না।—আমি পাশ হয়েছি।"

হাসি আনন্দে করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল—"পাশ হয়েছ! কি মজা! বাবাকে বলেছ?"

"না এখনো বলিনি—তবে তিনি জানেন। গেজেটে বার হবার আগেই কাল এ খবর পেয়েই তাঁকে জানিয়েছি।"

"আমাকে বল্লে না কেন—কাল?"

শরৎ স্ত্রীলোকের মতই অপ্রতিভ-ভাবে একটু মৃদুমধুর হাসিয়া উত্তর করিল—"কাল ত তোমাকে সে ঘরে দেখলুম না—আর তোমার বাবার সঙ্গে অন্য কথাও একটু ছিল।"

"আচ্ছা বেশ বেশ! কিন্তু মাকে বলেছ?"

"না এখনো বলা হয়নি।"

"তবে আমি যাই—এখনি খবরটা দিয়ে আসি।"

"না একটু দাঁড়াও—আর একটা কথা আছে।"

"কি?"

"আমি বিলাত যাচ্ছি!"

"কবে?"

"হপ্তাখানেকের মধ্যেই, জাহাজ ঠিক হয়ে গেছে।"

"এত শীঘ্র?"

"দেরী করে লাভ কি? যত শীঘ্র গরীব নামটা ঘোচে সেই ত মঙ্গল।"

বিকালের ঘটনাটা সে এতক্ষণ একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল শরতের কথায় তাহা মনে পড়িয়া গেল। শরৎ কি তবে কোন-রকমে মায়ের মনের ভাবটা টের পাইয়াছে নাকি! লজ্জায় তাহার হাসি মুখখানি মলিন বিবর্ণ হইয়া পড়িল। আপনা হইতে চোখ দুটি আনত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া দেখিল—দেয়ালের কোণে যে একটি ঘাসের ফুল অন্যের চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া ফুটিয়া ছিল, শরৎ সেটিকে আবিষ্কারপূর্ব্বক তুলিয়া লইয়া টবের ফার্ণের পাতার সহিত বাঁধিতেছে; বন্ধন-রজ্জু তাহার গলার ছিন্ন উপবীত-সূত্র।

তোড়া বাঁধা হইলে শরৎ হাসির দিকে সাগ্রহে চাহিল। ইচ্ছা, তোড়াটি তাহাকে উপহার দেয়। কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলে, বলি বলি করিয়া আর মুখ ফোটে না; ইতিমধ্যে হাসি ফুলটি অধিকার করিয়া লইয়া বলিল—"এস শর-দা—তোমাকে পরিয়ে দি।"

শরতের মনের কথা মনেই রহিয়া গেল। হাসি নিজের কাপড়ের একটা পিন খুলিয়া লইয়া তাহার কোটে ফুলটি আটকাইতে আটকাইতে বলিল—"কবে ফিরবে শর-দা?"

"জানিনা। সম্ভবতঃ বছর তিনেক পরে!"

"চিঠি লিখবে?"

"যদি বল।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

"তবে লিখব।"

"লিখবে?"

"লিখব।"

"তিনসত্যি?"

"হ্যাগো হ্যাঁ।"

ফুল পরাইয়া হাসি হাত সরাইয়া লইয়া বলিল "শর-দা গান শুনছ? কেমন লাগছে!" জোয়ানীর আকাশস্পর্শী বিরহসঙ্গীত মৃদু কোমলতর সুরে তখন নামিয়া পড়িয়াছিল।

শরৎ সে কথার উত্তর না দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এখনি যেতে হবে হাসি।"

"এখনি কেন যাবে? আর ত 'পাশের' পড়া পড়তে হবে না তোমার। দেখেছ শর-দা কেমন চাঁদ উঠেছে?"

"একটি কথা বলব?"

"বল না শর-দা—"

"তুমি চাঁদের চেয়েও সুন্দর।"

"কি যে বল তুমি!"

"বলবার অধিকার পেয়েছি হাসি। তোমার বাবা বলেছেন, তাঁর আপত্তি নেই।"

"কিসে?"

"বুঝতে পারছ না হাসি?"

হাসির এবার লজ্জায় মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু মায়ের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

শরৎ বলিল—"কিন্তু তুমি বল হাসি?"

"কি বলব?"

"তোমার ইচ্ছা আছে কি না?"

"কেন বাবা ত বলেচেন!"

"বাবা ত তোমার মনের কথা বলেন নি; তুমি বল হাসি!"

হাসি চুপ করিয়া রহিল। শরৎ আগ্রহভরে তাহার হাত-দুখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া তাহাতে তাহার সমস্ত প্রাণ-মন ঢালিয়া বলিল—"বল হাসি, তুমি বল; আকাশের ঐ আলোভরা চাঁদের দিকে চেয়ে বল তুমি—তোমার ইচ্ছা আছে। বল বল; এস আমরা এই শুভ মুহূর্তে দুজনের কাছে দুজনে শপথ করে—বলি—"

হাসি শরতের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাত-দুখানি ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া বলিল—"না, শর-দা।"

শরতের উচ্ছ্বাস-আবেগময় সুখস্বপ্ন কঠোর

বজ্রের ধ্বনিতে সহসা যেন ভাঙ্গিয়া গেল! সুধা চাহিতে নিষ্ঠুর দেবতার নিকট একি প্রাণঘাতী গরল লাভ করিল সে! শরৎ মুমূর্ষুর ন্যায় কাতরকণ্ঠে কহিল—"বলবে না?"

"না।"

"কেন হাসি?"

"জানিনা।"

শরৎ বুঝিল, ইহা হাসির সবিনয় অস্বীকার-বাক্য।

তাহার যেন সমস্ত শক্তি অবসিত হইল; আতকষ্টে সে বল সঞ্চয় করিয়া কহিল—"বেশ হাসি! বিদায় তবে,—আর দেখা হবে কি না জানিনা।"

শরৎ চলিয়া গেল। জোয়ানীর গান তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; পূর্ণিমার স্বচ্ছ আলোক একখণ্ড কালো মেঘের মধ্যে সহসা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; আর হাসির প্রফুল্ল হাসিখানি তাহার মনের দারুণ অন্ধকারের মধ্যে অতি অস্বাভাবিকভাবে মিলাইয়া পড়িয়াছে। যখন পরমুহূর্ত্তে সে পুনরায় হাসিবে—তখন কি পূর্ব্বের সরল স্বাভাবিক আনন্দদীপ্তিতেই সে হাসি ফুটিয়া উঠিবে? কে জানে!

শরৎ চলিয়া গেল। হাসি গাড়ী-বারাণ্ডার থামে ভর দিয়া মূর্ত্তিমতী বেদনার ন্যায় শূন্য কাতর দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় একজন কে অপরিচিত পথিক মার্জ্জিত সুকণ্ঠে তান ছাড়িয়া গাইয়া গেল—

"মনে রইল ও সই মনের বেদনা!
প্রবাসে যখন যায় গো সে—
তারে বলি বলি আর বলা হোল না!"

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

য়ুরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের গতি

শিল্প-বাণিজ্যে খুব দ্রুত উন্নতি জর্ম্মানিতে যেমন হইয়াছে আর কোনো দেশের ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলেনা। ফরাসির সহিত লড়াইর পর হইতেই ইহাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। জর্ম্মান রাষ্ট্রনীতি-বিশারদগণ তখন দেখিতে পাইলেন যে, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উন্নতিসাধন করা প্রয়োজন, নতুবা দেশের বৈষয়িক সমস্যা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিবে। জর্ম্মানির হাটে প্রতিবেশীদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হইত;—ইংলণ্ড জোগাইত কাপড়, ফ্রান্স জোগাইত রেশম ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি।

কিন্তু কোনো দেশের পক্ষেই এতাদৃশ অবস্থা ভাল নহে। দেশের শিল্প ও বাণিজ্য আর কাহারো হাতে দিয়া কেবল কৃষি-কর্ম্মে মন দিলে না-হয় সে দেশের কৃষির উন্নতি, না-হয় অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা। জর্ম্মানি যদি তাহার প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্য নিজে প্রস্তুত করিয়া লইতে না পারিত, যদি কলকারখানা স্থাপন করিয়া দেশের খনিজ পদার্থ ও নানা-

বিধ ক্ষেত্রজাত ফসল হইতে তাহারা নিজেরাই আবশ্যকীয় পণ্য প্রস্তুত করিবার সুযোগ না পাইত তাহা হইলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যাকে আজ কি পালন করা সম্ভব হইত? বিগত চল্লিশ বৎসরে জনসংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা জর্ম্মানির আদমসুমারিতে দেখা যায়;—১৮৭১ সালে জনসংখ্যা ছিল চারি কোটি, আর, ১৯১৪ সালে হইয়াছে সাড়ে ছয় কোটি। এই বিপুল জনসংখ্যার ভরণপোষণ স্বদেশী শিল্পোদ্ধার ব্যতীত কখনই সম্ভব হইত না। স্বদেশে জীবিকার্জ্জনের পথ খোলা না থাকিলে দেশবাসীকে অন্যদেশে গিয়া কুলী-মজুরের কাজ করিতে হয়। জর্ম্মানি হইতে ১৮৮৫ সালে ১৭১,০০০ জন জর্ম্মান বিদেশে গিয়াছিল, কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র কলকারখানা স্থাপিত হইতে সুরু হইলে এই সংখ্যারও হ্রাস হইল; ১৮৯৮ সালে ২২,৯২১ জন জর্ম্মান বিদেশে গিয়াছিল। ঘরে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান থাকিলে কে স্বদেশ পরিত্যাগ করে? আজ জর্ম্মানি তাহার শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের দ্বারা দেশের প্রায় অধিকাংশ লোকের ভরণ-পোষণের উপায় করিয়া দিয়াছে এবং দেশের বৈষয়িক অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। কেমন করিয়া এত অল্প সময় মধ্যে ইহা সম্ভব হইল ইহাই বিস্ময়ের কারণ। আরো আশ্চর্য্য এই যে, জার্ম্মান রাষ্ট্রনীতিবিশারদগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, কৃষি অবহেলা করিয়া শিল্পোন্নতির দিকে ঝোঁক দেওয়া কোনো দেশের পক্ষেই কল্যাণকর নহে। ইহারা দেখিলেন ইংলণ্ড একদিকে ঝোঁক দিতে গিয়া, সে দেশের সমস্যাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষা না করিয়া দেহের বৃদ্ধি ঘটিলে তাহা যেমন অস্বাভাবিক হয়, তেমনি জাতীয় জীবনের এক বিভাগের সঙ্গে অপর বিভাগের একটি যোগ রক্ষা না করিলে অনর্থের কারণ ঘটে। জর্ম্মানি সহরে সহরে কলকারখানা বসাইয়াছে, রাইন্ নদীর দুই কূলে দেখিতে দেখিতে শিল্প ও বাণিজ্যের নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান ও বহু আয়োজন স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু কৃষককে গ্রাম হইতে টানিয়া আনে নাই। সেইজন্যই কৃষি শিল্পকে কাঁচামাল জোগাইয়াছে আর শিল্প কৃষিকে লাভের অঙ্ক দেখাইয়া উৎসাহিত করিয়াছে। এই দু'য়ের যোগেই জর্ম্মানির আর্থিক উন্নতি এত দ্রুত এবং সম্পূর্ণ আকার ধারণ করিতে পারিয়াছে।

অবশ্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য ভিন্ন ইহা কখনও সম্ভব হইত না। য়ুরোপের আর কোনো রাষ্ট্র কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিবার জন্য এত যত্ন লয় নাই। তরুণ শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার নিমিত্ত ১৮৭৯ সালে জর্ম্মানি 'অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিল। তারপর পাছে কোনো এক বিশেষ দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া অপর কোনো অঙ্গের পরিণতির ব্যাঘাত ঘটে সেই দিকে জর্ম্মান অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণের সজাগ দৃষ্টি ছিল। প্রিন্স ফন্ বিউলোর বই (Imperial Germany —Prince von Bulow) হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"We had to proceed like a clever doctor, who takes care to maintain all the parts and functions of

the body in a strong and healthy condition and who takes measures in good time if he sees that the excessive development of one single organ weakens the others— অর্থাৎ শরীরের ভিতর-বাহির সকল যন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখা এবং কোনো বিশেষ অঙ্গের অস্বাভাবিক পরিণতি দ্বারা অপর অঙ্গ দুর্ব্বল হইলে সময়-মত তাহার প্রতিকার করা যেমন বিচক্ষণ চিকিৎসকের কাজ, আমাদেরও তেম্‌নি দেখিয়া-শুনিয়া, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া চলিতে হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মানির হাটে-বাজারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পণ্য-দ্রব্য বিক্রয় হইত। অপর দেশে পাঠানো দূরে থাকুক জার্ম্মানি তাহার নিজের প্রয়োজনই মিটাইতে পারিত না। কিন্তু আজ পৃথিবীর হাটে-বাজারে জার্ম্মান পণ্য আর সকলকে হার মানাইয়াছে; ইংলণ্ডের নিকট হইতে সে যেমন খরিদ করে আবার তাহার কাছে জর্ম্মানির প্রস্তুত জিনিষ-পত্তর বিক্রয় করিয়া থাকে। বহির্বাণিজ্যের হিসাবে জার্ম্মানি আজ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ পঁচিশ হাজার মিলিয়ন্ মার্ক (২০ মার্ক=১৫৲) আর জার্ম্মানির উনিশ হাজার।

ইংলণ্ড একদিন মনে করিয়াছিল ল্যাঙ্কেশায়ারের বস্ত্র না হইলে পৃথিবীর লজ্জা দূর হইবে না। কিন্তু সে স্বপ্ন সত্য হইল না। জর্ম্মানির তুলা নাই, তবু সে তুলা আমদানী করিয়া কাপড়ের মিল বসাইল। ১৮৬৪খৃষ্টাব্দে জর্ম্মানি ২২০,০০০ মণ তুলা খরিদ করিয়া কাপড় বোনে এবং ১৯০৪ সালে আমদানী তুলার পরিমাণ হইল ১০,২১০,০০০ মণ। ১৮৮৩ সালে মিলের সূতা ও কাপড় রপ্তানি করিল;—তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইল ৩, ৬০০, ০০০ পাউণ্ড, কিন্তু ১৯০৫ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯,০০০,০০০ পাউণ্ডে আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অবশ্য এখনও জর্ম্মানির মিল ল্যাঙ্কেশায়ারের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ১৯১৩ সালে জর্ম্মানি ইংলণ্ড হইতে ১২,৮১৬,৮৬৭ পাউণ্ড মূল্যের সূতার ও পশমের কাপড় খরিদ করিয়াছে;—কিন্তু, স্যাক্‌সনির উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি জর্ম্মানি ইংলণ্ডের কাছে বিক্রয় করিয়াছে ১০, ১৩৩, ৭৯২ পাউণ্ড মূল্যের।

অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই, পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। ইহা স্মরণ রাখিলেই হইল যে জর্ম্মানি এখন নিত্য-ব্যবহার্য্য পণ্য-দ্রব্যের নিমিত্ত অপর কোনো দেশের দিকে তাকাইয়া থাকেনা। কারখানায় যে কাঁচা মালের আবশ্যক তাহা যতদূর সম্ভব দেশের খণি হইতে, বন হইতে ও উন্নত কৃষি-প্রণালীর সাহায্যে স্বদেশের মাটি হইতে জর্ম্মানি সংগ্রহ করিয়া লয়। তারপর, পৃথিবীর চারিদিক হইতেও কম কাঁচামাল্ জর্ম্মানি খরিদ করেনা। ১৯১১ সালে কারখানার প্রয়োজনার্থ ৫, ৩৯৬ মিলিয়ন্ মার্ক মূল্যের (কুড়ি মার্ক পনর টাকা) কাঁচামাল জর্ম্মানি খরিদ করিয়া ৫, ৪৬০ মিলিয়ন্ মার্ক মূল্যের পণ্য দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে জর্ম্মানির সফলতার কারণ কি? প্রথমতঃ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে

কলকারখানা প্রস্তুত করিতে এবং বাণিজ্য-ক্ষেত্রের বহু সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইতে যে সময়, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল জর্ম্মানিকে তাহা করিতে হয় নাই; এই কারণে জর্ম্মানির কিছু সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু আসল কথা, জর্ম্মানিতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা যেমন বিস্তার লাভ করিয়াছে, আর কোনো দেশে তাহার দৃষ্টান্ত নাই। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, জর্ম্মান কারখানার মজুর ইংলণ্ডের মজুর অপেক্ষা শিক্ষিত। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিতে পারে এইরূপ শিক্ষা পায় বলিয়া ইহাদের কাছ হইতে পুরোপুরি কাজও পাওয়া যায়। রসায়ণ-শাস্ত্রের ব্যবহার বল, কলকব্জা নির্ম্মাণ বল, উন্নত কৃষি-প্রণালী বল, সমস্ত বিষয়ে দেশবাসীকে শিক্ষিত করিবার জন্য জর্ম্মান রাষ্ট্র সচেষ্ট। জার্ম্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক বিভাগের সহিত দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; শিল্প-সম্বন্ধীয় নানা সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য জর্ম্মান পণ্ডিতগণ ছাত্রদের লইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন্ এবং শিক্ষাকেন্দ্রের সহিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এইরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই জর্ম্মানির জাতীয় শিল্পোন্নতির গাঁথুনি এমন পাকা।

তারপর রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ত আর অন্ত নেই। ১৮৭৯ সালে অবাধ বাণিজ্য-নীতি পরিহার করা হইল; ইহার ফলে তরুণ শিল্প চারিদিকের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঘাত হইতে রক্ষা পাইয়া বাড়িবার সুযোগ পাইল, সন্দেহ নাই। এইরূপে, যে জার্ম্মানি কেবল চাষবাসের উপর নির্ভর করিত, যে দেশের হাটে-বাজারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের তৈজসপত্র পুরোপুরি দখল করিয়া বসিয়াছিল, সেই জার্ম্মানি নিজের দেশে নিজের লোক খাটাইয়া নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল আর স্বদেশের হাট-বাজার হইতে নানাবিধ বিদেশী পণ্য বিদায় দিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, অধিকন্তু বিদেশীয় বাজারে জার্ম্মানি প্রস্তুত মালপত্তর পাঠাইয়া বিপুল বাণিজ্যের সূত্রপাত করিল।

তখন য়ুরোপের মধ্যে রুসিয়ার হাট ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানি মনে করিল ইহার বিপুল জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহারাই জোগাইবে, কিন্তু য়ুরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের যে-গতি জার্ম্মানিতে কাজ করিয়াছে, তাহার বেগ রুসিয়ায়ও আসিয়া পৌছিল।

রুসিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতবর্ষের ন্যায় বিদেশী পণ্য হজম করিবার ক্ষমতা তাহারও আছে; সেইজন্যই এই দুই দেশের হাট-বাজার দখল করিবার জন্য শিল্পপ্রধান জাতিসমূহের মধ্যে এত চেষ্টা।

রুসিয়ার ধন-সম্পদের সীমা নাই,—বিস্তৃত জমি, অসংখ্যক খনি, বিপুল জনসংখ্যা সমস্তই আছে, নাই জর্ম্মানির মতন রাষ্ট্রব্যবস্থা, নাই ধনী-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশোন্নতির জন্য আগ্রহ।

কিন্তু তবুও য়ুরোপীয় শিল্প সভ্যতার ডাকে ইহাকে সাড়া দিতে হইয়াছে। জার্ম্মানির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রুসিয়াও কলকারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইল, দু-পাঁচটা করিয়া খনি খনন করা সুরু হইল, আর, শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য রুস ছাত্র জার্ম্মানির ও ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভীড় করিল।

তারপর, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শিল্প-জগতের নায়কেরা মনে করিত, রুসিয়া য়ুরোপকে চিরকাল তাহার বন হইতে কাঠ-খড় জোগাইবে, খণি হইতে কয়লা, তেল, লোহা তুলিতে দিবে আর তাহাদের প্রয়োজন হইলে মাঠ হইতে কিছু ফসলও রপ্তানি করিবে। ইহার পরিবর্ত্তে এই সুবৃহৎ সাম্রাজ্যকে কাপড়, ঔষধপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাহারা জোগাইবে। বস্তুত ইহাই প্রকৃত অবস্থা ছিল, কিন্তু জার্ম্মানি যেমন ম্যানচেষ্টারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কাপড়ের কল বসাইল, রুসিয়াও বস্ত্রাদির জন্য ম্যানচেষ্টার ও ল্যাঙ্ক্‌সনির উপর নির্ভর না করিয়া স্বদেশে কারখানা স্থাপনের উদ্যোগী হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সমস্ত রুসিয়ায় ১৪,০৬০ কারখানা ছিল এবং যে পরিমাণ মাল প্রস্তুত হইত তাহার মূল্য ৩৬,০০০,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু, বিশ বৎসর পরে মোট কারখানা হইল ৩৫,১৬০ এবং ইহা হইতে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের মূল্য ১৩১,০০০,০০০পাউণ্ড।

রুসিয়ার শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ লক্ষণ এই দেখা গিয়াছে যে, গত শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের ও জার্ম্মানির মূলধনে রুসিয়ার অনেক কারখানা স্থাপিত ও পরিচালিত। রুসিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা যাহাই থাকুক না, বিদেশী মূলধনের গতিবিধিকে ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব নহে। সেইজন্যই রুসিয়ায় পশম-বোনার শিল্প জার্ম্মানির ও বেলজিয়মের কলওয়ালারা স্থাপন করিয়াছে; উৎকৃষ্ট সুতা-কাটার শিল্প ইংরেজ কলওয়ালাদের হাতে; খণি হইতে তেল, কয়লা, তুলিবার মূলধন তাহাও আসিয়াছে বিদেশ হইতে; ইহা ঠেকাইয়া রাখিবার উপায় নাই। বিদেশী মাল-পত্তরের উপর শুল্ক বসাইয়া স্বদেশী শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য রুসিয়ার গভর্ণমেণ্ট কম চেষ্টা করে নাই। কিন্তু, এমন একটি বাধার সৃষ্টি করিলেই ত হয় না, বর্দ্ধিষ্ণু শিল্পের পুষ্টিসাধনের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় সাহায্য চাই—যেমন সাহায্য জার্ম্মানি দেয়।

আজ রুসিয়ায় বাহিরের জিনিষ অপেক্ষাকৃত কম আমদানী হয়। একসময় ইংলণ্ড হইতে প্রচুর পণ্যদ্রব্য রুসিয়া খরিদ করিত, আজ সে-দেশ হইতে কলকব্জা ও কয়লা ব্যতীত আর বিশেষ-কিছু আমদানী করে না। কলকব্জাও কিছু-কিছু স্বদেশেই নির্ম্মাণের চেষ্টা হইতেছে। চাষ করিবার উৎকৃষ্ট লোহার লাঙ্গল উরল অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানিও হইতেছে। খণি হইতে লোহা উঠিতে থাকিলে কলকব্জার জন্যও রুসিয়াকে অন্য দেশের দিকে তাকাইতে হইবে না। অবশ্য এখনও রুসিয়ার আমদানী রপ্তানির তুলনায় চৌদ্দগুণ হইবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায় যে তাহারা নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বদেশেই প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য উদ্যোগী। আজ তাহাকে একথা বলা চলে না, তুমি চাষ-বাস কর, ফসল উৎপন্ন কর, আর কাঁচামাল আমাদের দাও। আমরা তোমার জামা-কাপড় ঔষধ-পত্র, কলকব্জা ইত্যাদি যাবতীয় শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহ করিব। কেন্দ্রীভূত শিল্প ও বাণিজ্যের দিন চলিয়া গিয়াছে;—এমন কোনো বৈধয়িক নীতি নাই যাহা অনুসরণ করিলে সে দিন ফিরিয়া আসিবে। আর, এই

decentralisation of Industries এর দিনে চিরকাল কেবল কলকারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পজাত প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য পৃথিবীর হাটে-বাটে বিক্রয় করিবে, কোনো জাতি এমন আশা করিতে পারে না। যাহারা শিল্প-বাণিজ্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিল আজ তাহাদের দৃষ্টান্তে সকল জাতিই সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপে প্রত্যেক জাতি তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজেরা প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়াই ত ইংলণ্ড ও জর্ম্মানি এসিয়ার হাট দখল করিবার জন্য জাহাজ বোঝাই করিতে সুরু করিল এবং এই জাহাজ রক্ষার জন্যই প্রস্তুত হইল রণতরী।

কিন্তু এসিয়াও ত একেবারে নিদ্রিত নাই। এখানেও স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইতেছে এবং য়ুরোপীয় পণ্যদ্রব্যের দাসত্ব-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য এসিয়ার প্রত্যেক সভ্য জাতিই যতদূর সম্ভব আয়োজন করিতেছে।

বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মডেল

বাংলায় মডেলের প্রতিশব্দ যে কি হওয়া উচিত আমরা তা খুঁজে পাইনা। অনেকে 'মডেল' শব্দের বাংলা করেছেন "আদর্শ;"

মিসেস নাইটের আসল চেহারা।

কিন্তু শিল্পীর মডেল বল্লে যা বোঝায় তা ঐ আদর্শ কথাটির মধ্যে পুরোপুরি পাওয়া শক্ত। ঐ জিনিষটার চলন আমাদের মধ্যে ছিল না বলেই বোধ হয় ওর উপযুক্ত শব্দ পাওয়া যায় না। আমরা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য প্রভৃতিতে দেখতে পাই যে, বিরহীরা পরিকল্পনার সাহায্যে সুদূর প্রবাসে বসে পরস্পর পরস্পরের আলেখ্য চিত্র করে' তাঁদের বিরহ বেদনা দূর করবার চেষ্টা করচেন বটে, কিন্তু সাম্‌নে মডেলকে বসিয়ে ছবি-আঁকার কথা কোথাও বড়-একটা পাওয়া যায়না। ইউরোপীয় শিল্পীদের কাছ থেকে তাঁদের শিল্পের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে আমরা মডেলের সন্ধান পেয়েছি। ইউরোপীয়দের মতে চিত্রকরের ভাগ্যে যদি মডেলের মত মডেল অর্থাৎ ঠিক যে-ভাবের চিত্র আঁকা দরকার সেই

"দো-মনা" ছবিতে মিসেস নাইট

ভাবের মানুষটি মেলে তাহলে তাঁর আর ভাল ছবির পরিকল্পনা করতে বড়-বেশী ভাবতে হয় না,—মডেলের গুণেই ছবি দিব্যি উৎরে যায়। ইউরোপীয় চিত্রকরেরা তাই মডেলের মর্ম্ম ভালরূপই বোঝেন। তাঁরা বলেন কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য্য থাকলেই যে ভাল মডেল হয় এমন নয়, অন্তরের রূপ-গুণ থাকাও দরকার—বিশেষ-করে শিল্প-রসেরু সহজ অনুভূতিটি। একশোর মধ্যে কুড়িটি এমন যোগ্য মডেল মেলে কিনা সন্দেহ। সত্যই এমন মডেল খুব অল্প আছে, যারা প্রকৃত পক্ষে শিল্পীর হাতের শুভ্র লেখ্য-পটখানিকে সার্থক করে তুলতে পারে।

বিলাতে এক লণ্ডন সহরেই নানান শ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন হাজার হাজার লোক আছে যাদের মডেল হওয়াই জীবিকা-উপার্জ্জনের একমাত্র উপায়। এদের মধ্যে

কেউ-কেউ খুব ভাল বংশের ; আবার কেউ-কেউ সাধারণ লোকের ছেলে বা মডেলেরই ছেলে,—যারা শৈশবে মাতৃমূর্ত্তির মডেলের কোলে খোকার মডেল রূপে চিত্রকরের চিত্রশালায় প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করে ক্রমে বেড়ে উঠে, শিল্পীদের সংসর্গে থেকে শেষে ওস্তাদ-মডেলরূপে পরিণত হয়।

এমনও দেখা যায়, কোনো কোনো চিত্রকরের কোন-একটি বিশেষ ব্যক্তিকে মডেল-

কোনো বিখ্যাত মডেল
যিনি "গ্রেফতার" চিত্রে স্থান পাইয়াছেন

রূপে না পেলে তাঁর মাথা একেবারে খোলেনা—এমন-কি; সেই বিশেষ মডেলের চেয়ে অনেকগুণে দেখতে-শুনতে ভালো বা তাঁর সেই বিশেষ বিষয়টির উপযোগী চেহারার লোক পেলেও তিনি নিজের সেই পুরাতন মডেল না-হলে কাজ করতে পারেন-না।

যাঁরা কিছুকাল ধরে শিল্পীর মডেলরূপে কাজ করেন, তাঁদের দ্বারা জগতে অপর কোনো উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বিলাতে যদি কোনো অকর্ম্মণ্য বালিকার দেহের মধ্যে কোথাও বিশেষ কিছু সৌন্দর্য্য থাকে তাহলে শিল্পীর চিত্রশালায় অনায়াসেই সে স্থান পায়। যদি কোন বৃদ্ধের বা যুবকের চেহারার মধ্যে দৃঢ়তা, কুটিলতা, সরলতা, ক্রোধ বা এম্‌নি-একটা-কিছু স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব থাকে, তাহলে তার আর অন্নচিন্তার বিশেষ ভাবনা থাকেনা।

নট ও নটীদের সঙ্গে মডেলের তফাৎ এই যে, একটি বিশেষ ভাব বা ভঙ্গী যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিল্পীর আঁকা শেষ না হয় ততক্ষণ মডেলকে একই ভাব ধারণ করে' থাকতে হয়, আর অভিনেতাকে ক্রমাগত একটার-পর-একটা ভাব বা ভঙ্গী দেখিয়ে চলতে হয়। মডেল হতে হলে আত্মবিস্মৃত হয়ে চিত্রকরের পরিকল্পনার মধ্যে এম্‌নি তলিয়ে যাওয়া দরকার যে বোধ হবে, যেন সে চিত্রকরের জন্যে কোন ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই—যেন সে সত্যসত্যই সেই চিত্রবর্ণিত আসল নায়ক বা নায়িকা। উপকথায় আছে কোনো ছেলে ব্যাঙ্‌ ভাবতে ভাবতে শেষটা সত্যি-সত্যিই ব্যাঙ্‌ হয়ে পড়েছিল, মডেল হওয়া অনেকটা তাই। এই তদ্গত ভাবটি অল্প মডেলই স্থায়ীভাবে অধিকক্ষণ ঠিক ধরে রাখতে পারে। কোনো মডেল বিলাতের এক ব্যক্তির কাছে গল্প করেছিলেন যে, একবার তাঁকে কোনো চিত্রকরের কাছে মডেল হতে হয়েছিল। সেই ছবির বিষয়

গ্রেফ্‌তার

ছিল কোনো ভদ্রমহিলা তাঁর সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য এক প্রণয়াভিলাষীর দিকে অবহেলা ও ঘৃণাভরে দেখচে! এই ভাবটি যাতে মডেলের মুখে বরাবর সজাগ থাকে তার জন্যে শিল্পী ক্রমাগতই বল্‌তে লাগলেন— "ও লোকটার দিকে ঘৃণার সঙ্গে চাওয়া কেন? ও তোমার ঘৃণারও যোগ্য নয়!" এই কথা শুনতে শুনতে সত্যই মডেলের নাক সিঁটকে উঠতে লাগল এবং চোখের পাতা নেমে পড়ল এবং তিনি যে মডেল মাত্র, আসল সেই মহিলা নন, একেবারে তা ভুলে গেলেন!'

মডেলদের সম্বন্ধে নানান মজার গল্প প্রচলিত আছে। একটা গল্প শোনা যায়, একজন শিল্পী যুদ্ধ-বিগ্রহের ছবি আঁকতে ভালবাসতেন, কিন্তু তাঁর সমঝদারেরা বলতেন যে, তাঁর হাতে যুদ্ধ-বিগ্রহের ভীষণ ও কঠোর ভাব ভালো ফোটেনা। তিনি কিন্তু নিজে কথাটা মানতেন না, তাই যুদ্ধের এই ভীষণ ও কঠোর ভাব নিজের কোনো চিত্রে ফোটাবেন বলে তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প করে বসলেন। তিনি স্থির করলেন, একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের ছবি আঁকবেন। কিন্তু তার জন্যে উপযুক্ত মডেল তো পাওয়া চাই? অনেক সন্ধানের পর

তিনি এমন দুজন লোকের খবর পেলেন যারা কোনো কারণে প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয়ে পূর্ব্বেই একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে বলে স্থির করেছিল। শিল্পী সুযোগ বুঝে তাদেরই মডেল করবেন মনে-মনে স্থির করলেন এবং তাঁর ছবি আঁকবার ঘরে সব সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকে, উভয়কে একই কালে চুপি-চুপি নিমন্ত্রণ করলেন। যথা-

মিস্ গ্যারাওয়েরআসল চেহারা

সময়ে তারা সশস্ত্র সজ্জায় দুজনে দুই বিপরীত দরজা দিয়ে তাঁর চিত্রশালায় প্রবেশ করেই সহসা পরস্পরকে দেখতে পেয়ে রাগে জলে উঠল—তারপর একেবারে দ্বিরুক্তি না করেই বাঘের মত দুজনেই দুজনকে ভীষণ আক্রমণ করলে। একদিকে এদের ভীষণ তরবারী-যুদ্ধ চলতে লাগল, আর-একদিকে শিল্পীও তাই দেখে দেখে নিজের ছবি এঁকে যেতে লাগলেন। আধঘণ্টার পর দুজনেই দুজনের অস্ত্রাঘাতে আহত হয়ে মাটিতে যখন পড়ে গেল, তখন শিল্পীর ছবিও শেষ হয়ে গেল এবং তিনি কি গর্হিত কাজ করেচেন তাও বুঝতে পারলেন।

মোগল-আমলে আমাদের দেশে কোনো লোকের প্রতিকৃতি আঁকতে হ'লে শিল্পীরা সাধারণতঃ মন থেকে ভেবে ভেবেই আঁকতেন। রাজাবাদশাহের ছবি আঁকতে হলে রাজ-দরবারে বসে বসে আগে তাঁরা ভালো করে রাজা-বাদশাহের চেহারা দেখে নিতেন; তারপর চিত্রশালায় গিয়ে নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে ছবি আঁকতেন। কিন্তু বেগম বা রাণী-সাহেবাদের চেহারা আঁকতে হলেই শিল্পীকে বিষম মুস্কিলে পড়তে হ'তো। মোগলের অসূর্য্যম্পশ্যা বেগম দ্বিতলের ঝরোখা খুলে অল্পক্ষণের জন্যে এসে দাঁড়াতেন; নীচে থালায় জল বা আয়না রাখা হ'তো, শিল্পী মাথা হেঁট করে নীচে থেকে বেগমের প্রতিবিম্বটি দেখবার সুযোগ পেতেন। সেই প্রতিবিম্ব মানস-দর্পনে এঁকে নিয়ে তাকে আবার চিত্রপটে ফলাতে হ'তো। সেইজন্যে মোগল-আমলের সব চিত্রেই রাণীদের ছবিগুলি একই ধরণের দেখতে হয়ে থাকে। অজন্তার ভিত্তি-চিত্রে যদিও এক-একটি বিশেষ ধরণের মানুষের আকৃতি দেখা যায়, কিন্তু সেগুলি কোনো ব্যক্তিকে মডেল রূপে বসিয়ে যে হুবহু আঁকা হয়েছিল, তা জোর করে বলা যায়না।

ইউরোপে অনেক সময় শিল্পীর আত্মীয়ের ভিতর কেউ-কেউ মডেল হয়ে দাঁড়ান। ইউরোপীয় চিত্র ভালো হওয়া বা মন্দ হওয়া

অনেক সময় এই মডেলের উপরই নির্ভর করে। লর্ড লেটন্ তাঁর চিত্রে বিলাতের তখনকার অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে মডেল রূপে বসিয়েছিলেন। তিনি মডেলদের স্পষ্টই বলতেন যে, 'তোমাদের উপরই আমার যা-কিছু আশা-ভরসা, ছবি যদি ওৎরায় তা হলে জানবো সে তোমাদেরই গুণে।' লেডি বাট্লার তাঁর বিখ্যাত যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র-গুলিতে আসল সৈনিক পুরুষদের এনে মডেল করতেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন্ উড্ভিল্ কতকটা প্রাচ্য শিল্পীদের মতই মডেল না নিয়েও বড় বড় যুদ্ধের ছবি এঁকে গেছেন। অথচ তাঁর ছবিতে যুদ্ধের খুঁটিনাটি যা-কিছু দেখাবার, তার কিছুই বাদ পড়তনা। উড্ভিলের মত খালি পরিকল্পনার সাহায্যে আর-কোন বিলাতী শিল্পীকে ছবি আঁকতে দেখা যায় না। মডেল দেখে এঁকে এঁকে অনেক সময় শিল্পীদের এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে, কখনো কখনো মডেল সামনে না-রেখেও মডেলকে মনে-মনে ভেবেই তাঁরা ছবির বিষয়টি আঁকতে পারেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য যে, তাঁরা মডেলকে না ভেবে স্বাধীন ভাবে চিত্রটির মোট রূপটি একেবারেই ভাবতে পারেন না।

আমরা শুনেচি বিলাতের কোনো বিখ্যাত চিত্রকর (নাম বলবো না) ভারতবর্ষের নানান তীর্থস্থান ভ্রমণ করে যখন দেশে ফিরেছিলেন, তখন ভারতবর্ষে বসে তাঁর আঁকা কতকগুলি আদ্‌রা (Sketch) অবলম্বন করে কাশীর এক সাধু-সন্ন্যাসীর ছবি আঁকবেন ঠিক করেন এবং তজ্জন্য বিলাত-প্রবাসী কোন ভারতবর্ষীয় ছাত্রকে মডেলরূপে আহ্বান করেন। মডেলের সাহায্যে, অবশ্য ছবিটি সম্পন্ন হ'ল। তখন কবিবর পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বিলাতে ছিলেন। শিল্পী তাঁর কবি-বন্ধুকে নিজের চিত্রশালায় নিয়ে গিয়ে সেই ভারতবর্ষীয় সাধুর ছবিটি দেখালেন। কবি দেখলেন, সবই ঠিক, সেই ভারতবর্ষীয় ছেলেটির চেহারা সাধু-সাজে ছবিটিতে বেশ মানিয়ে গেছে,

"জোয়ান অফ্ আর্ক" চিত্রে
মিস্ গ্যারাওয়ে

কিন্তু মাথার হালফ্যাসানের টেরী-কাটা চুলের কাছটায় ছবির ছন্দপতন হয়েছে। তিনি শিল্পীকে সেই ভ্রমটি দেখিয়া দিলেন। শিল্পী তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষীয় মডেলের টেরীটি হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে এলোমেলো ক'রে দিয়ে, পুনরায় ছবি-সংশোধনের চেষ্টা

করলেন, কিন্তু কিছুতেই তাকে আর ঠিক করতে পারলেন না। প্রাচ্য শিল্পী হলে এ বিপদ ঘটত না, কারণ সম্পূর্ণ ছবি তাঁর মনেই থাকত, বাইরের বাধা তাঁকে পেয়ে বসত না। এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের আসল তফাৎ।

ছোট ছেলেদের বা যুবকদের মডেল হওয়া একটা বিষম সাজা। একবার একটি ছেলেকে তার মা তাঁর ছবির জন্যে বসতে বলেছিলেন, কিন্তু ছেলেটি খেলাধূলার বয়সে 'হতাশ প্রেমিকে'র ভঙ্গীধারণ করে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে কিছুতেই সম্মত হয়নি।

বিলাতের বিখ্যাত মডেলের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক গ্রেগরি একজন। ৮৬ সাল থেকে গ্রেগরী মডেল হয়ে আসছেন এবং লর্ড লেটন, ফ্রেড বানার্ড, চার্লস গ্রীণ, জে, বি, বার্জ্জেস প্রভৃতি বিস্তর বিখ্যাত শিল্পীর সহায় হয়েছিলেন। স্যার লরেন্স আ্যালমা-ট্যাডেমার মডেল ছিলেন—মিস্ ওলিভ্ গ্যারাওয়ে রূপে-গুণে তিনি খুবই বিখ্যাত। তিনি অনেক বড় বড় শিল্পীর কাছে মডেল হয়ে বসতেন এবং সেইজন্যে বেশ দু-পয়সা রোজগারও করেছিলেন। ঠাকুর-মা আঁকতে হলে শিল্পীরা এখনও মিসেস নাইটের তলব করে থাকেন। তিনি আজ ৮৪ বৎসর শিল্পীমহলে মডেলরূপে বসে বসে এ-কাজে এতটা পাকা হয়ে উঠেছেন যে, একভাবে মডেল হয়ে বসে থাকার যন্ত্রণা তাঁর কাছে কিছুই নয়; এই বৃদ্ধ-বয়সেও অসাধারণ ধৈর্য্যের সঙ্গে তিনি মডেলের কাজ করতে পারেন।

কখনো কখনো মডেলের চোখ, হাত, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর একটা কোন-কিছু ভালো হলেই শিল্পীরা একরকম করে' কাজ চালিয়ে নিয়ে থাকেন। ইউরোপে চিত্রকরের গুণে অনেক মডেল শিল্পজগতে অমরতা লাভ করে। ইউরোপে মডেলের উপর দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে চিত্রকরেরা যেমন অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকেন, প্রাচ্য শিল্পে কিন্তু তা মোটেই চলে না। প্রাচ্যশিল্পীরা ছবির ভাবকে মডেলের সাহায্যে দেখতে চান না, আপনাদের মানস-পটেই তাঁরা তার সন্ধান পান এবং এইজন্যেই প্রাচ্যশিল্পীর মনে ছবি আঁকবার পূর্ব্বে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়।

জাপানে শোনা যায়, কাল্পনিক নৃশংস বাঘের চিত্র আঁকার জন্যে কোনো শিল্পী বিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যখন বাঘের ছবি আঁকতেন, তখন নিজের ভাবে নিজেই বিভোর হয়ে যেতেন। একবার তিনি বাঘ আঁকতে আঁকতে এম্‌নি তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন যে, কিছুকাল তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং সর্ব্বদাই নিজেকে বাঘ মনে করে লোককে আক্রমণ করতে ছুটতেন। "কল্পনা শিল্পীর মনে সত্যের রূপটি এমন ভাবে এনে ধরবে, যে তিনি বাইরের সব কথা ভুলে যাবেন"— এইটেই হ'ল শিল্পীদের বিষয়ে মহাজনের উক্তি।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

বজ্র-বোধন

অযুত ঢেউয়ের তপ্ত নিশাস সুপ্তিহারা ;
ফির্‌তেছিল হাওয়ায় ছায়া-মূর্ত্তি-পারা ;
নিদাঘ-দিবস হান্‌তেছিল আগুণ চাবুক
লুপ্ত সারা জগৎ হতে সোয়াস্তি-সুখ।
শুক্‌নো পাতার সকল-এড়া শিথিল সুরে
তেপান্তরের তপ্ত তামার চাতাল ঘুরে—
উঠ্‌তেছিল গুমট্‌ ঠেলে মৌন মুখে
বিদ্যুতেরি বিত্ত নিয়ে গোপন বুকে—
সাগর-তড়াগ হ্রদের নদের তৃপ্তিহারা—
উষ্ণ নিশাস,—নীরব ছায়া-মূর্ত্তি-পারা।

* * * *

হঠাৎ কখন্‌ কোন্‌ গগনের পান্থ হাওয়ার কোন্‌ ইসারায়
শরীর পেল এক নিমিষে ওই অতনু সে কোন্‌ তারায় ?
লক্ষ ব্যথার তপ্ত নিশাস পড়্‌ল হঠাৎ ঐক্যে বাঁধা
জীবন-মরণ-মন্ত্র যেন মন্দ্রমধুর শব্দে গাঁথা !
আকাশ হ'ল ভাঙড় ভোলার নেশায় ঘোলা চোখের মত
ঘোর গুমটের গুম্‌ ঘরে আজ ঘুল্‌ঘুলি সে খুল্‌ল শত ;
অস্তাচলের সোনার বরণ অঙ্গ হঠাৎ উঠ্‌ল ঘেমে
শিউরে সাগর ঢেউ ঢিমিয়ে থম্‌থমিয়ে রইল থেমে।
তালের সারি পাণ্ডু ছবি কাজল মেঘের মূর্ত্তি দেখে
চম্‌কে উঠে ময়ূর চেঁচায় "কে গো ! এ কে ? কে গো। এ কে ?"
ধায় আকাশের উল্কামুখী হঠাৎ যেন প্রমাদ গণি'
আগুণ-ডোরে শূন্যে দোলে ইন্দ্রাণীরই স্নানের দ্রোণী।
বজ্র-বোধন বাদ্য বাজে' হিয়ায় হিয়ায় তড়িৎ চুয়ায়,
গুমট্‌-ভরা আষাঢ়-সাঁঝের জলদ্‌-গহন গগন-গুহায়।

* * * *

হ্রদের নদের কুড়িয়ে নিশাস নিশান ওড়ে ! নিশান ওড়ে
লক্ষ হিয়ার মন্যু জাগে প্রলয়-মেঘের মূর্ত্তি ধরে !
আস্‌ছ কে গো বাষ্প-ঘন ! বারুদ-মাখা অঙ্গে একা
ঈশান-কোণে দিগ্বারণের হাওদা তোমার যাচ্ছে দ্যাখা ;

তোমার সাড়ায় বৃংহনেরি বৃহৎ ধ্বনি স্তব্ধ বনে,
সিংহ বারেক গর্জ্জে উঠে গুহায় পশে ত্রস্ত মনে,
ঝঞ্ঝা তোমার চারণ-কবি জগৎ লোটায় পায়ের নীচে,
পায়ের ধূলার তলায় যারা তারাই শুধু অঙ্কুরিছে !
ব্যথার তাপে জন্ম তোমার আস্‌ছ ব্যথায় আসান দিতে
নবীন মেঘের গর্ভাধানে মন্ত্র পড় রুদ্র গীতে।
জীর্ণ যা' তা' পড়ছে ভেঙে জরার ভারে পড়ছে ভেরে
তোমার সাড়া চমক দিয়ে জাগায় অফুট অঙ্কুরেরে।
গর্ব্ব যাদের পর্ব্বে পর্ব্বে সে পর্ব্বতের উড়াও চূড়ায়
বজ্র ! কুশাঙ্কুরচ্ছবি ! তোমার পরশ পাহাড় গুঁড়ায়।
গ্রীষ্মে জরা দগ্ধ ধরা ভাব্‌ছে যারে চিরস্থায়ী
তোমার সাড়ায় মূর্চ্ছা সে পায়, বজ্র ! হে নীলপদ্মশায়ী !

* * * *

তোমার সাড়ায় তৃষায় অধীর কোন্ চাতকের পুড়্‌ল ডানা
কোন্ সে শাখীর ভাঙ্‌ল শাখা তার কথা নেই তুল্‌তে মানা,
তোমার সাড়ায় তরুণ প্রাণের যে বন্যা আজ জলে-স্থলে
ক্ষতির কথা ভুলিয়ে দিতে হাস্‌ছে তারা নানান ছলে।
তোমার সাড়ায় উল্টে গেল শূন্য-শয়ান জলের দ্রোণী
সোহাগ-দ্রোণীর ঝর্ণা-ধারায় আর্দ্র ভুবন দিন রজনী।
লক্ষ ব্যথার প্রসব তুমি সূর্য্যে নিবায় তোমার গাথা
বজ্র ! তুমি দর্পহারী, খড়্গ তুমি অভয়-দাতা !
তোমার বোধন গাইছে কবি গাইবে কবি সকল কালে,
জীবন-লোকে বরণ তোমার দীপক রাগে রুদ্র তালে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সোনার পদক

রাত্রি প্রায় নয়টা। সমস্ত দিন অত্যন্ত খাটুনি গিয়াছে। সন্ধ্যার পরও একজন রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া সবেমাত্র আহার সারিয়া ইজি চেয়ারে পড়িয়া ধূমপান করিতেছি, এমন সময় বাহিরে কে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। বিরক্তভাবে চাকরকে বলিলাম, "কে, দেখে আয়। যদি নূতন রোগী হয়,

ত অন্য ডাক্তারের কাছে যেতে বলে দে। আমি আজ আর বেরুতে পার্‌ব না।"

বেহারা চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "হেমেন বাবু।"

শুনিয়া বিরক্তভাবে বলিলাম, "আনে বোলো।"

বেহারা যাইবার পূর্ব্বেই হেমেন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল; আসিয়া একখানা চেয়ারের উপর সে বসিয়া পড়িল।

হেমেন্দ্র একসময় আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে তাহার অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। কাজ-কর্ম্ম কিছুই করে না! দিনরাত কোথায় থাকে, কি করিয়া কাটায়, কেহ জানে না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, যখন তার টাকার দরকার। অন্য কোন কারণে সে আর দেখা করিতে আসে না। যখন আসে তখন প্রায়ই মদ খাইয়া আসে। তাহাকে টাকা দেওয়ার অর্থ তাহার সর্ব্বনাশ করা, তাহা বুঝি। তবু না দিয়াও থাকিতে পারি না।

আজও উৎকট গন্ধে বুঝিলাম, সে সুরা-পান করিয়া আসিয়াছে। মনে ভাবিলাম, টাকা ফুরাইয়াছে! রাত সবে ন'টা। এখন টাকা চাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে, টাকা চাই বুঝি?"

হেমেন্দ্র কথার উত্তর দিল না। বলিল, "আচ্ছা, ডাক্তার (হেমেন্দ্র আমায় ডাক্তার বলিয়া ডাকিত), বেশী মদ খেলে কি জাগ্রৎ অবস্থাতেই লোকে স্বপ্ন দেখে?"

আমি বলিলাম, "কেন, বল দেখি?"

হেমেন্দ্র বলিল, "তামাসা নয়, সত্যি বল। আমার মাথাটা দেখ ত। দব্‌দব্‌ কচ্ছে। ভিতরে যেন আগুন জ্বল্‌ছে। আমি কি পাগল হয়েছি—যা দেখেছি, যা দেখ্‌ছি, তা কি সত্যি?"

"বেশ করে মাথায় খানিক জল ঢেলে এস দেখি। নেশাটা কাটুক তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে, স্বপ্ন দেখছ কি জেগে আছ?"

"তুমি কি ভাব্‌ছ এখনও আমার নেশা আছে? তুমি কিসের ডাক্তার? নেশা আমার অনেকক্ষণ ছুটে গেছে। কখন ছুটে গেছে, জান? যখন স্বপ্ন দেখেছি—যখন দেখেছি—ডাক্তার, ডাক্তার, স্বপ্ন না সত্যি? দেখ ত, দেখ ত, আমি এখন কেমন আছি? আমি কি পাগল হয়ে গেছি?"

হেমেন্দ্রর এরূপ ভাব পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে বলিয়া যাইতে লাগিল—"মিথ্যে কথা বল্‌ব না, আজ পাঁচ বোতল খেয়েছি। কোথায় ছিলুম, জান?" হেমেন্দ্র একবার দরজার দিকে চাহিল। "মেয়েরা শুন্‌তে পাবে না ত? আশ্চর্য্য হচ্ছ? আগে এ ভয় করতুম না, কিন্তু এখন থেকে করি। আর নাম করেই বা কি হবে? বুঝ্‌তেই পাচ্ছ। শুনলুম নতুন একজন এসেছে। তার বাড়ী কোনদিন যাইনি। শুনে গেলুম। আর কেউ ছিল না। খুব খাতির করে সে বসালে। কত কথা—মনে নেই, তখন ত আর জ্ঞান ছিল না—নেশার ঘোরে কি বলেছি, কি করেছি, তা জানি না। তারপর—তারপর হঠাৎ মনে হল আমার বুকের উপর একটা কেউটে সাপ যেন ছোবল মারলে। সমস্ত শিরা-উপশিরা-গুলো যেন বিষে চন্‌-চন্‌ করে উঠল! সে

কাছে আসতেই আমার চোখে পড়েছিল তার গলায় সরু সোনার হারে গাঁথা একটা পদক,—তার চারদিকে পানের মত চুণি বসানো। এমনি একগাছা হার যে আমার চির-পরিচিত। এমনি পদক যে সে—আমার স্ত্রী পরত! আমিই তাকে দিয়ে ছিলুম—প্রেমের সে এক মস্ত ইতিহাস! ঝুঁকে পড়ে পদকটা হাতে তুলে নিলুম। বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'কুসুম'। আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম। ডাক্তার, এই লক্ষ্ণৌ সহরে পতিতাদের মধ্যে বাঙ্গালী ত আগে দেখিনি। এ কি বাঙ্গালী না কি? আমার সঙ্গে ত বাঙ্গলায় কথা কচ্ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'সত্যি বল, ভগবানের দোহাই—তুমি কি বাঙ্গালী?' সে হেসে উঠ্‌ল। বোধ হয় ভাব্‌লে বাঙ্গালী বল্‌লে তার আদর আরও বাড়্‌বে, সে বল্লে—'হ্যাঁ, আমি কুসুম।" আমায় যেন কে চাবুক মার্‌লে, এঁ্যা—এইরকম পদক, এইরকম হার যে সে পরত!

তাকে চিতায় তুলে দিয়ে অবধি ত রমণী কাকে বলে ভুলে গিয়েছিলুম। আমোদের সঙ্গিনী নিয়ে মেতেছিলুম। বাঙ্গালী দেখিনি—বাঙ্গলায় কথা কইনি। তাই বুঝি ধাঁধা লেগেছিল—তাই বুঝি চমক ভাঙ্গেনি। ঠুংরির তালে তালে পেশোয়াজের ঝলমলে রূপ দেখেছি, ঘুঙুরের ঝুণুঝুণুর সঙ্গে হিন্দী গান শুনেছি। মুসলমানী আদব-কায়দায় কথাবার্ত্তা কয়েছি, সে আর-এক জগৎ! আর এ, এ কি বীভৎস—এ যে আমাদেরই ঘরের রমণী! এরাই তাহ'লে রূপান্তর ধরে বেরিয়েছে। আমার নেশা ছুটে গেল। ডাক্তার, ডাক্তার, অবিশ্বাস করো না, তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি—যেমন তোমায় এখন দেখ্‌ছি, তেমনি স্পষ্ট চোখে দেখলুম—আমার স্ত্রী এসে কুসুমের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিয়ের দিন যেমন দেখেছিলুম, কপালে চন্দনের রেখা—লাল চেলী পরা, ঠিক তেমনি! আমায় ইসারা করে কুসুমকে দেখিয়ে সে বল্লে—'আমার অপমান করো না। নারীত্বের অপমান করো না।' তারও বুকে সেই পদক—সেই হার! সে হার পরে আমি গড়িয়ে দিয়েছিলুম, তবু দেখতে পেলুম, বিয়ের সাজেই সে তা গলায় পরেছে। এমন ত কোন দিন দেখিনি! যখন মদ ধরিনি—সে মরে যাবার পর দিন-রাত যখন তার ধ্যানেই থাকতুম, তখনও ত সে দেখা দেয়নি! আজ এতদিন পরে, যখন আমার সব গিয়েছে, তখন কেন দেখা দিলে? তার মর্য্যাদা ত অনেকদিন আগেই ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছি! আমার কি অধঃপতনের চরম হয়েছে? আমার কি দিন ফুরিয়ে এসেছে? তার ত আর দেখা পাবার আশা রাখিনি। তার সঙ্গে থাকৃতে পাব, তার কাছে যেতে পাব, সে ভরসা আর নেই। এখন অনেক তফাতে পড়ে গেছি। কুসুম আমার দিকে চেয়েছিল, বল্‌লে—'এসো—অমন করে কি দেখ্‌ছ?' আমি বললুম, 'না। আর নয়। আজ বুঝ্‌তে পেরেছি, আমি কি করেছি। আমি শুধু নিজে অধঃপাতে যাইনি—প্রতি দিন তার অমর্য্যাদা করেছি। তুমি আমায় মাপ করো। আমরাই তোমাদের এ-পথে নামিয়েছি, আমরা পতিত, তাই আমাদের স্পর্শে তোমরাও পতিত হয়েছ।' কুসুম

হেসে বল্লে, 'নাও, ন্যাকামি কর্তে হবে না। এসো। এ কি থিয়েটার পেয়েছ যে এ্যাক্টিং আরম্ভ কর্‌লে?' এই বলে আমার হাত ধরে টান্‌লে। আমার স্ত্রী হেসে উঠ্‌ল। হাস্‌লে কেন ডাক্তার? আমি বুঝ্‌তে পারলুম না। তুমি বলতে পারো, কেন সে রাগ করলে না, তিরস্কার কর্‌লে না, শুধু একটু হাস্‌লে? কিন্তু সেই হাসিতে আমার সব ধাঁধা কেটে গেল ডাক্তার। আমি জোর করে হাত ছিনিয়ে নিয়ে আমার স্ত্রীর দিকে ছুটে গেলুম। সে আঙুল তুলে ঠোঁটের উপর রাখ্‌লে। রেখে ধীরে ধীরে সরে গেল। আমি পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে পড়্‌লুম। কুসুম চেঁচিয়ে বল্লে, "আমরণ, মুখপোড়া পাগল নাকি?' আমি সে কথায় কাণ দিলুম না। রাস্তাশুদ্ধ লোক আমার দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তখন আমার নেশা ছিল না, তবুও কেউ বল্লে 'মাতাল', কেউ বল্লে 'পাগল'। বলুক, ডাক্তার। তুমি শুধু বল, কিসে আমি আবার তাকে দেখ্‌তে পাই। মাতাল হলে যদি তাকে দেখ্‌তে পাই—তাই হব। পাগল হলে যদি তাকে দেখ্‌তে পাই—তাই হব—বল, বল—একটা উপায় কর।"

হেমেন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি বেহারাকে ডাকিলাম। সে মাথায় জল দিতে লাগিল, আমি একটা ঔষধ আনিতে বাড়ীর ভিতর গেলাম।

আহারান্তে স্ত্রী পানের সহিত কাশীর জর্দ্দা লাগাইতেছিলেন, বলিলেন, "আবার এত রাত্রে মাতালটা এসেছে? ভদ্রলোকের বাড়ীতে রোজ রোজ এ সব কি ঢলাঢলি বাপু!"

আমি বলিলাম, "ও আজ যে নেশায় মাতাল হয়েছে, ভগবান করুন যেন অমন নেশা আমার চিরদিন থাকে!"

স্ত্রী বলিলেন, "কথার ছিরি দেখ। তা খেলেই ত হয়। বারণ করেছে কে?"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

বিপন্না

কৌরবের সভাতলে বামহস্তে বসন সম্বরি'
অন্য বাহু ঊর্দ্ধে তুলি' শ্রীহরিরে ডাকি' বারম্বার,
বিহ্বলা দ্রৌপদী যবে দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভরি'
ঘৃণায় লজ্জায় ক্ষোভে মেগেছিল মৃত্যু আপনার,

শ্রীকৃষ্ণ তখনো সেই অপূর্ব্ব নির্ভর হেরি' তার
আপনারে একেবারে বস্ত্ররূপে দেয়নি বিতরি';
কিন্তু যবে নিরুপায়, দুইবাহু মেলিয়া উদার
চাহিল শরণ শেষে, নিমেষে আসিলা নামি' হরি।

বিমূঢ় ম্লানবদন পরস্পরে চাহি' রহে মুখে,
ধর্ষিতার হর্ষ হেরি' দুঃশাসন গুমরায় দুখে।

বিপন্না দ্রৌপদী আজি ঘরে-ঘরে মেলি' দুই বাহু
কাঁদে যে তোমায় ডাকি'; কোথা তুমি লজ্জানিবারণ?
তুচ্ছ করি' ভর্ত্তৃদলে, ব্যর্থ করি' দুঃশাসন রাহু
এস তুমি আর্ত্তসখা—এ দুর্দ্দিনে, এস নারায়ণ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সাহিত্যে মতের ভিড়

১

আর্ট কাকে বলে, কবিতার উদ্দেশ্য কি কিম্বা তার কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা—এই সব প্রশ্ন লইয়া বাংলা সাহিত্যে বিস্তর মতামত জমিয়া উঠিতেছে।

অস্কার ওয়াইল্ড, সিমন্‌স্‌ প্রভৃতির মতো একদল বলেন, "all art is quite useless"; আর্ট একেবারেই উদ্দেশ্যবিহীন, প্রয়োজনবিহীন, আর্টকে আর্টের তরফ হইতেই দেখা উচিত। অন্যদল বলেন যে, ঐ মতটি লইয়া বিদেশে বিস্তর তর্কবিতর্ক হইয়া চুকিয়াছে—আর্টকে আর্টের তরফ হইতে দেখা মানে যদি তাকে জীবনের বিচিত্র আনন্দ ও আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হয়, তবে সে আর্ট সৌখীন্ খেলনার মতো ক্ষণিক চাকচিক্যে মন ভুলায় বটে, কিন্তু মানুষের জীবনকে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করেনা।

এই উদ্দেশ্য-অনুদ্দেশ্য লইয়াই আর্টে নীতির স্থান আছে কি নাই, সে সম্বন্ধে পুনরপি তর্ক উঠে। অস্কার ওয়াইল্ড এ সম্বন্ধে এই রায় প্রকাশ করিয়াছেন :—"There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written or badly written. That is all." সাহিত্যে নীতিপূর্ণ বা দুর্নীতিপূর্ণ কোন গ্রন্থ নাই। কোন গ্রন্থ বা সুলিখিত, কোন গ্রন্থ বা কুলিখিত—ব্যস্ এই পর্য্যন্ত। আবার রাস্কিন্, ম্যাথু আরনল্ডের মতে উচ্চ আর্ট মাত্রেই মানুষের উচ্চ নৈতিক বোধকে জাগ্রত করে। আসলে সাহিত্যে নীতির তর্কটা রুচির তর্ক। কিন্তু এ তর্কের শেষ মীমাংসা যে পাওয়া যায়না তাহা কালিদাসই বহুযুগ পূর্ব্বে বলিয়া গেছেন :—ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।

তারপরে mass-consciousness, collectivism, individualism-এর তর্ক। কারো মতে গণ বা সমূহের মধ্যে আর্ট-সাহিত্যের আদর্শগুলা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গণ-প্রকৃতির আপনার জিনিস হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কাব্যকলায় কোন উদ্ভট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যোদ্ভূত কল্পনাকে রূপদান করা সার্থক হইতেই পারেনা। সেরূপ প্রয়াস আপনি স্বয়ম্ভূ হইয়া বিরাজ করিতে থাকে—দেশের রুচির রীতিধারার সঙ্গে, কাব্যকলার রীতিধারার সঙ্গে, তাহা দিব্য খাপ খাইয়া সেই রীতিধারাকে অবিচ্ছিন্ন রাখেনা। এদিক্ দিয়াও সাহিত্য-আর্টের বিচার চলিতেছে। "আর্য্য" পত্রিকায় অরবিন্দ বাবু জুন সংখ্যায় ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় লিখিয়াছেন—"Its history has been more that of individual poetic achievements than of a constant national tradition." অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কাব্য-কৃতিত্ব দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সাহিত্যে একটা অবিচ্ছিন্ন জাতীয় রীতি-ধারা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, ইহা দেখা যায় না।

অন্য পক্ষ বলেন যে, সাহিত্যে ও সব ট্রাডিশন বজায় রাখা, গণ-বোধকে ধীরে ধীরে উন্মীলিত করিয়া সৃষ্টিকে ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত করা, প্রভৃতির কথাই উঠিতে পারেনা। কেননা, প্রথমতঃ সাহিত্য বা আর্ট জিনিসটা স্বতোচ্ছ্বসিত ও অনিবার্য্য। সেইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর্টের সৃষ্টি মগ্নচেতন-লোকেই সম্ভাবিত হয়। ম্যাথু আবনল্ড ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতাকে যে "inevitable" বলিয়াছেন, সেই অনিবার্য্য স্বতোচ্ছ্বাসই আর্টের প্রাণ। দ্বিতীয়তঃ, আর্ট রীতিধারাকে বজায় রাখা দূরে থাকুক, প্রচলিত রীতিকে বরাবর আঘাতই ত করিয়া থাকে। সাহিত্যের ইতিহাসে এইটেই কি সবচেয়ে প্রত্যক্ষ নয় ?

তারপর, আর্টে ন্যাশন্যাল বা স্বাজাতিক এবং য়ুনিভার্সাল বা সার্ব্বজাতিক দিকের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান, কোন্‌টা অপ্রধান— এই তর্ক হইতে এখন আবার Ethnic বা নৃতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় তর্কও দেখা দিয়াছে। প্রতি সভ্যজাতির মধ্যেই জাতিমিশ্রণ ঘটিয়াছে ; সুতরাং বর্ত্তমান ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি এই জাতিমিশ্রণে বিচিত্র হইয়া আর্টকেও বিচিত্র করিতেছে বলিয়া ইংরাজী কোনো সাহিত্যগ্রন্থে কতটুকু কেল্টিক প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়া কতটুকুই বা স্যাক্সন্ প্রকৃতির অনুরঞ্জন পড়িয়াছে, তাহা বিশ্লেষণের একটা চেষ্টা দেখা যায়।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, নৃতত্ত্ব জিনিসটাই এখনো গোকুলে বাড়িতেছে। যে শাস্ত্র এখনো হামাগুড়ি দেয়, তাকে এ প্রকার সাহিত্যিক মল্লযুদ্ধে পাঠানোটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

২

সাহিত্যে এই সব মতের ভিড় দেখিয়া ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।

পঞ্চভূতে "কাব্যের তাৎপর্য্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—"কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচনাশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয় ; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতসবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া —কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি।"

অস্‌কার ওয়াইল্ডও বলেন "Diversity of opinion about a work of art shows that the work is new, complex and vital"—কোন কলারচনা সম্বন্ধে মতবৈচিত্র্য হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, সে রচনাটা নূতন, জটিল এবং প্রাণবান্।

উপরোক্ত দুই মত হইতেই এই কথা মনে হয় যে, পাঠকদের প্রকৃতির ভিন্নতা-বশতই আর্টের তাৎপর্য্য যেন বিচিত্র হইয়া উঠে। কিন্তু কলাস্রষ্টার মধ্যেই যে বিচিত্র প্রকৃতির সমাবেশ থাকিতে পারে, সুতরাং তাঁর কলাসৃষ্টিতেও সেই সকল বৈচিত্র্য প্রতিফলিত হইতে পারে, এ কথাটাও মনে রাখা দরকার। কাব্য হইতে জোর করিয়া "ইতিহাস আকর্ষণ বা দর্শন উৎপাটন" করিলে সেটা রসজ্ঞতার পরিচায়ক হয় না। কিন্তু যেখানে কাব্য স্বতই দর্শনের অভিব্যঞ্জনায় পূর্ণ, যেখানে তার রস তত্ত্বরূপে এবং তত্ত্ব রসরূপে বিভ্রাজমান, সেখানে সেই জটিল অথচ রসবিদগ্ধ সৃষ্টিটিকে

বিচিত্র দিক্ হইতে না দেখিয়া উপায় নাই। কেননা, সেই বৈচিত্র্যই যে তার অন্তর্ভূত।

সাহিত্যের মধ্যে এই বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে বলিয়াই সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও নানা মতের ও আদর্শের ভিড় দেখা দিয়াছে। সেইজন্য সমালোচনার যতগুলি কানুনের (canon) উল্লেখ করিয়াছি, তার কোনটাকেই বাদ্ দিলে চলে না। "আর্ট ফর্ আর্টের" যুগ যে "সম্মুখে সবে মাত্র এসে দাঁড়াচ্ছে" একথা এ যুগ সম্বন্ধে বলা যায় না; কেননা আমরা দেখিলাম যে কত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ canon বা কানুন সাহিত্য-সমালোচনার উপলক্ষ্যে দেখা দিয়াছে। অতএব, "বিশুদ্ধ আর্ট" অর্থাৎ জীবনের অন্য সকল interest-নিরপেক্ষ আর্ট, অর্থাৎ কেবল মাত্র কারুকৌশলসর্ব্বস্ব আর্ট, এ যুগে যে চলিবেনা বলিয়াছিলাম, তার কারণ এই যে, আর্টের মধ্যে জীবনের নানা জটিলতা যেমন সামঞ্জস্য খুঁজিতেছে, তেম্নি আর্টের রস গ্রহণ-ব্যাপারেও, সমালোচনার ক্ষেত্রেও, রস-বিচারের বিচিত্র মানদণ্ডগুলাও একটা বড় সামঞ্জস্যে পরিণত হইবার অপেক্ষায় আছে। সেই Synthetic criticism সেই সম্যগ্‌দর্শী সমালোচনা, আজও পর্য্যন্ত পূরোপুরি দেখা দেয় নাই। তার আয়োজন চলিতেছে মাত্র।

এ যুগে আর্ট-সাহিত্যের মধ্যেও এত তত্ত্ব, এত সমস্যার বিচিত্রতা, কেন দেখা দিতেছে—তার কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। তার কারণ পরিষ্কার এই দেখিতে পাই যে, এ যুগে মানুষ তার সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা, সমস্তই বড় করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিতে চায়। এ যুগে তারি বড় বড় নক্সা আঁকা হইতেছে, বড় বড় "প্ল্যান" তৈরি হইতেছে। সেই ভাবনা-কল্পনাগুলি মানুষের কল্পলোকে নীড় বাঁধিতেছে বলিয়া, কাব্যকুঞ্জও তাদের গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতার নব সৃষ্টির এই অপূর্ব্ব কল্পনাগুলির সঙ্গে যার কিছুমাত্র পরিচয় আছে, একালের সাহিত্যের সম্পূর্ণ রস-ভোজে তারি আসন। ইব্‌সেন বল, মেটারলিঙ্ক বল, রোম্যারোলাঁ বল, এচ্ জি ওয়েল্‌স্ বল, এ, ই বল,—কোন আধুনিক লেখকের মর্ম্মস্থানে পৌঁছিতে গেলে এ যুগের বিচিত্র সমস্যা ও তার বিচিত্র সমাধান-কল্পনার পরিচয়টা গোড়ায় আবশ্যক হইয়া পড়ে।

তবু বলি যে আর্টের পক্ষে একটা detachment বা নির্লিপ্ততার আবশ্যক আছে। পরিপ্রেক্ষণ ভিন্ন যেমন চিত্র ফোটেনা, নির্লিপ্ততা ভিন্ন তেমনি আর্টও সম্ভব হয় না। কেননা, আর্ট অনিত্যকে নিত্যের মধ্যে, অংশকে সমগ্রের মধ্যে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে—সেই ত আর্টের কাজ। আর্টের সেই নিত্যদৃষ্টি, সেই সমগ্রের vision যদি কোন অনিত্য পরিবর্ত্তমান আংশিকতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তবে তাহা আপন ধর্ম্ম হইতেই ভ্রষ্ট হয়। এ যুগে অনেক কলা-স্রষ্টার মধ্যে আর্টের সেই নিত্যতার দৃষ্টিটিকে দেখিতে পাই না বলিয়াই মহাকালের শিল-মোহর তাঁদের রচনার উপর অঙ্কিত হইয়াছে কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে
শ্রী... কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নেপথ্যে

শ্রীমতী সুনয়না দেবী অঙ্কিত

৪২শ বর্ষ]　　ভাদ্র, ১৩২৫　　[৫ম সংখ্যা

সুন্দর-মঙ্গল

ছি ছি ছি ছি ! রাম রাম ! একি ?
তোর তুল্য বেহায়া না দেখি !
শত শত পিশাচ-সেবিতা,
রে কুৎসিত ! দানব-দুহিতা,
তোর ও চুলের মুঠি ধরি,
শতবার ঝাঁটা-পিঠা করি,
তোরে আমি দেছি তাড়াইয়া—
তবু তুই আবার আসিয়া,
রে ডাকিনি, হইলি হাজির !
কাটা নাকে ঝরিছে রুধির,
সারা দেহে শীতলার দাগ,
বর্ণ তোর সম দাঁড়কাক—
ছি ছি ছি ছি ! রাম রাম ! একি ?
তোর তুল্য বেহায়া না দেখি !
কুহকিনি, রে বহুরূপিণি,
অপরূপা, অদ্ভুতা ডাকিনি,
গুহার আঁধারে, অন্তরালে,
কোন্ তান্ত্রিকের পাঠশালে,
চুপে চুপে শিখি' ছলা-কলা,
হয়েছিস্ নিপুণা কুশলা,
মায়াময় নাট্য-লীলা-তন্ত্রে,
জ্ঞান-হরা কাপট্যের মন্ত্রে ?
তাই তোর কোটী ছদ্মবেশ,
বৈচিত্র্যের নাহি বুঝি শেষ।
নানাবর্ণ পুষ্পের পরাগ,
কোটী বস্ত্র, কোটী অঙ্গরাগ,
অযুত মুখস্, পরচুলা,
বিশ্ব যাহে বিমূঢ়া ব্যাকুলা !
কভু তুই মূর্ত্তিমান কাম,
শত পুরুষের মনস্কাম
হাব-ভাব কটাক্ষে পূরাস্,
বিস্তারিয়া বাহু-নাগ-পাশ !
লজ্জাহীনা, উলঙ্গ হইয়া,
টপ্পা গাস্ নাচিয়া নাচিয়া
কভু তুই ক্রোধ মূর্ত্তিমান,
ঘুরাইয়া খড়্গ খরশান,

কাটিস আপন পতি-শির,
চীৎকারিয়া, চুষিস্ রুধির !
কভু তুই লোভ, ডোম-কন্যা,
আপনারে মানিস্ সুধন্যা,
অশুচি অস্থানে ছিল পড়ি,
পাকা জাম, দুই হস্তে ধরি,
আনন্দে পুরিয়া নিজ গালে,
যখন ভখিস্ অন্তরালে !
কু-সঙ্গে, কু-অঙ্গে, কু-বচনে,
বিশ্বের বিপুল অশোভনে,
রে কুৎসিত ! নিকেতন তোর !
অশোভার নাহি তোর ওর ।
কভু তুই দ্বেষ মূর্ত্তিমান,
পর-সুখে সদা মুহ্যমান ।
প্রতিবেশী-সৌম্য গৃহ-পানে,
চাহি চাহি আকুল নয়ানে,
ফেলিয়া ফেলিয়া দীর্ঘশ্বাস,
করিয়া করিয়া হা-হুতাশ,
গৃহে চুপে অগ্নি দিস্ জ্বালি—
সাবাসি লো তোর নাগরালি !
কভু অহঙ্কার শরীরিণী,
চোজ-পক্ষে ধনীর গৃহিণী ।
কর্ণে কণ্ঠে বদনে অলকে,
হীরা মুক্তা কাঞ্চন ঝলকে ।
দুগ্ধ-শুভ্র পালঙ্কে শয়ান,
ঊর্দ্ধে দোলে ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ ।
ডাগর নয়ানে হুতাশন,
দিবারাত্রি তর্জ্জন গর্জ্জন ।
মদে মত্তা, অঙ্গ নাহি নড়ে,
ধরা-পৃষ্ঠে চরণ না পড়ে ।
কভু তুই মূর্ত্তিমান স্বার্থ,
রোগে শোকে বিশ্ব যবে আর্ত্ত,
রাত্রি নাই, নাহিক সূর্য্যাস্ত,
আপনারি স্বার্থ লয়ে ব্যস্ত !
বধূ-বেশে, ভাঙ্গি লজ্জা-হাঁড়ি,
শাশুড়ির অন্ন নিস্ কাড়ি ।
ভিখারীর গালে মারি চড়,
হেসে হেসে দেখিস্ রগড় !
ছদ্মবেশ ধরি আপনার,
এসেছিস্ শত শতবার,
তবু তোরে চিনেছি চিনেছি,—
তোর ও চুলের মুঠি ধরি,
শতবার ঝাঁটা পিঠা করি,
তোরে আমি খেদায়ে দিয়েছি ।
বেহদ্দ বেহায়া আর পাজি,
রে কুৎসিত ! কেন তুই আজি,
আবার হাজির ?
ও নয় রে খেঁদা নাকে আরক্ত আবির,
কাটা নাকে ঝরিছে রুধির !
গালে তোর চুণ আর কালি মাখাইয়া,
গাধার পিঠেতে বসাইয়া,
এই নে এই নে, তোরে করিনু বাহির ।
ছি ছি ছি ছি ! রাম রাম ! একি ?
তোর তুল্য বেহায়া না দেখি !
আর যেন, আর যেন, হোস্‌নে হাজির ।
মহাজ্যোতি-পারাবার-পারে,
নরকের নিবিড় আঁধারে,
যারে তুই যা ।
ভন্ ভন্ করে যথা পুঞ্জে পুঞ্জে রক্ত-পায়ী মশা,
দশ-ঠেঙো বিশ-ঠেঙো মাকোসা,
মেলি লম্বা পা,
ডিমে দেয় তা,—
উকুন ও ছারপোকা
পিপীলিকা, তেলাপোকা,

শুঁয়োপোকা, সাপ বেঙ করে যথা,
কিল্‌বিল্ কিল্‌বিল্,
ভূত-প্রেত পিশাচেরা হাসে যথা,
খিল্‌খিল্, খিল্‌খিল্,
করি হা হা হা,
রে কুৎসিত! সে নরকে যা।

*   *   *

কয়লায় পশেছে অনল,
আজি হিয়া ধবল উজ্জ্বল।
সরসীর শৈবাল সরেছে,
চাঁদে হেরি চাঁদ হাসিতেছে।
এই বেলা মুদিয়া নয়ান,
হে সুন্দর! করি তব ধ্যান।
হয়েছে হয়েছে নিশি ভোর,
নাহি আর যামিনীর ঘোর।
সরসীতে ফুটেছে কমল,
কুসুমে শেফালি-তরুতল,
একেবারে ছাইয়া গিয়াছে।
রাঙ্গা উষা হের আসিয়াছে—
মেঘ-হীন চিত্তের আকাশ,
অহো একি অরুণ-প্রকাশ!
আসিয়াছ! এস হে সুন্দর,
মদন-মোহন, মনোহর!
চিরদিন নয়ন-অঞ্জন,
চিরদিন ভুবন-মোহন!
মুখ-চন্দ্র, নয়ন-মুকুর,
চিরদিন মধুর মধুর!
চিরদিন বদন-মণ্ডল,
রূপ ও লাবণ্যে ঢলঢল!
চিরদিন সুমধুর ভাব,
চিরদিন সুললিত হাস!
চিরদিন নন্দন-সৌরভ,
চিরদিন বসন্ত-গৌরব!
চিরদিন নয়ন-আনন্দ,
চিরদিন প্রাণ-মকরন্দ!

ওই চির-সুন্দর রূপরাশি,
একি শুভ্র আনন্দের হাসি
ও অধরে লাগিয়া রয়েছে!
নাহি জানি কত শুভ্র যূঁই,
জাতি ও মল্লিকা মধুময়ী,
কামিনী বকুল ও সেঁউতি,
ধবল কমল ও মালতী
তব শুভ্র হৃদয়ে ফুটেছে!
ফুলে ফুলময় ফুলবন,
তোমার ও হৃদয়, মোহন!
কোন্ শুভ্র গন্ধরাজ ফুল
ও নিকুঞ্জে ফুটিয়া রয়েছে,
সারা বিশ্ব হইয়ে আকুল,
গন্ধে যার পাগল হয়েছে?

সৌন্দর্য্য-সাগরে কার স্নান,
ঘুচিল ঘুচিল অকল্যাণ!
ধ্যান-অন্তে, একি হেরি চাহি?
অসুন্দর নাহি আর, নাহি!
চারিধারে সুন্দর, সুন্দর,
চারিধারে সৌন্দর্য্য-নির্ঝর,
উথলিছে করি কল্‌কল্,
উথলিছে করি ছল্‌ছল্!
নীলাকাশে বিথারিয়া তনু,
হাসে সৌন্দর্য্যের রামধনু!
সবুজে সবুজে একি ঘটা,
লাল নীল পীতের কি ছটা!

লাজে লাল গোলাপের কুঞ্জ,
লাজে লাল কমলের পুঞ্জ,
হাসিতেছে বিকাশি গরিমা—
সৌন্দর্য্যের নাহি আর সীমা!
হলুদ সফেদ বর্ণ-ভাতি,
নানাজাতি প্রজাপতি-পাঁতি;
কি আনন্দে বসিয়া নিঝুমে,
মধু পিয়ে কুসুমে কুসুমে!
রঙে রঙে একি ঘেঁষাঘেঁষি,
রূপে রূপে একি মেশামেশি!
সৌন্দর্য্যের কুঞ্জে কি উৎসব,
চারিধারে পক্ষী-কলরব।
নিখিলের চন্দনা ও টিয়া
নিখিলের কোকিল পাপিয়া,
একেবারে পাগল হয়েছে!
বউ কথা কও, সহ বধূ,
পরাণের সুমধুর মধু,
একেবারে ঢালিয়া দিতেছে!
ঝুরুঝুরু বহিছে অনিল,
রাশি রাশি মার্শেল্‌নিল্‌
নিজ গন্ধে ক্ষেপিয়া উঠেছে!
অপার-সৌন্দর্য্যের ধারা,
অতুলন রূপের ফোয়ারা!

* * *

আজি একি আনন্দ উদয়,
হে সুন্দর, জয় তব জয়!
নিখিলের শোভার মাঝারে,
হে সুন্দর, নিরখি তোমারে।
রূপসীর বরাঙ্গ মোহনে—
অফুরন্ত ফুল-উপবনে!
তার সেই গোলাপি বদনে,
তার সেই চম্পক-বরণে,
তার সেই নয়ন-কমলে,
আন্দোলিত ভ্রমর শ্যামলে,
তার সেই নাসা তিলফুলে,
কর্ণ-মূলে, ঝুমুকার দুলে,
তার সেই বাঁধুলি-অধরে,
কুন্দফুলে, দন্ত মনোহরে,
তার সেই শ্রীকণ্ঠ মাঝার,
হাসে যথা মালতীর হার,
তার সেই কুন্তলের মাঝে,
বেলফুল যথায় বিরাজে,
তার সেই মৃদু মৃদু হাসে,
জয়যুক্ত শেফালি-নিশ্বাসে,
তার সে কদম্ব পয়োধরে,
যাহে লীলা লাবণ্য বিহরে,—
হে সুন্দর, যেই ধারে চাই,
তোমারেই হেরিবারে পাই!
সু-সঙ্গে, সু-অঙ্গে, সু-বচনে,
বিশ্বের বিপুল সুশোভনে,
অপরূপ অদভুত সাজে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!
গ্রামোফোনে, পিয়ানো, এস্রাজে,
হারমোনিয়াম্‌, বেহালার মাঝে;
শঙ্খরোলে, ঘণ্টারোলে, তূর্য্যে,
সেতারে ও বীণার মাধুর্য্যে;
ছায়ানটে, ললিতে ও বেহাগে,
ইমনে ও ভৈরবের রাগে,
সাহানায় আর সোহিনীতে,
বিশ্বের বিপুল কলগীতে,
শষ্পে, শষ্পে, শ্যামল পল্লবে,
বসন্তের আনন্দ-উৎসবে,
প্রতিধ্বনি-কৌতুকে ও রঙ্গে,
দিশি দিশি শব্দের তরঙ্গে,

নারী-নৃত্যে, হাবভাবে, তালে,
ভকতের খোল্ করতালে,
নতমুখী কুলবধূ-লাজে !
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে !
ধূলিহীন গৃহ-আঙ্গিনায়,
টগর-ধবল সু-শয্যায়।
বিশ্বের বিপুল বিমলতা,
বিশ্বের বিপুল উজ্জ্বলতা,—
হে সুন্দর, যেই ধারে চাই,
তোমারেই দেখিবারে পাই !
মধুর পনসে ইক্ষুরসে,
সুস্বাদু ব্যঞ্জনে ও পায়সে,
তরমুজে ও আঙ্গুরে রসালে,
পাটনার আনারের লালে,
কমলালেবুতে, নারিঙ্গিতে,
বিশ্বের বিপুল মাধুরীতে,
মখ্‌মলে, বিচিত্র সাটীনে,
ঝলমল্ চেলির রঙ্গিনে,
রসময় পদ্মমধু-মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে !
রঙ্গণে ও দোপাটি, গ্যাঁদায়,
মৃগচক্ষে তব রূপ ভায় !
আবিরে সিন্দুরে ও চন্দনে,
তরল অলক্ত-বিলেপনে,
অতসী ও অশোকে অশোকে
নীপে নীপে চম্পকে চম্পকে,
পদ্মরাগে, চুণির চমকে,
হীরকে ও মুক্তার ঝলকে,
কর্পূরে ও কস্তুরি-ভিতরে,
চামেলী গোলাপী আতরে,
ম্যাহোগ্‌নি টেবিলে, দর্পণে,
ঝাড়, বাতি, ঝালরে, লণ্ঠনে,

মৃগশৃঙ্গে, হস্তীর দশনে,
বিপুল সুন্দরে ও চিকণে,
লীলাময় নির্ঝর-তরঙ্গে,
লীলাময়ী নদীর উৎসঙ্গে,
দূর্ব্বাদলে, শিশিরে শিশিরে,
সজনীর নয়নের নীরে,
কমলের ধবল মৃণালে,
সুধবল মরালে মরালে,
কষিত কাঞ্চন কণ্ঠহারে,
রজতের মঞ্জীর-ঝঙ্কারে,
লাল নীল উপলে উপলে,
ঝিলে বিলে উৎপলে উৎপলে,
ঊর্দ্ধে উছল উৎসে উৎসে,
ফোয়ারা'র লাল নীল মৎস্যে,
বীরবৌটি, কাচপোকা-মাঝে,
তোমার মধুর মূর্ত্তি রাজে !
বিয়োগিনী, উপজাতি-ছন্দে,
বিশ্বের বিপুল ছন্দোবন্ধে,
প্রাণচোরা গল্পে, কাহিনীতে,
স্তুতিতে ও ভজন-সঙ্গীতে,
বাগ্মীর জ্বলন্ত ভ্রূ-নয়নে,
রসনার উষ্ণ প্রস্রবণে,
অদভুত জোয়ার ভাটায়,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ-লীলায়,
জলধির হিল্লোলে হিল্লোলে,
জলধির কল্লোলে কল্লোলে,
সারা বিশ্ব-বিভূতির মাঝে,
তোমার সুন্দর মূর্ত্তি রাজে !
ফুল-শয্যা, ফুলের তোড়ায়,
চিত্ত-চোরা ফুলের মালায়,
ফুলদানি, ফুলের সাজিতে,
বাসরের হাসির রাশিতে,

কঙ্কণ ও কিঙ্কিণীর বোলে,
উলুউলু আনন্দের রোলে,
মধুর মধুর বংশীরবে,
বিরহান্তে মিলন-উৎসবে,
জগতের বিপুল খেলায়,
জগতের বিপুল মেলায়,
দুর্গোৎসবে, দোল-পূর্ণিমায়
বৃন্দাবনী আঁবির-খেলায়,
দম্পতীর মধুর চুম্বনে,
দম্পতীর বাহুর বন্ধনে,
বিশ্বের বিমলানন্দ-মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!
পতিব্রতা সতীর নিশ্বাসে,
বালকের হাসির উচ্ছ্বাসে,
দম্পতীর নব অনুরাগে,
ঋষি-সন্ন্যাসীর মহাত্যাগে,
ভকতের ভকতি-ঐশ্বর্য্যে,
ব্রাহ্মণের বালব্রহ্মচর্য্যে,
সাধকের নিশি-জাগরণে,
প্রাণপণে প্রাণান্ত সাধনে,
প্রেমিকের স্বদেশ-কল্যাণে,
দৃপ্ত তেজে আত্ম-বলিদানে,
মহাজ্ঞানে, মৈত্রী করুণায়,
মুদিতায় আর উপেক্ষায়,
হে সুন্দর, যেই ধারে চাই,
তোমারেই দেখিবারে পাই!
জননীর সস্নেহ-চুম্বনে,
শাশুড়ির অপূর্ব্ব যতনে,
গৃহবধূ-কার্য্য-পটুতায়—
শ্বশুর ও শাশুড়ি-সেবায়,
সন্তানের সহাস্য-বদনে,
পিতৃমাতৃ-চরণ-বন্দনে,
জামাইষষ্ঠীর উপচারে,
মিষ্টান্নে ও স্নেহ-উপহারে,
শ্যালিকার রঙ্গ ও লীলায়,
সৃষ্টিছাড়া ঠাট্টা তামাসায়,
ভগিনীর ভাই-ফোঁটা-মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!
মধুর গতিতে ও ভঙ্গিতে,
বিশ্বের বিপুল সুললিতে,
সুকবির ছন্দ-মহিমায়,
চিত্রকর-চিত্র-গরিমায়,
গায়কের রাগ-রাগিণীতে,
বাদ্যকর-তালের ভঙ্গিতে,
রাজহর্ম্ম্যে, মর্ম্মরের তাজে,
ভাস্করের শত চারু কাজে,
বিশ্বের বিপুল শোভা মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!

সেবাশ্রমে, সেবার ভিতরে,
রোগী, আর্ত্ত, দুঃখীর শিয়রে,
ক্লান্ত পান্থ ধর্ম্মশালা-মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!

অন্ন-সত্রে আর জল-সত্রে,
কলসীতে কদলীর পত্রে,
বিপুল বাসনাহীন কাজে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে
অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিতে,
সুবিচিত্র বেদের ধ্বনিতে,
উপনিষদের মহাজ্ঞানে,
পুরাণের ভকতি-আখ্যানে
যীশুর অপূর্ব্ব উপদেশে,
কোরাণের প্রখর আদেশে

অপরূপ অদভুত সাজে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে।

রবিহাস্তে, শশী-জোছনায়,
অনন্ত আকাশ-নীলিমায়,
ছায়াপথে তারকা-কুসুমে,
যামিনীর প্রশান্ত নিঝুমে,
রাঙ্গা উষা-হাসির ছটায়,
গোধূলির ম্লান সুষমায়,
শিখিপুচ্ছে, কপোত-গ্রীবায়,
সুন্দরীর বিচিত্র ব্রীড়ায়,
বসন্তের সুরভি নিশ্বাসে,
শরতের শশাঙ্ক-উল্লাসে,
বরষার অযুত প্রপাতে,
হেমন্তের হিমের সম্পাতে,
শৈলরাজ-তুষার-মুকুটে,
জলধির কোটী করপুটে,
অপরূপ অদভুত সাজে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে।

প্রতিমায়, বিগ্রহে ও পটে,
মন্দিরে, মসজিদে আর মঠে,
উপাসনা আর আরাধনে,
কীর্ত্তনে ও আত্ম-নিবেদনে,
ভকতের আকুল আহ্বানে,
সাধকের মুদ্রিত নয়ানে,
সিদ্ধ যোগী-যোগানন্দ-মাঝে,
হে সুন্দর, তব মূর্ত্তি রাজে!

*   *   *

আসিয়াছ? এস হে সুন্দর,
ভুবনমোহন, মনোহর!
চিরদিন নয়ন-অঞ্জন,
চিরদিন অপূর্ব্ব শোভন!
মুখচন্দ্র, নয়ন-মুকুর,
চিরদিন মধুর মধুর!
চিরদিন বদন-মণ্ডল,
রূপ ও লাবণ্যে ঢলঢল!
চিরদিন সুমধুর হাস,
চিরদিন সুললিত ভাষ!
চিরদিন নন্দন সৌরভ,
চিরদিন বসন্ত-গৌরব!
চিরদিন নয়ন-আনন্দ,
চিরদিন প্রাণ-মকরন্দ!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

খেলাঘর

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—হেমন্তর সুসজ্জিত কক্ষ। সন্ধ্যা হয়-হয়। নীরদা তাঁহার পূর্ব্ব-কল্পিত পুষ্প-শিল্প শেষ করিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। পর্দ্দা দিয়া এখন সেটি ঢাকা। তিনি একাকিনী কক্ষমধ্যে অস্বচ্ছন্দভাবে পায়চারি করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পর্দ্দা খুলিয়া নিজের কাজ দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন।

নীরদা। কে আস্‌চে না? (দরজার নিকটে গিয়া কান পাতিয়া শুনিলেন) না, কেউ নয়! (আবার ফিরিয়া আসিয়া পায়-

চারি করিতে লাগিলেন) ভারী বিশ্রী কিন্তু! উনি যা বল্লেন, সব বাজে কথা! এ রকম কখন হতে পারে? অসম্ভব!—আমার যে তিনটি ছেলেমেয়ে!—না—

(আয়ি প্রবেশ করিল) কি?

আয়ি। ঘরের ভেতর একলাটি কেন গা? বাইরে এস না। সন্ধ্যে হল যে!

নীরদা। লীলা দিদি ত কই এল না, আয়ি। কেন এল না?

আয়ী। কি জানি বাছা!

নীরদা। ছেলেরা কোথায়?

আয়ি। যে সব খেলনা তাদের দিয়েচ, তাই নিয়ে তারা এখন মেতে আছে।

নীরদা। আমার কাছে আসতে চাইছে না—আমাকে খুঁজচে না?

আয়ি। খুকী মাঝে মাঝে 'মা-মা' বলে চেঁচাচ্চে।

নীরদা। (তাড়াতাড়ি পর্দ্দা সরাইয়া) চট্ করে বাকী কাজটুকু সেরে ফেলে—না, আয়ি, ওদের নিয়ে এখন আর ঘাঁটঘাঁটি করব না।

আয়ী। ছেলেমানুষ কি না!—হাতে একটা কিছু পেলেই ভুলে থাকে।

নীরদা। সত্যি! আচ্ছা, আয়ি, তোমার কি মনে হয়? ওদের মা যদি জন্মের মত চলে যায়, তা হলে ওরা তাকে ভুলে থাকবে?

আয়ী। কি যে বল বাছা তার ঠিক নেই!

নীরদা। একটা কথা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার, আয়ি, তুমি তোমার ছোট মেয়েটিকে পরের কাছে রেখে কোন্ প্রাণে আমাদের বাড়ী চাকরি করতে এসেছিলে?—তোমার মনটা তখন কি রকম হয়েছিল?

আয়ি। উপায় ছিল না যে, বাছা। আর তা না হলে কি নীরোকে মানুষ করতে পারতুম? তারও যে মা ছিল না।

নীরদা। সে যেন বুঝলুম। তোমার মনটা তখন কি রকম হয়েছিল, তাই বল না!

আয়ি। কি করব বল! না এলে খেতে না পেয়ে আমিও মরতুম—মেয়েটাও মরত। তার চেয়ে তাকে পরের হাতে রেখে আসা ভালই হয়েছিল। মিন্সে কিছুই রেখে যায়নি ত!

নীরদা। তুমি না এলে আয়ি, আমি কিন্তু মরে যেতুম।

আয়ী। (গদ্‌গদ্ কণ্ঠে) নারো ছেলেবেলায় আমাকেই মা বলে জানত।

নীরদা। আমার ছেলেদুটি আর মেয়েটি এখন যদি তাদের মাকে হারায়, আমার বিশ্বাস আয়ি, তুমিই তাদের মা হয়ে—আঃ, মাথা-মুণ্ডু কি যে বকে যাচ্চি, তার ঠিক নেই! যাও তুমি এখন, আয়ি—ছেলেদের দেখগে। আমি চট্‌পট্ কাজ সেরে নি।

আয়ি। বেশ মা! (চলিয়া গেল)

(নীরদা দরজা বন্ধ করিলেন)

নীরদা। নাঃ, এখনও কারও দেখা নেই। এ কথা যে কাউকে বলবার নয়! নিজের আগুন নিজেকেই পুড়তে হবে। ওই যে কে আসচে!

(লীলাবতী প্রবেশ করিলেন)

কে, লীলাদিদি? এস এস। আমি তোমার জন্যই হা-পিত্যেশ করে বসে আছি।

লীলাবতী। আয়ি তাই বলছিল বটে।

নীরদা। তুমি যে দেরী করে এলে!

সবই প্রায় তৈরী। এস এখন দুজনে বসে গল্প করা যাক্।

(উভয়ে উপবেশন করিলেন)

লীলাবতী। তুমি ত নিজেই সব সাজিয়ে ঠিক করে রেখেচ দেখ্‌চি। তোমার পছন্দ ভারী চমৎকার!

নীরদা। আমার যা কিছু দেখ্‌চ, দিদি, সবই ওঁর কাছে শিক্ষা—এ আর বৃহৎ ব্যাপার কি? কিছুই নয়। কেবল দু'পাঁচ জনকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া, আমোদ করা আর কি!

লীলাবতী। তোমার এ উৎসবে যে যোগ দিতে পারলুম, এতে আমার কতখানি আনন্দ হচ্ছে, তা আর কি বলব? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আজ সকালে তোমাদের ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আলাপ হল। তাঁকে যেন কেমনতর দেখলুম না? বরাবরই কি উনি ঐ রকম?

নীরদা। ওঁর খুব শক্ত ব্যামো কি না, তাই কখন-কখন অমনতর দেখায়। বেচারী ক্ষয়রোগে ভুগচে। বাপের দোষেই ছেলের এই দুর্দ্দশা। বাপেরও শেষটা ঐ রোগ হয়েছিল—দিন-রাত তিনি নেশায় ডুবে থাকতেন।

লীলাবতী। উনি রোজ এখানে যাতা-য়াত করেন, বোধ হয়?

নীরদা। প্রত্যহ দুবেলা। নেহাৎ আপ-নার লোক—আর বে-থাও হয় নি। ওর কথা কেন এত জিজ্ঞাসা করচ বল দেখি?

লীলাবতী। আমার মনে একটা খট্‌কা বেধেচে, তাই।

নীরদা। খট্‌কা!

লীলাবতী। হ্যাঁ, সকালে যখন তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হল তিনি বল্লেন যে আমার নাম তিনি এ বাড়ীতে অনেক বার শুনে-ছিলেন, কিন্তু তোমার স্বামীর কথায় ত বোধ হল না, যে তিনি আমার নাম একবারও শুনেছেন। তোমার স্বামী জানলেন না, অথচ তিনি জানলেন কি করে, তাই বুঝতে পারচি না।

নীরদা। ও, এই কথা! কি জান, উনি চিরকাল নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। দিনান্তে যেটুকু ফুরসৎ পান, আমাদের ঘর-কন্নার কথাতেই তা কাটিয়ে দেন। তা'ছাড়া ওঁতে আর একটি চমৎকার জিনিষ আমি লক্ষ্য করেচি। ওঁর যা-কিছু কথাবার্ত্তা, যা-কিছু আলোচনা, সব আমাকে নিয়ে। আমার মুখে অন্য কারও প্রশংসা-আলোচনা শুনতে উনি ভালো বাসেন না। সেই জন্যে তোমার নাম ওঁর কাছে কখনও করিনি—কাজেই উনি শোনেন নি। ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার দুনিয়ার সব গল্পই হয়ে থাকে। তোমার গল্প ওর কাছে অনেকবার করেচি—তাই জানে।

লীলাবতী। নীরদা, তুমি যাই বল, তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে ছেলে মানুষের মত। আমি সংসারে অনেক রকম দেখেছি, আর আমার বয়সও তোমার চেয়ে বেশী, একটা পরামর্শ আমার শোন ত বলি। তোমার এই ডাক্তার ঠাকুরপোটির সঙ্গে যত শীগ্‌গির পার নিষ্পত্তি করে ফেল।

নীরদা। কিসের নিষ্পত্তি করে ফেলব?

লীলাবতী। সকালে তুমি একটি লোকের খুব তারিফ্ কচ্ছিলে না? কে তোমায় বিপদের সময় টাকা ধার দিয়েছিল?

নীরদা। তারিফ্ করবার কেউ নেই দিদি, আর।

লীলাবতী। আচ্ছা, তোমাদের এই ডাক্তার বাবুটি বেশ সঙ্গতিপন্ন, না?

নীরদা। হ্যাঁ, তা বটে।

লীলাবতী। বে-থা করেন নি, অন্য লোকও কেউ নেই যাকে ভরণ-পোষণ করতে হয়?

নীরদা। তা নেই, কিন্তু—

লীলাবতী। আর প্রত্যহ দুবেলা এখানে যাতায়াত করে থাকেন?

নীরদা। হ্যাঁ, সে ত আগেই বলেচি।

লীলাবতী। আর তিনি তোমাদের আত্মীয়।

নীরদা। হ্যাঁ।

লীলাবতী। আচ্ছা, তা হলে তোমাদের এই সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়টির কোনরকম অবিবেচনার কাজ করা কি সম্ভব?

নীরদা। তোমার কথা কিছুই বুঝ্লুম না ভাই।

লীলাবতী। আমার সঙ্গে ভাঁড়ামি করো না। তুমি কি মনে কর, আমি এতটুকুও আন্দাজ করতে পারিনি যে হাজার টাকা ঐ লোকটিই তোমাকে দিয়েছিল?

নীরদা। তুমি দিদি পাগল হলে নাকি! এ কথাটা তোমার মনে এল কি করে বল ত? যে আমাদের আত্মীয়, আর যে রোজ বাড়ীতে যাতায়াত করে, তার কাছে টাকা ধার নেওয়া—সেটা কি রকম বিশ্রী দেখায় বল দেখি?

লীলাবতী। তাহলে সত্যি সত্যি ওঁর কাছে নয়?

নীরদা। নিশ্চয়ই নয়! ওর কথা একবারও আমার মাথায় আসে নি। তা ছাড়া, সে সময় ত ওর অবস্থা ভাল ছিল না। টাকাকড়ি এই হালেই ওর হাতে এসেচে।

লীলাবতী। ভালই হয়েচে, তা হলে।

নীরদা। না, ঠাকুরপোর কথা আমার তখন মনেই আসে নি। কিন্তু ওর কাছে যদি চেয়ে বসতুম, ও নিশ্চয় তা হলে—

লীলাবতী। চাওনি যে, সেইটিই ভাল করেচ।

নীরদা। না, কখনই না। কিন্তু একবার যদি মুখ ফুটে ওকে বলতুম,—

লীলাবতী। তোমার স্বামীকে না জানিয়ে?

নীরদা। হ্যাঁ তা বই কি! অন্য লোকটির সঙ্গেও আমি শীঘ্রই নিষ্পত্তি করে ফেলবো—কিন্তু, তাও অবশ্য আমার স্বামীর অজ্ঞাতেই। যত শীগ্গির পারি সে লোকটির পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে।

লীলাবতী। হ্যাঁ,—আমি ঐ কথাই সকালে তোমাকে বলতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু, দেখ নীরো—

নীরদা। দেনা-পাওনার ঝঞ্ঝাট পুরুষমানুষেরই সাজে।

লীলাবতী। সে কথা আর বলতে!

নীরদা। আচ্ছা বলত দিদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দেনা চুকিয়ে দিলেই কাগজ-পত্র সব তার কাছ থেকে ফিরে পাব ত?

লীলাবতী। নিশ্চয়।

নীরদা। আর তখনি কুচি কুচি করে

ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবো। লক্ষ্মীছাড়া কাগজ!

লীলাবতী। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীরদার পানে চাহিয়া) নীরদা, তুমি আমার কাছে কোন কথা যেন গোপন কচ্চ।

নীরদা। অ্যাঁ,—আমার চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছে না কি?

লীলাবতী। নিশ্চয়! অবিশ্যি কিছু হয়েচে। কি হয়েচে নীরদা?

নীরদা। (আরও কাছে সরিয়া বসিলেন) তবে শোন দিদি সব কথা—ওই যা, উনি এদিকে আসচেন যে। সর্ব্বনাশ! তুমি কি দিদি তা হলে একটিবার ছেলেদের কাছে যাবে? উনি চলে গেলেই তোমায় ডেকে পাঠাব।

লীলাবতী। বেশ, বেশ, আমি ওদিকে ততক্ষণ বসিগে। জেনো বোন্, তোমার সব কথা ভাল করে শুনে তবে আমি এ বাড়ী থেকে নড়ব। [নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন]

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন)

নীরদা। এতক্ষণ কি বাইরে থাকতে হয়? তোমার জন্তে আমি হাঁ করে বসে আছি।

হেমন্ত। উনি কে বেরিয়ে গেলেন?

নীরদা। লীলাদিদি। আমরা বসে গল্প করছিলুম। তুমি এখন আপিসের কাজ নিয়ে বসবে নাকি?

হেমন্ত। (হস্তস্থিত কাগজের তাড়া দেখাইয়া) হাঁ্যা, আমি ব্যাঙ্ক থেকেই আসচি। ও, এখনও যে পরদা ঢেকে রেখেচ! আচ্ছা, আমি তবে ও ঘরে বসে কাজ করিগে।

(চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন)

নীরদা। (হাত ধরিয়া) দাঁড়াও না একটু।

হেমন্ত। কেন বল দেখি?

নীরদা। একটি কথা বলব?

হেমন্ত। কি কথা?

নীরদা। রাখবে, বল?

হেমন্ত। কোন উপরোধ-টুপরোধ নয় ত?

নীরদা। যদি রাখ, তা হলে আজ চমৎকার চমৎকার গান শোনাব।

হেমন্ত। সে লোকটার জন্তে অবিশ্যি কিছু বলবে না?

নীরদা। হাঁ্যা গো তারি কথা—তোমায় মিনতি করি—

হেমন্ত। তার কথা তুলতে আবার তোমার সাহস হচ্ছে?

নীরদা। আমার কথা তোমায় রাখতেই হবে, কামিখ্যেকে কিছুতেই তাড়াতে পাবে না।

হেমন্ত। তা আর হয় না। হুকুম পর্য্যন্ত বেরিয়ে গেচে—কামিখ্যেকে তাড়ান হবে, আর সেই বন্দোবস্তে তোমার লীলা-দিদির ভাইয়ের একটা চাকরি হবে।

নীরদা। সে তোমার অনুগ্রহ। কিন্তু কামিখ্যেকে তাড়িও না। তার বদলে না হয় অন্য কাউকে তাড়াও।

হেমন্ত। তা আর হয় না। হুকুম পর্য্যন্ত বেরিয়ে গেচে কামিখ্যেকে তাড়াবার।

নীরদা। ওগো, না, না! ও যে কত বড় পাজী, তা ত তুমি জান। চাকরি ওর গেলে, ও যে কতরকমে তোমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে, তা কি ভেবে দেখেচ?

শেষে হয়ত প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে! ও ত আমাকে সেই ভয়ই দেখিয়ে গেল!

হেমন্ত। আমি তত ভীরু নই, যে সামান্য একটা কেরাণীর কথায় ভয় পাব। আপিস-শুদ্ধ লোক জেনেচে যে কামিখ্যে বরখাস্ত হবে। এখন যদি আবার তা বদ্‌লে যায়, তাহলে সবাই মনে করবে, আমি স্ত্রীর কথামতই কাজ করি।

নীরদা। যদিই মনে করে, তাতে কি?

হেমন্ত। তা বটে! তোমার মত 'এক-গুঁয়ে যারা, তারা ওতে কোন দোষ দেখবে না ত! কিন্তু আপিসের লোকদের নজরে আমি কোনরকমে খাট হতে রাজী নই। এ রকম খামখেয়ালি কাজের ভবিষ্যৎ ফল ভাল হয় না, জেনো। এ সব ছাড়া এমন একটা ব্যাপার আছে, যার জন্যে আমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার থাকতে কামিখ্যের সেখানে থাকা চলতে পারে না।

নীরদা। কি সে ব্যাপার?

হেমন্ত। তার জাল-জুয়াচুরী, বদ্‌মায়েসী এ সব হয়ত আমি অগ্রাহ্য করলেও করতে পারতুম। কিন্তু, যে জিনিষটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না, সেটা হল তার অভদ্র, অবাধ্য ব্যবহার। ছেলেবেলায় দুজনে সহপাঠী ছিলুম—তার পর ইদানীং একটা সম্পর্কও হয়েছিল—কিন্তু সেই সব পুরানো ব্যাপার নিয়ে সে এখনও আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিতে ছাড়ে না।

নীরদা। দেখ, এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার—এতে নিশ্চয় তোমার মনে কিছু হওয়া উচিত নয়।

হেমন্ত। উচিত নয়?—কেন নয়?

নীরদা। কেননা, মনটাকে অত ছোট করে কোন জিনিষ দেখা উচিত নয়।

হেমন্ত। কি বল্‌চ তুমি?—ছোট মন? আমার ছোট মন!

নীরদা। না, তা বলছি না—

হেমন্ত। তুমি কথার ভাবে বল্‌চ, আমার মন ছোট অর্থাৎ আমি ছোট নজরে সব জিনিষ দেখি। আচ্ছা, তাই ভাল। আমি তবে ছোট নজরেই এবার কাজ করব। এখনই এর একটা হেস্তনেস্ত করব। (দরজার নিকটে গিয়া) বলাই—

নীরদা। কি করবে?

হেমন্ত। এই দেখনা, কি করি! (বলাই প্রবেশ করিল) দেখ বলাই, ব্যাঙ্কের চাপ-রাশি বাইরে বসে আছে। এই চিঠি আর এই টাকা নিয়ে তাকে দাও, আর বল যে এই সব নিয়ে এখনি যেন কামাখ্যা বাবুর হাতে সে দিয়ে আসে, জল্‌দি।

[বলাই চলিয়া গেল]

হেমন্ত। এবার কি হয়?

নীরদা। কিসের চিঠি ও?

হেমন্ত। কামিখ্যের বরখাস্তের চিঠি।

নীরদা। ওগো, ফিরিয়ে আন। এখনও সময় আছে। তোমার পায়ে পড়ূচি, এখনও ফিরিয়ে আন। যদি আমার ভাল চাও, তোমার ভাল চাও, ছেলেদের ভাল চাও ত ফিরিয়ে আন। আমার কথা রাখ, ফিরিয়ে আন। তুমি কি জান, ও চিঠিখানা আমাদের কি সর্ব্বনাশ ডেকে আনবে?

হেমন্ত। আর হয় না—লোক বেরিয়ে গেচে।

নীরদা। সত্যই আর হয় না। (অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িলেন)

হেমন্ত। (নীরদার হস্ত ধারণ করিয়া) এত ভয় পেয়েচ তুমি? কিসের ভয়? কেবল তুমি নাকি ভয় পেয়েচ, তাই আমি ব্যাপারটা গায়ে মাখ্‌লুম না; তা নইলে এটা কি কম অপমানের কথা! একটা কেরাণীর ধাপ্পা-বাজীতে ভয় পাওয়া অপমানের কথা নয়? তুমি কোন ভয় করো না। বিপদ আসে, আসুক, আমার সামর্থ্য এবং সাহস, দুই-ই আছে তাকে রোধ করবার। তুমি নিশ্চিন্ত হও। এর যত কিছু দায়িত্ব—যা কিছু বিপদ আমি একাই বহন করব।

নীরদা। (ভয়রুদ্ধ কণ্ঠে) কি বল্‌চ তুমি?

হেমন্ত। যা কিছু দায়িত্ব, আমি একাই তা—

নীরদা। তোমায় কখ্‌খন তা করতে দোব না।

হেমন্ত। আমরা স্বামী-স্ত্রীতে ভাগাভাগি করে নেব না-হয়? কেমন, এখন ত খুসী হলে? (নীরদাকে আবেগে জড়াইয়া ধরিয়া) মিছে কেবল তোমার ভয়! যত সব বাজে খেয়াল তোমার! কামিখ্যের কথা? সব ভুয়ো—সব ভুয়ো! এখন যাও, শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নাও। নিমন্ত্রিতেরা সব এলেন বলে। আমি ততক্ষণ খানিকটে কাজ সেরে নি। তারপর পেট ভরে তোমার গান শুনবো। রণেন এলেই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও কিন্তু!

[কাগজের বাণ্ডিল হাতে করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন]

নীরদা। (দরজা বন্ধ করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন) সে তা পারে—সে করবেই তা। আমি কিন্তু করতে দেব না—কখখনো না। আর যাই হোক, সেটি কিন্তু হতে দিচ্চি না।—ও কে আবার আসচে? ঠাকুরপো না? হ্যাঁ, সেই ত! ওকেও কিন্তু জানিতে দেব না—আর যাই হোক সে কথা কিন্তু জানতে দেওয়া হবে না—

(দরজা খুলিয়া দিলেন)

এস ঠাকুরপো। আমি দূর থেকেই তোমায় দেখেছিলুম। ওঁর কাছে এখন যেয়োনা—উনি ব্যস্ত আছেন।

রণেন্দ্র। আর তুমি, বৌদি?

নীরদা। কাজ-কর্ম্ম সেরে তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছি আর কি। বসোনা, ততক্ষণ গল্প-সল্প করা যাক্‌।

রণেন্দ্র। আমিও ত তাই চাই, বোঠান্‌ যে কটা দিন আছি, তোমাদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেই কাটিয়ে দি।

নীরদা। আহা, কথার শ্রী দেখ না!

রণেন্দ্র। শুনেই যে ভয় পেয়ে গেলে, বৌদি।

নীরদা। আচ্ছা তুমি কেমন আছ ঠাকুরপো?

রণেন্দ্র। যেমন থাকি। এগিয়ে চলেচি আর কি! তবে এত শীগ্‌গির যে অন্তিম-যাত্রা করতে হবে, তা ভাবি নি।

নীরদা। একটুতেই তোমার বাড়াবাড়ি। অসুখ করেচে, সেরে যাবে। অত অস্থির হলে কি চলে?

রণেন্দ্র। একেবারে সারবে, বোঠান্‌!

নিজে ত। আমি ডাক্তার, আমি বেশ ভাল রকম হিসেব করে দেখেছি, পরমায়ুর পুঁজি আর আমার বড় নেই। এক মাসের মধ্যেই দেউলে হব আর কি! বেশী দিন না, এক মাস। তার পরেই ভব পারের যাত্রা করব।

নীরদা। কি যে বল তুমি!

রণেন্দ্র। ব্যাপারটাই যে বিশ্রী, বোঠান। কিন্তু এখনও হয়েচে কি! যা দেখ্‌চ, এর চেয়েও বিশ্রী হয়ে দাঁড়াব, এই ক'দিনের ভেতর। এখন তবু উঠে হেঁটে বেড়াই, তখন আর তাও পারব না। তখন এক এক বার খবর নিও বোঠান। দাদাকে কিন্তু যেতে দিও না। উনি সৌখীন লোক। এ সব বিশ্রী জিনিষ ওঁর ধাতে সইবে না। আমার ওখানে ওঁর প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ।

নীরদা। আজ তুমি যা-নয়-তাই বকে যাচ্চ। একটু সুস্থির হও, মনটাকে প্রফুল্ল কর দিকি।

রণেন্দ্র। মৃত্যু যার শিয়রে দাঁড়িয়ে, তার আবার সুস্থিরতা, তার আবার প্রফুল্লতা! দোষ করে একজন, আর তার ফল ভোগ করে অপরে। দুনিয়ার নিয়ম কি চমৎকার!

নীরদা। আঃ, কি ছাই বকচ। চুপ কর—অন্ত কথা কও না!

রণেন্দ্র। ঠিক বলেচ বোঠান, কি ছাই বক্‌চি! আমি কিন্তু বুঝতে পাচ্চি নে, কি অপরাধ আমি করেচি, যার জন্তে আমার এই শাস্তি।

নীরদা। তুমি অধীর হচ্চ কেন, ঠাকুরপো? তোমায় আমরা অকালে হারাব না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

রণেন্দ্র। সয়ে যাবে। দুদিনেই আবার সয়ে যাবে। যারা চিরদিনের মত যায়, তাদের কথা শীগ্‌গিরই লোকে ভুলে যায়।

নীরদা। তোমার কথা ভুলে যাব, ঠাকুরপো?

রণেন্দ্র। মানুষ নিত্য-নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়ে, আর পুরাতনের কথা দুদিনে ভুলে যায়।

নীরদা। আমরা নূতন বন্ধনে বাঁধা পড়ব—?

রণেন্দ্র। দাদা আর তুমি দুজনেই। তোমার নিজের ত দেখ্‌চি, এরই মধ্যে তার সূত্রপাত হয়েচে। আচ্ছা বোঠান, তোমার বন্ধুটি যাঁর নাম লীলাদিদি, তোমার কাছে কি জন্তে তিনি এসেছিলেন, আর সমস্ত সকাল তোমরা কিসের পরামর্শ আঁটছিলে?

নীরদা। কেন ঠাকুরপো, তাকে দেখে কি তোমার হিংসে হচ্চে নাকি?

রণেন্দ্র। হ্যাঁ হচ্চে। সেই আমার স্থান দখল করবে। আমি যখন চলে যাবো, তখন এই স্ত্রীলোকটিই—

নীরদা। আহা, চুপ, চুপ,—চেঁচিও না। লীলাদিদি এই পাশের ঘরেই আছেন।

রণেন্দ্র। এ বেলাও আবার এসেচেন? তবেই বুঝতে পারচ, আমার কথা—

নীরদা। ওঁর জন্মোৎসবে নেমন্তন্ন করেচি, তাই এসেচেন। তুমি নেহাৎ অবুঝের মত কথা বলচ, ঠাকুরপো। আচ্ছা, একটা কথা বলি? একটা জিনিষ চাইব, দেবে?—না, কাজ নেই।

রণেন্দ্র। কি জিনিষ, বোঠান?

নীরদা। তুমি যে আমার হিতৈষী, বন্ধু, তারই একটা শক্ত পরিচয় আমি নিতে চাই। তুমি তা দিতে পারবে কি?

রণেন্দ্র। হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব।

নীরদা। আমার তা হলে অসীম উপকার করা হবে।

রণেন্দ্র। মরতে ত বসেচি। এ সময় তোমার একটা উপকার করব, সে লোভ কি ছাড়তে পারি?

নীরদা। কিন্তু তুমি জান না, ব্যাপারটি কি রকম গুরুতর।

রণেন্দ্র। তা সে যত গুরুতরই হোক্।

নীরদা। সে ব্যাপার আবার সকল জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে। আমি ভাল করে তা বুঝিয়েও তোমায় বলতে পারি না। এতে তোমার পরামর্শ, তোমার সাহায্য চাই, আর চাই তোমার অনুগ্রহ।

রণেন্দ্র। বুঝতে পাচ্চি না তোমার কথা। খুলেই বল না, কি? কেন, বিশ্বাস হচ্চে না?

নীরদা। একমাত্র তোমাকেই আমার বিশ্বাস হয়, সেইজন্যে আমার গোপন কথাটি তোমাকেই বলতে চাই। জানি, এ বিপদে তুমি আমার বন্ধু,— একমাত্র সহায়। তুমি—

(বলাই প্রবেশ করিল)

বলাই। বাবু ডাক্‌চেন ডাক্তার বাবুকে। আরও সেখানে অনেকে এসেচেন। (প্রস্থান)

নীরদা। এখন তবে বলা হল না— সে অনেক কথা। তুমি তবে এখন যাও। অন্য সময় সব বলব।

রণেন্দ্র। (উঠিয়া) কাজে কাজেই। দাদার আর তর সইল না।

(নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন)

(ঝি প্রবেশ করিল)

ঝি। (চুপি চুপি) মা, সে লোকটা অনেকক্ষণ থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে!

নীরদা। কে, কামিখ্যে বুঝি! তাকে বিদায় করে দিলি নে কেন?

ঝি। বলতে কসুর করিনি মা, কিন্তু সে কিছুতেই গেল না। তোমার সঙ্গে দেখা করে তবে যাবে।

নীরদা। হতচ্ছাড়া, পাজি! আচ্ছা, এক কাজ কর, তাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে আয়। দেখিস্, যেন এর বাষ্পও না কেউ টের পায়।

(ঝি চলিয়া গেল)

কি ভয়ানক! কপালে কি আছে, জানি না। (নীরদা পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গমন করিলেন। কামাখ্যাচরণ প্রবেশ করিল— তাহার আপাদ-মস্তক কাপড়ে ঢাকা) আস্তে কথা কয়ো, উনি বাড়ীতেই আছেন।

কামাখ্যা। আমার তাতে বয়েই গেল।

নীরদা। কি চাও তুমি আমার কাছে?

কামাখ্যা। একটা কৈফিয়ৎ।

নীরদা। আচ্ছা, চট্‌পট্ সেরে নাও— কিসের কৈফিয়ৎ?

কামাখ্যা। চাকরিটি আমার গেছে। কেমন, আপনি জানেন ত?

নীরদা। কি করব, রাখতে পারলুম না। তোমার জন্যে বলতে কসুর করিনি, কিন্তু কোনই ফল হল না।

কামাখ্যা। আপনার স্বামী তাহলে আপনাকে এতটুকুও খাতির করেন না দেখ্‌ছি। তিনি জানেন, এতে আপনার কি রকম অনিষ্ট হবে—জেনেও তাঁর এ সাহস হল?

নীরদা। আমার স্বামীর সম্বন্ধে একটু সম্ভ্রম করে কথা কয়ো। তিনি যে এ সব

জানেন, সে ধারণা তোমার কিসে হল? তুমি কি চাও এখন তাই বল। বেশী কথা কইবার আমার সময় নেই।

কামাখ্যা। একবার দেখা করতে এলুম। আজ আমি সমস্ত দিন কেবল আপনার কথাই ভেবেচি। আমি একজন কেরাণী, অতি তুচ্ছ ব্যক্তি, কিন্তু আমারও হৃদয় আছে—মায়া-মমতা আছে।

নীরদা। তা হলে আমার সঙ্গে অমন নিষ্ঠুরতা কচ্চ কেন? আমার ছেলেদের কথা, সংসারের কথা একবার ভেবে দেখ—

কামাখ্যা। আমায় ভাবতে বলচেন, কিন্তু আপনি বা আপনার স্বামী আমার কথা একবারও ভেবেচেন কি? যাক্ সে কথা। আমি কেবল আপনাকে জানাতে এসেছিলুম, আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ণ না হন, আমার দ্বারা প্রথমেই এ বিষয়ের কোন রকম আন্দোলন হবে না।

নীরদা। না, তুমি তা করবে না, আমি জানি।

কামাখ্যা। সমস্ত, গোলমাল আপোশে নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে। অন্য কেউ এর বাষ্পও টের পাবে না—কেবল আমরা তিন জনেই যা জানব।

নীরদা। আমার স্বামীকেও এর কিছু জানতে দেওয়া হবে না।

কামাখ্যা। তা কি করে হতে পারে? বাকী টাকা কি আপনি নিজেই দিতে পারবেন মনে করেন?

নীরদা। না, এখনই সব টাকা আমি দিতে পারব না।

কামাখ্যা। শীগ্‌গির শোধ দেবার কোন উপায় ঠিক করেছেন কি?

নীরদা। না, কোন উপায়ই আমার নেই।

কামাখ্যা। উপায় থাকলেও এখন আর সেটা কোন কাজেই আপনার লাগচে না। সব টাকা হাতে নিয়ে যদি আপনি দাঁড়িয়েও এখন থাকতেন, তা হলেও সে কাগজখানি আমি ফিরিয়ে দিতুম না।

নীরদা। কেন? সে কাগজ নিয়ে আপনি কি করতে চান?

কামাখ্যা। কেবল রেখে দেব—আর কিছু না। আমার কাছেই থাকবে সেটা। কেউ কিছু টের পাবে না। কোন ভয় নেই আপনার।

নীরদা। (নতমুখে নীরব রহিলেন)

কামাখ্যা। মন থেকে সব দুর্ভাবনা মুছে ফেলুন।

নীরদা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন) হ্যাঁ, একেবারেই সব মুছে ফেলব।

কামাখ্যা। অ্যাঁ, আপনি মনে মনে কোন গুরুতর সঙ্কল্প আঁট্‌ছেন না কি?

নীরদা। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ।

কামাখ্যা। না, না, ও সব ভাবনা ছেড়ে দিন।

নীরদা। আমি কি ভাবচি না ভাবচি, তুমি তার কি জানবে?

কামাখ্যা। ভাবনার ধরণটা অনেকের এক রকম কি না! আমিও একদিন ভেবেছিলুম, কিন্তু সাহস হয় নি।

নীরদা। (নিরুত্তর রহিলেন)

কামাখ্যা। আপনারও সে সাহস হবে না, নিশ্চয় বলতে পারি।

নীরদা। (নতমুখে) না, আমার সে সাহস নেই।

কামাখ্যা। যাক্, এক দায় থেকে বাঁচলুম। দেখুন, আমার স্বামীর জন্যে একখানা চিঠি আমি সঙ্গে এনেচি।

(পকেট হইতে চিঠি বাহির করিল)

নীরদা। সব কথা ওতে লেখা আছে বুঝি ?

কামাখ্যা। হাঁ, যতদূর সম্ভব নম্রভাবে গুছিয়ে সব কথা বলেছি।

নীরদা। (হস্ত প্রসারিত করিয়া) না, না! কিছুতেই তাঁকে দিতে পাবে না। ও চিঠি ছিঁড়ে ফেল বলছি—এখনি ছিঁড়ে ফেল। যেমন করে পারি, আমি টাকা দেব তোমায়।

কামাখ্যা। মাপ করবেন, সেটি করতে পারবো না।

নীরদা। তোমার বাকী টাকার কথা আমি বল্‌চিনে। যে টাকা তুমি আমার স্বামীর কাছে চাও, সেই টাকা আমিই তোমাকে দেব।

কামাখ্যা। একটি পয়সাও ত আমি তাঁর কাছে চাই নি!

নীরদা। কি চাও তবে ?

কামাখ্যা। শুনুন। আমি নিজেকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তাতে আপনার স্বামীর সাহায্য দরকার। এ-ক'বচ্ছর অত্যন্ত দুঃখে-কষ্টে আমি দিন কাটিয়েচি, তা ছাড়া কোন মন্দ কাজ করিনি। নিজের সামান্য উপার্জ্জনেই আমি সন্তুষ্ট ছিলুম। এখন তাও গেল। তাই আমি চাই, একটি ভাল রকম চাকরি, এই ব্যাঙ্কেই যে কোন উপায়ে হোক্ আমায় সে চাকরি পেতেই হবে। এতে আপনার স্বামীর সম্পূর্ণ হাত—তাঁকে দিয়ে এ কাজ করাতেই হবে।

নীরদা। তিনি কিছুতেই তা করবেন না।

কামাখ্যা। করতেই হবে তাঁকে। আমায় সাহায্য করতে তিনি বাধ্য। তারপর কাজে ঢোকা মাত্রই দেখে নেবেন, কি ব্যাপার হয়! এক বছরের মধ্যে আমি ম্যানেজারের ডান হাত হয়ে দাঁড়াব। তখন আমিই হব আসলে ব্যাঙ্কের হর্ত্তা-কর্ত্তা।

নীরদা। (হাসিয়া) কখনই তা হবেনা।

কামাখ্যা। কেন? হবে না কেন? এ হতেই হবে।

নীরদা। (নতমুখে) আমার এখন সাহস হয়েচে।

কামাখ্যা। (নীরদার কথা কাণে না তুলিয়া আপন মনে) একবার ঢুকতে পারলে হয়। দুদিনে তাকে নিজের বাধ্য করে ফেলবো।

নীরদা। অসম্ভব!

কামাখ্যা। (উত্তেজিতভাবে) আপনি ভুলে যাচ্চেন কেন যে আপনার মান-সম্ভ্রম এখন আমারই হাতে। (নীরদা কঠিন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন) শুনুন, আমার কথা। এখনো আপনি সাবধান হয়ে যান। বোকার মত কোন কাজ করবেন না। হেমন্তবাবু এই চিঠি পেয়ে একটা কিছু করবেনই—আপনারও তা জানতে বাকী থাকবে না। এই যে অপ্রীতিকর কাজে আমায় হাত দিতে হল, এর জন্য আপনার স্বামীই দায়ী! আমার ত এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি

করবার ইচ্ছে ছিল না। আমি তাঁকে এইবার দেখে নেব। তবে, চল্লুম এখন—বিদায়।

(দ্রুত প্রস্থান করিল)

নীরদা। (পূর্ব্বোক্ত কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দরজা অল্প ফাঁক করিয়া সম্মুখস্থ বারাণ্ডার দিকে দেখিতে লাগিলেন) চলে গেল। যাক্, চিঠিখানা বাক্সে তা হলে ফেলবে না। নাঃ, তা কি পারে? শুধু ভয় দেখাচ্ছিল বোধ হয়! বেচারীর কিন্তু বড় কষ্ট। ও কি! এখনও দাঁড়িয়ে আছে যে! সর্ব্বনাশ, চিঠির বাক্সের দিকে যাচ্ছে যে! ওই ত, ওই ত চিঠিখানা ফেলে দিয়ে চলে গেল! ওই যে দেখা যাচ্ছে চিঠিখানা। সর্ব্বনাশ, এবার সত্যি সত্যি সর্ব্বনাশ হল।

(লীলাবতী প্রবেশ করিলেন)

কেও; লীলাদিদি! এস ত এদিকে।

লীলাবতী। কি হয়েছে? এত অস্থির দেখ্‌ছি কেন?

নীরদা। এস না এদিকে। দেখ ত বাক্সের ভেতর চিঠি একখানা দেখতে পাচ্ছ কি! ঐ যে সামনে—চিঠির বাক্সের ভিতর?

লীলাবতী। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই ত রয়েছে।

নীরদা। কামিথ্যে ওখানা ফেলে গেল।

লীলাবতী। ও—কামিথ্যের, কাছেই টাকা ধার নিয়েছিলে?

নীরদা। হ্যাঁ দিদি, উনি এবার সবই জানবেন।

লীলাবতী। আমার ত মনে হয় বোন্, সেটা তোমাদের দুজনের পক্ষেই ভাল।

নীরদা। তুমি ত সব কথা জান না দিদি। আমি যে একটা নাম জাল করেছিলুম।

লীলাবতী। সর্ব্বনাশ! সে কি কথা!

নীরদা। একটি কথা কেবল তুমি আমার রাখ, দিদি। তুমি আমার সাক্ষী থাক।

লীলাবতী। কিসের সাক্ষী!

নীরদা। যদি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়—সে রকম হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়—যদি—

লীলাবতী। নীরদা,—

নীরদা। কিম্বা যদি এমন হয় যে, কোন কারণে আমাকে এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হয়—

লীলাবতী। নীরদা, সত্যই দেখ্‌ছি তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে।

নীরদা। আর এমন যদি হয় যে, কোন লোক নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ নিতে চায়—বুঝতে পাচ্চ?—তা হলে—

লীলাবতী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পাচ্চি। কিন্তু তুমি কি অনুমান কর যে—

নীরদা। তা হলে দিদি, তুমি আমার হয়ে সাক্ষী দিয়ে বলো যে সব মিথ্যে। এখন আমার মাথা এতটুকুও খারাপ হয়নি—আমি সজ্ঞানে বল্‌চি, এই ব্যাপারের জন্যে অন্য কেউ এতটুকুও দায়ী নয়। একা আমি নিজের বুদ্ধিতে এ কাজ করেচি। মনে রেখো দিদি, আমার এ কথা।

লীলাবতী। নিশ্চয় রাখব। কিন্তু আমি এর কিছুই বুঝতে পাচ্চিনে।

নীরদা। কি করে পারবে বল। দেখ দিদি, একটা মজা হয়ত এখনি দেখতে পাবে।

লীলাবতী। কি মজা?

নীরদা। ভারী মজা। কিন্তু কি

ভয়ঙ্কর! না—কিছুতেই হতে দেবনা তা—প্রাণ গেলেও না।

লীলাবতী। আমি এখনই গিয়ে কামিখ্যের সঙ্গে দেখা করব।

নীরদা। যেওনা দিদি, যেওনা। সে তাহলে তোমারও সর্ব্বনাশ করে ছাড়বে।

লীলাবতী। আমার কোন অনিষ্ট করবার সাহস তার হবে না। সে আমায় ভাল রকম চেনে।

নীরদা। তোমায় সে ভাল রকম চেনে?

লীলাবতী। হ্যাঁ। আমি একদিন তার বিশেষ উপকার করেছিলুম—বিষম সঙ্কট থেকে তাকে বাঁচিয়েছিলুম। আমি মিশনের চাকরি ছেড়ে যে ভদ্রলোকটির বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রীর কাজ কর্ত্তুম, কামিখ্যেও সেখানে রোজ যাতায়াত করত—তার মোক্তারির কাজ-কর্ম্ম নিয়ে। যাক্, সে অনেক কথা—আর একদিন বলব তখন। এখন বল দেখি, এখানে কোথায় ও থাকে?

নীরদা। ঝিকে জিজ্ঞাসা কর।

(হেমন্ত আসিয়া দরজায় ঘা দিলেন)

এই যে তুমি! কি চাও?

হেমন্ত। (বাহির হইতে) বলি, আমি ঘরের ভিতর একবার যেতে পাব কি?

নীরদা। একটু থাম, লক্ষ্মীটি। এই আমার কাপড় পরা হল আর কি!

(লীলাবতীর প্রতি—নিম্নস্বরে)

গিয়ে আর কি হবে দিদি? এখনি ত উনি চিঠির বাক্স খুলবেন।

লীলাবতী। চাবি কোথায়?

নীরদা। ওঁরই কাছে।

লীলাবতী। কামিখ্যেকে গিয়ে ধরব। কোন না কোন অছিলায় সে এখনি তার নিজের চিঠি ফিরে চাইবে।

নীরদা। কিন্তু অত করবার সময় কোথায় দিদি? এখনি ত উনি বাক্স খুলবেন—রোজ এই সময় খুলে থাকেন।

লীলাবতী। তুমি এক কাজ কর—যেমন করে পার ওঁর মন অন্যদিকে লাগিয়ে রাখ। আমি এই চল্লুম—এখনি ফিরে আসবো।

(দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন)

[নীরদা ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী অতি-দ্রুত যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া পরদাটি সরাইয়া ফেলিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে পুষ্পাধারের চতুর্দ্দিকে সজ্জিত বাতিগুলি জ্বালাইয়া দিলেন। উজ্জ্বল আলোকে গৃহ খানি ঝলমল্ করিয়া উঠিল—পুষ্পের সুমধুর গন্ধে কক্ষ আমোদিত হইল। এইবার তিনি একখানি সুন্দর বসন পরিধান করিলেন। তারপর, নিঃশব্দে কক্ষের অর্গল মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বাজনার নিকট গিয়া বসিলেন এবং গান ধরিলেন)

"ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি!
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি!
তুমি এস হৃদে এস, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্য-ভাতি!
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা,
আমি সকল কুঞ্জ-কানন ফিরি এনেছি যূথি জাতি।
তব পদতল-লীনা, বাজাব স্বর্ণ-বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস-সাথী!"

[গানের শব্দ পাইয়াই হেমন্ত ঘরে ঢুকিয়া একখানি আসন দখল করিয়া বসিয়া

ছিলেন। নীরদার সঙ্গীতে তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার রচিত অপূর্ব্ব পুষ্পসজ্জা দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও মোহিত হইতেছিলেন]

হেমন্ত। এ যে মেঘ না চাইতেই জল! আচ্ছা, তোমার মতলবখানা কি? আজ কি ফুল-শয্যার পুনরভিনয় হবে নাকি? তা বেশ! কিন্তু একা একা শুনলে ত চলবে না। রণেন বেচারা কি দোষ করলে? ছেলেরা সব গেল কোথা? আমি চিঠির বাক্সটা খুলে, চিঠিপত্র গুলো দেখে শুনে ওদের সবাইকে নিয়ে আস্‌চি। (উঠিতে উদ্যত হইলেন)

নীরদা। (বাজনার সুর দিতে দিতে) ছেলেরা ঘুমুচ্চে। আর কাউকে এখন ডাকতে হবে না। খাবার তৈরী হতে এখনও দেরী আছে। ততক্ষণ আমরা একটু গান করি, বসো। ওগো, তুমি একাই শোনো, আমি গাই—

(নীরদা গান ধরিলেন)

"আমি যে আর সইতে পারিনে।
সুর বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।
হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথা-ভরা ফুলের ভারে গো,
আমি যে আর সইতে পারিনে।
আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কি হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্ম্মরে।
কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারিনে॥"

(হেমন্ত গানে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। নীরদা তাঁহার দিকে কটাক্ষমাত্র করিয়া আবার গান ধরিলেন)

"মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়!
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়-রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়॥"

নীরদা। আঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

হেমন্ত। সুন্দর! ভারি চমৎকার! —আচ্ছা, তুমি একটু জিরোও, আমি ততক্ষণ চিঠিগুলো বার করে নিয়ে আসি, এখানেই বসে বসে দেখবো—অনেক জরুরী খবর আসবার কথা।

(হেমন্ত উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইবামাত্র নীরদা আবার গান ধরিয়া দিলেন)

"ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে,
শেষ হল মোর গান;
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।
অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলাম আনি,
ঐ হাতে মোর হাত দুটি লও
লও গো আমার প্রাণ।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা
চুকিয়ে লও গো ভয়।
বিরোধ আমার যত আছে
সব করে লও জয়।
লও গো আমার নিশীথ-রাতি,
লও গো আমার ঘরের বাতি,
লও গো আমার সকল শক্তি,
সকল অভিমান।
"এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।"

(গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই হেমন্ত কক্ষের বাহির হইয়া গিয়াছিলেন)

ক্রমশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

সাহিত্য

(ফরাসী হইতে)

২

স্বদেশী ভাষায় গ্রন্থরচনা

অবশ্য, য়ুরোপের প্রভাবাধীনে ভারত-বাসীদিগের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এক্ষণে উহারা ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থশাস্ত্র, দর্শনের অনুশীলন করিয়া থাকে। উহারা প্রাচ্য দেশের লোক, উহাদের কি তবে কবিতা গল্প ও ব্যঙ্গরচনা আর ভাল লাগে না? সাহিত্যের এই সকল বিভাগের অনুশীলন উহাদের দেশীয় ভাষায় হইয়া থাকে। ইংরেজীর অনুকরণে সমস্তই রূপান্তরিত হইয়াছে। পরমাশ্চর্য্য আখ্যানের পরিবর্ত্তে ঐতিহাসিক উপন্যাস, তারপর সামাজিক উপন্যাস; যাত্রা ও পৌরাণিক নাটকের পরিবর্ত্তে, সামাজিক নাটক। য়ুরোপীয়দিগের অন্তর্মুখী কবিতা, প্রাচ্যদিগের বহির্মুখী কবিতার স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে, সাহিত্যের কোন কোন বিভাগে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে ও খুব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া লিখিবার যে রীতি আছে—দেশীয় ভাষাকে দুম্‌ড়াইয়া মোচড়াইয়া সেই লিখন-রীতির উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যায়।

এক্ষণে, প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষার ক্রমবিকাশের অনুসরণ করা যাক্।

উর্দ্দূ। ১৯ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে, ১৮ শতাব্দীর প্রচলিত ধারা অনুযায়ী গতানুগতিক ধরণের কবিতা পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রকার কবি ছিলেন মুমিন্ (১৮৫২ অব্দে মৃত্যু হয়); নাশির (১৮৪২ বা ৪৩ অব্দে মৃত্যু হয়); আতাস্ (১৮৪৭ অব্দে মৃত্যু হয়)।

মামনুনের একটি কবিতার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

"রাত্রে, বুল্‌বুলের ন্যায় আমার আর্ত্তনাদ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। কিন্তু তাহাদের তীর আমার পাষাণ হৃদয়ে ঠেকিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে...

বন্ধু বিনা আমি আর কার কাছে বিশ্বাস করিয়া আমার হৃদয়-বেদনা নিবেদন করিব, আমার হৃদয় আমার বন্ধুকেই বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে...

যখন আমার কলম আমার হৃদয়-জ্বালা কাগজে লিপিবদ্ধ করে তখন সেই কাগজ হইতে অনল-শিখা নিঃসৃত হয়"...(১)

কবিতার সঙ্গে সঙ্গে, আইন ও ধর্ম্মের গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থে আরব ও পারসীকদিগের পুরাতন শ্রেষ্ঠ রচনা-সমূহের পুনরাবৃত্তি আছে।

৩০ বৎসর হইতে, প্রচুর পরিমাণে (১৯০০ অব্দে ১০৭৪ গ্রন্থ মুদ্রিত) সাহিত্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

য়ুরোপীয় গ্রন্থাদির অনুশীলনে নূতন ভাব মিশ্রিত হইয়া এই সকল গ্রন্থকে একটু রূপান্তরিত করিয়াছে। মুসলমান কবিতা-গ্রন্থ ও ধর্ম্ম-গ্রন্থে গতানুগতিক আদর্শটি বজায় আছে; কিন্তু উপন্যাস ইংরেজী গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিস্তর অনুবাদ:—সেক্স-পিয়ার, লিটন্ ("পম্পেয়াইর শেষদিন" পর্য্যন্ত); আবার অনেক দুর্নীতিমূলক উপন্যাস, চুরী ও গুপ্তহত্যার গল্প।

এই তিন বৎসরের মধ্যে, কতকগুলি চিত্তাকর্ষক রচনা বাহির হইয়াছে—"তুর্ক-গ্রীক যুদ্ধ", "সাদীর কবিতার সমালোচনা", "আমীর আবদুল-রহমানের জীবনী", "ইংলণ্ডের ইতিহাস" (রুমান ব্রিটানিয়া)।

*
* *

বস্তুতঃ লিখিত-হিন্দী একটি সাহিত্যিক ভাষা। অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল অসংখ্য উপভাষা কথিত হয়, হিন্দী তাহা হইতে ভিন্ন। এই আধুনিক কালে, সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষাগুলি যেরূপ শক্তি-শালী সাহিত্য উৎপাদন করিয়াছে, হিন্দী সেরূপ পারে নাই।

১৯ শতাব্দীর প্রারম্ভে, কবি লাল্লুলাল "প্রেম-সাগর" নাম দিয়া ভাগবদগীতার অনুবাদ করেন; এই প্রেমসাগর ও তুলসী দাসের রামায়ণ—এই দুই গ্রন্থই হিন্দুস্থানে সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়। সন্ধ্যাকালে গ্রাম্য লোকেরা কথককে ঘিরিয়া বসে; কথক প্রেমসাগরের ছন্দোবদ্ধ গদ্যরচনা সুর করিয়া গান করে, প্রেমের দেবতা কৃষ্ণের প্রেম-লীলা ও মৃত্যুর বর্ণনা করে।

প্রেমসাগর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—রাজকুমারী রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণের বিবাহ স্থির হইয়াছে। রুক্মিণীকে পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ বলিলেন, তাঁহাদের এই বিবাহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ। রুক্মিণী মূর্চ্ছিত হইলেন।

তখন কৃষ্ণ:—"এই ললনার মৃত্যু আসন্ন", এই কথা বলিয়াই, স্বকীয় দিব্যরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া, দুই বাহুতে তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইয়া, নিজের জানুর উপর বসাইলেন; তৃতীয় হস্তের দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, চতুর্থ হস্তের দ্বারা আলুলায়িত অলকদাম ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া দিলেন—কখন-বা হরি স্বকীয় রেশ্‌মী বস্ত্রের দ্বারা তাঁহার চন্দ্রবদন মুছাইতে লাগিলেন,

(১) Garcin de Tassy, Litterature Hindouie et Hindostanie.

কখন-বা তাঁহার কোমল করপদ্ম তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপন করিলেন।

হরি বলিলেন :—"সুন্দরি, প্রিয়তমে, তোমার হৃদয়ে সাহস নাই, তাই, আমি যাহা ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলাম তুমি তাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছ; তুমি সত্যই মনে করিয়াছ আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আশ্বস্ত হও প্রিয়ে, তোমার মনকে শান্ত কর, চক্ষু উন্মীলন কর; যতক্ষণ না তুমি আমার সহিত কথা কহিবে, ততক্ষণ আমার মনের কষ্ট দূর হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া রুক্মিণীর আবার চৈতন্য হইল, রাজকুমারী স্বকীয় পদ্মনেত্র উন্মীলন করিলেন। "কিন্তু একি! আমি কৃষ্ণের কোলে?"—নিজের এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন এবং হরির চরণতলে পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ( )।

প্রেমসাগর ও তৎসদৃশ গ্রন্থাদির প্রভাব হিন্দী সাহিত্যে সংরক্ষিত হইয়াছে; জনসাধারণ, রমণীবৃন্দ, এবং অনেক শিক্ষিত হিন্দু এখনো অতীত ছাড়া আর কিছুই জানিতে চাহে না। কিন্তু ভালই হোক্, মন্দই হোক্, বলপ্রদই হউক বা অস্বাস্থ্যকরই হউক, উপন্যাসে কিংবা আরও গম্ভীর ধরণের রচনায়, বর্ত্তমানের প্রভাব এখনই অনুভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি, বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া সত্বেও (১৮৯৯ অব্দে ৭৯৯ গ্রন্থ, ১৯০০ অব্দে ৭০০ গ্রন্থ) হিন্দী সাহিত্যে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ অতি অল্পই আছে।

* * *

পক্ষান্তরে, গত শতাব্দীতে যে ভাষা উল্লেখযোগ্য ছিল না, সেই গুজরাটী ভাষা,—বোম্বাই প্রদেশের উন্নতি ও পার্শীদিগের বর্দ্ধনশীল প্রভাবের কল্যাণে—ভারতের একটি প্রধান ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গুজরাটী লেখকের মধ্যে সব চেয়ে প্রসিদ্ধ—মালাবারী। বোম্বায়ের দুই ইংরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক ও ইংরেজী আখ্যান ও পদ্যের গ্রন্থকার মালাবারী, গুজরাটী কবিতার জন্যই বেশী প্রসিদ্ধ। "নীতিবিনোদ", "তরোদ্-ই-ইত্তেফক্" এবং খুব হালে "জীবনের অভিজ্ঞতা" (অনুভাবিক) (১৮৯৪) এবং "মনুষ্য ও জগৎ" (১৮৯৮) এই গ্রন্থগুলি তাঁহার রচিত। জীবন-চাঞ্চল্যে অনুরঞ্জিত ও মৈত্রীর দ্বারা অনুপ্রাণিত মালাবারীর যে কবিতা সেই কবিতার লিখন-ধারা ও মর্ম্মভাব সম্পূর্ণরূপে য়ুরোপীয়। (৩)

(২) প্রেমসাগর (Chap. LXI) Trad. Pincott, P. 215.

(৩) জননীর মৃত্যুতে মালাবারী নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন; ইহা আমি M. Tissotর অনুবাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছি।

"যখন আমার পরম পূজনীয়া মাতার মৃত্যু হইল, আমি মর্ম্মাহত হইয়া ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, আমার দুঃখ-শান্তির জন্য কোথায় মাথা রাখিব তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না! হতভাগ্য মা আমার, তাঁর অদৃষ্টে কত দুঃখই ছিল। বসন্তের আরম্ভেই তাঁহার সৌন্দর্য্য-কুসুম শুকাইয়া গেল; তাঁহার জীবন-শিখা অস্থির ভাবে জ্বলিতে লাগিল—মনে হইল যেন এক ফুৎকারেই নিবিয়া যাইবে।

মালাবারীর রচনা হইতে গুজরাটী সাহিত্যের মূল্য বুঝা যায় এবং নিম্নলিখিত সংখ্যাঙ্কগুলি হইতে, গুজরাটী সাহিত্য যে একটা উল্লেখযোগ্য সাহিত্য তাহাও উপলব্ধি করা যায়ঃ—১৮৯৯ অব্দে ৪৪৪ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়; তন্মধ্যে ইংরেজী ভাষান্তর-অনুসারে অনূদিত "টেলিমেকসের" অনুবাদ একটি। ১৯৯ অব্দে ৪৫৩ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; তাহার অন্তর্ভুক্ত

"তথাপি, যখন বৎসরের পর বৎসর দারুণ দুঃখ আসিয়া তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণকে এবং ব্যাধি আসিয়া তাঁহার দুর্ব্বল দেহকে অধিকার করিল, তখন এই রোগে তাপে আকুল হইয়াও, মধুরতম সুধারসে আমার দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য যত্ন করিতে তিনি ভুলেন নাই।

বসন্ত-সমীরণে গোলাপ-কলিকা প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ তাঁহার স্নেহের চুম্বনে আমার কপোলদেশ পুলকে বিকসিত হইয়া উঠিত।

"মাতৃ-হারা শিশুর কি দুর্ভাগ্য।...ভবিষ্যৎ জীবনে অবশ্য এই অনাথ শিশু স্বকীয় ভগবদ্দত্ত শক্তি হইতে সুফল লাভ করিবে এবং অনেক গুপ্ত সুখের আস্বাদন করিবে; কিন্তু আর কখনই সেরূপ পূর্ণ আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে না। মাকে হারাইলে পুত্র কি করিয়া সুখী হইবে?"

নিদ্রাহীন জীবন

"হে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর! তোমার সেবক না জানি কি দোষ করিয়াছে? আমার অতীত জীবন যতই আলোচনা করি—দেখিতে পাই, তখনকার দিনগুলি ভাল ভাবে কাটে নাই; আমার অন্তরের অন্তর প্রদেশ যতই কেন তলাইয়া দেখি না—বিশুদ্ধ জীবনের কোন্ নিয়ম আমি লঙ্ঘন করিয়াছি তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ধনী দরিদ্রের মধ্যে আমার হৃদয় একটুও পার্থক্য কখনো স্থাপন করে নাই।

"তবে কেন, হে সর্ব্বশক্তিমান, আমার হৃদয়ে শান্তি পাই না! তবে কেন আমার মনে শান্তি নাই, আমার এই হতভাগ্য দেহ স্বাস্থ্য হইতে বঞ্চিত? আমার অপরিচিত বন্ধু এই কবিতার পাঠকবৃন্দ, তোমরা আমার এই জীবন-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর—যে জীবন চিরদিন নিদ্রা হইতে বঞ্চিত।

"আমার ১০ বৎসর বয়স হইতে আমি নিদ্রার আরাধনা করিয়া আসিতেছি, আজ চল্লিশে পড়িয়াছি, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমি একটি রাত্রিও চোখ বুজিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না; নিদ্রামগ্ন হইয়া দিবসের ভাবনা-চিন্তা কখনই ভুলিতে পারি নাই।

"দিবালোকে আমি যে সকল চিন্তায় মগ্ন থাকিতাম, যে সকল প্রাণী আমার পাশ ঘেঁসিয়া যাইত, যে সকল দৃশ্য আমার নেত্র-পথে পতিত হইত—সে-সমস্ত নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমার স্মৃতিপটে নূতন ভাবে আবির্ভূত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব কত অদ্ভুত বিকট আকার ধারণ করিত। দারুণ ভয়ে আমার হাতের তেলো পর্য্যন্ত ঘামিয়া উঠিত।

"দিবালোকে যখন আমি ভাবিতাম আমার মতো কত হতভাগ্য লোক এইরূপ কষ্ট পাইতেছে, তখন আমার মন কারুণ্যরসে আপ্লুত হইত; কিন্তু যখন আবার ধরণীমণ্ডল অন্ধকারে আবৃত হইত এই করুণাই আমার কল্পিত দৃশ্যগুলিকে আরও তীব্র ও উজ্জ্বল আকারে অঙ্কিত করিয়া আমার অন্তঃকরণকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিত।

"আমার স্বভাব এইরূপ যে, যদি কোন রোরুদ্যমান বিধবা আমার নেত্রপথে পতিত হয়, তখন আমার মনে হয়, আমি যেন আর একটা জীবন ধারণ করিয়াছি এবং পুরুষ হইয়াও আমি যেন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যদি কোন রোগী, কিংবা অন্ধ, কিংবা কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি আমার নয়ন-পথে পতিত হয়, তখনও আমার

—কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ (৪)।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে সংস্কৃত হইতে হইতে উৎপন্ন আর দুই ভাষা উল্লেখযোগ্য। মরাঠী (২৪২ গ্রন্থ ১৯০০ অব্দে প্রকাশিত) ও পাঞ্জাবী (৩৪৭ গ্রন্থ)।

মরাঠী সাহিত্যে—কবিতা, উপন্যাস ও অনুবাদ।

পাঞ্জাবীতে অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য—কতকটা মুসলমানী ও কতকটা হিন্দু ধরণের (৫)

দ্রাবিড়ীয় ভাষাগুলিরও উন্নতি হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটির প্রচুর সাহিত্য আছে:—তামিল (১৯০০ অব্দে ২৮৬ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়), তেলুগু (২৫৮ গ্রন্থ) ও মলয়লম্ (৩৯ গ্রন্থ)। কিন্তু এই সকল মুদ্রিত গ্রন্থের অধিকাংশই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যান ও উপন্যাস; —উপন্যাসগুলি তেমন চিত্তাকর্ষক নহে। শিক্ষিত মান্দ্রাজীরা ইংরেজী লিখিতেই বেশী ভাল বাসে: ১৯০০—১৯০১ অব্দ মধ্যে ১২২৯ ইংরেজী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই ৩৬৬ গ্রন্থ রেজেষ্টারি হয়।

* *
* *

সমস্ত ভারতীয় ভাষার ক্রমবিকাশের মধ্যে, ভারতবাসীদিগের য়ুরোপকে জানিবার চেষ্টা, য়ুরোপকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা প্রকাশ পায়; কেবল বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্রম-বিকাশে একটা "লজিক্যাল" ধরণের ও একটা সর্ব্বাঙ্গীন ক্রমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ-অধিকারের পূর্ব্বে, বঙ্গদেশ ভারতের জ্ঞানানুশীলন-ক্ষেত্রে একটা গৌণ স্থান অধিকার করিত; তথাপি, হিন্দু চিন্তা-প্রবাহে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা বঙ্গের সাহিত্যিক ইতিহাসে বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পায়। মধ্যযুগে সংস্কৃত গ্রন্থের সরল অনুবাদ:—কাশীরাম

মনের ঐরূপ অবস্থা হয়। আতঙ্ক, মৃত্যুভয়, অন্ধতার যন্ত্রণা, দারিদ্র্য-কষ্ট অনুভব না করিয়া আমার জীবনের একদণ্ডও কাটে নাই।

"এই হতভাগ্যদের আর্ত্তনাদ দিবারাত্রি আমাকে অনুসরণ করিতেছে। তাহাদের যাচ্ঞা ক্রমাগত আমার মনকে আলোড়িত করিতেছে। একমুহূর্ত্তও তাহাদের কথা আমার স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া যায় না। যতক্ষণ না আমি এই হতভাগ্যদিগের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হই ততক্ষণ হাসিতেও সাহস করি না।

"যেন একটা প্রকাণ্ড ভারী পাথরের চাপে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। মানবের অপরিমেয় অনন্ত দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবিয়া আমার মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে! আমার অ-জানা বন্ধু সকল! যখন আমি শয্যায় শয়ন করি, তখন এই সকল দুঃখ-কষ্টের চিন্তা আমাকে অনুসরণ করে, এবং অনিদ্রায় আক্রান্ত হইয়া আমি অবিরাম এপাশ ওপাশ করিতে থাকি।

(৪) তিন জন পার্শী মহিলা (১৯০০-১৯০১) গুজরাটীতে নিম্নলিখিত গ্রন্থ রচনা করেন—"প্রসিদ্ধ নারীদিগের জীবনী" যথা—"ভিক্টোরিয়া", "জেন্ গ্রে", "মেরিয়া থেরিসা", "মারী-আঁতোয়ানেৎ", "প্রথম নেপোলিয়নের জননী", ইত্যাদি।

(৫) ১৯০০-১৯০১ অব্দে, "শীতের গল্প" ও "মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিসের" পাঞ্জাবী অনুবাদ।

* সংখ্যাঙ্ক গুলি Administrative Statistics Vol. XXV. হইতে গৃহীত।

দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ। ষোড়শ শতাব্দীতে যোগধর্ম্মী (মিস্‌টিক) চৈতন্য, নৈয়ায়িক রঘুনাথ এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন: এই যুগের সমস্ত ভাব-গতিই কৌতূহলাবহ ও জটিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম— যাঁহাতে "ক্লাসিক" কবির সুর আছে, কিন্তু যাঁহার কবিতার বিষয় সাধারণ গৃহস্থ সমাজ-ঘটিত। তিনি শান্তিময় সুব্যবস্থিত যুগের মুখপাত্র ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব। ইঁহার কবিতা, পদলালিত্য, শব্দচাতুর্য্য ও আদিরসের জন্য প্রসিদ্ধ। আর একজন কবি—রামপ্রসাদ। ইনি সরল গ্রাম্য ধরণের কবি।

তাহার পর,—যে সময়ে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ফ্রান্স ও য়ুরোপকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই একই সময়ে তদপেক্ষাও পূর্ণধরণের একটা বিপ্লব বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়: ইংলণ্ড বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া তাহার উপর য়ুরোপীয় সভ্যতা চাপাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদের সরল গান ও ভারতচন্দ্রের কামগন্ধী আদিরসাশ্রিত লঘুধরণের কবিতার পর রামমোহন রায়ের পৌরুষিক ও "মিস্‌টিক" রচনার আবির্ভাব। ফ্রান্সে যেরূপ Ducis ও Parreyর পরে Chateaubriandর আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহা সেইরূপ। তথাপি চিরাগত সাহিত্যিক ধারাটি অব্যাহত ছিল; সাহিত্য স্বাভাবিক কার্য্য-কারণের নিয়ম অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু পরে কতকগুলি গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রতিক্রিয়া-শক্তি জাগিয়া উঠিল।

রামমোহন রায়ের পর সমস্ত সাহিত্য নবীভূত হইল। একদিকে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮০৯-৫৮) Aristophanএর মতো রক্ষণশীল ও পরিহাস-রসিক, বিদ্রূপ-কশার দ্বারা য়ুরোপের পক্ষপাতী, উদারমতাবলম্বী বৈপ্লবিকদিগকে চাব্‌কাইতেছিলেন, অপর দিকে সেইরূপ অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৯১), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ, একেশ্বরবাদের পক্ষ ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষ সমর্থন ও পোষণ করিতেছিলেন। সকলের অগ্রগণ্য ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—৯১); উনবিংশ-শতাব্দীর একজন মহানুভব ব্যক্তি, পাণ্ডিত্য-পূর্ণ শক্তিশালী লেখক, এবং সর্ব্বোপরি সমাজ সংস্কারক:—১৮৫৫ অব্দে প্রকাশিত তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। Sceley প্রণীত Ecce homo গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণকে দেবতার মধ্যে গণ্য করেন নাই, তাঁহাকে একজন ধর্ম্মশীল বীরপুরুষ, শান্তিপ্রিয় ও সভ্যতা-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তিনি বলেন,—গোপীগণ ও রুক্মিনী—এ সমস্ত কবিকল্পনা।

উপন্যাস-রচনায় সেই একই গতিবেগ, সেই একই নমনীয়তা, সেই একই লেখার জোর। গ্রন্থরচনার সংখ্যা অগণিত, কিন্তু তিন জন বিশেষরূপে এই যুগের সাহিত্যের স্বরূপপরিচায়ক।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯—৭৩) বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেই নীল-দর্পণ (১৮৬০) নাটক লিখিয়া নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, উহাতে রায়তদিগের দুঃখ

ও ইংরেজ নীলকরদিগের অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। এই নাটক পাঠ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই সমস্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের উপায় অবলম্বন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১;৩৮—৯৪) ঐতিহাসিক উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" ও "কপালকুণ্ডলা" এবং সামাজিক উপন্যাস "বিষবৃক্ষ" লিখিয়া হিন্দু উপন্যাসের সৃষ্টি করেন।

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩) "মেঘনাদবধ" নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালী মহাকাব্য রচনা করেন। ইহার বিষয় রামায়ণ হইতে গৃহীত:—রাবণ-নন্দন মেঘনাদের মৃত্যু।

মধুসূদন বাল্মীকির কবিতাকে হোমর-ধরণের মহাকাব্যে পরিণত করিলেন। উহাতে আর সেরূপ বানর নাই, বহু-বাহু-বিশিষ্ট সেরূপ দেবতা বা দৈত্যও নাই। উহাতে রাবণ বিকটাকার রাক্ষস নহে,—একজন রাজা মাত্র; রাবণ সীতাকে যে হরণ করে, সে গর্ব্বের বশে, কামের বশে নহে। তা ছাড়া, কারাবদ্ধ সীতারাণীর দুঃখ-কষ্ট সুন্দর-রূপে বর্ণিত হইলেও, সীতা মেঘনাদবধের নায়িকা নহেন। মেঘনাদ ও তাহার পত্নী প্রমীলা—যাহাদের বিদায়-সম্ভাষণ হেক্টর ও অ্যান্ড্রোমেকসের বিদায়-সম্ভাষণকে স্মরণ করাইয়া দেয়—গ্রন্থের সমস্ত রসবিকাশের চেষ্টা ও আগ্রহ ঐ দুইজনের উপরেই সংকেন্দ্রিত হইয়াছে। মেঘনাদ, রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন; রাবণ আবার লক্ষ্মণকে বধ করিলেন। কিন্তু রাম নরকে প্রবেশ করিয়া নরক-দেবতাদিগের নিকট হইতে লক্ষ্মণের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লক্ষ্মণকে ফিরিয়া পাইলেন। মেঘনাদের শেষ-সর্গে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা আছে; প্রমীলা সহমৃতা হইলেন।

বাঙ্গালীরা মধুসূদনের লিখনরীতি ও সুন্দর পদ্য রচনার খুবই প্রসংশা করে। বাঙ্গলা ভাষায় মধুসূদনই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার যুদ্ধের বর্ণনা এবং যাহাতে প্রকৃত মানব-হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সব দৃশ্যের বর্ণনা সম্বন্ধেও বাঙ্গালী লেখকেরা প্রশংসা করিয়া থাকে। যেটা খুব য়ুরোপীয় বলিয়া চোখে ঠেকে—সেটা হচ্ছে কবিতার মর্ম্মভাবটি। হোমরের ও বাল্মীকির অনুকরণ, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন,—হিন্দু ও য়ুরোপীয় ভাবের সম্মিলন,—এই সমস্ত হইতে ভারত-বাসীদিগের স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতিসাধন এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের চরিত্র-সংগঠনের একটা প্রয়াস দেখা যায় (৬)।

* * *

এক্ষণে সমস্ত ভারতীয় সাহিত্য-সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা করা যাক্।

দুইটা জিনিস আমাদের চোখে ঠেকে।

প্রথম।—

ভারতীয় সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাববশে

(৬) ১৯০০ অব্দে, ২৫৯০ গ্রন্থাদি বঙ্গদেশে রেজিষ্টরি হয়: যথা—৬৯৫ মাসিকপত্র ও ১৮৯৫ গ্রন্থ; তন্মধ্যে মৌলিক:—৮৩২ বাঙ্গলা ও ২৫৭ ইংরেজী, ৯৯ সংস্কৃত, ১৪০ উড়িয়া; বাকী—অনুবাদ ও পুনঃসংস্করণ; সবশুদ্ধ, বাঙ্গলা—১৩৩৬।

নবীকৃত হইয়াছে; এতটা নবীকৃত হইয়াছে যে, দর্শনসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সাক্ষাৎভাবে Comte ও Spencer দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে; উপন্যাসগুলি এয় রোম্যান্টিক নয় স্বাভাবিক ধরণের; মহাকাব্যে হোমরের এমন-একটু ছায়া আছে যে আমাদেরও তাহা বোধগম্য হয়।" ভারতীয় সাহিত্যে এরূপ পরিবর্ত্তন কি করিয়া ঘটিল?—ইহা ভারতীয় সাহিত্যের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশেরই ফল। ভারতীয় সাহিত্য, শেষ চারি শতাব্দীর মধ্যে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় সেই একই অবস্থাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছে:—(রিনেসান্স) পুনরুত্থান, (Classicism) প্রাচীন-আদর্শনিষ্ঠা, দার্শনিক যুগ, স্বেচ্ছাচারের যুগ, বৈপ্লবিক যুগ, হিতবাদের যুগ।

য়ুরোপের সাহিত্যিক রূপ ও ভাব আত্মসাৎ করিয়া ভারত স্বকীয় ক্রমবিকাশের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথা। সাহিত্য হইতে (মুদ্রাযন্ত্র অপেক্ষাও সম্পূর্ণরূপে) চিরপ্রথানুগত ভারতের, বৈপ্লবিক ভারতের, কুলপতিতন্ত্র ভারতের, ব্যক্তিত্ব-প্রধান ভারতের ছবি আমরা প্রাপ্ত হই। এই ছবির অন্তর্ভুক্ত—লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর লোক, কতকগুলি রাষ্ট্রনৈতিক, কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর লেখক; আমরা এমন একটি ভারত দেখিতে পাই যেখানে লোক-ভাষাগুলির পরিপুষ্টি অতি কষ্টে সংসাধিত হয়। পক্ষান্তরে, একটি ভাষা সকল ভাষার উপর আধিপত্য করে, এবং সেটি ইংরেজী ভাষা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জলের আল্পনা

সাত

শিল্পীর বাটালির ছোঁয়া পাইবার আগে মূর্ত্তি গড়িবার পাথর যেমন আকারহীন ও কুদর্শন হইয়া থাকে, প্রেমের পরশ না-পাইলে মানুষের জীবনও তেমনি একটা সুডৌল-সুশ্রী আকার লাভ করিতে পারে না। তাই জয়ন্তের সেদিন মনে হইল, এতদিন পরে যথার্থ প্রেমের সাক্ষাৎ পাইয়া আজ তাহার শূন্যজীবন পূর্ণ, সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে!

আপনমনে গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিতে-গাহিতে জয়ন্ত যখন বাসায় ফিরিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিল, ভজহরি লণ্ঠনের আলোয় তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, "ইস্‌স্, খোকন যে আজ বড্ড খুসি!"

ভজহরি তাহাদের পুরণো চাকর। জয়ন্তের স্বর্গীয় মাতার বিবাহের সময়ে তাঁহার বাপের বাড়ী হইতে সেই যে সে সঙ্গে আসিয়াছিল, আর আজ-পর্য্যন্ত একবারও ছুটির নাম মুখে আনে নাই! তাহার কোল-পিঠই ছিল জয়ন্তের শিশুকালের খেলাঘর এবং আজ এই পূর্ণযৌবনেও ভজহরির

মমতাভরা বুক, স্নেহভরা কোল এবং সেবা-ভরা বাহুর বাঁধন পাইয়া জয়ন্ত নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত হইয়া আছে।

পুরাতন বটবৃক্ষের মত এই পুরাতন চাকরটিরও বয়স যে কত, কেউ তা জানে না। কিন্তু এত বয়সেও ভজহরি বেশ শক্তসমর্থ আছে—এমন-কি, জয়ন্ত এখনো যেদিন গান গাহিতে বসিয়া বাড়া ভাত ঠাণ্ডা করিয়া ফেলে, ভজহরি ক্রোধভরে আসিয়া তাহাকে শিশুর মত অনায়াসে কোলে তুলিয়া খাবারের সাম্‌নে লইয়া গিয়া বসাইয়া দেয়। জয়ন্ত যদি হাসিয়া বলে—"হ্যারে ভজা, তোর ঐ বুড়ো হাড়ের জোর কি কোনদিনই কম্‌বে না রে?"

ভজহরি ফোলা-ফোলা দড়ির মত শিরা-ভরা হাতদুখানা নাড়িয়া উত্তর দেয়, "এ বুড়ো হাড় নয় রে খোকন, এ বুড়ো হাড় নয়—এ হচ্চে পাকা হাড়! বাঁশের লাটির মত আমার হাড় যত পুরণো হচ্চে, তত পেকে উঠ্‌চে—এর জোর কি কখনো কমে রে বোকা?"

—"তুই কি বল্‌তে চাস্ তোর জোর কখনো কম্‌বে না?"

—"কম্‌বার যো কি? আমার জোর কম্‌লে তোকে দেক্‌বে কে রে খোকন? আর এটাও ঠিক জানিস্ যে, আমার খোকনকে বুকে কর্‌বার জোর যেদিন যাবে, তোর ভজা সেদিন পটল তুল্‌বেই তুল্‌বে!"

পুরণো চাকর একটু গায়ে-পড়া হয়; মনিবকে সে ভালোবাসে কিন্তু মনিবের ধম্‌কানি গ্রাহ্য করে না। ভজহরিও সেই স্বভাবের লোক; জয়ন্তের সঙ্গে সে সমান ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিত, দরকার হইলে উপদেশ-পরামর্শ বা ধমক-ধামকটাও দিতে ছাড়িত না।

জয়ন্ত সেদিন ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া যখন গায়ের জামাটা খুলিতেছে, ভজহরি তাহার হাতে একখানা পত্র দিয়া বলিল, "দেশ থেকে তোমার চিটি এসেচে—নাও।"

জয়ন্ত চিঠিখানা খুলিল। ভজহরি মাটির উপরে উবু হইয়া বসিয়া কৌতুহলের সহিত ঘাড় তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চিঠি লিখিয়াছেন অন্নপূর্ণা। জয়ন্ত পড়িতে লাগিল:—

"বাবা জয়,

আজ একসপ্তাহ তোমার কোন খবর না-পেয়ে ভাবিত আছি, শীঘ্র তোমার কুশল-সংবাদ দেবে।

এদিকে গৌরীকে আর রাখা যায় না; তুমি এখন বিয়ে কর্‌বে না বলে খালাস হ'লে ত চল্‌বে না। পুরুষমানুষ বেশী বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো থাক্‌লেও চলে—পুরুষের সব শোভা পায়; কিন্তু স্ত্রীলোক তা কর্‌লে নানাজনে নানাকথা কয়—বিশেষ পল্লীগ্রামে। কাজেই আমি ঠিক করেছি, আসছে বৈশাখ মাসেই একটা ভালো দিন দেখে তোমার বিবাহ দেব। এতে তোমার অমত হ'লে চল্‌বে না। আমরা সবাই ভালো আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার মা

চিঠি পড়িয়া জয়ন্তের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

ভজহরি উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল, "ও কি খোকন, তোর মুখ অমন হোলো ক্যানো? বাড়ীর খপর কি ভালো নয়? মা-ঠাকরোণ ক্যামন আচেন? গৌরী—"

জয়ন্ত বিরক্ত স্বরে বলিল, "তারা সবাই ভালো আছে। তুই এখন যা ভজা, কাণের কাছে ঘ্যানর‍্ঘ্যানর করে' আমাকে আর জ্বালাতন করিস্-নে!"

কিন্তু ভজহরি সেখান হইতে এক আঙুলও নড়িল না—ভাবিল নিশ্চয় কোন খারাপ খবর আসিয়াছে, খোকন তাহার কাছে লুকাইতেছে। চিঠিখানা জয়ন্তের হাত হইতে ফস্-করিয়া টানিয়া লইয়া আলোর কাছে ধরিয়া সন্দিগ্ধ চোখে সে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বারংবার দেখিতে লাগিল; কিন্তু সেই আঁকাবাঁকা কালির দাগের ভিতর হইতে ভালো-মন্দ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিল না। শেষটা হতাশভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিরক্ষর ভজহরি সকাতরে বলিল, "তোর পায়ে পড়ি খোকন, আমার কাচে কিছু লুকোস-নে!"

জয়ন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "বল্‌ছি ত খবর সব ভালো।"

—"তবে তোর মুখ অমন শুকিয়ে গ্যাল ক্যানো?"

—"শুকিয়ে গেল, সে আমার ইচ্ছে! তোর সব কথায় দরকার কি?"

—"বল্ না খোকন, লক্ষ্মীটি! বুড়োকে ক্যানো থাম্‌কা কষ্ট দিচ্চিস্!"

—"মা লিখেছেন বশেখ মাসে গৌরীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।"

ভজহরি বেজায় খুসি হইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, "সত্যি? এর জন্যে আবার ভাব্‌না ক্যান্‌রে হাঁদা!"

জয়ন্ত নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল।

ভজহরি আপনমনে বড়্‌-বড়্ করিয়া বকিয়া যাইতে লাগিল, "বশেখ মাসে নয়? এটা হোলো গিয়ে মাঘমাসের সাতাস তারিখ্—না খোকন? হুঁ, হাতে রইল ফাগুন চোত্—কুল্যে এই দুটো মাস। তাহলে একুনি থেকে সব উয্যুক-আয়োজন কর্‌তে হয় যে! আমার খোকনের বিয়ে—একি একটা যা-হোক্-তা-হোক্ ব্যাপার! সাতদিন ধরে সাত গাঁয়ে পাত্ পড়বে না, ঢাকের বাদ্যি শুনে-শুনে একমাস লোকের কাণে তালা লেগে থাক্‌বে, আর—"

জয়ন্ত বাধা দিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিল, "থাম্ ভজা, থাম্! বিয়ে কর্‌ছে কে?"

ভজহরি বলিতে-বলিতে থামিয়া পড়িয়া, বিস্ময়ে দুইচক্ষু ড্যাব্‌রা করিয়া জয়ন্তের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়ন্ত তিক্তস্বরে বলিল, "ভজা, মা যতই বলুন এ বিয়ে আমি কিছুতেই করব না!"

—"খোকন, এ কী বলিস্ রে?"

—"হ্যাঁ।"

—"ক্যানো?"

—"আমাদের সাম্‌নের বাড়ীর ঐ জগৎবাবুকে জানিস্ ত? আমি তাঁরই মেয়েকে বিয়ে কর্‌ব।"

—"অ্যাঁঃ! কে এ সমন্দ কর্‌লে?"

—"আমি!"

—"মা-ঠাকুরোণ জানেন ত?"

—"না। কিন্তু আজই তাঁকে চিঠি লিখে সব জানাব।"

ভজহরির মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। মাথা নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "খোকন, মাকে তুমি জান ত! কেউ তাঁর অমতে কাজ কর্‌লে তাঁর মন নোয়ার মত শক্ত হয়ে ওটে। অ্যামন কাজ করিস্‌ নে—করিস নে!"

—"উপায় নেই।"

ভজহরি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিন্তু খোকন, গৌরীদিদির আঁতে তুই কতবড় ঘা মার্‌বি তা কি একবার ভেবে দেকেচিস্‌? সে যে তোকে একন থেকেই স্বোয়ামীর মত ভক্তি করে, ভালোবাসে!"

ঠিক এইখানেই জয়ন্তের মনেও কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। গৌরীকে সে কি বলিয়া বুঝাইবে? তাহার কোমল প্রাণের ভিতরে, শৈশব হইতে এই উন্মুখ যৌবন পর্য্যন্ত যে ভাবের ধারা অবাধে বহিয়া আসিতেছে, অকস্মাৎ সে ধারাকে সে বন্ধ করিয়া দিবে কিরূপে? এ কি নির্দ্দয়তা নয়?

জয়ন্ত বিবর্ণ মুখে উঠিয়া ঘরের মধ্যে অস্থির পদে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দক্ষিণের জান্‌লা খোলা ছিল; সেই পথে নববসন্তের মধুর বাতাস একটা রাগিণীর সুর বহিয়া আনিয়া জয়ন্তের প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিল—

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর-মত বাসিও—"

এ ইন্দুলেখার গান!

জয়ন্ত সমস্ত ভাবনা ভুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিল—তাহার মনে হইল, এ গান যেন তাহাকেই শুনাইয়া-শুনাইয়া গাওয়া হইতেছে!... ...

সে গানের সুরের ভিতরে পড়িয়া অভাগী গৌরীর কাতর মুখ, জোয়ারের স্রোতে ছেঁড়া ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গেল!

আট

বৈকালে ঠাকুরঘরে বসিয়া অন্নপূর্ণা আরতির উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া আছেন। দরজার কাছে গৌরী, কোলের উপরে একখানা কুলা লইয়া ধান বাছিতেছিল।

এমনসময় দাসী একখানা চিঠি হাতে করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

অন্নপূর্ণা কোশার ভিতরে গঙ্গাজল ঢালিতে-ঢালিতে বলিলেন, "কার চিঠি রে?"

দাসী বলিল, "সরকার-বাবু বল্‌লেন কল্‌কাতার চিটি।"

গৌরী বুঝিল, কার চিঠি। একবার লজ্জিত চোখে পত্রের দিকে চাহিয়াই আবার মুখ নামাইয়া সে ধান বাছিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "চিঠিখানা ঐখানে রাখ্‌, দেব্‌তার কাজ না-সেরে ও ত আর ছুঁতে পার্‌ব না!"

ঠাকুরঘরের কাজকর্ম্ম চুকাইয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "চিঠিখানা এইবার দে ত গৌরী!"

গৌরী চিঠিখানা অন্নপূর্ণার হাতে দিয়া আবার ধান বাছিতে লাগিল—কিন্তু তাহার কাণ রহিল সজাগ।

অন্নপূর্ণা খাম ছিঁড়িয়া জয়ন্তের চিঠি পড়িতে লাগিলেন; কিন্তু পড়িতে-পড়িতে, তাঁহার মুখের ভাব ধীরে-ধীরে বদ্‌লাইয়া

গেল। পড়া যখন সাঙ্গ হইল—তখন তাঁহার মুখ একেবারে সাদা!... ... স্তম্ভিতের মত অন্নপূর্ণা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, পত্রখানা তাঁহার অসাড় হাত হইতে খসিয়া মাটির উপরে পড়িয়া গেল।

দেখিতে-দেখিতে অন্নপূর্ণার মুখ রাগে একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল, বিকৃত রুদ্ধ স্বরে তিনি বলিলেন, "জয় কি এতবড় পাষণ্ড হয়েছে!"

সে স্বরে চমকিয়া গৌরী মাথা তুলিল। অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া সে হতভম্ব হইয়া গেল!

জানলা দিয়া আচমকা একটা বাতাস আসিয়া গৃহতল হইতে জয়ন্তের পত্রখানা উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, গৌরী তাড়াতাড়ি সামনে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া দু-হাতে সেখানা চাপিয়া ধরিল।

হঠাৎ চিঠির একজায়গায় তাহার চোখ পড়িয়া গেল। সেখানে লেখা রহিয়াছে, "মা, গৌরী বোনের মত আমার কাছে থাক্—তাকে আমি চিরকাল স্নেহের চোখে দেখ্‌ব, কিন্তু তাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তার কারণ এই যে,—" গৌরী আর পড়িতে পারিল না, জয়ন্তের হাতের সেই নিষ্ঠুর অক্ষরগুলো যেন আগুনে-পোড়ানো সূচের মত তাহার চোখে বিঁধিয়া তাহাকে একেবারে অন্ধ করিয়া দিল।

অন্নপূর্ণা কঠিন স্বরে বলিলেন, "গৌরী, তুই এখন এখান থেকে যা!"

গৌরী আস্তে-আস্তে উঠিয়া আচ্ছন্নের মত ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন—তাঁহার দুইচক্ষু তখন বিস্ফারিত, নাসারন্ধ্র থাকিয়া-থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, ওষ্ঠাধর পরস্পরের উপরে চাপিয়া বসিয়া গিয়াছে।

অনেকদিন আগেকার একটা কথা বিদ্যুতের আখরে তাঁহার চোখের সামনে জ্বলিয়া উঠিল,—গৌরীর মা, মেনকার হাত ধরিয়া গঙ্গাজল ছুঁইয়া তাঁহার সেই শপথ! ... ...তারপর, সেইদিন! যেদিন মেনকার মৃত্যুশয্যায় তিনি শিশু গৌরীকে আপনার ভাবী পুত্রবধূ বলিয়া কোলে টানিয়া লইয়াছিলেন এবং তাই দেখিয়া মরণকালেও মেনকার মুখে নিশ্চিন্ত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

জয়ন্তের জন্য আজ কি তাঁহার সত্য ভঙ্গ হইবে?... ...অন্নপূর্ণার বুকটা ধুক্‌ফুক্ করিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, পরলোকে মেনকার অশরীরি আত্মা এতক্ষণে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে!

জয়ন্ত যে তাঁহাকে এতবড় দাগা দিতে চাহিবে, এ তিনি কখনো ভাবেন নাই। চিঠিতে সে আর-একজনের কথা লিখিয়াছে, কে সে? কার মেয়ে—হিন্দু না ক্রীশ্চান? কি কুহকে সে তাঁহার একান্ত-অনুগত জয়ন্তকে এমন বশ করিয়াছে যে, সে আজ ন্যায়-অন্যায় বিচার পর্য্যন্ত করিতেছে না?

আর গৌরী? অন্নপূর্ণা জানিতেন, জয়ন্তকে এখন থেকেই সে স্বামী বলিয়া জানে! জয়ন্তকে সে ভালোবাসে! এখন জয়ন্ত যদি তাকে ত্যাগ করে, তবে তাহার দশা কি হইবে, সে কোথায় দাঁড়াইবে?

অন্নপূর্ণা আপনা-আপনি বলিয়া উঠিলেন, "না, এমন পাপ আমি হোতে দেব না—

জয়ন্ত কি ভেবেছে নারী বলে আমি সুধু আদর করতেই জানি,—শাসন করতে জানি না!”

দরজার কাছ হইতে শোনা গেল, “পা-ধোবার জল দাও গো,—একি, ঠাকুর-ঘরে এখনো সন্ধ্যে দেওয়া হয়-নি!”

এ পুরুতঠাকুরের গলা! অন্নপূর্ণার তখন হুঁস্ হইল,—চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভরসন্ধ্যার পাত্‌লা অন্ধকারে চারিদিক আবছায়া হইয়া আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, “গৌরী, অ গৌরী—শুন্‌ছিস্, সাড়া দিচ্ছিস না যে, কাণের মাথা খেয়েছিস্ নাকি?”

পাশের ঘর হইতে গৌরীর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল—“যাই মা, যাই!”

অন্নপূর্ণা পুরুতঠাকুরের পা ধুইয়া দিতেছেন, গৌরী আসিয়া বলিল, “কি বল্‌ছ মা?”

—“কি বল্‌ছি? আ হাবা মেয়ে, সন্ধ্যে যে উৎরে গেছে, আজ কি আর শাঁক-টাখ্ বাজাতে হবে না?”—বলিতে-বলিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণা অবাক্ হইয়া গেলেন!

গৌরীর চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা—সে যেন এইমাত্র কাঁদিতে-কাঁদিতে কান্না থামাইয়া উঠিয়া আসিয়াছে!

নয়

ইন্দুলেখার ময়নাটা এম্‌নি দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, আজকাল যাকে-তাকে সে “দূর্ পোড়ারমুখো” বলিয়া গালাগালি দিতে সুরু করিয়াছে!

অতএব ইন্দু সেদিন চীনের বাদাম খাইতে-খাইতে তাকে বুঝাইতেছিল, “ছি ময়না, অমন করে’ কি গালাগাল দিতে আছে?”

ময়না তার চোখ পাকাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, “দূর্ পোড়ারমুখো!”

ইন্দু চটিয়া বলিল, “আ গ্যালো যা, আমার খেয়ে আমাকেই গালাগাল? রও, আজ তোমাকে ছাতু খেতে দিচ্ছি না—দু-বেলা পেটভরে খেয়ে-খেয়ে তোমার ভারি আস্পর্দ্ধা হয়েছে—না?”

জয়ন্ত পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল, “খেতে পেয়েও ময়না যখন তোমাকে গালাগাল দিচ্ছে, তখন খেতে না পেলেও তোমাকে আরো বেশী গালাগাল দেবে, ইন্দু!”

জয়ন্তের কথায় যেন সায় দিয়াই ময়না আবার চ্যাঁচাইয়া উঠিল, “দূর পোড়ারমুখো!”

ইন্দু চোখ রাঙাইয়া শাসাইয়া বলিল, “ময়না, ফের্!”

কিন্তু ময়না তাতে একটুও দমিয়া গেল না; ডান পা দিয়া ঠোঁট্‌টা চট্‌পট্ সাফ্ করিয়া লইয়া ইন্দুকে উল্টা ধমক দিতে লাগিল, “কোঁ-কট্‌কট্, কোঁ-কট্‌কট্, কোঁ-কট্‌কট্!”

—“ও কি-বল্‌তে চায় জয়ন্তবাবু?”

—“এবারে ও তোমাকে নিজের ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে—কেরাণীরা সায়েবের সুমুখেই সায়েবকে গালাগাল দিতে হ’লে এই চরম উপায়ই অবলম্বন করে! ওটা হচ্ছে দাসত্বের লক্ষণ!”

ইন্দুলেখা বাদামের খোসা ছাড়াইতে-ছাড়াইতে বাগানের একদিকে চাহিয়া বলিল,

"জয়ন্তবাবু, আপনার চাকর বোধহয় আপনাকে ডাকতে আসছে,—ঐ দেখুন!"

জয়ন্ত ফিরিয়া দেখিল, ভজহরি চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে তাহাদেরি দিকে আসিতেছে! সে ডাকিয়া বলিল, "কিরে ভজা, তুই যে বড় হঠাৎ এখানে?"

ভজহরি পাণের ছোপ্‌ধরা দুপাটি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার বৌ দেক্‌তে এলুম খোকন!"

ইন্দুলেখা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

জয়ন্ত বলিল, "এ আমাদের পুরণো লোক, এর হাতেই আমি মানুষ হয়েছি ইন্দু!"

একটা চীনের বাদাম টপ্‌-করিয়া মুখে ফেলিয়া দিয়া ইন্দু বলিল, "ও!"

ইন্দুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভজহরি বলিল, "হ্যাঁ খোকন, এই মেয়েটির সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে বুঝি?"

জয়ন্ত বিরক্তভাবে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

এত-বড় মেয়ে, এখনো আইবুড়ো! বৌয়ের বয়স বেশী দেখিয়া ভজহরি মনেমনে বড় খুসি হইল না। কিন্তু মুখে মনের কথা না-ভাঙিয়াই বলিল, "বাঃ, খাসা মেয়ে ত!"

ইন্দু মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ভজহরি মনেমনে তুলনা করিয়া ভাবিতে লাগিল, আমাদের গৌরীর চেয়ে এ মেয়েটির রং ঢের ফর্‌সা বটে, কিন্তু এ-যেন কিছু বেহায়া! গৌরী ত বরের সাম্‌নে এমন করে' কখনো চীনের বাদাম খায় না! গৌরীকে বৌ বলে যেমন মানায়, খোকনের পাশে একে ঠিক তেমনটি ত কৈ মানাচ্ছে না!

হঠাৎ ইন্দুলেখার পায়ের মখ্‌মলের চটি জুতোর দিকে ভজহরির নজর পড়িল। বৌয়ের পায়ে জুতো—অ্যাঁঃ! তাহার দৃঢ় ধারণা ছিল, যে-সব মেয়ে জুতো পায়ে দেয় তারা সবাই ক্রীশ্চান!

ফস্‌-করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "হ্যাঁগা বাছা, তোমরা হিঁদু ত?"

ভজহরির বিস্মিত মুখ দেখিয়া এবং এই উদ্ভট প্রশ্ন শুনিয়া ইন্দুলেখা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কেন, আমাকে দেখ্‌লে কি মোছলমান বলে মনে হয়?"

ভজহরি থতমত খাইয়া বলিল, "না—না, বল্‌চি কি—ইয়ে—ইয়ে—"

ইন্দুলেখা, বেচারাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "হ্যাঁগো হ্যাঁ, আমরা হিন্দু!"

—"তবে তুমি জুতো পরেচ ক্যানো গো বাছা?"

—"কেন, জুতো পর্‌লে কি আর হিন্দু হোতে নেই?"

ভজহরি মাথা চুল্‌কাইতে-চুল্‌কাইতে বলিল, "আমি পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ মা, সহরের ধরন-ধারন ত জানিনা, তা ক্ষমা-ঘেন্না করে' কিছু মনে কোরো না!" এই বলিয়া সে আস্তে-আস্তে আবার বাড়ীমুখো হইল।

খোকনের বৌ রূপসী হইলেও, সে জুতো পরে এবং বরের সাম্‌নে বেহায়ার মত চীনের বাদাম খায় বলিয়া, বুড়ো ভজহরির মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করিতে লাগিল। এর-চেয়ে গৌরী ভালো, বয়সেও ছোট; মুখটিতেও লজ্জা মাখানো—বৌ যেমনটি হয়, তেম্‌নি! গৌরীর নিরাশ মুখ ভাবিয়া ভজহরির ভারি দুঃখ হইল।

কিন্তু খোকনকে সে এত ভালোবাসে যে, গৌরীকে বিবাহ করিতে না-চাওয়ার দরুণ জয়ন্তের যে কিছু অন্যায় হইয়াছে, এটাও সে মনে করিতে পারিল না। 'আমরা বুড়ো-হাবড়া মানুষ, আমাদের পছন্দে-অপছন্দে কী এসে যায়? বৌ যখন খোকনের মনে ধরেচে তখন তার ওপর আর কথা নেই, সে যা ভালো বোঝে তাই করুক!'

—এই ভাবিয়া, একটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনের সমস্ত ইতস্তত বাহির করিয়া দিয়া বৃদ্ধ ভজহরি নিশ্চিন্ত স্বরে গান ধরিল—

"হরি হে, কেমনে ভুলিব তোমায়!
ওহে বন্ধুরায়, ভুলে রৈলে মথুরায়—
—কেমনে ভুলিব তোমায়!"

* * * * *

এদিকে, বৈকালে বাহিরের ঘরে বসিয়া জগৎবাবু খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, অবনী।

খবরে কাগজখানা টেবিলের উপরে রাখিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "আসুন।"

অবনী তাঁহার সাম্‌নেই একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কাগজ পড়্‌ছিলেন বুঝি?"

—"হ্যাঁ। পড়্‌তে-পড়্‌তে ভাবছিলুম যে, এত-বড় পৃথিবীতে নতুন-কিছু ঘট্‌ছে না—সব খবরই পুরণো আর একঘেয়ে! ধরিত্রী দেখ্‌ছি একেবারে বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে—তার মধ্যে রস-কস্‌ বৈচিত্র যা-কিছু ছিল, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা নিংড়ে সমস্ত বার করে' নিয়েছেন।"

অবনী ডিবা হইতে একটা পান লইয়া মুখে পুরিয়া চিবাইতে-চিবাইতে বলিল, "হ্যাঁ, ও কাগজ-টাগজ পড়া না-পড়া দুই-ই এখন এককথা।"

জগৎবাবু বলিলেন, "আমাকে পড়্‌তে হয়, নৈলে সময় কাটে না যে! কাগজের মধ্যে ভালো লাগে তবু পুলিস-কোর্টের কলমটা। বিংশ শতাব্দীর রোম্যান্‌স উপন্যাসের সীমানা আর মানুষের জীবন থেকে পলায়ন করে' আশ্রয় নিয়েছে ঐ পুলিস-কোর্টের ভিতরে গিয়ে!"—থামিয়া, গলা চড়াইয়া হাঁকিলেন, "ওরে, তামাক দিয়ে যা!"

চাকর তামাক দিয়া গেল। নলটা হাতে করিয়া, একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "বাজে কথা যাক্‌। এখনো কেউ আসে-নি, এইবেলা চুপি-চুপি আপনার সঙ্গে দুটো কাজের কথা কয়ে-নি।"

অবনী বুঝিল, কি কথা! কাণ খাড়া করিয়া সে চুপচাপ্‌ বসিয়া রহিল।

জগৎবাবু আগে আল্‌বোলার নলে দু-তিনটি টান মারিলেন; তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন, "অবনীবাবু আপনি আমার মত্‌ জানেন ত, মেয়েদের আমি দাস-ব্যবসার পণ্য বলে ভাব্‌তে পারি না; সুতরাং যাকে খুসি তার হাতে মেয়েকে সঁপে দেবার ক্ষমতা আমার নেই,—যদিও আমি পিতা।"

অবনী সায় দিয়া বলিল, "হ্যাঁ, এই ত উচিত। একপক্ষ থেকে গ্রহণ কর্‌লেই ত চল্‌বে না, যার সঙ্গে আজীবন এক হয়ে থাক্‌তে হবে, সেই ভবিষ্য স্বামীকে কন্যাও স্বেচ্ছায় গ্রহণ কর্‌তে চায় কিনা, সেটা দেখাও যে খুব দরকার।"

জগৎবাবু বলিলেন, "কিন্তু অনেকে এ সহজ কথাটাও বোঝেন না, বা বুঝ্‌তে

চান না। মন্ত্রশক্তিতে বোধহয় তাঁদের অসীম বিশ্বাস; তাঁরা তাই ভাবেন, পুরুত এসে টিকি নেড়ে বড়্‌বড়্‌ করে' দুটো মন্ত্র পড়ে দিলেই, সম্পূর্ণ অচেনা দুটি মানুষ ওদের চরিত্রের সমস্ত পার্থক্য ভুলে চিরকাল মিলে-মিশে এক হয়ে থাকবে। তা যদি সম্ভব হোতো, খবরের কাগজে পুলিস-কোর্টের রিপোর্টে তাহলে প্রায়-প্রত্যহই দাম্পত্য প্রণয়-ভঙ্গের এত মোকদ্দমার কথা দেখ্‌তুম না। শাস্ত্র যতই কোলাহল করুক,—আমি কিন্তু জানি, মন্ত্র পড়্‌লেই বিবাহ হয় না; সেই বিবাহই আসল বিবাহ—সে বিবাহে পাত্র আর পাত্রী দুজনেই সচেতন ভাবে পরস্পরকে গ্রহণ করে।"

অবনী বলিল, "এ কথা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। কিন্তু, সেকালে যখন গৌরীদান-প্রথার চলন ছিল, তখন মেয়ের মত্‌ জানবার কোন দরকার হোতো না। কারণ, শৈশবে বিবাহ হোতো বলে কন্যার মনে তখন বিচার-শক্তি নামে কোন-কিছুর অস্তিত্ব থাক্‌ত না। কাঁচা বাঁশের মত মেয়ের শিশু মন তখন কোমল থাকৃত, কাজেই স্বামী তাকে অনায়াসেই নিজের চরিত্রের উপযোগী করে' গড়ে নিতে পারত। এখন কিন্তু সমাজের সে অবস্থা আর নেই। একালে নানা কারণে মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে বেশী বয়সে। সুতরাং বিবাহের আগেই তাদের চরিত্র পরিণত হয়ে গড়ে ওঠে; সে-ক্ষেত্রে পিতার ইচ্ছায় কলের পুতুলের মত তারা যদি এমন পুরুষকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়—যাদের চরিত্রের সঙ্গে তাদের চরিত্রের সবদিকেই গরমিল, তাহলে সে বিবাহের পরিণাম চরম অমঙ্গলে।"

জগৎবাবু তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে বলিলেন, "সুতরাং বিবাহের আগে মেয়েদের মত্‌ নেওয়া অত্যন্ত দরকার।"

অবনী বলিল, "অত্যন্ত।"

অবনী যাহা বলিল, সেটা সত্য-সত্যই তাহার প্রাণের কথা; কিন্তু আজ হয়ত সে এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করিত না, জগৎবাবুর আসল বক্তব্য যদি তাহার জানা থাকিত। সে মনে-মনে এই ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল যে, তাহাকে জামাতা বা স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে জগৎবাবু বা ইন্দুলেখা কাহারোই অমত হইবে না; কেননা, তাহার টাকাও আছে বিদ্যাও আছে!

জগৎবাবু একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলেন, "এখন আসল কথাটা পাড়া যাক্‌। আপনি যে আমার মেয়েকে বিবাহ করতে চান, সে কথা আমি ইন্দুর কাছে তুলেছিলুম। কিন্তু—"

এই খটখটে 'কিন্তু'টা অবনীর কাণে ভারি বেসুরো ঠেকিল; চকিত চোখে সে জগৎবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

জগৎবাবু জ্বলন্ত কলিকার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু ইন্দুর এতে মত্‌ নেই।"

অবনীর মুখ একেবারে এতটুকু!—আস্তে-আস্তে মাথা নোয়াইয়া বোবার মত সে চুপ করিয়া রহিল।

জগৎবাবু তাহার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "কি করব বলুন, ইন্দুর মনে কষ্ট দিয়ে কোন কাজ করতে পারি না ত!"

উত্তরে অবনী একটু হাসিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু তাহার তখনকার বিকৃত মুখে সে হাসিকে একেবারেই হাসি বলিয়া মনে হইল না। ইন্দুলেখা যখন তাহাকে বিবাহ করিবে না, তখন সেও জগৎবাবুকে দেখাইতে চায় যে, ইন্দুর প্রত্যাখ্যানে সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই! অতএব, অবনী খবরের কাগজখানা সুমুখ হইতে তুলিয়া লইয়া কৃত্রিম মনোযোগের সহিত তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিল।

জগৎবাবু বলিলেন, "ইন্দুর অমতের একটি কারণও আছে।"—বলিয়া তামাকের নলে টান মারিতে লাগিলেন।

কারণটা যে কি, জানিবার জন্য অবনীর প্রাণটা ছটফট্ করিতে লাগিল। কিন্তু বাহিরে সে আর কোন আগ্রহই দেখাইল না, কাগজের দিকে যেমন চাহিয়াছিল তেম্‌নিই কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

জগৎবাবু বলিলেন, "আপনার মত জয়ন্তও আমার জামাই হোতে চান—"

—অবনীর বুকের ভিতর দিয়া যেন একটা আগুনের স্রোত বহিয়া গেল—

—"আর ইন্দুও জয়ন্তকে বিবাহ করতে চায়! সুতরাং এক্ষেত্রে আমার অবস্থাটা বুঝ্ছেন ত?"

ক্রোধের একটা দুরন্ত ঝট্‌কায় অবনী একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। টেবিলের দুটো কোণ্ দু-হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, অবনী প্রাণপণে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল।

খানিকপরে, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবনী বলিল, "জগৎবাবু, নমস্কার!"

—"সেকি, এরি মধ্যে!"

—"আজ্ঞে হাঁ, আমার একটু দরকার আছে।"

—"অবনীবাবু, কিছু মনে করবেন না", মুখখানি কাচুমাচু করিয়া জগৎবাবু হাতদুটি যোড় করিলেন।

—"কিছু মনে কর্‌বার অধিকার আমার ত নেই জগৎবাবু!"—চাপা অভিমানের স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া অবনী তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।... ..

রাস্তায় খানিকদূর গিয়াই অবনীর সঙ্গে স্বর্ণেন্দুর দেখা।

স্বর্ণেন্দু তাহার সেই ঘোড়ার মত মুখে ইঁদুরের মত দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "এই যে! জগৎবাবুর বাড়ী থেকে আস্‌ছ বুঝি?"

—"হুঁ।"

—"কেন, এরি মধ্যে চলে এলে বড় যে? ... ...ওহে ভোট না পেলে মিউনিসিপালিটির কমিশনরদের মুখের ভাব যে-রকম শোচনীয় হয়, তোমার মুখখানাও ঠিক তেম্‌নিধারা কেন হে?"

—বলিতে-বলিতে স্বর্ণেন্দু তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল; অবনী কিন্তু এক-হ্যাঁচ্‌কায় নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বিরক্ত স্বরে বলিল, "যাও, যাও, মিছে বকিও না!"

স্বর্ণেন্দু একটু ভাবিয়া বলিল, "ও; বুঝেছি!"

অবনী চোখ-মুখ কুঁচ্‌কাইয়া বলিল, "বুঝেছ? ছাই বুঝেছ!"

স্বর্ণেন্দু হাসিয়া বলিল, "তোমার মনের কথা আমি যদি না-বুঝি বন্ধু, তাহলে মিছেই

তোমার সঙ্গে এতদিন মিশ্‌লুম! কি হয়েছে বল্‌ব? তুমি সেদিন ইন্দুলেখার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলে, আজ তার চরম জবাব পেয়েছ আর কি!"

—"পেয়েছি ত পেয়েছি, তাতে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

—"কেন? কারণ, সুপথে-কুপথে আমি তোমার একমাত্র বন্ধু কিনা!"

অবনী ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "জান স্বর্ণ, ইন্দু আমাকে বিবাহ কর্‌বে না সেও আমি সইতে পারি—কিন্তু সে কিনা—সে কিনা—" রাগের আবেগে অবনী তাহার কথা আর শেষ করিতে পারিল না।

—"কিহে, থাম্‌লে কেন?"

—"ইন্দু জয়ন্তকে বিবাহ কর্‌বে।"

—"অ্যাঁঃ, জয়ন্তকে!"—স্বর্ণেন্দু যেন আকাশ থেকে খসিয়া পড়িল।

জয়ন্তকে এরা দুই বন্ধুই দেখিত বিষ-দৃষ্টিতে। স্বর্ণেন্দুর মনে পড়িল, জগৎবাবুর বৈঠকখানায় এই জয়ন্তের স্পষ্টস্পষ্ট কথার দরুণ কতদিন কতবার তাহাকে সকলের সাম্‌নে অপ্রস্তুত হইতে হইয়াছে। সুধুই কি তাই? কোনরকম তর্ক-আলোচনার সময়ে জয়ন্ত তাহাকে একেবারেই আমোল দেয় না, তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয়, স্বর্ণেন্দুকে সে যেন একটা মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। সেই নিদারুণ উপেক্ষায় জয়ন্তের উপরে স্বর্ণেন্দুর সমস্ত মন বিরূপ হইয়া আছে।

তাহার কটারঙের গোঁফে মোচড় দিতে দিতে স্বর্ণেন্দু খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল; তারপর বলিল, "দেখ অবনী, আমাদের চোখের উপরেই কলা দেখিয়ে জয়ন্ত যে ইন্দুকে ফস্ করে' বিয়ে করে' ফেল্‌বে, আর আমরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' তাকিয়ে বোকার মত তাই দেখ্‌ব, এ হোতে পারে না।"

—"তাই-বা দেখ্‌ব কেন? আজ থেকে আমি জগৎবাবুর বাড়ী ত্যাগ কর্‌লুম।"

—"কেন, থাম্‌কা অমন করে' হার মান্‌বার দরকার কি? বন্ধু, চোরের উপরে রাগ করে' ভূঁয়ে ভাত খেয়ে লাভ নেই। সংসার-অরণ্যে ঢুকে যদি সিংহের মত শীকার কর্‌তে চাও, তাহলে সর্ব্বদা শিয়ালের চাম্‌ড়ায় তোমাকে আগাপাশতলা ঢেকে রাখ্‌তে হবে! জয়ন্তকে ভালো করে' সম্‌ঝে দাও যে, আমরা তার উপেক্ষার পাত্র নই।"

—"স্বর্ণ, তুমি কি যে ছাই মাথামুণ্ডু বল্‌ছ, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!"

—"শোনো। এ বিবাহ যাতে না-হয় সেই চেষ্টা কর্‌তে হবে।"

—"কি করে'?"

—"সেইটেই ত আগে দেখা দরকার।"—বলিয়া, স্বর্ণেন্দু অন্যমনে একদিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ শিষ দিতে লাগিল; তারপর হঠাৎ শিষ বন্ধ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমাকে দুদিন ভাবতে দাও, সব ঠিক করে' ফেল্‌ব, দেখো—মাথা খাটালে কি না হয়! এতদিন আমরা কিছু বলি-নি বটে, কিন্তু এবার আমরা একেবারে প্রথমশ্রেণীর দুরাত্মায় পরিণত হব! জানইত, 'দুরাত্মার কখনো ছলের অভাব হয় না'!" বলিয়া, স্বর্ণেন্দু হেঁড়ে-গলায় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

'পিনস্‌নেয্‌' চশমাখানা নাকের উপরে ভালো করিয়া লাগাইয়া স্বর্ণেন্দু আবার বলিল, "কিন্তু সাবধান, জয়ন্তকে কি আর-কারুকে আমাদের মনের ভাব কোনরকমে জান্‌তে দিও না,—জগৎবাবুর সঙ্গে আরো ভালো করে' মিশ্‌বে। এম্‌নি ভিজে-বেড়ালটির মত থাক্‌বে—যেন ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জাননা! তাহলেই দেখ্‌বে, শেষটা আমরাই কেল্লা ফতে কর্‌ব!" এই বলিয়া অবনীর সঙ্গে 'স্যেক্‌হ্যাণ্ড' করিয়া সে চলিয়া গেল।

অবনী তখনো রাস্তার উপরে থ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, স্বর্ণেন্দুর আসল মত্‌লোবটা কি!

দশ

অন্নপূর্ণার চিঠি হাতে করিয়া জয়ন্ত বিছানার উপরে ভাবনা-বিভোর হইয়া বসিয়াছিল।

ভোর হইয়াছে অনেকক্ষণ,—জয়ন্তের গায়ের ও বিছানার উপরে ফাগুনের শিশির-ভেজা সকাল-বেলাকার রোদের একটি তপ্ত রেখা আসিয়া পড়িয়াছে,—কিন্তু সেদিকে তাহার মোটেই খেয়াল নাই। ঘুম ভাঙিয়াই এই চিঠিখানা পাইয়া আজ তাহার মাথার ভিতরে বিষম গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে।

জয়ন্ত চিঠিখানা আবার চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিল। অন্নপূর্ণা লিখিয়াছেন;—

"বাবা জয়,

তোমার পত্র পেলুম। যে লেখাপড়া শিখেছে, বংশগৌরবের দিকে যার দৃষ্টি আছে, সে এমন পত্র লিখ্‌তে পারে না।

তুমি কি জাননা, গঙ্গাজল ছুঁয়ে গৌরীর মায়ের হাত ধরে আমি কি শপথ করেছিলুম! গৌরীর মা যখন মৃত্যু-শয্যায়, তখনো আমি তাকে কি আশ্বাস দিয়েছিলুম, তাও তুমি অনেকবার শুনেছ। তারপর, গৌরীকে আমি তোমার সঙ্গেই মানুষ করেছি। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত সে জানে, তোমার সঙ্গেই তার বিবাহ হবে। স্বামী বল্‌তে সে তোমাকেই বোঝে। তোমার সঙ্গে তার সামাজিক লোকবুঝানো বিবাহ হয়-নি বটে, কিন্তু ধর্ম্মত এখনই তুমি তার স্বামী।

আর, আজ তুমি এ কি বল্‌ছ! গৌরীকে তুমি বিবাহ কর্‌বে না!

এ বিবাহে তুমি যদি অমত কর, তাহলে কি হবে, সেটা কি ভেবে দেখেছ? তাহলে আমার সত্যভঙ্গ হবে—গঙ্গাজল ছুঁয়ে যে সত্য আমি করেছি। তাহলে পরলোক থেকে গৌরীর মায়ের আত্মা অশান্ত হয়ে উঠ্‌বে,—হয়ত তার অভিশাপে তুমিও ইহলোক-পরলোক দুই হারাবে। তাহলে এ সংসারে থেকেও অভাগী গৌরী জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌বে।

তুমি কি তাই চাও? তুমি ত এমন ছিলে না, তবে কার চক্রান্তে পড়ে তোমার এমন মতিচ্ছন্ন হ'ল? কোন্ কুহকিনীকে দেখে তুমি আজ ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত-জ্ঞান হারাতে বসেছ? সে কোথায় থাকে, কার মেয়ে, কি নাম তার?... ... জেন, পৃথিবীতে রূপই বড় নয়, সংসারে আত্মসুখের চেয়েও বড় জিনিষ আছে।

আমি স্ত্রীলোক বলেই তুমি আমার অবাধ্য হোতে সাহস করেছ। উনি থাক্‌লে আজ তুমি নিশ্চয়ই তাঁকে এতবড় অপমানটা কর্‌তে পার্‌তে না। স্ত্রীলোক কি এতই হেয়?

বাছা জয়, লক্ষ্মী মাণিক আমার,—এমন কাজ তুই করিস্‌নে! ঘরের ছেলে তুই ঘরে ফিরে আয়, আমার কোলে ফিরে আয়— তোকে আর কল্‌কাতায় থাকৃতে হবে না, তোর আর লেখাপড়ায় দরকার নেই। আমি তোকে গর্ভে ধরি-নি বটে, কিন্তু আমি তোকে যে স্নেহ যে ভালোবাসা দিয়েছি— কোন মা কি সন্তানকে তার চেয়ে বেশী কিছু দিতে পারে?

তুই কি আমাকে বিমাতা বলে পর ভাবিস্‌? তাই হবে! তোর আচরণ দেখে আমারও কি মনে হচ্ছে জানিস্‌? মনে হচ্ছে যে, আমার গর্ভে জন্ম নিলে হয়ত তোর এমন কুমতি হোত না—আমার দেহের রক্ত তোর দেহে থাকৃলে আজ হয়ত আমার বুকেই তুই এমন শেল হান্‌তে পারতিস্‌ না!

কিন্তু জয়, আমাকে তুই জানিস্‌ ত? —আমি স্নেহ দিতেও জানি, শাসন করতেও জানি। তিনি যে উইল করে' গেছেন, তাতে সমস্ত বিষয়ের উপরে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার। এই পত্রেও তোর মন যদি না-ফেরে, তাহলে তুই ত্যাজ্যপুত্র হবি; সমস্ত বিষয় আমি গৌরীর নামে লিখে দিয়ে যাব। ইতি

তোর দুঃখিনী মা।

পুঃ। তোর চিঠির কথা শুনে গৌরী কি কর্‌ছে জানিস্‌? কাঁদ্‌ছে, খালি কাঁদ্‌ছে।"

দুই করতলের ভিতরে মাথা গুঁজিয়া জয়ন্ত ভাবিতে লাগিল।... ...তার মন তখন দোলনার মত দুলিতেছে—একবার এদিকে, একবার ওদিকে!

গৌরীর কান্নার অশ্রু তার মনকে বোধ-হয় সিক্ত করিয়া তুলিল। সে কি সত্যসত্যই গৌরীকে ভালোবাসে?... ... ... জয়ন্ত প্রাণপণে আপনার মনের ভিতরটা পর্য্যন্ত তন্নাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিল।... ...

না! সেখানে ইন্দুলেখার রূপের পূর্ণিমা পূর্ণজ্যোতিতে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে! ইন্দু'র প্রত্যেক চাহনি, প্রত্যেক ভাবভঙ্গি, প্রত্যেক কথাটি পর্য্যন্ত তাহার বুকের ভিতরে যেন মূর্ত্তি ধরিয়া জাগিয়া আছে, তাহার সমস্ত দেহের রক্তে রক্তে যেন ইন্দু'র শত-শত প্রতিমা নাচিয়া বেড়াইতেছে,—আর তাহার সমস্ত দেহ যেন শত-শত নেত্র লইয়া সেইদিকে নির্ণিমেষে দৃষ্টিপাত করিয়া বিপুল পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে!... ... ... নাই—নাই, গৌরী সেখানে নাই!

হ্যাঁ, গৌরীকেও সে ভালোবাসে বটে— কিন্তু সে যে বোনের প্রতি ভাইয়ের ভালো-বাসা! সে ভালোবাসায় এ ভালোবাসায় যে অনেক—অনেক তফাৎ!

জয়ন্ত অনেক ভাবিল, কিন্তু তার হৃদয়ের ভাষা যে কথা বলিতেছে, তাহার সত্যতা কি-করিয়া সে অস্বীকার করিবে!

মরুভূমে বর্ষাধারার মত, গৌরীর কান্নার অশ্রু জয়ন্তের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া আবার শুকাইয়া গেল!

হঠাৎ অন্নপূর্ণার পত্রের একটা জায়গা বিশেষ-করিয়া তাহার চোখে পড়িল। তিনি ভয় দেখাইয়াছেন, তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবেন।

ইন্দুকে ভালোবাসিয়া মনের ভিতর হইতে সে জোর পাইতেছিল বটে—কিন্তু এতক্ষণ

বাহিরে কোন অবলম্বন পাইতেছিল না; এখন, পত্রের উপরে আর-একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার প্রাণ একেবারে রুখিয়া দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণা বিমাতা, তাই তিনি তাহার রক্তের দোষ দেখাইয়া তাহার গর্ভ-ধারিণীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন! আর বিমাতা বলিয়াই তিনি তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার কথাটা মুখে আনিতে পারিয়াছেন! তিনি কি ভাবিয়াছেন, বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয়ে সে প্রাণের প্রার্থনা ভুলিয়া কুকুরের মত ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পদলেহন করিবে? না—কখনই না!... ... ...

দরজায় মুখ বাড়াইয়া ভজহরি ডাকিল, "খোকন, তোর আজ হ'ল কি! চাদ্দিকে রোদ খাঁ-খাঁ কর্‌চে, একনো মুখ-হাত ধুলি'নে!"

জয়ন্ত ডাকিয়া বলিল, "ভজা, ঘরের ভেতরে আয়, কথা আছে!"

ভজহরি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া হাঁটুর কাপড় তুলিয়া মেঝের উপরে উবু হইয়া বসিল।

জয়ন্ত বলিল, "ভজা, চিঠিতে মা কি লিখেছেন জানিস্‌?"

—"কি লিকেচে খোকন?"

—"যদি গৌরীকে বিয়ে না-করি, আমি ত্যাজ্যপুত্র হব।"

ভজহরি একেবারে লাফাইয়া উঠিল। অত্যন্ত উদ্বেগের স্বরে বলিল, "অ্যাঁঃ, সে কি গো!"

—"হ্যাঁ।"

—"তুই কি কর্‌বি তবে?"

—"গৌরীকে বিয়ে কর্‌ব না।"

—"সাধ করে' পথে বস্‌বি?

—'হ্যাঁ, তোর ভয় হচ্ছে নাকি?"

—"ভয়! তুই হাসালি খোকন! তিনকাল গিয়ে আমার এককালে ঠেকেচে, আমার আবার ভয়? দুগ্‌গা—দুগ্‌গা! ওরে বোকা, আমি ভাব্‌চি তোর জন্যে।"

"আচ্ছা ভজা, আমার এই মা যদি বিমাতা না-হতেন, তাহলে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র কর্‌বার কথা কি তিনি মুখে আন্‌তে পার্‌তেন?"

ভজহরি খানিক ভাবিয়া দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা নয় রে খোকন, তা নয়! মাঠাকৃরোণ যে গঙ্গাজল ছুঁয়ে পণ করেচেন গৌরী-দিদির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবেন! পাচে অধম্ম হয় সেই ভয়েই তোর ওপরে তিনি রাগ করেচেন! তিনি ত তোকে সৎমার মতন দ্যাকেন না ভাই! তোর অ্যাতটুকু বয়েস থেকে তিনি যে জয় জয় বলে অজ্ঞান, তোর সামান্যি অসুক হ'লে ভাব্‌নায় তাঁর চোকে যে জল আস্‌ত! আমার চোকে ধুলো দিয়ে তুই অ্যাক্‌বার পিদিমের কাচে গিয়েছিলি বলে মা-ঠাকৃরোণ আমার সঙ্গে কদ্দিন কথা কন-নি—নেহাৎ পুরণো চাকর আর তুই আমার বড্ডই ন্যাওটা বলে সেবারে মানে-মানে আমার চাক্‌রিটা টেকে গ্যাল। সৎমার কতা মনে আনিস্‌-নে রে খোকন, মনে আনিস্‌-নে, এ মাকে বিমাতা বল্‌লে তোর মঙ্গল হবে না!"

জয়ন্তের মন আবার এলাইয়া পড়িল, বিছানার চাদরটা মুঠোর ভিতর পাকাইতে-পাকাইতে স্তব্ধ হইয়া সে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

সত্য! অন্নপূর্ণার ব্যবহারে আজ-পর্য্যন্ত কখনো বিমাতার বিমুখতা প্রকাশ পায় নাই। এমন-কি, কেউ না বলিয়া দিলে

জয়ন্ত আজ জানিতেই পারিত না, তিনি তার নিজের মা নন।

ভজহরি বলিল, "আর তোরই-বা এ কি ধনুকভাঙা পণ যে, তুই গৌরীকে বিয়ে কর্‌বি-নে! ব্যাচারী তোর কাচে কি দোষে দুষী, আমাকে বুঝিয়ে দে দিকি অ্যাকবার!"

জয়ন্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ভজা, গৌরীর ত কোন দোষ নেই—কিন্তু তাকে বোন ছাড়া আর কিছু আমি বল্‌তে পার্‌ব না। বেশ, মা যদি বলেন, আমার বিষয়-সম্পত্তি আমি গৌরীকে দিচ্ছি, অতবড় বিষয় পেলে রাজার ঘরে গৌরীর বিয়ে হবে, তাই নিয়ে সে সুখী হোক্—মাও আমাকে ক্ষমা করুন।"

—"আর তোর কি হবে?"

—"আমি ইন্দুকে বিয়ে কর্‌ব।"

—"তোকে কি খাওয়াবি, পরাবি?"

—"নিজে রোজ্‌গার কর্‌ব, আমি পুরুষ-মানুষ, মূর্খও নই।"

ভজহরি সকাতরে জয়ন্তের কাছে আগাইয়া আসিল। তারপর তার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে বলিল, "খোকন, লক্ষ্মী ভাই আমার! তোর মায়ের কথায় কান দে, তাঁর আঁতে তুই অ্যাত-বড় ঘা মারিস-নে!"

জয়ন্ত দু-হাতে নিজের মাথার দু-পাশ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তা আর হয় না ভজা! 'ইন্দুকে না-পেলে আমি—"

ভজহরি অবাক হইয়া দেখিল, জয়ন্তের চোখ অশ্রুজলে টস্‌টস্ করিতেছে! খোকনের চোখে জল! সে আর থাকিতে পারিল না, জয়ন্তকে কচিছেলের মত দুইহাতে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ওরে খোকন, আমার চোকের সাম্‌নে তুই কেঁদে ফেল্‌লি! না ভাই, তোর যা প্রাণ চায় তাই কর্—আমি আর কোন কতা কইব না!"—এই বলিয়া সে ব্যাকুল ভাবে জয়ন্তের চোখের জল দুইহাতে মুছাইয়া দিতে লাগিল। [ক্রমশ]

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

হায়রে অভিমানী!

ও আমার সূর্য্যমুখী
ওগো কুসুমরাণী,
শুধাই তোরে চুপে চুপে
গোপন একটি বাণী!

এমন তোমার রূপের ঘটা!
এমন বর্ণ এমন ছটা!
লুকাও তুমি কিসের তরে
মধুর গন্ধখানি?

কমলিনী আকুল হেসে,
গোলাপ দোদুল গন্ধে ভেসে;
প্রেমিক অলি শুনায় এসে
সুখের গুন্‌গুনানি!

কার অযতন কাহার ভুলে
তুমি আনন শূন্যে তুলে
সাঁঝ না হতে পড় ঢুলে
হায়রে অভিমানী!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

নাগকেশর

বিশ-পঁচিশ বছর আগে, বাঙ্‌লা কাব্যের আসরে যে সুরের আলাপ শোনা যেত, কবিদের বীণায় সে সুর এখন আর বাজতে শোনা যায় না।

সত্য বটে, বাঙ্‌লার বর্ত্তমান গীতিকাব্যে যেমন নানান্ রাগিণীর বৈচিত্র্য, যেমন নিত্যনূতন ছন্দের নৃত্য, যেমন সার্ব্বজনীন ভাবের বিত্ত দেখা যায়, বিশ-পঁচিশ বৎসর আগে তেমন-ধারা বিচিত্রতা উপভোগের অবসর বড় ছিল না;—কাব্যের যে-দিকটি তখন ছিল তরল, এখন সেটি হয়েছে গভীর; এবং তখনকার সংকীর্ণতা এখনকার সর্ব্বগ্রাহিতার মধ্যে নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু একালের এতটা উন্নতি সত্ত্বেও, যতই দিন যাচ্ছে ততই আমরা একটি বিষয় থেকে ক্রমেই যেন বেশী বঞ্চিত হয়ে পড়্‌ছি। রবীন্দ্রনাথের "মানসী" ও "সোনার তরী" প্রভৃতি কাব্য-পুঁথিতে যে খাঁটি লিরিকের মন-মাতানো সুরটি ছিল, সে সুর এখন দিন-কে-দিন ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে কেন?

মহাকাব্যের গাম্ভীর্য্য-সাগরে পড়ে বাঙালীর প্রাণ যখন দস্তুরমত হাবুডুবু খাচ্ছিল, "সোনার তরী" তখন দেবতার আশীর্ব্বাদের মত ভরা-জোয়ারে আমাদের কাছে ভেসে এসেছিল। বাঙালীর ধাতে মহাকাব্যের গুরুত্ব যে একেবারেই যুৎসই নয়, বৈষ্ণব-কবির হাল্‌কা গান এতদিন-পর্য্যন্ত জলজ্যান্ত বেঁচে থেকে বিশেষভাবে তা প্রমাণিত করে' দিচ্ছে। সুতরাং আমাদের গীতিকাব্যের পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মত ঢুকে মহাকাব্য কিছুদিন উপদ্রব করেছিল বটে, কিন্তু সে উৎপাত আমরা বেশীদিন সহ্য করে' উঠ্‌তে পারলুম না। তাই বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি বাঙ্‌লার আসর অত-শীঘ্র জমিয়ে তুল্‌লেন—কারণ তাঁদের কাছ থেকে আমরা যা পেলুম তা মহাকাব্যের গুরুত্ব নয়, গীতকাব্যের লঘুত্ব। *

রবীন্দ্রনাথের অগ্রবর্ত্তী দুই কবি—বিহারীলাল ও—বিশেষ করে'—সুরেন্দ্রনাথ খণ্ডকবিতা লিখে থাক্‌লেও, তার মধ্যে লিরিকের রসরূপ উচিতমত ফোটাতে পারেন-নি। তাঁদের রচনা মহাকাব্য ও গীতি-কাব্যের মাঝখানে দোটানায় পড়ে ঐ দুয়েরই আকারলাভ করেছিল।

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল', সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা,' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' এই শ্রেণীর কাব্য। অর্থাৎ, এগুলি ঠিক গীতিকাব্য না-হ'লেও এদের মধ্যে মহাকাব্যের কবল থেকে মুক্তিলাভের একটা প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা দেশে যে জিনিষ আম্‌দানি করলেন, তা একেবারে আন্‌কোরা—খাঁটি লিরিক বল্‌তে যা বুঝায়! সন্ধ্যাগগনের মেঘের স্বপনের মত সেগুলি যেমন বিচিত্র, তেম্‌নি সুন্দর, তেম্‌নি হাল্‌কা এবং প্রথম ফাল্গুনের বাসন্ত সমীরের মত তারা চকিতে প্রাণের ভিতরে তরল ও চপল ভাবের ইঙ্গিতে জাগিয়ে যায়। তারপরে কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাঙ্‌লার কবিরা গীতিকাব্যের এই সুর ধরেই কাব্যচর্চ্চায় মেতে উঠেছিলেন।

কিন্তু আগেই বলেছি, এখন আবার হাওয়া বদ্‌লে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এখন যে-শ্রেণীর কবিতা রচনা করছেন, আকারে-প্রকারে তা মহাকাব্যের মত বৃহৎ ও গুরু না-হ'লেও, সেগুলির মধ্যে লিরিকের লঘুতাও আর নাই; এগুলির আকার ছোট হ'লে কি হয়, এদের ভাব এমন বিশাল ও গভীর যে, পড়্‌তে গেলে পাঠককেও

---

* শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ'র লেখা কবিতার বই। দাম একটাকা। প্রকাশক গুরুদাস-লাইব্রেরী।

যথেষ্ট পরিমাণে চিন্তাশীল হ'তে হবে। রবীন্দ্রনাথের আগেকার কবিতা ছিল একেবারে নিশ্চিন্ত যৌবনের কবিতা; আর, তাঁর এখনকার অধিকাংশ কবিতা (তাঁর গানের কথা এখানে ধরছি না) হচ্ছে ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ, বিশ্বের মধ্যে বিক্ষিপ্ত জীবন-সমস্যার কাব্য। হয়ত-বা বাঙ্‌লার বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে এইটেই বেশী স্বাভাবিক এবং উপযোগী. কারণ, এ-যুগের কর্ম্ম-সংঘাতের মধ্যে নিরিবিলিতে বসে স্বপ্নচয়নের অবকাশ বড় অল্প।

আমাদের সমালোচ্য কাব্যের কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বাগচীর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, 'বাঙলা গীতিকাব্যের পুরণো লিরিকের পরিচিত সুরটি এখনো তিনি ত্যাগ করেন-নি।

"আজ বসন্তে হঠাৎ চেয়ে
দেখছি আমার কুঞ্জ ছেয়ে
ফুল ফুটেছে মনের মরা গাছে,
বুকের বেড়ায় হিয়ার ফাঁকে
যেথায়-সেথায় ডাঁটায় শাখে
তারই মধুর গন্ধ জমে আছে।
... ...
মনের মধু-মালঞ্চেতে
বস্‌ল আবার আসন পেতে
পদ্মপাতায় সে কোন্ সাহসিকা,
বকুলফুলের দুকূলখানি
বুকের পরে কে দেয় টানি'
চটুল চোখে—ও কোন্ চতুরিকা?"

এ সুর রবীন্দ্রনাথের সেকালের সুর, একালে যা আর বড় শোনা যায় না।

নবীন বাঙ্‌লার তরুণ কবিদের অনেকেই আজকাল এমন হঠাৎ-গম্ভীর এবং অকাল-প্রবীণ হয়ে উঠেছেন যে, তাঁরা আর "শুধু অকারণ পুলকে" কোন হাল্‌কা ভাবের পল্‌কা সুরের গান ধর্‌তে পারেন না। আমাদের কাব্যলক্ষ্মীর মুখে তাইত আমরা আর কল্পনার রূপকথা শুনতে পাই না—নবীন কবিদের কাজের তাড়ায় বাধ্য হয়ে তাঁকে এখন গেরস্থালীতে পাকা গিন্নির মত গাছ-কোমর বেঁধে হাতে-নাতে কাজকর্ম্ম কর্‌তে হচ্ছে! নবীন কবিরা এখন কাজের মানুষ হ'তে চান—দেশোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার, কৃষির উন্নতি, পতিত-উদ্ধার, ম্যালেরিয়া-দমন এবং শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার—একালে এম্‌নি সব 'বস্তুতন্ত্র' ব্যাপার না-থাক্‌লে কাব্য নাকি অশ্রাব্য এবং অপাঠ্য হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্যহীন আর্টকে এখন নিরুদ্দেশ করবার আয়োজন চল্‌ছে, কাজেই কবিদের মানসপুরের স্বপ্নোদ্যানে আকাশ-কুসুমের চারা একেবারে নেতিয়ে পড়ে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু "নাগকেশরে"র কবি এই দুর্দ্দিনেও কল্পলোকের বিজন ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাই তিনি বল্‌তে পেরেছেন:—

"মনের বনের গহন-কোণে
আছে যে এক দেশ—
স্বপনরাণী থাকেন সেথায়
মেঘের মত কেশ;
... ...
জানই যখন অজ্ঞানাধিক—
আলোর বেশী কালো,
সত্য যখন মিথ্যা এত,
স্বপ্ন—সেত ভালো!
হাসি যখন অশ্রুজলে
যায়রে হেথায় ভেসে,
কিসের ক্ষতি—বাঁধ্‌না বাসা
স্বপ্নরাণীর দেশে!"

'নাগকেশরে'র 'বসন্তসপ্তক', 'মধুমাসে' ও "ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো' প্রভৃতি অনেক কবিতাতেই আমরা তাই দেখতে পাই, কবি উচ্ছ্বসিত আবেগে এবং উদ্বেলিত আনন্দে অধীর হয়ে কল্পনার মায়ালোকে বিচরণ করছেন। এ-সব কবিতায় শেখ্‌বার কিছু থাকে না বটে, কিন্তু সংসারে বাস্তবতার দংশনে যাঁরা আহত হন, তাঁদের পক্ষে এ-শ্রেণীর কবিতা স্নিগ্ধ প্রলেপের মত কার্য্য করে।

যতীন্দ্রমোহনের রচনা-রীতিতে যত্রতত্র রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখা যায় স্পষ্ট। এখনকার অন্যান্য কবিদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের সুর ও ঝঙ্কার এতটা

করে' নিতে পারেন-নি,—ভালো অনুকরণে যতটা সার্থকতা থাকতে পারে, 'নাগকেশরে' তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু, নিছক ও অন্ধ অনুকরণে কোন কাব্য উচ্চশ্রেণীতে উঠতে পারে না—যতই আশ্চর্য্য হোক্, সাহিত্যের আসরে গ্রামোফোনের একটুও মর্য্যাদা নেই। অবশ্য, 'নাগকেশরে'র কবি ঠিক এ-শ্রেণীর অনুকারী নন। নিজের চোখে পরকলা পরে তিনি বিশ্বকে দেখেন নি, তিনি স্বচক্ষে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ দর্শন করেছেন এবং আত্মহৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা সেই সৌন্দর্য্যের প্রকাশকে অধিক-সুন্দর করে' তুলেছেন। "নাগকেশরে'র 'উৎসবে', 'কেয়াফুল', 'রাধা', 'রামায়ণ-স্মৃতি', 'শত্রু' ও 'নিষ্কৃতিহীন' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথের সুর ও ঝঙ্কার থাকলেও এ-গুলির ভাবে এবং প্রকাশ-কৌশলে কবির নিজস্বের ছাপ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও খাঁটি কবিত্বের পরিচয় আছে যথেষ্ট।

এই প্রসঙ্গে 'নাগকেশরে'র 'অন্ধবধূ'র কথা মনে হচ্ছে। এ কবিতাটিতেও কবির নূতনত্ব-সৃজনের প্রয়াস দেখা যায়। এর আরম্ভটিও অতি সুন্দর। "অন্ধ বধূ" বলছে :—

> "পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি!
> আস্তে একটু চল্‌না ঠাকুর-ঝি—
> ওমা, এযে ঝরা-বকুল! নয়?
> তাইত বলি, বসে' দোরের পাশে,
> রাত্তিরে কাল—মধুমদির বাসে
> আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয়।"

ভালো ভাব লেখকের মনে আসে, ঠিক বিদ্যুতের চমকের মত! তখনি তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেল্‌তে না-পারলে তার সার্থকতা আর থাকে না। এখানে কবি বোধহয় সমগ্র ভাবটিকে ধারণা করতে পারেন-নি। এ-কথা বল্‌ছি এইজন্যে যে, "অন্ধবধূ'র ধর্তাই যেমন চমৎকার হয়েছে, তার আগাগোড়া ঠিক তেমন একসুরে বাঁধা হয়-নি। এর-মধ্যে সম্ভাব্য ছিল অনেক, কিন্তু সে তুলনায় যা হয়েছে তা খুবই সামান্য। "অন্ধবধূ"র কথায় সাধারণের মনে যে সহজ ভাব আসে, কবির কাছ থেকে আমরা তার চেয়েও অনেক বেশীর প্রত্যাশা করি—কিন্তু কবি এখানে আমাদের সে প্রত্যাশা ব্যর্থ করেছেন। ফলে যে কবিতাটি বাঙ্‌লা ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট কবিতা হ'তে পারত, সেটি নিকৃষ্ট না হলেও বড়ই বাজার-চল্‌তি গোছের হয়ে পড়েছে।

কিন্তু এখানে বিফল হ'লেও অন্যান্য অনেক জায়গায় কবি তাঁর কবিনাম সার্থক করে' তুলেছেন। যেমন, 'শত্রু' নামে কবিতায় প্রণয়-বেদনার অশ্রুজলে অভিষিক্তা প্রেমিকা যেখানে আপনার জীবনেশ্বরকে 'শত্রু' বলে মনে করছে—সেখানে আমরা বহুকবি-বর্ণিত প্রেম-বর্ণনার পরও কবির এই নায়িকার প্রেমের মধ্যে বেশ-একটু নূতনত্বের আস্বাদ লাভ করি :—

> "কে বলে তাহারে দরদী আমার, অনুরাগী বলে কে—
> মনে মনে আমি ভাল জানি মোর পরম শত্রু সে!
> শত্রু না হলে যেখানে-সেখানে চোখে-চোখে রাখে ঘিরে,
> শত্রু না হলে ঘাটে-বাটে মোর পায়ে-পায়ে সে কি ফিরে,
> শত্রু না হলে যেদিন হইতে আঁখিতে পড়িল আঁখি,
> নয়ানের নিদ বয়ানের হাসি কাড়ি' লয় দিয়া ফাঁকি?"

"রামায়ণ-স্মৃতি"তে কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টি 'রামায়ণে'র আসল মর্ম্মটুকু ঠিক আবিষ্কার করতে পেরেছে :—

> "তবু আজি ভাবি মনে—কতটুকু তার
> স্মরণে প্রদীপ্ত আছে। কি কথা কাহার,
> রাম আর বৈদেহীর মর্ম্মব্যথা ছাড়া—
> চির-প্রেম-অশ্রু সেই রসের ফোয়ারা!
> সেই চিত্র—সেই শ্লোক আসে ফিরে-ফিরে
> ঝর-ঝর শ্রাবণের উতলা সমীরে
> মল্লিকার গন্ধসম—সেই সিক্ত বাস
> ঘনায় বক্ষের মাঝে গোপন নিঃশ্বাস!
> আর যাহা আছে মনে, সবই বাষ্পে ঢাকা—
> অস্ফুট অস্পষ্ট ছায়া—অন্ধকারে আঁকা।
> সবই যায়—প্রেম থাকে জগতের আলো—
> রামায়ণ-পাঠে তাই বুঝিয়াছি ভালো।"

"রাধা" নামে কবিতায় কবি বল্‌ছেন :—

> "ব্রজভূমে বঙ্গভূমে—যেখানেই হোক্ বা না কেন,
> যে নারী প্রেমের পায়ে করিতেছে আরাধনা হেন,

কৃষ্ণে বা গোরায় হোক্ মন যদি দিয়ে থাকে বাঁধা—
আধা-অঙ্গ কাঁদে শুধু; কবি কহে সেই মোর রাধা!"

আমরা এই সামান্য তিনটি উদাহরণ দিলুম মাত্র; কিন্তু এ-ছাড়া আরো-অনেক জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের মধ্যে থেকেও, যতীন্দ্রমোহন নূতন বৈচিত্র্য এবং নূতন ভাব ফুটিয়ে আপনার শক্তি জাহির করতে পেরেছেন।

তবু, অনুকরণের যা বালাই, যতীন্দ্রমোহন সব সময়ে তা এড়িয়ে চল্‌তে পারেন-নি। তাঁর দু-চারটি কবিতায় ভাবমাধুর্য্য থাক্‌লেও রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, সুর, ঝঙ্কার ও ভঙ্গী এমন-বেশী জেগে উঠেছে যে, তাদের কথাগুলিকে আর ধ্বনি মনে হয় না—মনে হয় একেবারে প্রতিধ্বনি। যেমন, তাঁর "পদ্মাতীরে" ও 'স্বপ্নরাণী'র প্রত্যেক পদটি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' এবং 'সব-পেয়েছির-দেশ'কে বড় বেশীরকম স্মরণ করিয়ে দেয়। সাহিত্যক্ষেত্রে অনুকরণ ততক্ষণ সহ্য হয়, যতক্ষণ-না অনুকারী এবং দর্শকের মাঝখানে আসল আদর্শ তার সমুজ্জ্বল রূপে এসে নকলকে দু-হাতে ঢেকে না দাঁড়ায়!

'নাগকেশরে'র কবি প্রেমিক কবি। আজকাল সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেমের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধঘোষণা হয়েছে। ক্রিটিকরা বল্‌তে সুরু করেছেন, 'প্রেম এখন পুরণো—একঘেয়ে হয়ে গেছে, কাব্যে এখন গভীরতর অন্য-কিছু চাই!' ক্রিটিক্‌দের এই হুঙ্কারে ভয় পেয়ে নবীন ও তরুণ কবিরা পর্য্যন্ত, হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবকে চাপা দিয়ে, মানসনদের তটে আধ্যাত্মিকতার টোপ ফেলে, বকধার্ম্মিকের মত ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন; কিন্তু এই অকালপক্ক আধ্যাত্মিকতার টোপ গিলে কাব্যরসিকদের যে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয়ে উঠেছে, সেদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। প্রাণের স্বাভাবিক রক্তের টান বন্ধ করে' কবি যদি কিছু রচনা করেন, তবে তাতে ছন্দের ও শব্দের কৃত্রিম ঐশ্বর্য্য থাক্‌লেও স্বভাবসঙ্গত ভাবের সৌন্দর্য্য কখনো থাক্‌বে না। খালি intellectএর জোরে কখনো কাব্য জ্বালো হয় না—তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাব্য, যার মধ্যে কবির গোপন প্রাণের গভীর বার্ত্তা পাওয়া যায়। ভাষা, ছন্দ, মিল ও ঝঙ্কার—এ-সমস্তকে সার্থক করে' তোলে কবির ঐ প্রাণের বার্ত্তা। যতই পুরাতন হোক্, যতই অবিচিত্র হোক্, কবি যদি খাঁটি প্রাণের কথাটি নির্ভয়ে সরল ভাবে বল্‌তে পারেন, তবে তা পাঠকের প্রাণের 'পরে একটা উজ্জ্বল রেখাপাত করবেই-করবে। যাঁরা গ্রাম্য নিরক্ষর কবিদের কবিতা পড়বার বা শোনবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা বোধ হয় এটা লক্ষ্য করেছেন যে, ভাষা বা ছন্দ বা মিল—অর্থাৎ নির্দ্দোষ ও শ্রেষ্ঠ কাব্যে যে-সব লক্ষণ থাকা উচিত, ঐ-সকল কবিতায় বা ছড়ায় তার কিছুই নেই। তবু গ্রাম্য কবিদের রচনা অনেক সময়েই আমাদের মর্ম্মস্পর্শ করে কেন? তার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, গ্রাম্য কবিদের ভিতরে ক্রিটিক্‌দের উৎপাত নেই—তাই তারা যা বলে, অসঙ্কোচে সমস্ত প্রাণ খুলে বলে—মনের আনন্দে বনের বিহঙ্গের মত মুক্তকণ্ঠে তারা আকাশে-বাতাসে আপনাদের স্বাধীন হৃদয়ের অকুণ্ঠ বাণী প্রেরণ করে।

প্রেমের ধর্ম্ম হচ্ছে মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—এ সনাতন ধর্ম্ম কখনো পুরাতন হয় না। প্রেম তাই কাব্যের মধ্যে চিরন্তন হয়ে আছে এবং অদ্যাবধি কোন কবি প্রেমকে পুলিপোলাওতে চালান করে' প্রথম-শ্রেণীতে প্রমোশন পান-নি। অতএব ক্রিটিক্‌রা যতই চীৎকার করে' ধিক্কার দিন আর যতই উৎপাত করুন, কবির মানস-নদ থেকে প্রেমের উৎপল তাঁরা উৎপাটন করতে কিছুতেই পারবেন না।

'নাগকেশরে'র কবিও নিন্দিত প্রেমের পক্ষ ত্যাগ করে' আপনার স্বাভাবিক প্রাণের গতিকে সঙ্কুচিত করেন-নি—এমন-কি, তাঁর প্রাণকে এদিকে তিনি একেবারে দিশেহারা করে' ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন:—

"প্রেম—সেই মহাবাক্য—প্রেম মহাবাণী-
কোথা রাজা, কোথা রাজ্য, কোথা রাজধানী!
এসেছে গিয়েছে কত বুদ্বুদের মত,
কত-না মহতী কীর্ত্তি হয়েছে বিগত—
ইতিহাস-কথাসার! প্রেম শুধু আছে,
লয়ে তার নিত্য সুধা নরচিত্ত মাঝে!

প্রেম শুধু পুণ্যচিত্র মানবের মনে
রয়েছে জাজ্জ্বল্যমান! জীবনের সনে
সম্বন্ধ তাহার নিত্য; বিশ্ব যতদিন,
প্রেমের নক্ষত্র ধ্রুব অম্লান নবীন!
তাই তাহা বেঁচে আছে!"

"নাগকেশর" একরকম প্রেমের কাব্য বল্‌লেই চলে—এর আগাগোড়া সর্ব্বত্রই কত সুরে, কত রাগিণীতে, কত ছন্দে ঐ এক প্রেমের কথাই ফুটে উঠ্‌ছে—কখনো সুখে কখনো দুঃখে, কখনো মিলনে কখনো বিরহে! 'নাগকেশরে' সবশুদ্ধ ছাপ্পান্নটি কবিতা আছে—তার প্রায় অর্দ্ধেক কবিতাই হচ্ছে একেবারে নিছক প্রেমের কবিতা! এবং বাদ্‌বাকি কবিতাগুলির অধিকাংশের মধ্যেও কবি যেখানেই সুবিধা পেয়েছেন আভাসে-ইঙ্গিতে বা প্রকাশ্যে প্রেমের জয়গান করেছেন।

সর্ব্বশেষে এটাও বলে রাখা ভালো, 'নাগকেশরে' প্রেম ছাড়া অন্য নানান্ রসের বৈচিত্র্যও নিতান্ত সামান্য নয় এবং কবি যখনি যে রস ফোটাতে চেয়েছেন, তখনি ঠিক লাগ্‌-সৈ সুর, অকুণ্ঠ ভাব, অনিন্দ্য ছন্দ এবং সুন্দর ভাষা দিয়ে সাজিয়ে তাকে লোকের সাম্‌নে প্রকাশ করেছেন।... ...মোটকথা, 'নাগকেশরে' গুণগ্রাহী পাঠকের উপভোগ অতৃপ্ত থাক্‌বেনা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চক্র ও চক্রান্ত

"না হে, না, আমি এক পয়সাও দেবো না। গাড়ীতে সর্ব্বস্ব চুরি, তারপর লোকের কাছে ভিক্ষে করে দেশে যাওয়া,—এ-সব—"

"না, রেবতীবাবু, এ ছেলেটির তা নয়—"

"তা নয়তো, তবে সৎমার কথা শুনে বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে, এখন—"

"আজ্ঞে, তাও নয়। ও—"

"তবে দিল্লীতে গান শিখতে?"

বড়বাবুর কথা শুনিয়া নিরঞ্জন শ্যামলাল মহম্মদ সফী সকলেই হাসিয়া উঠিল।

রেবতীমোহন মৈত্র দিল্লীর ডাকখানায় হিসাব বিভাগের একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ অফিসেরই সামান্য কেরাণী। কেহ দুঃখ জানাইলে নিরঞ্জনের প্রাণ গলিয়া যাইত; যথাসাধ্য সে তাহার উপকার বা সাহায্য করিত, স্বয়ং অপারগ হইলে প্রবাসী বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়াও প্রার্থীর প্রার্থনা যথাসম্ভব পূর্ণ করিত। ইহাতে কেহ তাহার সুখ্যাতি করিত, আবার এমন লোকও ছিল যাহারা মজা করিয়া যাহা-ইচ্ছা বলিয়া লইত, নিরঞ্জন তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিত না। সে জন্য আজ যখন সে বিপদগ্রস্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যকে লইয়া বুক্ সেক্‌সনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রেবতীবাবুর কাছে আসিল, তখন তাহাকে অনেক কথাই শুনিতে হইল। কোন কথা না শুনিয়া রেবতীবাবু তাহাকে বিদায় দিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নিরঞ্জন ছাড়িবার পাত্র নয়, সেও বালকটির বিপদ রেবতীবাবুকে না বুঝাইয়া নড়িবে না! সে বলিল, "আজ্ঞে, গান টান শিখতে বড় লোকের ছেলেরাই আসে, গরীব—"

"আহা, ঐ কথাইতো বল্‌ছি, কাঙ্গালেরও ঘোড়া রোগ হয়। হ্যাঁ শ্যামলাল, ওটা সাহেবের হুকুম নিয়ে War Controllerকে debit দিলেই হবে। আমরা ঢের জানি হে বাপু, তোমরা কালকের ছেলে বৈ তো নও, ওরকম কত লোক কত কথা বলে কত কি ঠকিয়ে নিয়ে গেছে। বিদেশে ও একটা মজা। হাঁ মুন্‌সিজি, তোমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বল না সাহেবের হুকুম নিতে। তোমরা যেমন করে দেবে, আমরা সেই রকমই করবো, আমাদের নিজেদের মাথা-ব্যথার দরকার কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বৈ কি।"

"আজ্ঞে, এ ছেলেটি চাকরির জন্যে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চাকরির জন্যে, জানি, জানি, ও আর আমায় বল্‌তে হবে না। কেমন হে তিনকড়ি, Remittance registerটা গোলমালে submit হয়নি? এখন ভাল সাহেব পেয়েছ, যা খুসি করে যাচ্ছ, এর পর নিজেরাও ডুববে, আর সেই সঙ্গে আমাকেও ডোবাবে।"

"এ ছেলেটি বড় গরীব—"

"কে বল্‌ছে—ধনী?" U. Pর Exchange Account পাওয়া গেল না, একটা তার করে দাও না হে—"

"বাপ ছাঁপোষা—"

"বাঙ্গালীর ঘরে তাতো হয়েই থাকে, নতুন কথা আর কি! আঃ, ও আবার কি সিঙ্গিবাবু?"

"আজ্ঞে দেখুন দিকি C. I. T. বল্‌ছেন কি না আমাদের Salt statementএ Northern India Commissioner এর সঙ্গে ছ আনা তিন পাইএর তফাত হয়েছে।"

"আঃ, জ্বালাতন! নিয়ে আসুন, দেখি! এই দেউকি বেটা আসছে, এই দিকেই আসছে যে। বেটা ডাকলে না কি হে?" বলিতে বলিতে দেউকি নন্দন আসিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে সেলাম করিয়া বলিল, "বড়া সাব্‌—" সিঙ্গিবাবু পাদপূরণ করিয়া বলিলেন, "সেলাম দিয়া"। আর্দ্দালি মেড়ে পর্য্যন্ত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। রেবতীবাবু উতলা হইয়া উঠিলেন। তাইত, ব্যাপার কি! Section-শুদ্ধ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার কি case গিয়াছে। কেহ বলিল, approximate statementএর ভুলের draftটা রয়েছে! কেহ বলিল, B. P. O. statement এর বিলম্বের জন্য হয়ত তার আসিয়াছে। কেহ বলিল, pending report দাখিল হয়েছে। যাহা হউক রেবতীবাবু গালের পান ফেলিয়া সিগারেটটি নিবাইয়া জানালার উপর রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ "creeping like a snail unwilling to the school" সাহেবের নিকট চলিলেন। নিরঞ্জনও বালকটিকে লইয়া অন্যত্র চলিল।

২

আজ চার-পাঁচ দিন হইল নিরঞ্জন বিধুভূষণকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। কেহই বিশেষ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নয়, এমন কি মেসে থাকিতে দিতেও সম্মত নয়। যেমন দিন-কাল পড়িয়াছে লোকের সন্দেহ বা ভয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়। নিরঞ্জনের বৈঠকখানা নাই, তথাপি সে তাহাকে কোন

মতে আপন বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলে বিপদে পড়িয়াছে, স্পষ্ট কথাই বা কি করিয়া বলে? কিছুদিন পূর্ব্বে ডাক্তার কিশোরীমোহন রায় ছেলেদের একজন প্রাইভেট টিউটরের কথা তাহার কাছে বলিয়াছিলেন, তিনি যদি দয়া করিয়া ছেলেটিকে আশ্রয় দেন, এই ভরসায় নিরঞ্জন রায় মহাশয়ের ডিস্পেন্সারির দিকে বিধুকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

রায় মহাশয় রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন। কাজেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। বসিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইলও বিস্তর। "ডাক্তার সাব কোথায় গিয়েছেন?" লোকের পর লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "বন্দিগি জনাব, ডাক্তার সাব কাঁহা গয়া?"

"মালুম নেই সাব।"

"কিস্‌বখ‌্ৎ আয়েঙ্গে?"

"কেয়া মালুম?"

"কেঁউ বাবুজী, ডাক্তার সাহাব কাঁহা গেছি?"

"কম্পাউণ্ডার লোগোসে পুছিয়ে।"

"কেঁউ সাব, ডাক্তার সাহাব আয়া নেই আভি?"

"ডাক্তার সাব কাঁহা বাবু?"

নিরঞ্জন রাগে বলিয়া উঠিল, "চুলোয়।"

"কেৎনা দূর বাবু সাব? কিসবখ‌্ৎ লোটেঙ্গে?"

উত্যক্ত হইয়া নিরঞ্জন বিধুকে একটি বেঞ্চে বসাইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ডাক্তারবাবু আসিলেন, সঙ্গে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ডাক্তারবাবু নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত একের ঔষধের ব্যবস্থা লিখিতে লিখিতে অন্যের জ্বরের অবস্থা শুনিতেছিলেন, তৃতীয় রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে চতুর্থ রোগীর "খিচ‌ড়ি "কোস্কা" খাইবার ব্যবস্থা বলিয়া দিতেছিলেন। পনের মিনিটের ভিতর প্রায় সকল রোগী দেখিয়া বিধুর দিকে হত বাড়াইয়া কহিলেন, "নাম?"

"আজ্ঞে, শ্রীবিধুভূষণ"—

"হাত দেখি—Be sharp, man, জ্বর ছেড়েছিল? পাইখানা হয়েছিল?"

ডাক্তারদের সময় যে কতখানি মূল্যবান, তাহা রোগী বা রোগীর অভিভাবকের দল কেহ আদৌ বিবেচনা করেন না। তাঁহার রোগ যে কি, এক কথায় কোন রোগীই কখনও ডাক্তারকে খুলিয়া বলে না। ইহারা যে তাঁহাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে একটুও দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করে না, এ কথা সকল ডাক্তারদেরই জানা আছে, সুতরাং রায় মহাশয় বিধুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই যথারীতি প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

Liq Ammon Acct—

Tinc Aconite—

Mag Sulph—

Add aqua—

এমন সময় নিরঞ্জন আসিয়া ডাক্তার বাবুকে নমস্কার করিয়া বলিল, "ডাক্তার বাবু এ ছেলেটি বড় বিপদে পড়েছে—"

কলমটি রাখিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন, "কি জান, ডাক্তারের পয়সা দেবার সময় অনেকের

অনেক বিপদ হয়। অবশ্য এঁর কথা বলছিনি।” পরে নিরঞ্জনকে জবাবের অবসর না দিয়া কলমটি পুনরায় হাতে লইয়া প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনের উপর লিখিলেন, “Half—”

“আজ্ঞে ক’দিন পূর্ব্বে ছেলেদের মাষ্টারের কথা বলছিলেন না?”

“হ্যাঁ, পাচ্ছিনে ত’হে।”

“তা যদি এই ছেলেটিকে—”

বিধুর দিকে চাহিয়া ডাক্তার বলিলেন, “Then why did you keep me waiting so long?” সেই সময় প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন হস্তে একটি ভিখারী আসিয়া ডাক্তার বাবুর পায়ে জড়াইয়া পড়িল; ডাক্তার বাবুকে জানাইল, বারো আনা পয়সা তাহার নাই, ছয় আনা মাত্র ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছে, কিন্তু কম্পাউণ্ডার বাবু তাহাতে ঔষধ দিতে সম্মত নন। ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিয়া প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনটি লইয়া ছয় দাগের স্থানে তিন দাগ করিয়া দিলেন। লোকটি “বাবুজিকা খয়ের” “বাচ্ছা জিতে রয়” “পরমাত্মা সুখী রাখে” বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। তখন ডাক্তারবাবু বলিলেন, “হ্যাঁ নিরঞ্জন, বলছিলুম কি, ইনি বেশ যত্ন করে পড়াবেন তো? কতদূর পড়েছেন? তোমাদের অফিসেই চাকরি করেন বুঝি?”

“আজ্ঞে, না, ইনি এবার কলকেতায় আই, এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু ফেল হয়েছেন। সে জন্যে বাপ যথেষ্ট তিরস্কার করেন। তাঁর অবস্থা খারাপ, তিনি আর পড়াতে পারবেন না। কাজেই বাধ্য হয়ে এঁকে চাকরির অন্বেষণে বেরুতে হয়েছে। দেশে চাকরির বাজার জানেন তো? তাই আর কি দিল্লীতে—”

“হ্যাঁ, দিল্লী এখন রাজধানী কি না! তা কোথাও কিছু জুটলো?”

“আমাদের অফিসে এখনতো খালি নেই। তবে শীগ্‌গির কটা লোক নেবে। তখন দেখব’খন চেষ্টা করে। কিন্তু উপস্থিত কোথায় থাকে, খাই-খরচই বা চলে কি করে? অর্থাৎ—”

“কিসে ফেল হলে হে?”

“আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারি নে।”

“সব দিকেই স্কোয়ার নাকি? নিজে লিখে কিছু বুঝতে পার নি?”

“যা লিখেছিলুম তাতে ফেল হবো মনে হয় নি।”

“এক্‌জামিনারদের তোমার উপর আক্রোশ ছিল বুঝি?”

ডাক্তার বাবুর হাব-ভাব দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিধু মনে মনে তাঁহার উপর যথেষ্টই চটিয়াছিল কিন্তু এখন রাগ করিয়া কোন কথা বলা উচিত নয়, তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

এই সময় রেবতী বাবুও ডাক্তার-খানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারবাবু তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া বসিবার জন্য চেয়ার টানিয়া দিলেন। বসিয়াই রেবতীবাবু বলিয়া উঠিলেন, “কে নিরঞ্জন যে, এখানেও ধাওয়া করেছ?”

“কি করি বলুন, ভদ্রলোকের ছেলে বিপদে পড়েছে,—এখন নিরাশ্রয়—একটা ব্যবস্থা তার না হলে চুপ করে থাকি কি করে?”

রেবতীবাবু বলিলেন, “দেখুন ডাক্তারবাবু, পয়সা নেই, কড়ি নেই, বাড়ী থেকে রাগ

করে বেরিয়ে পড়া এ একটা আজকালকার ছেলেদের ফ্যাসান হয়েছে। এগুলো encourage করা কোনমতেই উচিত নয়।”

“এফ-এ—না, না, আজকাল বুঝি বলতে হয় আই-এ, যাহোক ফেল হয়েছেন, তাই বাপ বকেছেন, আর অমনি দিল্লী পাড়ি! বে হয়েছে? পয়সা-কড়ি কিছু চুরি করে এনেছ?”

ডাক্তার বাবু একটা বিকট হাস্য করিলেন। বিধু ও নিরঞ্জন উভয়েই রাগে নীরব রহিল। তাহাদের ইচ্ছা হইল, তখনই বা হর হইয়া পড়ে, কিন্তু ডাক্তারের কাছে সকলেরই টিকি বাঁধা। তিনি যদি রাগ করেন, তাহা হইলে ছেলে-পুলের রোগের সময় মানুষ কাহার কাছে যাইবে?

ডাক্তার বাবু বলিলেন, “দেখ নিরঞ্জন, আমার সত্যই একটি মাষ্টারের প্রয়োজন কিন্তু আজকাল পুলিসের হাঙ্গামও তো জান? না জেনে-শুনে কাকেও আশ্রয় দিতে ভয় করে। না হলে ছেলেটি দেখতে-শুনতে মন্দ নয়, বুদ্ধিমান বলেও বোধ হচ্ছে।”

“না মশাই, আজকাল যে ব্যাপার—হয়ত বা গোয়েন্দাই হবে।”

“তাতে আমার ভয় কি রেবতী বাবু? অ্যানার্কিষ্ট না হয়!” কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ডাক্তারবাবু আবার বলিলেন, “আচ্ছা বাপু, তোমার নামটি কি বল্লে?”

“আজ্ঞে আমার নাম শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।”

“নিবাস?”

রেবতীবাবু বলিলেন, “তোমরা কোন্ শ্রেণী হে?”

“আজ্ঞে আমরা বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ—আমাদের বাড়ী বারুইপুরের কাছে—”

রেবতীবাবু বলিলেন, “গ্রামের নামটা বল দেখি। বলনা, লজ্জা কি?”

“আপনারা চিনতে পারবেন কি?”

“আচ্ছা বলই না, আমরাই কোন্ হ্যালিবেরি কলেজ থেকে আসছি?

“লাঙ্গলবেড়ে।”

“—লাঙ্গলবেড়ে? বিশ্বনাথ ভট্চায্যির বাড়ীর কোন্ দিকে?”

“—আজ্ঞে ঐটিই আমাদের বাড়ী।”

“বিশ্বনাথ তোমার—?”

“বাবা।”

“বল কি?”

ডাক্তারবাবু কহিলেন, “রেবতীবাবু তাহলে চেনেন নাকি?”

“খুব চিনি। দেখুন ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। যদি একবার এদিকে—”উভয়ে গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া ডাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তার আর ভাবনা কি, হে?”

রেবতীবাবু বলিলেন, “কেমন হে নিরঞ্জন, দিনকতক না হয় উনি আমার বাড়ীতেই থাকুন। ছেলেটিকে একটু দেখবেন। আমার অবস্থা জানতো—”

“তাতো জানি, আপনার বাড়ী রাখেন যদি, সে তো ভালই। আর গেরস্থর ছেলে ভাত হাঁড়ির ভাত—”

“আর সাহেবকে বলে-কয়ে একটা চাকরিরও চেষ্টা করে দেখ’ন।”

বিধু রেবতী বাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় পাইল।

৩

রেবতীবাবু সাহেবের পেয়ারের লোক। তিনি বিধুর সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। তাঁহার নিজের উদ্দেশ্যও অকপটে জানাইলেন। সাহেব বিধুকে চল্লিশ টাকা বেতনের একটি চাকরি দিতে প্রতিশ্রুত—প্রতিশ্রুত কেন—আগামী সোমবার হইতে তাহাকে নিয়োগ করিবারও আদেশ দিলেন; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে ঐ কাজে বাহাল হয়, ততক্ষণ কথাটা গোপন রাখিতে বলিলেন। কথাটা প্রকাশ না হয় সে জন্য রেবতীবাবুও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু কথাটা গোপন রহিল না। "কি জানি কেমনে কেবা বলি দেয় কাকে!" "A" Sectionএর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অম্বুজাক্ষ দে সাহেবকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার ছেলেও তো এফ, এ পাশ ছিল, তাহাকে ত্রিশ টাকায় কেন লওয়া হইল? আর, এ ছেলেটাই বা কে? কি পাশ? তাহার সার্টিফিকেটই বা কে দেখিয়াছে? "C" Sectionএর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নেহাল সিং বলিল, তাহার ভাই গ্রাজুয়েট ছিল সাহেব তাহাকে চল্লিশ টাকা দিলেন না কেন? Gazetted audit sectionএর auditor বিপ্রহরি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেবকে বলিলেন, তাহারাও তো এফ্‌ এ, পাশ, বি, এ ফেল, তথাপি তাহাদের কুড়ি টাকায় প্রথমে লওয়া হইয়াছিল। সাহেব সকলের কথার জবাব দেওয়া উচিত বিবেচনা করিলেন না, কেবল রেবতীবাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া কথাটা প্রকাশ পাইল। রেবতীবাবু নিরঞ্জনের উপর সন্দেহ করিলেন।

অফিসে এক-এক Sectionএর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের এক-একটা দল আছে। একদল অপরদলের নিন্দামন্দ দোষ-গুণ প্রভৃতি লইয়া মনোমালিন্য বাড়াইয়া তুলে। সাহেব রেবতীবাবুর কথায় উঠেন-বসেন, অন্যদল তাহা সহ্য করিতে পারেন না। যখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের দল নিজেরা কিছুই করিতে পারিলেন না তখন স্বল্পবেতন কেরাণীদের বুঝাইয়া দিলেন, অফিসে কি রকম জুলুম চলিতেছে। ফলে বাহিরের লোক আনা, অন্যায় অবিচার প্রভৃতির দোহাই দিয়া তাহারা Comptroller Generalএর নিকট এক মেমোরিয়াল দাখিল করিল। সাহেব বুঝিলেন, ব্যাপার অনেকদূর গড়াইতেছে। তিনি বিধুকে কুড়ি টাকা বেতনে শিক্ষানবীশ লইবেন বলিয়া দিলেন; পরে যথানিয়মে পঁচিশ টাকায় পাকা চাকরি দিবেন। বিপ্রহরি, নিরঞ্জন, হুকুমচাঁদ, হোসেনবক্স প্রভৃতি অনেক এফ, এ পাশ আছে, তাহারা অনেকে আজও চল্লিশ টাকায় পাকা হইতে পারে নাই, সুতরাং বিধুকে তিনি উপস্থিত চল্লিশ টাকা দিতে পারিবেন না। রেবতীবাবু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার দুঃখের কারণ—শত্রুপক্ষ হাসিল। তিনি মনে মনে নিরঞ্জনের উপর চটিলেন। বিধুর চাকরির কথা একমাত্র তাহাকেই তিনি বলিয়াছিলেন; সে পঁয়ত্রিশ টাকার গ্রেডে প্রথম ছিল, চল্লিশ টাকা তাহারই হইবার কথা। তা ছাড়া memorial, representation প্রভৃতি লিখিতে সে-ই প্রধান উদ্যোগী রচনা প্রায় তাহাকে ধরিয়াই সারা হয়। আপন sectionএর দুই-একজনকে ডাকিয়া

রেবতীবাবু বলিলেন, "দেখলে হে, নিরঞ্জনের আক্কেল, কি শক্রতাটাই সাধলে!" সকলেই নিরঞ্জনের নিন্দা করিল। সেদিন আর বড়বাবুর নিকট কেহ কোন কেস্ লইয়া যাইতে সাহস করিল না, তিনিও অফিসের কোন কাজ করিতে পারিলেন না, রুক্ষ চিত্তে সকাল-সকাল বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ীতে ঢুকিয়াই দেখিলেন, ছোট মেয়েটা আপন-মনে কলতলায় জল মাখিতেছে, অমনি বড় ছেলেকে ধরিয়া খুব প্রহার দিলেন; স্ত্রী ধরিতে আসিলে তাঁহাকে যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া উঠিলেন। ভগ্নী কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া তিরস্কৃত হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কেহ বুঝিতে পারিল না, ব্যাপার কি? যথেচ্ছাক্রমে জামা-কাপড় ফেলিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বিধুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব চল্লিশ টাকা দিতে সম্মত হইলেন না, উপস্থিত কুড়ি টাকা দিবেন, তাহাতে তাহার কি মত?

"চাকরি কাজ নেই—নিরঞ্জনদা বলেছেন বাঙ্‌লা স্কুলে মাষ্টারি খালি—"

"বুঝেছি।" বলিয়া রেবতীবাবু বৈঠকখানা হইতে চলিয়া গেলেন।

* *

*

কয়েকদিন রেবতীবাবু নিরঞ্জনের সহিত বাক্যালাপ করেন না; পথে দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া যান। অফিসের সকলেই তাহার উপর চটা। কেহ ঠাট্টা করিয়া বলে—বিধুর চাকরির সে কি করিল? কেহ বা রাগ করিয়া বলে, ভদ্রলোকের ছেলে, যদিই বা সাহেব দয়া করিয়া একটা চাকরি দিতেছিলেন সেটার অন্তরায় হইয়া, তাহার কি লাভ হইল? নিরঞ্জন প্রকৃতই সাদা-প্রকৃতির লোক, সে পেঁচ্‌ওয়া কথা বুঝিত না; সকলকেই সাদা কথায় জবাব দিত। ভিতরে ভিতরে যে একটা ভয়ানক ব্যাপার চলিতেছে, তাহা সে আদৌ বুঝিতে পারিল না। অদৃষ্টক্রমে এই সময়ে তাহার একটি ভুল ধরা পড়িল। ভুলটি সামান্য হইলেও Book Section ও "A" Sectionএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের মনোমালিন্যে উভয় পক্ষে খুব মসীযুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষের ইংরাজী লেখার বহরে সাহেবের মনে ধারণা হইল, এটা একটা ভয়ানক ভুল, আর নিরঞ্জনই এই ভুল করিয়াছে! সুতরাং তিনি তাহাকে পঁয়ত্রিশ টাকার প্রথম হইতে ত্রিশ টাকার গ্রেডের সব-শেষে নামাইয়া দিলেন। নিরঞ্জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট বিস্তর কান্নাকাটি করিল কিন্তু কাহারও মন গলিল না। কেহ বলিলেন, "ফাঁকি দিয়ে কতদিন চালান যায় হে?" কেহ বলিলেন, "উপযুক্ত দোষের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে!" ব্যথিত অন্তঃকরণে নিরঞ্জন বাড়ী ফিরিল। পাঁচ-সাত দিন হইতে তাহার ছেলের ঘুষঘুষে জ্বর হইতেছিল, আজ বাড়ী আসিয়া নিরঞ্জন দেখিল, জ্বর ১০৫° ডিগ্রীতে উঠিয়াছে, ছেলে ভুল বকিতেছে! সে তখনই ডাক্তার বাবুর নিকট ছুটিল। ডাক্তারবাবু রেবতীবাবুর কথা শুনিয়া নিরঞ্জনের উপর খুবই চটিয়া ছিলেন; তাহাকে জব্দ করিবার শুধু অবসর খুঁজিতেছিলেন, ভগবান্ আজ সে সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। তিনি

নিরঞ্জনের কথা শুনিয়া বলিলেন, তাঁহার যাইতে কোন আপত্তি নাই, তবে তাঁহাদের ক্লাবে ঠিক হইয়াছে যে তাঁহারা বাঙ্গালীদের বাড়ীতেও ভিজিট লইবেন; সুতরাং নিরঞ্জনকে অন্ততঃ চারিটি টাকা ভিজিট দিতে হইবে। নিরঞ্জন অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, ডাক্তারবাবু কিছুতেই টলিলেন না, অগত্যা তাহাকে তখন হকিম নুরমহম্মদের শরণ লইতে হইল। পরদিন বাঙ্গালীমহলে মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল, নিরঞ্জন এমন কঞ্জুষ যে ছেলেটার অত-বড় ব্যারামে একটা ডাক্তার দেখায় না, একটা হাতুড়ে হকিমের হাতে ফেলিয়া নিশ্চিন্ত আছে!

যে যাহাই বলুক, নিরঞ্জন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিধুর জন্য বাঙ্‌লা স্কুলে একটি মাষ্টারি জোগাড় করিয়া দিয়াছিল। আজ কাল যে রকম ব্যাপার, তাহাতে যাহাকে-তাহাকে মাষ্টার নিযুক্ত করা স্কুলের পক্ষে বড়ই ভয়ের কথা। সে জন্য সেক্রেটারি, হেড্ মাষ্টার মহাশয়েরা তাহাকে চাকরি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে যে কলেজ হইতে আই এ পরীক্ষা দিয়াছিল তাহার প্রিন্সিপালের নিকট বিধুভূষণের বিপক্ষে তাঁহার কিছু জানা আছে কি না এই মর্ম্মে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। আজ তাহার জবাব আসিল,—সকলেই অবাক! হার্ডিঞ্জ কলেজের প্রিন্সিপাল লিখিয়াছেন, বিধু আই এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সার্টিফিকেট পাঠাইবার দরখাস্ত করিলে তিনি তাহা পাঠাইয়া দিবেন। হেড মাষ্টার মহাশয় রেবতীবাবুকে পত্রখানি দিলেন। রেবতীবাবু সেই দিনই অফিসে আসিয়া সাহেবকে উহা দেখাইলেন। সাহেব বলিলেন, "ছেলেটি যে খুব বুদ্ধিমান, তা আমি তার সঙ্গে কটা কথা কয়েই বুঝ্‌তে পেরেছি। আচ্ছা, ও যে বল্‌লে, গেজেট দেখেছিল! আমাদের অফিসেও তো গেজেট আছে, জুন মাসের গেজেটগুলো আনান্ তো।" গেজেট আসিল; কিন্তু আই, এর resultএ বিধুর নাম পাওয়া গেল না। সাহেব বলিলেন, "দেখ, অনেকবার গেজেটে pass listএর অনেক correction দেখেছি, দেখ ত এর পরের সব গেজেট।" দেখিতে দেখিতে সত্যই একদিনকার গেজেটে পাশের খবরের কতকগুলি ভ্রম-সংশোধন পাওয়া গেল। লেখা আছে, "আই, এ resultএর প্রথম বিভাগের নিম্নে ১৭র দাগে রমানন্দ ইন্‌ষ্টিট্যুসনের শশাঙ্কশেখর খাসনবীসের পরিবর্ত্তে হার্ডিং কলেজের বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য উত্তীর্ণ" পড়িতে হইবে। উভয়েই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কি ভুল!"

"আচ্ছা বাবু, কেমন করে এ ভুলটা হল?"

"ভুল যে কি করে হয় সাহেব, তার কারণ সব সময়ে দেওয়া যায় না। অফিসেই তো দেখতে পান, যেখানে হবে ৩৭, সেখানে লিখে বস্‌লো ৯। কেন লিখলে, কি করে লিখলে, তা কিছুই ধরতে পারা যায় না। যে লেখে সেও বুঝতে পারে না, কি করে লিখলে। এখানেও হয়ত এক রোল নম্বর লিখতে আর-এক রোল নম্বর লিখে বসেছে। ব্যস্, নাম কলেজ সব বদলে গেল!"

যাহা হউক সাহেব বিধুকে তাঁহার সহিত

দেখা করিবার জন্ত রেবতীবাবুকে বলিয়া দিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণেই ডাক্তার রায় মহাশয় রেবতীবাবুর মুখে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে আর দেরী কেন হে? শুভস্য শীঘ্রং। এই বেস্পতিবারেই তো দিন আছে। এখন ওর মনে আহ্লাদ হয়েছে, হয়ত বা বাড়ীতেই চলে যাবে!"

"আজ্ঞে শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি হবে, বিশেষ নিরঞ্জন ছোকরা, জানেন তো—"

"রেখে দাও তোমার নিরঞ্জন! অমন ঢের নিরঞ্জন দেখেছি, তুমি জোগাড়-যন্তর তো কর। হিঁদুর ঘরে একবার দিয়ে ফেলতে পাল্লে আর ফেরত চলবে না। নিরঞ্জনকে জব্দ আমিই করছি,' এ দোরে সকলকেই আসতে হবে।"

"আজ্ঞে আপনি যদি ভরসা দেন আর আমাদের ঘরের ভেতর আপনারাই এখানে আছেন—"

"ভরসা—নিশ্চয়ই—ও আর কালবিলম্ব করা নয়। ভালো কথা, এক কাজ কর। ওকে আর মাষ্টারি করতে দিও না। কলকেতায় সেসন আরম্ভ হয়ে গেছে, এখন আর ভর্ত্তি হবার সময় নেই, এখানে কিন্তু এখনও সময় যায় নি, এই সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে সেণ্ট ষ্টীফেন্স কলেজে আজই ভর্ত্তি করে দাও। আর বলে দাও, তুমিই ওর বাবাকে সব লিখবে; সে যেন এখন কিছু না লেখে।"

"হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, এটা উত্তম পরামর্শ—আপনি না হলে—"

"বুড়োর কথাটা শুনে চলো। তবে কথাটা উপস্থিত দু'দিন গোপন রেখো।"

"আজ্ঞে তা আর আমায় বলছেন কি!"

"জানি, তবে আমায় বলবার মানে হচ্ছে, মেয়েরা কোন কথা গোপন রাখতে পারে না, এই আর কি!"

রায় মহাশয় রেবতী বাবুকে সাবধান করিয়া দিলেন বটে কিন্তু নিজেই রায় গিন্নীকে কথাটা না বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। রায় মহাশয়ের বাড়ী একটা কৌন্সিল হাউস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অম্বুজাক্ষ বাবুর স্ত্রীই তাহার সভাপতি। সুতরাং গোপনে-গোপনে কথাটা শুনিতে বোধ হয়, দিল্লীর বাঙ্গালীদের কাহারও বাকী রহিল না। রেবতীবাবুর সহিত পুরাতন কলহের কথা অম্বুজাক্ষ বাবুর মনে পড়িয়া গেল; তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তিনি তিনি তাঁহার পারিষদবর্গকে ডাকাইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। যে যেমন লোক তাহার পারিষদও তেমনি জুটিয়া থাকে। বাবুর যেমনি ইচ্ছা প্রকাশ করা, পারিষদবর্গও সেই দণ্ডে উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল। শুনিয়া অম্বুজাক্ষ বাবু তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, কিন্তু মন্ত্রণা প্রকাশ না হয় এজন্য সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কাজেও তাহাই ঘটিল।

৪

আজ কয় দিন ধরিয়া অফিসে একটা গুজ-গুজ ফুষ-ফুষ চলিতেছে। অমন যুদ্ধের খবর ছাড়িয়া লোকে আজ কি একটা প্রব-চর্চ্চায় ব্যস্ত। কেহ বলিতেছে, "ও সব মিথ্যে। দিল্লীর লোকগুলোই ঐ রকম।" কেহ

বলিতেছে, "এর মধ্যে মিথ্যে কি আছে? অবিশ্বাসের কারণটা কি?" দুইদলে মহাতর্ক উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, "দেখছ না, আজ নিরঞ্জন অফিসে আসে নি," কেহ বলিল, "দেখছ না, অমুক, ছুটোর সময় বাড়ী যাবার দরখাস্ত করেছে।" যখন তর্ক করিয়া কোন স্থির মীমাংসা হইল না, তখন দুই-এক জন সাহসে ভর করিয়া স্বয়ং রেবতীবাবুকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই, কি একটা গুজব শুন্‌তে পাচ্ছি,—এটা কি সত্যি?"

রেবতীবাবু গরম হইয়া বলিলেন, "কিসের গুজব?"

"এই আপনার মেয়ের নাকি বে?"

কে বল্লে?"

"সকলেই বলছে।"

"সকলে? সকলটা কে? একটা নাম কি নেই?"

"এই যে নিরঞ্জন আজ—"

"নিরঞ্জন বলেছে—that stupid fellow! সে জানলে কি করে?" টেবিল চাপড়াইয়া খাতা-পত্র ফেলিয়া রেবতীবাবু একটা মহা গণ্ডগোল পাকাইয়া তুলিলেন। Section-শুদ্ধ লোক সেখানে সমবেত হইল। যাহারা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল, ব্যাপার দেখিয়া তাহারা অম্বুজাক্ষ বাবুকে সংবাদ জানাইল। সেখানে একটা বিকট হাসির রোল উঠিল!

প্রকৃতিস্থ হইয়া রেবতীবাবু নিরঞ্জনকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। ফরাস আসিয়া সংবাদ দিল, নিরঞ্জন দুইটার সময় বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। রেবতীবাবুর আর কোন কথা বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "What a devil he must be!"

বাড়ী ফিরিয়া রেবতীবাবু বড়ই ভাবিত হইয়া পড়িলেন। তিনি চুপি চুপি প্রায় সকল আয়োজনই সারিয়া ফেলিয়াছেন। কাল গায়ে হলুদ! আজ অফিসে অতটা রাগ করা ভাল হয় নাই, তিনি ভাবিলেন, নিরঞ্জনের হাতে ধরিয়া এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে। নিরঞ্জনকে তিনি ডাকাইতে পাঠাইলেন। ছেলে আসিয়া খবর দিল, তিনি আসিতে পারিবেন না।

"আরে তুই কেন গেছ্‌লি, বিধুকে পাঠিয়ে দিলিনে কেন?"

"বিধুদা যে এখনও কলেজ থেকে আসেনি।"

"সে কি রে?" স্ত্রী ভগ্নী সকলকেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই ঐ এক জবাব দিল, সে এখনও আসে নাই।

রেবতীবাবু দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এতক্ষণ অফিস থেকে এসেছি, এ কথা কেউ তো এতক্ষণ বলিস্‌নি?" জল পর্য্যন্ত না খাইয়া ছড়িটি হাতে করিয়া তখনই তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

৫

তখন প্রায় সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। রায় মহাশয় ডিস্‌পেন্‌সারীতে নাই, সাড়ে সাতটায় ফিরিবেন। রেবতীবাবু কোথায় যাইবেন, কি করিবেন বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। টেবিল হইতে খবরের কাগজটি লইয়া দুই-একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আবার তাহা রাখিয়া দিলেন। একজন হিন্দুস্থানী তাঁহাকে

খবরের কাগজ পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুজি, লড়াইকা কেয়া হাল?"

"চল্ রহা হ্যায়"মাত্র বলিয়া তিনি Lancet নামক ডাক্তারি কাগজখানা টেবিল হইতে উঠাইয়া diabetes mellitusএর পথ্যাপথ্য বিচারটা একটু পড়িবার চেষ্টা করিলেন। পার্শ্বস্থ হিন্দুস্থানীটি আবার বলিল, "বাবু সাব, ধোতি জোড়াভি ছ'রুপেয়া হো গিয়া", "হাঁ এসাই হোগা" বলিয়া তিনি বন্ধুর ল্যাবরেটরির ক্যাটালগ দেখিতে আরম্ভ করিলেন; তাহাও ভাল লাগিল না, উঠিয়া পদচারণ করিতে করিতে আলমারির মধ্যস্থ ঔষধের শিশিগুলির গায়ের লেবেল ও বিজ্ঞাপন পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মনে যে কি ব্যথা, তাহা তিনিই জানেন, অন্যে কি বুঝিবে? যাহা হউক সাড়ে সাতটার সময় ডাক্তার বাবু আসিলেন, রোগীদের ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া রেবতীবাবুর সহিত কথাবার্ত্তায় মন দিলেন।

"অ্যাঁ, বলেন কি? আমি কিন্তু ঐ রকমই সন্দেহ করেছি।"

"এখন উপায় কি, বলুন।"

"নিরঞ্জনটা বড়ই ছোটলোক ত! কেন, তার এতে কি ক্ষতি হচ্ছিল?"

"সে যাই হোক, এখন উপায় কি?"

"কথা হচ্ছে, তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে বলে তো আমার মনে হয়।" একটু ভাবিয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন, "আচ্ছা, নিরঞ্জন কোথায়, খোঁজ করুন। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, দেখি, কি করে সে এখান থেকে যায়। তখনই বলেছিলুম, মেয়েদের কাছে কোন কথা বলতে নেই। নিশ্চয়ই মেয়ে-ব্যাপারে কথাটা বেরিয়ে পড়েছে।"

"কি করব বলুন, এরা তো সব দিব্বি করে বল্লে কারও কাছে কিছু বলেনি।"

"যাই হোক, দেরী করবেন না, যা বল্লুম, এখনই ত করুন।"

রেবতীবাবু ডাক্তার বাবুর কথামত বাড়ীতে প্রত্যাগত হইলেন। নিরঞ্জনের বাসা তাঁহার বাসার কাছেই, সুতরাং ভাবিলেন, একবার সেখানটা হইয়া যাইবেন; কিন্তু মোড় হইতে তিনি শুনিলেন, কে যেন তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে, "রেবতীবাবু, ও রেবতীবাবু—"

তিনি উত্তর করিলেন, "কে হে?"

নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "একটি ভদ্রলোক আপনাকে খুঁজছেন।" মিউনিসিপালিটির তেলের টিমটিমে আলোয় রেবতীবাবু ভদ্রলোকটিকে চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভদ্রলোকটি রেবতীবাবুর অবস্থা বুঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি হে, নীলরতন, চিনতে পারলে না?" এল, এম, এস কলেজের ব্রক্‌ওয়ে সাহেব রেবতীবাবুকে নীলরতন বলিয়া ডাকিতেন।

"এ্যাঁ, এ কি—বিশ্বনাথ—? টেঁপি, ও খ্যাঁদা, ওরে ও মোনা, একটা আলো নিয়ে আয়—তোরা কি আর বৈঠকখানার দোর খুলবিনে?" পুত্রের খবর লইবার জন্য বিশ্বনাথ বাবুর প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল, তার উপর রেবতীবাবুর কথার ভাব দেখিয়া তাঁহার বড়ই আশঙ্কা হইল। তিনি বসিবার পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, আগে খবর কি, বল দেখি?"

রেবতীবাবু নিরঞ্জনের দিকে চাহিলেন।

তাহার উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। সে তো নিশ্চয়ই বিবাহের কথা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে, এই ভাবিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দেখলে কালি, লোকের আক্কেল! ভদ্রলোকের এই না খাওয়া, না দাওয়া, কোন্ দেশের কুড় রাজ্যের কুড় থেকে আসছেন, এখনি খবরটা দেবার—"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে একখানি গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল; কালীবাবু প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্রলোকেরা জানলা হইতে উঁকি মারিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ডাক্তার বাবু এসেছেন।"

"আসুন, আসুন, রায়-মশায়—"

"আসচি তো—এত লোকজন কেন? সব—"

বিশ্বনাথবাবুকে দেখাইয়া রেবতীবাবু বলিলেন, "বাপও এসে পড়েছেন, তবে দু দিন—"

বিশ্বনাথ বাবুর বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "রেবতী, তুমি কি বলছ,—তবে কি বিধু নেই?" কেহ জবাব দিল না; সকলেই বিশ্বনাথের দিকে তাকাইল। তিনি আরও অধীর হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "কি রেবতী, চুপ করে—"

"ওহে নিরঞ্জন, বলেই ফেল না, আর চাঁপা কেন? তোমায় ইষ্ট-সিদ্ধি তো হলই।"

"কি বলবো ডাক্তার বাবু?"

"ডাক্তার বাবুই বলুন। চার-চারটে উপযুক্ত ছেলে গেছে, তাতেও যদি এ পোড়া জীবন রাখতে পেরে থাকি, তাহলে এ খবরটা শুনেও তা রাখতে পারবো! রেবতী, যখনই তোমার তার পেয়েছি, তখনই আমি তাই বুঝেছি—মাগী বোঝে না, কাজেই—"

"আমার তার? সে কি?"

বিশ্বনাথ বাবু চোখ মুছিতে মুছিতে পকেট হইতে তারটি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই যে—"

ডাক্তার বাবু রেবতীবাবু প্রভৃতি সকলেই তার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। রেবতীবাবু তার করিয়াছেন, "বিধুর টাইফয়েড, আশা কম। বিশ্বনাথ শীঘ্র আসিবে।" নিরঞ্জন তারটি দেখিতে চাহিলে ডাক্তার বাবু তাহাকে অযথা কতকগুলি কুকথা শুনাইয়া দিলেন। তাহার যে কি দোষ, নিরঞ্জন তাহা বুঝিল না।

"আপনারা কি বলচেন মশাই—আজ সকালে যে তাকে আমি কলেজ যেতে দেখেছি। আর আমি তাকে লুকিয়ে রাখবো কেন?"

"তোমরাই জান, জব্দ করবে; মজা দেখবে অপদস্থ করবে।"

"দেখুন রেবতীবাবু, আমি গরীব বটে, কিন্তু ইতর নই। ভগবান জানেন—"

বাহির হইতে বিধু ডাকিল, "খাঁদু—"

"ঐ যে বিধু" বলিয়া সকলে একটা হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এই যে বিধু, কোথায় ছিলে হে এতক্ষণ? তোমার বাবা এসেছেন।"

"আজ্ঞে, কলেজে আজ ড্রামা ছিল, সেই জন্তে—" বলিতে বলিতে বিধু আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল। পিতা-পুত্রে উভয়েই কাঁদিয়া

ফেলিলেন; কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কয়েক মিনিট পরে বিশ্বনাথ বাবু চোখে জল মুখে হাসি লইয়া বলিলেন, "নীলু, ব্যাপারটা কি হে? তোমাদের যেন কি একটা হয়েছে! এ টেলিগ্রামটা কে দিয়েচে, কেন দিয়েছে বল দিকি?"

"বিশুদা, আর কোন কথা গোপন করবো না—কথাটা কি জান, আমি তোমার ছেলেটিকে ফাঁকি দিয়ে নেবার মতলব করেছিলাম, তাই পাঁচজনে পরামর্শ করে আমায় জব্দ করবার চেষ্টা করেছে।" এই বলিয়া রেবতীবাবু বিধুর আসা হইতে সমস্ত ঘটনাই খুলিয়া বলিলেন।

"বটে, তাঁরা তো বেশই করেছেন, বন্ধুর কাজই করেছেন। তুমি যেমন জোচ্চোর, তেমনি হয়েছে। কালই আমি মা-লক্ষ্মীকে দেখে যাব, আর গিন্নী যে ফর্দ্দ দিয়েছেন, তাও দেখাব, তার একটি কাণা কড়িও ছাড়বো না। নিরঞ্জন তো কৈ এ সব কথা আমায় বলে নি!"

সকলেই নিরঞ্জনের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সে যে কখন্ সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, কেহ তাহা জানিতেও পারে নাই।

তারাকালী বাবু বলিয়া উঠিলেন, "সে জান্‌লে তো—"

"নিরঞ্জন জান্‌তো না? কি বলচেন কালীবাবু?"

"নিরঞ্জন এর কিছ জানে না। আর সে কি ঐ প্রকৃতির লোক! সে জানতে পারলে কি আর এতটা হত! এর ভেতর লোক আছে হে, মাথা আছে, বুঝলে?

"হ্যাঁ কালীবাবু, এখন আমি বুঝতে পারচি। অথু সে দিন—"

"থাক্, থাক্, সে কথা আর কেন? তবে—"রেবতী, তোমার বুঝতে বড় দেরী লাগে। এখনও বুঝতে পারচ না মিথ্যে সন্দেহ করে একজনের কি সর্ব্বনাশ করলে! ছেলেটার এই ভীষণ অসুখ নিয়ে সে পাগল হয়ে আছে—বেচারাকে জব্দ করবে বলে তোমরা এমন চক্রান্ত করেছ যে একটা অভাগা শিশু—তার অসুখে এই বিজ্ঞ বিচক্ষণ ডাক্তারবাবুও তাকে দেখতে যাবার সুযোগ পান্‌নি, নিরঞ্জনকে হাঁকিয়ে দিয়েছেন—আর নিরঞ্জন—"

কথাটা শেষ হইল না, অদূরে কান্নার রোল উঠিল।

বাহির হইতে নিরঞ্জন ভাঙ্গা গলায় বলিল, "ডাক্তারবাবু, ছেলেটা কেমন করছে, এত কাছে রয়েছেন, একবার যদি—"

বিশ্বনাথ কহিলেন, "এ্যাঁ তার ছেলের এমন ব্যামো—আর নিরঞ্জন্ আমায় নিয়ে দিব্যি এখানে এল! একবার খবরটা অবধি—ডাক্তারবাবু—"

"চল, চল" বলিতে বলিতে ডাক্তারবাবু ও অন্যান্য সকলে নিরঞ্জনের বাড়ীর দিকে ছুটিলেন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন

স্বপ্নকে অনেকেই অর্থহীন অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করেন। সাধারণতঃ আমাদের ধারণা যে, একবিষয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলে নিদ্রাকালে স্বপ্নে তাহাই নানা অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নানা রূপে দেখা দেয়। তাই কাব্যে উপন্যাসে বিরহী-বিরহিণীর প্রেমাস্পদকে স্বপ্নে দেখা একটা অতি-সাধারণ বিষয়। ভীতি ও আতঙ্ক হইতেও স্বপ্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে দেখিতে পাই; গভীর রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিবার কথাও শুনি। কিন্তু বাস্তবের সহিত স্বপ্নের সম্পর্ক খুব অল্প বলিয়াই আমাদের ধারণা।

এমনও অনেক সময় হয় যে অভাবনীয় অচিন্তনীয় বিষয়ও স্বপ্নে দেখা গিয়াছে; নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাইয়া চলিয়াছি, বিশেষ ভাবনা-চিন্তা নাই, অথচ এমন একটা বিষয় স্বপ্নে দেখিয়া ফেলিব যাহা হয়ত কোন-কালে কল্পনাতেও কখনো স্থান পায় নাই! আবার সময় সময় স্বপ্নে ভবিষ্যতের এমন-সব বিষয় অনুভূত হয়, যাহা অর্থহীন ত' নহেই—পক্ষান্তরে গভীর অর্থপূর্ণ।

স্বপ্ন অর্থপূর্ণ বলিয়াই আগেকার কালের লোকের ধারণা ছিল। বহুদর্শী ব্যক্তিরা স্বপ্নের অর্থ নির্ণয় করিতেন। দেশী-বিদেশী ভাষায় স্বপ্ন-ফল-সম্বন্ধীয় পুঁথির অভাব নাই। তবে স্বপ্নে যাহা দেখা যায় ফলে তাহার বিপরীত ঘটে, এমনি কথাই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। ছেলেবেলায় ঠাকুর্দা ঠাকুরমার কাছে স্বপ্নের কাহিনী বলিলে শুনিয়া তাঁহারা হয় বলিতেন, 'ভাল',—নয় কিছুই বলিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতাম যে নিশ্চয় তাঁহারা স্বপ্নের অর্থটা বেশ ধারণা করিয়া লইয়াছেন। স্বপ্নে আগুন দেখিলে কি ফল-লাভের সম্ভাবনা এবং সাপ দেখিলেই বা কি হয় ইত্যাদি নানা স্বপ্ন-বিচার বটতলার পুঁথিতে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই। আবার প্রথম রাত্রের স্বপ্নের একরূপ ফল, শেষরাত্রের স্বপ্নের ফল অন্যরূপ। কিন্তু এ-সমস্ত স্বপ্ন-ফল-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত যে সত্য নয়, তাহাও আমরা বুঝি; সেইজন্যই এ-সম্বন্ধে বিশেষ মাথা ঘামাইতে চাহি না। কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত হইলেও বৈজ্ঞানিকেরা নিশ্চেষ্ট বা হতাশ হইয়া স্বপ্নের কারণ ও অর্থ-নির্ণয়ের চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই।

স্বপ্ন-বিষয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত বার্গসঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ায় বৈজ্ঞানিক জগতে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। যে স্বপ্নকে অমূলক বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া এতকাল সকল বিজ্ঞ ব্যক্তিই দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্ন-সম্বন্ধে বার্গসঁর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় সেদিকে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। সিদ্ধান্ত এই—জীবনের প্রত্যেক ঘটনার স্মৃতি আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত থাকে, কিছুই একেবারে বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া যায় না। ইহারা সজীব থাকে এবং

সুযোগ পাইলেই আমাদের জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা পায়, এমন-কি চেতন এবং অচেতন উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থার স্মৃতিও স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বার্গসঁর কথায় বলিতে গেলে, আমাদের অতীতের স্মৃতি কয়লায় সঞ্চিত বাষ্পের মত চাপ-দ্বারা পুঞ্জীভূত থাকে, স্বপ্নের পথে তাহারা ছাড়ান্ পায়।

বার্গসঁর সিদ্ধান্ত যে কবিকল্পনা নয়, তাহা ভায়েনার প্রোফেসার Freud প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইঁহারা হিষ্টিরিয়া রোগীর হৃদয়ের গোপন কথা ও লুকানো ভাব, যাহা অজ্ঞাতসারে রোগীর মনের উপর ক্রিয়া করিয়া রোগের সৃষ্টি করে, তাহা কৌশলে ব্যক্ত করাইয়া এই রোগ আরাম করিয়া থাকেন। স্বপ্ন কিম্বা এই প্রকার অর্দ্ধ-অতর্কিত অবস্থায় এই সমস্ত পীড়া দ্বারা দুর্ভাবনার কথা অলক্ষ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়ে।* Freud প্রভৃতির মতে স্বপ্ন একেবারে নিরর্থক নয়—তবে যে অর্থ স্পষ্টভাবে সে প্রকাশ করে, তাহাই তাহার আসল চেহারা নয়। ইহা সাঙ্কেতিক, তাই ইঙ্গিতে ইহার অর্থ বুঝিতে হয়। মনুষ্য-হৃদয়ের এমন-সব আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ভয়-ভাবনা স্বপ্নে ব্যক্ত হয় যাহা জাগরণে আমরা স্বীকার করিতে রাজি নহি। কারণ ইহাদের কল্পনা ক্লেশকর এবং ইহারা আমাদের বৈধ প্রকৃতির ঘোর বিরোধী। জ্ঞান-রাজ্যের দরজায় এক পাহার-ওয়ালা খাড়া আছে, সে দেখে, যাহাতে অপ্রীতিকর স্মৃতিগুলি জ্ঞানের সীমানায় ঘেঁসিতে না পায়; কিন্তু কখনো কখনো অলক্ষ্যে রূপান্তর ধারণ করিয়া গুপ্তবেশে ইহারা প্রহরা এড়াইয়া জ্ঞানরাজ্যে ঢুকিয়া পড়ে। ইহাই স্বপ্ন; এই সিদ্ধান্তের ফলে বাস্তবের অপেক্ষা কল্পনার দৌড়ই বেশী বলিয়া মনে হয়। অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি-ভাণ্ডারে কেবল অন্যায় অপ্রীতিকর ঘৃণ্য ভাব ও ভাবনাই জমা থাকিবে, এ কথা মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়।

বার্গসঁর সিদ্ধান্ত কিন্তু অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত ও প্রীতিকর। তিনি বলেন যে, আমাদের ভাল-মন্দ প্রিয়-অপ্রিয় সমস্ত স্মৃতিই এক জায়গায় সঞ্চিত থাকে। আমরা নিম্নে তাঁহার স্বপ্ন-বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। তিনি লিখিতেছেন—যে বিষয়ের আলোচনা করিতে চলিয়াছি, তাহা যে খুবই জটিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে যেমন সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের কথা আছে তেমনি বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের কথাও আছে; কাজেই ইহার আলোচনা করিতে গেলে বিবিধ

---

* এই প্রণালীর চিকিৎসা-কালে চতুর উকিল যেমন নানা ফন্দিতে সাক্ষীকে জেরা করে, রোগীকেও সেইরূপ নানা প্রশ্ন করা হয়। তবে এক একটী সম্পূর্ণ কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া শুধু রোগীর নিকট এক-একটী শব্দ উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। উকিলের জেরার উত্তরে যেমন সাক্ষী অলক্ষ্যে আপনার অজ্ঞাতসারে এমন-সব কথা বলিয়া ফেলে যাহা জ্ঞাতসারে সে বলিত না, তেমনি এই শব্দগুলির সাহায্যে রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার মনের ভাব-ভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি গোপন কথা বাহির হইয়া পড়ে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিচিত্র সমস্যার সমাধান করার প্রয়োজন। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে এবং সম্যকরূপে ইহার আলোচনা করিতে গেলে আমাদের স্থান-সঙ্কুলান হইবে না। পাঠকবর্গের নিকট এই ত্রুটি নিবেদন করিয়া গ্রন্থের সূচনাতেই স্বতঃসিদ্ধ ও সাধারণ বিষয়গুলি বাদ দিয়া, একেবারে আলোচ্য বিষয়টীর অবতারণা করিব।

স্বপ্ন জিনিসটা এই,—স্বপ্নে আমি নানা বিষয় উপলব্ধি করি; সে সমস্তই অপ্রকৃত—তাহাদের অস্তিত্ব নাই। স্বপ্নে আমি মানুষ দেখিতে পাই, তাহার সঙ্গে যেন কথাবার্ত্তা কহি, সে যাহা বলে তাহাও শুনিতে পাই—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বপ্নে কোন লোকের কোনই অস্তিত্ব নাই এবং বাস্তবিক আমি কোন কথা বলি না, বা তাহার কথা শুনিতেও পাই না। স্বপ্নে দেখি সত্যসত্যই বাস্তব মানুষ এবং বাস্তব জিনিস বর্ত্তমান; চকিতে নিদ্রাভঙ্গে কিন্তু সে সব অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?

এখন প্রথমেই জিজ্ঞাস্য এই, সত্যই কি কিছুই ছিল না? অর্থাৎ আমাদের জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় নিদ্রিত অবস্থাতেও এমন কতকগুলি বাস্তব জিনিস কি বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, যাহা আমাদের চক্ষু, কর্ণ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য?

চোখ বুজিয়া আমাদের দৃষ্টিমণ্ডলে কি ঘটিতেছে তাহা মনোযোগের সহিত উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করুন। কিছু উপলব্ধি করিতে পারিলেন কি?—অনেকেই বলিবেন—না, কিছুই দেখা গেল না। এরূপ উত্তরে বিস্মিত হইব না। কেননা চোখ বুজিয়াও যদি কিছু দেখিবার থাকে, তবে তাহা একটু অত্যন্ত চোখ-ছাড়া অপরের নিকট ধরা পড়ে না। কিন্তু যদি প্রয়োজনানুরূপ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে চোখ বুজিয়াও অনেক জিনিস দেখিতে পাওয়া যাইবে। প্রথমে একটা কালো ফুটকি, এই কালো ফুটকিতে কতকগুলি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু ধীরে বা ত্রস্তে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং চকিতে অদৃশ্য হইয়া যায়, আবার উপরে ও নীচে উঠা-নামা করিতেও থাকে। কখনো কখনো নানাবর্ণের নানা আকারের বিন্দু দেখা যায়, ইহারা কাহারো চোখে অস্পষ্ট আবছায়ার মত দেখায়, আবার কাহারো চোখে এমনই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে বাস্তবের সহিতও তাহাদের তুলনা হয় না! এই বিন্দুগুলি কখনো-বা প্রসারিত হইতেছে, কখনো-বা সঙ্কুচিত হইতেছে—বর্ণ ও আকৃতির মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে; কখনো-বা সে পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে বিলম্বে সংঘটিত হইতেছে। এই-সব দৃষ্টি-বৈচিত্র্য কোথা হইতে আসে? এই বর্ণ-রহস্য লইয়া প্রাণিতত্ত্ববিদ্ এবং মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং উহার নানা নাম দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, চোখের পাতা বুজিলে তাহার চাপে শোণিত-প্রবাহের দ্বারা অক্ষি-স্নায়ুমণ্ডলীর যে ঈষৎ পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাতেই এই বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। কারণ যাহাই হউক এবং এই বর্ণ-বৈচিত্র্যকে যে নামেই আমরা অভিহিত করি না কেন, তাহাতে আমাদের কিছুই আসিয়া যাইবে না। এরূপ ব্যাপার যে স্ফুট

এবং উপরি-উক্ত বর্ণ-বিন্দুগুলিই যে আমাদের স্বপ্নের উপাদান, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে M. Alfred Maury এবং সেই একই সময়ে St. Denisএর M.d'Hervey বলিয়া গিয়াছেন যে, যে-মুহূর্ত্তে আমরা নিদ্রিত হইয়া পড়ি সেই মুহূর্ত্তেই নানা আকারে পরিবর্ত্তনোন্মুখ এই বর্ণ-বিন্দুগুলি কেন্দ্রীভূত ও একত্রিত হইয়া আমাদের স্বপ্নের বিষয়ানুসারে মনুষ্য ও পদার্থ-নিচয়ের বিশেষ বিশেষ আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। এই সিদ্ধান্তটিকে একটু সতর্কতার সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। আরো আধুনিক কালের একজন ইয়াঙ্কি পণ্ডিত—প্রফেসর Ladd একটী অপেক্ষাকৃত যুক্তিপূর্ণ কিন্তু জটিল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, নিদ্রাভঙ্গে যে স্বপ্নের দৃশ্য ধীরে ধীরে কাল্পনিক দৃষ্টি হইতে মুছিয়া যাইতে থাকে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কল্পনায় তাহা পুনঃ-চিত্রিত করিবার অভ্যাস করিলে দেখা যাইবে যে, স্বপ্নের বিষয়ীভূত মূর্ত্তি ও পদার্থ-সমূহ ধীরে ধীরে গলিয়া আবার পূর্ব্বোল্লিখিত কতকগুলি বর্ণবিন্দুতে পরিণত হয়। কেহ যদি স্বপ্নে দেখে যে সে সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছে, জাগিবামাত্র সে সংবাদ-পত্রখানা মিলাইয়া যায় বটে, কিন্তু কালো কালো দাগে-ভরা একটী শাদা বিন্দু তখনো থাকিয়া যায়; আবার স্বপ্নের দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র জাগরণে মিলাইয়া গিয়া কতকগুলি উজ্জ্বল চিহ্ন-সমন্বিত একটি বৃহৎ বিন্দুতে পরিণত হয়। এই সকল বর্ণ-বিন্দুই স্বপ্নে ঐ সংবাদপত্র বা সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছিল।

দৃষ্টির উপর আভ্যন্তরীণ এই বর্ণ-বিন্দুর লুকোচুরি ছাড়া বাহিরের নানা বস্তুরও প্রভাব রহিয়াছে। চোখ বুজিলেও মানুষের দৃষ্টিতে আলো ও অন্ধকারের তারতম্য ঘুচিয়া যায় না। এমন-কি, বিভিন্ন বর্ণের আলোকের পার্থক্যও কিছু-কিছু ধরিতে পারা যায়। দৃষ্টির উপর বাহিরের আলোকের এই প্রভাবও আমাদের স্বপ্নের এক প্রধান উপাদান। ঘরে হঠাৎ একটি মোমের বাতি জ্বালিয়া দিলে, ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম খুব গভীর না-হইলে ইহা তাহার নিকট স্বপ্নে আগুন-লাগার চেহারা ধারণ করে। এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য M. Tissier, দুইটী পর্য্যবেক্ষণের কথা বলিব।

B—Leon স্বপ্নে দেখিলেন, আলেক্‌জান্দ্রা থিয়েটারে আগুন লাগিয়াছে; সমস্ত স্থান অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; তারপর হঠাৎ তিনি একটী বাগানের ঝরণার নিকট নীত হইলেন; সেখানকার চারিদিক্‌কার থামগুলির গায়ে-গায়ে যে শিকল বাঁধা ছিল—সেগুলিতেও রেখাকারে আগুন জ্বলিতেছে; তারপর তিনি যেন গ্যালারিতে গিয়াছেন; উহাও জ্বলন্ত; তিনি অগ্নি-নির্ব্বাণ-কার্য্যে নানা দুঃসাহসিক কার্য্যে যোগদান করিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চোখ চাহিয়া দেখিলেন, একজন শুশ্রূষাকারিণীর চোরা-লণ্ঠনের আলোকরশ্মি তাঁহার বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে।

M. Bernard স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব কর্ম্ম-ক্ষেত্রে (marine infantry) নৌ-পদাতিকভুক্ত আছেন; তিনি Fort-de-

France, Toulon, Loriet, Crimea, Constantinople প্রভৃতি স্থানে গিয়াছেন; তিনি বিদ্যুৎ চম্‌কাইতে দেখিলেন; বজ্র-নির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন, তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন, কামানসকল অগ্নি উদ্‌গীরণ করিতে লাগিল, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। B—র মত তাঁহার বেলাও শুশ্রূষাকারিণীর লণ্ঠনের আলোক রশ্মিপাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়।

হঠাৎ কোন আলোকরশ্মি চোখে পড়িলে নিদ্রিত ব্যক্তি তদনুরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্ররশ্মির ন্যায় স্থায়ী মৃদু আলোকের প্রভাব ভিন্নপ্রকার।

A. Krauss একদিন নিদ্রাভঙ্গে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে একটী সুন্দরী যুবতীর দিকে বাহু প্রসারিত করিতেছিলেন, ক্রমে এই যুবতী-মূর্ত্তি গলিয়া জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রে রূপান্তরিত হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন সত্যসত্যই আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে। চন্দ্ররশ্মি সচরাচর নিদ্রিত ব্যক্তির চোখের উপর আপনার মোহজাল বিস্তার করিয়া স্বপ্নে তাহার নিকট যুবতীর মোহিনী মূর্ত্তি উপস্থিত করে। এ-বিষয়ে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। পৌরাণিক গল্পের নিদ্রাবিলাসী মেষপালক Endymion ও চন্দ্রদেবী Seleneএর প্রণয়-কাহিনীর সহিত উপরি-উক্ত ব্যাপারের সম্বন্ধ রহিয়াছে—এ-কথা কি আমরা কল্পনা করিতে পারি না?

এতক্ষণ দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুভূতির কথাই কহিয়াছি। ইহাই স্বপ্নের প্রধান উপাদান। তবে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুভূতিও স্বপ্নের ক্রিয়া করে। প্রথমতঃ চক্ষুর ন্যায় কর্ণেরও আভ্যন্তরীণ অনুভূতি আছে। এমন নানারূপ শব্দ কাণের ভিতরে সর্ব্বদাই ভন্ ভন্, টিক্ টিক্ করিতেছে, যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভব করা কঠিন, কিন্তু নিদ্রাকালে সহজ-শ্রাব্য। ইহা ভিন্ন ঘুমন্ত অবস্থাতেও বাহিরের জিনিসপত্র ভাঙ্গিবার শব্দ, ইঁদুরের হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ির শব্দ, জানালার গায়ে বৃষ্টি পড়িবার শব্দ, বাতাসের হুহু শব্দ, প্রভৃতি আমাদের কাণে প্রবেশ করে এবং স্বপ্ন ইহাদিগকে অবস্থানুযায়ী কথাবার্ত্তা, হাসি-কান্না, গান-বাজনা প্রভৃতিতে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করিয়া লয়। Alfred Mauryর নিদ্রাকালে রান্নাঘরের চিম্‌টার (tongs) শব্দ তাঁহার কাণে ঢুকিল, আর অমনি তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন ঘণ্টা ধ্বনিত হইয়া বিপদ-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে এবং ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দের জুনমাসের ঐতিহাসিক ঘটনায় তিনি যোগদান করিয়াছেন! এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতার ও পর্য্যবেক্ষণ-বৃত্তান্তের অভাব নাই। তাই আর অধিক আলোচনা না করিয়াই বলিতেছি যে, বর্ণ-বৈচিত্র্য শব্দ অপেক্ষা আমাদের স্বপ্নের উপর বেশী ক্রিয়া করে। আমাদের স্বপ্ন বিশেষভাবে দৃশ্য বস্তু। চোখ বুজিয়া থাকিলেও আমরা স্বপ্ন দেখি। Maximilianএর ন্যায় ব্যাপার অনেকের বেলাই ঘটিয়াছে, যে, স্বপ্নে কাহারো-না-কাহারো সহিত কথা কহিতেছেন, অনেক-ক্ষণ ধরিয়া আলাপ করিয়াছেন, তারপর হঠাৎ নিদ্রিত ব্যক্তি লক্ষ্য করিলেন, যে তিনি কোন কথা কহিতেছেন না, কোন শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন না—কেবল স্বপ্নদৃষ্ট

ব্যক্তির সঙ্গে নীরবে ভাব-বিনিময় হইতেছে, স্পষ্টভাবে পরস্পরের ব্যক্তব্য প্রকাশ করা হইতেছে—অথচ একটী শব্দও কেহ প্রকৃত-পক্ষে শুনিতে পান নাই!

এ রহস্য সহজেই ধরিয়া ফেলা যায়। স্বপ্নে কোন-কিছু শুনিতে হইলে যেরূপই হউক একটা শব্দ কাণে প্রবেশ করা চাই;—সুতরাং স্বপ্নকালে যদি কোনরূপ শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট না হয় তবেই স্বপ্নে কথাবার্ত্তার শুধু মূক অভিনয় হইতে থাকে।

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী।

কুঁড়ি

কেন জড়সড়? কিসের এ লাজ!
আমায় বল্।
দেখিয়া ফেলেছি?—তাই এ সরম!
হা দুর্ব্বল!

শাখার গোপন অন্তর হ'তে
কাহার প্রেমে
বাহিরিয়া, শেষে আলোকে সহসা
গেলি রে থেমে?

মিছে ঢাকাঢাকি!—হাসিটুকু যেগো
অধরে কাঁপে!
তবে কেন তারে রুধিছ কোমল
নিঠুর চাপে?

চাহিবনা?—ভালো, বিঁধিবনা আর
নয়নবাণে!
ত্বরা করে নাও মুকুল ফুটাও
আকাশ পানে!

ওকি! ওকি! ক্ষীণ বোঁটাটির পরে
দুলিছ কেন?
রুদ্ধ-হাসির তাড়নায় কি গো
বিলাস-হেন!

হাল্কা হাওয়া কি চুমে গেল ধীরে?
জাগিল দিল্!
পারিলি না আর?—হাসির কোঠার
খুলিল খিল্!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

শরৎকুমার

শরতের ঘরখানি একতলায়, ঠিক বাগানের ধারেই, ঘরের পাশেই ছোট্ট একটু বারান্দা। রাত্রিকালে পড়িতে পড়িতে অবসন্ন বোধ করিলে, শরীরমনে বল সঞ্চয়ার্থে কত সময় সে এই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইত। বাগানের ফুলের গন্ধে তখন কাহার হাসি মনে পড়িয়া যাইত? তারকার জ্যোতিতে কাহার নয়নের দৃষ্টি

তাহার দৃষ্টির উপর ভাসিয়া উঠিত। আকাশ-পৃথ্বী-মথিত এই আশানন্দ সংগ্রহ করিয়া লইয়া সে যখন পুনরায় পাঠে মনোনিবেশ করিত তখন আর কোন পরিশ্রমকেই তাহার পরিশ্রম বলিয়া মনে হইত না। তিলে তিলে সঞ্চিত বহু দিনের সেই জীবন-ব্যাপী আশা আজ একটি মুহূর্ত্তে এমন করিয়া দগ্ধীভূত ভস্মে পরিণত করিলে তুমি?—হা ভগবান!

হাসির নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আজিও সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তরুলতায়, আকাশে বাতাসে চন্দ্রালোকের কি পুলক-কম্পন বহিয়াছিল! কিন্তু শরতের হৃদয়ে?—ইহার এক কণাও প্রবেশ করিল না। পুরাতন আনন্দ-দুঃখের দিকে চাহিয়া সে একান্ত নিরানন্দ মনে, আকুল হৃদয়ে কেবলি ভাবিতে লাগিল—"উঃ, আজই যদি আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারিতাম!"

পরদিনই সে আপনাকে বিলাত-যাত্রার আয়োজনে ব্যাপৃত করিয়া তুলিল। শরৎ আজন্ম-কাল হইতে মাতুল শ্যামাচরণের আশ্রয়েই প্রতিপালিত। তিনিই তাহাকে বিলাত পাঠাইতেছিলেন। সকালেই মামার নিকট হইতে শরৎ খরচপত্র লইয়া নয়টা না বাজিতে বাজিতে কোনরূপে আহারাদি শেষ করিয়া একখানা ঠিকা গাড়ীর দোলায় নিউ-মার্কেটের দিকে ছুটিল।—গেটের কাছে নামিয়াই সম্মুখে দেখিল বন্ধুবর শ্রীধরকে। জিনিষপত্র চিনিতে এবং কিনিতে শ্রীধর যেমন পাকা শরৎ তেমনি কাঁচা। যে কাজে যে পটু সে কাজ করিতে তাহার লাগেও ভাল, অন্যথা ঠিক বিপরীত। অতএব দুজনের সঙ্গলাভে দুজনে সুখ বোধ করিল। তাহারা দোকানে দোকানে ঘুরিয়া ফিরিয়া নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক অবশেষে চলিল লেড-ল কম্পানীর দোকানে। অভিপ্রায়, সেখানে শরৎ কলার, টাই, ও কামিজ প্রভৃতি কতকগুলো জিনিষ কিনিবে, আর পোষাক পরিচ্ছদ কিছু কিছু ফরমাসও দিয়া যাইবে। নানা কাপড়ের মধ্য হইতে দু-একটা কাপড় বাছিতে এবং গায়ের মাপ জোক দিতে যে কতটা সময় যায় ইতিপূর্ব্বে সে জ্ঞানই শরতের ছিল না। এ কার্য্য সমাধা করিয়া টমাস কুকের গেটের কাছে যখন তাহারা নামিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দুম করিয়া আফিসের গেটও বন্ধ হইয়া গেল। সেদিন শনিবার।—দরজা বন্ধের আওয়াজটা এমন জোরে শরতের বুকে ধাক্কা দিল যে ক্ষণকাল জ্ঞান-শূন্যের মতই সে সেই ফুটপাথের উপর বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শরতের এতটা নৈরাশ্য শ্রীধরের নিকট ভারী হাস্যজনক বলিয়া মনে হইল। তথাপি হাসিটা চাপিয়া লইয়া সান্ত্বনার স্বরে সে বলিল,—"এত মুষ্‌ড়ে পড়লে কেন হে? ক্যাবিন আজ এনগেজ করা হোল না তাতে আর ক্ষতিটা কি এমনই? জাহাজ ত আর আজই ছাড়ছে না—ছাড়বে সেই ১৫ই, আজ মাত্র মাসের ছ-তারিখ। চল চল আজ রেসের দিন, সেখানে যাওয়া যাক্, মন-টন সব ভাল হয়ে যাবে।"

ঠিকা গাড়ীর গাড়োয়ান শরতের চেনা লোক, জিনিষ পত্র সহ তাহাকে বিদায়

করিয়া দিয়া দুই বন্ধুতে পদব্রজে রেস কোর্সের দিকে চলিল। গেটের নিকট পৌঁছিয়া, দুখানা টিকিট কিনিয়া লইয়া তাহারা একটা প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িল। ভিতরে ঢুকিয়াই শ্রীধর মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল—তাহার টিকি পর্য্যন্ত আর দেখা গেল না। এই জনাকীর্ণ অপরিচিত রাজ্যে একাকী পড়িয়া প্রথমটা শরৎ কেমন একটা বিজনতা উপলব্ধি করিল। ক্রমশঃ সে ভাবটা কাটাইয়া উঠিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে 'বুকমেকার'গণ স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া বাজি খেলার টিকিট বিক্রয় করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে টাঙ্গান বোর্ডে যে যে ঘোড়া এ যাত্রা দৌড়িবে তাহাদের নাম লেখা। সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বাজিদারগণ তাহা পড়িতেছে, পড়িয়া ঘোড়া বাছিয়া সাধ্যমত বা অসাধ্যমত কোন একটা বা ততোধিক ঘোড়ার নামে বাজির টাকা জমা দিতেছে। শরৎকুমার এইরূপ দু-একটা ভিড়ের পাশ কাটাইয়া দৌড়চক্রের নিকটে বেড়ার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এইস্থান—বিশেষতঃ এরূপ দৃশ্য তাহার নিকট সম্পূর্ণই নূতন।—শরৎ যে বিকাল বেলাটাও ঘরে বসিয়া পড়িয়া কাটায় এমন নহে, ততদূর ভাল ছেলে সে নয়। গড়ের মাঠের বেঙ্গলি ব্যায়াম ক্লবের সে একজন মেম্বর। প্রায়ই বিকাল বেলা সে এখানে আসিয়া কোনদিন বা খেলিত, কোনদিন বা খেলা দেখিত। কিন্তু ইহার পর আর কোন স্থানে যাইবার তাহার সময় হইত না; সখও ছিল না।

ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলা দৌড় হইয়া গিয়াছে। আর একটা আরম্ভের এখনো কিছু সময় আছে, তবুও বেড়ার ধারে ইতিমধ্যে লোক জমিতে আরম্ভ হইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে আরোহী-(জকি.) পরিচালিত বহু অশ্ব চক্র মধ্যে সারি দিয়া দাঁড়াইল। সঙ্কেতকার (Starter) সাঙ্কেতিক যন্ত্র খুলিয়া দিয়া সঙ্কেত করিবামাত্র মুহূর্ত্তে সেই সকল অশ্ব একই সঙ্গে চক্রপথ আলোড়িত করিয়া ক্ষিপ্র বেগে ছুটিল। দর্শকগণ মাতিয়া উঠিল, অশ্বের প্রতিপদ-ক্ষেপে বাজিখেলোয়াড়দিগের হৃৎপিণ্ডে রক্ত-স্রোত দারুণ বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল; জকিগণ নিজ নিজ ঘোড়াকে সর্ব্বাগ্রে চালাইবার চেষ্টায় প্রাণের প্রতি মায়া মমতা ভুলিয়া গেল! কি এ বিকট উত্তেজনা! সর্ব্বগ্রাসী উন্মাদনা! বিরাট বিশ্বের ঝটিকা আবর্ত্তন যেন এই ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া অন্তর্ভুক্ত নরনারীকে উন্মত্ত দোলায় দোল দিতে লাগিল।—

একজন জকি মধ্য-পথে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল। মাথা কাটিয়া তাহার সর্ব্ব শরীর রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার প্রতি মায়া মমতা দেখাইবার সময় ইহা নহে। একটা বেগবান অশ্ব জকির গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। মনে হইল তাহার জানুর উপর যেন ঘোড়াটার পায়ের আঘাত পড়িল। দুচারিজন কোমলহৃদয় দর্শক আহা আহা করিয়া উঠিল, শরৎ-কুমার দুইহাতে আপনার চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিল। যখন হাত সরাইয়া পুনরায় চক্রের দিকে চাহিল তখন আর সেই হতভাগ্য

জকিকে সেখানে দেখিল না,—তখন ঘোড়াগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। সহসা আকাশভেদী রবে সম্মান-জয়ধ্বনি উঠিল। রণ্‌জির নাসিকা সর্ব্বাগ্রে দেখা গিয়াছে, তাহারই জিৎ। আহ্লাদে গর্ব্বে তাহার জকির মাথাটা যেন আধহাত উঁচু হইয়া উঠিল। 'বেটি' ও 'সুইটি' রণ্‌জির প্রায় কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ ক্ষেপ দৌড় এইরূপে শেষ হইয়া গেলে, রণ্‌জির অনুবর্ত্তী ভাবে অশ্বগণ জয়ধ্বনির মধ্যে স্বস্থানে ফিরিয়া চলিল।

আর সকলে বেড়ার ধার হইতে সরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই শরৎকুমার সেই আহত জকির সন্ধানে যাত্রা করিয়াছিল। আপনাকে ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়া সে অবিলম্বে আহতের শুশ্রূষার স্থানে আসিয়া দেখিল তাহার কলেজেরই একজন পরিচিত ডাক্তার জকির মাথা বাঁধিয়া দিতেছেন। শরৎ সাহায্য করিতে চাহিলে তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে ধন্যবাদ দান পূর্ব্বক জকির জানু পরীক্ষা করিতে বলিলেন। শরৎ সাতিশয় তৎপর ভাবে পরীক্ষা পূর্ব্বক জানাইল, যে যতদূর মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছিল," তাহা হয় নাই, জানু-গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে মাত্র, কিন্তু ভাঙ্গে নাই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহকারে সে যেরূপ দক্ষতার সহিত পা বাঁধিয়া দিল তাহাতে ডাক্তার সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার তখন ক্লবে যাইবার সময়। শরৎ দৈবপ্রেরিত রূপে আসিয়া সাহেবকে এ সময় উদ্ধার না করিলে তাঁহার টেনিস খেলায় এবং পানারামেরও যে বিলম্ব হইয়া পড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি ধন্যবাদ সহকারে শরতের নামের কার্ডখানা চাহিয়া লইলেন।

প্রাঙ্গণের একধারে দুইজনে কথা হইতেছিল। একজন ভগ্নহৃদয়ে কহিল—"এবারও হেরে গেলুম বিজনদা! এই শেষ chanceটা আমাকে দিতেই হবে"।

কথাটা বলিল শচীন্দ্র, ওরফে খোকা, হাসির ভ্রাতা। উত্তরে বিজন বলিল—"টাকা কোথা শচীন?"

"কেন, তোমার 'বেটি' ত দ্বিতীয় দাঁড়াল —তুমি ত বেশ টাকা পাবে।"

"বেশ টাকা পাব? হায়রে! টায়টোয়ে যদি ধার গুলো শোধ যায় তবেই ঢের; এর মধ্যে তোমার ধারই ত অনেক।" বলিয়া বিজন বাজির টাকা আনিতে ছুটিল। এই সময় শরৎ এদিকে আসতে আসিতে শচীনকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"হ্যাল্লো?" শচীন হঠাৎ শরৎকে এখানে দেখিয়া প্রথমটা একটু যেন অবাক হইয়া গেল; পরমুহূর্ত্তেই আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া শরতের প্রতিধ্বনি স্বরূপ বলিল, "হ্যাল্লো শর-দা! কতক্ষণ? তুমিও রাজি খেলছ নাকি?"

"না, খোকাবাবু না"।

"তবে এখানে এসে কি লাভ?" সে অবজ্ঞার সুরে মুখভঙ্গী করিল। তারপর কি মনে হইল; খুব নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"একটা কথা আছে শর-দা।"

"কি কথা?"

"এখানে না—ঐ গাছতলায় চল।" শরতের সহসা মনে হইল হয়ত ভাইকে দিয়া হাসিই বা তাহাকে কোন কথা বলিয়া

পাঠাইয়াছে কিম্বা যদিবা কোন চিঠিই দিয়া থাকে?" একবার তাহার পিতার অসুখের সময় হাসি তাহাকে একখানা পত্র লিখিয়া আসিতে বলিয়াছিল। একটা অকারণ আশায় তাহার মাথাটা যেন সহসা ঘুরিয়া উঠিল! গাছতলায় আসিয়া দুই একবার ঢোঁক গিলিয়া বাধ বাধ করিয়া শচীন বলিল, "শর-দা, তোমার কাছে টাকা আছে?" শরতের ধীরে ধীরে একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল; একটুখানি সময় লইয়া বলিল—"আছে।"

"আমাকে কিছু ধার দেবে?"

"কত?"

"বেশী নয় শ তিনেক?"

"তিনশ! তাহলে যে আমার টিকিটের টাকা কম পড়বে!"

শরৎ বিলাত যাইবে—শচীন তাহা শুনিয়াছিল, বলিল,—"সে ত দেরী আছে, ষ্টীমার ত আজই ছাড়ছেনা,—আমি তোমাকে কালই টাকা ফেরত দেব।—আমাকে এই শেষ chanceটা দাও শর-দা—দয়া কর, নইলে এ দেনা থেকে উদ্ধার পাবনা।"

"কিন্তু যদি এবারও না জেতো?"

"নিশ্চয়ই জিতব—bound to win, তুমি কি মনে কর ভগবান এমন নিষ্ঠুর এমন unjust!" তাহার এইরূপ উন্মত্ত বাক্যে শরৎ অবাক হইয়া গেল, তাহার মায়া করিতে লাগিল; ছেলে বেলা হইতে ছোট ভাইটির মত তাহাকে মনে করে। করুণ স্বরে কহিল—"কিন্তু তুমি দেখছনা—পরশুই আমায় ক্যাবিন ঠিক করতে হবে, নইলে এ-যাত্রা আমার যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।"

"বন্ধ হবে না! আমি তোমাকে ঠিক বলছি।"

"ধর যদি নাই জেতো?"

"তবুও আমি কালই তোমার টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব।"

"কি ক'রে? তোমার বাবাকে ত আমি চিনি, তিনি ত দেবেন না।"

"মায়ের কাছে নেব; আমার পাশের পুরস্কার তাঁর কাছে আমার পাওনা আছে।"

"কিন্তু তোমার ত ধার অনেক—সব কি'—"

"আঃ, তাতে আর হয়েছে কি? সে ভাবনা আমার। ধর যদি আমার ঘোড়াটা প্রথম হয়—তাহলে আমার ভাগ্য ওলট পালট হয়ে যাবে। উঃ কি মজা!"

শরৎ হাসিয়া বলিল—"ধর, তা হোলনা?"

"তাহলেও তোমার টাকা কালই চুকিয়ে দেব; দেবই দেব। তোমাকে শপথ করে বলছি।"

"শপথ করতে হবেনা—কিন্তু আর একটা বিষয়ে যদি শপথ কর ত আমি দিতে পারি।"

"কি?"

"তুমি কথা দাও এবার হারো বা জেতো আর কখনো এ রকম বাজির খেলা খেলবেনা?"

"যদি শপথ না করি?"

"তাহলে টাকা দেব না।"

শরৎকুমারের স্বর দৃঢ়—শচীন বুঝিল উপায়ান্তর নাই। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল—তাহার পর বলিল—"বেশ তাই হবে, আমি শপথ করছি এই আমার শেষ বাজি খেলা।"

শরৎ পকেট হইতে ৩০০ শত টাকা বাহির করিয়া শচীনকে দিল।

সৌভাগ্যক্রমে এবার শচীন জিতিল, তাহার ঘোড়া দ্বিতীয় হইল। ইহাতে ৫০০ শতের উপর সে টাকা পাইয়া গেল, কিন্তু তবুও তাহার সব ধার শোধ গেল না! বিজনকুমার তাহাকে যত টাকা ধার দিয়াছিল সব টাকা কাটিয়া লইয়া কেবল ৫০ টাকা মাত্র তাহাকে দিল। তাহাই শরৎকে দিয়া শচীন সানুনয়ে বলিল "শরদা, তুমি কিছু মনে করোনা, দেখলে ত বিজনদা আগে তার টাকা সব কেটে নিলে; আমি মনে করেছিলুম তোমাকেই আগে দেব; কিন্তু তা আর হোলনা। নাই দিক্‌গে ভয় পেয়োনা—আমি নিশ্চয়ই কাল তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেব।" বার বার এইরূপে শর-দাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক টমটমে আসিয়া উঠিল। এবং গাড়ী হাঁকাইয়া দুই বন্ধুতে গৃহযাত্রা করিল।

(৪)

বাজি খেলার নেশা হইতে শচীনকে রক্ষা করিতে পারিল—এই ভাবিয়া শরৎ বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিল। তবে এই আনন্দ তাহার আত্মপ্রসাদে পরিণত হইতে পারিত, যদি ঋণের বদলে টাকাটা সে শচীনকে দানরূপে দিয়া দিতে পারিত। তাহা পারে নাই বলিয়া শরৎকুমারের মনে একটা দুঃখ রহিয়া গেল; একটা ধিক্কারেরও উদয় হইল। এত বড় হইয়াছে সে, এখনো একটা পয়সার জন্য মামার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাঁহার বৃদ্ধবয়সের ব্যয়ভার কোথায় নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিবে—না এখনো তাহার জন্য মামারই ভাবিতে হয়। শরৎ বিলাত গেলে এ ভাবনা তাঁহার কত বাড়িয়া যাইবে! সে যদি কলিকাতায় বসিয়া প্র্যাক্‌টিস করে তাহা হইলে অবশ্য এ দায় হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিলে অল্পদিনের মধ্যে এখানে তাহার পসার জমিবারও সম্ভাবনা—কারণ সে সার্জ্জারিতে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছে। কিন্তু মামারই যে বিশেষ ইচ্ছা সে বিলাত যায়,—তিনিই ত একান্ত উৎসাহ সহকারে তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতেছেন। কি করিয়া পিতৃতুল্য মাতুলের এই গভীর স্নেহ-প্রণোদিত মঙ্গল-ইচ্ছাকে সে উপেক্ষা করিবে? তাহার নিজেরও যদি ইহাতে অনিচ্ছা থাকিত তাহা হইলেও সে তাঁহার এ ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু শরতের মনেও এ ইচ্ছা চিরদিনই প্রবল। একদিন এই ভিত্তিমূলে আশা-আকাঙ্ক্ষার যে সুন্দর প্রাসাদের নক্সা আঁকিয়াছিল নিরাশার জলে তাহা মুছিয়া গিয়াছে,—তবুও সে বিলাত যাইতে চায়; কেন না ইহাই এখন তাহার শান্তি লাভের উপায়।

শরৎ শচীনের নিকট হইতে টাকা ফিরাইয়া পাইবার অপেক্ষায় রহিল। রবিবারে টাকা পাইবার কথা কিন্তু মঙ্গলবারেও টাকা আসিল না। তবে কি শচীনকে টাকার জন্য শরৎ চিঠি লিখিবে? কিন্তু তাগাদা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। নিশ্চয়ই শচীন টাকাটা সংগ্রহ করিতে পারে নাই,—পারিলেই নিজে আসিয়া দিয়া যাইত। চিঠি লিখিলে তাহাকে কেবল বিব্রত করা হইবে মাত্র।

কিন্তু মামার কাছে কি বলিয়া জবাবদিহি করিবে সে? কি করিয়া আবার আজ টাকা চাহিবে?

শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্যালীপতি রাজা অতুলেশ্বরের ষ্টেটের ম্যানেজার। রাণীগঞ্জে ইঁহার যে কয়লার খনি আছে—প্রায় শনিবারে শ্যামাচরণ তাহার তত্ত্বাবধান করিতে যান,—এবং হিসাব নিকাশ সহ প্রায়ই সোমবারে বাড়ী ফেরেন। এবার তিনি সোমবারের পরিবর্ত্তে বুধবারে বাড়ী ফিরিলেন, কিন্তু তখনও শরতের টাকা আসিল না, শরৎ বুঝিল, আর টাকা পাইবার আশা নাই।—এই দুশ্চিন্তার মধ্যে বিলাত যাওয়ার ইচ্ছাটাও তাহার যেন একরকম ডুবিয়া গেল।

মামা খাওয়া দাওয়ার পর অফিসঘরে কাগজের দপ্তর সম্মুখে করিয়া টেবিলের নিকট চৌকিতে বসিয়া একটা পায়রার পালকে কান চুলকাইতেছিলেন, এমন সময় শরৎ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। পালকটা টেবিলে কলমদানীতে রাখিয়া তাহাকে সম্মুখের চৌকিতে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,--"ক্যাবিনের টিকিট কেনা হোল?"

"না এখনো হয়নি?"

"এখনো হয়নি! এ ষ্টীমারে তাহলে দেখছি তোর যাওয়াই হবে না! আজকালকার ছেলেদের যে কি রকম পাথুরে চাল হয়েছে,—তাঁরা থাকবেন টিট হয়ে বসে—আর কাজ গুলো যেন আপনি এসে ধরা দেবে! এমন গয়ংগচ্ছ কেন, ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

"টাকা কম পড়ে গেল।"

"টাকা কম পড়ে গেল! যত কিছু খরচ হতে পারে হিসাব ধরে তার উপর আমি যে একশ টাকা বেশী দিয়ে দিলুম। কত টাকা কম পড়েছে?"

"আড়াইশ!"

"আড়াইশ? সর্ব্বনাশ! অত টাকা কি করলে তুমি?" শরৎকে নীরব দেখিয়া লজ্জিত মনে করিয়া বলিলেন—"থাক্ আর বলতে হবে না—বুঝেছি ব্যাপারখানা কি! বিলিতি লোকে বেড়ে চোমরা করে ধরেছে, আপনাকে আর সামলাতে পার নি,—হাজার হোক ইংরেজ বাচ্ছার খোসামোদ! মনটা গলে মোম হয়ে পড়ে—তখন কি আর টাকা কড়ি মনে থাকে! উপেন-দাদা এ কথাটা বড্ড ঠিক বলেন—ইংরাজে যতদিন পায়ের জুত বুরুস না করে ততদিন রাঙ্গা মুখের মোহ ছোটে না। সাধে কি তোকে বিলাত পাঠাতে চাই—নিজের সাধ ত মিটল না, চিরকালই নিগার রয়ে গেলুম!"—

শরৎ একটু হাসিয়া বলিল—"না মামা—"

"আরে আর লজ্জায় কাজ কি? যা হয়েছে তা হয়েছে,—তবে নবাবের ভাগ্নে যে নস্ ভবিষ্যতে এটা মনে রাখিস। সেকালে আমরা কি রকম চালে চলেছি শুনবি? একটি আফিসের কাপড়ে ১০টি বছর কাটিয়েছি, তার পর যদি তোমার মামীর অনুরোধের দায়ে না পড়তে হোত,—আর মাইনেটাও সেই সঙ্গে না বাড়ত তাহলে আরও কতদিন যে চাপকানটা আমায় চেপে থাকতেন তা বলতে পারিনে।"

কথাটা বলিয়া শ্যামাচরণ খুব একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, সম্প্রতি বৎসর খানেক মাত্র তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে।

মামীর নামে শরতেরও চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। মামীর স্নেহে সে মাতার অভাব কখনো অনুভব করে নাই। তিনি তাহাকে এতই ভাল বাসিতেন যে মেয়েরা অনেক সময় ঈর্ষাকাতর হইয়া মাকে অনুযোগ করিত। মা হাসিয়া বলিতেন, "তোরা আমার মেয়ে বইত নয়—ওযে আমার পুত্র সন্তান।" আসল কথা বালক পিতৃ-মাতৃহীন বলিয়া আপনার স্নেহে তিনি তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিতে চাহিতেন। তিনি যে তাহার আপনার মা নন্‌—মাতুলানী মাত্র, শরৎ শিশুকালে তাহা জানিতই না,—বড় হইয়া যখন জানিল, তখনও তিনি শরতের হৃদয়-সিংহাসনে মাতৃরূপেই অধিষ্ঠিত রহিলেন।—

কিছুপরে শ্যামাচরণ বলিলেন—"কি এত কাপড় কিনেছিস নিয়ে আয় দেখি, কখনও ত ও রকম কাপড় পরা হয়নি,—দেখেও একবার চক্ষু সার্থক করি।—"

"না আমার কাপড়ে অত খরচ হয়নি। আপনি কাপড়ের জন্যে যে টাকা দিয়েছিলেন, তার চেয়েও কম টাকাই লেগেছে।"

"তবে কিসে অত খরচ করে এলি ?"

"একজন বন্ধুকে ধার দিয়েছি।"

এইবার তিনি সত্যসত্যই রাগিয়া গেলেন।

"বন্ধুকে ধার দিয়েছ! তোদের একটু ধর্ম্মজ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান নেই ? আজকাল-কার ছেলেরা কি এতদুর পাষণ্ড হৃদয়হীন! জানিস্‌ কত কষ্ট করে তোকে আমার বিলাত পাঠাতে হচ্ছে ? বড় মেয়েটিকে এবার ভাল করে পূজার তত্ব পর্য্যন্ত করা হোলনা। বেশ বুঝছি সেজন্যে তার কত গঞ্জনা সহ্য করতে হবে। মেজ মেয়েটি আসন্নপ্রসবা,—তাকেও আনতে পারছিনে; আনলেই ত খরচ পত্র আছে। ছোটটির বিয়েটাও পিছিয়ে দিতে হচ্ছে। শুধু ত তোর প্যাসেজ-মনি নয়—বিলাত যাবামাত্র ভর্ত্তির খরচ প্রভৃতি কত খরচ আছে। যতদিন তুই পাশ হয়ে ফিরে না আসবি ততদিন আমার আর মুক্তি নেই। আর তুই এর মধ্যে বন্ধুকে ধার দিয়ে নবাবি করতে গেলি !"

রাগের মুখে বলিয়া ফেলিয়া ভাবিলেন—"অত কথা না বলিলেই হইত।" শরৎ নতমুখে রহিল। মামা যে কতদুর কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহাকে বিলাত পাঠাই-তেছেন ঠিক সে জ্ঞানটা এতদিন তাহার ছিলনা। আজ সহসা তাহার যেন অন্ধ নয়ন খুলিয়া গেল। কিছু পরে সে বলিল, "তবে মামা আমি বিলাত যাবনা—এই খানেই প্র্যাকটিস করি"।

"অমনি রাগ হোল! আজকালকার ছেলেদের একটা কথা বলার যো নেই; আমার বাবা রাগের সময় আমাকে কত গালিগালাজই না করতেন,—কিন্তু সেই বিষের মধ্যেও আমরা অমৃত উপলব্ধি করেছি। আমি ত কোন জন্মে দেবদেবী মানিনে, ঈশ্বর আছেন কি না আছেন তাও জানিনে, কখনো জানতে চাইওনি; কিন্তু বাবার মনে আঘাত লাগবার ভয়ে প্রতিদিনই শালগ্রাম শিলার কাছে মাথা নুইয়েছি। তুই ভাববি, এ কি চাতুরী ? চাতুরী নয় এটা পিতৃভক্তি। এ সংসারে জ্ঞানবান স্রষ্টা পুরুষ কেউ আছেন কিনা জানিনে; কিন্তু আমার পিতৃদেব যে আমার স্রষ্টা পুরুষ তা

আমি জানি, তিনিই আমার মনে সাক্ষাৎ দেবতা। সে ভক্তিটুকু আজকালকার ছেলেরা হারিয়েছে!"

"না মামা তা নয়। আজ আমি খুব ভাল করে বুঝছি আমার জন্য আপনি কত কষ্ট স্বীকার করছেন। কিন্তু তবুও ত আপনি কর্ত্তব্য পালনে কুণ্ঠিত নন,—আমারও কি এ সম্বন্ধে একটা কর্ত্তব্য নেই মামা?"

"দেখ ঐ লম্বা-চওড়া কথাগুলো শুনলে আমার গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরে। ও সব বক্তৃতা রাখ্। এখনি টাকা দিচ্ছি—নিয়ে যা,—ক্যাবিন ঠিক করে আয়,—এ ষ্টীমারে আর যাওয়া হবে না তবে পরের ষ্টীমারে যেতে পারবি। তোর ভাল আমি যা বুঝি তাই কর্।"

"কিন্তু আমারও ত এখন বোঝবার ক্ষমতা জন্মেছে।"

শ্যামাচরণের সর্ব্বাঙ্গে এইবার সত্যই বিষের জ্বালা ধরিল। ছেলে-মেয়ের নিকট হইতে প্রতিবাদ তাঁহার অসহ্য! ইহাই তাঁহার স্বভাবের একটা বিশেষ দুর্ব্বলতা; ইহাতে তিনি শ্রদ্ধা-ভক্তিরই একান্ত অভাব দেখেন। রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাস গিয়াছিলেন—আর এখনকার ছেলেদের গুরুজনের প্রতি একটা অবিসম্বাদী শ্রদ্ধাবিশ্বাসও নাই! হায় রে! ইহার পর তিনি আর আত্মসম্বরণ করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না; ক্রোধ-বিকৃত স্বরে বলিলেন,—"লক্ষীছাড়া, তোমার মজ্জায় দেখছি ইংরাজি স্বাধীনতা ঢুকেছে। (যেন তিনি এ দোষ হইতে নিজে সম্পূর্ণ মুক্ত!) তোমাকে বিলাত পাঠিয়ে সত্যই ফল নেই; আরো জানোয়ার বনে আসবে। যা ইচ্ছা তবে তাই তুমি কর।"

শরৎ ধীরে ধীরে পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া টেবিলে রাখিল। তিনি এতদূর প্রত্যাশা করেন নাই; ভাগিনেয়ের স্পর্দ্ধায় তিনি অবাক হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। এ সাহসে তিনি রাগ করিবেন না প্রশংসা করিবেন? কিন্তু ইহা স্থির করিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাঁহার চক্ষু খুলিতে হইল। একজন ভৃত্য একখানা তার-পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। শ্যামাচরণ সেখানা হাতে করিয়া শরৎকে বলিলেন "রসিদ লিখিয়া দাও।" টেলিগ্রাম পড়িয়াই শ্যামাচরণ চমকিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "রাজা বাহাদুর ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন, ডাক্তার নিয়ে আজকার গাড়ীতেই প্রসাদপুর যেতে হবে। তুই যা একজন ভাল ডাক্তার ঠিক করে আয়। আমি ততক্ষণ অন্যান্য আয়োজন করে ফেলি। আগামী ষ্টীমারে তোর যখন বিলাত যাওয়া হোলই না তখন তুইও সঙ্গে চল্। সার্জ্জারিটা ত তুই ভাল বুঝিস। তুই সঙ্গে থাকলে আমার ভাবনাটা অনেক কম হবে।"

শরৎ ইহাতে কোন আপত্তি প্রকাশ না করিয়া ডাক্তার ঠিক করিতে গেল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

মাসকাবারি

কেল্টিক রিভাইভ্যাল ও সাহিত্যের নূতন ধারা।

"স্বদেশী সাহিত্য" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত গুপ্ত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বাংলা দেশে বর্ত্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রের দলাদলির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। যাঁরা "বাংলার প্রাণ" বলিতে বৈষ্ণবের প্রাণ বোঝেন এবং বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব সুরটিকে পদাবলীর সুর মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে আয়র্লণ্ডের "কেল্টিক রিভাইভ্যালের" উদ্যোগী-দিগের একটা বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও, আসলে মৌলিক সাদৃশ্য নাই, ইহা তিনি সুন্দররূপেই প্রতিপন্ন করেন। বাস্তবিক কেল্টিক রিভাইভ্যালের মধ্যে কেল্টিক মনের বৈশিষ্ট্য-গুলিকে বিকাশিত করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের দিকে বিশ্বমানবের দিকে অভিমুখ্য আছে, বৈমুখ্য নাই। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগীদের আদর্শের মধ্যেই সেই বিশ্ব-আভিমুখ্য, সেই সর্ব্বরস সর্ব্ব-প্রকরণ সর্ব্বকলারীতির সহিত আন্তর সম্বন্ধ, বিজের প্রাণ দিয়া তাদের প্রাণকে পরখ-পরশ করিবার সজীব চেষ্টা দেখিতে পাই না। স্বাদেশিক অভিমানেই তার উৎপত্তি এবং স্বাদেশিক অভিমানের মধ্যেই তার পর্য্যাপ্তি।

ইংরাজী সাহিত্যে, বিশেষতঃ কাব্য-সাহিত্যে, যে নানা ভাবের ও নানা রসের বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং যে বৈচিত্র্য অনেক সময় পরস্পর-সমঞ্জস না হইয়া অন্যোন্য-বিরুদ্ধ রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে, তার একটা বড় কারণ ইংলণ্ডে বিচিত্র জাতির মিশ্রণ ঘটিয়াছে। বিশেষ ভাবে কেল্টের সঙ্গে টিউটনের মিশলেই ইংরাজী সাহিত্যে ঐ দুই জাতির মানস বৈশিষ্ট্যগুলির রাসায়নিক সংযোগের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত ইংরাজ জাতির মধ্যে কেবলমাত্র টিউটন মনের বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে রূপ ধরিলে সে সাহিত্যের যে চেহারা হইত, ইংরাজী সাহিত্যের বিচিত্র-রসমণ্ডিত চেহারার সঙ্গে তার সারূপ্য খুঁজিয়া পাওয়াই শক্ত হইত, সন্দেহ নাই। ইংরাজীতে আজও যে শোনা যায় যে, আর্ট-সাহিত্যের কাজ "To hold up a mirror to nature"—বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিবিম্ব ধরিবার চেষ্টা মাত্র, ওটা একেবারেই স্যাক্সন মনের কথা। ইংরাজী কাব্যে ঐ বস্তুতন্ত্রতা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে; ব্যক্তির হৃদয়াবেগের বা passionএর প্রদীপ্ত রাগচ্ছটা আছে; বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার ইন্দ্রিয়-পরিহিত চৈতন্যের ঘাতপ্রতিঘাতের রম্য লীলাও আছে। বাস্তবিক সেই ঐন্দ্রিয় জীবনের গতি, বেগ, এবং চাঞ্চল্য সমস্তই ইংরাজী কাব্যে প্রস্ফূর্ত্ত, বিভাসিত। চসার হইতে ব্রাউনিং পর্য্যন্ত টিউটন মনের এই মানসমূর্ত্তি সমুজ্জ্বল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে কেল্টিক প্রতিভার

অপূর্ব্ব কাল্পনিকতা, ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যানুভূতি, সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মতম প্রেরণাকে ধরিবার শক্তি, অনুভবের কূলপ্লাবী বন্যা, নিগূঢ় অধ্যাত্ম চেতনা—এই বৈশিষ্ট্যগুলি যদি ক্ষণে ক্ষণে মিশ্রিত না হইত, তবে ইংরাজী কবিতার সঙ্গে নিছক বস্তুতন্ত্র লাতিন কবিতার বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। যেখানেই কেল্টিক প্রতিভার সঙ্গে টিউটন প্রতিভা আশ্চর্য্য সম্মিলনে মিলিয়া গেছে, সেখানেই ইংরাজী কাব্য অপূর্ব্ব।

তবু কেল্টিক রিভাইভ্যালের দল মনে করেন যে, সেই কেল্টিক প্রতিভার সম্যক্ স্ফূরণ ইংরাজী কাব্যে হয় নাই। এক সময়ে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, ব্লেক্, প্রভৃতি কবিগণ ইংরাজী কাব্যের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় রসের সঞ্চার করেন, ভিক্টোরীয় যুগের কবিরা সেই রসটিকে তার যথার্থ ব্যাপ্তি ও বিকাশের পথে সঞ্চরমান করেন নাই। তাঁরা নব নব বিজ্ঞানের আবিষ্কারের তাড়নায় কবিতাকে যথেষ্ট পরিমাণে বুদ্ধিগম্য চিন্তাসমন্বিত ও বিশ্লেষপূর্ণ করিয়া তোলেন। কেল্টিক রিভাইভ্যাল তারই প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া আবার ঐন্দ্রিয় রূপরসগ্রাহ্য এই জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে অতীন্দ্রিয় অরূপ অধ্যাত্মরস-জগতের ব্যঞ্জনাকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসী। সাহিত্যে ইহারা এক নূতন রস আনিয়া দিতেছে; এই নূতন রসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "মিষ্টিক"-পর্য্যায়ের কাব্যগুলির সারূপ্য আছে বলিয়াই কেল্টিক রিভাইভ্যালের দলের মধ্যে তাঁর স্তব সর্ব্বপ্রথমে বিঘোষিত হয়।

সাহিত্যে যে জিনিসটা একবার হইয়া চুকিয়াছে, যে রসের উৎস যতদূর উৎসারিত হইবার হইয়া অবশেষে নিরুদ্ধ হইয়া গেছে, তার পুনরুদ্ধার সাধন চলেনা। কেল্টিক রিভাইভ্যাল প্রাচীন কেল্টিক লোকসাহিত্য, গাথা, রূপকথা, পুরাণ প্রভৃতিকে নব বেশ-ভূষা পরাইয়া উপস্থিত করিবার চেষ্টাতেই যদি প্রধানতঃ রত থাকিত, তবে তার সেই চেষ্টার মধ্যে জীর্ণতা অচিরাৎ দেখা না দিয়া পারিত না। কবি ইয়েট্‌স্ তাঁর প্রথম কাব্যগুলিতে সেই চেষ্টা দিয়া সুরু করেন; তাঁর Wanderings of Oisin -প্রভৃতি তার সাক্ষী। কিন্তু ক্রমেই যতই তিনি গভীরতর রহস্য-লোকের সূক্ষ্মতম আভাস ও অভি-ব্যঞ্জনাকে কাব্যে রূপ দিয়া সাকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁর রচনায় কেল্টিক পুরাণ তার নির্ম্মোক ছাড়িয়া অত্যন্ত নূতন, অত্যন্ত আধুনিক হইয়া দেখা দিতে লাগিল। পুরাণটা তখন একটা উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া দাঁড়াইল—কবির Soul-vision বা অধ্যাত্ম দৃষ্টি তাকে আচ্ছন্ন আবিষ্ট অন্তর্হিতপ্রায় করিয়া আপনার প্রকাশে আপনি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। তার সাক্ষী ইয়েট্‌সের শ্রেষ্ঠ কাব্য-The Shadowy Waters। আবার কবি সিঞ্জ, বেন্‌জন্‌সন্‌কে আদর্শ করিয়া আইরিশ লৌকিক কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত বস্তুতন্ত্র নাট্য রচিলেন। সে সব নাটক আবার অতিমাত্রায় টিউটন বা অ-কেল্টিক। কবি এ,ই, সেই বাহ্য খোলস-টুকুও পরিত্যাগ করিয়া আপন অধ্যাত্ম অনুভূতিকে একেবারে স্বোদ্ভাবিত প্রকরণ ও রীতিতে প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং এই কেল্টিক কবিদের সঙ্গে আর বৈষ্ণব

পদাবলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কোথায় তাহাতো আমি দেখিতে পাই না।

ইংরাজী সাহিত্যের সমালোচনার উপলক্ষে অনেকে বলেন—সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষও লিখিতেছেন—যে, ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যে কোন ক্রমপারম্পর্য্য নাই, তাহা খাপ্ছাড়া খাপ্ছাড়া ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভাবলীলাকে দ্যোতমান করিয়াছে। গ্রীক সাহিত্য, এমন কি ফরাসী সাহিত্যেও নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও যেমন একটা অখণ্ড ভাব-সুসঙ্গতি ও রীতি-সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজী সাহিত্যে তাহা নাই। এই cultural tradition না গড়িলে, ভিন্ন ভিন্ন বড় বড় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধ ভাব ও প্রকাশ-লীলায় জাতীয় মনের মধ্যে সাহিত্য-বস্তুটার একটা অখণ্ড সংস্কার দাঁড়াইয়া যায় না। কথাটা একদিক্ হইতে যেমন ঠিক, অন্যদিক্ হইতে তেমনি ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। 'ট্রাডিশন' বা আবহমান রীতিধারা, যেমন বিচিত্র রস ও রসপ্রকাশের মধ্যে একটা সিমেণ্টের কাজ করিয়া সবটাকে আঁটে করিয়া বাঁধিয়া রাখে, তেম্নি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তি দিতেও বাধা দেয়। ইংরাজী সাহিত্যে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্ত্তি যতটা পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, অন্য কোন সাহিত্যেই বোধ হয় তাহা করা যায় না, একথাও অরবিন্দবাবু তাঁর আলোচনায় মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিয়াছেন। আমি মনে করি যে, সাহিত্যকে এবং সাহিত্য-সমালোচনাকেও এই 'ট্রাডিশন' নামক গণ্ডী হইতে মধ্যে মধ্যে মুক্তি না দিলে, সাহিত্য নব নব ধারাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। কেননা, ট্রাডিশনের মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা মিথ্যা যাহা আবর্জ্জনা। ইংরাজী সাহিত্যও স্বাদেশিক অভিমানবশতঃ তার আপাত ট্রাডিশনরাহিত্য সত্ত্বেও ঐতিহাসিক স্মৃতি-ভাণ্ডারে সেই রকমের বিস্তর মিথ্যা ও আবর্জ্জনাকে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে ইংরাজের যথেষ্ট মোহান্ধ সংস্কার আছে—শেক্‌স্‌পীয়রের বস্তুতান্ত্রিক প্রভাবে সে এমনি আচ্ছন্ন, যে সেই প্রভাবকে বাদ্ দিলে কবির দিব্য-বিভূতি-সমষ্টি শেক্‌স্‌পীয়রের মধ্যে যে কতটুকু পাওয়া যায়, অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের স্পন্দন-লেখা পাঠকের মনে যে কতটুকু অনুরণন জাগায়, তার খোঁজ লইতে তার সাহস হয় না। এক একটা সময় আসে—মানুষের জীবনেও বটে, জাতীয় জীবনেও বটে—যখন এই সমস্ত চিরপূজিত পুত্তলিকা-গুলিকে জাতীয় স্মৃতিমন্দির হইতে টানিয়া ফেলিয়া নব আদর্শ, নব চেতনা, নব প্রাণকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন হয়। কেল্টিক রিভাইভ্যাল যে পরিমাণে সেই কাজ করিতেছে, সেই পরিমাণেই ইংরাজী সাহিত্যের জীর্ণতার মধ্যে তাহা নব আশা ও নব প্রাণের সঞ্চার করিতেছে।

আমাদের দেশেও সেই কাজেরই অপেক্ষা আছে। অথচ দেশের স্রোতের বিরুদ্ধে একলা দাঁড়াইয়া সে কাজ সম্পন্ন করা অতীব কঠিন। কিন্তু কঠিন বলিয়াই ত তার এত মূল্য। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক অথচ ফরাসী-সাহিত্যের কঠিনতম বিচারক ও সকল ট্রাডিশন-বিপ্লবকারী রোম্যা রোলাঁর (Romain Rôland) একটি

উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমি শেষ করিতে চাই। উক্তিটি চমৎকার :—

"Every race, every art has its hypocrisy. The world is fed with a little truth and many lies. The human mind is feeble, pure truth agrees with it but ill: its religion, its morality, its states, its poets, its artists must all be presented to it swathed in lies. These lies are adapted to the mind of each race : they vary from one to the other : it is they that make it so difficult for nations to understand each other, and so easy for them to despise each other. Truth is the same for all of us : but every nation has its own lie which it calls its idealism : every creature therein breathes it from birth to death : it has become a condition of life : there are only a few men of genius who can break from it though heroic moments of crisis, when they are alone in the free world of their thoughts."

অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক আর্টের মধ্যেই কাপট্য আছে। এ জগৎ সামান্য একটু-খানি সত্য এবং অনেক খানি মিথ্যার দ্বারা পুষ্ট হইয়া থাকে। মানুষের মন দুর্ব্বল; বিশুদ্ধ সত্য তার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না; সেই জন্য তার ধর্ম্ম, তার নীতি, তার রাষ্ট্র, তার কবি, তার শিল্পী সকলকেই মিথ্যার বাঁধনে আচ্ছাদিত করিয়া তার সামনে উপস্থাপিত করিতে হয়। এই মিথ্যাগুলি প্রতি জাতির মনের অনুরূপ করিয়া লওয়া হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনের কাছে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত; ইহারাই ত জাতিতে জাতিতে বোঝাপড়ার পথে অন্তরায় এবং তাদের পরস্পরকে পরস্পর ঘৃণা করার পথে সহায়। সত্য আমাদের সকলের পক্ষেই সমান—কিন্তু প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কতকগুলি মিথ্যা আছে। সেই মিথ্যাকেই সে তার ভাবাত্মক তত্ত্ব বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি মনুষ্য সেই মিথ্যাকে নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাহা জীবনের অবস্থাবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। কেবল দুই একজন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ তাঁদের চিন্তার মুক্তলোকে একাকী বিহার করিতে করিতে কোন দুঃসাহসিক সঙ্কট-মুহূর্ত্তে সেই মিথ্যার জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পড়িতে পারেন।

স্বাদেশিক অভিমানের ছায়া আচ্ছন্ন হইয়া থাকিলে, উপরি-উদ্ধৃত বাক্যের গভীর সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কারো পক্ষেই সম্ভাবনীয় নয়। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে বাংলা দেশে যে সকল প্রতিভাবান পুরুষ বাংলা-দেশের চিরসঞ্চিত মিথ্যার জালকে বিদীর্ণ করিয়া বিশ্বসত্যের উদার মুক্তির মধ্যে বিচরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁরাই বাংলার সবচেয়ে বড় মিত্র—যদিচ আজ দেশ তাঁদের প্রতি বিমুখ হইতেও পারে। জীবনে সব-চেয়ে বড় প্রয়োজন যেমন সত্যের প্রয়োজন, জীবনের প্রতিচ্ছবি-সাহিত্যেও সত্যকেই সবচেয়ে বেশি করিয়া পাওয়া চাই এবং দেওয়া চাই।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

রাজকন্যা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান, ১ সানিপার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। বঙ্গদেশে এমন কোন পাঠক নাই, যিনি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা পাঠ করেন নাই। বঙ্গবিদুষীগণের তিনি সর্ব্বাগ্রবর্ত্তিনী, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বহু গ্রন্থ বহু রচনা বিবিধ ভাষায় অনূদিত হইয়া জগৎ-সভায় প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই বিদুষী বঙ্গমহিলা বাঙালীর গৌরব। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রতিভাশালিনী লেখিকার কথায় "নাট্যোপন্যাস"। আখ্যানটি ছোট এবং অল্প পরিসরে লেখিকা এমন বিপুল নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হয়। রাজকন্যার চরিত্রটি কোমলে কঠোরে অপূর্ব্ব হইয়াছে। শত অত্যাচারে জর্জ্জরিত প্রজাবৃন্দের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রসন্নচিত্তে আপনাকে বলি দিয়াছেন। গ্রন্থখানি আরম্ভ হইয়াছে হাসি-গান ও উৎসবের আনন্দ-কৌতুকে এবং ইহার সমাপ্তি অশ্রুতে। নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়টুকু লেখিকার কল্পিত সন্ন্যাসিনী বালিকাগণের গানে—"দুঃখে করিনা ভয়, মৃত্যু অমৃতময়, সত্য ধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে মিথ্যা হউক ক্ষয়—পাপ হউক লয়!" বেশ ফুটিয়াছে। কাব্যে, চরিত্র-সৃষ্টিতে, নাটকীয় ঘটনা-সন্নিবেশে লেখিকার প্রতিভা অসাধারণ, সে কথা নূতন করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, এ গ্রন্থে প্রতিভার সে লীলা আমরা দেখিয়াছি, এবং দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। হাসি ও দীর্ঘশ্বাস পাশাপাশি আলো-ছায়ার মত অপূর্ব্ব শ্রীতে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। গানগুলি কবিত্বে উজ্জ্বল, সুরে সুমধুর। বইখানির ছাপা-কাগজও ভাল।

নিবেদিতা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩ সানিপার্ক, বালিগঞ্জ কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি ক্ষুদ্র নাটিকা; মহিলা-সমাজে অভিনয়ের জন্য এই নাটিকাখানি রচিত। নাটিকাখানিতে ঘটনার আড়ম্বর নাই। সুমঙ্গলা ধনীর কন্যা, বাল-বিধবা, পরের দুঃখ ঘুচাইতে সর্ব্বদা সে অগ্রসর, পরের উপকারই তাহার জীবনের ব্রত। হেমাঙ্গিনীর পিতা স্ত্রী ও কন্যা তাহার সম্পর্কিত, তাহার পিতার আশ্রয়েই বাস করে। সুমঙ্গলার পিতা নিজের টাকা জমা দিয়া হেমাঙ্গিনীর পিতার চাকরি করিয়া দেন, হেমাঙ্গিনীর পিতার ঋণ শোধ করিতে গিয়া নিজের সম্পত্তি নষ্ট করেন। তথাপি সুমঙ্গলার পিতা বা মাতা তাহাদের উপর এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। হেমাঙ্গিনীর মাতা অত্যন্ত স্বার্থপর কুটিল-চিত্তা নারী—মেয়ের বিবাহে বৈবাহিকের জিদ মিটাইবার সাধ্য ছিল না—বৈবাহিক অনেক গহনা চায়—কথাটা কাণে যাইবামাত্র সুমঙ্গলা আপনার যথাসর্ব্বস্ব হাসিমুখে দান করিল। পরে তাহার পিতা ও মাতার মৃত্যুর পরই হেমাঙ্গিনীর মাতা মিথ্যা অছিলায় তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিল। সুমঙ্গলা যখন এমনই বিপদে দিশাহারা, তখন দৈববাণী হইল, "বিশ্বপতি তোমার পতি। * * তোমার মন্ত্রে, তোমার তন্ত্রে বঙ্গের নির্জীব রমণী-জীবনে তুমি প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর, তোমার শিক্ষায় তোমার দীক্ষায় তাহারা মহিমাময়ী নারী হইয়া উঠুক। * * * আত্মোৎসর্গ-সাধনায় বিশ্বের নর-নারীকে সন্তানরূপে লাভ কর।" এত বড় প্লট ছয়-সাতটি দৃশ্যে বেশ ফুটিয়াছে। নাটিকাখানির বিশেষত্ব, ইহাতে পুরুষ চরিত্র আদৌ নাই—অথচ বাহির-মহলের নানা দ্বন্দ্ব-কোলাহল এই মহিলা-দরবারের বাহিরে সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট শুনা গিয়াছে,—লেখিকার পক্ষে ইহা বড় অল্প কৃতিত্বের কথা নয়। এই নাটিকাখানিতে হাস্য ও করুণ রসের মিলনটি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। বৈষ্ণবী দিদির কথকতার অবতারণাটি অভিনব, কৌতুকপ্রদ। নাটিকাটিতে প্রাণ আছে, অল্প কথাবার্ত্তায় সামান্য ইঙ্গিতে বিবিধ নারী-চরিত্রগুলি বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে সুন্দর ফুটিয়াছে। হাসির গান, ভাবের গান নাটিকাখানিতে প্রচুর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

যুগান্ত কাব্য নাট্য। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বালিগঞ্জ। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি রূপক নাট্যলীলা—দেবদেবীই এ নাট্যলীলার পাত্র-পাত্রী। বিশ্বে বিষম বিশৃঙ্খলা, অন্যায়ের অত্যাচারে শান্তি জর্জ্জরিতা, করুণা নয়ন-হীনা, লক্ষ্মী ও বাণী দলিতা, তখন শিব সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্যায় নাশ করিয়া নবযুগ আনয়ন করিলেন—কিরূপে, তাহারই আভাষ রূপকের ছলে এই নাট্যলীলায় বর্ণিত হইয়াছে। রুদ্ররস প্রধান হইলেও ইহাতে করুণ ও হাস্যরসের অভাব নাই। নন্দী-ভৃঙ্গীর চরিত্র দুইটি বেশ নূতন ধরণের হইয়াছে।

ভারতবর্ষে কৃষি-উন্নতি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এস-সি প্রণীত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা চারি আনা মাত্র। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন "ভারতবর্ষে কৃষি-উন্নতির সমস্যাগুলি যে কি, এই বইখানিতে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। * * ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ, অতএব এখানকার প্রধান সমস্যা হইতেছে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি বিধান করা।" কোন্ পথে কৃষিতত্ত্বের গবেষণা হওয়া উচিত, কি করিলে সরকারী কৃষি বিভাগের কথা মূর্খ ও দরিদ্র কৃষকগণের নিকট পৌঁছিবে, কি উপায়ে ঋণজালে জড়িত কৃষকগণকে সে জাল হইতে মুক্ত করা যাইবে, কিরূপে দেশে কৃষিশিক্ষার বিস্তার হইবে, শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষকগণের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিবেন—এই সকল মৌলিক সমস্যার আলোচনাই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য—এই সুবৃহৎ গ্রন্থে লেখক প্রচুর অধ্যবসায়ে অসাধারণ দক্ষতার সহিত সরকারী কৃষি বিভাগের জন্ম-বৃত্তান্তের ইতিহাস বলিয়া সরকারী কৃষি বিভাগের কার্য্যপ্রণালী, শস্যের উন্নতি, কৃষি উন্নতি-বিষয়ক প্রণালী-সমূহ, গো-পালন, গোষ্ঠ-সমস্যা, কৃষিশিক্ষার আয়োজন ও প্রয়োজন প্রভৃতির সম্বন্ধে এমন বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গ্রন্থকারের শক্তি, উদ্যম ও স্বদেশপ্রীতি অপরিসীম, তাই এত মাথা ঘামাইয়া, এত পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া, এত অনুশীলন করিয়া তিনি এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন, এই মহাসমরের পর বিশ্বজগৎ কৃষির উন্নতির দিকে অত্যন্ত ঝোঁক দিবে—তাই তিনিও তাঁহার দেশবাসীকে পূর্ব্বাহ্নেই সচেতন করিয়াছেন। তিনি বিশেষজ্ঞ, ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং আমেরিকার কৃষি-সমিতির সভ্য! বাঙলার নানা পল্লীতে ঘুরিয়া তথ্য-সংগ্রহ এবং জ্ঞানসঞ্চয়ও করিয়াছেন বিস্তর। তাই তাঁহার মত বিশেষজ্ঞের যুক্তি ও মতের মূল্য যে যথেষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভদ্র সন্তানের কৃষিশিক্ষার কতখানি প্রয়োজন, তাহা তিনি সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশের ও পাশ্চাত্য দেশের কৃষি-সমস্যায় প্রভেদ কোথায় এবং কতখানি, লেখক তাহাও চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়াছেন। কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে এ গ্রন্থ বিরাজ করুক—বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করুন, আবার বাঙলার লক্ষ্মীশ্রী ফিরিবে।

নৃপেন্দ্র-স্মৃতি। স্বর্গীয় দীনদয়াল চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীদুর্গাদয়াল চৌধুরী, বেঙ্গল-বুক-ক্লাব, ১৪নং রামমোহন দত্তের রোড, ভবানীপুর। মূল্য বারো আনা। স্বর্গীয় কুচবিহারাধিপতি মহারাজা কর্ণেল স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ জি, সি, আই, ই; সি, বি বাহাদুরের জীবনের অনেকগুলি ঘটনার কথা এই বইখানিতে আছে। স্বর্গীয় লেখক স্বর্গীয় মহারাজের বাল্য-সহচর ও বন্ধু ছিলেন এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুর মতই প্রাণের সমস্ত স্নেহ-প্রেম ঢালিয়া তিনি নৃপেন্দ্রনারায়ণের চরিত্রের নানা দিক নানা ঘটনার মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে।

আলেয়ার আলো। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা ছয় আনা। এখানি উপন্যাস; গতবৎসর 'ভারতীতে' ধারাবাহিক বাহির হইয়াছিল। এ গ্রন্থ

সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে গেলে আত্মপ্রশংসাই করিতে হয় এবং সেটুকু মোটেই সঙ্গত বা শোভন নয়। তবে সত্যের খাতিরে যেটুকু বলা উচিত, সেটুকু বলিতেই হইবে। উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। মনস্তত্ত্বের আলোচনায় লেখক সফলকাম হইয়াছেন—তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রথম ভাগের গোপালের ছাঁচে ঢালা 'আদর্শ' নয়; তাহারা রক্ত-মাংসের জীব; সুখে-দুঃখে তাহারা টলে; বিবেক তাঁহাদের প্রাণে যে বাণী জাগাইয়া দেয়, জগতের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে তাহারা তাহা ঘোষণা করিয়া থাকে; সমাজ-গঞ্জনা বা লোক-লজ্জার ভয়ে তাহারা কর্ত্তব্য-পথ হইতে টলিতে চাহে না। মোহন ও হরেন দুইটিই বেশ সরল, সুদৃঢ় চরিত্র এবং ফুটিয়াছেও ভালো; নেকামি, ভাঁড়ামি বা গোঁড়ামির সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই, আধুনিক বাঙালীর সুযোগ্য 'হীরো'। সরমা,—বেশ নরম, শান্ত স্বভাবের বাঙালীর মেয়ে—কিন্তু তাহার তেজ আছে, প্রাণ আছে; সে যে মানুষ, সে কথা সে কখনো ভুলিতে পারে না এবং এই জন্যই সরমাকে আমাদের এতখানি ভাল লাগিয়াছে। মুরারিবাবু স্নেহ-বৎসল পিতা, তবে একটু ভীরু প্রকৃতির—বাঙ্লা দেশের পিতার ছবিটি হাসি ও অশ্রুর মধ্য দিয়া মুরারি-চরিত্রে বেশ ফুটিয়াছে। প্লটটিও মোটেই জড়ানো বা ঘোরালো নয়—ঘটনা সমান্য—এবং নাতিবিস্তৃত পরিসরে সে প্লটটুকু আপনাকে বেশ বিছাইয়া ধরিয়াছে। তবে গ্রন্থে দোষও আছে,—স্থানে স্থানে সমাজ-সংস্কারের ধূয়া মাত্রাতিরিক্ত হইয়াছে—এবং পাত্র-পাত্রীর টিপ্পনীও মাঝে মাঝে অনাবশ্যক রূঢ় হইয়াছে; সেকালের গোঁড়া কনসার্বেটিভ দলের সহিত মোহন ও হরেনের তর্ক মাঝে মাঝে ছেলেমানুষি-ধরণের; কতকটা চোখরাঙানি ও গা-জুরি-ভাবের হইয়াছে। ইহাতে রসভঙ্গও যে না হইয়াছে, এমন নয়। যমুনা-চরিত্র বিশেষত্বহীন এবং তাহার স্থিতি বা গতির সার্থকতাও বড় একটা নাই। যাহা হউক উপন্যাসে লেখকের এই প্রথম উদ্যম,—সে হিসাবে রচনা খুবই আশাপ্রদ, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বইখানির ছাপা-কাগজ-বাঁধাই চমৎকার।

গাজী। মৌলভী শেখ আব্দুল জব্বার প্রণীত। প্রকাশক মথ্‌ভূমি লাইব্রেরী, কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা। বাসন্তী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা; বাঁধাই এক টাকা। গাজী—বাঙ্লার নবাব সেকন্দর শাহার পুত্র—'গাজী' তাঁহার উপাধি। তিনি 'একাধারে কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর'; রাজপুত্র হইয়াও মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তাঁহারই জীবন-কথা লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাষা শুদ্ধ—সংস্কৃতানুসারী; রচনা প্রাঞ্জল; তবে স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাসের মাত্রা কিছু বেশী। লেখক বঙ্গসাহিত্যে মুসলমান কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরগণের কাহিনী রচনা করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য-সাধনে যেমন সহায়তা করিতেছেন, তেমনি সাহিত্যের একটা দিকও বৈচিত্র্যে পরিপুষ্ট করিতেছেন। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই ভাল।

সতুর মা। শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১ ক্লাইভ রো, কলিকাতা। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ সিকা। এখানি গল্পের বই, আটটি গল্প ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। ছোট গল্পের আর্ট তেমন না থাকিলেও গল্পগুলি সুলিখিত; আখ্যান-ভাগ ভালো এবং রচনাও অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসের ভারে পীড়িত নয়। তবে কয়েক স্থলে আদর্শ আঁকিতে গিয়া রঙের পোঁছ বেশী ঘন হইয়া উঠিয়াছে—তাহাতে আদর্শ হয়ত নীতিগ্রন্থের মাপকাঠি দিয়া দেখিলে খুলিয়াছে, তবে মানুষের দিক দিয়া স্বভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হইবে, জ্যাবড়া হইয়াছে। গল্পগুলির অধিকাংশই করুণ রসের এবং লেখিকা প্লটগুলিতে শেষ রক্ষাও করিতে পারিয়াছেন। গল্পের উপসংহার কোথাও ভারী বা এলোমেলো গোছের হয় নাই। মোটের উপর গল্পগুলি সুখপাঠ্য। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাইও ভালো।

শ্রীসত্যকেতু শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঘরের বাহিরে

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার অঙ্কিত

৪২শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩২৫ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

ঘেন্না

গান্ধারীর যখন ছয় মেয়ের পরও আবার মেয়েই হইল তখন বিধাতা হইতে ধাত্রী পর্য্যন্ত সকলকে গালি দিয়া হরকুমার সূতিকাগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া গৃহিণীকে উপদেশ দিল—মেয়েটাকে নুন খাইয়ে দিয়ে তুমিও একটু বিষ খাও!

কলিযুগের প্রারম্ভে মহাভারতের গান্ধারী ছিলেন শত পুত্রের জননী। সেই দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিবে আশা করিয়া যার বাপ-মা নাম রাখিয়াছিল গান্ধারী, সে এই ঘোর কলিতে বাংলা দেশের আবহাওয়ায় নাম-মাহাত্ম্যকে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া হইল কি না সাত মেয়ের মা! তিনটি মেয়ে হইতেই গান্ধারী আপনার গর্ভের লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া শেষ মেয়ের নাম রাখিয়াছিল বেশী। বেশীকেও উপচাইয়া আবার যখন মেয়ে হইল তখন সে কালীর কাছে অব্যাহতি চাহিয়া মেয়ের নাম রাখিল ক্ষান্তকালী। মা-কালী সেখানেও কন্যা দানে ক্ষান্ত হইলেন না দেখিয়া কাতর হইয়া পরের মেয়ের নামে প্রার্থনা জানাইল আর-না-কালী। অত নিষেধ সত্ত্বেও ষষ্ঠ বারেও কালী যখন কন্যাই দিলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা কুটিয়া মেয়ের নাম রাখিল রক্ষাকালী। কালী তাহাতেও রক্ষা করিলেন না, আবার মেয়েই হইল।

এই অশুভ উৎপাতে বাড়ীময় একটা এমন শোকের ছায়া পড়িল যে দাই তার পাওনা চাহিতেও সাহস করিল না, সে-ই যেন কিছু গুরুতর অপরাধ করিয়াছে এমনি ভয়ে-ভয়ে সে পালাইয়া বাঁচিল।

মেয়ে হইয়াছে শুনিয়াই গান্ধারী সেই যে পাশ ফিরিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইয়াছিল, মেয়েটা ককাইয়া দম বন্ধ হইয়া মরিবার

মতন হইলেও একবার ফিরিয়া তাকে দেখিত না। একজন দাসী মোক্ষদা মাঝে মাঝে দয়া করিয়া মেয়েটাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া রাখিয়া যাইত। ক্ষুধা পাইলে বা ভিজা বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া মেয়ে কাঁদিয়া উঠিলে গান্ধারী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিত—ওরে তোরা কেউ ওর টুঁটিটা টিপে ওর কান্নাটা জন্মের মতন থামিয়ে দে রে!

বুড়ী মোক্ষদা তাড়াতাড়ি আসিয়া খুকীকে তুলিয়া লইয়া বলিত—আহা মা, কেষ্টর জীব!

গান্ধারী উগ্র স্বরে বলিয়া উঠিত—কেষ্টর জীব, কেষ্ট পেলেই ত হয়! আবাগী আমাদের জ্বালায় কেন?

এম্‌নি অনাদর উপেক্ষায় যার জন্ম, তার মা তার নাম রাখিল ঘেন্না।

ঘেন্নার উপর তার বাপ-মার ঘৃণার অবধি ছিল না বলিয়াই বাড়ীর আর-কেহই তাকে দেখিতে পারিত না। ঘেন্নার দিদিরা এই ঘেন্নার আগমনে বাপ-মায়ের কাছে বেশী অপরাধী হইয়া কুণ্ঠিত ও ভীত হইয়া উঠিয়াছিল; যে প্রথম মেয়ে, সে পথ দেখাইয়াছে বলিয়া অপ-রাধী; তার পর যে যেমন হইয়াছে তার অপরাধ তত উত্তরোত্তর বাড়িয়াছে ও আগে যাদের জন্ম তাদেরও অপরাধ ক্রমশঃ গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে। ঘেন্না সপ্তম মেয়ে; সুতরাং বাপমায়ের মেজাজ ও তাদের সব কয়টি বোনের অপরাধ তা হইতেই সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্ত ঘেন্নার উপর ঘেন্নার দিদিদেরও, মমতা দূরে থাক, একটা বিষম ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিয়াছিল।

ঘেন্না একদিনও মার কোল বা মার দুধ পাইল না; মোক্ষদার বহু কাজের মধ্যে স্বল্প অবকাশে তার কোল যতটুকু ঘেন্না পাইত আর গাইএর দুধ মোক্ষদা যতটুকু চুরি করিয়া বা জোর করিয়া আনিয়া তাকে খাওয়াইত তাতেই ঘেন্নার ঘৃণিত জীবন টিকিয়া রহিল। মোক্ষদা সমর্থ বয়সেই স্বামীপুত্র হারাইয়া এই বাড়ীতে দাসীপনা করিতে ঢুকিয়াছিল, এখন সে বুড়ী হইয়া আসিয়াছে। এতগুলি মেয়ে হওয়াতে তার মুনিবদের যে বিপদ আর সেইজন্য তাদের প্রতি যে বিরাগ তাহা ন্যায্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও সে মেয়ে-গুলিকে অবহেলা করিতে পারিত না, কারণ সন্তান যে কি বস্তু তা যে সে হারাইয়া হাড়ে হাড়ে জানিয়াছে। তাই সে মুনিবদের নিষেধ ও বাধা সত্ত্বেও লুকাইয়া চুরাইয়া এবং সময়ে সময়ে জোর করিয়াই মেয়েদের যত্ন আত্তি করিত। তাহা দেখিয়া যখন গান্ধারী চীৎকার করিয়া উঠিত—"তোর জন্মেই মোক্ষদা ঐ আপদটা আমাদের বাড়ী আজাড় করে সর্‌ছে না! তুই আমাদের বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা, নইলে বাবুকে দিয়ে জুতো খাইয়ে বের কর্‌ব।" তখন মোক্ষদা নিজের অপমান ভুলিয়া খুকীকে বুকে চাপিয়া বলিয়া উঠে—ষাট ষাট!

এই বাড়ীতে মেয়েদের প্রতি এই বিষম অবহেলা আর-একজনের বুকে বাজিত,—সে এই বাড়ীর বাজার-সর্‌কার লালমোহন।

লালমোহনের বয়স বেশী নয়—বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে। কিন্তু সে এই বয়সেই দুঃখের আঘাত ঢের সহিয়াছে। তাই সে পরের দুঃখ অতি সহজেই অনুভব করিয়া কাতর হইয়া উঠে। তার স্ত্রী একটি কন্যাকে জন্ম দিয়া নিজে যখন মারা গেল, তখন লালমোহন সেই কচি প্রাণটির মায়ের অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু আনাড়ি অক্ষম পুরুষের সকল চেষ্টাকে ফাঁকি দিয়া মেয়েটির এতটুকু প্রাণ তার মায়েরই সন্ধানে যাত্রা করিল। সেই যে নিজের-হাতে-পালন করা মেয়ের মরণ লালমোহনের বুকে শোকের ছাপ মারিয়া দিয়া গেল, তা আর লালমোহন মুছিতে পারিল না; তার মর্ম্মস্থানটি সেই আঘাতে জর্জ্জর হইয়াই রহিল, একটু আঘাত সেখানে বড় বিষম হইয়াই বাজিত। যখন সে দেখিত যে মুনিবদের কঠোরতার ছোঁয়াচ লাগিয়া চাকর-দাসীদের মন পর্য্যন্ত মেয়েগুলির প্রতি মমতাহীন ও শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন লালমোহন মনে মনে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিত। সে যখন এ বাড়ীতে চাকরী করিতে আসে তখন বড় দুটি মেয়ের বিয়ে হইয়া গেছে, তারা শ্বশুরবাড়ীতে; পরের দুটির বিয়ের সম্বন্ধ হইতেছে, তারা আর সদরে বাহির হয় না; তার পরেরটি ম্যালেরিয়ার আর অযত্নের অত্যাচারে শয্যাগত মরমর; সুতরাং লালমোহন প্রভুর একটি মেয়েকেও চক্ষে না দেখিয়া সকল কটিকেই ভালো বাসিয়াছিল; তাদের জন্য তার ব্যথিত বক্ষে ক্ষুধিত স্নেহ থাকিয়া থাকিয়া উদ্বেল হইয়া উঠিত। সবার শেষে আসিল মুনিবদের ফাল্‌তোর উপরেও ফাউ মেয়ে তাঁদের ঘেন্না! এই ঘেন্নার কচি জীবনের উপর দিয়া যে কি অযত্নের ঝড়ঝাপ্‌টা বহিয়া যাইতেছে তা সে বাহিরে রোকড়ের খাতা লিখিতে লিখিতে মুনিব ও চাকর-দাসীদের টুক্‌রো টুক্‌রো কথা হইতেই বুঝিতে পারিত। ঘেন্নার কান্না দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইলে হরকুমার যখন খড়মের খটাস খটাস শব্দে বাড়ী কাঁপাইয়া ঘেন্নার কণ্ঠরোধ করিতে ছুটিত, অথবা মায়ের মনে মমতার বদলে রোষ প্রচণ্ড হইয়া ওঠাতে যখন সে কর্কশ কণ্ঠে চেঁচাইয়া পাড়া মাথায় করিত, আর মোক্ষদা হয়ত পাতের ভাত ফেলিয়া এঁটো হাতেই কচি মেয়েটার শুক্‌নো মুখে শুক্‌নো মাই গুঁজিয়া দিয়া তাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া বাহির-বাড়ীতে পালাইত, তখন লালমোহনের হিসাবে বড় ভুল ঘটিত আর তার জন্য সে মুনিবের কাছে যা-ইচ্ছা-তাই বকুনি খাইয়া মরিত।

একদিন লালমোহন মোক্ষদাকে ডাকিয়া চুপি-চুপি বলিল—তুমি যখন নাইতে খেতে যাবে তখন ঘেন্নাকে না হয় আমার কাছে রেখে যেয়ো।

ঘেন্নাকে যত্ন করিবার এখন দু-দুজন লোক!

লালমোহন নিজের পয়সা দিয়া একটা দুধ খাওয়াইবার শিশি কিনিয়া আনিল। অভাগিনী ঘেন্না মার মাই কেমন জানিত না, মাঝে মাঝে মোক্ষদার শুক্‌নো মাই

টানিয়াই তার অভিজ্ঞতা; এখন সে এই কৃত্রিম মাইএর স্নেহধারা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিল, বেচারী বর্ত্তিয়া গেল। ঘেন্না যখন পরম আগ্রহে তার কচি কচি হাত দুখানি দিয়া রবারের নলটাকে মুঠি করিয়া ধরিয়া ক্রমাগত চপর চপর করিয়া দুধ টানিত, তখন লালমোহনের মধ্যেকার শোকার্ত্ত পিতৃত্ব জাগ্রত হইয়া উঠিত, সে অশ্রুজালের মধ্য দিয়া পরম স্নেহে সেই শিশুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত। ঘেন্নাকে এই যে যত্ন, তা করিতে হইত সকলকে লুকাইয়া। মোক্ষদা যত্ন করিতে গিয়া মুনিবদের কাছে নিত্য শতেকবার কত যে অপমানিত ও তিরস্কৃত হইত তা ত লালমোহন বাহিরে থাকিয়াও বেশ টের পায়; আর মোক্ষদার অপমানে অপর চাকর-দাসীদের নিষ্ঠুরতার আনন্দও ত সে দেখে। এই যত্ন চুরি করিয়া করিতে হয় বলিয়া লালমোহনের আগ্রহ আনন্দ ও তৃপ্তি আরো বেশী হইয়া উঠিতেছিল দিনকার দিন।

একদিন লালমোহন বসিয়া খাতা লিখিতেছে, আর তার পাশে ছোট্ট একটি বিছানায় পাখীর ছানার মতন কৃশ শীর্ণ ঘেন্না হাতপা নাড়িয়া খেলা করিতে করিতে শিশি চুষিয়া দুধ খাইতেছে। গুপ্তচরের মুখে খবর পাইয়া হরকুমার নিঃশব্দে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল —ওটাকে এখানে কে আন্‌লে?

লালমোহনের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। লালমোহনের মুখে কথা ফুটিবার আগেই হরকুমারের নজর পড়িল ঘেন্নার মুখে দুধের শিশির উপর। হরকুমার লালমোহনের দিকে তাকাইয়া চোখ রাঙাইয়া বলিয়া উঠিল—এসব কার হুকুমে তুমি কিনে আন্‌লে? আমার পয়সা ত আর খোলামকুচি নয় যে এম্‌নি করে ছিনিমিনি খেল্‌বে? এর দাম আমি তোমার মাইনে থেকে কেটে নেব।

লালমোহন আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সে বলিতে পারিল না যে ওসব সর্‌কারী পয়সায় কেনা নয়, ওগুলি তারই উপার্জ্জনের কিঞ্চিৎ সদ্‌ব্যয়।

লালমোহনকে অপরাধীর মতন দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাকে দণ্ড দিবার ইচ্ছা হরকুমারের এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে সে "এই দুধ খাওয়াচ্ছি! এই সোহাগ বার কর্‌ছি!" বলিয়া চীৎকার করিয়া কচি মেয়ের মুখ হইতে দুধের শিশিটা হেঁচ্‌কা টান দিয়া কাড়িয়া লইয়া আছাড় মারিল।

আহারে হঠাৎ বঞ্চিত হইয়া ঘেন্না কাঁদিয়া উঠিতেই গান্ধারী ব্যস্ত হইয়া মোক্ষদাকে বলিল—ও মোক্ষদা, ছুটে যা যা, মেয়েটাকে নিয়ে আয়, বাবু আবার রাগের মাথায় ওকে তুলেই আছাড় দেবে!

ঘেন্নার কান্নায় বিরক্ত হইয়া হরকুমার বলিয়া উঠিল—রোস্‌, তোরও কান্না আজ জন্মের মতন বন্ধ করে দিচ্ছি।

এমন সময় মোক্ষদা পাশ দুয়ার দিয়া আসিয়া চিলের মতন ছোঁ মারিয়া ঘেন্নাকে লইয়া পলায়ন করিল।

হরকুমার অপ্রতিভ হইয়া কচি শিশুর উপর ক্রোধের লজ্জা ভৎর্সনায় ঢাকিয়া লালমোহনকে বলিল - এই সবের জন্যেই আজকাল তোমার কাজের অমন ছিরি

হচ্ছে! ফের যদি এ রকম কর ত ভালো হবে না বলে রাখ্‌ছি।

ভালো যে হইবে না তা না বলিলেও চলিত, দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। লালমোহনের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিতেছিল, কিন্তু পাছে ঘেন্নার বাপের সাম্‌নে একজন পরের চোখের জল ঘেন্নার অধিকতর দুঃখের কারণ হয় এই ভয়ে সে প্রাণপণ চেষ্টায় উদ্গত অশ্রু অন্তরেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল।

বাবু হিসাব করিয়া সর্‌কারের মাহিনা হইতে দুধের শিশির দাম কাটিয়া লইল, খাতায় ঐ জিনিসটির খরচ লেখা হইয়াছে কি না সেটুকু দেখাও সে আবশ্যক বোধ করিল না। হরকুমার নিজের মেয়ের প্রতি মমতা হইতেই সন্দেহও করিতে পারে নাই যে পরের মেয়ের জন্য পরে আবার খরচ করিবে। লালমোহন নীরবে দণ্ড সহ্য করিল। আবার সেইদিনই দুধের শিশি কিনিয়া আনিয়া এক জিনিসের জন্য তেকর খরচ সে আনন্দেই বহন করিল।

এখন হইতে সে ঘরের দরজায় খিল না দিয়া ঘেন্নাকে খাইতে দ্যায় না। ঘেন্নার জন্য সে যত দুঃখ সহিতেছিল ততই ঘেন্না তার আপনার হইয়া উঠিতেছিল; ঘেন্নার বাপ-মা তাকে যে-পরিমাণে ঘৃণা তাচ্ছিল্য করিত, লালমোহন সেই পরিমাণে অনুভব করিত সে ঘেন্নার কতখানি আপনার।

কিন্তু জন্মই যার অবাঞ্ছিত, জন্মক্ষণ হইতেই যার বাপ-মায়ের কামনা ও চেষ্টা হইয়াছিল তার মরণ, জীবন যার সুদুঃসহ, তার জন্য বিধাতার ভাণ্ডারে দুঃখের অনটন হয় না। ঘেন্নার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন মোক্ষদাকে যমরাজার দর্‌কার হইল। মোক্ষদা যাইবার সময় মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন ম্লান দৃষ্টিতে মিনতি ভরিয়া লালমোহনকে তার ইহজীবনের শেষ বাক্য বলিয়া গেল —সর্‌কার মশায়, ঘেন্নাকে তুমি দেখো।

লালমোহনকে মোক্ষদার এই অনুরোধ করার কোনো দর্‌কার ছিল না। তবু মোক্ষদার মৃত্যুকালের এই অনুরোধ লালমোহনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্নেহকে অনেকখানি বেগ দিয়া গেল।

মোক্ষদা থাকিতে সে-ই ঘেন্নাকে আনিয়া লালমোহনের কাছে রাখিয়া যাইত। কিন্তু এখন ঘেন্নাকে কেমন করিয়া অন্দর হইতে সদরে আনাইবে লালমোহনের এই হইল ভাবনা। লালমোহনের গোপন স্নেহ স্নেহ-পাত্রীর নাগাল পাইবার পথে যতই বাধা পাইতেছিল, ততই তা ব্যাকুল ও প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ঘেন্নার কান্না কানে গেলেই লালমোহন ব্যস্ত হইয়া উঠে; অথচ কোনো লোককে বিশ্বাস করিয়া সে আপনার ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে পারে না। ভোরের গোলাপী আভা ফুটিতে না ফুটিতে লালমোহন শয্যা ছাড়িয়া কতরকমের ফুল তুলিয়া আনিয়া ঘরে লুকাইয়া রাখে, আর সমস্তদিন প্রতীক্ষা করিয়া মনটিকে অন্দরের পথেই ফেলিয়া রাখে কখন তার ঘেন্না-দিদি আসিয়া তার এই স্নেহের গোপন দান আনন্দে সার্থক করিবে।

ঘেন্না সকল উপেক্ষা ও অবহেলা সহ্য করিয়া দীর্ঘ তিন বৎসর টিকিয়া যাওয়াতে তাকে সহ্য করা তার বাপ-মায়ের কতকটা অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকন্তু তাদের

একটি ছেলে হওয়াতে হরকুমার আর গান্ধারী তাকে লইয়াই এখন এমন ব্যস্ত আর আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল যে আর কোনো দিকে নজর দিবার বা অপর কাহাকেও অনাদর করিবার মতন অবসর তাদের বেশী ছিল না। বাপ-মায়ের মন অন্যদিকে নিবিষ্ট থাকার ফাঁকে গা মেলিয়া ঘেন্না আনন্দেই বাড়িয়া উঠিতেছিল। এখন সে ইচ্ছা হইলেই যখন-তখন লালুদাদার কাছে গিয়া আপনিই উপস্থিত হয়। লালমোহন শিশি শিশি লজঞ্চুষ আর টিন টিন বিস্কুট আনিয়া লুকাইয়া রাখে, সন্দেশ-রসগোল্লারও অভাব থাকে না; সুতরাং লালুদাদার ঘরে কোন্ সময়ে কোন্ দিক দিয়া চুরি করিয়া যাওয়া নিরাপদ তা তিন বছরের ঘেন্না ঠিক বুঝিয়া লইয়াছিল। ঐটুকু ছোট্ট মেয়ে যখন মা-বাপের দিবানিদ্রার অবসরে চোরের মতন ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চকিত চাহনির সার্চ লাইট ফেলিয়া ফেলিয়া সন্তর্পণে লালমোহনের কাছে আসিত, তখন তাহা দেখিয়া লালমোহনের বুক যেন ভাঙিয়া যাইত, সে ছুটিয়া গিয়া ঘেন্নাকে বুকে তুলিয়া চাপিয়া ধরিয়া ঘরে আনিত আর তাকে খেলা দিয়া খাবার দিয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া তাকে, হাসাইয়া বকাইয়া তার মনের ভার সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিত। লালমোহনের বিচিত্র ভঙ্গীর রঙ্গ দেখিয়া আনন্দে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই ঐটুকু মেয়ে সেই উচ্ছ্বসিত হাসি হঠাৎ দমন করে, বাপের ভয়ে চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা বলে;—আর লালমোহনের বুকের মধ্যে দুঃখের আগুন জ্বলিয়া তার মর্ম্মস্থানটিকে পুড়াইতে থাকে।

লালমোহন আর ঘেন্নার এই যে গোপন মিলন তা কর্ত্তা-গিন্নির একেবারে অগোচর ছিল না; মুনিবদের প্রিয় হইবার ভরসায় চাকর-দাসীদের মধ্যে গুপ্তচর ছিল অনেকেই। কর্ত্তা-গিন্নি এখন কথাটা কানে তুলিয়াও গ্রাহ্য করে না, ভাবে—মরুকগে যাক। কিন্তু লালমোহন আর ঘেন্নার ভয় ঘুচাইয়া তাদের অনুমতি দেওয়াও কুকুরকে নাই দেওয়া হইবে মনে করে। ছেলের যত্ন করিতেই তাদের সময় যায়, মেয়েটা বাড়ীময় দৌরাত্ম্য করিয়া না বেড়াইয়া এক-জায়গায় যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকে ত থাকুক গিয়া।

সাত মেয়ের পর ছেলে! তার জন্য দোল্‌না বিছানা ঠেলাগাড়ী সোনার ঝারা ঝুম্‌ঝুমি চুষিকাঠি খেল্‌না কিনিয়া কিনিয়া ঘর বোঝাই হইয়া উঠিতেছিল, তবু বাপ-মার মন উঠিতেছিল না। মেয়েরা এমন সব বিলাসের দ্রব্য কখনো চক্ষেও ছাখে নাই। ঘেন্নার শিশুচিত্ত ঐগুলি খোকার সঙ্গে ভাগে উপভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেও মুখ ফুটিয়া চাহিতে তার সাহসে কুলাইত না; সে দু-চারবার ঐসব জিনিসে হাত দিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, তার মা অম্‌নি কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছে—ঘেন্না! ফের খোকার জিনিসে হাত দিচ্ছিস! কিছু যদি ভাঙে ত তোমারও হাত পা আস্ত থাক্‌বে না জেনে রাখো!

একদিন খোকা দোল্‌নায় শুইয়া একটা ঝুম্‌ঝুমি মুঠো করিয়া ধরিয়া হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছিল আর তার হাতের উৎক্ষেপে ঝুম্‌ঝুমিটা থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া

বাজিয়া উঠিতেছিল। ঝুমঝুমিটার লাল রং আর ঝুমুর ঝুমুর শব্দ ঘেন্নার মন হরণ করিল; সে উৎসুক হইয়া ডিঙি মারিয়া খোকার দোল্‌নার মধ্যে দেখিতে লাগিল। খানিকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া তার লোভ প্রবল হইয়া উঠিল। সে চোরের মতন মিট্‌মিট করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল সে-তল্লাটে কেহ নাই, তার বাবা খোকার দোল্‌নার পাশে খাটের উপর গড়্‌গড়ার নল হাতে করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন সে সাহস করিয়া খোকার দোল্‌নার মধ্যে তার ছোট্ট হাতখানি ভরিয়া দিল; দোল্‌নার মধ্যে আরো কতকগুলি খেল্‌না ছিল, সেগুলি সে একটি একটি করিয়া তুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া রাখিয়া দিল; তারপর খোকার হাতের ঝুম্‌ঝুমিটা ধরিল; খোকা হাত নাড়িতেই টান পড়িয়া ঝুম্‌ঝুমিটা তার মুঠি হইতে খুলিয়া ঘেন্নার হাতে রহিয়া গেল, আর খোকা অম্‌নি কাঁদিয়া উঠিল। খোকার কান্নায় থতমত খাইয়া ঘেন্না তাড়াতাড়ি ঝুম্‌ঝুমিটা খোকার হাতে গুঁজিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু খোকা কিছুতেই আর ঝুম্‌ঝুমি ধরে না, হাত পা ছড়াইয়া কেবলই কাঁদে। খোকার কান্নার শব্দে চোখ মেলিয়াই হরকুমার দেখিল -ঘেন্নার হাতে খোকার ঝুম্‌ঝুমি! অম্‌নি রাগে দাঁত কড়্‌মড় করিয়া বলিয়া উঠিল—"রাক্ষুসী, খোকার ঝুম্‌ঝুমি চুরি কর্‌ছিস্‌!" কথা শেষ করিবার আগেই হাতের লম্বা শট্‌কা নল দিয়া ঘেন্নাকে শপাশপ্‌ কয়েক ঘা কসাইয়া দিল। ঘেন্না চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেই হরকুমার সিংহনাদ করিল—"চোপ্‌! চোপ্‌ বল্‌ছি! দোষ করে আবার কান্না!" ঘেন্না কাঁদিয়া উঠিয়াই বাপের ধমকে একবার বিষম রকম চম্‌কিয়া উঠিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু বাপের গর্জ্জনে ভয় পাইয়া খোকা কাঁদিয়া একেবারে হাট বাধাইয়া তুলিল।

খোকার কান্না! এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া যখন খোকার বাপ মা চাকর দাসী ছুটাছুটি করিয়া সান্ত্বনা করিতে আসিয়া পড়িল ও সকলেই তাকে লইয়াই ব্যস্ত, সেই অবসরে ঘেন্না ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘর থেকে পলায়ন করিল।

ঘেন্নার হঠাৎ কাঁদিয়া ওঠা যেমন তীরের মতন গিয়া লালমোহনের প্রাণে বিঁধিয়াছিল, তার হঠাৎ থামিয়া যাওয়াটাও তেম্‌নি বাজিল। হায়রে! একি বিষম অত্যাচার যে দুঃখ প্রকাশ করিবারও অধিকার নাই! লালমোহন হিসাবের খাতা সরাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ঘেন্না আস্তে আস্তে ঘরে আসিয়া লালমোহনের কোলের মধ্যে ঢুকিল। লালমোহন হঠাৎ ঘেন্নাকে কোলের মধ্যে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত স্নেহসিক্ত স্বরে ডাকিয়া উঠিল—"দিদি!" ঘেন্না তখনো রুদ্ধ রোদনের আবেগে থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল; সে ভয়চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া তার ছোট্ট হাতখানি দিয়া লালমোহনের মুখ চাপিয়া ধরিয়া চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল—চুপ কর লালু-দা, চুপ কর, এখুনি বাবা আস্‌বে!

লালমোহনের চোখ ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল; সে আদর করিয়া ঘেন্নার গায়ে হাত

বুলাইতে গিয়া দেখিল তার কচি গায়ে ছড়া ছড়া হইয়া নলের আঘাত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেইসব আঘাত লালমোহনের মনের গায়ে তেমনি হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। লালমোহন ঘেন্নার সঙ্গে আর একটি কথাও বলিতে পারিল না।

খোকার মুখ আঙ্গুর দিয়া বন্ধ করিয়া গান্ধারী বামা-ঝিকে চুপি চুপি বলিল—বামা, মেয়েটা কোথায় গেল একবার ছাখ! মার খেয়ে ভেতর যে চূর্ণ হয়ে গেছে—আড়ষ্ট হয়ে কোথায় ভির্মি-টির্মি যাবে!

ঘেন্না চুপ করিয়া থাকিতে থাকিতে লালমোহনের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের ঘোরেও থাকিয়া থাকিয়া ঘেন্না কান্নার আবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফোঁপাইয়া উঠিতেছিল। লালমোহন তাকে কোলে করিয়া ভাবিতেছে—বাপ-মা বলিয়া তাদের একে নিষ্ঠুর নিদারুণ দুঃখ দিবারও অধিকার আছে, সে কেউ নয় বলিয়া এ-কে ভালো বাসিবারও অধিকার তার নাই!

হঠাৎ তাকে সচেতন করিয়া বামা ঝি ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সর্‌কার-মশায়, এখানে ঘেন্না আছে? মা ডাকৃছেন।

লালমোহন যেন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে এম্‌নি ভাবে বলিল—এই এল, এসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তুমি একটু কোলে করে নিয়ে যাও বামা।

"মেয়েটা সবাইকে জ্বালিয়ে মার্‌লে বাপু! এতবড় বুড়ো মেয়েকে ঘুমন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়! তুমিই ওকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খাচ্ছ সর্‌কার মশায়!" বলিয়া বকিতে বকিতে বামা ঘেন্নাকে তুলিতে গেল। ঘেন্নার গায়ে হাত দিয়াই বামা বলিয়া উঠিল—ওমা! জ্বরে গা যে পুড়ে যাচ্ছে একেবারে!

লালমোহন ব্যস্ত হইয়া ঘেন্নার গায়ে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাঁ! জ্বর হয়েছে? গা কি খুব বেশী গরম?

বামা লালমোহনের উদ্বেগ উপেক্ষা করিয়া আর-কিছু না বলিয়া ঘেন্নাকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। লালমোহন দুটা টাকা লইয়া চাদর গায়ে দিয়া বাজারে বাহির হইল।

বামা ঝি ঘেন্নাকে আনিয়া গান্ধারীকে বলিল—ঘেন্নার জ্বর হয়েছে মা!

গান্ধারী মেয়ের দিকে বক্র কটাক্ষ করিয়া খোকাকে কোল নাচাইয়া ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে বলিল—ভয় নেই, ওরা মর্‌বে না।

এই কতকক্ষণ আগে ঘেন্নার দুই দিদি আর-না-কালী ও রক্ষা-কালীকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া বরপক্ষের লোকেরা হাজার দশেক টাকার ফর্দ্দ দিয়া গেছে; সুতরাং মেয়েদের উপর হরকুমার ও গান্ধারীর চটা মন আরো কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। তাদের মনে হইতেছিল—হায়রে ছেলে! এরা ছেলে হইলে অপরের ঘর হইতে এম্‌নি কষিয়াই টাকা আদায় করিতে পারিতাম। বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকুক খোকা—কিছু আদায় না হইয়া যাইবে না।

ঘেন্না জ্বরের ঘোরে বলিয়া উঠিল—লালু-দা, একটু জল খাব।

গান্ধারী সেই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—কেবল লালু-দা আর লালু-দা! সাতকালের এক লালু-দা পেয়েছে! এখানে

তোর লালু-দা কোথায়? ঐ মাথার কাছেই ত জল রয়েছে নিয়ে খা না—আমার কোলে যে খোকা ঘুমুচ্ছে। আর দু-দুটো ধেড়ে মেয়ে, তারাই বা গেল কোন্ চুলোয়?

আর-না ও রক্ষা ছেলেমানুষ হইলেও অবহেলার পাঠশালায় দুঃখ গুরুমশায়ের কড়া শাসনে অল্প বয়সেই অনেক শিখিয়াছিল; তারা দেখিয়াছিল তাদের দিদিদের বিবাহ দিয়া বাপ-মায়ের অর্থনাশে মনস্তাপ, আর দেখিতেছে তাদের বিয়ে দিতে অর্থনাশের আশঙ্কায় বাপ-মায়ের অসন্তোষ। আজ এই কতকক্ষণ আগে তাদের অনুগ্রহ করিয়া পছন্দ করিয়া কে জানে কাহারা হাজার দশেক টাকার ফর্দ্দ দিয়া তাদের বাপমায়ের মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া দিয়া গিয়াছে; তারা তাই নিজেদের জন্মের ও জাতের লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া অপরাধীর মতন ভয়ে ভয়ে বাপ-মায়ের দৃষ্টি এড়াইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছিল। এখন ছোট বোনটির, তাদের সকল বোনের জন্ম-অপরাধে সবাঁর বেশী দণ্ডিত এতটুকু মেয়ের, কাতর স্বর তাদের কানে যাইতেই তারা আর লুকাইয়া থাকিতে পারিতেছিল না; তার উপর মায়ের মধুর আহ্বান শুনিয়া তারা ছুটিয়া আসিয়া জলের ঘটী তুলিয়া মায়ের কাছে বাহির হওয়ার লজ্জায় ও বোনটির প্রতি স্নেহে মৃদুস্বরে বলিল—ঘেন্না ভাই, জল খা!

ঘেন্না চট করিয়া চাহিয়া দেখিল সে ত লালুদাদার কোলে নাই। সে উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। তখন সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, আমি লালু-দাদার কাছে যাব।

এতদিন সে যে-কাজ চুরি করিয়া করিত, আজ অক্ষম হইয়া সে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে বাধ্য হইল।

গান্ধারী ঘেন্নার কান্নায় বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আ মলো! আবার কাঁদে কেন? এখুনি ওঁর ঘুম ভেঙে যাবে; কত কষ্টে খোকাকে ঘুম পাড়ালাম, সেও কাঁচা ঘুম ভেঙে খেঁত্‌খেঁত্ করবে। যা বামা, ফেলে দিয়ে আয় ওকে লালুর কাছে।—ওকে আর বাড়ীতে আস্‌তে হবে না। এক এক করে সবাই যমের বাড়ী গেলেই ত হয়, তোদেরও হাড় জুড়োয়, আমরাও বাঁচি!

মায়ের এই অনুরোধ যে তাহাদিগকেও তা বেশ বুঝিয়া ভয়ে ও লজ্জায় মুখ কাচুমাচু করিয়া আর-না ও রক্ষা সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ঘেন্নাকে ঘাড়ে ফেলিয়া বাহির-বাড়ীতে যাইতে যাইতে বামা-দাসী গজর গজর করিয়া বকিতেছিল—ভ্যালা মেয়ে সব জন্মেছিল বাবা!—ভিটেমাটি চাটি করে দিলে! ...

লালমোহন বাজার হইতে এক পাঁজা খেল্‌না আনিয়া বিছানার উপর রাখিয়া সবে গায়ের চাদর খুলিয়া আল্‌নায় রাখিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে বামা-কণ্ঠের সুস্বর শুনিতে পাইল—এই নাও সরকার-মশায় তোমার আদুরীকে—একেবারে রসাতল করতে নেগেচে!

লালমোহন ফিরিয়াই দেখিল জ্বরের ধমকে ঘেন্নার মুখ ও চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে ধুকিতেছে। সে তাড়াতাড়ি তাকে বুকে করিয়া লইয়া ঠাণ্ডা জল চোখে মুখে দিয়া মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল।

ঘেন্না একটু সাম্‌লাইয়া খেল্‌নাগুলি দেখিয়া কাতর স্বরে বলিল—খোকার খেল্‌নায় আর আমি হাত দেব না লালু-দা !

—এ খোকার খেল্‌না না দিদি, এ তোমার খেল্‌না,—এ সব তোমার, আমি এনেছি।—বলিয়া এক বোঝা খেল্‌না লালমোহন ঘেন্নার সাম্‌নে তুলিয়া ধরিল।

এই অতুল ঐশ্বর্য্য তার ! ঘেন্নার জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন চোখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে পরম স্নেহ ও পরিতোষের সঙ্গে খেল্‌না-গুলির উপর একখানি হাত রাখিয়া আর-একখানি হাতে লালুদাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ খেল্‌না নিলে বাবা মার্‌বে না ?

লালমোহন বলিতে পারিল না—"না, মার্‌বে কেন ?" সে শুধু বলিল—আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা কর্‌ব ভাই।

আর-না ও রক্ষার বিয়ের ঝঞ্ঝাটে বাড়ী সুদ্ধ লোক ব্যস্ত থাকাতে লালমোহনই ঘেন্নাকে যত্ন ও শুশ্রূষা করিবার অবকাশ পাইয়াছিল। হরকুমার মাঝে মাঝে লাল-মোহনকে ধম্‌কাইতেছিল বটে—"কাজকর্ম্ম কর্‌বে, না মেয়েটাকে নিয়েই থাক্‌বে ?" কিন্তু সে ধম্‌কের মধ্যে বিশেষ বিষ ছিল না ; সবাই ব্যস্ত, জ্বরো মেয়েটাকে একজন দেখিবার লোক ত থাকা চাই।

হরকুমারের মেয়েদের বিয়ে হইয়া গেলে তারা আর বাপের বাড়ীর মুখো হইতে চায় না, এমনি তারা নিমকহারাম! শ্বশুর-বাড়ীতে বৌদের যে আদর, ততটুকুতেই তারা কৃতার্থ!

এখন বাড়ীতে [illegible] ঘেন্না। তাকে এখন মায়ের হুকুমে খোকার কাছে অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া বসিয়া খেলা দিতে হয়। খোকা কাঁদিলে তাকে কোলে করিয়া বেড়াইতে হয় ; লালুদাদার কাছে যাইবার জন্য মন-কেমন করিলেই মায়ের পাঁচ-আঙুলের দাগ-তোলা চড়ের কথা মনে পড়িয়া ঘেন্নার উৎসাহ চঞ্চলতা দমিয়া যায়। কিন্তু মন যেখানে টানে সেখানে সকল বাধা অতিক্রম করিয়াও চুরি চলিতেই থাকে।

কিন্তু খোকা চলিতে ও বলিতে শিখিয়াই তাদের চুরি ধরিয়া শাসাইত—দাঁলা না ঘেন্না পোলাল্‌মুকী, তুই লেলো মুকপোলার কাচে এইচিস—মাকে বলে তোদের মজা দেকাব।

ঘেন্নাকে বাপ মা ভাই ঘেন্না করে বলিয়া বয়স তাকে ছাড়িয়া কথা কহিল না, ঘেন্নারও বিয়ের বয়স হইল। আবার পাত্র খোঁজা, বরপক্ষের লম্বা ফর্দ্দ, আর মেয়ের উপর তার বাপ-মায়ের সকল ঝাল ঝাড়া রীতিমতই চলিতে লাগিল। জন্মদুঃখিনীর এই এক নূতন দুঃখ উপস্থিত—কোথাও কিছু বলা কহা নাই, মা তাকে টানিয়া লইয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে, খোঁপার উপর মায়ের হাতের তেলোর ঠোকা আর মুখের উপর শুক্‌নো খড়্‌খড়ে গাম্‌ছার রগ্‌ড়ানি সহ্য করিয়া তাকে কতকগুলো অপরিচিত পুরুষের সাম্‌নে গিয়া বসিতে হয়, হাঁটিতে হয়, হাত পা দেখাইতে হয়, অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর ভাবিবার সময় না পাইয়া তখনি-তখনি দিতে হয়। মা চুল এই মাত্র বাঁধিয়া দিল, কিন্তু লোকগুলা সেই বাঁধা চুল এলো করিয়া ফেলিতে হুকুম

দেয়; তার ফর্‌সা গালের আর ঠোঁটের লাল রং কৃত্রিম কি না ধরিবার জন্ত অচেনা লোকে ইস্ত্রিকরা কড়া রুমালের মধ্যে আঙুল ঢুকাইয়া তার গালের ও ঠোঁটের উপর মিনিট খানেক ধরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া আরো লাল করিয়া তোলে। যে মা আগে তাকে তাকাইয়া দেখিত না, সেও এখন নিত্য তাকে যখন-তখন বসিয়া ঘষে মাজে সাবান মাখায়। এমনিতর বহু দুঃখ ভোগের পর তাকে এক তেজ্‌বরে পাত্রের পছন্দ হইল, আর সবার চেয়ে বড় কথা দরে বনিল। অল্প খরচে শেষ মেয়েটিকে পার করিতে পারিয়া হরকুমার ও গান্ধারী আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ঘেন্নার কপালে সুখ আছে, তাই এমন সুপাত্রে পড়্‌ছে।

শ্বশুরবাড়ী যাইতে ঘেন্নার কোনো দিদি তেমন করিয়া কাঁদে নাই, যেমন কান্না কাঁদিল ঘেন্না; তার যে লালু-দাদাকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে।

কিন্তু বেশী দিন লালুদাদাকে ছাড়িয়া ঘেন্নার থাকিতে হইল না। সে বিধবা হইয়া বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, আর সঙ্গে লইয়া আসিল অনেক গহনাপত্তর ও অনেকগুলি টাকার কোম্পানির কাগজ। বিধাতা তাকে শেষ দুঃখ দিবার সময়ও উপহাস করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

বাপ-মা আদর করিয়া মেয়েকে ঘরে তুলিল, গলা জড়াইয়া ঘটা করিয়া শোক করিল, তারপর চোদ্দ বছরের খোকাকে ঘেন্নার কোলে বসাইয়া দিয়া বলিল—বেঁচে থাকুক খোকা, একেই তুই মানুষ কর্—তোর মনটা একটা অবলম্বন পেয়ে ভালো থাক্‌বে।

হরকুমার ও গান্ধারী খোকাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া দিল—দিদির মন জুগিয়ে থাকিস্, তোর ওপর নজর পড়্‌লে আখেরে তোর ভাল হবে, তোর আর খেটে খেতে হবে না। এখন ওকে আর যেন ঘেন্না বলিস্‌নে, তুই-তোকারিও করিস্‌নে যেন।

খোকাকে মানুষ করিয়া অবলম্বন খুঁজিতে ঘেন্না বাপের বাড়ী আসে নাই, সে আসিয়াছিল তার লালুদাদার জন্য। এতকাল পরে বাড়ীতে ফিরিয়া লালুদাদাকে দেখিবার জন্ত তার মন ছটফট করিতেছিল। বাপ-মায়ের শোকের ঘটা আর আদরের আড়ম্বর হইতে যেই মুহূর্ত্তে সে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারিল, অমনি সে সদর-অন্দরের সন্ধিস্থলে গিয়া বামাদাসীকে হুকুম করিল—বামা-দি, একবার লালুদাদাকে ডেকে দে ত।

বামা অবাক হইয়া দেখিল এ ত সে ঘেন্না নয় যে ভয়ে ভয়ে চোরের মতন কুণ্ঠিত হইয়া কিছু চায়; এ রাণীর মতন অসঙ্কোচে হুকুম করে। বামা দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল।

বুড়ার সঙ্গে বিয়ে হইয়া ঘেন্নার উপকার হইয়াছিল অনেক। বুড়ার সংসারে ঘেন্নার শাশুড়ী ননদ কেহ ছিল না, ঘেন্নাকেই সেখানকার কর্ত্রী হইতে হইয়াছিল। বুড়া ঘেন্নাকে যে পরিমাণ সোহাগ করিত সেই পরিমাণ ভয়ও করিত। এসব যে ঘেন্নার অভাবনীয় অভিজ্ঞতা—তাকেও লোকে ভয় করে, ভালো বাসে, শ্রদ্ধা ভক্তি করে, তারও হুকুম পালন করিবার জন্য বাড়ীর কর্ত্তা হইতে

চাকর-দাসী সবাই হায়েহাল হইয়া থাকে! ঘেন্নার মনের উপর যে সঙ্কোচ কুণ্ঠা ও ভয়ের চাপ ছিল তা সহজেই সরিয়া তাকে মানুষ হইয়া উঠিবার অবকাশ দিল। তার পর তার হাতে প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া তার স্বামী যখন মারা গেল তখন কত যে অচেনা লোক পাড়াপড়সী ও আত্মীয়স্বজন হইয়া তার স্তব স্তুতি আরম্ভ করিল তার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এত লোকের আদর সত্ত্বেও তার চিত্ত একটি লোকের আদরের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতেছিল—সে তার লালু-দা। তাই ঘেন্না শ্বশুরবাড়ীর প্রতিপত্তি ছাড়িয়া বাপের বাড়ীতে অনাদরের সম্ভাবনার মধ্যে চলিয়া আসিল। কিন্তু এখানে আসিয়াও সে দেখিল হঠাৎ সোনার কাঠির স্পর্শে সব বদল হইয়া গিয়াছে—মা-বাপও তাকে আদর করে, সমীহ করিয়া খাতির করিয়া কথা বলে। ঘেন্না অনুভব করিল আপনার শক্তি, বদল হইয়া গেল সমস্ত মানুষটা!

ঘেন্না শ্বশুরবাড়ী যাওয়া অবধি লাল-মোহনের আনন্দ ছিল না; ঘেন্না বিধবা হইয়াছে শুনিয়া সে ত আধমরা হইয়াই গিয়াছিল। ঘেন্না এ বাড়ীতে আসিয়াছে অবধি তার কান্নার বিরাম নাই। ঘেন্নাকে দেখিবার জন্য তার মন যত উৎসুক হইতেছিল, ঘেন্নার বিধবা বেশ দেখিবার দুঃখ তত প্রবল হইতেছিল। বামা-দাসী গিয়া ডাকিতেই লালমোহনের বুকের মধ্যে হর্ষবিষাদের জোড়া আঘাত জোরে বাজিল। সে চোখ মুছিতে মুছিতে ঘেন্নার কাছে আসিয়াই ক্রন্দনের উচ্ছ্বসিত স্বরে ডাকিল—দিদি!

ঘেন্না তাড়াতাড়ি লালমোহনের পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া আপনার মুখটাকে লালমোহনের দৃষ্টি হইতে সরাইল। সকলে তার যে-দুঃখ কল্পনা করিয়া শোক করিতেছে তার চেয়েও লালমোহনকে দেখিতে পাওয়ার আনন্দ তার যে বেশী হইয়াছে ইহা সে লালমোহনকে দেখাইতে লজ্জা বোধ করিয়া প্রণামের ছলে মুখ নত করিল।

ঘেন্নাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া লাল-মোহন শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—করিস্ কি দিদি, করিস্ কি? তুই ব্রাহ্মণ কন্যা, আমি শুদ্দুর—

ঘেন্না অপ্রতিভ স্মিতমুখ নত করিয়া বলিল—তা হোক, তোমার চেয়ে পূজ্য আমার কেউ নেই, তোমার চেয়ে আপনারও আমার কেউ নেই!

লালমোহন সকল দুঃখ ভুলিয়া হাসিমুখে ঘেন্নার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—তুমি আমার দিদি, আমি তোমার ছোট ভাই। অমন কথা বল্‌লে আমার পাপ হবে যে!

ঘেন্না লালমোহনকে প্রণাম করিয়া কি যে বিষম কথা বলিয়াছে তা বামার মারফতে কর্ত্তাগিন্নির কানে উঠিতে বিলম্ব হইল না। গান্ধারী গম্ভীর হইয়া কন্যাকে উপদেশ দিল—ত্যাখো ঘিনু, তোমার এখন সোমত্থ বয়েস, পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা ভালো নয়। লালু চাকর বৈ ত না। চাকরের সঙ্গে চাকরের মতনই ব্যবহার কোরো।

মায়ের কথা শুনিয়া ঘেন্না হাসিল। তার ঘৃণিত নামটা কোমল হইয়া হইয়াছে ঘিনু! তার লালুদাদা পর, বুঝাইয়া দিতেছে তার আপনার জন বাপ মা! লালুদা চাকর, আর সে মুনিব!

লালমোহনের সঙ্গে দেখা ক'রয়াই ঘেন্না বুঝিতে পারিয়াছিল যে-জায়গাটি হইতে তাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল ঠিক সেই জায়গাটিতে আসিয়া তারা মিলিতে পারিল না। অল্প কয়েক বৎসরের অদর্শনে তাদের দুজনের মধ্যে কি একটা ব্যবধান দেয়াল তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, যা না সে, না লালমোহন অতিক্রম করিতে পারিল। সে ইহাতে অস্বস্তি বোধ করিল, দুঃখ অনুভব করিল, কিন্তু ইহাও বুঝিল যে এ ব্যবধান অতিক্রম করা আর যাইবে না। কিন্তু যখন তার মা সেই দেয়ালের উপর উপদেশের ভার চাপাইয়া ব্যবধান আরো দুর্লঙ্ঘ্য ও পোক্ত করিতে চাহিল, তখন সেই ভারে সকল বাধা ভিতসই হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। ঘেন্নার জেদ হইল—লালুদাদা আমার সেই লালুদাদা, তার কাছে আবার সঙ্কোচ!

সেই দিন হইতে ঘেন্না দিনের মধ্যে যখন-তখন লালমোহনের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করিল, কারো মধ্যস্থতায় ডাকিয়া-ডুকিয়া নয়, বরাবর আপনি তার ঘরে।

গান্ধারী কন্যাকে স্মরণ করাইয়া দিল—তার বয়েস মাত্র সতেরো, ও লালমোহনের এখনো চল্লিশের কোটায় এবং সে ঘেন্নার স্বামীর চেয়েও বয়সে ঢের ছোট আর তার স্ত্রী বহুকাল হইল মারা গেছে।

ঘেন্না ঘৃণাভরে মায়ের দিকে শুধু একবার চাহিয়া তখনি তার লালুদাদার কাছে চলিয়া গেল।

চাকর-দাসীদের রসনা আসিরসের আস্বাদ পাড়ায় বিতরণ করিতে লাগিল। পাড়া মাতিয়া উঠিল।

পাড়ার বিজ্ঞ নসীবাবু ঘাড় নাড়িয়া পরম নিরপেক্ষ ভাবে বলিলেন—হতে পারে ওরা সচ্চরিত্র নির্দোষ; কিন্তু মানুষের নির্দোষ হওয়াও যেমন চাই, তেমনি সাবধান বিবেচক হওয়াও ত চাই। এ রকম ব্যবহারে সংসারের লোকে কথা বলতে পারে তা ত ওরা পরিহার করে চলে না। সুতরাং কেউ যদি ওদের সম্পর্ক নিয়ে কিছু কানাঘুষো করে ত তাদেরই যে শুধু দোষ তা ত বলা যায় না! এই দেখ না সেদিন নবীন-নন্দীকে আর দয়াল-কুণ্ডুর ভাইঝি লক্ষ্মীকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারী কাণ্ডটাই না হল?

হরকুমার মাথা হেঁট করিয়া বাড়ীতে ফিরিল। যে মেয়ে হইতে তার উঁচু মাথা হেঁট হইল তাকে সে সেই দণ্ডেই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিত যদি না ঘেন্নার অবর্তমানে ঘেন্নার কোম্পানির কাগজগুলি খোকার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত।

স্বামীর বিপদে সহধর্ম্মিণী গান্ধারী পরামর্শ দিল—ঘেন্নাকে দূর না করে লেলোকে দূর করে দিলেই ত সকল আপদ চুকে যায়।

হরকুমার বিপদ-সমুদ্রের কূল দেখিতে পাইয়া উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—এই ত্যাখো! এই সহজ উপায়টা মনে আসেনি! মাথার কি আর স্থির আছে? ঠিক বলেছ তুমি, লেলোকে আজই তাড়াচ্ছি।

কথাগুলি ঘেন্নার শুনিতে দেরী হইল না, বামার যে দয়ার শরীর।

ঘেন্না তখন লালমোহনের কাছে যাইতেছিল, ফিরিয়া আসিল। তার জেদের জন্য লালু-দাদার চাকরী যাইবে? আজ থেকে সে

আর লালুদাদার ত্রিসীমানায় যাইবে না। তাতে দুজনেরই কষ্ট হইবে? নাচার!

প্রতিমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া লালমোহনের দিন কাটিল, ঘেন্না-দিদির ছায়া পর্য্যন্ত সেদিন সে আর দেখিতে পাইল না। পাড়ার লোকের নিন্দা সহ্য করিয়া হাসি-মুখে সহজ ভাবে সে ঘেন্নার সঙ্গে অনর্গল কথা কহিত পাছে কুৎসার কালী ঘেন্নার মনে লাগিয়া তার মুখখানিকে একটুও ম্লান করে। কিন্তু সেই অপবাদ বেড়া হইয়া যখন ঘেন্নার আসা বন্ধ করিল তখন সে কাতর হইয়া পড়িল—হায় হায়! ঘেন্নার নিন্দার কারণ হইল অবশেষে সে! এর আগে তার মরণ হইল না কেন? এখন হরকুমার যদি তাকে কঠিন দণ্ড স্থায় তবে তাও কতকটা সান্ত্বনা! কিন্তু কেউ যে তাকে কিছুই বলে না—এ যে ভীষণ শাস্তি!

হরকুমার পরদিন সকালেই লালমোহনকে ডাকিয়া শুধু বলিল—হিসেবপত্তর বুঝিয়ে দাও।

লালমোহন ঘেন্নার কাছ হইতে চির-নির্ব্বাসনের চরম দণ্ড বুঝিতে পারিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিল।

ঘেন্নার কাছে খবর পৌছিল, লালমোহনের জবাব হইয়াছে। খবর দিল অবশ্য বামাই।

ঘেন্না বামাকে বলিল— বামা-দি, শিগ্‌গির একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে আয়।

বামা অবাক্ হইয়া ঘেন্নার বজ্রগম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল—গাড়ীর আড্ডায় নয়, গান্ধারীর ঘরে।

গান্ধারী তখন খোকার জন্য আনারসের সর্‌বৎ করিতেছিল; তাড়াতাড়িতে সব উল্টাইয়া ফেলিয়া ছুটাছুটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ঘিনু, গাড়ীতে কোথায় যাবে মা?

ঘেন্না আপনার জিনিসপত্র বাক্‌সে ভরিতে ভরিতে বলিল—শ্বশুরবাড়ী।

বামার কাছে খবর পাইয়া হরকুমারও ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—হঠাৎ শ্বশুরবাড়ী যাবে কেন মা-লক্ষ্মী?

বাক্‌সে চাবি ঘুরাইয়া ঘেন্না বলিল—এখন থেকে আমি সেখানেই থাক্‌ব।

হরকুমার অবাক গান্ধারীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া বলিল—সেখানে তোমার টাকাকড়ির হিসেবপত্তর রাখ্‌বে কে?

ঘেন্না উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাবির-থোলো-বাঁধা আঁচলটা ঝনাৎ করিয়া পিঠে ফেলিয়া বলিল—আমি নিজেই রাখ্‌ব। না পারি ত লালুদাদাকে ডাকিয়ে নেব।

হরকুমার হাসিয়া বলিল—লালুকে তুমি কোথায় পাবে মা, পুরোনো চাকরকে কি কেউ ছাড়ে? লালু ত আর আমাদের পর নয়, ও ত আমাদের ছেলেরই সমান।

বাবার কথা শুনিয়া ঘেন্না ঘৃণাভরে ঈষৎ হাসিল। তাহা দেখিয়া মেঘ দুর্য্যোগ কাটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া গান্ধারী চেঁচাইয়া ডাকিল—ও বামা, আর গাড়ী আন্‌তে যেতে হবে, না। ও খোকা, তোর দিদি পালাচ্ছে ধরে রাখ্‌।

খোকা আসিয়া ঘেন্নার হাত ধরিয়া বলিল—দিদি আমাকে ছেড়ে যাবে কোথায়, যেতে পার্‌লে ত!

ঘেন্না আবার ঘৃণাভরে হাসিল। তাকে

গাঁথিয়া রাখিবার জন্ত চারিদিকে কত টোপের আয়োজন!

ঘেন্না বাপের বাড়ীতেই থাকিল, কিন্তু তার আনন্দকে বিদায় দিয়া। বিধাতার দেওয়া সকল দুঃখের চেয়ে তার নিজের নেওয়া একটি দুঃখ অনেক কঠিন।

লালমোহনের হিসাব বুঝিয়া লইবার অবকাশ হরকুমারের হইয়া উঠিতেছিল না। হিসাব বুঝাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত লালমোহনকে বাধ্য হইয়া থাকিতেই হইল, একই বাড়ীতে থাকিয়া ঘেন্না-দিদির চির-অদর্শনের দারুণ দণ্ডে নিত্য নিরন্তর দলিত হইয়া।

হরকুমার ও গান্ধারী মেয়েটার সুবুদ্ধি দেখিয়া সুখী হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক দিন খোকা আসিয়া ব্যস্ত হইয়া খবর দিল—মা, মা, ঘেন্না পোড়ারমুখী ওপাড়ার চাটুজ্জেদের মাবাপমরা ক্যাব্‌লাটাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছে, আর বল্‌ছে ওকে পুষ্যিপুত্তুর নেবে!

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্যৌ র্মে পিতা মাতা পৃথিবী

প্রথমে কি, আগা না গোড়া, উপর না নীচ, ভিতর না বাহির? কোন জিনিষ গড়িতে বা আয়ত্ত করিতে হইলে পা হইতে আরম্ভ করিব না মাথা হইতে আরম্ভ করিব? মূল হইতে ক্রমে শিখরে আরোহণ করিব, না শিখর হইতে মূলে নামিয়া আসিব? পূর্ব্বে কোন্‌টি, পরেই বা কোন্‌টি—কতরা পূর্ব্বা কতরা পরায়োঃ?

নীচ হইতে, মূল হইতেই ত আরম্ভ করা উচিত। ভিত্‌ই যদি ঠিক না হইল তবে ইমারত দাঁড়াইবে কোথায়? প্রতিষ্ঠা যদি পাকা হয়, তবেই ত তাহার উপর স্থায়ী কিছু খাড়া করা যায়। জিনিষ যাহাকে ধরিয়া ভর করিয়া আশ্রয় করিয়া থাকিবে তাহারই প্রতি সর্ব্বপ্রথমে মনোযোগ দেওয়া যে কর্ত্তব্য এ ত অতি সহজ সাধারণ কথা। বাহির হইতেছে প্রতিষ্ঠা, বাহিরকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ভিতর। কাজেই আগে চাই বাহির, তারপর ভিতর। বাহির হইতেছে যাহা বেশী জানা, বেশী স্পষ্ট; আর ভিতরটা সন্দেহের জায়গা, সেখানকার সবই আবছায়া। যেটার উপর কিছু দখল আছে, সেইটা দিয়া সুরু করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাহাই গড়ি না কেন সেখানে একটা সত্য থাকিবেই, কারণ গোড়ায় একটা পরিচিত সুদৃঢ় সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য দিয়া আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু প্রথমেই যদি অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ি তবে হাত পা ভাঙ্গিয়া অন্ধকারের মধ্যেই চিরকাল গুমরাইয়া মরিতে হইবে, ইহারই সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং কার্য্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ হইতেছে জানা হইতে ক্রমে অজানার দিকে, বাহির হইতে ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করা। ছোট যাহা নিকটের যাহা শিক্ষা-নবীসের কাছে সেইটাই প্রধান কথা। বৃহৎ যাহা দূরের যাহা সেটাকে আয়ত্ত করিতে

হয় কাছের চারিপাশের ছোট ছোট জিনিষকে আয়ত্ত করিয়া, ইহারাই ত প্রতিষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠা পাকা কর, তাহার উপর জিনিষ গড়িয়া তোল, জিনিষ চিরস্থায়ী হইবে—এ কথা শুনায় ভাল, মনে হয় স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ইহার কারণ হইতেছে এই যে মানুষের দৃষ্টি একান্ত স্থূলের উপর আবদ্ধ, স্থূলের সাহিত মিলাইয়াই তাহার সকল কল্পনা খেলিতে চায়। যে সত্যটি প্রধানত খাটে স্থূল জিনিষের সম্বন্ধে, তাহাকে সে ধরিতে চায় বিশ্বসত্য বলিয়া। গোড়া হইতে আগা, ভিত হইতে চূড়ায় উঠা ইমারত গড়িবার বেলায় ঠিক ঠিক পদ্ধতি হইতে পারে। কিন্তু জগতের সব জিনিষ ইমারতের মতনই নিথর নিরেট হয় তাহা কে বলিতে পারে? আর যে-সব জিনিষ একান্ত নিথর নিরেট নয়, তাহারা যদি গোড়ার ভিতের উপর নির্ভর করিয়া না থাকে, অনেক সময়ে যদি মাথার উপর ভর করিয়াই চলে, তাহাই বা অসম্ভব কি? উপনিষদ এই রকমের একটা কথা বলিতেছেন না?—উর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখঃ—

সৃষ্টির সব জিনিষই যে স্থূল জগতের নয় এ কথাও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। জড়জগৎ ছাড়া স্পষ্টই আমরা দেখি আছে প্রাণের জগৎ, মনের জগৎ। বস্তুতঃ সূক্ষ্ম জগতের সংখ্যাই বেশী আর প্রাধান্যে ইহারাই বড়। আর সূক্ষ্মজগতের—মনের, প্রাণের জিনিষ সব আদৌ স্থায়ু নহে, তাহাদের ধর্ম্মই হইতেছে গতি, চঞ্চলতা। তাহারা স্থির হইয়া কোথাও বসে না, কিছুকে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না, তাহারা চলে। ভাসিয়া ভাসিয়া, বাষ্পবৎ উড়িয়া ঘুরিয়া। সুতরাং এ সকল জিনিষ গড়িতে হইলে কোথা দিয়া আরম্ভ করিতে হইবে? প্রতিষ্ঠা নয়, যাইতে হইবে উৎসে।

প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির অর্থই এই। স্থূল হইতে স্থূলের যে পরিণতি তাহা সৃষ্টি নয়। স্থূলের যে পরম্পরা তাহার মধ্যে প্রকৃত কার্য্যকারণের সম্বন্ধ নাই। সকল স্থূলই হইতেছে কার্য্য, কারণ রহিয়াছে উহার এক অতীত প্রদেশে। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, ভাব হইতে বস্তু ইহাই সৃষ্টির ক্রম। স্থূল, বস্তু হইতেছে প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সূক্ষ্ম, ভাব হইতেছে উৎস। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, বস্তু হইবে ভাব, বাহির হইতে ভিতর—এটা উজানের পথ, স্রোতের প্রতিকূল ধারা। কিন্তু সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে, ভাব হইতে বস্তুর দিকে, ভিতর হইতে বাহিরের দিকে যে গতি তাহা সহজ স্বাভাবিক অনুকূল স্রোত।

প্রতিষ্ঠার, বাহিরের উপর জোর দেওয়ার অর্থ জড়বাদ। দেহটাই আসল, মূল কারণ, প্রাণ মন এবং আত্মা (যদি কিছু থাকে) এই দেহেরই পরিণাম বা Function মাত্র—এই ধারণা ভিতরে ভিতরে আছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি দেহ অধিকৃত হইলে প্রাণ-মন অধিকৃত হইবে, বাহিরকে ঠিক ঠিক বুঝিলে ভিতরটাও আপনা হইতেই বোধগম্য হইবে। কিন্তু সত্য হইতেছে ইহার বিপরীত। আত্মাই মূল কারণ, আত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে মন-প্রাণ। দেহ হইতেছে সকলের শেষ নিম্নতম সৃষ্টি। এই আত্মাই প্রকৃত মূল, এখানে সকল জিনিষ

রহিয়াছে বীজভাবে। উপনিষদ জগতের যে চিত্র দিয়াছে তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নয়, তাহা মোটেই কবিকল্পনা নয়। সাধারণতঃ আমরা মনে করি, এই যে বাহিরের স্থূল জগৎ এইটিই হইতেছে মূল গোড়া, ইহা উর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়াছে, শাখা-প্রশাখা তুলিয়া দিয়াছে আকাশের দিকে, আর আর জগতের দিকে। মানুষ দাঁড়াইয়া আছে দেহের উপর, এখান হইতেই প্রাণকে মনকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে আত্মার দিকে। কিন্তু এটি দেখিবার ভুল। আত্মাই উৎস আত্মাই মূল, আত্মাই সৃষ্টিকে ধরিয়া রাখিয়াছে, আপনার সমুচ্চের গুহাহিত গর্ভ হইতে নীচের দিকে মেলিয়া দিয়াছে মনের প্রাণের দেহের সৃষ্টির এই বহু-পল্লবিত বাহু।

ধর্ম্মসাধনাও এই জড়বাদের হাত এড়াইতে পারে নাই। এক্ষেত্রে একটা খুব সাধারণ হিতোপদেশ আমাদের দেওয়া হয়—শরীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং। শরীরই হইতেছে প্রতিষ্ঠা, আত্মাকে মনকে এই শরীরই ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং আগে শরীরটি ভাল থাকা চাই, সুস্থ সবল নিরাময় হওয়া চাই, তবেই ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা-কিছু সম্ভব। নতুবা রোগে যে জীর্ণ, সকল রকম অস্বচ্ছন্দতায় যে খিন্ন, তাহার কাছে আত্মার কথা, ভগবানের কথা উপহাস মাত্র। সেই জন্যই দেখি প্রচলিত সকল রকম যোগ-সাধনাতে প্রথমে শরীর, শরীর-সম্বন্ধীয় যাহা তাহারই উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। দেহশুদ্ধি দিয়া আরম্ভ করিয়া সাধককে ক্রমে চিত্তে, মনে উঠিতে হয়, সকলের শেষে অধ্যাত্মের মধ্যে পৌছিতে হয়। হঠযোগ (আসন ও প্রাণায়াম) হইতেছে যোগের অধ্যাত্ম-সাধনার মূল প্রতিষ্ঠা, অবশ্য-করণীয় কর্ত্তব্য, এটিকে ছাড়িয়া অন্য পথ নাই।

কিন্তু ধর্ম্ম-জীবনে বা যোগ-সাধনার এটি উল্টা পথ। আগেই হইতেছে সাধকের মন—তাহার আত্মা, তারপর শরীর। রোগজীর্ণ শরীর লইয়া যে ভগবৎ চিন্তা করিতে পারে না, রোগমুক্ত হইলেই সে ভগবানে স্থিরনিবিষ্ট হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। যাহার অন্তরাত্মায় ভগবানের স্পর্শ পড়ে নাই, সে সুখী সুস্থ হইলেও ভগবানকে মনে করিতে পারিবে না। কিন্তু যে পাইয়াছে এই স্পর্শ, তাহাকে, সুখে-দুঃখে, রোগে-স্বাস্থ্যে, বাধ্য হইয়া ভগবানকে ভাবিতে হইবে। যোগ-সাধনারও গুপ্তরহস্য এইখানে, গোড়াতেই প্রথমেই ধরিতে হইবে অধ্যাত্ম সত্তা, এই জিনিষটি অধিগত হইলে তুমি এক নিভৃত তপঃ-শক্তির অধিকারী হইবে। এই তপঃশক্তির উচ্ছ্বসিত বন্যা তোমার আধারকে ছাপাইয়া চলিবে, এবং উহারই তেজে ও উহারই চাপে তোমার মন তোমার চিত্ত তোমার দেহ শুদ্ধ হইয়া উঠিবে, নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিবে। কায়াসিদ্ধি যোগ-সাধনার গোড়ার উপকরণ নয়, শেষ ফল মাত্র।

সেই রকম, ছোট যাহা কাছের যাহা সেটা হইতেছে দূরের যাহা বৃহৎ যাহা তাহারই একটা রূপ, প্রকাশ বা প্রয়োগ। বড় জিনিষ কঠিন জিনিষ প্রথমে ধর, দেখিবে ছোট জিনিষ সহজ জিনিষ আরও কত সহজ সরল হইয়া গিয়াছে, আপনা হইতেই কেমন সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। যে যত উর্দ্ধে

আপনার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, বাধ্য হইয়া তাহাকে সেই অনুপাতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে, অল্পশক্তিসাধ্য যে কর্ম্ম সে-সব কোন বিশেষ যত্নেরই অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু অল্প লইয়া যে আছে তাহার ততখানি শক্তি ব্যয় করিবার প্রয়োজনও হইতেছে না, অবসরও জুটিতেছে না। সুধু তাহাই নয়, ছোট জিনিষ কেবল তখনই সুনিষ্পন্ন হয়, যখন 'বৃহতের প্রভা ও আবেগ তাহার পিছনে জাগ্রৎভাবে রহিয়াছে। আসল কথা এই, যে জিনিষকে আমরা বলিতেছি দূরের অজানার, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু সেইটাই মানুষের বেশী কাছে বেশী জানা। অন্তরের দিক দিয়া দেখিলে দেখি ভিতরটাই আগে, কাছে, বাহিরটাই পশ্চাতে, সুদূরে, মানুষ যদি কিছুর উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তবে তাহা আত্মার সমুচ্চ শিখরে।

আত্মাই আগে, মনই আগে তারপর দেহ, ভিতরই আগে তারপর বাহির, আগে শিখর তারপর মূল, আগে উৎস তারপর প্রতিষ্ঠা—ইহাই হইল অধ্যাত্মবাদীর কথা। অধ্যাত্মবাদী যাহা বলিতেছেন তাহা খুবই সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া জড়বাদীর কথা কি মোটেই প্রণিধানযোগ্য নয়, সেখানে কি কিছু সত্য পাওয়া যায় না? আমরা বলি, জড়বাদের মধ্যেও একটা সত্য, গভীর সত্যই আছে, কার্য্যতঃ সেটিকে যতই বিকৃত করিয়া ফেলা হউক না কেন। ফলতঃ অধ্যাত্মবাদী আর জড়বাদী দুইজনে হইতেছেন দুই অতিমাত্রা। প্রত্যেকেই চাহিতেছেন একটা বিশুদ্ধ অমিশ্র সত্য, সৃষ্টিকে একটিমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ং তত্ত্বের মধ্যে ঢালিয়া সহজ সরল করিয়া ধরিতে। কিন্তু সত্য জিনিষটি বড়ই মিশ্র জটিল দ্বন্দ্বপূর্ণ, সৃষ্টির রহস্য একটি কথায় শেষ করিয়া ফেলা যায় না। মিল একটা অবশ্য কোথাও আছে, থাকিবেই। কিন্তু সে মিল, আমাদের মনে হয়, ঐক্যে ততখানি নাই, যতখানি আছে সামঞ্জস্যে।

জড়বাদীর ভুল এইখানে যে মানুষকে তিনি কেবল জড় বা জড়ের দাস বলিয়া দেখিতেছেন। অধ্যাত্মবাদী এই ভুলটি সংশোধন করিয়া বলিতেছেন, মানুষের উপর জড়ের বাহির-প্রভাব যতই থাকুক না কেন, আপাততঃ এটিকে যতই অবাধ অটুট মনে হউক না কেন, ইহারই মধ্যে, এই ঘন তমিস্রা ভেদিয়াই খেলিয়া উঠিতেছে ভিতরের আত্মার বিজলী চমক। জড়ের সহায়ে নয়, এই ভিতরের আলো'কেই আশ্রয় করিয়া—তাহা যতই ক্ষণিক যতই চঞ্চল হউক না—ইহারই ধ্যান করিতে হইবে, একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে, ক্রমে ইহাকে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা যদি পারি তবে জড়ের জড়ত্ব সহজেই দূর হইতে থাকিবে, আপনা হইতেই নবরূপে গঠিত হইতে থাকিবে। অথবা বেদ যেমন বলিতেছেন, পৃথিবী মানুষের মাতা বটে, কিন্তু তাহার পিতা হইতেছে স্বর্গ—সন্তানের উপর মাতার যতই দাবী থাকুক না, পিতার দাবীও যে আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না, শুধু তাহাই নয় একদিক দিয়া দেখিলে, মাতা অপেক্ষা পিতার দাবীই বেশী। এ সব কথা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু

অধ্যাত্মবাদীর ভুল এইখানে যে পিতার অধিকার সাব্যস্ত করিতে গিয়া, মাতার অধিকারকে অবশেষে তিনি অস্বীকার করিয়া ফেলিতেছেন। ভিতরকে, উপরকে, আত্মাকে ধরিতে হইবে, সেখান হইতেই নামিয়া আসিতে হইবে, কিন্তু যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে তাহা হইতেছে না, ততক্ষণ বাহিরটা, নীচটা, দেহটাকে লইয়া কি করিতে হইবে? পারমার্থিক সত্য-হিসাবে যাহাই হউক, ব্যবহার-হিসাবে পৃথিবীর দিকেই মানুষের টান বেশী। তাহার অন্তরাত্মায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বর্গের দ্যুতি ফুটিয়া উঠিলেও সমস্ত দিনটিই যে তাহাকে পার্থিব জাল-জঞ্জালের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয়! তবে কি স্বর্গের উপলব্ধিটুকুকেই কেবল আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে, আর পৃথিবীর অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, 'মায়া নু মতিভ্রমো নু' বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে? না, চক্ষু বন্ধ করিয়া সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে হইবে? আধ্যাত্মবাদী ফলতঃ তাহাই করিতে বলেন।

আমরা বলি ইহারও প্রয়োজন নাই। মানুষের উপর এতখানি জোর-জবরদস্তি সহিবে না। আর মাতা পৃথিবীও তাহা মানিবেন না। মানুষ যদি কেবল দেবতাই হইবে, তাহার যদি থাকিত শুধু আত্মা তবে অবশ্য কোন কথাই ছিল না। কিন্তু সে যে অমর্ত্ত্য ও মর্ত্ত্য, আত্মা ও দেহ এক সঙ্গে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পথ, জ্ঞানীরও পথ হইতেছে যুগপৎ পৃথিবী ও স্বর্গের সেবা করা, আত্মার ও দেহের তৃপ্তিসাধন করা—একসাথেই ভিতর ও বাহিরকে, উপর ও নীচকে গড়িয়া তুলা। ভিতর বাহিরকে সৃষ্টি করিতেছে, অধ্যাত্মবাদীর এই মহান সত্য হইতে মহত্তর—বৃহত্তর সত্য হইতেছে ভিতর ও বাহির একসঙ্গেই সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে, উভয়েরই মধ্যে উভয়কেই ঘিরিয়া রহিয়াছে যে একটা পূর্ণ অখণ্ড সমগ্র কিছু তাহারই প্রেরণায়। আত্মা শরীরকে গড়িয়াছে, এ সত্য হইতে গভীরতর সত্য হইতেছে আত্মা ও শরীর দুইটিই আর একটি তৃতীয় জিনিষের বিভূতি যাহা 'পূর্ণস্য পূর্ণং' —গীতা যাহার নাম দিয়াছে 'পুরুষোত্তম', বেদ যাহাকে বলিয়াছে পিতার পিতা পিতুষ্পিতা। কারণ, এমন কাল যেমন ছিল না, থাকিতে পারে না যখন শুধু শরীরকেই, পাই, আত্মার অস্তিত্ব কিছু পাই না, সেই রকম এমন কালও নাই, থাকিবে না যখন দেখি আছে আত্মা, শরীর নাই। শরীর যেমন পরে ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে আত্মাকে গড়িয়া তুলে নাই, আত্মাও তেমনি পরে শূন্য হইতে শরীরকে গড়িয়া ধরে নাই। এক অখণ্ড সত্তায় পরস্পর পরস্পরের সহিত বিধৃত, সৃষ্টির এক অখণ্ড আবেগ উভয়কে নিত্য প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছে।

তাই বলিয়া ঐ দুএর মধ্যে যে পার্থক্য নাই তাহা নয়। পার্থক্য আছে, কিন্তু এ পার্থক্য অর্থে এমন নয় যে উভয়ে একান্ত বিসম্বাদী, উভয়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, এক সঙ্গে তাহারা থাকিতে পারে না। পার্থক্য এই যে একটির মধ্যে মৌলিক বস্তুটির যতখানি জাগ্রৎ প্রকাশ হইয়াছে আর একটির তাহা হয় নাই, হইতে চলিয়াছে মাত্র। কিন্তু তবুও উভয়ের মূল্য সমান, উভয়ের উপরই সমান জোর দিতে হইবে।

শুধু উভয়ের ধর্ম্মগত পার্থক্য অনুসারে জোরও দিতে হইবে পৃথক রকমে। ভিতরের যে জোর তাহা ভিতরেরই অর্থাৎ ভাব-গত, সেইসঙ্গে বাহিরের একটা সাধনা একটা কর্ম্ম চাই যেটা বস্তুগত। এই দুইকে সর্ব্বদা মিলাইয়া ধরিয়া চলিতে হইবে, দেখিতে হইবে ভিতরটি কতখানি মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিতেছে বাহিরে, বাহিরের মধ্যে কতখানি ফুটিয়া উঠিতেছে ভিতরের প্রভা।

সুতরাং যখন বলি যাও ভিতরে, দূরে অজানায় শিখর-ভাগে, তার অর্থ এমন নয় যে যতক্ষণ তাহা হইতেছে না ততক্ষণ বাহিরের কাছের জানার প্রতিষ্ঠার জিনিষ সব ভুলিয়া যাও বা অবজ্ঞা কর। তাহা নয়, খণ্ড জিনিষ স্থূল জিনিষ লইয়াই থাক; কারণ, জীবনটি এ সকলেরই সমষ্টি, কার্য্য-ক্ষেত্রে এ সকল লইয়া থাকিতে হইবে—নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। কিন্তু দেখ তাহার মধ্যে বৃহতের সূক্ষ্মের প্রভাব জাগিয়া উঠিতেছে কি না, তাহারা ইহাদেরই বিগ্রহ হইতেছে কি না। অন্তরের সাধনা কর, কিন্তু তাহার যেন গতি হয় বাহিরের দিকে, বাহিরের সাধনা কর তাহার যেন মুখ থাকে ভিতরের দিকে, এই যুগল সাধনা যুগপৎ চাই। মানুষের খণ্ডতা চায় এক সময়ে একটিকেই ধরিয়া চলিতে, কিন্তু উহারা যে কখনো একটি ছাড়া আর একটি থাকিতে পারে না, উহাদের কেহই পূর্ব্বে, কেহই পরে নয়—

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গ্রভীতোঽমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা সযোনি।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা ন্যন্যং চিক্যুর্ণ নি চিক্যুরন্যং॥

নীচ চলিয়াছে উপরের দিকে আপন স্বধর্ম্মের অটুট আবেগে, অমরের প্রতিষ্ঠান মরেরই সহিত একাধারে। অনাদি অনন্ত কাল ধরিয়া উহারা একসাথে চলিয়াছে, দুই জনে দুই ভঙ্গিমায়। লোকে কিন্তু এটিকে জানিলে ওটিকে জানে না, আবার ওটিকে জানিলে, এটিকে জানে না।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

খেলাঘর

তৃতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য—হেমন্তর কক্ষ। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে]

নীরদা। (গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন) সমস্ত দিন বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বল্‌ছে। আর কতক্ষণ এমন করে কাটবে? বড় জোর দু ঘণ্টা—! তারপর—?

(লীলাবতী প্রবেশ করিলেন। নীরদা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।)

কে ও? লীলাদি? কিছু করে আসতে পারলে?

লীলাবতী। তার দেখা পেলুম না। তবে চিঠি লিখে তার টেবিলের উপর রেখে এসেচি। সে ফিরে এলেই পাবে।

নীরদা। হুঁ।

লীলাবতী। উনি বোধ হয় চিঠিখানা এখনও খোলেন নি?

নীরদা। না। ঐটুকু এখনও যা ভরসা। গান গেয়ে প্রথমটা ভুলিয়ে রেখে ছিলুম। তারপর ঘর থেকে বার হতেই বন্ধুরা এসে পাকড়াও করলে। তাই আর চিঠি খোলবার অবসর পান নি। তার পর এতক্ষণ ত এই খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিল, এখন বাইরে, বসে গল্প কচ্ছেন। এইবার সকলে চলে গেলে শোবার আগেই চিঠি বার করবেন। এবার ত আর ভুলোতে পারা যাবে না। আচ্ছা দিদি, তুমি তবে এখন শীগ্‌গির খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও গে। উনি হয়ত এখনি এসে পড়বেন। অদৃষ্টে আমার যা আছে, তাই হবে, আর ভাবতে পারি না। তুমি যাও।

লীলাবতী। কিন্তু আমার কথা যদি শোন ভাই, তাহলে এ সব-কথাই কিন্তু ওঁকে জানানো ভাল। তাতে তোমার মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না।

নীরদা। (হতাশভাবে চাহিয়া) হুঁ—তা জানি।

লীলাবতী। তা হলে এ চিঠিখানার জন্য অত ব্যস্ত না হলেও চলে। কামিখ্যেকে আমি ঠিক করে নেব—সে জন্যে কোন ভাবনা নেই।

নীরদা। তুমি বড় ভাল, দিদি, কিন্তু কি হবে এত কথা বলে! আমি যা করব, তা ঠিক করে নিয়েছি।

(হেমন্ত প্রবেশ করিলেন)

হেমন্ত। (লীলাবতীর প্রতি) এই যে আপনি! এতক্ষণ কোথা ছিলেন? নীরো আজ কি চমৎকারই গান শোনালে! কিন্তু আমি একাই শুনলুম, আপনি থাকলে আরও আমোদ হ'ত। আচ্ছা, আর একদিন তখন হবে। কি বল নীরো?

নীরদা। আজ আপনার জন্যই এই আয়োজন—আপনি শুনেছেন, তাহলেই সব সার্থক হয়েচে। নীরদা, আজ তবে ভাই চল্লুম। তুমি বেশ চেপে-চুপে চলো—কোন কাজে বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বুঝলে?

হেমন্ত। হ্যাঁ, ওই কথাটিই ওকে ভাল করে বলে যান ত।

লীলাবতী। আজ তবে আসি। নমস্কার।

[নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন]

হেমন্ত। (নীরদার পার্শ্বে বসিয়া) আজ সমস্ত দিন তোমার ভারী খাটুনি গেচে।

নীরদা। নাঃ, তেমন আর কি!

হেমন্ত। বড্ড ঘুম পাচ্ছে বোধ হয়?

নীরদা। মোটে না। বরং আরও ফুর্ত্তি বোধ হচ্চে। তোমাকেই বরং শুক্‌নো দেখাচ্চে—আর দুটো গান শুনবে?

হেমন্ত। সুধায় কার অরুচি, বল? তবে আজ থাক্। তুমি ঘুমোও।

নীরদা। হ্যাঁ, সত্যি আমার বড্ড ঘুম পাচ্চে। আমি শুইগে। শোব কি, মুরুবো!

হেমন্ত। আমি এখনই আস্‌চি।

(উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন)

নীরদা। কোথায় যাচ্চ?

হেমন্ত। চিঠিগুলো আজ বাক্স থেকে মোটেই বার করা হয়নি।

নীরদা। আজ রাত্রে আর নেই বা বার করলে? কাল সকালে দেখো তখন।

হেমন্ত। (চিঠির বাক্সের নিকটে গিয়া) ভয় নেই গো, তোমায় বেশীক্ষণ বিরহ-যন্ত্রণা

ভোগ করতে হবে না। এখনই আমি আসচি। কেবল শুধু চোখ বুলিয়েই রেখে দেব। —এ কি! কে তালা খুলতে গেছলো যে দেখচি!

নীরদা। সে কি?

হেমন্ত। তাইত দেখচি! এর মানেটা কি! ঝী-চাকর অবিশ্যি কেউ সাহস পাবে না!—এই যে একটা চুলের কাঁটা পড়ে রয়েচে! এটা ত দেখ্‌চি, তোমারি মাথার কাঁটা,—না? দেখ দেখি!

নীরদা। (ব্যস্তভাবে) সত্যি নাকি? তাহলে ছেলেরা কেউ নাড়াচাড়া করছিল না ত?

হেমন্ত। ছেলেরা? তাদের ধম্‌কে দিও —আর কখনো না করে। যাক্‌,—তালা খুলে ফেলেচি যা-হোক্‌ করে। ইস্‌, এ-যে এককাঁড়ি চিঠি জমা হয়েচে!

নীরদা। তবে তুমি এখন তোমার চিঠি পড়গে—আমি এই শুলুম। একদিন আমার কথা রাখতে পারো না?

হেমন্ত। কতক্ষণ আর লাগবে! এই এলুম বলে।

[অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন]

নীরদা। (শয্যার উপর নিতান্ত অবসন্ন-ভাবে বসিয়া পড়িলেন) বিদায় প্রিয়তম, আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না—এই শেষ। একটু পরেই ঠাণ্ডা, অবশ হয়ে সব ফুরিয়ে যাবে—ছেলেদের একবার শেষ দেখা দেখতে সাধ হয়, দেখে আসি—বাছারা আমার এই পাশের ঘরেই শুয়ে ঘুমুচ্চে। আহা, কিছু জানে না তারা, যাই একবার। (উঠিলেন) না,—ওদের ছোঁব না—বাছাদের সর্ব্বনাশ করব না—ছুঁত্‌ লেগে যাবে।—এতক্ষণে উনি চিঠি খুলেচেন—পড়চেন নিশ্চয়। এখনি যদি এসে পড়েন?—না, আর দেরী করা নয়!—মায়া! কিসের মায়া? (দীর্ঘনিশ্বাস) ওই যে কার পায়ের শব্দ পাচ্চি না? সর্ব্বনাশ! দুম্‌ দুম্‌ করে এই দিকেই যে আস্‌চে। ওই যে এসে পড়ল বলে!—কি করি এখন?—যাই, পালাই—

[নীরদা বেগে বাহির হইতে যাইতেছিলেন; এমন সময় হেমন্ত একখানা খোলা চিঠি হস্তে প্রবেশ করিলেন]

হেমন্ত। (কর্কশ কণ্ঠে) নীরদা—

নীরদা। ওঃ!

হেমন্ত। এ চিঠিখানা কি, জান?

নীরদা। জানি—যেতে দাও, আমায় বাইরে যেতে দাও।

হেমন্ত। (পথ রোধ করিয়া) না, দাঁড়াও। কোথায় যাবে, হতভাগিনি—

নীরদা। (বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতে করিতে) আর আমায় কিন্তু বাঁচাতে পার না!

হেমন্ত। সত্যি কি এ কথা!—যা আমি এই চিঠিতে পড়চি?—কি ভয়ঙ্কর! বল, বল, না,—অসম্ভব—এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

নীরদা। হ্যাঁ সত্যি। ওগো, তোমায় যে আমি ভাল বাসতুম—জগতের সকল বিপদ তুচ্ছ করে ভালবাসতুম।

হেমন্ত। রাখ তোমার ও সব বাজে কথা।

নীরদা। সর—পথ ছাড়।

হেমন্ত। ছিঃ! এ তুমি কি করেচ?

নীরদা। দাও আমায় চলে যেতে দাও। আমার জন্যে তুমি কেন কষ্ট পাবে—তুমি কেন এ নিয়ে ব্যস্ত হচ্চ?

হেমন্ত। রেখে দাও ও-সব কাব্যের কথা! কোথায় যাবে তুমি? (ভিতর দিক হইতে দরজায় তালা বন্ধ করিলেন) দাঁড়াও ওখানে। এ যা তুমি করেচ তার কৈফিয়ৎ দাও।—তুমি কি করেচ, তা বুঝতে পারচ কি? বল—জবাব দাও—কি করেচ বল।

নীরদা। (শুষ্ক দৃষ্টিতে হেমন্তর দিকে চাহিয়া রহিলেন) হ্যাঁ পারচি—বুঝতে একটু-একটু পারচি।

হেমন্ত। (কক্ষের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে) কি ভয়ঙ্কর এ! উঃ! অ্যাদ্দিনে আমার চোখ্ খুললো। এই আট বছর ধরে যে আমার চিন্তায় সুখ, হৃদয়ের আনন্দ তার মনের ভিতরে এত! সে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, জালিয়াৎ! কি লজ্জা—কি ঘৃণা—কি কুৎসিত! এ রকম একটা-কিছু যে ঘটবে, তা যেন আমার মন বলে দিচ্ছিল। যে বাপের মেয়ে তুমি—ব্যস্, চুপ করে দাঁড়াও—বাপের সব গুণগুলিই পেয়েছ! ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান ছিল না—বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল না—কোন রকম কাণ্ডজ্ঞান ছিল না, তাঁর। সে দিকে দৃষ্টি না করে আমি এখন কি সাজাটাই পেলুম। আমি তোমারই জন্যে সে সব খেয়ালও করিনি! আর তুমি এই রকমে তার শোধ দিলে?

নীরদা। ঠিক বলেছ তুমি! আমার অপরাধের সীমা নেই।

হেমন্ত। তুমি এখন আমার সুখশান্তি সব নষ্ট করে দিলে—তোমা হ'তে আমার উন্নতির পথও বন্ধ হল। কি ভয়ঙ্কর! ভাবতে গা শিউরে ওঠে। এখন আমি কিনা কামিখ্যের মত একটা ধাপ্পাবাজ জোচ্চোরের বাধ্য হয়ে পড়লুম! সে এখন আমায় নিয়ে যা ইচ্ছে করে নিতে পারে—হুকুম পর্য্যন্ত চালাতে পারে···আমার টুঁ করবার ক্ষমতাও নেই। তার হাতে আজ খেলার পুতুল আমি! আমার এই দুর্দ্দশা—এই শোচনীয় পরিণাম হল কেন, না, একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন, একগুঁয়ে স্ত্রীলোকের দুর্ব্বুদ্ধির জন্যে—

নীরদা। ওগো, আমি ত চলেই যাচ্ছি, তবে আর তোমার এ জন্যে ভুগতে হবে কেন?

হেমন্ত। চুপ্, এ-সব ছেঁদো কথা আমি শুনতে চাইনে। তোমার বাবারও ও-ধরণের কথার পুঁজি ঢের ছিল। তুমি বলছ, চলে যাবে—কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হবে, শুনি?—এতটুকু লাভ' নেই। যার কাছে ইচ্ছে এ কথা সে রাষ্ট করবে—তখন সবাই ভাববে, আমিও এর মধ্যে ছিলুম—আমারই ইঙ্গিত-মত তুমি এ কাজ করেছিলে, আর আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই আড়ালে ছিলুম। তুমি বুঝতে পারচ কি নীরদা, কি সর্ব্বনাশটাই আমার তুমি করেচ?

নীরদা। হ্যাঁ। তখন বুঝিনি যে—

হেমন্ত। শোনো, এর প্রতিবিধান করতেই হবে—আমার এ দুর্নাম কিছুতেই আমি রাষ্ট হ'তে দেব না। খুলে ফেল তোমার ঐ সাজ-সজ্জা—খুলে ফেল এখনই। এস, এখন একটা পরামর্শ করি। লোকটাকে যে-কোন রকমে হোক ঠাণ্ডা করতেই হবে—যত টাকা

চায় সে, দিয়ে একটা মিট্‌মাট করে ফেলতে হবেই। আর তারপর তোমায় আমায়? যেমন ছিলুম, জগতের চোখে ঠিক তেমনিই থাক্‌ব। তুমি এই বাড়ীতেই থাকবে—যেমন ছিলে, কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা রকমে। ছেলে-মেয়েদের ছুঁতে পাবে না—তোমার কাছে তাদের রেখে আর আমার বিশ্বাস নেই। কি আপ্‌শোষ! এমন কথাও আমায় বলতে হ'ল! যাকে আমি এত ভাল বাসতুম,—এখনো যাকে—না, আর না, সব ফুরিয়ে গেছে। এই মুহূর্ত্ত থেকে ভালবাসার কথা—সুখের কথা আস্‌তেই পারে না আর। কেবল কোনরকম করে বাইরের আবরণটা রাখতে হবে আর কি!

(বাহিরের দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হইল)

এত রাত্রে আবার কে? সেই পাজিটা নয় ত? হ'তে পারে। নীরদা, কোন জবাব দিও না—শুয়ে পড় তুমি—বলো, অসুখ করেছে।

(নীরদা কাষ্ঠপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়াই রহিলেন—হেমন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলিলেন। ঝী আসিয়া দেখা দিল)

ঝী। চিঠি।

হেমন্ত। (ব্যস্তভাবে) দাও, আমায় দাও। যাও তুমি।

(দরজা বন্ধ করিলেন)

হ্যাঁ, তার কাছ থেকেই ত! না, তুমি না—আমিই পড়ব। কি লিখেছে দেখি আবার—পাজি,—বদ্‌মায়েস্!

নীরদা। তুমিই পড়।

হেমন্ত। চিঠিখানা খুলতে কিন্তু হাত কাঁপ্‌চে। না জানি, আবার কি সর্ব্বনাশের কথা এতে আছে। না, তবু পড়তেই হবে।

(চিঠি খুলিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উপর হইতে নীচে চোখ বুলাইয়া লইলেন। চিঠির সঙ্গে আর একখানা কাগজ গাঁথা ছিল, সেখানার দিকে চাহিয়া সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন)

নীরদা। (নীরদা সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন)

হেমন্ত। না, আর একবার পড়ে দেখি—হ্যাঁ সত্যিই বটে, কাগজখানা সে ফেরত্‌ দিয়েছে—আসলখানা। আঃ, বেঁচে গেলুম আমি—বেঁচে গেলুম—

নীরদা। আর আমি?

হেমন্ত। তুমিও অবিশ্যি। তুমি আর আমি দুজনেই বেঁচে গেলুম। এখন আর কেউ কিছু কর্‌তে পারে না। নীরদা, নীরদা—না—আগে এই লক্ষ্মীছাড়া কাগজ-খানাকে পুড়িয়ে ফেলি, তারপর অন্য কথা। আচ্ছা, পঁড়ে দেখি একবার কাগজখানা—

(কাগজখানার দিকে চাহিয়া)

না, না—ভারী কুৎসিত—ভারী বিশ্রী এ—এ আমি পড়তে পার্‌বো না—তা'হলে একটা বিশ্রী দাগ আমার মনে লেগে যাবে।

(খণ্ড খণ্ড করিয়া কাগজখানা ছিঁড়িয়া আলোয় ধরিলেন। যতক্ষণ সেটা পুড়িতে লাগিল, ততক্ষণ সেদিকে উভয়ে চাহিয়া রহিলেন)

যাক্—আর ভয় নেই। দেখ, নীরদা, ও লিখেছিল যে আজ সকাল থেকে এই ব্যাপার চল্‌চে।—আজ তাহলে সমস্ত দিন তুমি কি কষ্টই না ভোগ করেচ!

নীরদা। (অন্যমনস্ক ভাবে) হুঁ—

হেমন্ত। নিজের আগুনে নিজেই পুড়েচ! কি ভয়ঙ্কর! যাক্, এ সব কথা আর নয়। এখন আমরা নিশ্চিন্ত। এখন আমরা প্রাণ খুলে আমোদ-আহ্লাদ করতে পারি—আর কিসের ভয়! কি বল, নীরদা? শুন্‌চ আমার কথা? আর কোন ভয় নেই! কি?—তোমার যে এখনও ভয় কাটেনি, দেখ্‌ছি!—এ কি? অমন করে চেয়ে রইলে যে!—ও নীরো, শুন্‌চ? তোমার সব দোষ ভুলে গেছি—তোমায় আমি ক্ষমা করেচি। এখনো চেয়ে আছ! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?—সত্যি নীরো, তোমায় ক্ষমা করেচি—আর কোন কথা আমার মনে নেই। আমি এখন বেশ বুঝতে পার্‌চি, আমার প্রতি ভালবাসার দরুণই তুমি এ কাজ করেছিলে।

নীরদা। সত্যিই সে কথা। তুমি বিশ্বাস করেছ? বল, সত্যি বল।

হেমন্ত। বিশ্বাস করেছি। স্ত্রীর স্বামীকে যে রকম ভালো বাসা উচিত, ঠিক সেই রকম ভালোই তুমি আমায় বাস; কেবল তোমার বুদ্ধি তত পরিষ্কার নয় বলেই এই অবিবেচনার কাজ করে ফেলেচ। কিন্তু, তাই বলে কি তুমি ভাবো যে, তোমার এই অল্প বুদ্ধির দরুণ তোমায় আমি কিছু কম ভাল বাসি? না, তা মনেও স্থান দিয়ো না। আর দেখ, আমার উপরেই তুমি এবার থেকে ষোল আনা নির্ভর করে চল। তোমার অকেজোমি আর তোমার নির্ভরতার দরুণ আমার চোখে তাহলে তুমি আরও বেশী সুন্দর হবে। কেমন, বুঝেছ আমার কথা? রাগের ঝোঁকে যা বলে ফেলেচি, সে সব ভুলে যাও। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। আমি তোমায় ক্ষমা করেচি, নীরো, তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি, ক্ষমা করেচি।

নীরদা। তুমি মহৎ।

(ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া একটা দেরাজ খুলিলেন)

হেমন্ত। কোথায় যাচ্চ? কি করচ ওখানে?

নীরদা। (দেরাজ খুলিয়া) কাপড় নিচ্চি।

হেমন্ত। হ্যাঁ, ও কাপড় ছেড়ে ফেল, ঠাণ্ডা হও। ভয় নেই তোমার—আমি থাকতে কিসের ভয় তোমার?

(পায়চারি করিতে লাগিলেন)

আঃ—ঘরটি কি চমৎকার ঠাণ্ডা—বাইরে কিন্তু বড্ড গরম।—মন থেকে সব কথা মুছে ফেলো, নীরো, আর কোন ভয় নেই। একটু স্থির হয়ে ঘুমোও, সকালে উঠে দেখবে, মন একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে। যেমন আনন্দে আমাদের দিন কাটত, তেমনি আনন্দে কাটবে—আজকের এই তর্কাতর্কির কথা মনেও আসবে না। তুমি কি ভাবো, নীরো, তোমায় দুটো কড়া কথা বলেচি বলে আমার মনটা কেমন কচ্চে না? তুমি বোধ হয় জান না, নীরো, যারা খাঁটি মানুষ, তাদের মন কি রকম? স্ত্রীকে ক্ষমা করলে—তার কোন দোষ প্রাণের সহিত মার্জ্জনা করলে, স্বামীর মন কি রকম প্রফুল্ল হয়, তা তুমি

জান না, বোধ হয়। যাক্‌—এর পর, মনে তুমি আর এতটুকুও খোঁচ রেখো না। যখন যা হবে, সব আমায় নির্ভয়ে খুলে বলবে—আমার পরামর্শ-মত চলবে—এ কি! শোবে না?—এ বেশ কেন?

নীরদা। (জিনিষ-ভরা একটি ব্যাগ টেবিলের উপর রাখিয়া)। না, আজ আর শোব না। রাত্রি এখনো বেশী হয়নি। তুমি একটু বসো, কথা আছে।

হেমন্ত। কি কথা আবার!

নীরদা। ওইখানটায় বসো। একটু দেরী হবে—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

হেমন্ত। (অশান্তভাবে উপবেশন করিলেন) তোমায় আমি কখনো বুঝতে পারলুম না।

নীরদা। ঠিক বলেছ। আমায় তুমি সত্যিই বুঝতে পারনি—আর আমিও দেখ্‌ছি, এদ্দিন আমিও তোমায় বুঝতে পারিনি। না, অস্থির হয়ো না। কেবল যা বলি, চুপ করে শুনে যাও। দেখ, আজ আমি আমাদের দেনা-পাওনা শেষ করতে চাই।

হেমন্ত। সে কি?

নীরদা। আমাদের আজ আট বচ্ছর বিয়ে হয়েচে, কেমন?—তোমার কি মনে হয় না, যে, এই আট বছরের ভেতর আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে আজ এই প্রথম ঝগড়াঝাঁটি হলো?

হেমন্ত। ঝগড়াঝাঁটি আবার কিসের?

নীরদা। আজ এই এদ্দিনের ভেতর, কি তারও অনেক আগে—যবে থেকে তোমাতে-আমাতে পরিচয় হয়েচে—আমাদের, দুজনের মধ্যে কখনো কোন বিষয় নিয়ে ছোট-একটা তর্কাতর্কি পর্য্যন্ত হয় নি।

হেমন্ত। সেটা কি ভাল হ'ত মনে কর যে, সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের অভিযোগ আমি তোমায় জানাতুম, আর তুমি তাই নিয়ে বৃথা মন খারাপ করতে—না হয় তর্ক জুড়ে দিতে!

নীরদা। অভাব-অভিযোগের কথা আমি আন্‌চি না। আমি বলতে চাই যে, আমরা এ-পর্য্যন্ত দুজনে একসঙ্গে বাস করে কোন বিষয়েরই আগাগোড়া বুঝে দেখবার চেষ্টাও করিনি।

হেমন্ত। তা বুঝে কি লাভ হত?

নীরদা। ঠিক বলেচ। কোন দিনই তুমি আমার কথা বোঝনি। দুজন তোমরা আমার সম্বন্ধে বরাবরই মস্ত ভুল করেচ—বাবা আর তুমি!

হেমন্ত। কি বল্লে! আমরা ভুল করেচি—যারা দুজন পৃথিবীতে সব-চেয়ে তোমায় ভাল বাসত!

নীরদা। (ঘাড় নাড়িয়া) আমায় তুমি কোন দিনই ভাল বাসনি—কেবল আমার প্রতি ভালবাসা দেখাতে মাত্র—তাতেই তোমার আনন্দ ছিল।

হেমন্ত। এ-সব কি কথা শুন্‌চি নীরো, তোমার মুখে?

নীরদা। যা শুনচ, সব সত্যি—খাটি সত্যি। যখন বাবার কাছে থাকতুম, তিনি সব-তাতে নিজেরই মতামত বলে যেতেন। আমিও তাঁরই মতে মত দিতুম। নিজের স্বাধীন ইচ্ছা কিছু জানাতে গেলেই, তা তাঁর পছন্দ হ'ত না; কাজেই চুপ করে যেতুম।

বাবা আমাকে তাঁর খেলার পুতুল বলতেন। আমায় নিয়ে তিনি ঠিক তেমনি ভাবেই চলতেন,—যেমন আমিও তখন নিজের পুতুল-গুলি নিয়ে খেলা করতুম—তারপর যখন সেখান থেকে তোমার কাছে এ বাড়ীতে এলুম—

হেমন্ত। আমাদের বিয়ের কথা বলচ তুমি?

নীরদা। হ্যাঁ—আমি বলছিলুম যে, কেবল হাত বদ্‌লান হলো এই আর কি! তাঁর হাতে ছিলুম, তারপর তোমার হাতে এলুম—তফাৎ কেবল এইটুকু। যাক্, তখন তুমি নিজের পছন্দ-সই সকল রকম ব্যবস্থা করে ফেল্লে। আমিও বাবার কাছে যেমন ছিলুম, তোমার কাছে ঠিক তেমনিই রইলুম, অর্থাৎ তোমার মতেই মত দিয়ে যেতে লাগলুম। কোন বিষয়ে দুজনের মতামতের পার্থক্য হলেও বাধ্য হয়ে আমায় তোমারই মতে সায় দিতে হয়েছে। এই রকমে সারাটা জীবন কি আমাকে নিজের সঙ্গে আর তোমার সঙ্গে ছলনা করে আসতে হয় নি? পিছন ফিরে যখনি চাই, তখন কি দেখি, জান? দেখি যে তোমার সংসারে কেবল এক মুঠো পেটের ভাত আর একখানা পরবার কাপড় পেয়েই সন্তুষ্ট থেকে, সামান্য একটা দাসীর মত আমাকে এতদিন কাটাতে হয়েছে,—আর তোমার মনের সঙ্গে চাতুরী করতে হয়েছে। বাবা আর তুমি দুজনেই আমার সম্বন্ধে ভয়ানক অন্যায়, ভয়ানক অবিচার করে এসেচ—শুধু তোমাদেরই দোষে আমি জীবনে কোন কাজ করতে পারিনি। কোন কাজ করবার যোগ্যতাও আমার হয় নি!

হেমন্ত। তোমার পেটে এত! নীরদা, এ কি বলছ তুমি? তুমি কি এখানে সুখে ছিলে না?

নীরদা। একদিনের জন্যেও নয়। আমি মনে করতুম, আমি সুখী, কিন্তু সত্যি তা নয়!

হেমন্ত। সুখী ছিলে না তাহলে?

নীরদা। না। সুখ কাকে বলে?—আমোদে ছিলুম মাত্র। অনুগ্রহ তুমি আমার উপর যথেষ্টই করতে, সে কথা চিরদিন বলব। অনুগ্রহে কোনদিন ত্রুটি হয়নি। কিন্তু আমাদের এই গেরস্থালীটা খেলাঘরের চেয়ে কি কোন বিষয়ে তফাৎ ছিল, বলতে চাও? আমি ছিলুম তোমার পুতুল-স্ত্রী—বাড়ীতে বাবার যেমন আমি খেলার পুতুল ছিলুম, ঠিক তেমনি!—আর আমাদের ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট পুতুল! আমি ছেলেদের নিয়ে খেলা করলে তারা যেমন আমোদ পায়,—তুমি আমায় আদর জানালে আমিও সেই রকম আমোদ পেতুম। এই আমাদের বিবাহ—এই ছিল আমাদের সংসার!

হেমন্ত। যা তুমি বলচ, তা অনেকটা সত্যি—যদিও তুমি নিজের মতটা টেনেটুনে বাড়িয়ে বলে যাচ্ছ। তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পেরেচি। এখন থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ সংসার অন্য রকমের হবে। খেলার সময় কেটে গেল—এইবার পড়া আরম্ভ।

নীরদা। কার পড়ার সময়?—আমার, না ছেলেদের?

হেমন্ত। ছেলেদের আর তোমারও।

নীরদা। হায়, তোমার স্ত্রী হবার উপযোগী শিক্ষা আমাকে দেবার যোগ্য পাত্র তুমি হ'তে পার না!

হেমন্ত। এই কথা তুমি বলচ!

নীরদা। আর আমি!—আমিই বা ছেলেদের লালন-পালন করবার কি শিক্ষা দেবার উপযুক্ত কি-করে হ'তে পারি?

হেমন্ত। কেন নীরদা?

নীরদা। তুমি নিজেই না এই মাত্র বলেচ—এই একটু আগে—যে, ছেলেদের আমার হাতে দিয়ে তুমি বিশ্বাস করতে পার না?

হেমন্ত। রাগের মাথায় বলেচি সে কথা। ওই কথাটাই অত মনে করচ কেন, নীরদা?

নীরদা। না—, তোমার কথাই ঠিক। ও কাজের যোগ্য পাত্রী আমি নই। তার আগে অন্য কাজ আমায় করতে হবে। আমার নিজেরই প্রথমে শিক্ষার দরকার—কিন্তু তোমার দ্বারা ত সে কাজ হ'তে পারে না। সে কাজ আমি নিজে-নিজেই করব, আর এইজন্যে—কেবল এই জন্যেই—তোমার কাছ থেকে আমি এখন চলে যাচ্ছি।

হেমন্ত। (লাফাইয়া উঠিয়া) কি বল্লে?

নীরদা। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াব আমি। তা নইলে নিজেকে বুঝব কেমন করে—অপরকে নিজের কথা বোঝাব কি করে? কেবল এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আর আমি থাকতে পাচ্ছি না!

হেমন্ত। নীরো—

নীরদা। শোনো, এই মুহূর্ত্তে আমি তোমার বাড়ী থেকে চল্লুম। লীলাদিদির কাছে আজকের রাত্রিটা কাটিয়ে দিতে পারব।

হেমন্ত। তোমার এখন মতি স্থির নেই। কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না—তোমায় আমি যেতে দেব না।

নীরদা। কোন ফল হবে না আর আমায় রুখে। আমার যা নিজস্ব, তাই মাত্র আমি নিয়ে চল্লুম। তোমার জিনিষ কিছুই নিলুম না—এখনও নিলুম না—পরেও নেব না।

হেমন্ত। এ কি পাগলামি করছ নীরো?

নীরদা। পাগলামি নয়, এই ঠিক কথা। কাল সকালে আমি নিজের বাড়ীতে গিয়ে উঠবো—আমার বাপের বাড়ীতে। কোন কষ্ট হবে না সেখানে।

হেমন্ত। নির্ব্বোধ তুমি!

নীরদা। এবার থেকে বুদ্ধি হবে—তা হলেই চোখ খুলবে। সেইজন্যেই যাচ্ছি।

হেমন্ত। তোমার স্বামীকে ত্যাগ করে? ছেলে-মেয়ে, নিজের ঘর সব ত্যাগ করে?—এ কি রকম বিবেচনার কাজ, নীরদা? লোকে কি বলবে, তা ভেবেচ?

নীরদা। লোকে কি বলবে, সে ভাববার আমার অবসর নেই। আমি কেবল বুঝতে পারচি যে এইটিই আমার করা দরকার।

হেমন্ত। অর্থাৎ সংসারে সব-চেয়ে যা পবিত্র, যা-কিছু ধর্ম্ম-সঙ্গত, সেই সব ত্যাগ করে তুমি যাবে নিজের স্বেচ্ছাচারিতা সাধন করতে!

নীরদা। সব-চেয়ে পবিত্র, সব-চেয়ে ধর্ম্ম-সঙ্গত আমার কোন্ কাজ, শুনি!

হেমন্ত। তাও বলে দিতে হবে? স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য, ছেলে মেয়ের প্রতি কর্ত্তব্য, এই সব—

নীরদা। কিন্তু, তারই মত পবিত্র কাজ যে আরও আমার আছে।

হেমন্ত। কি তা শুনি।

নীরদা। আমার নিজের প্রতি কর্ত্তব্য।

হেমন্ত। কিন্তু তা হলেও তুমি স্ত্রী! সন্তানের জননী! স্ত্রীর কর্ত্তব্য—জননীর কর্ত্তব্য যে সব কর্ত্তব্যের উপর।

নীরদা। এখন আর এ-সব আমি বিশ্বাস করি না—ধর্ম্ম জিনিষটাও আমি কোনদিন বুঝতে পারলুম না। সব গোল হয়ে যায়। আমি এখন কেবল এইটুকু বুঝি, যে নিজের হিতাহিত বুঝে আমি চলব—নিজেকে বোঝবার চেষ্টা করব। লোকে কি বলবে বা ভাববে, সে সবে আমার প্রয়োজন নেই। মানুষের গড়া আইন জিনিষটাও আমি বুঝতে পারি না। আইন সম্বন্ধে আমার ধারণা যা ছিল এখন তা বদলে গেছে। মরণাপন্ন বাপের মুখ চেয়ে কাজ করবার অধিকারে কি স্বামীর প্রাণ রক্ষা করবার অধিকারে যে আইন বাধা দেয়, সেটা অন্যের কাছে আইন বলে গ্রাহ্য হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়—আমি তাকে আইন বলে মানতেই পারি না।

হেমন্ত। অবুঝের মত কথা কইচ তুমি, তোমার দেখ্‌চি বুদ্ধি-ভ্রম হয়েচে।

নীরদা। এর চেয়ে পরিষ্কার বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়ে আর কখনো কথা কই নি।

হেমন্ত। তাহলে পরিষ্কার বুদ্ধি-বিবেচনা নিয়েই তুমি তোমার স্বামী, পুত্র-কন্যা, গৃহ, সব পরিত্যাগ করে চল্লে?

নীরদা। হ্যাঁ।

হেমন্ত। এ কথার তাহলে কেবল একটি মাত্র কৈফিয়ৎ আছে।

নীরদা। কি সে?

হেমন্ত। তুমি আর আমায় ভালবাস না?

নীরদা। না—

হেমন্ত। এই কথা তুমি আমায় বলতে পারলে, নীরদা?

নীরদা। বুক ফেটে গেল বলতে। কিন্তু কি করব, উপায় নেই। না, আমি আর তোমায় ভালবাসি না।

হেমন্ত। এইটিই তাহলে কবুল জবাব?

নীরদা। হ্যাঁ, অতি সহজ-পরিষ্কার জবাব, স্পষ্ট সত্য কথা। এইজন্যেই ত আমি এখানে আর থাকতে পারি না।

হেমন্ত। বলতে পার নীরদা, কি অপরাধ আমি করলুম যে তোমার ভালবাসা তুমি কেড়ে নিলে?

নীরদা। পারি বলতে। আজ রাত্রেই যখন এই ঘটনা ঘটল, আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখলুম যে, সে মানুষ ত তুমি নও, যা তোমায় জেনেছিলুম, দেখেছিলুম—

হেমন্ত। বুঝলুম না তোমার কথা। স্পষ্ট করে বল।

নীরদা। এই দীর্ঘ আট বৎসরের ভিতর কখনো আমি অধীর হই নি, কারণ এমন আশ্চর্য ব্যাপার নিত্য দেখা যায় না। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা যখন এসে উপস্থিত হল, ভাবলুম, আমার ভাগ্যে এইবার হয়ত

আশ্চর্য্য কিছু ঘটে যাবে। হ'লও তাই। কামিখ্যের চিঠিখানা যখন ওখানে পড়েছিল, তা দেখে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভাবতে পারিনি যে তুমি ঐ লোকটার ধম্‌কানিতে এত ভয় পাবে, তার অসঙ্গত কথাগুলোকে সত্যি বলে মনে নেবে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম যে, তুমি জোর গলায় সে লোকটাকে শুনিয়ে দেবে, "যাও তুমি, জগৎময় রাষ্ট করগে এই কথা"; তার পর সত্যি-সত্যি যদি সে রাষ্ট করে দিত, তখন—

হেমন্ত। তখন আর বাকী থাকত কি, বল? আমার স্ত্রীর দুর্নাম ত ঢাকা থাকত না।

নীরদা। যদিই সে রাষ্ট করে দিত, আমি ভেবেছিলুম, তুমি নিশ্চয় বুক ফুলিয়ে অগ্রসর হবে আর সমস্ত ব্যাপার নিজের ঘাড়ে নিয়ে জোর-গলায় বলবে যে তুমিই দায়ী।

হেমন্ত। নীরদা, তুমি কি তা—

নীরদা। বলতে চাও যে আমি তা করতে দিতুম না। সে কথা ঠিক। আমি কখনই তা করতে দিতুম না। কিন্তু তোমার ভাল সম্বন্ধে ধারণা এর চেয়ে আর কি বেশী আমি করতে পারতুম, বল? তোমার সম্বন্ধে উচ্চ-ধারণা পাছে কাজে উল্টো দাঁড়ায়, এই ভয়েই ত আমি ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়বার আগেই সরে যেতে চেয়েছিলুম—কিন্তু তুমিই বাধা দিলে।

হেমন্ত। আমি তোমার জন্যে দিবারাত্র কুলির মত খাটতে পারি—তোমার দুঃখ তোমার অভাব স্বচ্ছন্দে বইতে পারি, কিন্তু নীরদা, আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি দিতে পারি না।

নীরদা। সেই জন্যেই ত এটাকে আমি আশ্চর্য্য ঘটনা বলচি।

হেমন্ত। তুমি কথা কইচ, নেহাৎ ছেলেমানুষের মত।

নীরদা। হ'তে পারে। কিন্তু তুমিও ঠিক সেই মানুষের মত কথা কইচ না ত, যার কাছে আমি এতদিন আত্ম-বিক্রয় করেছিলুম? যে মুহূর্ত্তে তুমি বুঝতে পারলে যে আর তোমার কোন ভয় নেই—আমার দরুণ নয়, তোমার নিজেরই দরুণ—তখনি তুমি কথার সুর ফিরিয়ে নিলে। বুঝতে পারচ আমার কথা? (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আর ঠিক সেই সময়টা আমার চমক লেগে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলুম যে এই আট বচ্ছর যার সঙ্গে আমি ঘর করেচি, এ লোক—সে নয়। কি আপ্‌শোষ! আর এই অপরিচিত লোকের জন্যেই আমি তিনটি সন্তান প্রসব করেচি। ওঃ, ভাবলেও আমার হৃৎকম্প হয়!

হেমন্ত। বুঝলুম তোমার কথা। আমাদের দুজনের মধ্যে একদিনেই একটা মস্ত ব্যবধান এসে পড়েচে, কিন্তু সেটা কি দূর করা যায় না, নীরদা?

নীরদা। আমায় এখন যা দেখচ, আমি আর তোমার স্ত্রী নই!

হেমন্ত। তুমি চলে যাবে?

নীরদা। নিশ্চয়।

হেমন্ত। যাবে, যেয়ো, কিন্তু এখন না। রাত্রিটা এখানে থাকো।

নীরদা। (একখানা চাদর গায়ে জড়াইতে জড়াইতে) পরের বাড়ীতে আমি রাত্রি বাস করতে পারি না। চল্লুম তবে। বিদায়। ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা করা উচিত হবে না। আমি আর তাদের কি কাজে লাগব! তারা ভুল জায়গাতেই রইল।

হেমন্ত। যেখানেই যাও, তুমি আমারই স্ত্রী, এ কথা মনে রেখো। এও তোমারই বাড়ী—সে বাড়ীও তোমার।

নীরদা। জগতের চোখে হ'তে পারে, কিন্তু তোমার-আমার চোখে নয়। তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই রইল না।

হেমন্ত। আমাদের কথা তাহলে তোমার মনেও হবে না?

নীরদা। তা হবে। এই বাড়ীর কথা, তোমার কথা, ছেলেদের কথা সর্ব্বদাই আমার মনে পড়বে।

হেমন্ত। চিঠি-পত্র লিখবে?

নীরদা। না—তুমিও লিখো না।

হেমন্ত। দরকার পড়লে টাকাকড়ি নিতে আপত্তি আছে?

নীরদা। যে পর, তার কাছ থেকে এক পয়সাও নেওয়া দোষের। তোমার কোন জিনিষ আমি নিয়ে গেলুম না। যা নিয়েছি, তা আমার নিজের। (ব্যাগটি হাতে লইয়া) তবে আমি চল্লুম।

হেমন্ত। তা হলে এখন থেকে আমি তোমার কাছে কেবল পরই থাকব? আপনার কি কখনো হব না, নীরদা?

নীরদা। (দরজার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া) ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে যাবে তা'হলে—

হেমন্ত। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, নীরদা?

নীরদা। তুমি আর আমি—দুজনেই আমরা এতদূর বদ্‌লে যাব যে—না, না,—তা হয় না—আশ্চর্য্য বলে জগতে কিছু আছে, তা আর মোটেই আমি বিশ্বাস করি না।

হেমন্ত। কিন্তু আমি করি। বল, বল নীরদা,—দুজনেই আমরা এতদূর বদলে যাব যে—?

নীরদা। যে, আমাদের সত্যিকার বিবাহ হবে, আর আমরা আবার একত্র হব! বিদায় তবে।

(দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন)

হেমন্ত। (কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর বাহিরের দিকে চাহিলেন) নীরদা! নীরদা! চলে গেল—সত্যিই চলে গেল! কি ভয়ঙ্কর!

যবনিকা

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

আধুনিক ভারতের নৈতিক সভ্যতা

(উপসংহার—ফরাসী হইতে)

পূর্ব্ব দুই পরিচ্ছেদে ভারতের নৈতিক সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি, তাহার সারমর্ম্ম সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—উহার সমস্তই একটা বিষম গর্ভযন্ত্রণা, একটা বিশৃঙ্খল গোলমেলে ব্যাপার।

ত্রিশকোটি মনুষ্য। সকল জাতের লোক। সকল ধর্ম্মমত, সকল রকমের ধর্ম্মভাব। জীর্ণকায় শুষ্কচর্ম্ম যোগী স্বপ্নজগতের বাস্তবতা অস্বীকার করিয়া যে যোগানন্দে নিমগ্ন থাকেন সেই যোগানন্দ হইতে পজিটিভিজম পর্য্যন্ত সমস্তই উহার অন্তর্ভূত। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক গঠন; আদিমকালের শাখাবংশ, গোত্র, বর্ণ, বহুপতি-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত পরিবারতন্ত্র, কুলপতি-পদ্ধতিমূলক পরিবারতন্ত্র, অবিভাজ্য সত্বাধিকারমূলক পরিবারতন্ত্র, য়ুরোপীয় ব্যক্তিতন্ত্র। আইন-কানুন, লৌকিক প্রথা, উপস্থিত মতো সদ্যসাধিত সমাজ-সংস্কার। বৈদেশিক অভিভাবক ও শিক্ষকের শিক্ষাধীনে সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রতন্ত্র। অতীতের প্রতি অনুরাগ, অতীতের প্রতি বিদ্বেষ। বিদেশীর প্রতি ঘৃণা, বিদেশীর প্রতি জ্বলন্ত ভক্তি। বিভিন্ন দেশ আছে, মাতৃদেশ নাই; নাই সেই জ্বলন্ত বিশ্বজয়ী দেশানুরাগ, আছে দেশানুরাগের ছায়ামাত্র।

কিন্তু আমরা যদি একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখি ত দেখিতে পাইব, এই গোলমাল ও বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও ভারতীয় সভ্যতা কার্য্যকারণের অকাট্য নিয়মে দিন দিন পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং স্বকীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলিকে য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতেছে। অন্য প্রমাণের মধ্যে ইহা কি আর একটি প্রমাণ নহে যে, জাতি ও জলবায়ু-ঘটিত বিবিধ গৌণ পার্থক্য সত্ত্বেও মানব-সভ্যতা একটিমাত্র এবং সেই সভ্যতার ক্রমবিকাশ নিয়তির ন্যায় অনিবার্য্য?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জলের আল্পনা

এগারো

চাঁদের আলোয় পাপিয়ার প্রাণে কবিত্ব জাগিয়াছে—তাহার সপ্তস্বরের লহরে-লহরে আজ রাতে তাই আকাশ-বাতাস ভরিয়া উঠিয়াছে।

একখানা ইজি-চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় বসিয়া ইন্দুলেখা একমনে পাপিয়ার সেই সুখের গান শুনিতেছিল।

জয়ন্ত নীরবে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

গায়ের উপর ছায়া পড়িতেই ইন্দু বলিয়া উঠিল, "জয়ন্তবাবু বুঝি? আজ সারাদিন

আপনাকে একবারও দেখতে পাই-নি কেন? ঐ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়ুন। শুনুন, পাপিয়া কেমন গান গাইছে! আচ্ছা জয়ন্তবাবু, পাপিয়ার গলায় ষড়জ থেকে নিখাদ পর্য্যন্ত সব স্বরগুলোই বেরোয়—না? দেখুন না, ওর ডাক্ কি ঠিক এমনিতর?" এই বলিয়া ইন্দু সারেগামায় পাপিয়ার নকল করিতে লাগিল,—'সা—আ, রে-এ, গা—আ, মা—আ'—প্রভৃতি!

জয়ন্ত জবাব দিল না।

ইন্দু আশ্চর্য্য হইয়া একবার এদিকে আর-একবার ওদিকে ঘাড় কাৎ করিয়া জয়ন্তকে দেখিয়া বলিল, "উঃ! আজ যে দেখ্‌চি জয়ন্তবাবুর মুখ 'মেঘনাদ-বধ' কাব্যের চেয়েও গম্ভীর! ব্যাপার কি,—কথাও কবেন না বস্‌বেনও না, এ কেমন ধারা!"

জয়ন্ত আস্তে-আস্তে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া চাঁদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিল। তারপর সঙ্কুচিত স্বরে কহিল, "ইন্দু, তোমার হাসি-ঠাট্টা আজ ভালো লাগছে না।"

ইন্দু ভুরু কুঁচ্‌কাইয়া সেই অল্প-আঁধারে জয়ন্তের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কি হয়েছে জয়ন্তবাবু?"

কোনরকম ভূমিকা না-করিয়া জয়ন্ত একেবারে বলিয়া ফেলিল, "দেশ থেকে আমার মা লিখেছেন, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি, তাহলে ত্যাজ্যপুত্র হব।"

জয়ন্তের অগোচরে ইন্দুলেখার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, মাথা হেঁট্ করিয়া সেই চাঁদের আলোয় আপন ছায়ার দিকে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল।

জয়ন্ত আবেগভরে বলিল, "আমার অবস্থা ত বুঝ্‌ছ ইন্দু, তোমাকে যদি বিয়ে করি তাহলে আমাকে খেটে খেতে হবে। এমন গরিবকে তুমি—"

ইন্দু বুঝিল, জয়ন্তের কথার শেষটা কি! হঠাৎ মাথা তুলিয়া সে কহিল, "থাক্, আর বল্‌বেন না। আমাকে কি আপনি এতই নীচ মনে করেন?"

যে দুর্ভাবনাটা এতক্ষণ শক্ত দড়ির মত জয়ন্তের মনটাকে অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দুর এই এক উত্তরেই সে বাঁধনটা ছিঁড়িয়া গেল। হাঁপ ছাড়িয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলিল, "ইন্দু, ইন্দু, আমি ত্যাজ্যপুত্র হ'লেও তুমি আমাকে—"

খুব মৃদু স্বরে ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ।"

জয়ন্ত নন্দিত কণ্ঠে বলিল, "তাহলে সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও তোমার পাশ থেকে আমি এক-পাও নড়্‌ব না!"

ভরা-পূর্ণিমার চাঁদ তখন ইন্দুর মুখের উপরে পরিপূর্ণ লাবণ্যের ধারা ঢালিয়া দিতেছে—তাহার মুখের রঙের সঙ্গে জ্যোৎস্নার রং যেন এক-হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। জয়ন্ত বিভোর হইয়া সেই সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল নীরবে নির্নিমেষ-নেত্রে। ইন্দুর মুখেও আর কথা ফুটিল না।

এরই মধ্যে জগৎবন্ধু যে কখন্ সেখানে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাহা টের পায় নাই!

স্নেহভরে খানিকক্ষণ দুজনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জগৎবাবু শেষটা হাসিয়া বলিলেন, "ইন্দু, জয়ন্ত, তোমরা কি আজকাল

বসে-বসেই ঘুমবার অভ্যাস করেছ? এ অভ্যাস ভালো নয় গো ভালো নয়, কারণ পাশ ফির্‌তে গেলেই পড়ে যাবার সম্ভাবনা!"

তখন তাদের সাড় হইল,—দুজনেই চম্‌কাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

জগৎবাবু বলিলেন, "তোমাদের ঘুমের মাঝখানে আমি একটা মস্ত দুঃস্বপ্নের মত এসে পড়লুম,—নয়?"

জয়ন্ত লজ্জিত ভাবে বলিল, "আপনি এসেছেন আমরা জান্‌তে পারি-নি, ক্ষমা কর্‌বেন।"

—"এতে ক্ষমা করবার কিছু নেই জয়ন্ত! তোমাদের এযে জেগে ঘুমবারই বয়স! যৌবন হচ্ছে একটা দীর্ঘ নিদ্রা—এর স্বপ্ন হচ্ছে চাঁদের আলো, পাখীর গান, ফুলের গন্ধ! যতদিন পার সুখে ঘুমিয়ে নাও—কারণ এমন দিন আসবে যেদিন সংসারের বিষাক্ত দংশনে আচম্বিতে এ নিদ্রা টুটে যাবে, তখন চারিধারে চেয়ে দেখ্‌তে পাবে সুধু ধূ-ধূ কর্‌ছে তপ্ত মরু! সেখানে ভয়ে পাখী ডাকে না, ফুল ফোটে না, জ্যোৎস্নার রস শুকিয়ে যায়! জয়ন্ত, জীবন বড় ছোট—যৌবন আরো ক্ষণিক!"—বলিয়া, জগৎবাবু ইন্দুর পাশে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।......

ইন্দু তাহার পিতার একখানি হাত লইয়া আঙুলগুলি আস্তে-আস্তে টিপিয়া দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ থাকার পর জয়ন্ত বলিল, "জগৎবাবু, আপনার সঙ্গে আজ আমার একটা বিশেষ দরকারি কথা আছে।"

জগৎবাবু জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে অর্দ্ধমুদিত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "জয়ন্ত, তোমরা একালের যুবক, হ'লে কি? আমাদের যখন বয়স ছিল তখন দরকারি কথা কাকে বলে আমরা তা জান্‌তুমই না! এমন-কি বাজে কাজ আর বাজে কথা আমরা এত-বেশী ভালোবাসতুম যে, কর্ত্তাদের দল আমাদের ভবিষ্যতে অন্ধকার ছাড়া আর-কিছু দেখ্‌তে পেতেন না! তোমার ঐ 'বিশেষ দরকারি কথা' শোনবার জন্যে এখন আমার একটুও আগ্রহ নেই, এমন পূর্ণিমাকে তুমি 'দরকারি কথা'র খোঁচায় হত্যা কোরো না এই আমার অনুরোধ!"

—"কিন্তু—"

—"কিন্তু তুমি যদি এখন একটি গান গাও, তাহলে তোমার 'বিশেষ দরকারি কথা'র চেয়ে সেটা আমি বেশী মন দিয়ে শুন্‌ব।"

—"জগৎবাবু, আমি কর্ত্তব্যের জন্যেই আপনাকে এতটা বিরক্ত কর্‌ছি।"

—"তুমি জ্বালালে দেখ্‌ছি! নাও বাপু নাও, এই আমি কাণ খাড়া করে রইলুম—তাড়াতাড়ি তোমার কর্ত্তব্যপালন করে' নাও!"

—"আমার মা চিঠি লিখেছেন, আমি যদি আপনার মেয়েকে বিবাহ করি, তাহলে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির কিছুই আমি পাব না।"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "সে কি! এ বিবাহে কি তাঁর মত্‌ নেই?

—"না।"

জগৎবাবুর সমস্ত অবহেলার ভাব ছুটিয়া গেল। ভালো করিয়া উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, "কেন?"

জয়ন্ত কিছুই লুকাইল না—একে-একে সব কথা খুলিয়া বলিল।

জগৎবাবু অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর ধীরেধীরে বলিলেন, "তুমি এখন কি করবে বলে ঠিক করেছ?"

—"মায়ের কথা মত কাজ-করা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব।"

—"কিন্তু আমি হ'লে এখানে মায়ের কথা-মতই কাজ করতুম্।"

—"বিষয়-সম্পত্তি কি এতই বড়!"

—"না, কর্ত্তব্যের জন্যে।"

—"কিন্তু তাতে কি কর্ত্তব্যপালন হবে জগৎবাবু? আমি যদি এখন গৌরীকে বিবাহ করি, তাহলে অমিও সুখী হব না—সেও নয়!"

জগৎবাবু কোন সাড়া দিলেন না, আবার ভাবিতে লাগিলেন। এমন সমস্যায় তিনি আর কখনো পড়েন নাই!

খানিক পরে বলিলেন, "আমি যদি এখন তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ না দি, তাহলে তুমি ত মার কাছেই ফিরে যাবে?"

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, "না।"

জয়ন্তের মুখের উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাত করিয়া জগৎবাবু বুঝিলেন, এ-কথা তার খাঁটি প্রাণের কথা। ইন্দুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে তখন তাঁহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বারান্দার রেলিংএ ভর্ দিয়া দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া আছে।

জগৎবাবু বলিলেন, "জয়ন্ত, আমার বোধ হয় তোমার মা এতটা কঠিন হ'তে পারবেন না যে, সত্যসত্যই তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করবেন। হয়ত দুদিন পরে তাঁর রাগ পড়ে যাবে, তখন তোমার অবস্থা বুঝে তিনি তোমাকে ক্ষমা করতেও পারেন। সে যাই হোক্—তুমি বিষয় পাও আর না-পাও, আমি তোমার হাতেই ইন্দুকে সঁপে দেব। কারণ, তা ছাড়া আর উপায় নেই, আমার মেয়ের মন ত আমি জানি—সে যে তোমাকে বড় বেশী আপন বলে ভাবে! ওর চোখের জল আমি ত সইতে পারব না!"

জয়ন্তের মনে শেষ যে খট্‌কাটুকু লাগিয়া ছিল, এতক্ষণে তাও ঘুচিয়া গেল।

চেয়ারের উপরে আবার আড় হইয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জগৎবাবু বলিলেন, "আঃ!... ...দ্যাখ জয়ন্ত, এমন যে মূর্ত্তিমান কবিতার মত সুন্দর জ্যোৎস্না, তোমার দরকারি কথার দৌরাত্ম্যে তার অনেকখানি বাজেখরচ হয়ে গেল! সৌন্দর্য্যের অপচয়কে আমি একটা বড় পাপ বলে মনে করি। নাও, শীগ্‌গির একটা গান গেয়ে তোমার পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত কর!"

জয়ন্ত গান ধরিল—জগৎবাবু ঘনঘন ঘাড় নাড়িয়া তারিফ করিতে লাগিলেন। এবং খানিকপরে ঘাড় নাড়া বন্ধ করিয়া বেমালুম ঘুমাইয়া পড়িলেন!

বারো

অন্নপূর্ণা অনেকদিন হইতে বুকের ব্যামোয় ভুগিতেছিলেন। তাঁহার এ অসুখটা মাঝে-মাঝে বেশ আরাম হইয়া যায়, মাঝে-মাঝে আবার চাগাড় দিয়া উঠে। অন্নপূর্ণা যখন-তখন তাই হাসিয়া বলিতেন, "আমার দেহে জীবন আর মরণ দু-ভায়ের মতন

একসঙ্গে বাস কর্‌ছে। ভায়ে ভায়ে যেদিন আর বনিবনাও হবে না, সেদিন আমার এই দেহ-ঘর ভেঙে যাবেই যাবে!"

সংপ্রতি অসুখটার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে।

দুপুরবেলায় অন্নপূর্ণা শুইয়াছিলেন; পাশে বসিয়া গৌরী শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া শুনাইতেছিল। এমনসময় তাঁহার নামে একখানা চিঠি আসিল।

অন্নপূর্ণা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জয়ের চিঠি?"

গৌরী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

অন্নপূর্ণা ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া গৌরীর হাত হইতে পত্রখানা লইয়া খুলিয়া ফেলিলেন।

জয়ন্ত লিখিয়াছে:—

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলুম। কিন্তু মা, আপনি এত-বেশী রাগ করেছেন যে, আপনাদের কুশল-সংবাদ কিছুই দেন-নি; এমন-কি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তেও ভুলে গেছেন। এথেকে আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমি এখনি আপনার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি; এর পর আপনার বিষয় থেকে আমাকে যদি বঞ্চিত করেন, তবে সে আঘাতটা আমার বুকে এর-চেয়ে বেশী নিদারুণ হয়ে বাজ্‌বে না।

জান্‌বেন, আমি যে সঙ্কল্প করেছি, সে সঙ্কল্প এখনো ত্যাগ করি-নি; আপনি আমাকে ত্যজ্যপুত্র কর্‌বেন শুনে আমার সঙ্কল্প আরো দৃঢ় হয়েছে।

আপনার রক্ত আমার গায়ে নেই বলে আপনি আমার রক্তের দোষ দিয়েছেন। দোষ-গুণ জানিনা, কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, আপনার রক্ত যদি সত্যই আমার গায়ে থাকৃত, আমি যদি আপনার পেটের ছেলে হতুম তবে ত্যজ্যপুত্রের কথা নিশ্চয় আপনি মুখের আগেও আন্‌তে পার্‌তেন না! কিন্তু আমার সঙ্গে ত আপনার শোণিত-সম্পর্ক নেই,—আমার মা যে আজ পরলোকে।

গৌরীকে বল্‌বেন, তাকে আমি চিরকাল বোনের মতই ভালোবাস্‌ব। আপনার সম্পত্তি পেয়ে সে যেন আমার অভাব ভুলে আর কারুকে বিবাহ করে' সুখে-শান্তিতে থাক্‌তে পারে; এই আমার প্রার্থনা।

আশা করি, সবাই ভালো আছেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

জয়ন্ত

জয়ন্তের পত্র হাতে করিয়া অন্নপূর্ণা অচল-মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন—বসিয়াই রহিলেন। ডাক্তারের অস্ত্রাঘাতে রোগীর পা-দুটো যখন ছিন্ন হইয়া যায়, রোগী যেমন তখনো ব্যাপারটা বুঝিয়াও সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না যে, তাহার পা আর নাই—তার দেহ এখন একটা অচল মাংসপিণ্ড মাত্র; অন্নপূর্ণার অবস্থাও এখন অনেকটা সেই রকমের! জীবনহীন শবের মত তাঁহার মুখখানা বুকের উপরে এলাইয়া পড়িল এবং সে মুখের দিকে চাহিয়া, পত্রের মর্ম্ম বুঝিতে গৌরীর আর বিলম্ব হইল না। দুইহাতে মাটি আঁক্‌ড়াইয়া হেঁটমুখে সে বসিয়া রহিল।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙিয়া অন্নপূর্ণা ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিয়া উঠিলেন, "জয়ের মুখ থেকে আজ আমাকে এতবড় কথাটা শুন্‌তে

হ'ল! সে ভেবেচে পেটে ধর্‌লে আমি তাকে ত্যজ্যপুত্র কর্‌তে পার্‌তুম না! হা ভগবান, এতদিনেও সে আমাকে চেনেনি, এখনো সে আমাকে বিমাতা বলে সন্দেহ করে! জয়, ওরে জয়, ছেলেরা যখন বড় হয় তখন এম্‌নি করে'ই কি মাকে ভুলে যায় রে!"—অন্নপূর্ণার চোখের পাতা প্রাণের কান্নায় ভিজিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে চোখের জল মুছিয়া অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "নারাণদাসী!"

বাহির হইতে ঝী সাড়া দিল, "ক্যানো মা!"

—"দেওয়ান-মশাইকে ডেকে আন্‌।"

খানিক পরেই দেওয়ান কালীশঙ্কর লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ ও গলা খক্‌খক্‌ করিতে-করিতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। অন্নপূর্ণা বধূবেশে যখন এ বাড়ীতে প্রথম আসেন, তখন হইতেই তিনি এই সাম্‌নের-দিকে-ঝুঁকে-পড়া থুথ্‌ড়ো বুড়ো দেওয়ানটিকে ঠিক এম্‌নি ভাবেই দেখিতেছেন। কালীশঙ্করকে কেউ বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "জমিদারীর হিসাব-নিকাশ করে' এমন সময় পাই না যে, নিজের বয়সের জমাখরচ রাখতে পারি!"—চুলের সঙ্গে কালীশঙ্করের বুদ্ধিটিও এমন পাকিয়া উঠিয়াছে যে, জমিদারীর সমস্ত ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত করিয়া অন্নপূর্ণা নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। দেওয়ান-মশাইকে এ-বাড়ীর বৌ-ঝী কেউই লজ্জা করে না, তাই বাড়ীর যেখানে-সেখানে যখন-তখন তাঁহার পাকা বাঁশের লাঠির ঠক্‌ঠকানি এবং সর্দ্দিভরা গলার খক্‌খকানি শুনিতে পাওয়া যায়।

অনেকগুলো সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া কালীশঙ্কর কিঞ্চিৎ হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। বুকে হাত দিয়া খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়িয়া তিনি বলিলেন, "হঠাৎ ডাক পড়্‌ল কেন মা, তোমার অসুখ কি বেড়েছে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "না। জয়ের চিঠি এসেছে।"

ঘরের মেঝের উপরে হাতের ভর রাখিয়া বসিয়া কালীশঙ্কর বলিলেন, "খোকাবাবু কি লিখেছেন?"

—"গৌরীকে সে বিয়ে কর্‌বে না।"

কালীশঙ্কর খক্‌খক্‌ করিয়া কাশিতে-কাশিতে গৌরীর দিকে করুণ চোখে একবার চাহিয়া দেখিলেন; সে বেচারী তখন আড়ষ্ট-ভাবে বসিয়া-বসিয়া ক্রমেই ঘামিয়া উঠিতেছে!

কালীশঙ্কর হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এবারেও সেই এক কথা! তাঁর মাথায় এমন কুবুদ্ধি কে দিচ্ছে? কি বল মা, একবার কল্‌কাতায় যাব নাকি? তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দেখি, যদি ফিরিয়ে আন্‌তে পারি!"

অন্নপূর্ণা দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "না; আমি উইল কর্‌ব —তারই বন্দোবস্ত দেখুন।"

কালীশঙ্কর ভয়ে-ভয়ে অন্নপূর্ণার পাথরের মত কঠিন মুখের পানে তাকাইয়া খক্‌খক্‌ করিয়া কাশিতে লাগিলেন। উইলে কি থাকিবে তিনি তা জানিতেন।

সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "একবার কল্‌কাতায় গেলে দোষ কি?"

অন্নপূর্ণা কাহারো প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না—অল্পবয়স হইতে কর্ত্তৃত্ব করিয়া করিয়া তাঁহার এম্‌নি স্বভাব হইয়া গিয়াছিল

যে, তাঁহার কথার উপরে কেউ কথা কহিলেই তিনি অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিতেন। কালীশঙ্করের কথায় তাই তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না! জয়কে আমার চেয়ে আপনি কি বেশী জানেন? সে যা ধরেছে তা করবেই!"

কালীশঙ্কর অত্যন্ত দমিয়া গিয়া মুখে হাত-চাপা দিয়া আবার কাশি সুরু করিলেন। তারপর ভয়ে-ভয়ে অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "এ বাড়ীর বংশধর হয়ে শেষটা কি সে পথে বসবে—"

—"হ্যাঁ, আমার পেটের ছেলে হ'লে আজ তাকে একেবারেই পথে বসাতুম! বারবার আপনি এককথা বলছেন, কিন্তু জয় কি লিখেছে জানেন? লিখেছে, আমি তার বিমাতা—তাই—" রাগে দুঃখে অন্নপূর্ণার মুখে আর বাক্য সরিল না।

কালীশঙ্কর কি বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে ক্রমাগতই কাশিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা আপনাকে একটু সামলাইয়া আবার বলিলেন, "সে যদি আমাকে তার নিজের মা বলে ভাবত, তাহ'লে আমি তাকে আমার বিষয়ের একটা কাণাকড়িও দিতুম না। কিন্তু সে এখন আমাকে বিমাতা বলে ভাবে, তাই তাকে আমি একেবারে পথে বসাব না, গৌরীকে অর্দ্ধেক দিয়ে বাকী অর্দ্ধেক বিষয় আমি তাকেই লিখে দেব। সে বুঝুক, আপন মায়ের চেয়ে আমার মত বিমাতার দরদ কত বেশী!—যান, আপনি উইলের বন্দোবস্ত করুন-গে যান!"

কালীশঙ্কর আর কথা কহিতে ভরসা পাইলেন না; আস্তেআস্তে উঠিয়া লাঠি ঠকঠক ও গলা খকখক করিতে-করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণা শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন; তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা আজ আকাশ-কুসুমে পরিণত হইয়া গেল, তিনি আজ একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন; তাঁহার স্পন্দন-রোহিত চোখ ঠেলিয়া আজ যে সজল হাহাকার বাহির হইয়া আসিতেছিল, অনেক কষ্টে তিনি তাহাকে থামাইয়া রাখিলেন।

গৌরীর দিকে ফিরিয়া ব্যথাভরা স্বরে বলিলেন, "গৌরী, মা, আমারও সত্যভঙ্গ হ'ল, তোকেও সুখী করতে পারলুম না। জানিনা এ কার অদৃষ্টের দোষ—তোর, না আমার?"

গৌরীর পাণ্ডুর মুখ ক্রমেই মাটির দিকে নুইয়া পড়িতে লাগিল।

মমতাভরে গৌরীর মাথার উপরে একখানি হাত রাখিয়া অন্নপূর্ণা আবার বলিলেন, "মা, জয়কে তুই ভুলে যা! তার মন কাঁচের মত—তাতে ছায়াই পড়ে, দাগ পড়ে না। নইলে আপন হাতে যাকে মানুষ করেছি, সে আজ আমার আপন না-হয়ে আমারি শত্রু হয়ে দাঁড়াল!"

কাতর নয়নে একবার অন্নপূর্ণার দিকে চাহিয়া, গৌরী আচম্বিতে মেঝের উপরে টলিয়া পড়িয়া গেল!

অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি তাহার দিকে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "নারাণদাসী, অ নারাণদাসী, শীগ্‌গির একঘটি জল নিয়ে আয়—শীগ্‌গির! গৌরী অজ্ঞান হয়ে গেছে—নারাণদাসী, নারাণদাসী!"

তেরো

স্বর্ণেন্দু আজকাল জয়ন্তের সঙ্গে বড়-বেশী ঘনিষ্ঠতা সুরু করিয়াছে—সকাল দুপুর বিকাল সন্ধ্যা সব-সময়েই যখন-তখন সে জয়ন্তের বাসায় আসে-যায়, গান শোনে, গল্প করে। তাহাকে হঠাৎ স্বর্ণেন্দুর এতটা পছন্দ হইল কেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া না-পাইয়া জয়ন্ত মনেমনে একটু আশ্চর্য্য হইত। বাস্তবিক, জয়ন্তকে দেখিলেই যে-স্বর্ণেন্দু মুখ গোমড়া করিয়া থাকিত, সেই-স্বর্ণেন্দু আজকাল তাহার সঙ্গে যেমন দরাজ প্রাণে মিশিতেছে সেটাকে পূরোদস্তর মোসাহেবী ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না।

আরো-বিচিত্র এই যে, স্বর্ণেন্দুর বেচাল দেখিলে জয়ন্ত আগেকার মতই নির্দ্দয়ভাবে তাহার প্রতি চোথাচোথা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে, তবু কিন্তু তাহার মুখে আহত হইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না।

এই গেল-কাল সে এক রাজা-উজির-মারা গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছিল এবং বলা বাহুল্য, সে গল্পের নায়ক হইয়াছিলেন তাহার সেই মেজমামা! গল্পটা যখন অবাধ কল্পনার চরমে উঠিয়াছে—অর্থাৎ তাহার মেজমামার হীরা বসানো আংটি দেখিয়া বড়লাট-সাহেব যখন হাঁ-করিয়া থ হইয়া আছেন—তখন জয়ন্ত আর কিছুতেই বরদাস্ত করিতে না-পারিয়া দু-হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "থামুন্ স্বর্ণেন্দু-বাবু, থামুন্, থামুন্! আপনার মেজমামার বিচিত্র জীবনচরিত অনায়াসে হজম করতে পারি, আমার ধৈর্য্যের বহর তত বেশী লম্বা নয়—যথেষ্ট হয়েছে, ক্ষান্ত দিন।"

স্বর্ণেন্দু তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত তাহার মেজমামার আশ্চর্য্য আংটি এবং বিস্ময়-স্তম্ভিত বড়লাট সাহেবের বর্ণনা বন্ধ করিয়া ফেলিল। তারপর তাহার কুৎকুতে চোখদুটো মটকাইয়া, একটা ঢোক্ গিলিয়া এবং একগাল হাসিয়া বলিল, "ও, আপনার ভালো লাগ্‌ছে না বুঝি?"

—"না। বাঙালীর রচিত জীবনচরিত আর মাসিক-পত্রের প্রবন্ধগৌরব, এ-দুটো জিনিষ জ্যান্ত মানুষের ধাতে সহ্য হওয়া অসম্ভব।"

—"হ্যাঁ, আমার মেশোমশাই—গ্যালো বছরে যিনি সি-আই-ই হয়েচেন, জানেন ত,—তিনিও বলেন মাসিকপত্রের—"

—"রক্ষা করুন স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনার মেজমামাব পিছনে-পিছনে যদি সি-আই-ই মেশোমশাইও এত ঘনঘন আবির্ভূত হন, তাহলে আমাদের দশা রাম-রাবণের মাঝখানে মারীচের চেয়েও ভয়ানক সাংঘাতিক হয়ে উঠবে যে!"

স্বর্ণেন্দু আর-কোন কথা কহিল না, —ফস্-করিয়া পকেট হইতে রূপার 'কেস্' বাহির করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল। তাহার মনের কথা তাহার মনই জানে, কিন্তু বাহিরে সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই হাসিমুখে বসিয়া রহিল।

আসল কথা, জয়ন্ত এই স্বর্ণেন্দু লোকটাকে অতিশয় ঘৃণা করিত—কারণ তাহার টাকার জাঁক্ যেমন বেশী, মিথ্যাকথা বলিবার শক্তিও তেম্‌নি। স্বর্ণেন্দু যাহাতে তাহার উপরে চটিয়া মেলা-মেশা বন্ধ করিয়া দেয়, জয়ন্ত সেই ফিকিরে প্রায়ই তাহাকে অপ্রস্তুত

করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিত;—কিন্তু স্বর্ণেন্দুও যেন অপ্রস্তুত হইবে না বলিয়াই প্রস্তুত হইয়া আসিত! জয়ন্ত যত কড়া কথা বকে স্বর্ণেন্দুও তত মুখ টিপিয়া হাসে, এবং প্রত্যহ যথানিয়মেই আপনার নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে আসিয়া বসে! আর-সকলে ভাবিত, ওঃ, এযে দেখচি যীশুখৃষ্টের মত ক্ষমাশীল এবং কমলীর মত নাছোড়বান্দা!

কাল্কের সেই 'মেজমামার আশ্চর্য্য আংটি'র ব্যাপারের পর জয়ন্ত ভাবিয়াছিল, স্বর্ণেন্দু অন্তত আজকের দিনটা তাহার নিয়মিত হাজ্‌রিতে কামাই দিবে।

কিন্তু আজ সকালে জয়ন্ত যখন তানপূরা লইয়া গলা সাধিতেছিল তখন দ্বারপথে স্বর্ণেন্দুর হ্যাট্‌কোট্‌-পরা বকের মত কৃশ মূর্ত্তিখানি দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গেল।

স্বর্ণেন্দু ঘরে ঢুকিয়া ডানহাতের একটা আঙুল কপালে ছুঁয়াইয়া হাস্যমুখে বলিল, "গুড্‌ মর্ণিং জয়ন্তবাবু!"

জয়ন্ত মাথাটি নত করিয়া বলিল, "নমস্কার। স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনি চলেন-বলেন সায়েবী-ধরণে অথচ আজ-পর্য্যন্ত কেতাদুরস্ত হ'তে পার্‌লেন না!"

—"কেন জয়ন্তবাবু, এমন কথা বল্‌লেন কেন?"

—"ভদ্রলোকের ঘরে ঢুক্‌লে সায়েবরা কি মাথায় টুপি পরেই ঢোকে!"

মাথা হইতে হ্যাট্‌টা তখনি খুলিয়া ফেলিয়া আধহাত জিভ্‌ বাহির করিয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "ঐ যাঃ! ভুল হয়ে গিয়েছিল মশাই, বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছিল!"

—"ভুল ত হবেই! দেশে বসে দেশকে ভুল্‌তে চাইলে ভুল হবে না! কি সুখে আপনারা যে অমন ধড়া-চুড়ো পরেন, আপনারাই তা জানেন!"

—"আর যা-বলুন তা-বলুন, কিন্তু ও-কথা বল্‌লে চল্‌বে না জয়ন্তবাবু! সায়েবী পোষাকে সুবিধে ঢের, চল্‌তে কোঁচা বাধে না, কসি খুলে যায় না, আর—আর—"

তানপূরাটা নামাইয়া রাখিয়া জয়ন্ত ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "আর—আর—?"

—"আরো ঢের সুবিধে আছে—"

—"যেমন, গ্রীষ্মকালে মনে হবে টার্কিস-বাথের গরম সিন্দুকটা ঘাড়ে করে' বয়ে বেড়াচ্ছি, সতরঞ্চে বা ফরাসের ওপরে বস্‌তে গেলে মনে হবে যেন আমি 'গেঁটে বাতে'র আড়ষ্ট রোগী! ঐ কলার,—কুকুরের কলারের চেয়েও যা টাইট্‌ হয়ে গলায় বসে' হাঁপ ধরায়, ঐ রাতের পোষাকের প্লেট্‌-বসানো সার্ট,—দেহকে যা সর্ব্বদাই দরজার মত সটান খাড়া থাক্‌তে হুকুম দেয়, ঐ পায়ের জুতো,—নেমন্তন্নে গিয়ে যার ফিতে খুল্‌তে-খুল্‌তেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে যায়, এ-সবও ত আপনি সুবিধে বলে মনে করেন?"

—"হ্যাঁ, একটু-আধটু অসুবিধে আছে বটে—"

—"একটু-আধটু কি, ও-পোষাকে বাঙালীর পনেরো-আনাই অসুবিধে, সায়েবরা শীতের দেশে প্রাণের দায়ে অমন পোষাক পর্‌তে বাধ্য হয়েছে বৈ ত না! আমাদের এই চাঁদের আলো, দখিণ হাওয়ার দেশে, পোষাক-পরিচ্ছদও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে! দেখুন, আমাদের এই কোঁচানো চাদর,—এ-যেন ভাঁজে-ভাঁজে

ছড়িয়ে-পড়া শতদল; এই গিলে-করা পাঞ্জাবীর আস্তীন,—এ-যেন ঢেউ-খেলানো নদীর মত; এই মোলায়েম কাপড়,—এ-যেন পূর্ণিমার শুভ্রতা-মাখানো; এই কোঁচার রঙিন মুখ,—এ-যেন পাপড়ি-মেলিয়ে-দেওয়া একটি ফুল! স্বর্ণেন্দুবাবু, আমাদের পোষাক দেখলে আপনার ও-সায়েব-আর্টিষ্টরাও আর্টের আদর্শ বলে মান্‌তে বাধ্য হবেন! আমার এই পোষাকে যদি বৈচিত্র্য আন্‌তে চান তাহলে নানা ঋতুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের পোষাকও অনায়াসে রঙে ছুপিয়ে নিতে পারেন,—বর্ষাকালে ভিজে বনের মত তাজা সবুজ রং, শরৎকালে পাকাধানের মত সোনালী রং, বসন্তকালে বাসন্তী রং; গ্রীষ্ম-কালে রোদে শুক্‌নো মাটির মত গেরুয়া-রং, এম্‌নি যখন যেমন তখন তেমন। এ পোষাকের কাছে কোথায় লাগে আপনার ও দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ!”

—“ওঃ, জয়ন্তবাবু, আপনার কথাগুলো প্রায় কবিতার রগ্‌ ঘেঁষে গেছে! কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন না যেন, যে, জীবনের সবটাই কবিতার মত কোমল নয়!”

জয়ন্ত সে কথা কাণে না-তুলিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল, “পুরো সায়েবী পোষাক বরং সহ্য হয়, কিন্তু আমরা—বাঙালীরা যে অদ্ভুত পোষাকটাকে জাতীয় করে তুলেছি, সেটা সূচের মত চোখকে বিঁধ্‌তে থাকে। আমরা অনেকে পায়ে পরি মস্ত বুট, তার ওপরে এদেশী কাপড়, তার ওপরে সায়েবী সার্ট বা কোট—কেউ কেউ আবার গলা-খোলা কোটের সঙ্গে নেকটাই আর কলার পর্‌তেও লজ্জা পান না—তার ওপরে কোঁচান চাদর—কেউ কেউ দেখি মাথায় আবার টুপি পর্‌তেও সুরু করেছেন! কাপড়ের ওপরে সায়েবদের ‘ড্রেসিং গাউন’ পরে অনেককে দেমাকে বুক-ফুলিয়ে সদর রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেও দেখেছি! আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের যে কতটা অধঃপতন হয়েছে, আমাদের জাতীয়তা যে কত নীচে নেমে পড়েছে, আর, সেই সঙ্গে আমাদের নির্লজ্জতা যে কতটা চরমে উঠেছে, বাঙালীর এই ‘ফেরঙ্গ-বঙ্গ-বেশে’র কিম্ভূতকিমাকার খিচুড়ি তার অকাট্য প্রমাণ!”

স্বর্ণেন্দু বলিল, “কিন্তু আপনি আমাকে ও-দলে ফেল্‌তে পার্‌বেন না! কাপড়ের সঙ্গে আমি কখনো সার্ট-কোট পরে পথে বেরুই-নি!”

জয়ন্ত আর-কিছু না-বলিয়া তানপুরাটি তুলিয়া লইয়া একটি ভজন ধরিল।

স্বর্ণেন্দু একপাশে বসিয়া গান শুনিতে শুনিতে মুরুব্বিআনা চালে তুড়ি মারিয়া বেতালা তাল দিতে লাগিল।

জয়ন্ত যখন থামিল, স্বর্ণেন্দু বাহবা দিয়া বলিয়া উঠিল, “তোফা, তোফা! আপনার গান শুন্‌লে প্রাণটা যেন মাৎ হয়ে যায়! সত্যি জয়ন্তবাবু, আপনার এই গান শুন্‌তে পাব বলেই রোজ সকালে এখানে এসে তীর্থের কাকের মত বসে থাকি!”

জয়ন্ত জানিত, কিছুদিন আগে এই স্বর্ণেন্দুর কাছেই তাহার গান ছিল অত্যন্ত অশ্রাব্য! অকস্মাৎ তাহার এই মত-পরিবর্ত্তনের কারণটা বুঝিতে না-পারিয়া সে নীরব হইয়া রহিল।

স্বর্ণেন্দু একখানা এসেন্সমাখা সিল্কের রুমাল বাহির করিয়া মুখের কাছে নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "অবিশ্যি এ-দেশে আপনার চেয়ে বড় আর নামজাদা গাইয়ে ঢের আছেন; কিন্তু কেন জানি না, তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকের গান থেকেই আমি রস পেয়েছি।"

—"ওর কারণ আছে। এদেশের অনেক গাইয়েই গানের মধ্যে সুরকেই সর্ব্বেসর্ব্বা করে' তোলেন, কথাকে একেবারেই আমোল দেন না। কিন্তু তাঁদের বোঝা উচিত, কেবল সুরই যদি গানের সর্ব্বস্ব হ'ত, তাহলে কণ্ঠসঙ্গীতের কোনই সার্থকতা থাক্‌ত না—যন্ত্র-সঙ্গীতেই সে কাজটা ভালো করে' চল্‌তে পার্‌ত। সুরের সঙ্গে কথাকে প্রকাশ কর্‌বার জন্যেই যখন কণ্ঠ-সঙ্গীতের সৃষ্টি, গানে তখন সুর বা কথা— কেউই ফেলনা নয়, এ সত্য আমি কখনো ভুলি না!"

স্বর্ণেন্দু খানিকটা চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া উস্‌খুস্‌ করিতে লাগিল। তারপর একটা সিগারেট ধরাইয়া, জয়ন্তের মুখের দিকে না-চাহিয়াই বলিল, "আমি একটি লোককে জানি মশায়, সে যে কী চমৎকার গায়, তা আর কি বল্‌ব!"

—"কি গান তিনি?"

—"টপ্পা, খেয়াল। বড়বড় রাজা-মহারাজা তার গান শুন্‌তে লালায়িত। আমার ভারি ইচ্ছে, আপনাকে একবার তার গান শুনিয়ে আনি।"

—"বেশ ত!"

স্বর্ণেন্দু খুব খুসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা, কালই সন্ধ্যার সময় এসে আপনাকে আমি নিয়ে যাব।"

—"তাঁর নাম কি?"

কিন্তু স্বর্ণেন্দু বোধহয় শুনিতে পাইল না; কারণ জয়ন্তের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়াই সে নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

চৌদ্দ

পরদিন ঠিক্‌ সন্ধ্যার মুখে স্বর্ণেন্দুর গাড়ী আসিয়া জয়ন্তের বাসার সুমুখে দাঁড়াইল।

জয়ন্ত কাপড়-জামা পরিয়া তৈরি হইয়াই ছিল। স্বর্ণেন্দুর সাড়া পাইয়াই উপর হইতে নামিয়া আসিল। জয়ন্তকে তুলিয়া লইয়া স্বর্ণেন্দু গাড়ী চালাইতে হুকুম দিল।

ঘরমুখো জ্যান্তে-মরা কেরাণীর দলকে শশব্যস্ত ও ছত্রভঙ্গ করিয়া, অনেকগুলো রাস্তা পার হইয়া স্বর্ণেন্দুর গাড়ী বৌবাজার ষ্ট্রীটের একখানা তিনতলা বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া থামিল। বাড়ীর দরজার কাছে একজন দ্বারবান বসিয়া বাঁ-হাতের চেটোতে ডানহাতের বুড়ো আঙুলের টিপ্‌ দিয়া 'শুকা' পিষিতেছিল, গাড়ী দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া মস্ত-এক সেলাম ঠুকিল।

জয়ন্ত বাড়ীর বাহিরটার এবং দ্বারবানটার দিকে একবার বিস্মিত চোখে চাহিয়া বলিল, "এই বাড়ী নাকি?"

স্বর্ণেন্দু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

—"তাহলে এ গায়কটির বেশ দু-পয়সা আছে দেখ্‌ছি।"

—"রাজা-মহারাজকে গান শুনিয়ে যে

হাত করেছে তার আবার টাকার ভাবনা! এখন নামুন,—কথাবার্ত্তা সব ভেতরে গিয়ে হবে-অখন।"

গাড়ী হইতে নামিয়া দুজনে বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। উঠানে একজন মুসলমান চাকর দাঁড়াইয়া ছিল, সে তাহাদের পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেল।

জয়ন্ত চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার এই গাইয়েটি কি মুসলমান?"

স্বর্ণেন্দু বলিল, "হ্যাঁ। বাঙালীর ভেতরে ভালো গাইয়ে কোথায় পাবেন?"

মুসলমান চাকরটা একটা ঘরের দরজা হইতে পুঁতির পরদা সরাইয়া দিল। স্বর্ণেন্দুর পিছনে-পিছনে জয়ন্তও ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।

স্বর্ণেন্দু একটা জান্‌লার দিকে আঙুল তুলিয়া বলিল, "আপনি ঐ জান্‌লাটার কাছে গিয়ে বসুন। বেশ হাওয়া পাবেন।"

জয়ন্ত সেইখানে গিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর ঘরের চারিদিকে কৌতূহলী চোখ বুলাইয়া সাজসজ্জা দেখিতে লাগিল।

ঘরখানি বেশ সাজানো-গুছানো। ঘরের মেঝেটি রঙ্‌চঙে মাদুরে মোড়া, তার উপরে পুরু ও নরম গালিচা, তার উপরে মাখনের মত সাদা চাদর, তার উপরে কতকগুলো মোটা মোটা তাকিয়া, একটা রূপার গড়্‌গড়া, রূপার পিক্‌দান ও পানের ডিবা। পঙ্কের কাজ-করা দেওয়ালের দুদিকে ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি দুখানা বড়-বড় আয়না। আয়না দুখানার উপরে-নীচে দুটো-করিয়া ব্রাকেট; উপরের ব্রাকেটে এক-একটি পোর্সিলেনের পুতুল এবং নীচে এক-একটি রূপার ফুল-দানীতে ফুলের তোড়া! ঘরের ছাদের মাঝখানে একটা ছোট ইলেক্‌ট্রিকের ঝাড় ও পাখা। এ-সব দেখিয়া জয়ন্তের মুখের ভাব কিছু বদ্‌লাইল না,—কিন্তু দেওয়ালের ছবিগুলোর উপরে চোখ পড়িতেই তার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

বিরক্তির সহিত ভ্রু-সঙ্কোচ করিয়া বলিল, "স্বর্ণেন্দুবাবু, আপনার গায়কটি সুধু বিলাসী নন, তাঁর রুচিও ভারি জঘন্য ত!"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "কেন?"

ছবিগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জয়ন্ত বলিল, "এমন ছবি ভদ্রলোকের ঘরে থাকা উচিত নয়।"

একটা তাকিয়া টানিয়া লইয়া তাহার উপরে বুক রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া স্বর্ণেন্দু বলিল, "ওঃ, তাই ও-কথা বলছেন! আর্টিষ্টদের রুচি অম্‌নি একটু তরল হয়েই থাকে!"

জয়ন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আপনি তাহলে আর্টের কিছুই বোঝেন না। আর্ট হচ্ছে—"

স্বর্ণেন্দু বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "চুপ্, চুপ্! আর্টের ওপরে লেক্‌চার যা দিতে হয় বাইরে বেরিয়ে দেবেন! শুন্‌ছেন না, কে আস্‌চে!"

জয়ন্ত শুনিল, বাহির হইতে কাহার গহনার ঠুন্‌ঠুনানির সঙ্গে পায়ের চটিজুতার মৃদু আওয়াজ আসিতেছে! সে অবাক হইয়া দরজার দিকে ফ্যাল্‌ফেলে চোখে তাকাইয়া রহিল।

... ... জয়ন্তকে একেবারে

হতভম্ব করিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল এক অপূর্ব্বরূপসী যুবতী—তাহার চক্ষে কটাক্ষ, ওষ্ঠে হাস্যের লীলা!

জয়ন্তের মুখের উপরে ঢুলে-পড়া তৃষা-ভরা চোখদুটি রাখিয়া যুবতী সাম্‌নে একটু হেলিয়া একটা সেলাম করিল। কিন্তু জয়ন্ত তখন এম্‌নি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছিল যে সেলাম ফিরাইয়া দেবার কথাটা বেবাক্ ভুলিয়া, বসিয়া রহিল ঠিক এক কাঠের পুতুলের মত!

স্বর্ণেন্দু বলিয়া উঠিল, "আরে ছুয়ো জয়ন্তবাবু, মেয়েমানুষ দেখে লজ্জা! ইনি হচ্ছেন হুস্‌না-জান, আপনি যে এঁরই গান শুন্‌তে এসেচেন!"

জয়ন্তের বুকের ভিতরটা গুর্‌গুর্ করিয়া উঠিল—স্বর্ণেন্দু তাহাকে বাইজীর গান শুনাইতে আনিয়াছে! স্বর্ণেন্দুর দিকে আগুনভরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জয়ন্ত তখনি উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বর্ণেন্দু অর্থপূর্ণ চোখে বাইজীর দিকে চাহিয়া কি-একটা ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "জয়ন্তবাবু, উঠ্‌লেন যে!"

দরজার দিকে আগাইতে-আগাইতে গম্ভীর স্বরে জয়ন্ত বলিল, "বাড়ী যাব!"

স্বর্ণেন্দু আড়্‌চোখে বাইজীকে আবার কি-একটা ইসারা করিল।

অনেকগুলো আংটি-পরা হাতখানি রং-মাখানো ঠোঁটের উপরে চাপিয়া বাইজী খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল! তারপর পরিষ্কার বাঙ্‌লায় বলিল, "বাবুসাহেব, বস্‌তে হুকুম হোক্!"

কোন জবাব না-দিয়া, বাইজীর মুখের দিকে চাহিয়াই জয়ন্ত মাথা হেঁট করিল—তাহার মনে হইল, সে-দুটো চোখের খর দৃষ্টি যেন দু-দুটো অগ্নিশিখার মত তার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধাইয়া দিতেছে!

বাইজী হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া খপ্-করিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া গানের সুরে বলিয়া উঠিল—

"আর্জ মরে লড়ুজি
পিয়াকো যানে ন দেউঙ্গি!"

একটা গোখ্‌রো সাপ হঠাৎ হাত জড়াইয়া ধরিলে মানুষ যেমন করে, জয়ন্ত ঠিক তেম্‌নি করিয়াই বাইজীর হাতখানা আপন হাত হইতে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিদ্যুতাহতের মত পিছনে হটিয়া আসিল।

থর্‌থরে ঠোঁটদুখানি ফুলাইয়া বাইজী অভিমানের সুরে বলিল, "বাবুসাহেব, আমার গা বড় নরম—আপনি আমাকে ব্যথা দিলেন!"

জয়ন্ত যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানেই অবশ দেহে ধুপ্-করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে!... ... ...

তেম্‌নি আচ্ছন্নের মত সে যে কতক্ষণ বসিয়া রহিল, তা সে জানে না! যখন ফের হুস্ হইল তখন দেখিল, এরি-মধ্যে কখন্ সারেঙ্গী ও তবল্‌চী আসিয়া যন্ত্র বাঁধিয়া সঙ্গত্ সুরু করিয়া দিয়াছে এবং সেই যুবতীটিও পায়ে ঘুঙুর পরিয়া গান ধরিয়াছে

"ক্যায়সে ভরু ম্যয়
জল-কি গাগরিয়া!"

মনে-মনে জয়ন্ত আপনাকে ধিক্কার দিয়া

উঠিল—ছিঃ ছিঃ, এ কী করিল সে! স্বর্ণেন্দুকে আগে সে দু-চোখে দেখিতে পারিত না বটে; কিন্তু লোকটা যে এত-বড় সয়তান, এমন সন্দেহ কোনদিনই করে নাই! কেন সে তাহাকে এখানে লইয়া আসিল—ইহাতে তাহার কি স্বার্থ? ... ... জয়ন্ত অনেক ভাবিয়াও কিছু বুঝিল না।

আস্তে-আস্তে সে মাথা তুলিল। বাইজীও অম্‌নি তরল চোখ ঢুলাইয়া মুখে হাসি মাখাইয়া এবং চপল চরণের সঙ্গে সমস্ত দেহখানি ঠমকে ঠমকে নাচাইয়া আবার একটা নূতন গান ধরিল:—

"হামারা যৌবন নেহি মানে পিয়া বিনা—"

পলক না-পড়িতে জয়ন্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহিরে ছুটিয়া গেল; তারপর এক-এক লাফে তিন-চারিটা সিঁড়ি পার হইয়া হুড়্‌মুড় করিয়া একেবারে সে রাস্তায় আসিয়া পড়িল!

সেখান হইতে শুনিল, বাইজীর গান থামিয়া গিয়াছে এবং জান্‌লায় মুখ বাড়াইয়া স্বর্ণেন্দু হো-হো করিয়া হাসিতেছে!

জয়ন্ত মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরদিকে তুলিয়া পাগলের মত চেঁচাইয়া বলিল, "যেদিন ফের দেখা হবে সেদিন তুমি আর হাস্‌বার অবকাশ পাবে না—আমার পায়ের তলায় পড়ে কাঁদতে হবে!"

উপর হইতে একজোড়া জুতো নীচে ফেলিয়া দিয়া স্বর্ণেন্দু সকৌতুকে বলিল, "মশাই, এ জুতোজোড়া লোককে ছুঁড়ে মারা ছাড়া আমাদের আর কোন কাজেই লাগ্‌বে না,—অতএব, আপনি ত্যাগ কর্‌লেও আমরা এদের গ্রহণ করতে পারলুম না! নমস্কার মশাই, নমস্কার!"

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

অনাদি মন্ত্র

আকাশে কি উঠে গীত
বাতাসে কি ভাব বয়?
কি মন্ত্র অনাদি যন্ত্রে
ধ্বনিত নিখিলময়?

"ভালবাসা ভালবাসা—
বিশ্ব বাঁধা প্রেমবলে—"
নীরবে মহান্‌ রবে
এই কথা সবে বলে।

এ ধ্রুব পরম সত্য
খণ্ডিবারে যেবা চায়,—
সেই শুধু মিথ্যাবাদী
সেই ব্যর্থ দুনিয়ায়।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের বহুপ্রকার ভেদ নাট্যশাস্ত্র ও অলঙ্কার-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ঈহামৃগ, ডিম, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, বীথী ও ভাণ নামক দশপ্রকার দৃশ্যকাব্যভেদের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) প্রধানতঃ এই দশটি রূপকের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া ধনঞ্জয় নিজ-রচিত অলঙ্কার-গ্রন্থের "দশরূপক" সংজ্ঞা দিয়াছেন। বিশ্বনাথ-রচিত সাহিত্যদর্পণে পূর্ব্বোক্ত দশ-প্রকার রূপক ব্যতীত নিম্নলিখিত উপরূপক নামক দৃশ্যকাব্যগুলির নামও দেখিতে পাওয়া যায়। নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থানক, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেঙ্খন, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ ও ভাণিকা। এই দশপ্রকার রূপক ও অষ্টাদশ-প্রকার উপরূপকের নাম ও লক্ষণ প্রদত্ত হইলেও, ইহার সকলগুলির উদাহরণ আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞান-শকুন্তল, মহাবীর-চরিত, উত্তররাম-চরিত, বালরামায়ণ প্রভৃতি নাটক, মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব প্রভৃতি প্রকরণ, রত্নাবলী, বিদ্ধশালভঞ্জিকা প্রভৃতি নাটিকা, বিক্রমোর্ব্বশী নামক ত্রোটক, কর্পূরমঞ্জরী নামক সট্টক প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। ব্যায়োগ ও ভাণ শ্রেণীরও অনেকগুলি দৃশ্যকাব্য মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সমবকার, ঈহামৃগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক প্রভৃতির উদাহরণ অতি বিরল। সাহিত্য-দর্পণ ও দশরূপকে উদ্ধৃত কতকগুলি নাম-মাত্র এগুলির অস্তিত্ব সূচনা করিতেছে।

ভাসরচিত দৃশ্যকাব্যগুলি প্রকাশিত হওয়াতে আমরা এই শেষোক্ত শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যভেদের উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাস মধ্যমব্যায়োগ, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ ও কর্ণভার নামক ব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র নামক সমবকার, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নামক ঈহামৃগ (২) ও উরুভঙ্গ নামক উৎসৃষ্টিকাঙ্ক রচনা করিয়াছেন। আজ আমরা পঞ্চরাত্র নামক সমবকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

আমরা পঞ্চরাত্র ব্যতীত এযাবৎ সম-বকার-শ্রেণীর কোন দৃশ্যকাব্য প্রাপ্ত হই নাই। ধনঞ্জয়ের দশরূপকে "সমুদ্রমন্থন" ও বিশ্বনাথের সাহিত্য-দর্পণে "সমুদ্রমথন" নামক সমবকারের নাম উদাহরণরূপে প্রদত্ত

(১) "নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো বায়োগ এব চ।
ভাণঃ সমবকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিম ঃ॥
ঈহামৃগশ্চ বিজ্ঞেয়ো দশমো নাট্য-লক্ষণে।
এতেষাং লক্ষণমহং ব্যাখ্যাস্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ॥"

[নাট্য-শাস্ত্রম্, ১৮শ অধ্যায়, ২—৩ শ্লোক]

(২) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ মধ্যে ইহা নাটিকা বলিয়া উল্লিখিত হইলেও ঈহামৃগের সমস্ত লক্ষণ ইহাতে বর্ত্তমান বলিয়া ইহাকে ঈহামৃগ বলা যায় কি না তাহা বিবেচ্য।

হইয়াছে। এই দুইটি নাম একই রূপকের বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই নাম ভিন্ন উক্ত গ্রন্থখানির আর কোনও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কাজেই ভাসের পঞ্চরাত্র নামক সমবকারখানি এই বিলুপ্তপ্রায় দৃশ্যকাব্যভেদের একমাত্র উদাহরণরূপে অতি আদরণীয়।

পঞ্চরাত্রে ভাস মহাভারতোক্ত উপাখ্যানের অনুসরণ করেন নাই। কৌরব, পাণ্ডব প্রভৃতি নায়ক, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ও বিরাটের গোহরণ ঘটনা অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণ নূতন কল্পনায় কথা-বস্তু গঠন করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে রাজা দুর্য্যোধনের যজ্ঞ-বর্ণনা। তিনজন ব্রাহ্মণ আসিয়া যজ্ঞের সমৃদ্ধি বর্ণনা করিতেছেন। যজ্ঞাবসানে যজ্ঞশালা অগ্নিপ্রদানে ভস্মীভূত করা হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বালকেরা বালসুলভ চাপল্যবশতঃ যজ্ঞশালায় অগ্নি-সংযোগ করিয়া দিল। অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে নদীকূলে গিয়া দাহ্যবস্তুর অভাবে নির্ব্বাপিত হইল। ব্রাহ্মণগণ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বিষ্কম্ভক এইখানেই শেষ হইল।

তাহার পর ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রবেশ করিলেন। কিছুপরে দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনিও প্রবেশ করিলেন। যজ্ঞাবসানে রাজগণ আসিয়া অভিবাদন করিলে দুর্য্যোধন বলিলেন, "বিরাটরাজ আসেন নাই?" শকুনি বলিলেন, "আমি দূত পাঠাইয়াছি। বোধ হয় পথে আসিতেছেন।" দুর্য্যোধন তখন দ্রোণকে যজ্ঞদক্ষিণা দিতে চাহিলেন। দ্রোণ দুর্যোধনকে সলিলহস্তে কৃতপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন—

"বার বৎসরের মধ্যে নিরাশ্রয় যাহাদিগের কোথাও গতি তাহা জানি না, সেই পাণ্ডবগণের সহিত রাজ্য ভাগ করিয়া লও। এই, আমার ভিক্ষা—এই আমার দক্ষিণা।"(৩)

শকুনি ইহা ধর্ম্মবঞ্চনা বলিয়া দ্রোণকে অনুযোগ করিলেন। বহু তর্কবিতর্কের পর শকুনি পরামর্শ দিলেন, "যদি পঞ্চরাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদিগের সংবাদ আনিতে পারেন তাহা হইলে দুর্য্যোধন অর্দ্ধরাজ্য তাঁহাদের দিবেন।"

এই সময় দূত আসিয়া নিবেদন করিল কীচকবধহেতু বিষণ্ণ হওয়াতে বিরাটরাজ আসিতে পারিলেন না। কীচকবধবৃত্তান্ত শুনিয়া ভীষ্ম দ্রোণকে বলিলেন, "এ নিশ্চয়ই ভীমের কাজ।" তখন দ্রোণ পঞ্চরাত্রের সর্ত্তেই সম্মত হইলেন। ভীষ্ম তখন দুর্য্যোধনকে বলিলেন, "বিরাটের সহিত আমার গুপ্ত শত্রুতা আছে। তোমার যজ্ঞে আসে নাই, এই হেতু-বশতঃ তাহার গো-গ্রহণ কর।" সকলে তখন যুদ্ধ-সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম অঙ্ক এইখানেই শেষ হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমে গোবালকগণ বিরাটরাজের জন্মদিনে ধেনু আনিয়া সজ্জিত

(৩) "যেষাং গতিঃ কাপি নিরাশ্রয়াণাং
সংবৎসরৈর্দ্বাদশভির্ন দৃষ্টা।
ত্বং পাণ্ডবানাং কুরু সংবিভাগম্
এষা চ ভিক্ষা মম দক্ষিণা চ॥"

করিতেছে, এমন সময় ধেনুগুলি আক্রান্ত হইল। গোপালকগণ শরবর্ষণে ভীত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বিরাটরাজের নিকট সংবাদ গেল।

"বিরাট যুদ্ধযাত্রা করিবেন, এমন সময় শুনিলেন, বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া উত্তর তাঁহার রথ লইয়া নির্গত হইয়া গিয়াছে। যুধিষ্ঠির আসিলেন। তাহার পর ভটমুখে শ্মশানের নিকট রথের গমন, যুদ্ধ ও কৌরবগণের পরাজয় বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধে যাঁহারা বীর্য্য দেখাইয়াছেন তাঁহাদের নাম যুদ্ধাবসানে উত্তর পুস্তকে লিখিতেছিলেন। (৪) এটুকু আধুনিক Military Despatches স্মরণ করাইয়া দেয়।

বৃহন্নলা আহূত হইলেন। এই সময় ভট আসিয়া নিবেদন করিল, অভিমন্যু কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, সে বিরাটরাজের পাচক কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দীকৃত হইয়াছে। ভীম ও অভিমন্যু প্রবেশ করিলে কিছুকাল অভিমন্যুর সহিত কপট কথোপকথনের পর পাণ্ডবেরা আত্মপ্রকাশ করিলেন। বিরাট অর্জ্জুনকে যুদ্ধবিজয়ের শুল্কস্বরূপ উত্তরা দান করিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন পুত্রের নিমিত্ত উত্তরা গ্রহণ করিলেন। বলিলেন "আমি অন্তঃপুরস্থ রমণীগণকে মাতার ন্যায় পূজা করিয়াছি।" ভীষ্মের নিকট উত্তরকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় অঙ্কের এইখানেই সমাপ্তি।

তৃতীয় অঙ্কে দুর্য্যোধন প্রভৃতি অভিমন্যু-উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় অর্জ্জুনের নামাঙ্কিত বাণ আসিয়া পড়িল। পরে দূতস্বরূপ উত্তর আসিয়া উত্তরা ও অভিমন্যুর বিবাহ-সংবাদ জানাইলে, দ্রোণ বলিলেন, "পঞ্চরাত্রের মধ্যেই আমি পাণ্ডবদিগের বার্ত্তা আনিয়াছি।" দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমি পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপ রাজ্য দিলাম। যাঁহারা সত্যপালন করেন তাঁহারা মরণের পরও জীবিত থাকেন।"

ইহার পর ভরতবাক্য উচ্চারণে যবনিকা পড়িয়াছে। দ্রোণের মুখে প্রদত্ত নিম্নলিখিত শ্লোকের শেষার্দ্ধই ভরতবাক্য :—

"হন্ত সর্ব্বে প্রসন্নাঃ স্মঃ প্রবৃদ্ধকুলসংগ্রহাঃ।
ইমামপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ
প্রশাস্তু নঃ॥"

এখন আমরা দেখিব, সমবকারের লক্ষণগুলি পঞ্চরাত্রে বিদ্যমান আছে কি না। ভরত নিজকৃত নাট্যশাস্ত্রে সমবকারের নিম্ন প্রকার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

"ইহার পর আমি সমবকারের লক্ষণ বলিতেছি।

দেব বা অসুর বিষয়ক ঘটনা সমবকারের বীজস্বরূপ। ইহার নায়ক প্রখ্যাত ও ধীরোদাত্ত। ইহার অঙ্কগুলিতে তিনপ্রকার কপট, তিনপ্রকার বিদ্রব ও তিনপ্রকার শৃঙ্গার থাকে। ইহাতে বারজন নায়ক থাকে ও সময়ের পরিমাণ অষ্টাদশ নাড়িকা। যে অঙ্কে যত নাড়িকা থাকিবে তাহার বিধি বলিতেছি।

ইহার অঙ্কগুলি প্রহসন, বিদ্রব, কপট ও বীথীযুক্ত হইবে।

ক্রিয়াবিশিষ্ট প্রথম অঙ্ক দ্বাদশ নাড়ী

(৪) "দৃষ্টপরিস্পন্দানাং যোধপুরুষাণাং কর্ম্মাণি পুস্তকমারোপয়তি কুমারঃ।"

সময়বিশিষ্ট, দ্বিতীয় অঙ্ক চারনাড়ীবিশিষ্ট ও ঘটনার সমাপ্তিবিশিষ্ট তৃতীয় অঙ্ক দুই নাড়ী পরিমাণ হইবে।

অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত সময়কে নাড়ী বলে। যে পরিমাণ নাড়িকার কথা বলিলাম উহা যথোচিত অঙ্কগুলিতে সংযোগ করা উচিত।

বন্ধ অনুযায়ী এক-একটি অঙ্ক এক এক বিষয়ক হইবে। সমবকারে ফলগুলি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে।

বিদ্রব তিনপ্রকারঃ—(১) যুদ্ধ, জল প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন, (২) অগ্নি, গজেন্দ্র প্রভৃতি ভীতি হইতে উৎপন্ন ও (৩) নগর-অবরোধ প্রভৃতি হইতে জাত।

কপট তিন প্রকার; (১) বস্তু-গতি হইতে উৎপন্ন, (২) দৈববশতঃ জাত ও (৩) পরপ্রযুক্ত। এই তিনপ্রকার কপট দ্বারা সুখ বা দুঃখের উৎপত্তি হয়।

যাঁহারা বিধিজ্ঞ, তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের উপযোগী ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে শৃঙ্গারের প্রয়োগ করিবেন। বহুপ্রকার উপকরণ-যুক্ত, ধর্ম্ম-সমাপক, নিজমঙ্গলজনক, ব্রত, নিয়ম ও তপোযুক্ত শৃঙ্গারের নাম ধর্ম্মশৃঙ্গার। অর্থের ইচ্ছাবশতঃ বা বহুপ্রকারে অর্থ হইতে জাত শৃঙ্গারকে অর্থশৃঙ্গার বলে। অযথার্থ হইলেও স্ত্রী-সম্ভোগ-বিষয়ে রতি, কন্যাবিলোভন-জাত শৃঙ্গার, স্ত্রীপুরুষ উপস্থিত হইলে তাহাদের আবেগযুক্ত, রম্য, নিভৃত শৃঙ্গার কামশৃঙ্গার নামে কথিত।

উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্ প্রভৃতি বন্ধকুটিল যে সকল ছন্দ তাহা কবিগণ সমবকারে সম্যক্রূপে প্রয়োগ করিবেন। এইরূপ নানা রসবিশিষ্ট সমবকার তদভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রয়োগ করিবেন।"

"বক্ষ্যাম্যতঃপরমহং লক্ষণযুক্ত্যা সমবকারম্।
দেবাসুরবীজকৃতঃ প্রখ্যাতোদাত্তনায়কশ্চৈব ॥
অঙ্কস্তথা ত্রিকপটস্ত্রিবিদ্রবঃ স্যাত্ত্রিশৃঙ্গারঃ।
দ্বাদশনায়কবহুলো হ্যষ্টাদশনাড়িকা—প্রমাণশ্চ
বক্ষ্যাম্যস্যাঙ্কবিধিং যাবত্যো নাড়িকা যত্র।
অঙ্কস্তু সপ্রসহনঃ সবিদ্রবঃ সকপটঃ সবীথীকঃ ॥
দ্বাদশনাড়ীবিহিতঃ প্রথমঃ কার্য্যঃ ক্রিয়োপেতঃ।
কার্য্যস্তথা দ্বিতীয়ঃ সমাশ্রিতো নাড়িকাশ্চতস্রশ্চ ॥
বস্তুসমাপনবিহিতো দ্বিনাড়িকঃ স্যাত্তৃতীয়স্তু।
নাড়ীসংজ্ঞা জ্ঞেয়া মানং কালস্য যন্মুহূর্ত্তার্দ্ধম্ ॥
তন্নাড়িকাপ্রমাণং যথোক্তমঙ্কেষু সংযোজ্যম্।
অঙ্কোঽঙ্কস্ত্বন্যার্থঃ কর্ত্তব্যো বন্ধমাসাদ্য ॥...
অর্থং হি সমবকারে হ্যপ্রতিসম্বন্ধমিচ্ছন্তি ॥
যুদ্ধজলসম্ভবো বা হ্যগ্নিগজেন্দ্র-সংভ্রমকৃতো বাপি।
নগরোপরোধজো বা বিজ্ঞেয়ো বিদ্রবস্ত্রিবিধঃ ॥
বস্তুগতিক্রমবিহিতো দৈববশাদ্বা পরপ্রযুক্তো বা।
সুখদুঃখোৎপত্তিকৃতস্ত্রিবিধঃ কপটাশ্রয়ো জ্ঞেয়ঃ ॥
ত্রিবিধশ্চাত্র বিধিজ্ঞৈঃ পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যযোগ—
বিহিতার্থঃ।
শৃঙ্গারঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ ॥
যত্র তু ধর্ম্মসমাপকমাত্মহিতং ভবতি সাধনং বহুধা।
ব্রতনিয়মতপোযুক্তো জ্ঞেয়োঽসৌ ধর্ম্মশৃঙ্গারঃ ॥
অর্থস্যেচ্ছাযোগাদ্বহুধা চৈবার্থতোঽর্থশৃঙ্গারঃ।
স্ত্রীসংপ্রয়োগবিষয়েষ্বযথার্থমপীষ্যতে হি রতিঃ ॥
কন্যাবিলোভনকৃতং প্রাপ্তৌ স্ত্রীপুংসয়োস্তু রম্যং বা।
নিভৃতং সাবেগং বা যস্য ভবেদ্বা কামশৃঙ্গারঃ ॥
উষ্ণিগ্বানুষ্টুভ্ বা বৃত্তানি চ যানি বন্ধকুটিলানি।
তান্যত্র সমবকারে কবিভিঃ সম্যক্ প্রযোজ্যানি ॥
এবং কার্য্যং তজ্জ্ঞৈর্নানারসসংশ্রয়ং সমবকারম্।"
[নাট্য-শাস্ত্র, ১৮শ অধ্যায়, ১০৯—১২৩ শ্লোক]

ধনঞ্জয় নিজকৃত দশরূপকে সমবকারের নিম্নপ্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"নাটক প্রভৃতির ন্যায় সমবকারেও আমুখ

বা প্রস্তাবনা থাকিবে। দেবাসুর-ঘটিত বিখ্যাত ঘটনা ইহার কথাবস্তু হইবে। বিমর্শ ভিন্ন অন্য সন্ধিগুলি (অর্থাৎ, মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ ও নির্বহণ) ইহাতে থাকিবে। ইহার বৃত্তিগুলির মধ্যে কৈশিকীবৃত্তি থাকিবে না। ইহার নায়ক দ্বাদশজন ধীরোদাত্ত ও বিখ্যাত দেব বা দানব। ইহারা বহুবীররসযুক্ত ও ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ ফলপ্রাপ্তি হইবে। সমুদ্রমন্থন ইহার উদাহরণ। তিন অঙ্কে তিনপ্রকার কপট, তিনপ্রকার শৃঙ্গার ও তিনপ্রকার বিদ্রব থাকিবে।

প্রথম অঙ্ক দুই সন্ধিবিশিষ্ট ও দ্বাদশ নাড়িকা পরিমাণ। শেষ অঙ্ক দুইটি যথাক্রমে চার ও দুই নাড়িকা পরিমাণ। দুই ঘটিকায় এক নাড়িকা হয়।

বস্তুর স্বভাব হইতে, দৈববশতঃ ও অরিকৃত এই তিনপ্রকার কপট হইয়া থাকে। নগর-অবরোধ, যুদ্ধ ও বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি হইতে বিদ্রব ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম হইতে তিনপ্রকার শৃঙ্গার। সমবকারে বিন্দু ও প্রবেশক থাকে না। প্রহসনে যেরূপ সেইরূপ বীথ্যঙ্গ সমূহ সমবকারে প্রযুক্ত হইবে।"

"কার্য্যং সমবকারেঽপি আমুখং নাটকাদিবৎ ॥
খ্যাতং দেবাসুরং বস্তু নির্বিমর্শাস্তু সন্ধয়ঃ।
বৃত্তয়ো মন্দকৈশিক্যো নেতারো দেবদানবাঃ ॥
দ্বাদশোদাত্তবিখ্যাতাঃ ফলং তেষাং পৃথক্ পৃথক্।
বহুবীররসাঃ সর্ব্বে যদ্বদম্ভোধিমন্থনে ॥
অঙ্কৈস্ত্রিভিস্ত্রিকপটস্ত্রিশৃঙ্গারস্ত্রিবিদ্রবঃ।
দ্বিসন্ধিরঙ্কঃ প্রথমঃ কার্য্যো দ্বাদশনালিকঃ ॥
চতুর্দ্বিনালিকাবন্ত্যৌ নালিকা ঘটিকাদ্বয়ম্।
বস্তুস্বভাবদৈবারিকৃতাঃ স্যুঃ কপটাস্ত্রয়ঃ ॥
নগরোপরোধযুদ্ধে বাতাগ্ন্যাদিকবিদ্রবাঃ।
ধর্ম্মার্থকামৈঃ শৃঙ্গারো নাত্র বিন্দুপ্রবেশকৌ ॥
বীথ্যঙ্গানি যথালাভং কুর্য্যাৎ প্রহসনে যথা।"
[তৃতীয় প্রকাশ, ৬২—৬৮ শ্লোক]

বিশ্বনাথ সাহিত্য-দর্পণে সমবকারের নিম্ন-লিখিত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

"সমবকারে দেবাসুরাশ্রিত বিখ্যাত কথা-বস্তু হইবে। বিমর্শ ভিন্ন অন্য সন্ধিগুলি থাকিবে। তিনটি অঙ্ক হইবে। তাহার মধ্যে প্রথম অঙ্কে দুইটি সন্ধি ও শেষ দুই অঙ্কে এক-একটি সন্ধি থাকিবে। দ্বাদশজন ধীরোদাত্ত বিখ্যাত দেবতা অথবা মানব ইহার নায়ক হইবে। নায়কদিগের পৃথক্ পৃথক্ ফললাভ হইবে। সমস্ত রস বীররসপ্রধান হইবে। কৈশিকী ভিন্ন অন্য বৃত্তি থাকিবে। ইহাতে বিন্দু ও প্রবেশক থাকিবে না। যথোপযুক্তরূপে ত্রয়োদশ বীথ্যঙ্গ ইহাতে থাকিবে। ইহা তিনপ্রকার শৃঙ্গার, তিন প্রকার কপট ও তিনপ্রকার বিদ্রব-যুক্ত হইবে। প্রথমাঙ্কের বিষয় দ্বাদশ নালীর মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইতে হইবে, দ্বিতীয় অঙ্কে চার ও তৃতীয় অঙ্কে দুই নালীর (মধ্যে ঘটনা সম্পন্ন হইবে)।"

"বৃত্তং সমবকারে তু খ্যাতং দেবাসুরাশ্রয়ম্।
সন্ধয়ো নির্বিমর্শাস্তু ত্রয়োঽঙ্কাস্তত্র চাদিমে ॥
সন্ধী দ্বাবন্ত্যয়োস্তদ্বদেক একো ভবেৎ পুনঃ।
নায়কা দ্বাদশোদাত্তাঃ প্রখ্যাতা দেবমানবাঃ ॥
ফলং পৃথক্ পৃথক্ তেষাং বীরমুখ্যোঽখিলে রসঃ।
বৃত্তয়ো মন্দকৈশিক্যো নাত্র বিন্দুপ্রবেশকৌ।
বীথ্যঙ্গানি চ তত্র স্যুর্যথালাভং ত্রয়োদশ।
গায়ত্র্যুষ্ণিঙ্মুখান্যত্র ছন্দাংসি বিবিধানি চ
ত্রিশৃঙ্গারস্ত্রিকপটঃ কার্য্যশ্চায়ং ত্রিবিদ্রবঃ।
বস্তু দ্বাদশনালীভির্নিষ্পাদ্যং প্রথমাঙ্কগম্ ॥
দ্বিতীয়েঽঙ্কে চতসৃভির্দ্বাভ্যামঙ্কে তৃতীয়কে
[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২৩৪—২৩৮ শ্লোক]

বিশ্বনাথ তিন-তিনপ্রকার শৃঙ্গার, কপট ও বিদ্রবেরও সংক্ষিপ্ত লক্ষণ দিয়াছেন।

"শৃঙ্গার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লইয়া ত্রিবিধ। কপট স্বাভাবিক, কৃত্রিম ও দৈবজাত এই তিনপ্রকার। বিদ্রব চেতনকৃত, অচেতনকৃত ও চেতনাচেতন কৃত (৫) এই তিন প্রকার।"

"ধর্ম্মার্থকামৈস্ত্রিবিধঃ শৃঙ্গারঃ, কপটঃ পুনঃ ॥
স্বাভাবিকঃ কৃত্রিমশ্চ দৈবজো, বিদ্রবঃ পুনঃ।
অচেতনচেতনৈশ্চ চেতনাচেতনৈঃ কৃতঃ।"

[৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২৩৯—২৪০ শ্লোক]

আমরা তিনখানি গ্রন্থ হইতে সমবকারের লক্ষণ উদ্ধৃত করিলাম। কতকগুলি লক্ষণ তিনখানি গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে, কতকগুলি ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্রে নাই, দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণে আছে। লক্ষণগুলির অর্থও ভরত, ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ একপ্রকার করেন নাই। কাজেই সমবকারের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে এই তিনজনের লক্ষণগুলি একত্র আলোচনা করা আবশ্যক।

বিশ্বনাথ সমবকার শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, "সমবকীর্য্যন্তে বহবোঽর্থা অস্মিন্নিতি সমবকারঃ।" ধনিক অবলোক-নামক নিজ রচিত দশরূপকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন— "সমবকীর্য্যন্তেঽস্মিন্নর্থা ইতি সমবকারঃ।"

সমবকারের যে লক্ষণগুলি সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই, সেগুলি এই। দেবাসুর বিষয়ক ঘটনা ইহার আখ্যান-বস্তু হইবে। ইহাতে বারজন নায়ক থাকিবে। এই নায়কেরা বিখ্যাত ও ধীরোদাত্ত(৬) হইবে। ইহাতে তিনপ্রকার কপট, তিনপ্রকার শৃঙ্গার ও তিনপ্রকার বিদ্রব থাকিবে। তিন অঙ্কে ইহা সমাপ্ত হইবে। প্রথম অঙ্কের সময় দ্বাদশ নাড়িকা; দ্বিতীয় অঙ্কের চার নাড়িকা ও তৃতীয়ের দুই নাড়িকা।

এই লক্ষণের মধ্যে নায়ক দেব বা দানব হইবে, ধনঞ্জয় এইপ্রকার লিখিয়াছেন। বিশ্বনাথ দেব ও মানব লিখিয়াছেন। রাম-তর্কবাগীশ সাহিত্য-দর্পণের টীকায় লিখিয়াছেন, 'দেবমানবাঃ' ইহার পরিবর্ত্তে কোন কোন পুঁথিতে 'দেবদানবাঃ' এ পাঠও আছে। সুতরাং এ কথা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারা যায় না, যে বিশ্বনাথ দেব বা মানবই লিখিয়া গিয়াছেন। ভাসের পঞ্চরাত্র নামক সমবকারে আমরা মানবদেহধারী পঞ্চপাণ্ডব, কৌরবগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিরাট প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। ইঁহারাই নায়ক।

ধনিক নিজকৃত অবলোক-নামক দশরূপকের টীকায় লিখিয়াছেন "দেবাসুর প্রভৃতি দ্বাদশ নায়ক।" কাজেই কেবল দেব বা অসুরই যে নায়ক হইবে, ধনিক এ অর্থ করেন নাই। 'সমুদ্রমথন' নামক যে সমবকারের নাম উদাহরণ-রূপে ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নায়কগণ বোধ হয় কেবল দেব ও অসুর; আমরা অবশ্য এ গ্রন্থ দেখি নাই। নাম হইতে বিষয় অনুমান করিয়াই এ কথা বলিতেছি। কিন্তু পঞ্চরাত্রে

(৫) "চেতনাচেতনা গজাদয়ঃ।" বিশ্বনাথ।

(৬) "অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ ॥"
[সাহিত্য-দর্পণ ৩।৩২

যখন মানব-দেহধারী নায়ক রহিয়াছে তখন ধনিক-কৃত ব্যাখ্যা অবলম্বনে "দেব-দানব প্রভৃতি" অর্থ কল্পনা করাই সঙ্গত। তাহা হইলে লক্ষণে কোন দোষ পড়ে না।

ভরত লিখিয়াছেন, নাড়িকা, নালিকা বা নালী শব্দের অর্থ অর্দ্ধমুহূর্ত্ত। ধনঞ্জয় ও বিশ্বনাথ নাড়িকার অর্থ ঘটিকাদ্বয় লিখিয়াছেন।

এখন তিনপ্রকার শৃঙ্গার, কপট ও বিদ্রবের প্রয়োগসম্বন্ধে মতভেদ আছে। ভরত যাহা লিখিয়াছেন, তাহার এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে, যে প্রত্যেক অঙ্কেই কপট, শৃঙ্গার ও বিদ্রব থাকিবে। ধনিক দশরূপকাবলোকে এই প্রকার মত স্পষ্টই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ("প্রত্যঙ্কং যথাসংখ্যং কপটাঃ। তথা নগরোপরোধযুদ্ধ-বাতাগ্ন্যাদিবিদ্রবাণাং মধ্য একৈকো বিদ্রবঃ কার্য্যঃ। ধর্ম্মার্থকামশৃঙ্গারাণামেকৈকঃ শৃঙ্গারঃ। প্রত্যঙ্কমেব বিধাতব্যঃ।")

মন্দারমরন্দ নামক একখানি চম্পূকাব্য আছে। তাহাতেও দৃশ্যকাব্যের ভেদ ও লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আছে যে সমবকারের প্রথম অঙ্কে কপট, দ্বিতীয় অঙ্কে বিদ্রব ও তৃতীয় অঙ্কে শৃঙ্গার বর্ণিত হইবে। প্রত্যেক অঙ্কেই যে কপট, বিদ্রব ও শৃঙ্গার থাকিবে তাহা নহে।

"অঙ্কস্ত্রয়স্তত্র চাদ্যে মুখ প্রতিমুখে তথা।
বস্তুস্বভাবদৈবারিকৃতাঃ স্যুতঃ কপটাশ্রয়ঃ॥
কথামপি নিবস্ময়াত্তথা দ্বাদশনালিকাম্।
দ্বিতীয়েহঙ্কেহপি চতুর্ণালিকাবধিকাং কথাম্॥
পুরয়োধরণাগ্ন্যাদি নিমিত্তা বিদ্রবাস্ত্রয়ঃ।
তৃতীয়েহঙ্কে নিবদ্ধব্যা কথা চাপি দ্বিনালিকা।
ধর্ম্মার্থকামানুগুণাস্ত্রিস্রঃ শৃঙ্গারস্নীতয়ঃ॥"

[মন্দারমরন্দচম্পূ]

পঞ্চরাত্রের প্রথম অঙ্কে দ্রোণের কপট ভাব অবলম্বনে দান-প্রার্থনা, অগ্নি-প্রজ্বলন-রূপ বিদ্রব ও দুর্য্যোধনের যজ্ঞ-রূপ ধর্ম্মশৃঙ্গার বর্ণিত হইয়াছে। ভরত-কৃত ধর্ম্মশৃঙ্গারের লক্ষণ মানিলে দুর্য্যোধনের যজ্ঞে দীক্ষা ধর্ম্ম শৃঙ্গারের স্বরূপ বলিয়া কথিত হইতে পারে। পূর্ব্বে আমরা ভরতের যে লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছি; তাহা হইতে দেখা যাইবে, যে ধর্ম্মশৃঙ্গার নিজের মঙ্গলসাধক, ধর্ম্ম-সমাপক, বহুপ্রকার উপকরণ সহিত ব্রত-নিয়ম-তপোযুক্ত। এ লক্ষণ দুর্য্যোধন-অনুষ্ঠিত যজ্ঞবিষয়ে খাটে।

বিশ্বনাথ কিন্তু ধর্ম্মশৃঙ্গারের অন্যপ্রকার লক্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে শৃঙ্গার শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, তাহাই ধর্ম্মশৃঙ্গার। ("তত্র শাস্ত্রাবিরোধেন কৃতো ধর্ম্মশৃঙ্গারঃ।") রাম তর্কবাগীশ ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন "নিষিদ্ধকালে নিষিদ্ধযোষিতি কৃতঃ শৃঙ্গারঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধস্তদিতরো ধর্ম্মঃ শৃঙ্গারঃ।" এই অর্থ মানিলে পঞ্চরাত্রের প্রথমাঙ্কে ধর্ম্ম-শৃঙ্গার দেখা যায় না। বিশ্বনাথ আরও বলেন যে সমবকারের প্রথম অঙ্কে কাম-শৃঙ্গার অবশ্য থাকিবে। অন্যান্য অঙ্কে কোন্ শৃঙ্গার থাকিবে তাহার কোন নিয়ম নাই।

বিশ্বনাথের মতে, অর্থলাভার্থ কল্পিত শৃঙ্গার অর্থশৃঙ্গার ও প্রহসন-শৃঙ্গার কাম-শৃঙ্গার। বিশ্বনাথের লক্ষণ পঞ্চরাত্রে খাটে না। ধর্ম্ম-শৃঙ্গার, অর্থশৃঙ্গার ও কামশৃঙ্গারের যে প্রকার অর্থ বিশ্বনাথ করিয়াছেন, তাহার কোন প্রকারই পঞ্চরাত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভরতকৃত লক্ষণ মানিলে প্রথম অঙ্কে দুর্য্যোধন-যজ্ঞরূপ ধর্ম্মশৃঙ্গার, দ্বিতীয় অঙ্কে যুদ্ধ[illegible]

জন্য বৃহন্নলাকে উত্তরা দান করিবার প্রস্তাব রূপ অর্থশৃঙ্গার ও তৃতীয় অঙ্কে উত্তরা ও অভিমন্যুর বিবাহসূচক বর্ণনা কামশৃঙ্গার বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে।

দ্বিতীয় অঙ্কে গোগ্রহণ ও যুদ্ধরূপ বিদ্রব, বৃহন্নলা, যুধিষ্ঠির, ভীম প্রভৃতির ছদ্মবেশরূপ কপট ও অভিমন্যুর সহিত কপট কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে যুদ্ধরূপ বিদ্রব ও পাণ্ডবদিগের ছদ্মপরিচয় ও দ্রোণের ছলে দানগ্রহণরূপ কপট বিদ্যমান, কাজেই মন্দার-মরন্দ-রচয়িতার লক্ষণ থাটিতেছে না। প্রত্যেক অঙ্কেই কপট, শৃঙ্গার ও বিদ্রব দেখা যাইতেছে।

এই সকল পরস্পর-বিরুদ্ধ লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, সমবকার-শ্রেণীর বেশী রূপক বিশ্বনাথ, ধনঞ্জয় প্রভৃতিরও নয়নপথবর্ত্তী হয় নাই। বিশ্বনাথ ও ধনঞ্জয় উভয়েই কেবলমাত্র সমুদ্রমন্থন নামক সমবকারের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ঐ গ্রন্থ-খানিকে উদাহরণ ধরিয়াই সম্ভবতঃ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন। আমরা সমুদ্রমন্থন গ্রন্থ পাই নাই। কাজেই এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে পারিলাম না; কিন্তু ইহা মনে হয় যে উক্ত আলঙ্কারিকেরা সমবকারের লক্ষণ নির্দ্দেশকালে ভাসকৃত পঞ্চরাত্র স্মরণ করেন নাই। তাহা হইলে যাহা পঞ্চরাত্রে থাটে না এরূপ লক্ষণ আমরা সাহিত্য-দর্পণে বা দশরূপকে দেখিতে পাইতাম না। এই বিরুদ্ধ লক্ষণের আরও একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

সাহিত্য-দর্পণ ও দশরূপক উভয় গ্রন্থেই আছে, যে সমবকারে বিন্দু ও প্রবেশক নাই। ("নাত্র বিন্দুপ্রবেশকৌ") বিশ্বনাথ বৃত্তিতে আবার স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, "নাটকে বিন্দু ও প্রবেশক থাকিবে একথা বলা হইয়া থাকিলেও সমবকারে এ দুটি বিধেয় নহে।" ("বিন্দুপ্রবেশকৌ চ নাটকোক্তাবপি নেহ বিধাতব্যৌ।")

অবান্তরকথাবিচ্ছেদে তৎসংযোগকারী বিষয়কে বিন্দু বলে। ("অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।")

প্রবেশক দুই অঙ্কের মধ্যে সন্নিবিষ্ট অনুদাত্ত-বাক্য-কথনকারী নীচ-পাত্রযুক্ত হইয়া থাকে। (৭) বিশ্বনাথ ও ধনঞ্জয় সমবকারে প্রবেশক থাকে না, একথা বলিলেও পঞ্চরাত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যে আমরা নিম্নোদ্ধৃত প্রবেশক দেখিতে পাই।

[তাহার পর বৃদ্ধ গো-পালক প্রবেশ করিল]

বৃ-গো। আমার গরুগুলির বাছুর ভাল থাকুক

---

(৭) "নোত্তমমধ্যমপুরুষৈরাচরিতো নাপ্যুদাত্তবচনকৃতঃ।
প্রাকৃতভাষাচারঃ প্রবেশকো নাম বিজ্ঞেয়ঃ॥"

[নাট্য-শাস্ত্রম্, ১৮।৩৪]

"প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।
অঙ্কদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা॥"

[সাহিত্য দর্পণম্, ৬।৫৭]

"তদ্বদেবানুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।
প্রবেশোঽঙ্কদ্বয়স্যান্তঃ শেষার্থস্যোপসূচকঃ॥"

[দশরূপকম্। ১।৬০,৬১]

গোপ-যুবতীরা যেন বিধবা না হয়। আমাদের রাজা বিরাট একচ্ছত্র পৃথিবীর রাজা হোন্। মহারাজ বিরাটের জন্মদিন বলে গরু দিতে সমস্ত গোয়ালার ছেলে-মেয়েরা নূতন কাপড়, গয়না পরে নগরের উপবন-বীথীতে গরু এনে সাজাবে। এদের কর্ত্তা হয়ে দেখি। (দেখিয়া) আরে একি? এই কাকটা শুক্‌নো গাছে উঠে, শুক্‌নো গাছের ডালে মুখ ঘষে সূর্য্যের দিকে চেয়ে বিকৃতস্বরে বিলাপ করছে। আমাদের ও গরুগুলির শান্তি হোক্, শান্তি হোক্। এদের কর্ত্তা হয়ে গোয়ালার ছেলে-মেয়েদের ডাকি। (পরিক্রমণ করিয়া) ওরে গোমিত্রক। গোমিত্রক।

গোমিত্রক। (প্রবেশ করিয়া) মামা, প্রণাম হই।

বৃ-গো। আমাদের ও গরুগুলোর শান্তি হোক্; শান্তি হোক্। ওরে গোমিত্রক! মহারাজ বিরাটের জন্মদিন বলে গরু দিতে সমস্ত গোয়ালার ছেলেমেয়েরা নূতন কাপড় ও গয়না পরে নগরের উপবন-বীথীতে গরু এনে সাজাবে। ওরে গোমিত্রক! গোয়ালার ছেলেমেয়েদের ডাক্।

গো। যে আজ্ঞে মামা। গোরক্ষিণিকে। ঘৃত-পিণ্ড! স্বামিনি! বৃষভদত্ত! কুম্ভদত্ত! মহিষদত্ত! আয়, আয় শীগ্‌গির।

[সকলে প্রবেশ করিল]

সকলে। মামা, প্রণাম।

বৃ-গো। আমাদের, গরুগুলির, গোয়ালার ছেলে-মেয়েদের শান্তি হোক্, শান্তি হোক্। মহারাজ বিরাটের জন্মদিনে গোরু দিবার জন্যে এই নগরের উপবন-বীথীতে গরু এনে সাজাবে। যতক্ষণ গরু না আসে, ততক্ষণ নাচ-গান করি আয়।

[সকলে নৃত্য করিতে লাগিল]

বৃ-গো। হিঃ হিঃ, বেশ নেচেছিস্, বেশ গেয়েছিস্। আমিও এবার নাচি। (নৃত্য করিতে লাগিল)

সকলে। হা-হা—মামা, ভয়ানক ধুলো উড়ছে।

বৃ-গো। কেবল ধুলো নয় রে, শঙ্খ-দুন্দুভির শব্দও শোনা যাচ্ছে।

সকলে। হা-হা, মামা, ধুলোর ঢাকা সূর্য্য, দিনের বেলায় চাঁদের মতন ফেকাসে হয়ে গেছে। আছে কি না আছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে না।

গো। হা, হা, মামা। এই যে কোথাকায় চোর সব দইয়ের মত সাদা ছাতা ধরে ঘোড়ার গাড়ী চড়ে সমস্ত গোয়ালাপাড়া তাড়া দিচ্ছে।

বৃ-গো। হী-হী—তীর ছুট্‌ছে রে। ওরে ছেলেরা মেয়েরা! শীগ্‌গির ঘরে ঢোক্!

সকলে। যে আজ্ঞে মামা। (নিষ্ক্রান্ত হইল)

বৃ-গো। হা-হা। দাঁড়া, দাঁড়া। মার্, মার্। ধর্, ধর্। এই বৃত্তান্ত মহারাজ বিরাটকে জানাই। (নিষ্ক্রান্ত)

প্রবেশক।

ভরত নিজ লক্ষণে সমবকারে প্রবেশক থাকিবে না, একথা বলেন নাই। ভরতকৃত লক্ষণ অনুসারে পঞ্চরাত্রকে সমবকাররূপে গণ্য করিতে কোন বাধা নাই। কিন্তু দশরূপক ও সাহিত্য-দর্পণের লক্ষণ সমস্ত ইহাতে খাটে না।

এখন ইহা অনুমান করা কি অসঙ্গত, যে নাট্যশাস্ত্রের সময় যে সকল সমবকার প্রচলিত ছিল, তাহা দেখিয়াই ভরত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেক-গুলি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে, সমুদ্রমন্থন বা আর দুই-একটি সমবকার দেখিয়া বিশ্বনাথ ও ধনঞ্জয় সঙ্কীর্ণতর লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন? আমাদের মতে ইহা হইতে ভাসের প্রাচীনত্ব সুপ্রমাণিত হইতেছে।

পঞ্চরাত্রে প্রথমেই সূত্রধারের মুখে একটি শ্লোকে সুকৌশলে নায়কগুলির নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সে শ্লোকটি এই:—

"দ্রোণঃ পৃথিব্যর্জ্জুনভীমদূতো
যঃ কর্ণধারঃ শকুনীশ্বরস্য।
দুর্য্যোধনো ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরঃ স
পায়াদ্ বিরড়ুত্তরগোঽভিমন্যুঃ॥

ইহাতে এগারজন নায়কের নাম আছে। লক্ষণ অনুযায়ী দ্বাদশজন নায়ক থাকা উচিত।

মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহণ এই পাঁচপ্রকার সন্ধি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মূল ঘটনার অবতারণা (মুখ-সন্ধি) তাহার পর তাহার ঈষদ্বিকাশ (প্রতিমুখ-সন্ধি,) পরে অন্যান্য বিরোধী বা অনুকূল ঘটনার সহিত সংঘর্ষ (গর্ভ-সন্ধি,), এই সংঘর্ষের বিস্তৃতি (বিমর্শ-সন্ধি) ও পরিশেষে সমাপ্তি (নির্বহণ-সন্ধি)। সমবকারের প্রথম অঙ্কে মুখ ও প্রতিমুখ সন্ধি, দ্বিতীয় অঙ্কে গর্ভ-সন্ধি ও শেষ অঙ্কে নির্বহণ-সন্ধি থাকে। বিমর্শ-সন্ধি সমবকারে প্রযুক্ত হয় না। আমরা পঞ্চরাত্রের যে আখ্যায়িকা-বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পূর্ব্বে দিয়াছি তাহা হইতেই পাঠকগণ ইহার যথার্থতা উপলব্ধি করিবেন।

সমবকারে কৈশিকীবৃত্তি থাকে না। কেননা, ইহা বীররসপ্রধান। শৃঙ্গারপ্রধান নাট্যে কৈশিকীবৃত্তি প্রযুক্ত হয়। উৎকৃষ্ট ও বিচিত্র বেশভূষাযুক্ত, নৃত্য-গীতবহুল, স্ত্রীজন-সঙ্কুল, মনোহর বিলাসযুক্ত ও শৃঙ্গারের অঙ্গপূর্ণ বৃত্তিই কৈশিকী-বৃত্তি। পঞ্চরাত্র বীররসপ্রধান।

সমুদ্রমথন নামক সমবকারে নায়কদের পৃথক্ পৃথক্ ফললাভ বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রের ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবাদি লাভ, নারায়ণের লক্ষ্মীলাভ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ফল। পঞ্চরাত্রেও অভিমন্যুর উত্তরালাভ, পাণ্ডবদের রাজ্যলাভ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্ প্রভৃতি বিবিধ ছন্দ সমবকারে প্রযোজ্য। পঞ্চরাত্রের শ্লোক-গুলি নানাপ্রকার ছন্দে রচিত।

উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, প্রপঞ্চ, ত্রিগত, ছল, বাক্‌কেলি, অধিবল, গণ্ড, অবস্যন্দিত, নালিকা, অসৎ-প্রলাপ, ব্যাহার ও মার্দ্দব এই ত্রয়োদশ প্রকার বীথ্যঙ্গ সমবকারে প্রয়োগ করিতে হয়। পঞ্চরাত্রে এগুলির প্রয়োগ আছে। মূল ব্যতীত ইহা বুঝান যাইবে না বলিয়া বাহুল্যভয়ে আমরা সে চেষ্টায় বিরত হইলাম।

পঞ্চরাত্রের একটি বিশেষত্ব যাঁহা আর কোন সংস্কৃতরূপকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না এই যে, ভাস এখানে প্রচলিত কাহিনী রূপান্তরিত করিয়া নাট্যের আখ্যানবস্তু কল্পনা করিয়াছেন। এ সাহস আর কোন কবির দেখা যায় না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে বিধান আছে বটে যে, যদি কোন স্থলে নায়ক-চরিত্র বা রসের বিরুদ্ধ অনুচিত কোন ঘটনা থাকে তাহা হইলে হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে, না হয়, তাহা অন্যপ্রকারে রূপান্তরিত করিবে। রাম-চরিত লইয়া যাঁহারা নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বালিবধ দেখাইলে নায়কের চরিত্রে দোষ পড়িবে বলিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। উদাত্ত-রাঘবে বালিবধ ঘটনা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মহাবীর-চরিতে ভবভূতি রামবধার্থ আগত বালীকে রাম নিহত করিলেন, এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে নায়কচরিত্র বা রসের বিরুদ্ধ কোন বস্তু নাই, সেখানে নিজ কল্পনা অনুসারে প্রচলিত কাহিনীবিরুদ্ধ কথাবস্তু রচনা প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

যেখানে কিছুর উল্লেখ থাকে না, সেখানে

না হয় অতিরিক্ত দুই-একটি ঘটনা কবি সংযোজন করিতে পারেন। কিংবা প্রসিদ্ধ ঘটনার হেতু বিভিন্ন প্রকারে কল্পনা করিতে পারেন। হোমরের ইলিয়াদে আগামেমননের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীর ব্যভিচার উল্লিখিত হইলেও, আগামেমননের পুত্র ওরেসটিসের, ভগিনী ইলেকট্রার সহায়তায় মাতৃহত্যার বিশদ চিত্র নাই। এস্কিলাস্,সফোক্লিস্ ও ইউরিপিদিস্ এই তিনজন নাট্যকারই এই ঘটনা লইয়া নাট্য রচনা করিয়াছেন। তিনজন তিন প্রকারে মাতৃহত্যার চিত্র দেখাইয়াছেন. ওরেসটিসের মনের ভাব তিন নাটকে তিন প্রকারে চিত্রিত। এখানে কবিদের স্বাতন্ত্র্য দেখা গেলেও কাহিনী অন্যরূপে কল্পনা করা কোথাও দেখা যায় না। তাহা অভিনয়ের সময় শ্রোতৃবর্গের মনঃপূত না হওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু ভাস যে এ সকল কারণ সত্ত্বেও পঞ্চরাত্রের ঘটনা মহাভারত-বিরুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছেন,' ইহা স্মরণীয়। অন্যান্য গুণের কথা ছাড়িয়া দিলে কেবল এই বৈচিত্র্য হেতু পঞ্চরাত্র সংস্কৃত নাট্যগুলির মধ্যে বিশেষ স্থান পাইবার যোগ্য।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

কাশফুল

একি তৃণ-সুগহন সবুজসায়রে,
কাশের শুভ্র ঢেউ!
ওগো শরতের মেঘ নেমেছে ধরায়
বুঝি না জানিতে কেউ!

মরি জ্যোৎস্না-মদিরা পান করি কিগো
ঘাসেরও খুলিল রূপ!
আজ শারদ-রাণীর পূজার দেউলে
কে জ্বালালো এত ধূপ?

হায় শেফালি-মাল্য লাজে ম্লান হয়
কাশের বাহার দেখি।
আর পটুয়ার হাতে গুপটু তুলিটি
আপনারে ভাবে মেকি।

ওই পবনের আগে কাশগুলি দোলে,—
—পুলকে দুলিছে হিয়া!
ও কি জগতের সব মলিনতা আজ
মুছিবে পরশ দিয়া?

আহা ও তো নহে ফুল, অতি সুতরুণ
ধরার অঙ্গুলি ও!
ওগো জননী মাটীর পরশ ওতেই
তাই তো সবার প্রিয়!

ওরে ওরে কাশফুল! পরিচয় দিতে
তুলনা খুঁজে না পাই;
ওরে নির্ম্মলতাই পরিচয় যার
আর কিবা তার চাই!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

আর্টে নব-ধারা

ছবিকে এতদিন আমরা সার্ব্বজনীন ভাষা বলেই জান্‌তুম ও মান্‌তুম। সাধারণ লিখিত ভাষা সকলে পড়্‌তে পারে না—মূর্খের কাছে তা হিজিবিজির মতই অসার্থক এবং অনর্থক। আবার এক ভাষায় বর্ণপরিচয় হ'লেই যে পৃথিবীর সব জাতির সব ভাষা বুঝতে পারব—তাও নয়। কোন ভালো লিখিয়ের ভালো বই শত শত অনুবাদের দ্বারা আংশিক রূপে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পারে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কখনো নয়। কারণ, অনুবাদে মূলের প্রকৃত প্রতিকৃতি থাকে না—থাকে তার বিকৃত অনুকৃতি।

ছবিতে এ-সব আপদ-বালাই নেই। ছবির ভাষা সব দেশেই অনেকটা এক। অজ্-পাড়াগাঁয়ের এক বাঙালী চাষাও র‍্যাফেলের আঁকা মাতৃমূর্ত্তির ভাব মোটামুটি

অনন্তের পথে
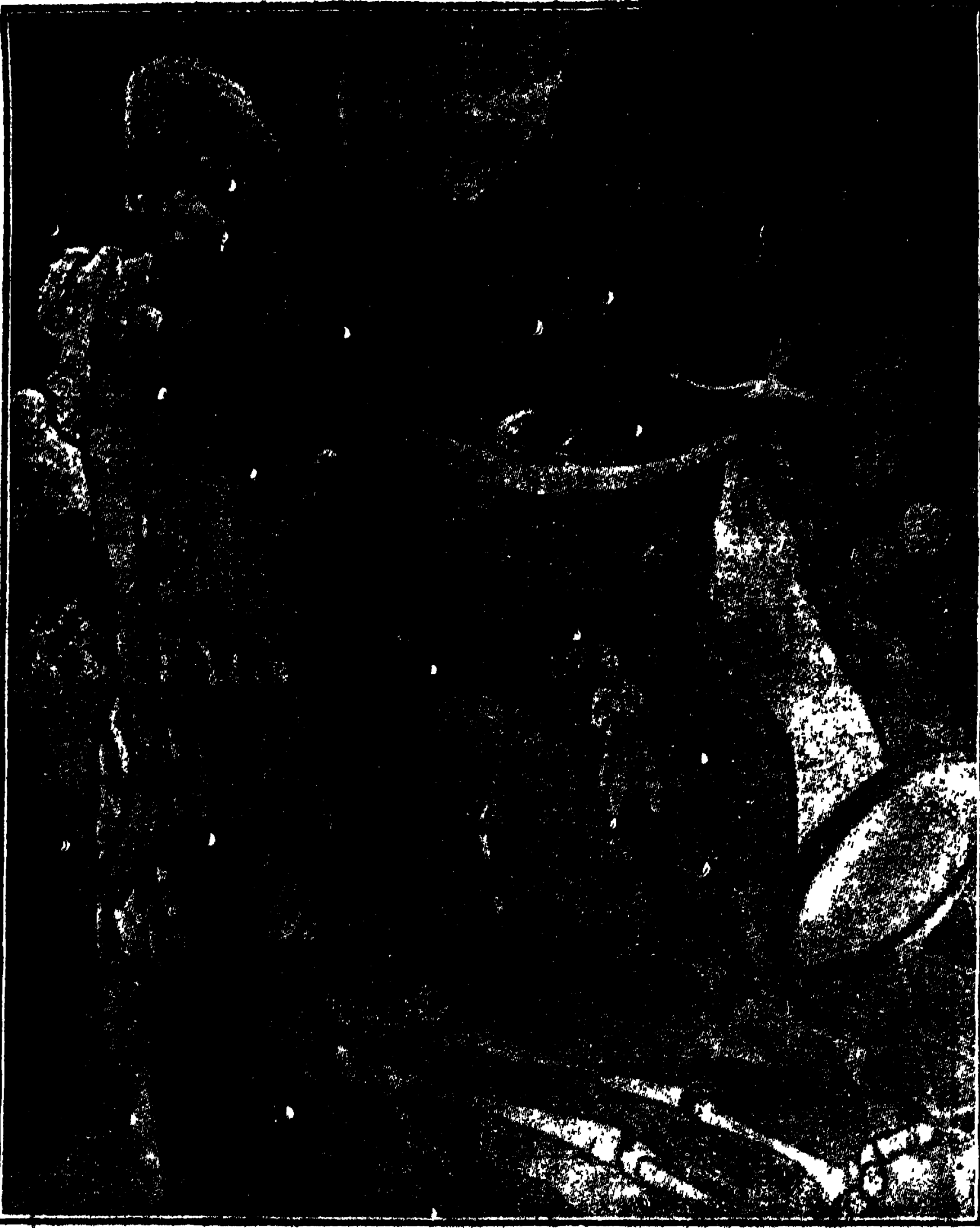
ক্রৌড়ক

একরকম বুঝ্‌তে পার্‌বে। ছবির ভাষা এম্‌নি সার্ব্বজনীন বলেই সেকালে নানাজাতির ধর্ম্মমন্দিরে ছবি এঁকে সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তার প্রমাণ রিম্‌স্‌ প্রভৃতি স্থানের অসংখ্য গির্জ্জা এবং ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলির ভিত্তি-চিত্র।

কিন্তু আধুনিক চিত্রকরদের অনেকেই চিত্রাঙ্কনের নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার কর্‌ছেন; ফলে ছবির সার্ব্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়্‌ছে। অবশ্য, এখানে ভালো-মন্দের বিচার হচ্ছে না—আমরা সুধু বল্‌তে চাই, একালের অনেক ছবির আসল ভাব মূর্খের মাথায় ঢোকা ত দূরের কথা, পণ্ডিতের মাথাতেও ঢুক্‌বে না। এখানে ব্যাখ্যা কর্‌লে পণ্ডিতের মুখ হয়ত প্রসন্ন হবে, কিন্তু হতভম্ব মূর্খ-বেচারী 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই পড়ে থাক্‌বে!

দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন বিখ্যাত আঁকিয়ের খান-তিনেক ছবি দিলুম। প্রথম দৃষ্টিতেই ছবিগুলির ভিতরে যাহা দেখা যাইবে, তাহাই তাহার আসল অর্থ নয়—কেননা এগুলি চিন্তাত্মক। বৈষ্ণব-কবির অনেক কবিতার

যাদুকর

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মত এই চিত্রগুলিও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

যেমন, প্রথম ছবি 'অনন্তের পথে'। এখানি দেখ্‌লে সকলেরি মনে হবে, এ বুঝি আরব্য-উপন্যাসের কোন গল্পের ছবি! কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়; এই পটে দেখানো হচ্ছে, দুটি আত্মা নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে ইন্দ্রলোক থেকে দুর্জ্ঞেয় পরলোকের দিকে। তাঁদের বাহন ঐযে উটটি দেখ্‌ছেন, ওটিকে উট ভাবলেই মুস্কিলে পড়্‌বেন—কেননা ঐ কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহটি হচ্ছে মূর্ত্তিমান সত্য! অসীম-অনন্ত শূন্যতার মধ্যে পড়েও ধ্বংসের সম্মুখে এসেও আত্মনিমগ্ন প্রেম আপনাতে অটল হয়ে আছে—এইটিই এখানে ছবির বিষয়।

তারপর—'খেলোয়াড়'। ছবির 'ক্ষেত্র-পৃষ্ঠে' (Back ground) একটি পাহাড়। ভালো করে' দেখ্‌লে দেখ্‌বেন, ওটি পাহাড়

নয়, একটি কাফ্রির মাথা,—জীবনের পর্ব্বত-প্রমাণ মূর্খতা ও অজ্ঞানতার প্রতিমূর্ত্তি। নীচে তিন-চারটি সংসারী লোকের মাঝখানে যে কঙ্কালটি দীপ হাতে করে' বসে আছে, সে হচ্ছে অন্ধ মৃত্যু—অক্ষিকোটর থেকে বিলুপ্ত দৃষ্টিকে সে খুঁজে বের্ কর্‌তে চায়! সামনেই বিরাট খেলোয়াড়ের মূর্ত্তি, হাতের পুতুলে কোন খুঁৎ আছে কি না, একমনে সে তাই পরখ কর্‌ছে। চিত্রকর দেখাচ্ছেন, এই মিছে জাঁকজমকে ভরা জীবনটা হচ্ছে মস্ত একটা খেলনা!

তৃতীয় ছবি—'যাদুকর'। যাদুকরের স্বহস্তে-সৃষ্ট দানব তার স্রষ্টাকেই উদর-গহ্বরে নিক্ষেপ কর্‌তে উদ্যত,—কার্‌দানি দেখাতে গিয়ে যাদুকর-বেচারী ভারি ফ্যাঁসাদেই পড়ে গেছে আর কি! এই ছবির আসল অর্থ হচ্ছে আমরা যেচে নিজের অমঙ্গলকে নিজেই ডেকে আনি।

আজকাল শিল্পীসমাজে রূপকের ব্যবহার দিন-কে-দিন বেড়েই চল্‌ছে। সুধু প্রতীচ্যে নয়,—প্রাচ্যদেশে জাপানী এবং ভারতীয় চিত্রপদ্ধতিতেও প্রায়ই রূপকের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ করা হয়। বাল্যকালে শিশুপাঠ্য পুস্তকে আমরা যে-সব ধাঁধার ছবি দেখ্‌তুম, একেলে শিল্পীদের চিন্তাত্মক ছবিগুলিও প্রায় তেম্‌নি; তবে এ ধাঁধা উঁচুদরের এবং ছেলে ভুলোনো না-হয়ে বুড়ো-ভুলোনো—এই যা তফাৎ। কিন্তু আর্টের এ ধাঁধা বুঝতে হ'লে খালি মাথা খাটালেই চল্‌বে না, সেই সঙ্গে মাথার ভিতরে জ্ঞান নামে দুর্লভ পদার্থটিও থাকা চাই। শিশুদের হাসাতে ও মন-মজাতে

জীবনের বোঝা

পার্‌লেই ছেলেদের ধাঁধার কাজ শেষ হয়। কিন্তু এই শিল্প-ধাঁধার মধ্যে ও-রকম তরলতা নেই—এ চায় রসিকের চিত্ত-সায়রে ভাবের তরঙ্গ তুল্‌তে, নানা রহস্যের মধ্যে ফেলে জীবনের বিচিত্র রূপ জাগ্রৎ কর্‌তে!

কর্ম্ম ও ভ্রাতৃত্ব
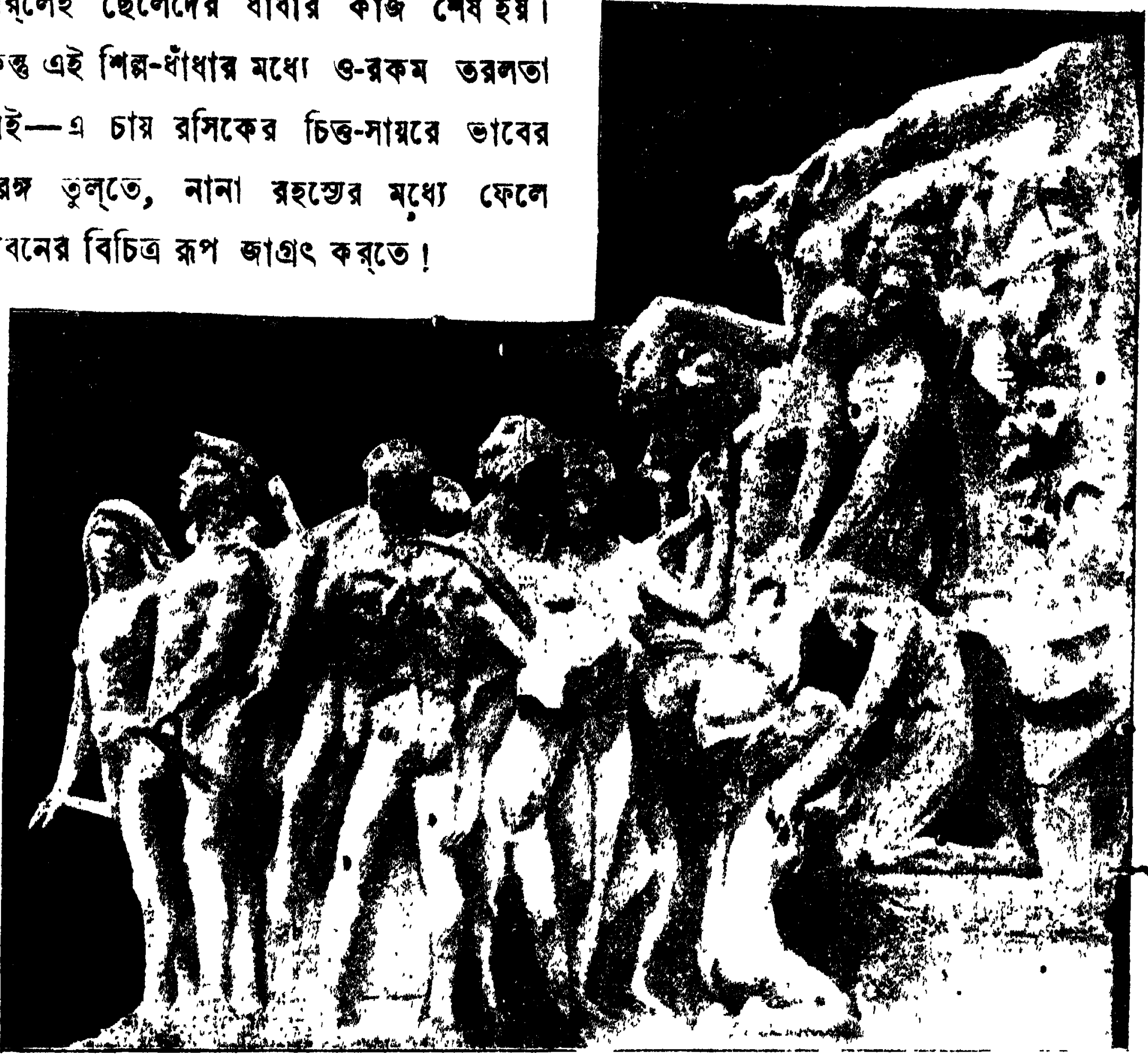
আর্টের এক ধরা-বাঁধা রীতির মধ্যেই শিল্পীরা এতদিন লৌকিক সুখ-দুঃখের ছবি দেখিয়ে আস্‌ছিলেন। এই নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিই ছিল আর্টের মাপকাঠি এবং এথেকে একটু এদিক-ওদিক হ'লেই আর রক্ষে ছিল না—সাধারণের চক্ষে শিল্পীর কার্য্য একেবারে খেলো হয়ে পড়্‌ত।

কিন্তু নব-যুগের শিল্পীরা এই বাঁধা-দস্তুরের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ কর্‌তে চান,—তাঁরা বলেন, আর্টকে কোন-একটা সীমার মধ্যে বন্দী করে' রাখা চলে না, যদি তোমার কাজে সামঞ্জস্য আর সৌন্দর্য্য থাকে, তাহলে তুমি দস্তুরের ভিতরেই থাক আর বাইরেই যাও তাতে কিছু এসে-যাবে না, আমরা তোমাকে আর্টিষ্ট বলে মান্‌তে বাধ্য হবই।

সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে তাই এখন বিদ্রোহের বিজয়-দুন্দুভি বেজে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা', 'ডাকঘর' ও 'ফাল্গুনী'; মেটারলিঙ্কের 'ব্লু-বার্ড', লিওনিড্‌ আন্দ্রীভের ভাবাত্মক নাটক প্রভৃতি এই বিদ্রোহের অমৃত-ফল। সাহিত্যের ওস্তাদ কারিকরেরা দেখিয়ে দিলেন, নাটক-রচনার পুরাতন পদ্ধতিটিই আদর্শ পদ্ধতি নয়—ভালো আর্টিষ্টের হাতে পড়্‌লে যে-কোন একটা নূতন আকারের মধ্যে নাটকের নাটকত্ব পরিস্ফুট হ'তে পারে।

ভাস্কর জর্জ গ্রে বার্ণার্ড

যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন

ভাস্কর্য্য-ক্ষেত্রেও দেখি ওগস্ত্‌, রোদাঁ, জর্জ্জ গ্রে বার্ণাড ও মেষ্ট্রোভিক্ প্রভৃতি শিল্পী বিদ্রোহের এই বীজ বপন কর্‌ছেন।

ভাস্কর বার্ণাডকে লোকে মানবতার উপাসক বলে জানে। আমরা এখানে তাঁর কাজের নমুনা দিলুম। আগে আমরা যে তিনখানি চিহ্নাত্মক ছবি দেখিয়েছি, বার্ণাডের কাজ সেগুলির মত দুর্ব্বোধ না-হ'লেও আপাত-দৃষ্টিতে তাঁর গড়া মূর্ত্তিগুলিরও গুপ্তরহস্য বোঝা যাবে না,—কারণ, এখানেও রূপকের মধ্য দিয়ে শিল্পীর পরিকল্পনা আত্মপ্রকাশ করেছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

স্বরলিপি

কীর্ত্তনের সুর—একতালা।

কে জানে, সখি, কে জানে,
কেন হেন পরাণ কাঁদে কে জানে।
নয়নের জল, উথল চঞ্চল,
যতন বাঁধন না মানে,
না মানে, সখি, না মানে॥

পাখী গায় দূরে, বাজে বাঁশী পুরে,
কে ডাকে আমায় সে সুরে;—
হৃদয়-দুকূলে ঢেউ ছোটে ফু'লে,
আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে টানে,
সে টানে, সখি, সে টানে॥

কথা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

২ ৩ ১

I মা মা পা II { · পা ধা। মপা মগা রা। গরা সন্া সা।

কে জা নে { ০ স খি • কে০ জা নে ০০ ০০ ০

২´ ৩ ০ ১
I –া –া সা। সা রা গা। মা পা ধা। পমা গরা গা।
০ ০ কে ন হে ন প রা ণ কাঁ০ ০০ দে

২´
I মা মা পা } II
"কে জা নে"

২´ ৩ ০ ১
II { পা পা ধা। ধা ধা –া। পর্সা র্সা নধা। পর্সা নধা পা } I
ন য় নে র জল্ ০ উ থ ল০ চ০ ঞ্চ০ ল

১
I পা পা র্সা। না ধা পা। গপা মগা রা। –া –া –া
য ত ন বাঁ ধ ন না০ মা০ নে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা। –া পা ধা। মপা মগা রা। –গরা –সন্া সা।
না মা নে ০ স খি না০ মা০ নে ০০ ০০ ০

২´ ৩ ০ ১
I –া –া সা। সা রা গা। মা পা ধা। পমা –গরা গা।
০ ০ কে ন হে ন প রা ণ কাঁ০ ০০ দে

২
I মা মা পা II
"কে জা নে"

২´ [মা। গরা] ৩ ০ ১
II { রা রা রা। রা রা রা। –া –া –া। –া –া –া।
পা খী গা য় দূ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I রা পা মা। মা –া –গরা। গা গা –রা। –গা –া –া } I
বা জে বাঁ শী ০ ০০ পু রে ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I র্সা –া ণা। ধা পা –া। গমা –পমা –গরা। –া গা মা।
"কে ০ ডা কে গা ০ মায় ০০ ০০ ০ সে সু

২ ৩ ০ ১ ০
–পা –া পা। –া –া –া। { পা পা ধা। ধা ধা ধা।
০ ০ রে ০ ০ ০ হৃ দ য় দু কু লে

২´ ৩ ০ ১
I পা র্সা র্সা। র্সনধা –া –া। না না –ধা }। পা পা পা।
ঢে উ ছো টে০ ০ ০ ফু লে ০ ০ আ কুল

২ ৩ ০ ১
I পা পা র্সা। না ধা পা। মগা -রা -া। -া গা পা।
ভা সি য়ে নি য়ে যা য়্ ০ ০ ০ সে টা

I পা -া -া। -া পা ধা। পমা মগা রা। -গরা -সন্া -সা
নে ০ ০ ০ স খি সে০ টা নে ০০ ০০ ০

২ ৩ ০ ১
-া -া সা। সা রা গা। মা পা ধা। পমা -গরা -গা।
০ ০ কে ন হে ন প রা ণ কাঁ০ ০০ দে

২
I মা মা পা II
"কে জা নে"

শরতের গান

বেরিয়ে এল সোনার হরিণ
স্থল্-কমলের বন থেকে ;—
ভোম্‌রা-মেঘের কাম্‌রা যেমন
টুট্‌ল হাওয়ার হাই লেগে !
প্রশান্ত কার নয়ন গো আজ প্রফুল্ল,
চোখের জলে ধোয়া, মরি,
ওই হাসিটি অমূল্য !
জাগ্‌ল হিয়ার হারা হাসি
ওই হাসিরই রং মেখে,
আশার আলো ফুট্‌ল, ঊষার
আল্‌তা-হাতের ছাপ এঁকে !

কার দু' ঠোঁটের স্পন্দনে আজ
প্রাণের পুরে সুর বাজে,
হরষ যে আজ রোয়াঁয় রোয়াঁয়
ছড় দিয়েছে এস্‌রাজে !
নেইতো কোথাও বেছুট বেসুর আজ কিছু,
চোখে চোখে মিল্‌লে এখন
নাই বা হ'ল চোখ নীচু,

ভালোবাসার শরত আলো
আঁখির আলোয় আজ রাজে,
কান্না-শেষের হাসির যে তাজ
সেজেছি আজ সেই তাজে !

আজ কেবলি সকল বেলা
সকালবেলার বয় হাওয়া।
শিউলি-ঝরা ঝর্ণা-তলা
ভোরের তারায় রয় ছাওয়া !
শুকতারা সে আঁখির তারায় কার জাগে !
দুখের সুখের সব কথা, কার—
মনের কোণে ঠাঁই মাগে !
কার হাসিটির ঊষা-প্রভায়
হারানো দিন যায় পাওয়া !
মন্-গহনের মায়া-হরিণ
নিতান্ত কার মুখ-চাওয়া !

অতসী আর অপরাজিতায়
মন টানে মোর প্রাণ টানে !

যার চুলে ফুল সর্ব্বজয়া
বীণ্ মাতে তার জয়গানে !
আঁধার অতল শাম-সায়রে ফুট্‌ল কে !
স্নিগ্ধ হাসির শম্‌-শীতলে
জুড়িয়ে ভুবন উঠ্‌ল কে !
মেলিয়ে পাখা লাখ্ বলাকা
চল্‌ছে ছুটে কার পানে !
মুখখানি কার অমল উজল
অপ্সরীদের রূপটানে !
ফুলের চামর দুলিয়ে রে আজ
ফির্‌ছে সমীর কার লেগে !
তবক্-মোড়া ধূলোর পথে
আলোর হরিণ ধায় বেগে !
সোনার ধূলোয় হয় সোনালি অন্ধকার !
পায়ের পাতায় লক্ষ চপল
আঁখির পাতার ছন্দ কার !
নীল কমলের বন থেকে কি
বেরিয়েছে সে মন থেকে !
মুগ্ধ পথন মুগ্ধ ভুবন
মজ্‌ল নয়ন রূপ দেখে !

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ।

রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী *

(৫)

রাজা অতুলেশ্বরের তৃতীয়া কন্যা জন্মগ্রহণ করিল ঠিক জন্মাষ্টমীর দিনে। দুই কন্যার পর এবার রাজাবাহাদুর যে পুত্র-মুখ দর্শন করিবেন—এ বিষয়ে রাজবাড়ীর বালবৃদ্ধ সকলেই এক রকম নিঃসন্দেহ ছিলেন ;—নহিলে তাঁহার আভিজাত্য-তরণীর হাল ধরিবে কে ? রাজার বংশরক্ষা, কুল রক্ষা, রাজ্যরক্ষা হইবে কিরূপে ?

রাত্রিকাল হইতে এই বহু প্রত্যাশিত নবীন কাণ্ডারীর আগমন অভ্যর্থনা উপলক্ষে সকলেই ব্যতিব্যস্ত ; বহির্বাটীতে ডাক্তার গণৎকার গুরুপুরোহিতদিগের সমাগম হইয়াছে ; অন্তঃপুরে সূতিকাগৃহের পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দা আত্মীয়া, দাসীপরিচারিকায় পূর্ণ ; তাহারা শঙ্খ, ধান্যদূর্ব্বা, নববস্ত্র, রত্নভূষণ প্রভৃতি বিবিধ আয়োজন-দ্রব্যাদি সাজাইয়া অতিথিবরণ জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, এবং নিশ্বাস ফেলিবার অনবসর সত্ত্বেও গল্পগুজবে সুখনিশা অতিবাহিত করিতেছে। নীচের উঠানে সমবেত বাদ্যকারগণ মঙ্গল শঙ্খধ্বনিতে অতিথির শুভাগমন বার্ত্তা লাভের জন্য কাণ পাতিয়া আছে। চারিদিকের উৎফুল্ল জনতা-বেষ্টিত সূতিকাগৃহ জনবিরল, কেবল দুইজন মাত্র ধাত্রী সেখানে প্রসূতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল, আর মহারাণী—অতুলেশ্বরের মাতা বধূর শীর্ষদেশে বসিয়া তাহাকে বীজন করিতে করিতে নাম জপ করিতেছিলেন।

রাজা চিন্তিত মনে শুষ্কমুখে সংবাদ

* "হাসি" গল্পের অনুবৃত্তি।

লইবার জন্য বারবার অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেছিলেন। তিনিই কেবল ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—তিনি কি চান—কন্যা বা পুত্র; প্রসূতির চিন্তাতে এমনি তিনি চিন্তামগ্ন।

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমসুন্দর-মন্দিরে যখন নহবতে প্রভাতী রাগিণী বাজিয়া উঠিল ঠিক সেই সময়ে নবশিশু ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার রোদনধ্বনিতে অন্তঃপুরিকাগণের প্রাণে একটা অপরিমিত উচ্ছ্বলিত আনন্দ আবেগ বহাইয়া দিল। দোলোৎসব রাগিণী আজ তাহার মধ্যে অস্ফুট, আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। শিশুকণ্ঠের সাড়া পাইয়া মঙ্গল-শঙ্খ তাহার প্রতিধ্বনি গাহিল, হুলুধ্বনি উঠিল, বাদ্যকার-দিগের ঢাক ঢোল কাঁসী ঘণ্টা,—সানাইএর মৃদু নিনাদে মিলিত হইয়া আকাশে বাতাসে একটা পুলক মত্ততা জাগাইয়া তুলিল। বহির্বাটী ও অন্তর্বাটীর সন্ধিস্থলে যে প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত ছিল—সে তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজাকে গিয়া খবর দিল যে তাঁহার বংশধর ও ছত্রধর জন্মিয়াছে।

এই সকল কাণ্ড এমন চকিতে সম্পন্ন হইয়া গেল যে নবশিশু যে কি সন্তান ইহা জিজ্ঞাসা করিতেও মহারাণীর অবসর হইল না,...বুঝি সাহসেও কুলাইল না।

ধাত্রী যখন শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া আপনা হইতে বলিল—"কন্যা-সন্তান গো" তখন মহারাণীর নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া পড়িল; নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—প্রসূতির মুখে গরম দুধ দিতে তিনি ভুলিয়া গেলেন। শিশুর রোদনধ্বনি শুনিয়া বারান্দা হইতে উঠিয়া—দ্বার ঠেলিয়া যাহারা সূতিকা-গৃহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল—তাহারা হা-হুতাশ করিতে করিতে কেহ বসিয়া পড়িল কেহ বা ফিরিয়া গেল; শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি সহসা থামিয়া পড়িল। নিমেষের মধ্যে চারিদিকে যেন একটা হাহাকার প্রবাহ বহিল; উঠানের বাদ্যধ্বনি কেবল থামিল না, যেমন বাজিতেছিল সেইরূপই বাজিতে লাগিল, বাদ্যকারদিগকে বারণ করিবার উদ্যমটুকুও তখন কাহারও রহিল না।

তাহার নবসংসারে এতদূর নিরানন্দ নিরাশা আনয়ন করিয়াছে তাহা না জানিয়া সদ্যোজাত সদ্যোস্নাত নব বস্ত্রে সজ্জিত শিশু মধু মুখে পাইয়া দুইটি অঙ্গুলির সহ চক চক শব্দে তাহা পান করিতে করিতে প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার প্রতি আনন্দ-বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ধাত্রী কিছু পরে মহারাণীর কোলে কন্যাকে ফেলিয়া দিয়া কহিল—"মেয়ে হয়েছে তাতে এত দুঃখ কেন মহারাণী? সাত রাজার ধন এক মাণিক বলে কোলে তুলে নিন্। দেখুন দেখি কত রূপ!"

তখন প্রসূতি নিরাপদ হইয়াছেন,—তাঁহার সেবাশুশ্রূষা শেষ করিয়া ধাত্রী তাঁহার গায়ের উপর একখানা শুভ্র বস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে। সূতিকার দ্বার সকল এখন উন্মুক্ত, গৃহপ্রবিষ্ট অরুণালোকে বালিকা-শিশুর মুখ-খানি কি সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া মহারাণীর অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এ কি! সত্যই, এ কি রূপ! কি লাবণ্য? সুবর্ণবর্ণের গোলায় কে যেন ইহাকে ধুইয়া দিয়াছে। মহারাণী অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু মেয়ের

রূপ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ কমিল না—বরঞ্চ বাড়িয়া উঠিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি মনে মনে বলিলেন—"এ শিশু যদি আমার অতুলের পুত্রসন্তান হইত—হায়রে!"

রাজা কন্যা দর্শনে আসিলে মা বলিলেন—

"এবারও তোমার মেয়ে হোল অতুল! ভেবেছিলুম ছেলে হবে—তা ভগবান সে আশা পূর্ণ করলেন না।"

রাজা সতৃষ্ণ নয়নে কন্যাকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন—"তাতে দুঃখ কেন মা, —সংসারে কি মেয়ের দরকার নেই?"

"আমাদের সংসারে ছেলেরই যে দরকার ছিল। তা এবার হোলনা! অন্যবারে হবে।"

"নাই হোল মা।"

"বেশ বলছিস্ যাহক। তোর এত বড় বংশ এত বড় নাম সব লোপ পেয়ে যাবে নাকি?"

"লোপ পাবে কেন? মেয়েরাই আমার নাম রাখবে?"

"জ্বালাসনে অতুল! তুই হলি রায় চৌধুরী—জামাই হবে তোর ঘটক, ফটক, চটক এই রকম সব ত!"

"এই জন্যে এত ভাবনা! আমি দেখো —নামের মামলা ঠিক মিটিয়ে নেব। জান—চাটুয্যে বাড়ুয্যে মজুমদার মহালানবীশ —সকলেই রায়চৌধুরী হতে পারে,—আমি যে জামাই করব—তার ল্যাজে নিশ্চয়ই রায়চৌধুরীটা বসিয়ে দেব—তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা।"

"হাসাস্‌নে বাছা,—আহা এ মেয়ে যদি তোর ছেলে হয়ে জন্মাত রে!"

"অত দুঃখ কেন করছ মা! ভুলে গেছ যে আমাদের আদি বংশ মেয়েরই বংশ। আমার প্রমাতামহী তাঁর পিতৃরাজ্যে রাণী হয়েছিলেন—আমার মেয়েও তাই হবে। আমার অন্য দু মেয়ের নামকরণ করেছ তুমি, আমি এ মেয়ের নাম রাখলুম—রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী। তোমার নাতি হয়নি বলে যে ক্ষোভ হয়েছে—নাতনীকে রাণী বলে ডেকে সে ক্ষোভ মিটিও। যদি তাতেও দুঃখ না ঘোচে—তবে না হয় রাজা বলেই একে ডেকো।" এই বলিয়া রাজা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

* * *

জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিল বলিয়া ঠাকুরমা যে পরিমাণে দুঃখিত হইয়াছিলেন—তাহার অধিক পরিমাণ স্নেহাদর সে তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইল। কেবল ঠাকুরমার নহে বাড়ীর সকলেরই সে আদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল।

রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরণ্ময়ীর বয়স এখন দশ এবং মধ্যমা কন্যা কিরণ্ময়ীর ছয়, সুতরাং এতদিন পরে জ্যোতির্ম্ময়ীর আবির্ভাবে অন্তঃপুরিকাগণের স্নেহধারা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাহার প্রতি বর্ষিত হইতে লাগিল। বোন দুইটির ত সে খেলার পুতুল, তাহাকে পাইলে তাহারা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যায়। রাজবাড়ীর আত্মীয়া পরিচারিকাগণের অবস্থাও তথৈবচ, শত কাজের মধ্যেও অবসর করিয়া লইয়া তাহারা শিশুদর্শনে ছোটে। আর মহারাণীর ত কথাই নাই—জ্যোতির্ম্ময়ী তাঁহার বক্ষের ধন। তাহাকে দুগ্ধ পান

না কেবল তার প্রসূতি, স্তন্যপান করাইবার সময়ে মাত্র কন্যাকে তিনি কোলে পান।

রাজান্তঃপুরে ভৃত্য প্রবেশের নিয়ম নাই। কেবল দুইজন মাত্র এ সম্বন্ধে বর্জ্জিত বিধির মধ্যে গণ্য। রাজার শৈশব ভৃত্য হরিরাম—আর রাজার পিতার আমলের দৌবারিক কালীদিন পাঁড়ে। ইহারা এৎলা দিয়া মহারাণীর নিকট যাইতে পারে। পেন্সন-ভোগী পাঁড়ে এখন এত বৃদ্ধ হইয়াছে যে চোখেও ভাল দেখিতে পায় না—কাণেও কম শোনে—কিন্তু তাহার বিশ্বাস সে দেউড়িতে না থাকিলে রাজবাড়ীর আদব-কায়দা রক্ষা হওয়া অসম্ভব। তাই পেন্সন লইয়াও সে এবাড়ী ছাড়িতে পারে না। চোখের গুণে সে রাজার বন্ধু-বান্ধবদিগকেও গেট হইতে নির্ব্বাসন হুকুম দিয়া থাকে আর কাণের দোষে পাত্রপাত্র নির্ব্বিশেষে গালি-গালাজ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। মাঝে মাঝে নূতন লোকের নিকট রাজাকে এজন্য অপ্রস্তুতও হইতে হয়। একবার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে নাকি বড়ই নাকাল হইতে হইত, যদি না—সেই সময় রাজা আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। তবে রাজার আত্মীয় বন্ধুরা পাঁড়েকে সকলেই চেনে, তাই তাহার ব্যবহার ক্ষোভের পরিবর্ত্তে তাহাদের কৌতুকই উদ্রেক করে। রাজার অল্পবয়স্ক আত্মীয় বালকদিগের নিকট হইতে পাঁড়ের এজন্য উপদ্রবও কম সহ্য করিতে হয় না, বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতা-অপরাধ চিরদিনই বালকদিগের হাসি তামাসার বিষয়।

বৃদ্ধ পাঁড়ে এবং হরিরামের শিশুদর্শন আর্জ্জেন যথাসময়ে পেশ হইল। ষষ্ঠীপূজার পর অন্তঃপুরের দালানে একজন পরিচারিকা শিশুকে কোলে লইয়া দাঁড়াইল—পাঁড়ে নিদ্রিত বালিকার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্ধনয়নকে যথাসম্ভব ফুটাইয়া তুলিয়া মস্তক আঘ্রাণে তাহাকে অভিনন্দন করিল। হরিরামের চিত্ত এত সহজে তৃপ্তিলাভ করিল না। পরিচারিকার নিকট হইতে তাহাকে নিজহস্তে তুলিয়া লইয়া সুনিপুণা ধাত্রীর মত আস্তে আস্তে দোল দিতে দিতে হর্ষবিস্ফারিত নয়নে তাহাকে দেখিয়া সে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "রাজকুমারী কি হুবহু রাজার মত দেখিতে হইয়াছেন !"

একথা মহারাণী কিন্তু এ পর্য্যন্ত একবারও মুখে আনেন নাই। ইহার পর হইতে হরিরামের সংসারের শত মায়ার সহিত আর এক মায়ার যোগ হইল। সে প্রতিদিনই একবার করিয়া শিশুকে দেখিতে আসিত। যেদিন কোন কারণে তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিত সেদিন শ্যামসুন্দরের আরতির সময়েও মনস্থির রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। কেবলি তাহার মনে হইত—হয় ত বা রাজকুমারীর কোন অসুখ হইয়াছে।

শিশু যখন আট দশ মাসের—তখন হইতে হরিরামের এক নূতন কাজ জুটিল। বালিকার নরম নরম রেশমী চুলগুলি সে মাথার উপর তুলিয়া চূড়া করিয়া বাঁধিয়া দিত, একখানি পীতধড়া পরাইয়া কটিদেশে সোনার পাটা কষিয়া দিত, এইরূপে সাজসজ্জা শেষ করিয়া তাহাকে বুকের উপর দাঁড় করাইয়া হরিরাম গান ধরিত—

নাচে আমার গোপালমণি দেখবি যদি আয়,—
তার—পীতধড়া মোহনচূড়া, নূপুর বাজে পায়।

ভৃত্যের গানের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা হাসিয়া হাসিয়া নাচিত। ঠাকুরমা এই নাচ দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়া গেলেন, যে হরিরামের অবিলম্বে ৫ টাকা করিয়া বেতন বৃদ্ধি হইল—অধিকন্তু এত দামী ভাল ভাল কাপড় সে উপহার পাইতে লাগিল, যে তাহার স্ত্রী কর্ত্রীর বেশভূষা অন্যান্য পরিচারিকাগণের ঈর্ষার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। রাজাও মাঝে মাঝে আসিয়া কন্যার নাচ দেখিয়া প্রীত হইতেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শরীর মনের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাচেরও উন্নতি দেখা গেল।

তিন বৎসর বয়স হইবার আগেই তাহাকে হরিরাম গায়িকা করিয়া তুলিল। নূপুর দুগাছি তাহার পায়ে সদাসর্ব্বদাই থাকিত, কিন্তু ভৃত্য বালিকার নিকট আসিবার সময় তাহার জন্য প্রতিদিন একগাছি করিয়া ফুলের মালা লইয়া আসে। মালাটি তাহার গলে পরাইয়া, হাতে একটি বাঁশি তুলিয়া দেয়;—বাঁশিটি দুই হাতে ধরিয়া পা-দুটি একটির উপর আর একটি রাখিয়া হরিরামের মোটা গলার সঙ্গে মিলাইয়া আধ আধ কোমল কণ্ঠে সে গান ধরে,—

নাচে আমার গোপালমণি দেখবি তোরা আয়,—
তার, পীতধড়া মোহন চূড়া—নূপুর বাজে পায়!
তার—বনমালা গলায় দোলে (সে যে)
রুণুঝুণু রঙ্গে চলে—
তার, নয়ন-কোণে চাঁদের আলো ঝলকিয়ে যায়!
দেখবি যদি শ্যামের লীলা,
আয় গো ছুটে ব্রজবালা
তার হাতের বাঁশি,—শোন্‌রে আসি
কি মধুর গায়!

গান আরম্ভ হইবার পর হরিরামের তুড়ির সঙ্গে সঙ্গে বালিকার নৃত্য আরম্ভ হয়—এই মনোমোহন নৃত্য দেখিবার জন্য রাজবাড়ীতে ছুটাছুটি পড়িয়া যায়। রাজার ইচ্ছা হইল—কন্যার এই নৃত্য-গীতে তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে একদিন পরিতৃপ্ত করেন। কিন্তু পুরুষ-মজলিসে আনীত হইয়া বালিকা এমনি নিস্তব্ধ গম্ভীর হইয়া গেল যে পিতার শত অনুরোধেও একটি পা তাহার নড়িল না। কন্যার যে বেশ একটু জেদ আছে সেই দিন হইতে তাহা বেশ বুঝা গেল।

(৬)

জ্যোতির্ম্ময়ী যখন ৭।৮ বৎসরের বালিকা তখন রাজবাড়ীতে উপর্য্যপরি দুই তিনটি শোচনীয় ঘটনা ঘটিল। রাজার দুই কন্যারই বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সে এক জমীদারের দুই পুত্রের সহিত। জ্যেষ্ঠা হিরণ্ময়ীর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে প্রসবের সময় অকালমৃত্যু ঘটিল, আর ইহার অল্পদিন পরে কিরণ্ময়ীও ইহলোক ত্যাগ করিল। কি পীড়ায় যে তাহার মৃত্যু হইল—অতুলেশ্বর তাহা জানিতেও পারিলেন না। সব শেষ হইয়া যাইবার পর তাঁহার নিকট এ খবর আসিল। রাণী তখন অন্তঃস্বত্বা ছিলেন—এই অল্প সময়ের মধ্যে উপরি উপরি দুই কন্যার মৃত্যুশোক তাঁহার সহ্য হইল না, অকালপ্রসবে তিনিও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। রাজবাড়ীর সকলেই শোকনিমগ্ন হইল, বালিকার জীবনেও একটা সুগভীর কাল রেখা পড়িল, কিন্তু মর্ম্মাহত হইলেন অতুলেশ্বর। এই আঘাতে মহাকাল-চক্রের কক্ষবিচ্যুত হইয়া তাঁহার জীবন যেন ছিন্ন

পথে প্রধাবিত হইল। দুঃখের মধ্য দিয়া ভগবান যেন তাঁহাকে নব জন্মদানে নূতন জ্ঞানে প্রবুদ্ধ করিলেন।

অতুলেশ্বর স্বভাবতঃ উদারপ্রকৃতি—মনে মনে বুঝিতেন স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা দেশের পক্ষে জাতির পক্ষে কল্যাণজনক! কিন্তু এ সত্য তাঁহার মনে এমন বদ্ধমূল ভাবে বসে নাই—যে আজন্ম সংসারের বেড়া ভাঙ্গিবার সাহস তাঁহার জন্মায়। আজ তিনি বুঝিলেন—স্ত্রী-শিক্ষা কেবল মাত্র কল্যাণজনক তাহা নয়—স্ত্রী-জাতির জ্ঞান-নেত্র উন্মেষের উপর জাতির গতি-মুক্তি একান্ত ভাবে নির্ভর করিতেছে। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—জ্যোতির্ম্ময়ীকে আর ছোটবেলায় বিবাহ দিবেন না—এবং তাহাকে রীতিমত লেখাপড়া শিখাইবেন।

এই সময় প্রসাদপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট বদল হইল। নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লাউডেন সাহেবের পত্নী রাজার এই শোকের সময় আন্তরিক ভাবে সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে বেশ একটু বন্ধুত্ব জন্মিল, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায়—রাজা তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে যেন দৈবশক্তি লাভ করিলেন। তাঁহার সাহায্যে এবং তাঁহার পরামর্শে রাজান্তঃপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। বাঙ্গলা পড়াইতে কলিকাতা হইতে দুইজন শিক্ষয়িত্রী আসিলেন, ইংরাজীর জন্য স্থানীয় মিশনারী মেম দুইজন নিযুক্ত হইলেন। রাজবাটির বালিকাগণ এবং প্রজাদিগের কন্যাও অনেকে এখানে শিখিতে লাগিল।—

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী—নিজে দুই তিন দিন বিদ্যালয়ে আসিয়া সেলাই শিখাইতেন,—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার তত্বাবধান করিতেন—এবং মাসে একবার করিয়া ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ীর মেধাশক্তি দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইতেন। যাহা তাহাকে শেখান হইত অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে তাহা অভ্যস্থ করিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত জটীল পাঠ গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী তাহাকে কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন। সর্দাসর্ব্বদা নিজের বাটিতে লইয়া যাইতেন।

রাজা বিকালে বায়ুসেবনে গমনকালে প্রায়ই কন্যাকে গাড়ীতে সঙ্গে লইতেন। সকালে সে ঘোড়ায় চড়িতে শিখিত। অনেক সময় পিতার সহিত শীকারেও সে যাইত। মেয়েদের নির্ভীকতা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন আছে,—ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী—রাজাকে ইহা বেশ করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। একবার জ্যোতির্ম্ময়ী শীকারস্থলে তাহার সাহসের আশ্চর্য্যরূপ পরিচয় দিয়াছিল। একটা শীকারী হাতী সেখানে কি কারণে কে জানে মাহুতের অবাধ্য হইয়া বেগে ছুটিয়া—সকলকে ভয়বিহ্বল করিয়া তুলিল। মাহুত যদি একেবারে বে-এক্তার হইয়া পড়ে তবে হস্তী যে কত লোককে পদদলিত, আহত করিবে তাহার ঠিক নাই। এই আতঙ্ক চাঞ্চল্যের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রশান্তভাবে বংশীধ্বনির মত মধুর অথচ উচ্চস্বরে,—ডাকিল—"মিতিয়া—মিতিয়া"! সে স্বরে ধাবমান হস্তীর গতিবেগ সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল—উর্দ্ধকর্ণ হইয়া সে দাঁড়াইল,—জ্যোতির্ম্ময়ী

আবার ডাকিল "আও ভাইয়া—আও মিতিয়া"—হাতী ধীরে ধীরে তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর হস্তীর নিকট আসিয়া শুণ্ড তুলিয়া ধরিল; বালিকা তাহাকে আদর করিয়া স্কন্ধে বিলম্বিত শীকারি-ঝুলি হইতে একখণ্ড রুটি বাহির করিয়া তাহাকে প্রদান করিল,—সে সেলাম করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া শান্ত হইয়া গেল। বালিকা যে হাতীশালায়, ঘোড়াশালায় গিয়া জীবজন্তুর সহিত ভাব করে—ম্যাজিষ্ট্রেট-দম্পতি তাহা এই প্রথম জানিলেন। সুতরাং এ ঘটনায় তাঁহারা তেমন বিস্মিত হইলেন না, কিন্তু ভৃত্য সকলে বলিল—"জন্মাষ্টমীর দিনে বালিকার জন্ম—তাহার দৈবশক্তি হইবে না?"

এইরূপ অনাচারের মধ্যে কন্যাকে লালিত পালিত করিতে দেখিয়া মহারাণী মনে মনে ক্ষুব্ধ হইতেন,—কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতেন না। রাজা মেয়েকে সঙ্গে রাখিয়া মনের মত শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া যদি শোক ভুলিয়া থাকেন, ত তিনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে নিরস্ত করিবেন? আর কতদিনই বা এ খেলা! যতদিন কন্যার না বিবাহ হয়—সেই কটা দিন বইত নয়? লউন এই কয়েক দিন রাজা তাঁহার সখ মিটাইয়া।—কিন্তু মহারাণী যখন দেখিলেন বার বৎসরের মেয়েরও বিবাহের নামগন্ধ রাজা মুখে আনেন না, তখন তিনি ভীত হইয়া জেদ ধরিয়া বসিলেন,—"মেয়ের বর খোঁজ,—বিবাহ দাও,—তাহাকে অন্তঃপুরিকা কর,—আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে রাখিও না।"

রাজা কিন্তু এবার অটল,—তিনি একান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"না মা আমি, আর ছোটবেলায় মেয়ের বিবাহ দেব না, আমাকে ঐ অনুরোধটি কোরো না।" মা উত্তরে প্রথমত কোন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। দুইটী কন্যার অকাল-মৃত্যুর স্মৃতি তাঁহাকেও নিস্তব্ধ করিয়া তুলিল! কিছুপরে দুঃখের চিন্তা মনের মধ্যে চাপিয়া হইয়া হাসিয়া বলিলেন—"মেয়েকে স্বয়ম্বরা করবি নাকি রে?" এইরূপ কৌতুক-বাক্যে পুত্রের মন হইতে শোকস্মৃতি তাড়াইয়া দিবেন এই তাঁহার অভিপ্রায়।

তাঁহাদের কথা হইতেছিল অন্তঃপুরের দালানে একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়া। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে মহারাণী কোমল শয্যা গ্রহণ করিতেন না। রাজা মাতার কথায় পাশের উন্মুক্ত আকাশ-খণ্ডের দিকে চাহিয়া কণ্ঠাগত সুদীর্ঘ নিশ্বাস সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ফেলিয়া উত্তরে বলিলেন, "ক্ষতি কি? আগে ত সেইরকমই হোত।"

"সেকাল নেইরে—কতবার সে কথা বোঝাব তোকে? যা যায় তা কি আর ফেরে অতুল!" অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহারাণীর মুখ হইতে এই কথাই বাহির হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে নয়নে জলও ভরিয়া উঠিল। এবার রাজার পালা,—মায়ের অশ্রুজল নিবারণ উদ্দেশে তিনি কৌতুকচ্ছলে বলিলেন,—

"কেন মা, কালচক্র ঘুরে ফিরে ত সেই একই পথে আসে,—একালকে সেকাল করে তুলব আমরা, সেজন্য ভাবনা কি! সেই চেষ্টাতেই ত আমি আছি—সেটা কি বুঝছ না মা?"

"বুঝছি বলেই ত ভয় পাই। অসাধ্য-সাধন করতে গিয়ে কি-একটা অদ্ভুত কাণ্ড

করে বসবি! তা বাছা বিয়ে এখন নাই দিলি—পাত্র দেখে রাখতে ক্ষতি কি?"

"বড় না হলে যখন বিয়ে দেবই না তখন পাত্র দেখে লাভও ত নেই। বরঞ্চ ক্ষতি এই—পরে আরও ভাল পাত্র যদি পাওয়া যায় তখন তাকে গ্রহণ করবার আর উপায় থাকবে না।"

এই সময় সহসা জ্যোতির্ম্ময়ীর সময়োচিত আবির্ভাবে সে কথা বন্ধ হইয়া গেল। সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী তাঁহাদের নিমন্ত্রণ ছিল। বালিকা সেজন্য প্রস্তুত হইয়া পিতাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। কিন্তু নিমন্ত্রণে যাইবে বলিয়া সজ্জাড়ম্বর তাহাতে কিছুই ছিল না। বেশী সাজসজ্জা বা গহনা পরা রাজা ভাল বাসেন না, মেয়েরও সেইরূপ রুচি হইয়াছে। প্রতিদিন বিকালে যে সাজে সে পিতার সহিত গাড়ীতে বেড়াইতে যায়—আজও তাহার সেই একইরূপ সাজ। সে পরিয়াছে ফিকা গোলাপী রঙের একখানি সাড়ী, শাদা রেশমের একটি জ্যাকেট ও শাদা রঙের জুতা মোজা। অলঙ্কারের মধ্যে উন্মুক্ত কেশ-বন্ধনী স্বরূপ শিরোভাগে মুক্তার কাজ করা একটি গোলাপি ফিতা, দুএকটি ব্রোচ; হাতে দুগাছি মুক্তার চুড়ি,আর কণ্ঠে একগাছি মতির মালা। জ্যোতির্ম্ময়ীর শিক্ষয়িত্রী গভর্ণেশ কুন্দবালা তাহাকে সাজাইয়া দিয়াছিল। এই স্বল্পতর সাজে তাহার রূপখানি এত খুলিয়াছিল, যে মনে হইতেছিল বালিকা যেন কতই সাজ-সজ্জা করিয়াছে। রাজা কন্যার প্রতি আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "সময় হয়েছে বুঝি, চল রাণী।"

রাজা কন্যাকে রাণী বলিয়াই ডাকিতেন। তাঁহারা চলিয়া গেলেন,—মহারাণীর নয়নে কন্যার রূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগতঃ বলিলেন, "হায়রে! এত রূপ—মেয়ের, এ না জানি কার হাতে পড়বে, সে আদর করবে কি অনাদর করবে—তারই বা ঠিক কি? সাধে কি মেয়ে ছেলে হলে দুঃখ করি! মেয়ে-জন্মের ত কত সুখ! এই জন্যেই অতুল মেয়ের শিগ্‌গির বিয়ে দিতে চায় না, তাও বুঝি,—কিন্তু তবুও ত দিতে হবে রে বোকা!"

মহারাণী রাজার অজ্ঞাতসারে জ্যোতির্ম্ময়ীর পাত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রাজা আর একটি অভূতপূর্ব্ব কাজ করিয়া বসিলেন।—১২ বৎসরের মেয়েকে আজও বাহিরে রাখিয়া রাজা ক্ষান্ত নহেন, তার সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এক পণ্ডিত নিযুক্ত হইল। মহারাণী অনেক সহিয়াছেন, কিন্তু এত বড় একটা অনাচার তিনি চুপ করিয়া সহিতে পারিলেন না। পুত্রকে ডাকিয়া—শিরে করাঘাত পূর্ব্বক কহিলেন—"তুই কি জাত ধর্ম্ম সব খোয়াবি রে? নিদেন আমার মরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্!"

রাজা তাঁহার ক্রোধোক্তিতে না দমিয়া হাস্যমুখেই বলিলেন—"জান মা তোমার ঐ আঘাত আমার মাথাতেই পড়ছে! আমাকে অভিশাপ লাগছে? তুমি দেখে নিও—কে আগে মরে।"

রাজার এই কথায় মহারাণী জাতি ধর্ম্মের ব্যবস্থার কথা ভুলিয়া গেলেন।

এই রকম কৌশলে বরাবরই পুত্র মাকে হার মানাইয়া আসিতেছেন। মহারাণী আকুল

কণ্ঠে কহিলেন, "ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস, অভাগিনীর আঁচলের ধন তুই—অমন কথা মুখে আনিসনে বাছা,—তোর মেয়েকে নিয়ে তুই যা খুসী কর্‌গে।"

"কিন্তু তুমি অসুখী হলে ত তা পারব না মা। তোমার দুষ্টু ছেলের কাজই খুসী হয়ে তোমাকে মেনে নিতে হবে। জ্যোতির্ম্ময়ী ছেলে নয় বলে, তোমার এত আক্ষেপ—তাইতেই না আমি তাকে ছেলে গড়বার চেষ্টাতে আছি !"

মায়ের রাগ ছেলের কথায় পড়িয়া আসিয়াছিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন—"ওরে নির্ব্বুদ্ধি, তুই ইচ্ছা করলেই কি তা হবে? শেষে তোর মেয়েটি চিত্রাঙ্গদা হয়ে দাঁড়াবে —দেখে নিস্।"

"অর্জ্জুনের মত নাতজামাই যদি পাও— তাতে ত তোমার আপত্তিও হবে না মা।"

"সেই বরই প্রার্থনা করি। তোর মেয়ে ভাগ্যবতী,—তা হোতেও পারে।" এইরূপে ক্রন্দনপর্ব্ব হাস্যে পরিণত হইলে মহারাণী বলিলেন—"তবু ত বাছা তোর একটি বংশধর চাই। অর্জ্জুন নাতজামাই তোর মেয়ের প্রাণ ঠাণ্ডা করবে—কিন্তু তোর ছেলে নইলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা করে কে বল দেখি? বিয়ে কর্ বাছা,—কতদিন আর বাঁচব—আমার এই সাধটি পূর্ণ কর্, লক্ষ্মী ছেলেটি আমার।"

"সর্ব্ব সাধ কি সংসারে পূর্ণ হয় মা! ছেলে হবার হলে আগেই হোত। এখন মেয়ে নিয়েই তোমার সাধ বাসনা পূর্ণ করতে হবে।"

"তাই বা দিচ্ছিস কই? মেয়ের ত বিয়ে দিতে চাচ্ছিস নে।"

"দুটি মেয়ের ত ছোটবেলাতেই বিয়ে দিয়েছিলে,—কত সাধ তোমার পূর্ণ হোল বল দেখি? তোমাদের মনের গতি আমি বুঝে উঠতে পারিনে? পদে পদে ঠেক্‌বে— কিছুতেই তবু শিখতে চাইবে না!" রাজা রাগ করিয়া এই কথা বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

মাসকাবারি

আর্টের অভিব্যক্তি ও আধুনিক আর্টের রূপ

জর্ম্মাণ দার্শনিক হিগেল আর্টের অভিব্যক্তির ধারায় oriental. classical এবং romantic এই তিন শ্রেণীপর্য্যায় নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন আর্টের শৈশব অবস্থায় দেখা যায় যে, শিল্পীর অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ্ ভাবপ্রকাশের জড় উপকরণের বাধা অতিক্রম করিয়া আপনাকে যথাযথরূপে প্রকাশ করিতে পারে নাই। কবি, চিত্রকর বা ভাস্করের মনের মধ্যে যে আইডিয়াটা ছিল তাহা কাব্যে সুবিহিত আকার পায় নাই, চিত্রে বিক্ষিপ্ত বা অতিরঞ্জিত হইয়া গেছে,

মূর্ত্তিতে অসমবিন্যস্ত বা অপরিমাণ হইয়া নষ্ট হইয়াছে। এই শ্রেণীর আর্টকে হিগেল oriental art নাম দিয়াছিলেন। তারপর তিনি দেখাইয়াছেন যে, আর্টের যৌবন দশায় ভাবের সঙ্গে ভাবের প্রকাশের সাযুজ্য ও সারূপ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভাব আপন প্রকাশের মধ্যে সুবিহিত সুপরিমিত ও সুষমা বিশিষ্ট আকার লাভ করিয়া সার্থক হইয়াছে। হিগেল এই আর্টকে classical art বলিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের সভ্যতা উন্নতির নানা খাত কাটিয়া বিবিধ ধারায় প্রবহমান; সেই বহুযুগব্যাপী জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা, সামাজিক সাধনা ও আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে মানুষের রসবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ প্রভৃতি ক্রমশ সূক্ষ্ম ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। তাই আর্টের প্রৌঢ়দশায় ভাবকে প্রকাশ করিতে গিয়া কবির বাণী নীরব হইয়া যায়, চিত্রকর ব্যর্থকাম হইয়া তুলি ফেলিয়া দেয়, ভাস্কর স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। শিল্পী তার সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে এমন এক অনন্ত ব্যাকুলতা অনুভব করে, প্রেমের অনুভাবের মধ্যে এমন অনির্ব্বচনীয়তা আস্বাদ করে, এবং কি ভিতরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই এমন অতলস্পর্শ অসীম রহস্য তাকে অভিভূত করিয়া দেয় যে, কেমন করিয়া যে তাকে প্রকাশ করিবে তাহা সে ভাবিয়াই পায় না। এই অস্পষ্টসুন্দর, এই অনন্তের ব্যঞ্জনাময় আর্টকে হিগেল romantic art আখ্যা দিয়াছেন।

হিগেল-কথিত এই তিন শ্রেণীর আর্টের রূপই হয় ত কোন সাহিত্যে সমকালেই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের পারম্পর্য্য নাই মনে করিবার কোন হেতু নাই। সভ্যতার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে বলিয়া কি সভ্যতার আদিম অবস্থার ছবি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেছে? হিগেল মনে করিতেন যে, রোমাণ্টিক আর্টই আর্টের চরম পরিণতি। ইহার পর আর্টের আর ভবিষ্য বিকাশ হইবে না, তাহা ধর্ম্ম ও দর্শনের মধ্যে আপনাকে বিসর্জ্জন দিবে। দার্শনিক জল্পনার বিজৃম্ভণ এবং জীবনের বিকাশ যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর মেলেনা, হিগেলের এই দম্ভোক্তিই তার প্রমাণ। আর্ট কত অভাবনীয় বিকাশের পথ ধরিয়া নব নব রূপে অভিব্যক্ত হইবে, কারণ তাহা সমগ্র জীবনকে প্রকাশ করিতে চায় এবং জীবনের অভিব্যক্তি তো শেষ হইয়া যায় নাই। কোন স্পর্দ্ধিত তাত্ত্বিক—ব্যস্ এই পর্য্যন্তই আর্টের সীমা—ইহা বলিলে চলিবে কেন?

রোমাণ্টিক আর্টের পরে একালে realistic art বাস্তব আর্ট এবং symbolical ও mystical art রূপক ও অতীন্দ্রিয় রসাত্মক আর্ট দেখা দিয়াছে। অর্থাৎ একদিকে সাহিত্যের একধারায় দেখি—নৃবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান, মিথুনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির নব নব আবিষ্কারের দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন প্রভৃতি বিষয়ে বিচিত্র নূতন তথ্য স্তূপীকৃত হওয়াতে বহুযুগসঞ্চিত সংস্কার ভাঙিয়া চুরিয়া যাইতেছে। বংশানুক্রমগত (hereditary) অসুস্থ (pathological), অস্বাভাবিক (abnormal), ও সমাজ-প্রতিকূল (ante-social) কত যে পাপ অপরাধ ও বিকৃতির বিশ্লেষ ও উদ্ঘাটন

জোলা-ইব্‌সেন হইতে সুরু করিয়া এ কালের সাহিত্যে জমিয়া উঠিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত মানুষের সম্বন্ধ, ধনীর সহিত শ্রমীর সম্বন্ধ—সকল সম্বন্ধ ও শৃঙ্খলা, সকল স্থিতি ও ব্যবস্থা, উলোট্ পালোট হইয়া ঘূর্ণী-বায়ুপ্রক্ষিপ্ত পর্ণরাশির মত উড়িয়া যাইতেছে। এর নাম রিয়ালিজম্ বা বাস্তবতা। রোমান্টিসিজম্যে ইহা পরিহাস করে। সাহিত্যকে ইহা বিজ্ঞানের সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দাঁড় করাইতে চায়। ইহা তথ্যকেই বড় করিয়া দেখে, সত্যকে নয়।

অথচ একালের সাহিত্যেরই আর এক ধারায় দেখি হিগেল-কথিত রোমান্টিসিজম্ই symbolism ও mysticismএ পরিণতি লাভ করিতেছে। symbolismকে আমরা রূপক বলি, কিন্তু তাহা অ্যালিগরি-জাতীয় সাবেক ধরণের রূপক নয়। অ্যালিগরি শ্রেণীর রূপকের মধ্যে দুইটা ধারা থাকে—একটা স্থূল ঘটনাবহুল বাস্তবচরিত্রসম্বলিত কাহিনীর ধারা, এবং অন্যটা সেই সব ঘটনা বা নায়ক নায়িকারা কোন্ কোন্ ভাবের বিগ্রহ, সেই বিগ্রহসমষ্টিগত রূপক-কাহিনীর ধারা। বাস্তব কাহিনী হিসাবেও অ্যালিগরির রসাস্বাদ হয়, আবার রূপক-কাহিনী হিসাবেও হইয়া থাকে। যেমন স্পেন্সারের Faerie queene কিম্বা দ্বিজেন্দ্র-নাথের স্বপ্নপ্রয়াণ অ্যালিগরির উদাহরণ। কিন্তু symbolical রূপকজাতীয় রচনায় অ্যালিগরি-শ্রেণীর দুইটা ধারা থাকিলেও সেখানে বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব অর্থটার কোন প্রাধান্যই নাই। বাস্তব ঘটনা বা চরিত্র ব্যঞ্জনার দ্বারা যে আর একটা গভীরতর অতীন্দ্রিয় অর্থকে ব্যঞ্জিত করিতেছে, যে গভীরতর অর্থের আভাস দিতেছে, symbolical আর্টে তারই প্রাধান্য। যেমন ধর, রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের চিঠি বা ডাকঘর প্রভৃতির বাস্তব হিসাবে কোন সার্থকতা নাই—এই সমস্ত রূপ একটি অরূপ বা অপরূপ লোকের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ—সেই অতীন্দ্রিয় লোকটাই এখানে সত্য, ঐন্দ্রিয় লোকটা মায়াছায়া মাত্র। আধুনিক যুগে ইউরোপে এই শ্রেণীর symbolical নাট্য ও সাহিত্য অজস্র। মেটারলিঙ্কের প্রায় সকল নাটকই এই জাতীয়। কেল্টিক কবি ও নাট্যকারগণ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়েন।

এই symbolical আর্টের সঙ্গে মিষ্টিক আর্টের একটু বিভেদ আছে। mystic আর্টে symbolical রূপকের মত দুইটা ধারা নাই—সেখানে বাহির ভিতর এক হইয়া একটি মাত্র অনির্ব্বচনীয় ভাবধারা, একটি অখণ্ড নিবিড় আনন্দের সমুচ্ছ্বাস, একটি দিব্য বোধি দেখিতে পাই। অনেক সময় symbolical ও mystical, এ দুয়ের মধ্যে এই বিভেদ না ধরিবার দরুণ symbolical রচনাকেই mystical নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

Realism বা বাস্তবতার সঙ্গে এই symbolism বা mysticismএর আপাতঃ বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও আসলে বিরোধ নাই। কেননা বাস্তবতার পক্ষীয় যাঁরা, তাঁরাও আসলে চান্ বাস্তবের অন্তর্নিহিত সত্য, ফরাসীরা যাকে বলেন—la verite vraie—the very essence of truth.

তাই তাঁরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রণালীতে সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন। আবার symbolist কিম্বা mystic সেই একই এষণায় নিরত। তাঁরাও খুঁজিতেছেন বাস্তবেরই অন্তর্নিহিত সত্য। দুয়ের মধ্যে বিরোধ কেবল এই জায়গায় যে, বাস্তবপন্থা সত্যকে বিচিত্র তথ্যের (Fact) জঙ্গলের মধ্যে হারাইতেছেন, তাঁরা আর্টের আনন্দের ও রসের জায়গায় বিজ্ঞানের শুষ্ক বিশ্লেষণ উপস্থিত করিতেছেন; অপর পক্ষে রূপকপন্থী ও মিষ্টিক সেই বিচিত্র তথ্যের জাল বুনিবার চেষ্টা না করিয়া বাস্তবকেই প্রত্যক্ষকেই অতীন্দ্রিয়ের ব্যঞ্জনায় অপরোক্ষের আভাসে পূর্ণ করিয়া লইতেছেন। মিষ্টিক মাত্রেরই এই মন্ত্র:—এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ। ইনি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় তুরীয় সত্ত্বা ইহার অর্থাৎ বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্ত্বার, পরম আনন্দ। এই উভয়ের আর দুই ধারা নাই, এক অখণ্ড ধারা।

বস্তুতপক্ষে বাস্তবপন্থা ও রূপকপন্থা এই দুই পন্থাতেই আর্ট-সাহিত্য বর্ত্তমান সময়ে চলিয়াছে। মিষ্টিক পন্থা যথার্থভাবে এখনও দেখা দেয় নাই। সাহিত্যে মেটারলিঙ্ক বা ইয়েট্‌স্ বা এ,ই, প্রভৃতি যাহাদিগকে মিষ্টিক বলা হইয়া থাকে, তাঁরা প্রায় সকলেই রূপকপন্থী। তাঁদের মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের, প্রত্যক্ষের সঙ্গে আইডিয়ালের বিভেদ আছে। কিন্তু যথার্থ মিষ্টিকের মধ্যে সে বিভেদ থাকেনা।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা

ভূদেব চরিত। প্রথম ভাগ। শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক চুঁচুড়া বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ড অফিস হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা, ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এখানি চরিত-গ্রন্থ। বাঙ্‌লা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের আদিযুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শে যখন দারুণ সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, আমাদের জাতীয়তা যখন বিপন্ন, পরধর্ম্মের বিপুল মোহে স্বধর্ম্ম যখন জাতির চক্ষে দরিদ্র ম্লান বলিয়া অনুভূত হইতেছে, সেই সঙ্কট সময়ে মহাত্মা ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন। কালের স্রোত তাঁহার চিত্তকে আঘাত করিয়াছিল—কিন্তু ভাসাইয়া লইতে পারে নাই। তিনি সুদৃঢ় অটল মহিমায় আমাদের জাতীয়তার নিশানটিকে সবলে ধরিয়া উড্ডীন রাখিয়া ছিলেন—আমাদের শাস্ত্র-বিধি, আমাদের আচার-নীতি সুদৃঢ় যুক্তির সাহায্যে দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—প্রাচ্য আদর্শের গভীর মহিমা বজ্রস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে ভূদেব ভারতে এক নব যুগের প্রবর্ত্তক। এই গ্রন্থে তাঁহার জীবনের বহু কাহিনী সুন্দর সুশৃঙ্খল ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার বংশ-পরিচয় এবং কি করিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান আপন-শক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিলেন, একই কালে বিদেশী রাজপুরুষ ও স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা এবং গৌরব আকর্ষণ করিলেন, সে কাহিনী বেশ প্রাঞ্জল সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই চরিত-গ্রন্থখানির প্রধান গুণ, এ গ্রন্থ পাঠ করিলে ভূদেবকে পরিপূর্ণভাবে জানা যায়, ভূদেবের ব্যক্তিত্বও বিশেষত্ব রচনার গুণে সুন্দর ফুটিয়াছে। এইখানেই চরিত-গ্রন্থ-লেখকের কৌশল, কৃতিত্ব, ইহাই চরিত-গ্রন্থ-রচনার আর্ট।

ভূদেববাবু তখন ছাত্র; তাঁহারই উপর বাড়ীর

বিগ্রহাদির আরতি করিবার ভার; মিসনরীগণের সংস্রবে ভূদেববাবুর মনে দ্বন্দ্ব বাধিল; তিনি একদিন রাত্রে ঠাকুরের আরতি করিলেন না। পিতা ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আরতি কর নাই কেন? ভূদেব বলিলেন, উহা পৌত্তলিকতা, উহা করিলে পাপ হয়। পিতা এ কথায় কোন তিরস্কার করিলেন না, শুধু বলিলেন, তুমি আমার একমাত্র পুত্র; আমরা একবাড়ীতেই থাকি, কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ কথা-বার্ত্তা বড় কম হয়। কাল হইতে ভোরে উঠিয়া দুইজনে গঙ্গাস্নানে যাইব, পথে একত্রে অনেকক্ষণ কথা-বার্ত্তা কহিতে পাইব। সেই ব্যবস্থাই হইল। পথে পিতার সহিত সহজ কথায় বার্ত্তায় পুত্র বুঝিলেন, নিজে শাস্ত্র কিছুমাত্র অধ্যয়ন না করিয়া স্বধর্ম্মের কোন কথা না জানিয়া তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অন্যায়; তিনি তখন নিজের শাস্ত্র, নিজের ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মোহ কাটিল। স্বদেশবাসী তাহার ফলে অমূল্য গ্রন্থ লাভ করিল।

মুসলমানের প্রতি ভূদেববাবুর এতটুকু বিদ্বেষ ছিল না; তিনি বলিতেন, হিন্দু-মুসলমান এক মাতৃদুগ্ধে পরিপুষ্ট। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরে "দুধভাই"। সামাজিক প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারতসমাজের মধ্যে একটি বর্ণ-বিশেষরূপেই লক্ষিত হইবেন, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" ইহা মস্ত রাজনীতিজ্ঞের কথা। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ মনে করিতেন; সমস্ত সমাজের স্থায়ী উপকারকেই সারাৎসার ভাবিতেন এবং যাহাতে ভবিষ্যতে সমাজের সুবিধা, মোটের উপর ব্যক্তিগত ইহ-পারলৌকিক স্বাচ্ছন্দ্য তাহাতেই অধিক, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

বাস্তবিক কি পারিবারিক জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি ধর্ম্ম-কর্ম্মে এবং কি কর্ম্মক্ষেত্রে—সকল স্থলেই ভূদেববাবু principle মানিয়া চলিতেন—এবং সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়াছিল। বাঙলায় শিক্ষা-বিস্তারের মূলে তাঁহার চেষ্টা সামান্য নয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুলাই তারিখে সেক্রেটারি অব ষ্টেট্ শিক্ষাসম্বন্ধীয় ডেস্‌পাচে ভূদেববাবুর প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন, "উক্ত কর্ম্মচারীর (ভূদেববাবুর) ঐকান্তিকতা এবং সুবুদ্ধি (zeal and intelligence) এবং গবর্ণমেণ্টের সে ব্যবস্থায় যতটা উন্নতি হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া বিশেষ তুষ্ট হইয়াছি।" (have been much gratified at that officer's zeal and intelligence and the correct comprehension mainfested in his report of the progress of the Government in the establishment of his system.) আজ পল্লী-সংস্কার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যের দিকে দেশবাসীর নজর পড়িয়াছে, বহুকাল পূর্ব্বে ভূদেব বাবু তাহার ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে স্বদেশজাত শিল্প প্রভৃতির উন্নতির দিকে আমরা ঝোঁক দিয়াছি, বহুকাল পূর্ব্বে মনস্বী ভূদেব সে দিকেও আমাদের চোখ ফুটাইতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার "পুষ্পাঞ্জলি," "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস," "বিবিধ প্রবন্ধ" প্রভৃতি জ্ঞান-গভীর গ্রন্থ বাঙ্গালীর গৌরব, জাতির গৌরব, যে-কোন-সাহিত্যে গর্ব্বের সামগ্রী। এ জীবনী-গ্রন্থে ভূদেব বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কথা সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে—গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু তিনি যিনিই হউন, ভূদেব বাবুকে তিনি ভাল করিয়া চিনিয়াছেন এবং দেশবাসীর নিকট তাঁহাকে চিনাইতেও পারিয়াছেন। এখানি গ্রন্থের প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় ভাগ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। লেখক এই গ্রন্থ রচনা করিতে বিস্তর পুরাতন চিঠি-পত্র সরকারি রিপোর্ট প্রভৃতি ঘাঁটিয়াছেন, তাঁহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ও অসাধারণ। তবে আমাদের অনুরোধ, দ্বিতীয় ভাগে ভূদেব বাবুর জীবনের একটি critical study যেন তিনি পাঠকগণের সম্মুখে ধরিয়া দেন। এ গ্রন্থে প্রকাশকের ত্রুটি একটি বিষয়ে লক্ষ্য হইল—গ্রন্থে সূচী দেওয়া হয় নাই, indexএর ধরণে গোড়ায় একটি সূচী দেওয়া উচিত ছিল। আশা করি, এ ত্রুটি অচিরে স্খলিত হইবে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভালই হইয়াছে—এবং এত বড় গ্রন্থের মূল্য দুই টাকা মাত্র করিয়া প্রকাশক-মহাশয়

যে এ গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে সহজ-প্রাপ্য করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ঠাণদিদির কবিরাজী। বা সরল গৃহ-চিকিৎসা। (দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ) শ্রীযুক্ত নীলমাধব সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক নানা আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থহইতে সঙ্কলিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ; ও ইণ্ডিয়ান পাব্লিসিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে নানা ব্যাধির উৎপত্তির কারণ, লক্ষণ ও তাহার প্রতিকারের অত্যন্ত সহজ ঔষধাদির বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থখানি কথোপকথনচ্ছলে লিখিত এবং রচনার ভঙ্গীটিও এমন সহজ যে অল্পশিক্ষিতা রমণীগণও পাঠ করিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা একজন অভিজ্ঞ বৈদ্য এবং ঔষধগুলিও পরীক্ষিত। পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রাচীনার দল ছেলেমেয়েদের ছোট-খাট অসুখ বিসুখে নিজেরাই প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন, এখন বাড়ীর ছোট ছেলেটির সামান্য একটু সর্দ্দি হইলে আমরা ডাক্তার ডাকি এবং ক্ষুদ্র শিশুকে প্রেসকৃপসনের মিক্শ্চার খাওয়াইবার ব্যবস্থা করি। অসুবিধা ইহাতে কতখানি তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, এবং কুড়ি-পঁচিশ টাকাই যখন আমাদের সাধারণ বাঙ্গালীর মাসিক আয়, তখন গৃহস্থের পক্ষে তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহ যে একান্ত কঠিন,এমন কি অসাধ্য, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর ছোটবেলা হইতে মিক্শ্চার, পেণ্ট ও তাপ-প্রভৃতির চাপে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হইতে পায় না। আমাদের প্রাচীন প্রথায় নানা গাছ-গাছড়ার মূল পাতা এবং টোট্কা ঔষধে বিস্তর উপকার হইত। সেই সব পুরানো হারানো ব্যবস্থা এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথমেই এ গ্রন্থে জ্বরের কথা আছে। জ্বর কয় প্রকার, কোন্ জ্বরের কি লক্ষণ, উপবাসের উপকারিতা কি, এবং কিরূপ লক্ষণ-যুক্ত জ্বরে কিরূপ ঔষধ-পথ্যাই বা দেওয়া উচিত তাহার পরিপূর্ণ বিবরণ গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। এমনি ভাবে অতিসার, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, দাহ, হৃদ্রোগ প্রভৃতি সমস্ত সাধারণ রোগের লক্ষণ-ঔষধাদির কথাই বিবৃত হইয়াছে। ঔষধগুলি অতীব সহজে সংগ্রহ করা যায় এবং তাহা যথেষ্ট সুলভ। পরিশিষ্টে ঔষধগুলির ভারতের নানা দেশে প্রচলিত বিভিন্ন নামের তালিকাও আছে। এ গ্রন্থখানি বাঙ্লার প্রবীণা ও নবীনা জননীগণের হস্তে বিরাজ করিলে কল্যাণের সম্ভাবনা আছে।

বজ্রমণি। শ্রীমতী সীতা দেবী প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয়, ২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ব্রাহ্মমিসন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি ছোট গল্পের বহি; "চোখের আলো," "স্মৃতিরক্ষা," "পথের দেখা", "রূপান্তর", "আলো ফুল" ও "সাথী"—এই ছয়টি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম পাঁচটি গল্প মৌলিক এবং শেষেরটি ব্রেট হার্টের গল্পের অনুবাদ। গল্পগুলি সুখপাঠ্য, ভাষায় প্রাণ আছে, রচনার ভঙ্গীও হৃদয়গ্রাহী। তবে প্রায় সর্ব্বত্রই সহজ কথাকে বাঁকাইয়া ঘুরাইয়া বলিবার চেষ্টা এবং জোর করিয়া হাস্যরসসৃষ্টির প্রয়াস মাঝে মাঝে রসভঙ্গ করিয়াছে। গল্পগুলিতে মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ আছে এবং তাহা উপভোগ্য হইয়াছে। "চোখের আলো" ও "রূপান্তর" গল্প দুইটিতে রোমান্স বেশ ফুটিয়াছে; তবে এ দুইটি গল্পই একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। "স্মৃতি-রক্ষা" গল্পটিতে করুণ রস চমৎকার ফুটিয়াছে। বাঙালীর সমাজে উমার মত দুর্ভাগিনী বালিকার অভাব নাই, এ ধরণের গল্প বাঙ্লা সাহিত্যে বিরল নয় এবং ঘটনাও অসাধারণ নয়, কিন্তু রচনার গুণে এ গল্পটি অভিনব সজ্জা ধারণ করিয়াছে; শেষের দিকে প্লট জটিল হইয়া উঠিলেও লেখিকা শেষ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। বইখানির ছাপা-কাগজ-বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে। ছোট গল্প-রচনায় লেখিকার হাত আছে।

বৈরাগ্যের পথে। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের যে সকল অমূল্যবাণী ইতস্ততঃ সংরক্ষিত আছে, তাহারই মধ্য হইতে যেগুলি গৃহী, সংসারীর পক্ষে উপযোগী, তাহাকে পথ দেখাইবে, সেইগুলি বাছিয়া এবং বিষয়-অনুযায়ী সাজাইয়া গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। তাপিত তৃষিত

নর-নারীর চিত্তে এ অভয় বাণী শান্তি ও উৎসাহের বার্ত্তা বহিয়া আনে। এ-সকল বাণীর যত অধিক প্রচার হয়, ততই সমাজের মঙ্গল।

সচিত্র স্বাস্থ্যপাঠ। শ্রীযুক্ত কুমারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এস সি, এল, টি কর্ত্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, এল, এল, বি কর্ত্তৃক মূল ইংরাজী হইতে অনুদিত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ; ও ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা মাত্র। এখানি শরীর-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ—বালক-বালিকাদিগের জন্ম লিখিত হইলেও সাধারণে এ গ্রন্থ-পাঠে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সহিত পরিচিত হইবেন। রচনা বেশ সহজ, ভাষা সরল। গ্রন্থখানি প্রত্যেক স্কুলে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

হিন্দু-কণ্ঠহার। শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিশ্বনাথ ট্রষ্ট ফণ্ডের অফিস হইতে প্রকাশিত। চুঁচুড়া, বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। হিত-কথা চরিত্র-বিকাশের একটি প্রধান সহায়। বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বিস্তর অমূল্য শ্লোক এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে; দেবদেবীর ধ্যান, প্রণাম হইতে আরম্ভ করিয়া মানব-চিত্তের বিবিধ সদ্‌গুণ, স্বাস্থ্য-সদাচার, রাজধর্ম্ম, ও সামাজিক বিবিধ কর্ত্তব্যাদি সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে যে সকল অমূল্য বাণী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, তাহাই সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ পাঠ করিলে হিন্দুজাতির সার্ব্বজনীন উদারতা, মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা ও কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, শ্রদ্ধায় শির নত হইয়া পড়ে। এই সকল অমূল্য প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক-পাঠে মনের ক্ষুদ্রতা ও নীচতা দূর হয়, উদার ভাবে মন পরিপূর্ণ উন্নত হয়।

সরলা। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান প্রণীত। প্রকাশক মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা। মেটকাফ প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচসিকা। এই উপন্যাসের সমালোচনা এক কঠিন ব্যাপার। লেখক এই গ্রন্থে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টানকে একসঙ্গে যেন একটা হামানদিস্তায় পুরিয়া কষিয়া ঘুঁটিয়াছেন! তিনটি সমাজের ভাল-মন্দ লোক নানা ঘটনার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে উঁকি দিয়াছেন—কিন্তু কেহই স্পষ্ট দেখা দেন নাই। নায়িকা সরলা বিস্তর রকমের আজগুবি ঘটনার মধ্য দিয়া চলা-ফেরা করিয়া আজগুবি রকমে গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় আসিয়া "অন্ধকার ও বাতাসের মধ্যে মিশে গেল"। লেখকের রচনার ভঙ্গী ভালই, কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই—অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস নাই, তবে ভাষা মাঝে মাঝে দো-আঁশলা গোছের হইয়াছে। উপন্যাসের ভাবও উঁচু পর্দ্দার—নারী, নারীর সুখ-দুঃখ, নারীর অসহায়তা এ-সমস্তই এ-দেশের সমাজ কিরূপ বর্ব্বরের মত উপেক্ষা করিতেছে, সেদিকে লেখকের ইঙ্গিত বেশ তীক্ষ্ণ এবং মর্ম্মস্পর্শী। সেইটকুই এ উপন্যাসে একমাত্র প্রশংসার সামগ্রী। নহিলে ঘটনা-সংস্থান, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে কৌশল কিছুমাত্র নাই—লেখক যে কয়টি সাধু-চরিত্র আঁকিয়াছেন, সেগুলি প্রাণহীন মাটীর পুতুল, বরং বদচরিত্রের লোকগুলো গোটা হইয়াছে, জীবন্ত হইয়াছে। আর একটা ব্যাপার নেহাৎ হাস্যকর,—মুসলমান না হইলে কি মানুষ ভাল হয় না? বিলাসের আবদুল্লা হওয়ার ত ইহা-ভিন্ন দ্বিতীয় কারণ খুঁজিয়া পাই না। বেচারা হিন্দু থাকিয়া গেলে কি ক্ষতি হইত? লেখক এই সকল সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী ছাড়িয়া নিরপেক্ষভাবে উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা করিলে কালে তাঁহার রচনা সফল হইতে পারে বলিয়া মনে হয়।

চমচম্। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ, বি, এ কলিকাতা; ইউ রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এখানি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্ম লিখিত ছবি ও ছড়ার বহি। রচনা চলনসই—তেমন ঝরঝরে নয়,—ছন্দও নেহাৎ পঙ্গু, তবে ছবিগুলি ভাল। ছাপা-কাগজও ভাল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট হইতে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।